উদ্বোধন

৫১ম বর্ষ

(১৩৫৫ মাঘ হইতে ১৩৫৬ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী সুন্দরানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

(মাঘ, ১৩৫৫ হইতে পৌষ, ১৩৫৬)

স্বামী বিবেকানন্দ

আমেরিকায় ভগিনী ললিতার গৃহে

'উদ্বোধনে'র নববর্ষ

সম্পাদক

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপিত 'উদ্বোধন' বর্তমান মাঘ মাসে একান্ন বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ এই মাসিক পত্র বহু নিবন্ধ সহায়ে পৃথিবীর লোকোত্তর ধর্ম-প্রবর্তক ও বিশ্বমানবহিতৈষী মনীষিগণ-প্রচারিত ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সমদর্শন প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছে। এই বিশ্বজনীন মহান ভাবসমূহকে ভিত্তি করিয়া দেশের রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার এবং এইগুলিকে সকল নরনারীর দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কর্মে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন 'উদ্বোধনে'র জীবনাদর্শ। নববর্ষে পদক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসি-সংঘ-পরিচালিত এই মাসিক পত্র পুনরায় নবোদ্যমে এই মহান আদর্শ প্রচার করিতে চেষ্টা করিবে।

অসাধারণ প্রভাবশালী ধর্মপ্রবর্তক কৃষ্ণ বুদ্ধ মহাবীর শংকর রামানুজ নানক চৈতন্য তাও কংফুসে জরাথুষ্ট্র মুশা খৃষ্ট মহম্মদ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রীর মাহাত্ম্য বিভিন্ন ভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণে সকল দেশের বিশ্বপ্রেমিক মনীষিগণ এই মহতী বাণীই সকল নরনারীকে শুনাইয়াছেন। তাঁহারা এই মহান ভাবগুলিকে মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে, এই মহাত্মাদের ত্যাগদীপ্তিসমুজ্জ্বল জীবন, অলৌকিক সাধনা এবং জ্ঞানগর্ভ উপদেশ জনসাধারণের মনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্তমানেও পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য নরনারীর মনের উপর এই মহাপুরুষদের প্রভাব সামান্য নহে। সভ্য দেশমাত্রেরই অধিকাংশ নরনারী এই ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কোন-না-কোন একজনের প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণকারী বলিয়া গর্বের সহিত পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, ইহা সত্ত্বেও পৃথিবীর সকল দেশেই মানব-সমাজে অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসাম্য চলিয়াছে এবং এইগুলি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইদানীং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ধর্মভূমি ভারতবর্ষেও ধর্ম সত্য ন্যায় নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অভিযান পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলে অধিকাংশ নরনারীর পক্ষেই সদ্ভাবে দৈনন্দিন জীবন পরিচালন

করা ক্রমেই অধিকতর সমস্যাসংকুল হইয়া পড়িতেছে।

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণ বলেন, সভ্য দেশসমূহে বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্রমেই অধিকতর ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী বর্জিত হইতেছে বলিয়াই এই বিশ্বপাবন ভাবগুলির প্রতি অধিকাংশ নরনারীর আন্তরিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাহারা দৈনন্দিন জীবনে ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হইতেছে এবং এই জন্য নানাবিধ সমস্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধুনা সভ্য দেশমাত্রেই প্রচলিত রাজনীতি একটি অপরিহার্য নোংরা বিষয়ে পরিণত হইয়াছে! বর্তমানে সকল দেশেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে চলিয়াছে—উৎকট দলাদলি, দলগত সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত প্রভুত্ব ও স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গণতন্ত্রের আবরণে স্বেচ্ছাতন্ত্র, স্বদেশপ্রেমের ভানে দুর্বলের সর্বস্বহরণ, জাতীয় উন্নতিবিধানের অছিলায় অপর জাতির সর্বনাশসাধন, বিশ্বশান্তির অজুহাতে মারণাস্ত্র নির্মাণ ও বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা! অর্থনীতি-ক্ষেত্রে চলিয়াছে—আবশ্যকীয় খাদ্য ও শিল্প দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় অসাম্য, শ্রেণী ও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং ইহার পরিণতিরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে চলিয়াছে—কন্ট্রোল পারমিট ভেজাল ব্ল্যাকমার্কেটিং ও স্মাগলিং! সমাজক্ষেত্রে চলিয়াছে—মানুষে মানুষে ভেদ বিরোধ ও অনৈক্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের অপমান ও অসম্মান! চতুর্দিকে এইরূপ অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসাম্য ভেদ ও বিরোধের আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষে এইগুলির প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হইলেও সাধারণ নরনারীর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। দেখা যায়—ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতি শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে, ব্যাপক অশান্তি বিপ্লব এবং দুঃখ ও অভাবের মধ্যে জনসাধারণে এই গুণগুলির বিকাশ সম্ভব হয় না। অধিকাংশ নরনারীই আত্মরক্ষার অংকুশতাড়নায় বাধ্য হইয়া এই সকলের বিরুদ্ধাচরণ করে। ইহাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বর্তমানে সভ্য দেশসমূহের প্রচলিত রাজনীতিক অর্থনীতিক ও সামাজিক শোচনীয় পরিস্থিতি এবং তজ্জনিত ব্যাপক অশান্তি বিশৃঙ্খলা অভাব-অনটন এবং দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জনসাধারণের পক্ষে ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতির মর্যাদা রক্ষা করা কার্যতঃ সম্ভব হইতেছে না। দেশশুদ্ধ নরনারীকে এই মহান গুণগুলি পালনের প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়া কেবল এইগুলির মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না। মানব-সভ্যতার প্রভাত হইতে এইগুলির মাহাত্ম্য উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করা হইতেছে, কিন্তু তথাপি আজ পর্যন্তও ইহাতে আশানুরূপ ফল হয় নাই। কাজেই জনসাধারণের পক্ষে এই মহান ভাবগুলি অতি সহজে প্রতিপালনের অনুকূল আবেষ্টনী সৃষ্টি করাই এই জটিল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞগণের মতে দেশের ভূমিজ ও শিল্পজ প্রমুখ সকল সম্পদ জনসাধারণের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গঠিত ও পরিচালিত একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সত্ত্বাধিকারে সকল বিষয়ে সকল নরনারীর সমানাধিকার-ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাহাদেরই সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনার্থ পরিচালন করাই এই আবেষ্টনীসৃষ্টির একমাত্র উপায়। তাঁহারা বহু অকাট্য প্রমাণমূলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দেশের জনগণের জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য ও শিল্পদ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার

অসমতার জন্যই প্রচলিত রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অসাম্যমূলক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কুফল-স্বরূপে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান লোক সকল বিষয়ে সুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং অধিকাংশ নরনারীকে সকল বিষয়ে—বিশেষ করিয়া অন্নবস্ত্র-সমস্যায় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের (Democratic Socialism) মূলতত্ত্ব। বর্তমানে সকল দেশেরই বিশ্বমানবহিতৈষী মনীষিগণ একবাক্যে এই নীতির উপযোগিতা স্বীকার করেন। তবে ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই মতভেদ-মূলে অধুনা অধিকাংশ সভ্য দেশেই অনেক রাজনীতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি এবং সত্য ন্যায় নীতি ও সাম্যমৈত্রী বিরোধী নহে, পরন্তু ইহাদের সমর্থক ও পরিপোষক। অবশ্য প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ ধর্মের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করে না, জাগতিক উন্নতি সাধনই ইহার লক্ষ্য; কিন্তু এই মতবাদ সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রীর আবশ্যকতা অস্বীকার করে না। সকল দেশে ও সকল কালে এইগুলিই সার্বজনীন ধর্ম নামে অভিহিত এবং এই ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এই বিশেষত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিকে ভারতের উপযোগী করিয়া অতি সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা কার্যে পরিণত করাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি এবং চূড়ান্ত সাম্যমৈত্রী ভিত্তির উপর গঠিত ও পরিচালিত করিবার একমাত্র উপায় এবং দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে এই মহান ভাবগুলি কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী আবেষ্টনী সৃষ্টিরও ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সকল দেশের বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষমাত্রই ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি দেবভাবকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া জীবন পরিচালন করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীর কোনও ধর্মাচার্যই কেবল ধর্মসাধন-ক্ষেত্রে এই দৈবীসম্পদসমূহকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলেন নাই, পরন্তু তাঁহারা সকল নরনারীর জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রে এইগুলিকে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ নরনারীই পশুভাবের প্রাবল্যে এবং ইন্দ্রিয়ের তাড়না ও স্বার্থের প্রেরণায় এই দেবভাবসমূহকে তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইতে পারে নাই, অথবা কর্মজীবনে পরিণত করিবার চেষ্টাও করে না। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল আবেষ্টনীর চাপে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দেবভাবগুলিকে কাজে লাগান সম্ভবও নহে। দেখা যায়—পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীই তাহাদের ভোগ-সুখ-পথের প্রতিবন্ধকসমূহকে যে কোনও উপায়ে দূর করিতে বদ্ধপরিকর। তাহারা ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী সমদর্শন প্রভৃতি প্রতিপালনের আবশ্যকতা অনুভব করে না, পরন্তু অনেকে এইগুলিকে ভোগ-সুখের প্রতিবন্ধক বলিয়াই মনে করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বলে—ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি ধার্মিকগণের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, সাধারণ সংসারী মানুষের জীবনের ব্যবহারক্ষেত্রে এইগুলি পালন করা তাহাদের স্বার্থবিরোধী। এই কারণে তাহারা এই দেবভাব-সমূহের বিপরীত আসুরিক ভাবগুলিকেই সাধারণ সংসারী নরনারীর 'ব্যবহারিক ধর্ম' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে! এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অক্লান্ত প্রচারফলেই স্মরণাতীত

কাল হইতে অধর্ম অসত্য অন্যায় দুর্নীতি অসাম্য ভেদ বিরোধ প্রভৃতি 'ব্যবহারিক ধর্ম' নামে মানব-সমাজে চলিতেছে! ইহারই অবশ্যম্ভাবী কুফলরূপে ধর্মাচার্যগণের উপদেশমূলে প্রচলিত রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত না হইয়া এইগুলির বিপরীত—'ব্যবহারিক ধর্ম' ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে!

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এজন্য ধর্মকেই দায়ী বলিয়া প্রচার করে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "ইহাতে ধর্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন—জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আমার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব।" অপর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "যখন লোককে বলা যায়—তোমাদের শাস্ত্রে আছে—সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া এবং কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এইভাব কার্য্যে পরিণত করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া উত্তর দেয়—পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত হিংসা-বিদ্বেষ রহিয়াছে।"

এই মহা অনর্থকর ভেদদৃষ্টি দূর করিয়া মানব-জীবনের সকল বিভাগ—এমন কি মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা-প্রণালীও বেদান্তের চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে পরিচালনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের অপরিসীম আগ্রহ ছিল। তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা, যে যে-কার্য্যই করুক না কেন, যে যে-অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সর্ব্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।"

বিশ্বপ্রেমিক স্বামীজীর প্রচারিত এই বৈদান্তিক সাম্য-মৈত্রী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিতে স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই নীতি ধর্ম সত্য ন্যায় প্রভৃতি বিরুদ্ধ নহে, বরং এইগুলির সমর্থক ও পরিপোষক। এই জন্য আমাদের মতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ স্বামীজী-প্রচারিত বৈদান্তিক সাম্য-মৈত্রীকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিক আর্থিক সামাজিক এবং সকল নরনারীর দৈনন্দিন জীবনে কর্মে পরিণত করিবার কার্যকর উপায়। ইহা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী ভাবপূর্ণ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিবারও সহজ পন্থা। এই বিশ্বজনীন ভাব সাম্প্রদায়িকতার লেশবর্জিত। নরমাত্রকেই নারায়ণ—জীবমাত্রকে শিবজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন ইহার বিশেষত্ব।

বেদান্তের একনিষ্ঠ প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, "আমি সমাজতন্ত্রবাদী"। তিনি যে সমাজতন্ত্রবাদের মুখ্যনীতি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেন ইহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে সুস্পষ্ট। সকল বিষয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান অধিকার—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে সকলের সমান সুযোগ তিনি মুক্তকণ্ঠে সমর্থন করিয়াছেন। স্বামীজী কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি শ্রেণী বা সম্প্রদায়বিশেষের 'একচেটিয়া ভোগাধিকারে'র অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। দেশের আপামর জনসাধারণের—বিশেষ করিয়া দরিদ্র কৃষক শ্রমজীবী অবনত অনুন্নত জনগণের সর্বাঙ্গীণ

উন্নতি ও অভ্যুদয় তাঁহার একান্ত কাম্য ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "সমষ্টির উন্নতিতেই ব্যষ্টির উন্নতি, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ। সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।" সমাজতন্ত্রবাদীদের ন্যায় রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী ভিত্তির উপর গঠন ও পরিচালন করা তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। যাহারা ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি প্রভৃতির মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াও এইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাইবার পক্ষপাতী নহে, তাহাদিগকে তিনি 'ভণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন, "ধর্ম যদি মানুষের সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। উহা কতকগুলি ব্যক্তির মতবাদ মাত্র।"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী ধর্ম সত্য ন্যায় নীতি সাম্য মৈত্রী প্রভৃতিকে কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মানব-জীবনের সকল বিভাগ এই ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইহাদিগকে প্রয়োগ করিতে বিশেষ জোরের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা এখন পর্যন্তও নির্বস্তুক কাল্পনিক আদর্শ-মাত্রেই পর্যবসিত আছে। এই মহান কাল্পনিক আদর্শকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে রূপায়িত বা বস্তুতান্ত্রিক করিতে হইলে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের সাম্য-মৈত্রী-মূলক কার্যকর পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় প্রদর্শন 'উদ্বোধনের' অন্যতম জীবনব্রত। এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনে এই মাসিক পত্র নববর্ষে পদার্পণ করিয়া তাহার লেখক গ্রাহক ও পাঠকদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে।

উদ্বোধন

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

খেলনার রূপে
চুপে চুপে—
মর্মের কামনারাজি
নানা রঙে সাজি'
বসে আছে'
সম্মুখে উদ্ভাসি'।

নিশ্চেতন
শিশুমন
মম—
অনুপম
খেলা পেয়ে
নেচে গেয়ে
শান্ত হয় যেন,—
মুগ্ধ হেন
ঢলো-ঢলো ভাবে
'পাবে পাবে
পাওয়া যাবে'

বলি'
ওঠে সমুজ্জলি'
দীপ্ত কামে ;
সন্ধ্যার আঁধার নামে
যবে—
ফাল্গুনের ফুলোৎসবে
গাহে নিতি :
'হে প্রকৃতি
নাও প্রীতি
প্রাণময় প্রীতি !'

তারপর
উদ্বেল-অন্তর
কেটে গেলে বহুদিন—
কে যেন নবীন
জীবনের মর্ম চিরি'
ধীরি ধীরি
দানে দরশন।

শিশুমন
ঘুমালে, আমার
ভালো আর
লাগে নাক খেলা,
সারা বেলা
বারংবার
যেন-বা ইঙ্গিত কার
জানায় আহ্বান
গাহি' গান।
খেলানারে ফেলি' তাই
'যাই-যাই'-সুরে
চলি দূরে।
যাই যাই
কোথা যাই ?
কোথা পাই ?
কোথা তুমি ?
মন মরুভূমি
মন নাই !

অমা-রাতে
ঝুমঝুমি থাকে হাতে,
থাকে হাতে
মাটির পুতুল।
মনে হয়, ওর তুল
কিছু নাই
যেন কিছু নাই,—
বুঝি তাই
আর্ত কামে—
কাচেরে হীরার দামে
দেই সমাদর
নিরন্তর ;
আঙুলি' আঙুলি' রেখে'
বুকে ঢেকে'
সুখে যন্ত্রণায়—
দেই হায়
সহস্র চুম্বন
নিশ্চেতন।

তারপর
প্রভাত-সুন্দর
এলে
সূর্যদীপ জেলে'
চিন্তাকাশে—
জ্যোতির আশ্বাসে
বিশ্ব ভরি ;
প্রশ্ন করি :
কেমনে-বা ছিলে
শিশুর নিখিলে
সুখে ঘুমি' ?

আজ তুমি
জীবন সুন্দর,
মুহূর্ত সহ না স্বর
ছোট কোন নূতনের রূপে
চুপে চুপে ?
মুখখানি হাসি-হাসি
উদিছে উদ্ভাসি'
সূর্য সম।
অনুপম
এই তুমি
হাতে ঝুমঝুমি
ছিলে ভুলে'
মাটির পুতুলে,
হায়—
মোমের পুতুলে ?

শোনানে নেতাজী *

স্বামী ভাস্বরানন্দ

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪১ সনের ৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৪ টার সময় জাপানীরা সিঙ্গাপুরে প্রথম বোমা ফেলে। সেই একই সময়ে উহারা আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপের অন্তর্গত পার্ল্ হারবার (Pearl Harbour) ও ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা আক্রমণ করিয়া উড়োজাহাজ-সংরক্ষিত নৌ-বাহিনী সহায়ে মালয় উপদ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত কোঠাবারু নামক স্থান অধিকার করে। আড়াই মাসের মধ্যেই সমস্ত মালয় দেশ জাপানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর জাপানীদের করতলগত হয়। জাপানীরা সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়াই তাহার নাম দেয় শোনান্। জাপানী ভাষায় ইহার অর্থ, "দক্ষিণ সাগরের আলো"। জাপানীরা ইংরাজ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শোনানেই কারারুদ্ধ করে। জাপানীদের শাসন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম—মালয় দেশে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) স্থাপিত হইতেছে; ইহার প্রধান উদ্যোগী ও অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু মহাশয়। তিনি রাজনৈতিক অপরাধে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া বহুকাল যাবৎ জাপানে বসবাস করিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেই সময় একটি বড় হোটেলে দোতলার একটি ঘরে বাস করিতেন। তখন হোটেলটি জাপানী সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীতে পূর্ণ ছিল। প্রথম সাক্ষাতে রাসবিহারী বাবুকে কুশলপ্রশ্নাদি করিবার পর তিনি বলিলেন, "এখন ধর্ম্ম-টর্ম্ম সব রেখে দিন্। সবাই কাজে লেগে যান। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ঐ সব নিয়ে ভাবা যাবে।" আমি তদুত্তরে বলিলাম, "হাঁ, আমরা ত সেবাকার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আমাদের দ্বারা যা সম্ভব হবে সাধ্যমত তা আমরা করিব বৈকি!" আরও অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে আমাদের মিশনবাটী দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া সেই দিনের জন্য বিদায় লইলাম।

পরে বুদ্ধোৎসবের দিন রাসবিহারী বাবু তাঁহার জাপানী বন্ধুবর্গ সহ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। উৎসবে যোগদান করিয়া বিদায় লইবার পূর্ব্বে আশ্রমের অনাথ বালক-বালিকাদের সাহায্যার্থ তিনি কিছু অর্থও দান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার নিকট হইতে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইলাম। তিনি যে এই প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা তাহা তাঁহার কথায় জানিতে আর বাকী রহিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই মালয়ের বিভিন্ন শহরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র স্থাপিত হইল। রাসবিহারী বাবু ইহার কার্য্য পরিচালনের জন্য একটি কার্য্যকরী পরিষদ (Council of

* ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। এই প্রবন্ধে ইহার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

Action) গঠন করিলেন। ইহাতে মালয়-প্রবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও যোগদান করেন। এই বন্ধুদের লইয়া কিছুদিন কাজ চলিবার পর মতের অনৈক্য বশতঃ উক্ত পরিষদের কাজ নিম্নোক্ত কারণে বন্ধ হইল। কয়েকজন সভ্য প্রশ্ন তুলিলেন, "প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমরা সঠিক জানিতে চাই যে, জাপানীরা তাহাদের সর্ত্ত সত্যসত্যই পালন করিবে কিনা এবং সেই সর্ত্তগুলি আইন অনুযায়ী জাপানের সম্রাট দ্বারা অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইবে কিনা?" এই রকম জাপানী 'Imperial Rescript' না পাইলে Council-এর কোন কার্য্য চলিতে পারে না। রাসবিহারী বাবু এই প্রস্তাব জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিলেন। উত্তরে তিনি অবগত হইলেন যে, যেহেতু ভারত কোন স্বাধীন রাজ্য নয় সেই হেতু ঐরূপ কোন দলিল দেওয়া জাপানীদের শাসনতন্ত্র-বিরুদ্ধ। ইহার ফলে ঐ কার্য্যকরী সভা অচিরেই ভাঙ্গিয়া গেল। রাসবিহারী বাবু একে বৃদ্ধ, তদুপরি বিপুল কার্য্যভারাক্রান্ত। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় ব্যাঙ্ককে (Bangkok) ভারতীয় নেতাদের লইয়া এক বিরাট জনসভা আহূত হইল। ঐ সভায় অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে মালয়ে আনিবার জন্য একটি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রস্তাব রাসবিহারী বাবুকে জানান হইল। ঐ প্রস্তাবের অভিপ্রায় ছিল এই যে, রাসবিহারী বাবু জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সফল হইবার আশা করা যাইতে পারে। নচেৎ ঐ কার্য্যে বিরত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। জানিনা কোন অজ্ঞেয় উপায়ে রাসবিহারী বাবু উহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। কয়েক মাস পরে শুনিতে পাইলাম—সুভাষ বাবু টোকিয়োতে আসিয়াছেন এবং তথা হইতে শীঘ্রই রেডিওতে ভাষণ দিবেন। তিনি রেডিওতে তিন দিন তিনটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম মোটামুটি এই:—"ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক অমূল্য সুযোগ মিলিয়াছে। এই সুযোগ হারাইলে বহু বৎসর আর এইরূপ সুযোগ মিলিবার সম্ভাবনা নাই। এক অভাবনীয় উপায়ে আমার এদেশে আসা সম্ভবপর হইয়াছে। বৃটিশরাজ যেমন আমার ভারতের বহির্গমন বন্ধ করিতে পারে নাই, তেমনি আমার ভারতের অন্তর্গমনও বন্ধ করিতে পারিবে না। আপনারা জানেন আমি একজন বিপ্লবী (Revolutionary)। আপনারা জানেন যে আমেরিকার সাহায্য লইয়া ডি ভেলেরা আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। আমাদেরও ঐরূপ একটা বড় স্বাধীন রাজ্যের সহায়তা মিলিয়াছে। জাপান আধুনিক জগতে এক পরাক্রমশালী জাতি। আমরাও তাহাদের সাহায্য লইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইব। আমি আশা করি, ইহাতে আপনারা আমার সহায়ক হইবেন। আমি শীঘ্রই শোনানে যাইতেছি।"

সাত দিনের মধ্যেই তিনি বিমানযোগে শোনানে আসিলেন। শহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ক্যাথে' নামক সিনেমা হলে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন হইল। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন জার্ম্মানী-প্রবাসী ভারতীয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাসবিহারী বাবু সুভাষ বাবুকে লইয়া বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। বিপুল জনতার সম্মুখে রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "Here is your beloved leader Subhas Babu. I hand him over to you. From today onward he will be your Supreme Commander. I am too old now, let me retire.

He will lead you on to the path of freedom of India—our Motherland. I hope you will follow him implicitly as your destined leader." এর পর সুভাষ বাবু তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

সুভাষ বাবুর মালয়ে আগমনের বার্ত্তা বিদ্যুৎ-বেগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা সুভাষ বাবুকে পূর্ব্বে ভারতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। আর যাঁহারা টোকিয়ো-রেডিওতে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তিনি জাপানী-তৈয়ারী সুভাষ বাবু, তাঁহারাও ক্রমশঃ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বিশ্বস্ত সূত্রে সব জানিয়া আর তাঁহার সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারিলেন না।

শোনানে সমুদ্রতীরে একটি প্রাসাদোপম বাড়ীতে (Meyer's Mansion) তিনি তাঁহার বাসস্থান ঠিক করিলেন। ঐ বাড়ী সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত থাকিত। সুভাষ বাবুর লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঐ বাড়ীতে প্রবেশাধিকার সর্ব্ব-সাধারণের ছিল না। সুভাষ বাবুর প্রাণের জন্য দায়ী জাপানীরা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার যাতায়াতের সময় সুবৃহৎ মটরগাড়ী এবং তৎসঙ্গে সশস্ত্র গার্ড থাকিত। একখানা য়্যারোপ্লেন তাঁহার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তিনি যখনই চাহিতেন ঐখানা জাপানী পাইলট সহ তৎক্ষণাৎ পাইতেন।

যে দিন হইতে রাসবিহারী বাবু সুভাষ বাবুর উপর কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, সেইদিন হইতে তিনি অতি একাগ্রতার সহিত কাজ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিকট শুনিয়াছি তিনি রাত্রিতে কখনও ৩ ঘণ্টার বেশী নিদ্রা যাইতেন না। সারাদিন কর্ম্মব্যস্ততায় কাটিয়া যাইত। কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই তিনি সর্ব্ব-সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক বিরাট সভা আহ্বান করিলেন। শোনানের মিউনিসিপাল অফিসের সম্মুখে সুবৃহৎ ময়দানে এক জনসমুদ্রের মধ্যে তিনি তাঁহার মালয়ে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে। আশ্চর্য্য এই যে ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া জনতাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। জনতার কেহই বারিপাতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিল। দেখা গেল বক্তৃতার শেষে সকলেই আর্দ্র বস্ত্রে অথচ শান্তচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। কথাপ্রসঙ্গে কখন কখন সুভাষ বাবু এই সভার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "দেখলেন সে দিন সভাতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও সবাই কেমন অবিচলিতচিত্তে বক্তৃতা শুনছিল। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমাদের কাজের জন্য সাধারণের সহানুভূতি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। এতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই।"

১৯৪৩ সনের বিজয়া দশমী রাত্রিতে সুভাষ বাবু তাঁহার বাসভবন হইতে সিঙ্গাপুর Indian Independence League-এর মারফত গাড়ী পাঠাইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে অনতিবিলম্বে দেখা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাত্রি ৯টা হইবে। আমি ঐ গাড়ীতেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গাড়ী বাড়ীর দরজায় পৌছিতেই সশস্ত্র প্রহরীরা অতি সন্ত্রস্ত ভাবে আমাকে সুভাষ বাবুর সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সেক্রেটারী মিষ্টার হাসান্ আমাকে উপরে সুভাষ বাবুর নিকট লইয়া গেলেন। পৌছিবা মাত্রই তিনি অতি বিনীত ও শ্রদ্ধাবনত হইয়া

প্রণাম করিয়া আমাকে বসিতে বলিলেন এবং সহকারীদের চা আনিতে আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে কথা চলিতে লাগিল। তিনি আমাদের সিঙ্গাপুর আশ্রমের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হওয়ায় আমি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বলিলাম। তৎপরে চা পান শেষ হইলে আবার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কলিকাতা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বাবস্থা সম্বন্ধে বলিলেন, "জেল হতে বেরিয়ে আমি যখন আমদের Elgin Road-এর বাড়ীতে বাস করছি তখন কি যেন একটা দৈবশক্তি-প্রণোদিত হয়ে ঐ বাড়ী হতে বেরোবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার জন্মেছিল। সব সময়েই মনে হত এবার বেরিয়ে পড়ে কিছু করা যাক্। যা কিছু কর্‌বার এই সময়েই কর্ত্তে হবে। কি হবে এভাবে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থেকে? বন্ধুদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা গেল। শীঘ্রই একটা উপায় বের করে ফেললাম। আমার ঘরে সকলের প্রবেশ নিষেধ করে দিলুম। চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি পাঠ করি দেখে ও আমার নিষেধ শুনে কেউ আর কাছে আস্‌ত না। এই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম আমার বন্ধুরা সকলেই carried out their duties. সেই জন্যই আমার এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।" কলিকাতা হইতে কিরূপে জার্ম্মাণীতে গেলেন ও তথা হইতে কিরূপেই বা জাপানে আসিলেন তৎসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন স্পষ্ট জবাব না দিয়া বলিলেন, "ও সম্বন্ধে বরং এখন কিছু না বলাই ভাল।" আমরা কিন্তু কিছুদিন পরে লোকমুখে শুনিতে পাইলাম যে তিনি কলিকাতা হইতে মটরে চড়িয়া কিছুদুর যাইয়া ট্রেণে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পার হইয়া আফগানিস্থানে যান। তথা হইতে ইটালী হইয়া জার্ম্মানীতে পৌছান। রুশিয়াতে যাইবার সংকল্প করিলেও তখন তাহা আর হইয়া উঠে নাই।

রাসবিহারী বাবুর প্রস্তাবে জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সংবাদ-বিনিময় করিলেন। জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষ বাবুকে জানাইলেন যে জাপান সরকার সুভাষ বাবুকে জাপানে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আরও বলিলেন, "You are at liberty to go to Japan at your own risk. The road is full of dangers. We cannot stand guarantee for your life. We shall advise you not to go." জাপান যাইবার পূর্ণ স্বাধীনতাই আপনার আছে কিন্তু আপনার জীবন বিপদাপন্ন হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। সমস্ত রাস্তাই অতিশয় বিপজ্জনক। আপনার জীবনের জন্য আমরা দায়ী থাকিব না। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি আপনার না যাওয়াই ভাল। সুভাষ বাবু উত্তরে জানাইলেন, "I am ready to risk my life if it is sacrificed at the altar of the freedom of my Motherland. I must go." আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি নিশ্চয়ই যাইব। জার্ম্মান সরকার তদনুযায়ী ডুবুরীজাহাজে (Submarine) তাঁহাকে ভূমধ্যসাগর অবধি পৌঁছাইয়া দেয় এবং পিনাং হইতে জাপানী ডুবুরী জাহাজ ভূমধ্যসাগরে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া শোনানে আসে। তিনি বিমান যোগে শোনান হইতে টোকিয়োতে যান। এ খবর শোনানবাসী কেহই পূর্ব্বে জানিত না।

অতঃপর একদিন তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "জগতের ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতিই অন্য কোন প্রতাপশালী স্বাধীন জাতির সাহায্য না নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারেও নাই। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে আমরাও চাই ঐরূপ একটা সাহায্য। জাপান জগতের মধ্যে একটা

গণ্যমান্য জাতি হয়ে উঠেছে। তার প্রতাপ আমরা স্বচক্ষে দেখছি। ঘটনাপরম্পরায় জাপানের সাহায্যও আমাদের পক্ষে পাওয়া সুগম হ'য়ে উঠেছে। এই সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে আর আগামী একশ বছরেও এই সুযোগ মিল্‌বে কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমি ঠিক করেছি জাপানের সাহায্য নিয়ে যথাশক্তি সংগ্রাম চালিয়ে ভারতকে ইংরেজাধিকার হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করব। গীতায়ও ত বলেছে আমাদের কাজে অধিকার, ফলে নয়। কাজ ত করে যাই, ফল তাঁর হাতে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি মনে করেন জাপানীরা প্রতিশ্রুতি-মত কাজ করিবে? যদি তাহা না করে কিংবা জাপানীরা আপনার সাহায্যে ভারতাধিকার করিবে এইরূপ কোন দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হয়ে আপনাকে বঞ্চনা করে তা হ'লে কি কর্‌বেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝেছি এইরূপ কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদেরই চালাতে হবে। এদেশের ভারতীয়দের অর্থে পরিচালিত সৈন্যদের দিয়েই সমস্ত কাজ চলবে। কেবলমাত্র হাতিয়ার জাপানীদের থেকে নিতে হবে। আমাদের ফৌজ অনেক পরিমাণে জাপানী ফৌজের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। আমার মনে হয় জাপানীরা অতটা বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না। কোন প্রকারে বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ কর্ত্তে পারলেই আমাদের কোন চিন্তা থাকবে না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে বাঙ্গলায় পৌছুবা মাত্রই আশাতীত সাহায্য আমরা সকলের কাছ থেকেই পাবো। আমার খুবই ভরসা আছে যে আমার দেশবাসীই আমার এই কাজে সহায়ক হবেন। জাপানীদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রতিক্রিয়ার জন্যও আমাদের তৈরী থাকতে হবে।" এইরূপ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি বলিলাম, "আমাদের মিশনের কার্য্যের ধারা আপনার ত কিছুই অজ্ঞাত নাই। আমরাও মিশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া যতটা পারি আপনার কাজের সহায়তা করিব, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।" অনুরুদ্ধ হইয়া নৈশ আহার সমাপনান্তে আশ্রমে ফিরিতে প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি কখনও ভোজন না করাইয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার আদর-আপ্যায়নে সত্য সত্যই কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পৃথিবীর খনিজ সম্পদ

ট্রেভর আই উইলিয়াম্‌স্‌

ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্রিষ্টলে বৃটিশ পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক বৈজ্ঞানিক সভায় স্যার উইলিয়াম্‌ ক্রুক্‌স্‌ এই মর্মে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়াতে না পারলে পৃথিবীতে গুরুতর খাদ্যসংকট দেখা দেবে। প্রতীকারের উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। সেই উপায় হল—বায়ুমণ্ডলের অপর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন থেকে সার উৎপাদন।

সৌভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিকরা স্যার উইলিয়ামের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল এবং বর্তমানে পৃথিবীর নানা দেশে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন থেকে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন সার উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

এই বৎসরে ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত বৃটিশ পরিষদের বৈজ্ঞানিক সভায় বিশ্বের এক নূতন গুরুতর বিপদাশংকার কথা আলোচিত হয়। নূতন বিপদ হল এই যে, বর্তমান সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি মৌলিক পদার্থ যে হারে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সেই পদার্থগুলি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কয়লাযুগ থেকে তড়িৎযুগে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাম্রের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তড়িৎবাহক তার প্রস্তুত হয় তাম্র থেকে। পৃথিবীতে উৎপন্ন তাম্রের মোট পরিমাণের শতকরা পঁচিশ ভাগ ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক তার প্রস্তুতির জন্য এবং তড়িৎ শিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যের জন্য শতকরা আরও পঁচিশ ভাগ ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে একটি বৃহৎ বোমারু-বিমানে দু'মাইলেরও অধিক দীর্ঘ তাম্র তার থাকে।

এই হারে ব্যবহৃত হতে থাকলে পৃথিবীর খনিগর্ভে সঞ্চিত তাম্রের পরিমাণ আগামী পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। দস্তা ও সীসা প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ধাতু সম্বন্ধেও এই আশংকা হয়। এলুমিনিয়মের অভাব ত এরি মধ্যে গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে! এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

ব্রাইটনের বৈজ্ঞানিক সভায় প্রফেসর জে ডি বার্ণাল কতকগুলি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ করেন যেগুলির আশু সমাধান প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে আমাদের যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে তার সাহায্যেই এবং অধিকতর গবেষণা না করেই কতকগুলি সমস্যা সমাধানের পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়।

প্রফেসর বার্ণাল বলেন যে, যে সমস্ত জিনিষপত্র নির্মাণের পক্ষে এলুমিনিয়মই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, কেবলমাত্র সেইগুলির জন্যই এই ধাতু ব্যবহার করা উচিত। এলুমিনিয়মের গৃহাদি নির্মাণ করা উচিত নয়, কারণ গৃহ নির্মাণের জন্য অন্য অধিকতর উপযোগী উপকরণ সহজলভ্য। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্মাণের জন্য যদি এলুমিনিয়মের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে কয়েকশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এলুমিনিয়মের অভাব দেখা দেবে না।

বক্সাইট নামক খনিজ পদার্থ থেকে সহজে, স্বল্পব্যয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে এলুমিনিয়ম পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়াও কর্দমের মধ্যে সিলিকনের সঙ্গে মিশ্রিত এলুমিনিয়ম থাকে। সেই এলুমিনিয়ম যদিও পরিমাণে অল্প এবং উদ্ধার করা ব্যয়সাধ্য তবুও বক্সাইটের অভাব হলে কর্দম থেকে এলুমিনিয়ম সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হবে না।

অব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত ধাতব দ্রব্য ও ধাতুর টুকরা সংগ্রহের ব্যাপারে আরো অধিক যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলেও নষ্ট হয় না এবং মূল্যের জন্য এগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা হয়। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতনির্মিত দ্রব্যাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকলেই মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে যায়। লৌহ ও ইস্পাত ছাড়াও আরো কয়েকটি ধাতু অবহেলার ফলে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনর্ব্বার উৎপাদনের জন্য সেগুলিকে আর কাজে লাগান হয়ে ওঠে না।

প্রফেসর বার্ণাল বলেন যে, ধাতুনির্মিত দ্রব্যগুলি অব্যবহার্য ও পরিত্যক্ত হলেই সেগুলিকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলি থেকেই পুনর্বার নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। স্বাভাবিক উপায়ে অপচয় অবশ্য কিছু হবেই এবং সেই অভাব পূরণ করবার জন্যই প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে লেড-টেট্রা-ইথীল যুক্ত পেট্রোল পুড়িয়ে গাড়ী চালালে প্রচুর পরিমাণ সীসা চিরতরে নষ্ট হয়।

বৃটেনে কি ভাবে গন্ধকের অপচয় নিবারণ করা হচ্ছে ডাঃ লিন্‌ষ্টেড ও ডাঃ লেসীং সেই প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। সালফিউরিক য়্যাসিড বর্ত্তমান জগতের একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বস্তু। এই য়্যাসিড প্রস্তুত করার জন্য বিপুল পরিমাণ গন্ধকের আবশ্যক হয়। বর্তমানে বৃটেনে যে পরিমাণ গন্ধক ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বটে, কিন্তু বৃটেনে কয়লার পরিত্যক্ত অংশ থেকে গন্ধক উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ান হচ্ছে। বৃটেনে প্রতিবৎসরে ২০০০০০০০০ টন কয়লা পোড়ে এবং ফলে যৌগিক পদার্থ রূপে ৩০০০০০০ টন গন্ধক উৎপন্ন হয়। পূর্বে এই সমস্ত পরিমাণ গন্ধকই বাতাসে মিশে গিয়ে নষ্ট হত। এখন ফুলহাম, ম্যানচেষ্টার, এবং অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন কারখানায় নূতন নূতন প্রণালীর দ্বারা বৎসরে প্রায় ১০০০০০ টন গন্ধক উদ্ধার করা হচ্ছে।

খাদ্য উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক ফসফরাসের অভাবও গুরুতর ভাবে দেখা দিয়েছে। ডাঃ সাউথগেট বলেন যে, বৃটেনের ড্রেনগুলি থেকে বৎসরে প্রায় ১৫০০০ টন ফসফেট সংগ্রহ করা সম্ভব। বৃটেনের বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে এই সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করা হচ্ছে এবং সাফল্যের পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গেছে।

বর্তমান যুগের মানুষের সম্মুখে এত প্রকার জটিল ও জরুরী সমস্যা রয়েছে যে, ভবিষ্যতের অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধেও তার চিন্তা করার অবসর নেই। তথাপি বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য সময় থাকতে কাজ সুরু করা। বৃটেন বহুবিধ সমস্যা নিয়ে বর্তমানে বিশেষ বিব্রত থাকা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতের সমস্যা সম্বন্ধেও উদাসীন নয়। সেই অনাগত বিশ্বসমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কারের জন্য বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ এখন থেকেই অক্লান্ত চেষ্টা ও গবেষণায় রত হয়েছেন। *

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

'এখনো সময় তবু আছে'

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

শতাব্দীর সঞ্চিত বেদনা পুঞ্জীভূত বুকের ক্রন্দন
আজো যা'রা সম্মুখেতে চলিয়াছে বহি, বুভুক্ষু ক্রন্দসী ··
ভুখার শ্মশান-বুকে আজো যা'রা ল'য়ে জর্জর জীবন
মরণের মহা অর্ঘ্যতরে নিরন্তর চলেছে নিঃশ্বসি',—
মৃত্যুর বাহন তা'রা ঃ ওরে সখি, আজিকে তা'দের তরে
এই হ'বে কর্ত্তব্য চরম প্রাণ মোর নিঃশেষে নীরবে—
তা'দের সে জীবনের সাথে মিশাইয়া অক্ষরে-অক্ষরে
প্রেমকম্প্র প্রসারিয়া বাহু আলিঙ্গিব অখণ্ড গৌরবে।
তোমার আসঙ্গ-লিপ্সা, সে তো, মানি এক উগ্র উন্মাদনা
সমারোহে অন্তরের তলে রচে মত্ত স্বপন-শিহর,
কামায়ন-রসায়নে ডুবে অবিরাম বিলোল বাঞ্ছনা,
পুষ্পধন্বা ছন্দে নেচে চলে তপোভঙ্গ তনুর ভিতর।
আজি এই বিষদিগ্ধ বুভুক্ষার বীভৎস উৎসবে
ধরিওনা সুমুখেতে সখি, প্রস্ফুটিত গোলাপ কপোল
গুণ্ঠনের নিবিড়তা হ'তে; যাত্রাপথে বাধা মোর হ'বে
তোমার ও চুম্বনের চিত্ত-উদ্বেলিত আগুন-কল্লোল।

সারাটি জীবন ভরি' প্রতি পলে-পলে করিয়াছি ভুল ঃ
দেহের দেউল হ'তে দেবতারে কবে দিয়াছি বিদায়;
মাঙ্গল্যের চিহ্নমাত্র নাই, অবাধে খেলিছে শিবাকুল,
আপনারে বুঝিবারে চেয়ে অবশেষে ফেলেছি ধূলায়।
পৃথিবীর অবজ্ঞাত যা'রা ব্যথাতুর লাঞ্ছিত জীবন,
বুভুক্ষা বরণ করি' তা'রা হ'লে লক্ষ্মীহারা, বক্ষ ফুঁড়ে
উষ্ণতর ফেলিলে নিঃশ্বাস, হ'লে তা'রা ধ্বংসের বাহন···
তোমার-আমার ধ্বংস সখি, রহিবে না দূরে বেশী দূরে।
এখনো সময় তবু আছে—এস সখি, মুছে দেই তার
বিক্ষুব্ধ বক্ষের মূলে জমা আছে যত ব্যথার গ্লানিমা,
জীবনের জমায়িত জ্বালা, আত্মার কী অপমান-ভার,
—বহাই জীবন-স্রোতে স্বাচ্ছন্দ্যের স্বচ্ছ বিকাশ-মহিমা।
সৃজনের জয়োল্লাস নিয়া জীবনের জাগরণ-গীতি
শুনাই মরণাতুরে, ঢেলে দেই ব্যগ্র বাঁচিবার আশা;
বসন্তের বৈজয়ন্তী-সুরে যে বাণী ধ্বনিছে আজো নিতি—
ক্ষীণ কণ্ঠে গা'ক সেই যৌবনের গান, যৌবনের ভাষা।
জানো কি? নারীর বিশ্বে কল্যাণের স্নিগ্ধ পরশ-প্রসাদ
আনন্দের জয়যাত্রা-পথে নিত্য বুঝি সিঞ্চে বারম্বার
প্রভাতের পুণ্য মাঙ্গলিকে শুভ্রতর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ;
···নারীত্বের স্বর্গ-শিরে তা'রি' স্বপ্নে সখি, খোল মাতৃদ্বার।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান*

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও বিরাট যে তাহার সকল অংশের পরিচয় প্রদান দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন অন্ধকার রাত্রির অবসানে পূর্ব্ব গগনে জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতির উদয় হয়, তখন মানুষ তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিনিবেদন কালে যেমন তাঁহার কিরণপাতে সমুজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখে না, তেমনি অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার অবদানের দিকে মনোযোগ দিবার অবসর লাভ করে না। কিন্তু আজ পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থায় দেশের ও সমাজের পক্ষে তাঁহার অবদানের আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য-পথের সন্ধানলাভ একান্ত প্রয়োজন। একদিন যেমন বাঙ্গালী ভারতের ও জগতের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব লাভ ও রক্ষার জন্য তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল. আজ আবার তেমনই, তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনে আমরা যেন স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসরণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে পারি।

যে রামকৃষ্ণ পরমহংস—বিদেশী শাসকের রাজধানী ও বিদেশী ভাবের বিচ্ছুরণকেন্দ্র কলিকাতার উপকণ্ঠে পতিতপাবনী জাহ্নবীর কূলে দেবীর মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া সর্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের উপায়-নির্দ্দেশ-চেষ্টার দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মত প্রতীচ্য-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ধর্ম্মপ্রচারক হইতে আরম্ভ করিয়া "লাটু মহারাজের" মত ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে দীর্ঘ কাল হিমালয়ের পুণ্যস্থানে সাধনা শেষ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন দেশের ও সমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাঁহার আবির্ভাবের কারণ ও গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়। তিনি সে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-মণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্ম্মর প্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্ম্মী সমশরীর গো মহিষ বলীবর্দ্দ; চারিদিকে আবর্জ্জনা-রাশি - এই আমাদের বর্ত্তমান ভারত।

"অট্টালিকা বক্ষে জীর্ণ কুটির, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীন-ধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি— আমাদের জন্মভূমি।"

আমাদিগের এই অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিলে যেমন ব্যথিত হইতে হয়, সে কারণ দূর করিবার জন্য জাতির মনে তেমনই আগ্রহ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বহুদিন হইতে বিদেশীর আক্রমণের বাত্যা ও বিপর্য্যয়ের বন্যা

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে আহুত সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ।

এই দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া লোককে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। যে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ মানব-চরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন, তাঁহারা গণতন্ত্রের সহিত গুণকর্ম্মের ও সাম্যবাদের সহিত সন্তোষবাদের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া যে সমাজ-শৃঙ্খলা রচনা করিয়াছিলেন, ইহকাল-সর্ব্বস্ব, জড়বাদ-জর্জ্জরিত, ভোগবিলাসাকাঙ্ক্ষী, প্রবৃত্তি-পরায়ণ জাতিরা আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া দেশে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—সমাজে সাম্যবাদ ও সন্তোষ নষ্ট করিয়াছিল। লুণ্ঠন, দেবস্থান অপবিত্রীকরণ ও দাসদলগঠন—ইহাই মুসলমান অত্যাচারীদিগের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল। তাহারা যখন আপনাদিগের ভোগাতিশয্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন নূতন সভ্যতা ও নূতন আদর্শ লইয়া ইংরেজের আবির্ভাব—ভারত-বাসীর কল্যাণসাধন-জন্য নহে—আপনাদিগের ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এ দেশে বৃটিশপ্রাধান্য-প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইবের সম্বন্ধে শুনা যায়—যে বিরাট সিন্দুকে তিনি মুর্শিদাবাদের লুণ্ঠনলব্ধ ধনরত্নাদি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার শয়নকক্ষের নিকটে তাহা দেখিয়া তাঁহার একজন ভৃত্য সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, পাপের ঐ প্রমাণ শয়নগৃহ-সান্নিধ্যে রাখিয়া তিনি সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে পারেন কি? ইংরেজ এ দেশে শোষণই শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়াছিল এবং একদিকে অর্থনীতিক, আর একদিকে শিক্ষাবিষয়ক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র জাতিকে পরানুকরণরত, পরমুখাপেক্ষী ও আত্মবিশ্বাসহীন—আত্মসম্মানত্যাগী করিয়া তুলিবার উপায় করিয়াছিল।

কিন্তু ইংরেজের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দেশে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মনীষার অনুশীলনের সুযোগ ঘটিল এবং সেই সুযোগের ফলে দেশে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল।

সেই ভাবের প্রতীকরূপে স্বামী বিবেকানন্দ জাতির উদয়াচলের অরুণরাগরঞ্জিত শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া জাতিকে বলিয়াছিলেন—উত্তিষ্ঠ! তিনি কি চাহিয়াছিলেন—জাতিকে কি আদর্শ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন:—

"বিস্তৃতিলাভই জীবনের লক্ষণ। তোমরা যদি বাঁচিতে চাও, তবে বিস্তৃতিলাভ করিতে হইবে। আমি আমেরিকায় ও য়ুরোপে গিয়াছিলাম —আমাকে যে যাইতে হইয়াছিল, তাহার কারণ তাহাই জাতীয় জীবনে পুনরুত্থানের প্রথম লক্ষণ—বিস্তার। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মনে করে, হিন্দুরা চিরকাল নিজদেশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিলেন, তাহারা ভ্রান্ত; তাহারা জাতির ইতিহাস প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করে নাই। * * * আমি কল্পনাপ্রবণ—আমার মনোভাব এই যে, হিন্দুজাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে। পৃথিবীতে বহু জয়ী জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। আমরাও জয়ী ছিলাম। ভারতের বিখ্যাত সম্রাট অশোক বলিয়াছেন, আমাদিগের জয় ধর্ম্মের ও আধ্যাত্মিকতার জয়। ভারতবর্ষকে আবার সমগ্র জগৎ জয় করিতে হইবে। * * * যদি বিদেশীরা আসিয়া এ দেশ তাহাদিগের শোষণে প্লাবিত করে, তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিও। ভারত, তুমি উত্থিত হও—তোমার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় কর। এই ভূমিতেই প্রথম উক্ত হইয়াছে, প্রথমে প্রেমের দ্বারা ঘৃণা জয় করিতে হইবে, ঘৃণা কখন আপনাকে জয় করিতে পারে না। জড়বাদের দ্বারা কখন জড়বাদ ও জড়বাদজনিত দুর্দ্দশা জয় হইতে পারে না। সেনাবল যখন সেনাবল জয় করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা কেবল বর্দ্ধিত হয় ও মানুষকে পশুতে পরিণত করে। আধ্যাত্মিকতাই প্রতীচীকে জয় করিবে। প্রতীচী ধীরে ধীরে বুঝিতেছে যে, জাতিহিসাবে

আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের আধ্যাত্মিকতা প্রয়োজন।”

এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই স্বামীজীর সাধনায় জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও স্বদেশপ্রেমের ত্রিধারা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর ধারার মত মিলিত হইয়াছিল।

জাতি যখন হতাশায় ক্লৈব্যানুভব করিতেছিল—মাতার কথার অর্থানুভব করিতে পারিতেছিল না—

“ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারীদশা তবে কেন তোর আজি?”

তখন স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে বলিয়াছিলেন—

“হাজার বৎসরের নানারকম হাঙ্গামায় (আমাদের) জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতি নীতি যদি এত খারাপ, ত আমরা এত দিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে! তবু সব হিন্দু মরে লোপাট হয় না কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনিই ত এসে চাষ বাস করে বাস করতো, যেমন আমেরিকায় অষ্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে! তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, এটা কল্পনা; ভারতেরও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।”

আমাদিগের যাহা দিবার আছে, তাহাই আধ্যাত্মিকতা। সেই আধ্যাত্মিকতা ভারতের বিততবহুশাখ ন্যগ্রোধের মত ত্রিতাপতপ্ত মানুষকে অবারিত আশ্রয় ও স্নিগ্ধ ছায়া দিয়া আসিতেছে।

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সময় তিনি জাতির মনীষীদিগের ভাব উত্তরাধিকাররূপে পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসাকে বলিয়াছিলেন—

“আনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। * * আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নিগুর্ণ হইলেও, রত্ন-প্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আবার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না? ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যা-লোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল; সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে।”

গভীর জ্ঞানই স্বামী বিবেকানন্দকে ধর্ম্ম ও মোক্ষ উভয়ের প্রভেদ দেশবাসীকে শিখাইতে প্রণোদিত করিয়াছিল। ধর্ম্ম ক্রিয়ামূলক। “মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে। অন্যত্র নাই”—কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরবের সময় এ দেশে “ধর্ম্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল।”

তিনি দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হিন্দুর শাস্ত্রের সেই উপদেশ দিয়াছিলেন—স্বধর্ম্ম কর। —“হিন্দুশাস্ত্র বল্‌ছেন যে, ‘ধর্ম্মের’ চেয়ে ‘মোক্ষটা’ অবশ্য অনেক বড়,—কিন্তু আগে ধর্ম্মটি করা চাই। * * * অহিংসা ঠিক, নির্ব্বৈর বড় কথা, কথা ত বেশ; তবে শাস্ত্র বল্‌ছেন তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। * * বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; বীর্য্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে

ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও পাপ গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জ্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' !!"

অসাধারণ প্রতিভা জ্ঞানের সকল বিষয়কেই কিরূপ আয়ত্ত করিতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার নিদর্শন। তিনি ইংরেজী ভাষা তাঁহার মাতৃভাষার সহিতই শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি য়ুরোপে সর্ব্বত্র সমাদৃত ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে যাইয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ অধ্যয়নফলে হিন্দুশাস্ত্র-সিন্ধুমন্থন করিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মঠে ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। মঠের সহিত একটি বৃহৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। আর আজ বেলুড় মঠে যে মন্দির প্রতিদিন শতশত নরনারীকে আকৃষ্ট করিতেছে, তিনিই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা তাহার আদর্শ রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া ছিলেন বলিয়াই, শিকাগো নগরে ধর্ম্ম-সম্মিলনে যখন বক্তার পর বক্তা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিলেন, তখন আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহার সেই বিশালায়ত চক্ষুর দৃষ্টি সমবেত বুধমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কয় জন হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে সাহস করেন? সমবেত ব্যক্তিরা নিরুত্তর দেখিয়া তিনি ঘৃণাভরে তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"আর আপনারাই হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন!" সেই উক্তি কি ধৃষ্টতার পৃষ্ঠে কশাঘাত বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে না?

তিনি বেদান্তে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ।

তিনি অসত্যকে ঘৃণ্য মনে করিতেন। সেই জন্যই তিনি খৃষ্টানগণ হিন্দুদিগের গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন প্রথার নিন্দা-প্রসঙ্গে যে চিত্র প্রদান করেন, তাহাতে সন্তান-বিসর্জ্জন-কারিণী জননীকে কৃষ্ণকায়া কিন্তু শিশুকে য়ুরোপীয়দিগের মত শ্বেতকায় চিত্রিত করিয়া য়ুরোপীয়দিগের সহানুভূতি আকর্ষণ-চেষ্টাকে প্রচারের অপকৌশল বলিয়া তাহার নিন্দা করিয়াছিলেন।

জ্ঞানের মর্য্যাদা তিনি দিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন—জ্ঞানই মোক্ষ-লাভের সন্ধান প্রদান করে।

জ্ঞান প্রচার ও প্রদান জন্য তিনি তাহার উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন। আজ যখন আমরা কোন কোন লেখককে বা তাঁহাদিগের ভক্তদিগকে বলিতে শুনি—তাঁহারাই কেহ কেহ কথ্যভাষার সহিত লেখ্য ভাষার সম্মিলনে ভাষার ভাবপ্রকাশশক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তখন মনে হয়, বহ্নি যেমন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা সম্ভব নহে, তেমনই সে বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কীর্ত্তি কখনই অস্বীকার করা যায় না।

জ্ঞানের পর আধ্যাত্মিকার কথায় উপনীত হইতে হয়। এ বিষয়ে তিনি যে উৎস হইতে উৎসারিত উপদেশামৃত পান করিয়াছিলেন, তাহার ধারা গোমুখীর মুখ হইতে প্রবাহিত জাহ্নবীর ধারারই

মত পূত—তেমনই আবিলতাশূন্য—তেমনই সঞ্জীবনী-শক্তিসম্পন্ন।

গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়া সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। শিষ্য বিবেকানন্দ সেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভগীরথের সাধনাতুষ্টা ত্রিপথগা যখন ধরাতলে অবতীর্ণা হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন দেবসমাজে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কে তাঁহার অবতরণবেগ ধারণ করিবে? তখন দেবাদিদেব মহাদেব—যিনি সৃষ্টিরক্ষার জন্য সমুদ্রমন্থনজাত কালকূট কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার জটাজালমধ্যে সেই বেগধারণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সেই জটাজালমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া অপগতবেগা জাহ্নবী কল্যাণরূপিণী হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তেমনই ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিভৃত গুহায় থাকে, তাহা সরল ও সবল ভাবে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বজনবোধ্য হইত।

আধ্যাত্মিকতা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। একদিন যে রোমের সৈনিকপদভরে মেদিনী কম্পিত হইত, সে রোমের আজ রাজপথে ও ভগ্ন গৃহে পরিচয় মাত্র আছে। যে গ্রীস য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রসূতি, সে গ্রীসের মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে মিশর প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্ব করিতে পারে, সে আজ তাহার মরুকান্তারে স্ফীংস ও পিরামীডের তলে সমাহিত। কিন্তু ভারতবর্ষ যে এখনও জীবিত, সে তাহার আধ্যাত্মিকতাহেতু। বেদান্তের সত্য এখনও হিন্দুস্থান উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানেও আর ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডব চমূর মধ্যে অর্জ্জুনের জয়রথে সারথ্যতৎপর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মানবজাতিকে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্ববাসীর অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে এবং সেই আধ্যাত্মিকতার অমৃত মানবজাতি—

"যতনে রাখিবে নিত্য মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।"

এই আধ্যাত্মিকতার দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগৎ জয় করিবার উপদেশ তাঁহার স্বদেশীয়গণকে দিয়া গিয়াছেন।

মাদ্রাজে তাঁহার যে বক্তৃতার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতীচী ধীরে ধীরে বুঝিতেছে, জাতি হিসাবে আত্মরক্ষার জন্য তাহার আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। এই আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রতীচীকে কিরূপ বিপন্ন করিবে, তাহা যেন তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে বহুদিন পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আমাদিগের যে জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দিবার আছে, তাহা বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন:—

"এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্ব্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু,' 'তোমরা, হে ইয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আজ যিশু এসে ভারতে বসেছেন বলে, হাঁসেন হোঁসেন করছ। ওহে বাপু, যিশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই।"

প্রতীচ্য-দেশের লোকরা যে "ঘর সামলাচ্ছেন" —তাঁহাদিগের "আমাদের দেশে আসবার সময় নাই" —ইহা পাঠ করিলে যেন মনে হয়—যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহাদিগের পক্ষে "Coming events cast their shadows before." প্রতীচীতে—ক্ষমতার লালসায় ও স্বার্থের প্রাবল্যে যে সঙ্ঘর্ষ আছে—মহাসমরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং প্রথম

যুদ্ধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে আবার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা যে অনিবার্য্য স্বামীজী তাহা যখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রতীচীর মহাপণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

আমাদিগের সামাজিক ও জাতীয় বহু সমস্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর এই দুরদৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই। তাঁহার দেশাত্মবোধের কথায় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

রবার্ট পামার নামক একজন ইংরেজ ভারত ভ্রমণে আসিয়া লিখিয়াছিলেন, এ দেশে সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়াদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভ কবে? তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর দিবেন, "বোধ হয় —ক্লাইভের সময় হইতে।" আজ তেমনই আমরা লক্ষ্য করিতেছি, যাঁহারা আমাদিগের রাজনীতিক ইতিহাস রচনায় বা বর্ননায় প্রবৃত্ত তাঁহারা মনে করেন, অন্ততঃ বলেন, নব ভারতের ইতিহাস ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের যে আন্দোলন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে সেই আন্দোলন হইতে। ইলবার্ট বিল-বিরোধী যে আন্দোলনে প্রথম জাতীয়তার তূর্য্যনিনাদ শ্রুত হইয়াছিল, তাঁহারা তাহার কথাও ভুলিবার চেষ্টা করেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অবদান তাঁহারা যেন অস্বীকার করিতেই উৎসাহ বোধ করেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালী। তাঁহার সমাধিস্তম্ভে লিখিত আছে—"Here lies W. C. Bonnerjee, a Hindu Brahmin."—ইত্যাদি। কংগ্রেসের কার্য্য-বিবরণে তিনি "হিন্দু ব্রাহ্মণ" বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন—কিন্তু কংগ্রেসের যে সকল পরিচালকের পক্ষে নির্ভুল হওয়াই আশা করা যায় তাঁহারাও তাঁহাকে "ভারতীয় খৃষ্টান" বলিয়াছেন। যদিও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ কখন জানিতেও পারিবে না, তিনি তাঁহাকে (রাজনীতিক আন্দোলনের জন্য) কত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন" —যদিও দাদাভাই নৌরোজী বলিয়াছিলেন—কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল সে কেবল বাঙ্গালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ জন্য নহে; পরন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে পদে বৃত হইবার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া, তথাপি কংগ্রেসের অনুমোদিত কংগ্রেসের ইতিহাসে তিনি উপযুক্ত স্থান লাভ করেন নাই। আজ যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা যে ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে দেশের রাজনীতিক চেতনা সাধনে যিনি প্রধান কার্য্য করিয়া গিয়াছেন সেই সুরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি উপযুক্ত স্থান পায় নাই। আর হয়ত সেই কারণেই আজ বিদেশে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই; অথচ এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠাবধি যে তিনজন ভারতীয় সমগ্র সভ্য জগতে ভারতের (ভারতের ইংরেজাধীন বা দেশীয় সরকারের নহে) প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা তিন জনই বাঙ্গালী—রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙ্গালাই যে এ দেশে দেশাত্ম-বোধের ও জাতীয় ভাবের প্রবর্ত্তক তাহা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও লালা লজপত রায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন সমাজ দেশাত্মবোধে—জোয়ারের জল যখন নদীতে প্রবেশ করে তখনকার নদীর মত—চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও নহে।

মধুসূদন জননীর নিকট যেমন আপনার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—

"ফুটি যেন স্মৃতিজলে　　মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে।"

তেমনই দেশের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।"

রঙ্গলাল আইরিশ কবি মূরের ভাবে ভাবিত হইয়া লিখিয়াছিলেন :—

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায়?"

হেমচন্দ্র হিন্দুদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,

"কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা?
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমনি প্রখরা
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও?
ওই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখনও ধাবিত
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?"

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়াছেন :—

"হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি—হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

সেই আশাপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়াছিলেন :—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের জয়গান।"

পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুকীর্ত্তি স্মরণে মনে পড়ে—"হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

তাঁহার বক্তৃতাশেষে রাজনারায়ণ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে গীত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' লিখিত হয় :—

"এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক; হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক; গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক; পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক; এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র হইয়া সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু বলিয়াছিলেন :—

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন; তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি ও উপযুক্ত উৎসাহতাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, তখন জাতি-গৌরবরূপে তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতিশুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে; তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে

সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে 'স্বাধীনতা' নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন'নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলনসাধনের একমাত্র উপায়।"

এই ভাব যখন দেশে ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে, তখন বিবেকানন্দের আবির্ভাব। এ দেশে দেশাত্মবোধের এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বাধীনতার কথায় তিন জনের কথা প্রথমেই বলিতে হয়—বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার দার্শনিক ও লেখক, সুরেন্দ্রনাথ তাহার বক্তা ও সাংবাদিক, বিবেকানন্দ তাহার প্রচারক ও শিক্ষক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।"

ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন :—

"এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীরবিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটজূটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-বারি। * * এখানকার নরনারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী গঙ্গাবারি কি ভস্মমাত্রা-বশিষ্ট সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করে নাই? কপিলদেবের প্রিয়া, স্থায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্রশাস্ত্র-জননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

জননীকে জাগাইতে হইবে—তাঁহার যোগ-নিদ্রাশেষ করিতে হইবে—তাঁহাকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার উপায়সন্ধান হেমচন্দ্র দিয়াছিলেন :—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখাধরে
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। মাদ্রাজে তাঁহার যে বক্তৃতার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"ভারতবর্ষকে আমি যতই ভালবাসি না, আমি যত স্বদেশভক্তই কেন হই না, পূর্ব্বগামী-দিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধা যত প্রগাঢ়ই কেন হউক না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—পৃথিবীর (অন্যান্য দেশের) নিকট আমাদিগের অনেক জিনিষ শিখিবার আছে। আমরা সকলের নিকট হইতে শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত থাকিব—সকলেরই আমাদিগকে শিক্ষা দিবার কিছু না কিছু আছে। * * সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে পৃথিবীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে।"

তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা যদি শত শত বৎসর বিদেশে যাইয়া অবস্থা লক্ষ্য করিতে বিরত না থাকিতাম, তবে আজ ভারতবর্ষকে পরপদানত থাকিতে হইত না।

বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠতার ও প্রকৃত স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজন স্বামীজী বুঝিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন বিদেশের যশে উদ্ভাসিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তারুণ্যের অবিবেচনাহেতু সরলা দেবী তাঁহার কার্য্যে হতাশা ব্যক্ত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযোগের উত্তরে স্বামীজী এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। সেই পত্র পাইয়া সরলা দেবী ১৩০৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী'-পত্রে এক প্রবন্ধ লিখেন :—

"বিবেকানন্দ স্বামী যখন পাশ্চাত্য দেশে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানকার সংবাদপত্রে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার-বৃত্তান্ত পড়িয়া আমাদের দেশের লোকের মনে একটা বৃহৎ আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এ দেশে পদার্পণ করিলে বুঝি একটা নূতন ধর্ম্মযুগ উপস্থিত হইবে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, তিনি কেশব বাবুর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করিবেন, সংস্কারের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া আমাদের যুবকদলদের আর একবার মাতাইয়া তুলিবেন, কতিপয় বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার কবল হইতে আমাদের ছাত্রদলকে উদ্ধার করিবেন। সে আশা বিফল হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস শীঘ্রই নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গুপ্তযুগ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক ভারতে একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের যুগ। দক্ষিণ-ভারতে এ সময়ে অন্ধ্ররাজত্বের অবসান, উত্তর ভারতে কুশান রাজত্বের পতন। এ সময়ে শুধু রাজনৈতিক কেন, ভারতীয় সামাজিক জীবনেও আন্দোলন আসিয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের আরম্ভের পূর্ব্বে এবং কুশানের পতনের পর, যে সময় ভারত ঝটিকাক্ষুব্ধ, সে সময়ের ইতিহাসের উপাদান কম পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে পাটলীপুত্রে প্রথম গুপ্ত-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন। সমুদ্রগুপ্ত-কর্ত্তৃক শতদ্রু পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত এবং দাক্ষিণাত্য বিজিত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৫ম শতাব্দী) মালোয়া ও উজ্জয়িনী জয় করেন। তিনি শকদের সৌরাষ্ট্র (বর্ত্তমান কাথিওয়াড়) হইতে বিতাড়িত করেন। তিনিই কিংবদন্তীতে বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ইঁহার সময়ে ভারতে আগমন করেন।

পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে যাযাবর দুর্দ্ধর্ষ হূণজাতি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক তাহারা পরাজিত হয়। ৫২৮ খৃষ্টাব্দে বালাদিত্য হূণনায়ক মিহিরগুলকে পরাস্ত করিয়া হূণদের অত্যাচার হইতে ভারতকে মুক্ত করেন। এই হূণদের অপর একটি দল আটিলার নেতৃত্বে রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে।

সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৪৭ খৃঃ) উত্তর ভারতে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বের সময় চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েনশাঙ ভারতে আগমন করেন। হুয়েনশাঙ ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেছিলেন; সুদূর দক্ষিণে ছিল পল্লব রাজত্ব।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বিদেশী যাযাবর জাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু জাতির মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। নবম শতাব্দীতে দেখা যায়, হূণেরা রাজপুত নামে পরিচিত হইয়া অনেক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার পরে আরো দুইজন রাজার আমলে (৩৭৫-৪৯০ খৃঃ) সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করে। মহাকবি কালিদাস ছিলেন (৫ম শতাব্দী) গুপ্তযুগে।

পুরাণ এখন আমরা যে আকারে দেখি, তাহা সঙ্কলিত হয় গুপ্তযুগে; কাব্য-নাটকাদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ যুগের পাটলীপুত্রের আর্য্যভট্ট (জন্ম ৪৬৭ খৃঃ) এবং উজ্জয়িনীর বরাহমিহির (জন্ম ৫০৫ খৃঃ) জ্যোতির্ব্বিদ্যার জন্য খ্যাত। অজন্তা, বাঘ, সিংহল, সিগিরিয়ার চিত্র এই সময়ে অঙ্কিত হইয়াছিল।

মৌর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বারহুত, সাঞ্চি, মথুরা অমরাবতী একই যুগ। ইহাকে বলা যায়, প্রিমিটিভ বা আদিম শিল্প-যুগ। ইহার পরে গুপ্তযুগে ক্লাসিক্যাল যুগের আরম্ভ; এযুগে শিল্পের আদর্শ

একেবারে বদলাইয়া যায়। বহুযুগের বহু দেশের বহু সাধনার ধারা গুপ্ত আদর্শে মিলাইয়াছে। দেশজ, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পরীতি হইতে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে বৈদেশিক পারশ্য ও গ্রীক আদর্শের সংমিশ্রণ হইয়াছে। বিদেশ হইতে গ্রহণ করিলেও গুপ্ত-শিল্পী একেবারে নিজস্ব পরিভাষায় ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। অন্যান্য শিল্প বিশেষ যুগের বা বিশেষ স্থানের শিল্প, কিন্তু গুপ্ত-শিল্প ভারতের জাতীয় শিল্প, ইহা সর্ব্বকালের জন্য, সর্ব্ব দেশের জন্য। এখানে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় শিল্পাদর্শের এবং টেকনিকের একীকরণ হইয়াছে। বহুযুগ ধরিয়া শিল্পের যে পরীক্ষণ চলিয়াছিল, তাহাই এখানে দানা বাঁধিল ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল।

প্রাচীন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই ভল্যুম (Volume) বা আয়তন প্রধান, গুপ্তযুগে মূর্ত্তির বক্রগতিতে প্রবহমাণ রেখা লক্ষণীয়। এই রেখার ছন্দ আসিয়াছে Vegetative rhythm বা উদ্ভিজ্জের ছন্দ হইতে। মথুরা অমরাবতীর পরের যুগের Floriated design বা ফুললতা পাতার পরিকল্পনার প্রায় লোপ হয়, কিন্তু মৃণালদণ্ডের সৌন্দর্য্য দেহের মধ্যে, বাহুর মধ্যে আসিয়াছে; পদ্মফুল এবং মৃণালের সৌন্দর্য্য শিল্পী শরীরের গঠন বা অ্যানাটমির মধ্যে ঢুকাইয়াছেন।

পূর্ব্বের শিল্পীরা শুধু দেহের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এখন শিল্পীরা একটি নূতন ভাব দান করিলেন, ইহা আধ্যাত্মিক ভাব। দেবতার আদর্শে মানুষ সৃষ্ট হইল; দেবতা চিরতরুণ, মূর্ত্তিতে আসিল চিরতারুণ্য। বুদ্ধ ও দেবমূর্ত্তিতে দেখা গেল ধ্যানের আদর্শ; নাসাগ্র দৃষ্টি। শিল্পাদর্শের সঙ্গে যোগের আদর্শ যুক্ত হইল। বুদ্ধ ও দেবমূর্ত্তিতে ভাবপ্রকাশক মুদ্রা বা হাতের ভঙ্গি সৃষ্ট হইল।

গুপ্তযুগ যে শুধু ভারতীয় শিল্পের ক্লাসিক্যাল যুগ তাহা নহে, ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির ক্লাসিক্যাল যুগ। এই সময় শিল্পশাস্ত্র রচিত হইয়াছে এবং ইকোনোগ্রাফি বা মূর্ত্তিশিল্পের লক্ষণ স্থিররূপ পাইয়াছে।

গুপ্তযুগে ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া নবরূপ লাভ করে। স্থাপত্যের অলঙ্করণের সঙ্গে মিলিয়া তাহা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়। লাবণ্য কমনীয়তা ও শান্তির ভাব মূর্ত্তিতে নিবিষ্ট হয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ শুধু ভাস্কর্য্যেই যে প্রকাশিত হইল তাহা নহে—চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যেও তাহা দেখা দিল। টেকনিক বা কলাকৌশল পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, মূর্ত্তির একটি টাইপ সৃষ্টি করিল।

কুমারস্বামী বলিয়াছেন, "With a new beauty of definition it establishes the classical phase of Indian art, at once serene and energetic, spiritual and voluptuous. The formulae of Indian taste are now definitely crystallised and universally accepted; iconographic types, and compositions still variable in the Kusāna period, are now standardised in form."

এক কথায় ভারতীয় শিল্পের ভাষা ও ভাবের সৃষ্টি হইল। গুপ্তশিল্প নূতনভাবে সমৃদ্ধ হইয়া সারা ভারত ও সিংহলে তো ছড়াইলই, এমনকি বাহিরেও বৃহত্তর ভারতে ইহার আদর্শ পৌছিল। আজ পর্য্যন্তও গুপ্তযুগের আদর্শ অক্ষুণ্ণ আছে; প্রাচীন ভারতের শিল্প বলিতে আমরা গুপ্তযুগের শিল্পকেই বুঝিয়া থাকি।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৭৫ খৃঃ) বিজয়ী সেনাপতি, কবি এবং সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন। তাঁহার আমলের মুদ্রা ছাড়া আর কোনো শিল্পের নিদর্শন দেখা যায় না।

এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভে তিনি নিজের কীর্ত্তিকাহিনী লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। গুপ্তযুগের নির্দর্শন ৫ম শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত সারনাথ, মথুরা, গরহোয়া, উদয়গিরি (গোয়ালিয়র) ও দেওঘরে গুপ্ত-শিল্পীদের কাজ দেখা যায়।

বুদ্ধমূর্ত্তি

গুপ্তযুগে হিন্দু বৌদ্ধ দুই রকম মূর্ত্তিই পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্ত্তি এ সময়ে পূর্ণরূপ পায়। ধ্যান-স্তিমিত নেত্র (নাসাগ্র দৃষ্টি), মাথার কুঞ্চিত কেশ, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বস্ত্র; বস্ত্রের ভিতর দিয়া দেহের গঠন দেখা যাইতেছে। কাঁধের দুই দিকই কাপড়ে ঢাকা, কুশান যুগে ডান কাঁধ খোলা। আলোকমণ্ডল কারুকার্য্যপূর্ণ।

বুদ্ধমূর্ত্তিতে এই কয়প্রকার মুদ্রা দেখা যায়—(১) ধ্যানমুদ্রা, দুই হাত কোলের উপর ন্যস্ত (২) ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, ডান হাত মাটী ছুঁইয়া আছে; মার যখন বুদ্ধকে আক্রমণ করিয়াছিল, বুদ্ধ মাটী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। (৩) ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন মুদ্রা, সারনাথে প্রথম ধর্ম্ম প্রচার কালীন; দুই হাত বুকের নীচে ন্যস্ত। (৪) অভয় মুদ্রা, ধর্ম্মপ্রচার কালীন, বা হাত কোলের উপর, দক্ষিণ হাত কাঁধের কাছে তোলা।

সারনাথে গুপ্তযুগের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সারনাথের উপবিষ্ট বুদ্ধ বিখ্যাত। ৫½ ফুট উচ্চ, সাদা বেলে পাথরের তৈয়ারী সারনাথ-যাদুঘরে রক্ষিত, ৫ম শতাব্দী। সারনাথে প্রথম ধর্ম্মপ্রচার কালীন মূর্ত্তি (ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন)। আসনের নীচে একটি চক্র খোদিত আছে; পঞ্চশিষ্য, একটি রমণীমূর্ত্তি এবং শিশুও খোদিত আছে। মাথার পিছনের আলোকমণ্ডল কারুকার্য্য-পূর্ণ। দেহের গঠন মসৃণ, মুখে শান্ত-সমাহিত ভাব। সারনাথের গুপ্ত-শিল্পীরা মথুরার শিল্পীর নিকট শিক্ষা পাইয়াছে।

মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তি, ৭ ফুট ২½ ইঞ্চি উচ্চ। স্বচ্ছ কাপড়ের ভিতর দিয়া দেহের গঠন দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচল ধরা, ইহা গুপ্ত-ভাস্কর্য্যের একটা বৈশিষ্ট্য। ইহা ৫ম শতাব্দীর কাজ।

সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বিরাট আকার দাঁড়ান বুদ্ধমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৭½ ফুট উচ্চ। ইহা বর্ত্তমানে বার্ম্মিংহাম যাদুঘরে রক্ষিত আছে—৫ম শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্ম্মিত।

মানকুয়ার উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি (৫ম শতাব্দী) কুশান বুদ্ধের ন্যায় মাথা কামান। হাতের আঙ্গুল জোড়া (webbed fingers); ইহা কোনো কোন বৌদ্ধধর্ম্ম মতে বুদ্ধের লক্ষণ।

গুপ্তযুগ আরম্ভ হইবার পরও মথুরার শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। কুশানযুগের পরে নির্ম্মিত কাশিয়ার (গোরক্ষপুর জেলা, ইউ, পি) বিরাটাকার শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি (পরিনির্ব্বাণ) উল্লেখযোগ্য। হুয়েনশাঙ ইহা দেখিয়াছিলেন। ৫ম শতাব্দীর শিলালেখ হইতে জানা যায়, ইহা ভিক্ষু "হরিবল"র দান, ও মথুরার ভাস্কর দিন্ন কর্ত্তৃক খোদিত।

ব্রাহ্মণ্য মূর্ত্তি

কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি (৫ম শতাব্দী) এলাহাবাদ জেলার কোসাম এ (কোসাম্বি) প্রাপ্ত।

যুক্ত প্রদেশের ঝান্সি জেলায় দেওঘরের দশাবতার মন্দিরের (৬ষ্ঠ শতাব্দী) দেয়ালের তিন দিকে তিনটি বিষয় খোদিত আছে—(১) শিব-মহাযোগী (২) গজেন্দ্রমোক্ষ (৩) বিষ্ণুর অনন্তশয্যা। মূর্ত্তিগুলির দুই পাশে স্তম্ভ ও তিন দিকে কারুকার্য্য খচিত, গুপ্ত-শিল্পী অনুযায়ী দ্বারবেষ্টনী (Jamb) আছে। ইহার জন্য ফ্রেমে আবদ্ধ ছবির ন্যায় মূর্ত্তিগুলি মনোহর দেখায়। দ্বারে গঙ্গা-যমুনার মূর্ত্তি খোদিত, ইহা গুপ্ত-স্থাপত্যের একটি রীতি। মন্দিরের ভিত্তিতে রামায়ণের বিষয় খোদিত আছে, যেমন, জাভাতে আছে। দেওঘরের ভাস্কর্য্যে গুপ্ত-রীতি বিশেষভাবে প্রকটিত।

এলাহাবাদের ২৫ মাইল দূরে, গরহোয়াতে ৫ম শতাব্দীর গুপ্তযুগের মন্দির আছে। তাহার স্তম্ভগাত্রে সাঞ্চি, বারহুতের ন্যায় ভাস্কর্য্য আছে।

উদয়গিরিতে (ভূপাল রাজ্যে) বরাহ অবতারের বিরাট মূর্ত্তি আছে, ৪০০ খৃষ্টাব্দের কাজ।

আমেরিকার বোষ্টন নগরে রক্ষিত বেসনগরে প্রাপ্ত গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি মনোরম, ৫ম শতাব্দীর কাজ।

আইহোল মন্দিরের ভাস্কর্য্য (৬ষ্ঠ শতাব্দী), বিষ্ণু অনন্তনাগের উপর বসিয়া আছেন।

গোয়ালিয়র যাদুঘরে রক্ষিত "কৃষ্ণের জন্ম" (৭ম শতাব্দী) উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্যের ভক্তগায়ক ত্যাগরাজ

স্বামী নির্বিকল্পানন্দ

দক্ষিণ-ভারতে আবহমান কাল হইতে যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার ধারা চলিয়া আসিতেছে, উহাকে কর্ণাটক সঙ্গীত বলা হয়। মুত্তুস্বামী দীক্ষিত, শ্যামাশাস্ত্রী ও ত্যাগরাজ এই তিনজন মহাত্মা এই সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক। শেষোক্ত দুইজন মহাপুরুষ গান রচনা করেন তেলেগু ও অন্ধ্র ভাষায়, দীক্ষিতের গান সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই তিনজন যথাক্রমে সুব্রহ্মণ্য (কার্ত্তিক), দেবীকামাক্ষী ও শ্রীরামের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের গানের সুর নিজ নিজ ইষ্টদেবের ভাবে অনুপ্রাণিত।

পুণ্যসলিলা কাবেরী নদীর প্রান্তদেশ বহু সঙ্গীতসাধকের আবির্ভাবকেন্দ্র। উঁহাদের অন্যতম শ্রীগিরিরাজ ব্রহ্ম ছিলেন ত্যাগরাজের পিতামহ। শুনা যায় তাঁহাদের প্রাচীন নিবাস ছিল কার্ণুর জেলার অন্তর্গত কাকার্লা নামক গ্রামে। সেখান হইতে তাঁহারা তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত তিরুবারু গ্রামে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। কথিত আছে শ্রীগিরিরাজ ব্রহ্মের বেদান্তবোধক পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎকালীন তাঞ্জোর অধিপতি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানিত করিয়াছিলেন। শ্রীরাম ব্রহ্ম গিরিরাজ ব্রহ্মের পঞ্চম সন্তান। ইনি ত্যাগরাজের পিতা। ত্যাগরাজের আর এক নাম ত্যাগব্রহ্ম। ত্যাগরাজের দুইজন অগ্রজ ছিলেন—পঞ্চনদ ব্রহ্ম ও রামনাথ ব্রহ্ম। রামনাথ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ৩০ বৎসর বয়সেই ইহলীলা সংবরণ করেন। তিনি যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন তখন মাতৃ-আজ্ঞানুসারে ত্যাগরাজ একটী গান গাহিয়া শ্রীরামের নিকট তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগরাজকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতার আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে। পঞ্চনদের আর একটী নাম ছিল জপ্যেশ। তিনি ক্রোধী, কপট ও অসূয়া-পরায়ণ ছিলেন। তিনি যেন ত্যাগরাজের ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার জন্য ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিকষ পাথর। কিন্তু ত্যাগরাজ তাঁহাকে কখনও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। পরবর্ত্তী কালে জপ্যেশের জীবনেও উন্নতি দেখা গিয়াছিল।

ত্যাগরাজ প্রথমতঃ তিরুবারু গ্রামের চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিকটবর্ত্তী কাবেরী তটস্থিত তিরুবয্যুর গ্রামে চলিয়া আসায় তাঁহার বেশীর ভাগ বিদ্যাভ্যাস এখানেই হয়। তিরুবয্যুর প্রান্তে প্রবাহিতা কাবেরীর সহিত পাঁচটী উপনদী মিলিত হইয়াছে। এই নদীতীরে বহুবার বহু সাধক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। আপ্পার, সুন্দরমূর্ত্তি, সম্বন্দর প্রভৃতি বহু শৈবভক্ত সেখানে "ত্যাগরাজ স্বামী" নামক শিবলিঙ্গকে আপনাদের প্রাণের আবেদন গানের ভিতর দিয়া জানাইতেন।

রাম ব্রহ্মের ইচ্ছা ছিল ত্যাগরাজ পণ্ডিত হন। ত্যাগরাজ টোলে চারি বৎসর কালের মধ্যে বেদ, বেদাঙ্গ, রামায়ণ এবং পুরাণাদির অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। রামায়ণ পাঠ করিয়া তিনি শান্তি পাইতেন। তাঁহার হৃদয়-কুসুম শ্রীরামচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সীতাদেবী পুত্রকে রামদাস নামক প্রচীন ভক্তের গান, পুরন্দরদাসের কীর্ত্তন ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ শিখাইয়া পুত্রের মুখে সেই গানগুলি শুনিতেন এবং আনন্দে

বলিতেন, "বৎস, তুমি কালে গানের বড় ওস্তাদ হইবে।" বলা বাহুল্য, পরে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে বর্ত্তমানে এমন কোন লোক নাই যিনি জীবনে একবারও ত্যাগরাজের গান শুনেন নাই, কিংবা তাঁহার নাম জানেন না। যদিও ত্যাগরাজের গান তেলেগু ভাষায় রচিত —তবুও কর্ণাটক সঙ্গীতের আসরে তাঁহার পদাবলীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ। ইহার অন্তস্থিত প্রাণ-মাতান মাধুর্য্যের জন্য কি তামিল, কি কানাড়ী, কি মালাবারী সমগ্র দক্ষিণ দেশের গায়কগণ এই পদাবলী গাহিয়া আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দেন এবং ভক্তগণ ভাষা ঠিক না জানিলেও শুনিতে শুনিতে ভাবে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন।

পিতা যখন গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতেন তখন ত্যাগরাজ উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিয়া দেবতাকে শুনাইতেন। ব্রাহ্মণের প্রথামত রাম ব্রহ্ম যখন গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, ত্যাগরাজও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন এবং গান করিতেন। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় আমরা কাছের জিনিষকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকি। ত্যাগরাজের পিতাও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। সুতরাং প্রথমতঃ তিনি ত্যাগরাজের গানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন যে নিত্যপরিচিত সেই গানের ভিতর এমন শক্তি নিহিত আছে যে ভাবের আবেগকে সংযত রাখা অসম্ভব, তখন তিনি সেই পদাবলী লিখিয়া নিতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত ও গায়কগণ সেই পদাবলী পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। ত্যাগরাজের প্রশংসায় তাঁহারা বলিতেন তিনি খুবই উচ্চদরের কবি ও সঙ্গীতবিশারদ। তাহার পর রাম ব্রহ্ম পুত্রকে সঙ্গে করিয়া তাঞ্জোর গমন করেন। সেখানকার রাজসভার ওস্তাদের নাম ছিল সঙ্গীত-কলানিধি শোণ্টি বেঙ্কটরমনৈয়া। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া রাম ব্রহ্ম আপন পুত্রকে তাঁহার ছাত্র করিয়া নিতে প্রতিশ্রুত করান। এই ব্যবস্থাতে ত্যাগরাজ অনেকটা উপকৃত হইলেন। অন্তঃস্থিত সুপ্ত সঙ্গীত-সরস্বতীকে জাগ্রতা করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলেম।

ত্যাগরাজের মাতামহের নাম ছিল বীনে কার্লাহস্থ্যা। তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত অনেক সঙ্গীত-শাস্ত্র গ্রন্থ ছিল। এই শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশীলন, শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসি-গুরু প্রদত্ত রাম-শরক্ষরী মন্ত্রকে দৈনিক ২৫ হাজার বার পুরশ্চরণ, নিজের লিখিত গানের সুর আচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধন করান এবং তাঁহার গান শুনা ছিল ত্যাগরাজের নিত্য কর্ম্ম।

কিন্তু এতবড় আচার্য্যও ত্যাগরাজের সঙ্গীত-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় সন্দেহের মীমাংসা করিতে পারিলেন না। কথিত আছে তিনি আপন পারমার্থিক গুরু রামকৃষ্ণানন্দের শরণাপন্ন হইলে তিনি নাকি নারদমন্ত্রের উপদেশ দিয়া শিষ্যকে সান্ত্বনা দেন। সেই মন্ত্র জপের পরে ত্যাগরাজ দেবর্ষি সঙ্গীতাচার্য্য নারদের দর্শন লাভে সমর্থ হন, এবং তাঁহার নিকট হইতে "স্বরার্ণব" নামক একটী সঙ্গীত গ্রন্থ লাভ করেন। উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে ত্যাগরাজ সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হন। এই ইতিবৃত্ত আমরা তৎকৃত লিখিত একটী পদ হইতে জানিতে পারি।

এই ঘটনার পর আচার্য্য বেঙ্কটরমনৈয়া ত্যাগরাজকে বলেন "বৎস, আমার নিকট তোমার শিখিবার আর কিছু নাই, তুমি বাড়ী গিয়া শ্রীরামের নামার্চ্চনা কর।" আচার্য্যের নিকট হইতে এইরূপে অনুমতি লাভ করিয়া ত্যাগরাজ স্বগৃহে আসিলেন। রাম ব্রহ্ম নিজেই তিন পুত্রের বিবাহ

দান করিয়াছিলেন। ত্যাগরাজের দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম ছিল পার্ব্বতী। তিনি পাঁচ বৎসর কাল পতিসেবা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ত্যাগরাজ প্রথম পত্নীর অনুরোধে পরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। ইনি ছিলেন মহা পতিব্রতা, স্বামীর মন বুঝিয়া চলিতেন। তাঁহাদের একটি কন্যা জাত হয়, তার নাম রাখেন সতীলক্ষ্মী এবং উপযুক্ত বয়সে তাহার বিবাহ দেন। সেই কন্যার গর্ভে জাত পুত্রের নামও ত্যাগরাজ রাখা হয়। তিনিও অভিজ্ঞ গায়ক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে ত্যাগরাজের বংশ লোপ পায়। এক্ষণে ত্যাগরাজের পদাবলীই তাঁহার একমাত্র অমর সন্তান!

ত্যাগরাজের দ্বিতীয় ভ্রাতার পঞ্চম বংশধর আজও সেই বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন। ত্যাগরাজের যখন ৩৮ বৎসর বয়স তখন তাঁহার শ্রীরাম মন্ত্রের ৯৬ কোটী পুরশ্চরণ সমাপ্ত হয়। সেইদিন যখন তিনি নিজের সঙ্কল্প সিদ্ধিতে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া গানে বিভোর হইয়া ছিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল কে যেন দ্বারে আঘাত করিতেছে। ত্যাগরাজ দ্বার খুলিয়া দেখিতে পাইলেন বিশ্বামিত্রের যাগসংরক্ষণে গমনোদ্যত শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে। ক্ষণমাত্র ছিল সেই দিব্যদর্শন। অন্তর্ধানের পর ত্যাগরাজ হতাশ হইয়া তীব্রভাবে সাধন ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

রামগতপ্রাণ বিরাগী কনিষ্ঠের ব্যবহারে অগ্রজ জপ্যেশ কুপিত হইলেন। সংসারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ত্যাগরাজ যদি ইচ্ছা করিতেন নিজে স্তূপীকৃত অর্থের উপর বসিতে পারিতেন। কত রাজা-মহারাজা তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার মধুর গান শুনিয়া প্রচুর সম্মান, অর্থ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সেইদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপই করিলেন না। পরন্তু তাঁহাদের প্রেরিত অজস্র অর্থকে ফিরাইয়া দিয়া অকিঞ্চন রহিলেন। তিনি নিধিকে চাহিলেন না, শ্রীরামের সান্নিধ্যই ছিল তাঁহার প্রার্থনীয়।

এই প্রকার ব্যবহারে বিস্মিত ও রুষ্ট জপ্যেশ ত্যাগরাজকে পৃথকভাবে থাকিতে আদেশ দিলেন। দৃষ্ট অর্থকে উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্ট রামকে লইয়া পাগলামি করা তাঁহার ভাল লাগিল না। ত্যাগরাজ নিজের পিতৃপূজিত শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহকে নিজের ভাগ বলিয়া গণ্য করিয়া তৃপ্ত হইলেন, আর কিছুই দাবী করিলেন না।

ত্যাগরাজ ছিলেন সগুণের উপাসক। তাঁহার গানের ভিতর দাস্যভাবেরই ছায়া স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। প্রত্যূষে ঠাকুরকে ঘুম হইতে উঠান, স্নান করান, পূজা ও নৈবেদ্য অর্পণ, চামর ব্যজন, শয়ন করান প্রভৃতি সেবাই ছিল তাঁহার গানের প্রাণ। তিনি অবশ্য সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভগবান বিনা অন্য কিছুই জানিতেন না। কেহ ভগবদ্ভাবরহিত প্রসঙ্গ কিংবা গান করিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। একবার তাঁহার একজন ছাত্র যখন একটী আদিরসাত্মক গান করিতেছিল তখন ত্যাগরাজ তাহাকে সেই স্থান হইতে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার মতে যে স্থান শ্রীরামের নিবাস, সেই স্থানকে ঐরূপ ভগবদ্‌ভাববিবর্জ্জিত গান দ্বারা অপবিত্র করিয়া তোলা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তখন তাঁহার পত্নী হস্তক্ষেপ করিয়া ত্যাগরাজকে শান্ত করেন। তিনি স্বামীকে বুঝাইলেন, "গায়ক নিতান্ত ছেলে মানুষ। আপনার মত সাধুপুরুষের সঙ্গ যখন পাইয়াছে, একটু বুঝাইয়া দিলে সে নিজেকে শুধরাইয়া নিতে পারিবে।" ত্যাগরাজ এই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজের ক্রোধের জন্য অনুতপ্ত হন এবং একটী গান রচনা করেন।

ত্যাগরাজ কি ভাবে দিন যাপন করিতেন তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। তিনি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমে কাবেরীতে স্নান করিতেন, পরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে আহ্নিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। অনন্তর শ্রীরামের পূজায় নিযুক্ত হইতেন এবং ঠাকুরকে গান গাহিয়া শুনাইতেন। এই প্রকারে দ্বিপ্রহর হইলে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া ছাত্রগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ছাত্রগণকে গান শিক্ষা দিতে রত হইতেন। যিনি যে স্তরের লোক তাঁহাকে তদনুরূপ সঙ্গীত শিক্ষা দান ছিল ত্যাগরাজের বৈশিষ্ট্য। তিনি কোন দিন কোন ছাত্রকে বলিতেন না, "এই গান তুমি শিখিতে পারিবে না।"

একাদশীর উপবাসব্রত তিনি আজীবন পালন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তাহে মাত্র দুই বার গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। সেই সময় তিনি যে সব গান গাহিতেন তাহা ছিল শুনিবার মত। ছাত্রগণও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেন। লব্ধ ভিক্ষা দ্বারা তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, ছাত্রদের পোষণ ও সংসার পালন করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ধন-মান-যশোলাভের জন্য গান গাহিতেন না কিংবা মানুষের মুখ দেখিয়াও গাহিতেন না। কেবলমাত্র শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার শ্রোতা। যত বড় লোকই হউন না কেন, কিংবা রাজা-মহারাজাই হউন, তাঁহার পক্ষে ত্যাগরাজের গান শুনিবার একমাত্র উপায় ছিল ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া ত্যাগরাজ যখন ভাবে মত্ত হইয়া গাহিতেন তখন শুনিয়া পরিতৃপ্ত হওয়া। তিনি একমাত্র নিজের ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নাম গুণ গান গাহিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না—এই দিব্য নাম গানের পূর্ব্ব গায়ক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের পদাবলীকেও ভক্তির সহিত গাহিয়া সেই বাণীকে পুনরায় অমর করিয়া তুলিতেন।

ত্যাগরাজ ভাবসমাধিতে তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যাইতেন। দিনের ভিতরে কোন সময়ে এই অবস্থা ঘটে, নিরন্তর সঙ্গে থাকায় ত্যাজরাজের ছাত্রদের তাহা জানা ছিল। সেই সময়ে নাকি তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া যাইত। সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণ আশু প্রবাহিত সেই গানের সুর ও কথা লিখিয়া নিতেন। পরে পরস্পর সেই গানের তুলনামূলক আলোচনা ও পাঠ নির্দ্ধারণ করিয়া আচার্য্যকে দেখাইতেন। তাঁহার অনুমোদন পাইবার পর তাঁহার মুখ হইতেই আবার শিখিয়া লইতেন।

তাঞ্জোরের মহারাজা স্বরভোজের সভায় তিনশতাধিক সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত থাকিতেন। প্রত্যেককেই পর্য্যায়ক্রমে বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র গান গাহিতে হইত। এত অধিকসংখ্যক গায়ক থাকার জন্য প্রত্যেকেই নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র সুযোগ পাইতেন। এই গায়কবৃন্দের মস্তকমণি ছিলেন শুণ্ঠি বেঙ্কটসুবায়া। ইনি ত্যাগরাজের সঙ্গীতবিদ্যার গুরু শোন্টি বেঙ্কটরমনৈয়ার পিতা। একদিন বেঙ্কটরমনৈয়া আপন পিতাকে ত্যাগরাজের গান শুনাইতে ইচ্ছুক হইয়া স্বগ্রাম তিরোয়ায্যোর হইতে তাঁহাকে তাঞ্জোরে অবস্থিত পিতৃগৃহে লইয়া যান। তখন রাজপ্রাসাদে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে বহু গায়কের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই এইগৃহে উপস্থিত ছিলেন। পুত্রের আগমনের কারণ শুনিয়া বেঙ্কটসুবায়া ত্যাগরাজকে গান গাহিতে বলেন। সম্ভবতঃ পণ্ডিতেরা সকলে সেই গন্ধর্ব্ববিনিন্দিত সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া এমন ভাবে দেশ কালের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন যে রাজসভায় যাইবার সময় অতীত হইয়া গেল।

সময়ক্ষেপের কারণ শুনিয়া রাজা ভাবিলেন, যে গান শুনিয়া ওস্তাদ গায়কগণও আত্মবিস্মৃত

হইয়াছিলেন তাহা অবশ্যই শুনিতে হইবে। কিন্তু যখন জানিলেন ত্যাগরাজ অত্যন্ত ত্যাগী ব্যক্তি এবং রাজসভায় ধনের জন্য গাহিতে আসিবেন না, তখন তাঁহাকে যে কোন প্রকারে আনিতে তিনি একজন লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ত্যাগরাজ আসিলেন না। এদিকে রাজাও ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি অবশেষে ত্যাগরাজকে জোর করিয়া আনিবার জন্য কতকগুলি গুণ্ডা নিযুক্ত করিলেন। তাহাতেও হইল না, অধিকন্তু ভাগবত অপচারের অপরাধে মহারাজা শূলব্যাধিগ্রস্ত হইলেন এবং শেষে নিজের ভুল বুঝিয়া ত্যাগরাজের পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন ও রোগমুক্ত হইলেন। এই ঘটনার পরে মহারাজ স্বরভোজ বহুবার প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া ত্যাগরাজের সঙ্গীতসুধা পান করিতেন। ত্যাগরাজের হস্তে কিছু দেওয়ার লোভ তাঁহাকে পাইয়া বসিল। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? একদিন তিনি জানিতে পারিলেন ত্যাগরাজের একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করিবার প্রয়োজন আছে। তাহা করিয়া দিতে মহারাজ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ত্যাগরাজের ছাত্রগণও এমন ত্যাগী ছিলেন যে তাঁহারা রাজার সঙ্কল্প জানিয়া তাহা হইতে দিলেন না। পরে যখন ত্যাগরাজ কোন এক কাজে দিন কয়েকের জন্য গ্রামান্তরে গেলেন তখন তাঁহার একজন ছাত্র এই ঘরটি নির্মাণ করিয়া রাখেন। এই ছাত্রের নাম ছিল অভ্লাজিপেট বেঙ্কটরমনৈয়া। তিনি স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে গণপতি নামে অভিহিত করিতেন। ত্যাগরাজ ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন।

গণপতি জাতিতে তাঁতি ছিলেন, বস্ত্রবিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতেন। তিনি সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রাণে সঙ্গীতশিক্ষার ইচ্ছা খুব বলবতী ছিল। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগরাজের সেবা করিয়া যাইতেন। ভজনে যোগ দান করা, পুষ্পফলাদি সংগ্রহ করা ও ত্যাগরাজকে প্রণাম করা ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম। তিনি কোন কথা বলিতেন না; একদিন ত্যাগরাজ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার কামনা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন।

কথিত আছে যে একবার ত্যাগরাজ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাহা জানিয়া একজন দরিদ্র কৃষক আপন ক্ষেত্রস্থিত দশটি কুমড়া পাঠাইতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। পাছে সেই ব্যক্তি নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এই ভয়ে গণপতি নিজেই তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া এক সঙ্গে দশটি কুমড়া নিজে বহন করিয়া আনিলেন এবং তজ্জনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে মূর্চ্ছা যাইলেন। ত্যাগরাজের ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি এত ভক্তিমান ছিলেন!

ত্যাগরাজ ৮৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে ৩৮ বৎসর অর্থাৎ শ্রীরামের দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার দিন দুঃখে কষ্টেই কাটিত। একদিকে দারিদ্র্য-দুঃখ, অপরদিকে ভ্রাতৃদ্বয়ের যথেচ্ছাচার! কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনের পর তাঁহার কীর্ত্তি সমগ্র দক্ষিণভারতে ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় রাজা-মহারাজগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ত্যাগরাজ কিংবা তাঁহার ছাত্রগণ সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত মুষ্টি ভিক্ষাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্তি বোধ করিতেন। উপরোক্ত তাঞ্জোরের রাজা একবার তিরুবায়ু গ্রামের কোন ব্রাহ্মণের হাতে বহু স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "আপনি ত্যাগরাজকে ভিক্ষা দেওয়ার সময়ে চাউলের সঙ্গে মিশাইয়া এই মুদ্রাও ছাড়িয়া দিবেন। ত্যাগরাজ তো জানিয়া শুনিয়া রাজপ্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিবেন না। এইরূপে যদি আমার অর্থের কিছু অংশ তাঁহার ইষ্ট রামচন্দ্রের সেবায় লাগে তাহা হইলে আমার প্রাণে আনন্দ

হইবে।" কিন্তু ত্যাগরাজ চাউলের সঙ্গে সুবর্ণ মুদ্রা দেখিয়া অর্থসংযোগ-দোষে দুষ্ট চাউল রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিলেন। কাঞ্চনত্যাগের প্রতি তাঁহার এমনই অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল!

তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সাতিতিরোর্নাল্ নিজে একজন গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বডিবেল নামক একজন বেহালাবাদন-পারদর্শী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। প্রসিদ্ধি আছে, তিনিই দাক্ষিণাত্যের প্রথম বেহালাবাদক। তাঁহার প্রতি মহারাজের এত অনুরাগ ছিল যে তিরুবেন্দ্রাম্ এর একটী প্রসিদ্ধ রাজপথ তাঁহারই নামে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে একটী দন্তনির্ম্মিত বেহালা উপহার দিয়াছিলেন। সাতিতিরোর্ণাল্ ত্যাগরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবার জন্য উক্ত বডিবেলকে পাঠাইয়াছিলেন। ত্যাগরাজ যশস্বী বডিবেলকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত আলাপাদি করিলেন কিন্তু সঙ্গে যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি একটী গান গাহিয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করতঃ যাইবার প্রস্তাবকে বাতিল করিলেন। সাতিতিরোর্নালকে সেই গান বডিবেলের মুখে শুনিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইল।

গোবিন্দ মারার্ নামক আর একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত রামমঙ্গল গ্রামে বাস করিতেন। তিনি ত্যাগরাজকে গান শুনাইবার মানসে তিরোবায়ুরে আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেইদিন ছিল একাদশী; ত্যাগরাজ তখন বিশেষভাবে ধ্যানে তন্ময় ছিলেন। আগন্তুককে যখন গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল তখন রাত্রি ১১টা। গোবিন্দ মারার্ নিজের সপ্ততন্ত্রী তানপুরা বাহির করিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত নীলাম্বরী রাগিণীর আলাপন করিলেন। সেই তন্ত্রীর ধ্বনিতে ত্যাগরাজের পূজাগৃহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই গান অবিরাম ভাবে সকাল ৬টা পর্য্যন্ত চলিল। ত্যাগরাজ অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজে একটী গান গাহিয়া গোবিন্দ মারারকে প্রণাম করিলেন। তখন ত্যাগরাজের বয়স ছিল ৭৯ বৎসর। কাশী হইতে গণেশগিরি ভাবে নামক একজন হিন্দুস্থানী গায়কও ত্যাগরাজের কীর্ত্তির কথা শুনিয়া তিরোবায়োর গ্রামে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্যামাশাস্ত্রী এবং ত্যাগরাজের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য ছিল। শুনা যায় জপ্যেশ নাকি কনিষ্ঠের পাগলামীতে ক্রুদ্ধ হইয়া একদিন তাঁহার পূজা শ্রীবিগ্রহকে কাবেরী নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ত্যাগরাজ পরে সেই শ্রীবিগ্রহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন সেই শ্রীমূর্ত্তি রবাহপ্পান্যরা নামক একজন ব্রাহ্মণের গৃহে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি উক্ত বিগ্রহের সেবায় দেবোত্তর করিয়া দিয়াছেন।

ত্যাগরাজ জীবনে মাত্র একবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। উত্তরে তিরুপতি ও দক্ষিণে রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া সকল দেবদেবীকে দর্শন করিয়াছিলেন। ত্যাগরাজের অনেক প্রসিদ্ধ পদাবলী এই সময়ে রচিত হয়। তিনি মান্দ্রাজ শহরে বর্ত্তমান বন্দর ষ্ট্রীটস্থ ৫নং বাটীতে সুন্দরেশ-মুদালিয়ারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ত্যাগরাজের এই তীর্থপর্য্যটন সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। সর্ব্বত্রই তাঁহার ভক্ত ও গায়কগণের সমাগমে তীর্থযাত্রা আনন্দের সহিত সমাপ্ত হয়।

স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১৮৪৭ সালে ত্যাগরাজ একাদশী তিথিতে আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে পরিচিত সকলকে ভজনগান শুনাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

শুনা যায়, ভজন গাহিতে গাহিতে তাঁহার দেহাবসান হয় এবং একটী জ্যোতি তদর্চ্চিত শ্রীবিগ্রহে লীন হইয়া যায়।

কথিত আছে, বাল্মীকি রামায়ণের সংখ্যার অনুপাতে ত্যাগরাজ স্বামীও ২৪ হাজার পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৪৮ সালে তাঁহার তিরোধান শতবার্ষিকী উপলক্ষ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এবং কাঞ্চিকামকোটী শঙ্করাচার্য্যের ভূমিকা সহ যে সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ৬৬২ পদের অধিক পাওয়া যায় না। ত্যাগরাজের প্রত্যেকটি গানের সম্বন্ধে কোন না কোন কাহিনী পাওয়া যায়। আনন্দের বিষয় এই, এখনও দাক্ষিণাত্যের গায়কসম্প্রদায় ত্যাগরাজের মহাসমাধিকে উপলক্ষ করিয়া প্রতি বৎসরই একদিন তিরুবায়োর গ্রামে সমবেত হন এবং নিজ নিজ সঙ্গীতের নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন।

শ্রীত্যাগরাজ স্বামীর পদাবলীতে কথার চেয়ে সুরেরই বিকাশ বেশী। তিনি নাট, গৌর, আরভিভৈরবী ইত্যাদি বহু রাগ-রাগিণী অবলম্বন করিয়া অনেক গান রচনা করেন। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের মত প্রসিদ্ধ কলাবিদ্—যাঁহার হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক উভয়বিধ সঙ্গীতের সহিতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে,—তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিলে সকলেই উপকৃত হইবে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের সম্পাদক শ্রীরামানুজাচার্য্য ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অনুবাদক শ্রীবেদোরোঘাড়ী কৃষ্ণারাও উভয়ে মিলিয়া ইংরেজীতে ত্যাগরাজ স্বামীর পদাবলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আছেন। আশাকরি এই গ্রন্থ আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

কথা কও

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

আমায় কইতে যদি
চাও গো কথা
কাছে এসে কও।
আমার হৃদয় মাঝে
থেকেও কেন
তুমি দূরে রও?

গাইতে চাই তোমার গান
ভাঙা বীণায় ধরে না তান
ছেঁড়া তারে এবার তুমি
সুর দিয়ে লও—
হিয়া মাঝে থেকে
মিছে কেন দূরে রও?

যেই গানে কেড় নেবে
তোমার পরাণ খানি
সেই গান অন্তর্য্যামী!
আমি কি কভু জানি?
সেই গানের তান তুমি
এবার দিয়ে লও—
এমনি কেন ফাঁকি দিয়ে
দূরে দূরে রও?

আত্মানাত্মবিবেক

ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, এম-বি

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১০।২০)। তিনিই জীবের আত্মা। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "মানুষ আপনাকে চিনলে ভগবানকে বুঝতে পারে। আমি কি হাড় না চামড়া ? সব বাদ দিতে দিতে যা থাকে তাই তিনি।" আত্মা নিত্য বস্তু; আর যা সব নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, তাই অনিত্য অনাত্ম বস্তু। সেই জন্য গীতায় ভগবান বলেছেন, এই দেহাদি সব অনাত্ম পদার্থ—ক্ষেত্র এবং ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রকে ঠাকুর বলেছেন, "কাঁচা আমি" যে 'আমি' মনে করে—'আমি দেহবান মানুষ, কর্ত্তা ভোক্তা।' কিন্তু আত্মা আছে বলেই দেহ-যন্ত্র চলছে, যেমন ঘড়ির স্প্রিং আছে বলেই ঘড়ি চলে। সব ঘড়ির আলাদা আলাদা স্প্রিং। এক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সব বৈদ্যুতিক ঘড়ি চলছে। শুধু ঘড়ি কেন শহরের যত পাখা, কারখানা, আলো সব চলছে। তেমনি পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগৎ ভগবানের শক্তিতে চলছে। জীবাত্মা যেমন ব্যষ্টি শরীর চালান, পরমাত্মা তেমন সমষ্টি জগৎ-চক্র চালান। এই জন্য ঠাকুর বলতেন, "তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।" "মানুষগুলি যেন নাচের পুতুল, তিনিই সকলকে চালাচ্ছেন।" "নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।" ভক্তরাজ মহাবীর বলতেন, 'দেহ-বুদ্ধ্যা দাসোঽহং জীববুদ্ধ্যা তদংশকঃ।' আভাসবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ যে ভাবেই ধরা যাক 'আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহম্।' পরমহংসদেবও বাহ্য অবস্থায় মার সন্তান ভাবে থাকতেন, অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় মার সঙ্গে কথা কইতেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আত্মারাম হয়ে অবস্থান করতেন। ঠাকুর বলতেন, "বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন, তন্ত্রে তাঁকেই কালী বলে, আবার পুরাণে ভগবান বলে।" এ বিষয়টা আরো ভালো করে বোঝাবার জন্য গান ধরতেন "কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।" আবার বলতেন, "সাপের মুখে বিষ আছে তাতে সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়ায় সে মরে।" অর্থাৎ ভগবানে মায়া আছে বটে কিন্তু তিনি মায়াধীশ। মায়া তাঁর অধীন। আমরা মায়ার অধীন। তাই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করছি। এ মায়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে? শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ঠাকুর বলেছেন, "আমাকে বকলমা দে। ভাবের ঘরে চুরি না থাকে!" গল্পে আছে—'হরিও বলবো এবং কাপড়ও তুলবো' তা হলে হবে না। দ্রৌপদী যখন দুহাত তুলে শরণাগত হলেন শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্ররূপে তাঁর লজ্জা নিবারণ করলেন।

আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত সতত বদলে যাচ্ছে। তবুও ছেলে বেলা থেকে কেউ ডাকলে 'আমি' বলে উত্তর দিচ্ছি। শৈশবে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সেই একই আমি। 'আমি' দেহেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির নই। কারণ এগুলি বদলাচ্ছে, কিন্তু 'আমি' অপরিবর্ত্তনীয়।

মানুষের চৈতন্য না থাকলে তাকে ডাকলেও সাড়া দেয় না। ডাক্তাররা অজ্ঞান করে তার

দেহে অস্ত্রোপচার করেন, সে টেরও পায় না। টের যেটা পাওয়া যায় সেইটেই মনে থাকে। সুষুপ্তিতে আমরা অজ্ঞান থাকলেও জেগে বলি বড় 'আরামে ছিলাম'। সুষুপ্তির আরাম আমরা অনুভব করি। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা জগতের যে সব বিষয়-বস্তু দেখি বা শুনি, তাতে ইন্দ্রিয়, মনও বুদ্ধির সঙ্গে সূর্য্য বা চন্দ্র কিরণ অর্থাৎ কোন প্রকার আলো বা শব্দের দরকার হয়। মন ইন্দ্রিয়কে সাহায্য না করলে দেখা বা শোনা যায় না। সেই জন্য অন্যমনস্ক থাকলে দেখতে বা শুনতে পারে না। এই জন্য বলে সূর্য্য দেবতা অনুগ্রহ না করলে দেখা যায় না। এখানে সূর্য্য মানে সূর্য্যের আলো। শোনা সম্বন্ধেও বলে দিক দেবতার অনুগ্রহে শোনা যায়। অর্থাৎ আকাশপথে একটা না একটা দিক থেকে শব্দ শোনা যায়। এ সব ছাড়াও দরকার হয় 'চৈতন্য'। সেই চৈতন্য অনুভব করবার জন্য আর কিছু দরকার হয় না। তাই শাস্ত্র বলেন, "সে চৈতন্য অপরোক্ষ, ব্যবধানশূন্য, স্বয়ংপ্রকাশ।" তাঁকে বোঝাবার জন্য বা প্রকাশ করবার জন্য কোন জিনিষের সাহায্য নেবার দরকার হয় না। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করি তার জন্য চৈতন্যের দরকার। কিন্তু ঐ চৈতন্য আপনা আপনি অনুভূত হয় বলে তাকে স্বানুভূতিও বলে। শাস্ত্রে অপর অপর শব্দের দ্বারাও এর নির্দ্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন শুদ্ধ জ্ঞান। বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানকে শুদ্ধ জ্ঞান বলা এইজন্য যায় না যে সেই জ্ঞানের জন্য অনেকগুলি উপকরণ দরকার হয়। তাদের নাম 'করণ'। সেই সব করণের দোষে বস্তুজ্ঞান ঠিক ঠিক না হয়ে ভুলও হয়। একে "প্রজ্ঞান" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়। কারণ 'জ্ঞান' শব্দটি একটু গোলমেলে। বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। যাতে সেই গোল না হয় তাই বলা হয় শুদ্ধজ্ঞান। তাতেও সকলের সঠিক ধারণা হয়না বলে বলা হয় 'প্রজ্ঞান'।

শাস্ত্রে চারটি ঈশ্বরবোধক মহাবাক্য আছে। যথা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তৎ ত্বমসি"। যে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য-সাগরে জগৎ বুদ্‌বুদের মতন ভাসছে—মহাসাগরে যেমন ফেন বুদ্‌বুদ তরঙ্গ, বরফের চাঁই ভাসে—সেই চৈতন্যই প্রজ্ঞান। জলে যা-কিছু ভাসছে জল অবলম্বন করেই ভাসছে। ঐ প্রজ্ঞান অবলম্বন করে আমরা সকল বস্তু অনুভব করি।

'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' মানে আমার আমিত্ব যে প্রজ্ঞান বা চৈতন্যের উপর নির্ভর করছে সেই আত্মা ব্রহ্ম। এটা যদি কেউ মনে করেন যে হাত-পা-ওয়ালা মানুষটা ব্রহ্ম তিনি মহাভুল করবেন। সাদা কথায় ভগবানই আমাদের আত্মা এবং সেই ভগবান ও ব্রহ্ম একই জিনিষ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (১৪-২৭)। ঠাকুর বলেছেন, "আমিই কৃষ্ণ আমিই রাম।" এর মানে হাত-পাওয়ালা মানুষটা রাম বা কৃষ্ণ নন। সেটা বোঝাবার জন্য বলেছেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এই খোলটার মধ্যে আছেন।"

অবতারের দেহ সাধারণ মানুষের দেহের মতন নয়। সে চিন্ময় দেহ। নিদ্রিতাবস্থাতেও তাতে চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় গায়ে টাকা ছোঁয়ালে ঠাকুরের শরীর কুঁকড়ে যেত এবং দমবন্ধ হ'ত। মণি মল্লিকের বাগান থেকে আফিং আনবার সময় পথ দেখতে পান নি। একবার "মা" কাপড়ের খুঁটে নহবৎ থেকে দুটি মসলা বেঁধে দিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজের ঘরের দিকে না যেয়ে গঙ্গার ধারে যেয়ে বলছেন "মা, ডুবি? মা, ডুবি?" মা হৃদয়কে ডেকে বলায় হৃদয় হাতে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। ওঁদের দেহের খবর সব সময় থাকে না।

আমাদের ঠিক উল্টো। দেহ ছাড়া যে আত্মা এর ভেতর আছে, সেটার ধারণা সহজে করতে পারি না। কিন্তু গীতায় বলেছেন "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" ঠাকুরও বলেছেন, "মা ইচ্ছা করলে ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।" বাঁধেন ও তিনি এবং খোলেনও তিনি। তিনি ছাড়া যে আর কেউ নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঠাকুর বলছেন "যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যেমন মণি আর তার জ্যোতি। জ্যোতি বাদ দিয়ে মণি ভাবা যায় না। মণি ভাবলেই জ্যোতির বোধ আপনি আসে।" তবে সমাধিতে যখন দেহজ্ঞানের সঙ্গে জগৎজ্ঞান লোপ পায় তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হলে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু থাকে না। সেই অবস্থায় ঠাকুরের দেহ জ্বলন্ত গুলে পুড়ে গেলেও তাঁর হুঁশ নেই। বলতেন "সমাধি থেকে ১০০ হাত নেমে এলে তখন বলা কওয়া চলে।" "আমার স্বাভাবিক গতি অখণ্ডের দিকে। তোদের জন্য মনকে নামিয়ে রাখি।" একেই বলে অহেতুক কৃপা। অহেতুকী ভক্তি না হলে অহেতুকী কৃপা লাভ হয় না।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" মানেও এই দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধিরূপী সংঘাতটা বাদ দিয়ে যেটা আমার আসল "আমি" বা "পাকা আমি"—সেইটাই ব্রহ্মবস্তু।

ঠাকুর বলতেন "তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন" "যেমন বহুরূপী নানা রকম সাজ করে তেমনি।" "আমি দেখছি সচ্চিদানন্দই এক একটা চামড়ার খোল পরে মাথা নাড়ছেন।" ইহাই বিজ্ঞানীর অবস্থা। গীতায় বলেছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

এখন "তত্ত্বমসি" সম্বন্ধে আলোচনা। এটি ছান্দোগ্য উপনিষদের মহাবাক্য। এখানে হাত-পা-ওয়ালা তুমি ব্রহ্ম নয়। সর্ব্ব উপাধি বাদ দিলে যে নিরুপাধিক আত্মা থাকেন তিনি ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নন।

সব মহাবাক্যের এক অর্থ। অর্থাৎ যে ভগবান তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনিই ব্রহ্ম। একথা খুব সহজে বোঝা যায়। কোন তর্ক ওঠে না। সেই ব্রহ্ম তোমার ভেতরে ও বাইরে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত ভাবে আছেন, তাঁকেই বলে ভূমা। ব্রহ্ম মানে বৃহৎ। ভূমা মানে বহু।

এটি শুধু শুনলে হবে না। বিচার করে বুঝতে হবে। না বুঝলে ত পাকা বিশ্বাস হয় না। শালিখ পাখিকে হাজার কেষ্টবুলি শেখাও বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি! বিশ্বাস যাতে পাকা হয় সে জন্য উপাসনা-প্রার্থনা দরকার। সে প্রার্থনা দরদ দিয়ে কাতর ভাবে মরমের অন্তঃস্থল থেকে হওয়া চাই। আর সেটা একবার করলাম আবার ছেড়ে দিয়ে সংসারের সব কিছুরই সঙ্গে রইলাম তাতে হবে না। দিবা নিশি থানিকটা মন ঐ চিন্তায় লাগিয়ে রাখতে হবে। শাস্ত্রে একে বলে নিদিধ্যাসন। ঠাকুর উপমা দিতেন প্রতিমার কাছে প্রদীপ। সেটা পাছে নিভে যায় তাই হাঁড়ির ভেতর রাখে। সে প্রদীপ ত দেহহাঁড়িতে সদাই জ্বলছে তাই বেঁচে আছি। এইটি পাকা করতে পারলে বৈরাগ্য আপনি আসে। বিবেক হলে বৈরাগ্য হয়।

শ্রীসম্পদকুমার

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

মেলকোট মহীশূর শহর হইতে ত্রিশমাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহের অন্যতম। ইহার অন্য নাম যাদুগিরি বা নারায়ণপুরম্। চারি যুগে ইহার চারিটী নাম আছে। ইহা সত্যযুগে নারায়ণাদ্রি, ত্রেতাযুগে বেদাদ্রি, দ্বাপরযুগে যাদবাদ্রি এবং কলিযুগে যতিশৈল বলিয়া খ্যাত।

এই স্থানে আচার্য্য রামানুজ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে মহালক্ষ্মীর পূজার ব্যবস্থা করেন। এখানে রামানুজের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। আচার্য্যের জীবদ্দশায় তাঁহার যে তিনটী প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা তাহাদের অন্যতম। আর একটী কাঞ্জিভরমে ও অপরটি শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের নিকটে একটী সরোবর আছে। উহাকে "বেদপুষ্করিণী" বলে। অদূরে নৃসিংহদেবের ও বিবি নাচায়ারের মন্দির অবস্থিত। এ স্থানের স্থলবৃক্ষের নাম বদরীবৃক্ষ। আচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যতিরাজ মঠ এখনও বিদ্যমান। কয়েকটী বৌদ্ধ গুহাও দৃষ্ট হয়। সাধারণ উৎসবে রাজমোড়ি (মহীশূরের রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মুকুট) সহ ভগবান শ্রীসম্পদ-কুমারের শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। বৎসরে একদিন দোলপূর্ণিমায় শ্রীভগবানের বৈরবমোড়ি (বহুমূল্য রত্নমণ্ডিত মুকুট) সহ শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই উৎসবের নাম বৈরবমোড়ি উৎসব। এই উৎসব তিন দিন ব্যাপী হয়। কিন্তু বৈরব-মোড়ি একদিনই বাহির হয়। মহীশূর শহর হইতে শোভাযাত্রা সহ ইহাকে আনা হয়। রাস্তার মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা ইহার পূজা ও আরতি করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, কয়েকজন রাজার সাহায্যে কয়েক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে এই বৈরবমোড়ি নির্ম্মিত হয়।

মুসলমান রাজত্বে এই স্থানের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হয়। এই সময় পূজারীগণ তাহাদের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মন্দির হইতে মূল বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করেন। নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে মাটির নীচে বিগ্রহকে পুতিয়া রাখিয়া দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে বিগ্রহকে এবং নিজেদের জীবন রক্ষা করেন। অত্যাচারি-গণ মন্দির আক্রমণ করিয়া ধনরত্নাদি অপহরণ করে এবং মন্দিরটিকে ধ্বংস করিয়া উৎসব-বিগ্রহসহ দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়া যায়। সেই সময় তাহারা ভারতের অনেক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া বহু ধন রত্ন ও বিগ্রহাদি লুণ্ঠন করিয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে এই যাদুগিরি ঘোরতর জঙ্গলে পরিণত হয়। এদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে হিন্দুধর্ম্মের কীর্ত্তি সকল ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিল।

১০৯০ খৃষ্টাব্দে বিঠ্ঠলদেব নামে জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সেই সময় আচার্য্য রামানুজ সশিষ্য দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন রাজা আচার্য্যের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজসভায় বৌদ্ধপণ্ডিতগণের বিচার হইল। পণ্ডিতগণ বিচারে পরাজিত হইয়া

অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে রাজাও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। অবশিষ্ট বৌদ্ধপণ্ডিতগণ স্থানান্তরে গমন করেন। সেই সময় আচার্য্য রামানুজ অশীতি বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজা বিঠ্‌ঠলদেব বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে অভিহিত হন।

একদিন স্বয়ং নারায়ণ আচার্য্যকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আজ কতকাল যাবৎ নিকট-বর্ত্তী যাদুগিরির জঙ্গলে বল্লীস্তূপের নীচে আছি। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া পূজার ব্যবস্থা কর। এই স্থানে আসিতে হইলে প্রথমেই একটি সরোবর দেখিতে পাইবে। সেই সরোবরের জলেই আমার অভিষেক হইত।" এই স্বপ্নবার্ত্তা আচার্য্য রাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রাজা তাঁহার সৈন্যগণকে আচার্য্যের পথ অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ আচার্য্যের আদেশানুসারে পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পথ তৈয়ার করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন পথ চলার পর স্বপ্নাদিষ্ট সরোবর দৃষ্ট হইল। এই সরোবরের নাম "বেদ-পুষ্করিণী"। আচায্য এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলেন। তথা হইতে কোন্‌দিকে শ্রীভগবান অবস্থান করিতেছেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আবার স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন "এই সরোবর হইতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে কিছুদূরে কল্যাণী নামে আর একটি সরোবর দেখিতে পাইবে। তাহার উত্তরপশ্চিম কোণে শ্বেত মৃত্তিকা আছে। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে চম্পক ও বকুল নামে দুইটি বৃক্ষ আছে। ঐ দুই বৃক্ষের মাঝে বল্লীস্তূপের ভিতরে আমি অবস্থিত।" পরদিন আচার্য্য স্বপ্নাদেশানুযায়ী সরোবর হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর কল্যাণী সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহার উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্বেত মৃত্তিকা লাভে সকলেই আনন্দিত হইলেন। কারণ পূর্ব্বদিনই তাঁহাদের নাম-তিলক করিবার শ্বেত মৃত্তিকা ফুরাইয়া যাওয়ায় পরদিন কি উপায়ে নাম-তিলক করিবেন ইহা ভাবিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সরোবরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে উপস্থিত হইলেন এবং স্বপ্নাদেশানুযায়ী চম্পক ও বকুল বৃক্ষের মাঝে বল্লীস্তূপের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাইলেন। বিগ্রহকে উদ্ধার করিয়া তাঁহারা পাহাড়ীদের (প্যারেয়াদের) সাহায্যে তথায় পর্ণ কুটির নির্ম্মাণ করিয়া পূজার ব্যবস্থাদি করেন। পরে আচার্য্যের আদেশে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীভগবানের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদির সুব্যবস্থা করিলেন। এই কার্য্যে প্যারেয়াগণ আচার্য্যকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের কৃপা করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা 'পঞ্চমা' নামে অভিহিত। মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া তাহারা বৎসরে তিনদিন উৎসবের সময় বেদ-পুষ্করিণীতে স্নান ও শ্রীভগবানের দর্শনের অধিকার পাইয়া আসিতেছে। পাহাড়ীদের মধ্যে কেহ কেহ আচার্য্যকে বলিয়াছিল যে "বাল্যাবস্থায় তাহারা পিতামহদের নিকট শুনিয়াছিল যে পুরাকালে সেই স্থানে যাদবাদ্রির পূজা হইত। মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে পূজারীরা বিগ্রহকে ঘোর জঙ্গলের ভিতর মাটীতে পুতিয়া পলায়ন করিয়া নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের বিশ্বাস এই সেই বিগ্রহ। তিনিই সেই পবিত্র যাদবাদ্রি-পতি পরমেশ্বর। তাঁহারই নামে দ্বাপর যুগে এই পাহাড়ের নাম যাদবাদ্রি বা যাদবগিরি হইয়াছে।" কিছুদিন শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনার পর একদিন নারায়ণ আচার্য্যদেবকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন,

"আমার এই মূর্ত্তি 'মূল বিগ্রহ'। আমি কখনও বাহিরে গমন করি না। ভক্তদের দর্শন দিয়া তাহাদের পবিত্র করিবার জন্য আমি বৎসরে দুই তিনবার মাত্র বাহিরে যাইয়া থাকি। সেই মূর্ত্তি আমার 'উৎসব-বিগ্রহ'। উহা দিল্লীতে সুলতানের প্রাসাদে আছে। এই মূর্ত্তিটি পঞ্চধাতু নির্ম্মিত এবং রাম-প্রিয়া নামে অভিহিত হয়। উহাকে আনিতে পারিলে তবে আমার কার্য্যের সমাধান হইবে।" দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী বিগ্রহ আছে। একটি মূলবিগ্রহ, তাঁহার নিত্য পূজার্চ্চনা গর্ভ মন্দিরে হইয়া থাকে, আর দ্বিতীয়টি উৎসব বিগ্রহ—উৎসবের দিনে তাঁহাকে শোভা-যাত্রা সহ বাহির করা হয়।

আচার্য্য রামানুজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উৎসব-বিগ্রহের অনুসন্ধানে সশিষ্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীর সুলতান তুর্ক ইস্মাতুরায়ারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রামপ্রিয়ার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। সুলতান তাঁহার দিব্য কান্তিতে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ মিষ্ট ভাষায় মুগ্ধ হইয়া যে স্থানে অপহৃত মূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে সেই স্থানে প্রবেশের এবং যাঁহার অনুসন্ধানে তিনি আসিয়াছেন তাঁহাকে লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তবিগ্রহের কোনই সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। নারায়ণ আবার তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "উক্তবিগ্রহ অন্দরমহলে সুলতানের কন্যা বিবি লচিমারের সহিত দিবা রাত্রি খেলা করিতেছেন।" আচার্য্য সুলতানকে এই স্বপ্নাদিষ্ট ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আচার্য্য লচিমারের ঘরের দরজায় উপস্থিত হইয়া নিজ অভীষ্ট দেবতাকে ভক্তিভাবে ডাকিতে লাগিলেন,—"প্রভো, তুমি কোথায় আছ দয়া করিয়া আমায় দেখা দাও।" লচিমার দেখিলেন তাঁহার নিত্য খেলার সাথী—যাঁহাকে তিনি পতিরূপে বরণ করিয়াছেন—তিনি গৃহাভ্যন্তরস্থিত স্বর্ণপালঙ্কের উপর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়া গৃহদ্বারাভিমুখে যাইতেছেন। আচার্য্য দেখিলেন, একটি ছোট ছেলে বাৎসল্য ভাবে হাসিমুখে নিজ সকাশে আসিল। ইহাই সেই অভীষ্ট দেবতা বুঝিতে পারিয়া তিনি ছেলেটিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিগ্রহের মধুর বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "সম্পদকুমার" নামে অভিহিত করিলেন। সেই সময় হইতে রামপ্রিয়ার নাম সম্পদকুমার হইল। অদ্যাবধি এই নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত।

সুলতানের আদেশে আচার্য্য শিষ্যসহ বিগ্রহকে মেলকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লচিমার তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে না পাইয়া পিতার নিকট গুপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পিতা বলিলেন, "ঐ মূর্ত্তি জনৈক ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া সুলতান-কন্যা অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিলেন, "ইঁহাকে ছাড়া কিভাবে জীবন ধারণ করিব?" কন্যার কাতরভাব দেখিয়া সুলতান বিগ্রহের অনুসন্ধানে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং বিগ্রহকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। লচিমার পিতাকে বলিলেন, "আমিও তাঁহার অনুসন্ধানে যাইতেছি।" এই বলিয়া তাঁহার প্রিয়তমের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এদিকে কুবের নামে জনৈক সুলতান-পুত্র লচিমারের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবা ও যত্ন করিতেন। প্রণয়িনী পাগলিনী বেশে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তিনিও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিছুকাল পরে আচার্য্য বিগ্রহ সহ মেলকোটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বিবি লচিমার এই স্থানে

উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমের দর্শনে শান্তি লাভ করিলেন। ভক্তিমতী লচিমার যবন হইলেও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহের দর্শন লাভ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। 'ভক্তের কোন জাত নাই' বলিয়া আচার্য্য তাঁহাকে মন্দিরপ্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। লচিমার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পর্ণকুটিরে বাস করিয়া প্রিয়তমের দর্শন ও স্মরণ-মননে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কুবেরও তাঁহার প্রণয়িনীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রবাদ আছে, ভক্তিমতী লচিমার সম্পদকুমার বিগ্রহের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান উৎসব-বিগ্রহই সম্পদকুমার নামে অভিহিত। বৎসরে তিনবার তাঁহার শোভাযাত্রা হইয়া থাকে। অদ্যাবধি যাদবাদ্রিপতির মন্দিরের অনতিদূরে ভক্তিমতী সাধিকা লচিমারের সমাধি বিদ্যমান। তথায় নিত্যপূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। সাধিকা হিন্দুস্থানী ছিলেন বলিয়া রুটি ও ছোলাসিদ্ধ ভোগ নিবেদন করিবার বিধি আছে। এই লচিমার 'বিবি নাচায়ার' নামে অভিহিত।

এতাবৎকাল কুবের লচিমারকে স্বীয় প্রণয়িনী জ্ঞানে সেবাযত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কুবের নিজ যবনশরীর শুদ্ধীকরণার্থ শ্রীরঙ্গমে গমন করেন। তথায় মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। তিনি দূর হইতে শ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইতেন। সামান্য ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া অহর্নিশ শ্রীরঙ্গনাথের স্মরণ-মননে দিনযাপন করিতেন। একদিন তিনি গভীর ধ্যানযোগে দেখিলেন—শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমি এই স্থানে বৈষ্ণবদের মোক্ষ দানের জন্য বিরাজ করিতেছি। পুরুষোত্তমে (পুরীধামে) শ্রীজগন্নাথজী যবনদের উদ্ধারের জন্য বিরাজ করিতেছেন। তুমি তথায় যাও।" শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে কুবের পুরীধামে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুবের শ্রীভগবানের দর্শন লাভে নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। শ্রীজগন্নাথের কৃপায় তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল এবং সর্ব্বভূতে সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পাইলেন। একদা তিনি শ্রীভগবানকে নিবেদনার্থ রুটি প্রস্তুত করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটি কুকুর আসিয়া রুটি খণ্ড মুখে করিয়া পলায়ন করিল। ভক্তবীর ঘৃতপাত্র হস্তে কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভো, একটু অপেক্ষা করুন, শুষ্ক রুটিটি ঘৃতসিক্ত করিয়া দেই, নচেৎ আপনার আহারে কষ্ট হইবে!"

দিব্যজ্ঞান লাভে দেহাত্মবুদ্ধি ও জাতিভেদ কিছুই থাকে না। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের রূপ দর্শন হইয়া থাকে।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" গীতা ৬।২৯

ভক্তবীর কুবের যবন হইয়াও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফিরিয়ে পাওয়া

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

সযতনে যারে
রেখেছিনু ঘরে'
খুঁজে তারে নাহি পাই,

পেয়েছি ফিরিয়ে
শতগুণ ক'রে
যারে ভেবেছিনু নাই।

লিথোগ্রাফির জন্মকথা

সি হারকোর্ট রবার্টসন

একশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে য়্যালয়েজ সেনিফেলডার নামে ব্যাভেরিয়ার এক তরুণ নাট্যকার হাতের কাছে কোন কাজ না পেয়ে একটুকরো পাথরের ওপর তাঁর মার ধোপার হিসেব লিখে রাখলেন। পরে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে পাথরটি ভিজিয়ে এবং তাতে চট্‌চটে কালি লাগিয়ে তার থেকে যতগুলি ইচ্ছা সেই লেখার নিখুঁত ছাপ পাওয়া যায়। এই হল লিথোগ্রাফির আবিষ্কার।

এই আবিষ্কার অতিশীঘ্র সমগ্র ইউরোপ এবং ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষেও এর আমদানী হতে দেরী হল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন কোন দেশীয় ভাষার বর্ণমালার টাইপ প্রস্তুত হয়নি তখন এই লিথোগ্রাফির সাহায্যে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র লিথোগ্রাফির প্রেস থেকে শীঘ্রই উর্দু, হিন্দী, গুজরাঠি, মারাঠি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকে।

লিথোগ্রাফির সাহায্যে ছবি ছাপানও সহজ; সেই জন্য দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে নানারকমের নক্সা ও ছবি ছাপানও সম্ভব হোত। কিন্তু সেই সব ছবি শিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে না। লিথোগ্রাফিকে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে ভারতীয় শিল্পীরা অনেক ইতস্ততঃ করেছিলেন। লিথোগ্রাফির ব্যবহারিক কার্যকারিতা ছাড়া এর যে একটা বিশেষ শৈল্পিক সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে ভারতীয় চিত্রকরদের সচেতন হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল।

বৃটেনে কিন্তু তা হয়নি, লিথোগ্রাফির প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ শিল্পীরা পাথর খোদাই এর কাজে লেগে যান। উইলিয়াম্ ব্লেক এবং বিখ্যাত কাঠ খোদাইকারী শিল্পী টমাস বেউইকও পাথর খোদাই করতে আরম্ভ করেন। পরে দান্তে গ্রেবিয়েল রসেটি প্রমুখ প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর বহু শিল্পী লিথোগ্রাফার হয়েছিলেন।

সেনিফেল্‌ডারের আবিষ্কারের দেড়শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও য়্যালবার্ট মিউজিয়ামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বহু শিল্পীর লিথোগ্রাফের কাজ এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।'

এই প্রদর্শনীতে হেনরী মুর, গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড, জন পাইপার, পিকাসো, মাতিসে, ব্রাক্ এবং রুয়াণ্ট প্রমুখ আধুনিক যুগের শিল্পীদের এবং ইন্‌গ্রেস, গয়া প্রমুখ পুরাতন যুগের শিল্পীদের খোদাই-এর কাজ দেখান হচ্ছে। ড্যমিয়ের ও গ্যাভারনির খোদাই কাজের নমুনা এবং বার্ণেট ফ্রীডম্যান, এড্‌ওয়ার্ড বডেন ও এড্‌ওয়ার্ড আর্ডিজোন প্রভৃতি শিল্পীদের আধুনিকতম পদ্ধতিতে খোদাই-এর নিদর্শনও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বৃটেনে এ ধরনের প্রদর্শনী পূর্বে কখনো হয়নি। ১৯শে অক্টোবর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে। তারপর দ্রষ্টব্য জিনিষগুলিকে তিনভাগ করে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক মিউজিয়ামগুলিতে প্রদর্শনের জন্য পাঠান হবে। *

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

পূজনীয় লাটু মহারাজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা খুব মানতেন। জনৈক ভক্ত বৃহস্পতিবার কলকাতা রওনা হ'বে, তারপর দিন তার অফিস খুলবে। যাওয়ার কথা বলায় লাটু মহারাজ মত দিলেন না, অধিকন্তু ক্ষুণ্ণ হলেন। আমিও বৃহস্পতিবারের বারবেলায় একদিন সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করতে গিয়েছিলাম। সেইজন্য আমাকে খুব বকে ছিলেন। আমি এই ব্যাপার শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজকে জানালাম। তিনি কিন্তু বললেন দেব ও সাধুদর্শনে দোষ নেই। লাটু মহারাজ ওতে ক্ষুণ্ণ হলেন। লাটু মহারাজের কোন কোন বিষয়ে নিজস্ব ভিন্ন ভাব ছিল।

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কৃতজ্ঞতা এত গভীর ছিল যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আহিরীটোলার জনৈক ভক্ত তাঁর শ্রীচরণসমীপে কিছুদিন ছিলেন। মহারাজ তাঁকে খুব যত্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু সেই ভক্তটি মহারাজকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখতেন না, বরং তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন, অথচ মাঝে মাঝে মহারাজকে ভিক্ষা দিতেন। এই টুকুর জন্য এত সমালোচনা সত্ত্বেও লাটু মহারাজ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। রামচন্দ্র দত্তের প্রতি তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বললে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমাকে বলতেন—"উপকার পেয়ে কখনও ভুলিস না। কৃতজ্ঞতা মনে রাখিস।"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ কাকেও দীক্ষা দেন নি। দীক্ষার কথা বললে বলতেন, "মা আছেন, শ্রীশ্রীমহারাজ আছেন, তাঁদের শরণাগত হও। ভার নেওয়া কি মুখের কথা?" আমার দীক্ষার কথা বললে তিনি দেবেন না জানি। তবুও পরে মহারাজকে জানালাম। তিনি মার নিকট দীক্ষা নেবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। দীক্ষা নিতে যাবার আগে আমি কি নিয়ে যাচ্ছি, গোপনে সব খবর নিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তাই আমার খুব অভিমান হল। রাস্তায় গাড়ীর মধ্যে খুব কেঁদেছিলাম। কারণ অন্য লোক গেলে, 'পৌছে চিঠি দিস' প্রভৃতি একটা কিছু বলতেন কিন্তু আমাকে কোনও স্নেহের কথাই বলেন নি। কলকাতা হতে দীক্ষা লওয়ার খবর লাটু মহারাজকে পত্রে জানালাম। তিনি উত্তরে লিখলেন—"মহা ভাগ্য! মহা ভাগ্য!! বহু ভাগ্যে মার কৃপা পেয়েছ। এখন চলে এস।" ৺কাশীতে ফিরে গেলে তিনি শ্রীশ্রীমার মহিমা অনেক বললেন।

শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ ৺কাশীতে এলে লাটু মহারাজ তাঁর নিকট যেতেন। সেবাশ্রমের সামনের ঘরে শ্রীশ্রীমহারাজ থাকতেন। তাঁকে দর্শন করেই ফিরতেন। সেবাশ্রমের ভেতর প্রবেশ করতেন না। শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজ লাটু মহারাজকে দেখে বলতেন, "লাটু ভাই যে! ত্রৈলঙ্গ স্বামী হচ্ছ।"

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ বলতেন, "সাধুর সর্ব্বপ্রথম দরকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ করা। সেইজন্য গীতায়

বলেছেন, 'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ'। মমতা আর অহঙ্কার ত্যাগ করা চাই। মমতা যে কি, আর অহঙ্কার কি এসব বোঝা সাধন-সাপেক্ষ। তবে খুব সংযমী আর দৃঢ়চিত্ত হলে কিছুটা বুঝতে পারে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শাস্ত্রই একথা জোর করে বলে গেছেন।

"মূলকে ধরে থাক। তিনিই সব করাচ্ছেন। ইষ্টই হচ্ছেন সেই মূল, তিনিই পরম গুরু। শ্রীগুরুই সেই মূলকে ধরিয়ে দেন। সদ্গুরুর আশ্রয় পেলে তবে ঠিক্ ঠিক্ গতি হয়। তখন আর সংশয় নেই, পথ খোলা। তার আগে আর সব কর্ম্মক্ষয়। দেখ্, সদ্গুরুর কৃপা পেয়ে আর দেরী করিস্‌নে। তাহলে ঠক্‌বি। শ্রীগুরুর কাছে ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কিছু নেই। তিনি যা দয়া করে দিয়েছেন, তাই সব। তার চেয়ে বেশী কেউ আর দিতে পারবে না। অবতারও না। দেখছিস্ না, গুরুর মহিমা বোঝাবার জন্য অবতাররাও গুরুকরণ করেছেন। এতো দেখেও জীবের চৈতন্য হয় না। সব কর্ম্মফল।

"যে ভগবানকে মানে সে জগতের তোয়াক্কা রাখে না। জানে এসব মিথ্যা, অসার; একমাত্র ভগবানই সার। এই হল ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞানী বা ভক্তের লক্ষণ। এই কথাটা বোঝাবার জন্য শঙ্কর বলেছিলেন 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' সাধন করলে এ সব বুঝতে পারা যায়, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। নইলে শুধু শুধু শাস্ত্র আওড়ালে কি হবে?

"সুখদুঃখ, ভালমন্দ সব কিছু ভগবানকে অর্পণ করতে হয়। তাহলে আর কর্ম্মফল আবদ্ধ করতে পারে না। এমনকি নিজেকেও তাঁর পায়ে বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হতে হয়। এই করতে করতেই আত্মসমর্পণ আসে। নিরন্তর অভ্যাস আর সাধনভজন না করলে এসব উপলব্ধি হয় না। শুধু কথার কথা—শুনতেই বেশ। কর্ম্ম না করলে আর ধর্ম্ম হবে কোত্থেকে?

"ভয় একটা সংস্কার—পূর্বজন্মের বা এজন্মের কর্ম্মের ফল। কোন কোন লোকের ভয়ের সংস্কার খুব বেশী। অল্পেতেই ভয় পায়, বুক দুর দুর করে। অনেকের আবার রোগও আছে। কেউ আবার খুব ডানপিটে সাহসী হয়, ভয় ডর নেই। হলে কি হবে ভয়ের সংস্কার সূক্ষ্মভাবে সকলের ভেতরই রয়েছে। সাধনভজনের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে ভয় চলে যায়। যোগীরা এর অনেক প্রক্রিয়া জানেন। ভক্তের কাছে গুরুকৃপা হলে ভয় কাটে। এজন্য শাস্ত্র বলেছেন—অল্পমাত্র ধর্ম্ম (ঠিক্ ঠিক্) আচরণ করলে মহৎ ভয় থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কতো উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন, "হে অর্জ্জুন, এই হল আদর্শ; এইভাবে জীবকে স্ব স্ব স্বভাব অনুযায়ী সাধন করে সংসার-মায়া থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে। তুমিও একটা পথ বেছে নিয়ে মোহ থেকে নিষ্কৃতি পাও। যোগী হও, না হয় নিষ্কাম কর্ম্ম কর। তাও না পারলে সর্ব্বতো-ভাবে আমার শরণাগত হও, আমায় পূজা কর, আমায় নমস্কার কর, আমাতে তন্ময় হয়ে যাও, তাহলে আমি তোমায় মুক্ত করতে সমর্থ হবো।" দেখো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সাধন না থাকলে ভক্তকে কৃপা করতে পারছেন না। কতো জন্মের সাধনা ছিল বলেই না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সখা হয়েছিলেন, তাও আবার তাঁদের দিয়ে কতো কর্ম্ম করিয়ে নিয়েছিলেন! এতেও যদি জীবের ভুল না ভাঙ্গে তাহলে আমরা কি কোরবো?

"ভগবানকে লাভ করবার জন্যই এই দুর্লভ মানবজন্ম। জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মানুষ ভুল পথে চলে বলেই এতো দুর্দ্দশা। না হলে, জীবের আবার দুঃখ কি? সে এই জন্মেই শাশ্বত শান্তির অধিকারী হতে পারে, আর বুঝতে পারে সে

কোথা থেকে এসেছে। অবতাররা জগতে আসেন এই ভুল ভেঙ্গে দেবার জন্য, আর জীবনের কি উদ্দেশ্য তাও দেখাবার জন্য। তাঁদের সংস্পর্শে এসে অনেক অযোগ্য লোকেরও উদ্ধার হয়ে যায়।

"সংসারে থেকে ভগবানকে ডাকা অতি সহজ। কেন না যোগান দেবার লোক অনেক আছে। আর অল্প সাধনভজন করলেই ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সংসারীর প্রতি ভগবানের কত দয়া! আগে এদেশে ঘরে ঘরে সাধক ভক্ত ছিল। এখন আর সে দিন কাল নেই। বিলিতী শিক্ষা পেয়ে লোকে ভোগের দিকে ছুটেছে। ধর্ম্মের ওপর সে বিশ্বাস কই? তাই এতো দুর্দ্দশা!

"ভগবান্ অন্তর্য্যামী। তাঁকে অন্তর থেকে প্রাণভরে ডাকতে হয়। তবে তাঁর কৃপা হয়, তাঁর সাড়া পাওয়া যায়। বাইরের ভেক নিলেই হয় না। ভগবান নিজে খাঁটি, খাঁটি না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সেজন্য সাধনভজনের দ্বারা আগে মনের ময়লা সাফ করতে হয়। যত মনের গলদ ধুয়ে মুছে যাবে, তত তাঁর কৃপা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারবে।

"ভগবান্ জীবকে দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে তাঁর দিকেই নিয়ে চলেছেন, জীব বুঝুক আর নাই বুঝুক। ঈশ্বরের ভালবাসা ক্ষুদ্র মানুষ বুঝবে কি করে? সাধুরা ঠিক্ ঠিক্ ঈশ্বরের মহিমা জানেন। তাই তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। ভগবানের দুয়ারে ধন্না দিয়ে থাকতে হয়। তুমি দেখা দাও আর না দাও তোমাকে ছাড়ছিনে, নেহি ছোড়েঙ্গে। এই ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে ভগবান আপ্‌সে দেখা দেবেন। ভক্তের ঠেলায় ভগবান অস্থির। এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন, ভক্ত, ভাগবত, ভগবান—তিন জনের সম্বন্ধ সমান। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'খানদানী চাষার মতো লেগে থাকতে হয়।'

"ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্মসাধনার মূল। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যবান্ হতে হবে। তবেই ধর্ম্মের তত্ত্ব আপনা আপনি প্রকাশ হতে থাকবে, আর সাধক বুঝতে পারবে ধর্ম্ম কি জিনিস। পবিত্রতাই ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি। শাস্ত্র বলেছে—'শৌচ', অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ হতে হবে। শুদ্ধ না হলে ধর্ম্মের তেজ আর আনন্দ ধারণ করা যায় না। কলির জীবের ব্রহ্মচর্য্য নেই বলে তারা ধর্ম্ম বুঝতে পারে না। নইলে ধর্ম্ম বোঝাবার জন্য এতো মিটিং আর বক্তৃতা করতে হতো না। ধর্ম্ম হচ্ছে স্বয়ংপ্রকাশ।

"ব্রহ্মচর্য পালন করে সৎসঙ্গ কর্। তারপর যদি কিছু না বুঝতে পারিস্ আমাকে এসে বলিস্। সাধুসঙ্গ কি তখন প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারবি, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবি। নাহলে সংযম নেই, খালি ঘোরাঘুরি করছিস, আর সাধুসন্ন্যাসীকে বকাচ্ছিস্। এতে আর কতটুকু হবে?

"ভগবান্‌কে ঠিক্ ঠিক্ চাইলে তিনিই তাঁকে পাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। যখন যা দরকার তিনিই জুটিয়ে দেবেন। সাধুসঙ্গ, কৃপা—তাঁকে ধরে থাকলে কালে সব হবে। তবে তিনি বাজিয়ে নেবেন। ভক্তের ঠিক্ ঠিক্ অনুরাগ হচ্ছে কি না পরীক্ষা করবেন।

"ভোগবাসনাকে গোড়া থেকে দাবিয়ে দিতে হয়। রিপুজনিত ভোগবাসনার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছু নেই। একবার প্রশ্রয় দিলে অলক্ষিতে এরা প্রবল হয়ে ওঠে, আর সাধককে সাধনমার্গ থেকে নাবিয়ে দিতে চায়। তখন আবার সে অবস্থা ফিরে পেতে গেলে চতুর্গুণ খাটতে হয়। সেজন্য কামভাব ওঠবার আগেই তাকে বিবেক-বলে বা মনের জোরে নিরোধ করে দিতে হয়। তাহলে ক্রমে ক্রমে প্রবল শক্তি আসে, আর সাধকের বড় একটা পতনের ভয় থাকে না। সাধু সাবধান!

"আমি যে তোদের সঙ্গে মিশি, কথাবার্ত্তা বলি, উপদেশ দি, এও এক মায়া। অন্তর থেকে জানি যে এসব কিছুই নয়, তোদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি সেই নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তোরা এই অবস্থা লাভ করবার চেষ্টা কর্। মোহ রেখে কোন লাভ নেই। অদ্বৈতজ্ঞান না হলে পূর্ণ হওয়া যায় না। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। তোরা পূর্ণকে জান্। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের পূর্ণজ্ঞান দিয়ে গেছেন।

"সব জীবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে হয়। তাহলে আর হিংসা, দ্বেষ, কপটতা থাকতে পারে না। আর তাতো দেখতেই হবে। সবাই যে ব্রহ্ম রে! আমি তুমিই কি ভগবানের কাছ থেকে এসেছি? সবাই এসেছে, সবাই তাঁর কাছে যাবে। ছোট বড় ভেদ শুধু অজ্ঞানতার জন্য। দেখ, ঠাকুর নিজে স্বয়ং ভগবান্ হয়েও জীবকে কতো শ্রদ্ধা করেছেন, পায়ে মাথা ঠেকাতে দিতেন না। আবার ঠাকুরই বলে গেছেন—শিবজ্ঞানে জীব সেবা। ঠাকুরের মহিমা ক্ষুদ্র মানুষ কি বুঝবে?

"দোষগুণ নিয়ে মানুষ। সব মানুষের মধ্যে ভগবান্ দুটোই দিয়েছেন। কেন না তিনি চান যে দোষটা বর্জ্জন, গুণটা গ্রহণ করে মানুষ তাঁর কাছে ফিরে আসুক। তবে তাঁকে বুঝতে পারবে। এজন্যই সাধনভজন দরকার। সাধন-ভজন করলে আমাদের ভেতরের ঈশ্বরীয় গুণ প্রকাশ পায়, আর তাঁকে একটু একটু করে জানা যায়। বিদ্যাপতি ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত ছিলেন। ভগবান্‌কে পেয়েও তিনি বলছেন, 'হে ঈশ্বর, বিচার করে দেখলে দেখবে আমার কোনই গুণ নেই।' আহা! এই হল গুণীর লক্ষণ!

"এইজন্য বলছি—নিজের দোষটা সব সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ্‌বি। তাহলে গুণটা একদিন প্রকাশ পাবে। শুধু পরের দোষ দেখে বেড়ালে কি হবে? যে গুণী হবে সে পৃথিবীতে কারুর দোষ দেখবে না। তুমি নিজের দোষটাই দেখ আর নিজেকে সংশোধন কর। অন্যের দোষ ধরবার তুমি কে?

"এ জগতে সবই মায়া। মায়ার শৃঙ্খল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সাধনভজন আর অভ্যাসের দ্বারা একটু একটু করে মায়া ত্যাগ করতে হয়। তবে সহজসাধ্য হয়। প্রথমে পারিপার্শ্বিক, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের মোহ একেবারে ত্যাগ করতে হবে। বাইরে বেশ লোকাচার দেখাবে যাতে তারা তোমার মনের সদিচ্ছা বুঝতে না পারে। ভেতরে জানবে এরা তোমার কেউ নয়। পারিপার্শ্বিক ত্যাগ সোজা। সৎ অসৎ বিচার আর তীব্র বিবেক থাকলেই ক্রমে ক্রমে হয়ে যায়। কিন্তু বাপু, শরীরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয়। ভাবতে হবে যে শরীরটাও আমার নয়, মনও আমার নয়; ইন্দ্রিয়াদি, বুদ্ধি এসব কিছুই আমি নয়। আমার স্বরূপ এরও পারে। এমনি করে করে সূক্ষ্মের ধ্যান করতে করতে দেহাত্মজ্ঞান যাবে। এসব সময়সাপেক্ষ। একদিনে হয় না।

"ইষ্টের প্রতি মনকে একাগ্র করাই হচ্ছে সাধন। প্রথম প্রথম মন বসতে চাইবে না। নানা বিষয়ে মন ছড়িয়ে আছে বলে একদিকে আনতে চাইলে সে হঠাৎ রাজী হবে কেন? অভ্যাসযোগের দ্বারা মনকে আস্তে আস্তে বশীভূত করে ইষ্টে স্থাপন করতে হবে। সেই একাগ্র মনেই চিত্তশুদ্ধ হয়, আর ইষ্টের স্বরূপ ভক্তের নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। তবে মনের অনেক ভেল্‌কি আছে। সাধন-ভজনের দ্বারা একটু চিত্ত স্থির হলেই খুব কিছু হয়ে গেল না। অনেক গুপ্ত সংস্কার হঠাৎ

একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সাধকের তখন সামাল সামাল অবস্থা।" সেজন্য আগে থাকতেই তৈরী থাকতে হয়। খুব নিয়মিত জপধ্যানের দ্বারা মনকে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করতে হয়। যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলেছেন, 'মনকে দৃঢ়ভূমি করতে হয়। তবে তো হবে।' এসব জেনে শুনে সাধনা করলে অনেক বিপদের হাত এড়ান যায়। অবশ্য এক শ্রীগুরুনিষ্ঠা ঠিক্ ঠিক্ থাকলে কোন কিছুরই দরকার হয় না। আপ্‌সে সব হয়ে যায়। এমনি সদ্‌গুরুর মহিমা! কিন্তু সে আর ক'জনের হয়?

"সাধু হওয়া কি চারটিখানি কথা? কতো প্রলোভন আসবে, সংস্কারে আটকে দেবে। সে সব কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া চাই। রিপুকে জয় না করলে কিছুই হবার জো নেই। একি যার তার কর্ম্ম? গুরুকৃপা হলে আস্তে আস্তে এসব হয়ে যায়। না হলে মানুষের সাধ্য কি যে মায়ার হাত থেকে মুক্ত হবে?

"ভগবানকে পেতে হলে যেমন করেই হৌক ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। বীর্য্য ধারণ না করলে দেহ মন কিছুতেই শুদ্ধ হতে পারে না, নিত্য-শুদ্ধ ভগবানকে ধারণা করবে কি করে? তাছাড়া সংযমী না হলে মানুষের কোন সদ্‌বৃত্তিরই বিকাশ হয় না, সে পশুরও অধম হয়ে পড়ে। কোন বড় কাজ তার দ্বারা হতে পারে না। এখন এক কথা বলছে, লোভে পড়ে অন্য কাজ করছে। যে ব্যক্তি সৎ হবে তার ব্রহ্মচর্য্য থাকা চাই-ই—অন্য কিছু থাক আর না থাক।

"কখনও কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা পাপ। এতে অহংকার দেখান হয়। ঈশ্বরের জগতে কে বলতে পারে এটা কোরবো, এটা কোরবো না? সব তাঁর ইচ্ছা। তবে মনের ভেতর সৎসঙ্কল্প বা তেজ থাকা ভাল, যেমন আমি কখনও অসৎ কাজ করবো না, কারুর নিন্দা করবো না, কাউকে হিংসা করবো না—ইত্যাদি। এসব জিনিষ দশজনকে বলে বেড়াবার জন্য বা জাহির করবার জন্য নয়। এসব গোপনে করতে হয়। ভেতরে সত্য জমলে তা কখনও চাপা থাকে না। একদিন না একদিন আপনা থেকে প্রকাশ হবে। যে নীরব সাধনার দ্বারা সত্যলাভ করেছে তাকে আর প্রতিজ্ঞা করতে হয় না, সে যা বলবে তা প্রতিজ্ঞার চেয়েও সত্য হবে। একমাত্র সাধুই প্রতিজ্ঞা করতে পারেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা ভগবান রক্ষা করেন।

"বিদেশী ভাবের দিকে বেশী ঝুঁকো না। ওতে নিজেদেরটার ওপর অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আসে। তোমাদের মন আজকাল অনেক নেমে গেছে। তাই ওদের ভাব, ওদের বুলি বেশ মিষ্টি লাগে। উঁচু জিনিষ ধারণা করবার শক্তি নেই। ওরা যা পেয়েছে অনেক ওপরকার জিনিষ। আরো ভেতরে ডুব দিতে ওদের আরো অনেক সময় লাগবে। তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ওদের তো জড়বাদীর দেশ। মাঝে মাঝে দু'একজন সাধু মহাপুরুষ এসে ধ্বংসের হাত থেকে ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। দেখ্‌ছিস্ না, ওরা কি নিয়ে আছে? আর তোদের এই সাধু ঋষিদের দেশ ভগবানকে জানবার জন্য যুগ-যুগান্তর কাটিয়ে দিলে! এখানকার আকাশবাতাসে তপস্যার বীজ রয়েছে। এখানে অল্পেতেই যা হবে আর কোথাও তা হবে না। যদি যাচাই করবার ক্ষমতা থাকে তো সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরে আয়। দেখবি এই সনাতন ধর্ম্মের চেয়ে বেশী আর কোথাও কিছু নেই।"

সাহিত্যে সৌন্দর্যানুভূতি

শ্রী—

সাহিত্যের মূল লক্ষ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। সমালোচকদের মধ্যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক বাদানুবাদ, অনেক আলোচনা হয়ে থাকে। অনেকে বলেন যে, সাহিত্যকে সমাজের কল্যাণের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত করাই নীতি। সাহিত্যের আদর্শ দিয়ে একটি কল্যাণময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। সাহিত্য প'ড়ে যদি একটা জাতির নৈতিক বল বৃদ্ধি না পেল, তবে সে সাহিত্যের মূল্য কোথায়? একদল বিপক্ষ সমালোচক সাহিত্যের এই নীতিমূলক উদ্দেশ্যের অসারতা সম্পর্কে যুক্তির অবতারণা করলেন—নীতি বা সমাজকল্যাণ দিয়ে সাহিত্য হয় না। দর্শন ও ধর্মের রাজ্যে নীতি ও সমাজকল্যাণ প্রধান বিষয়-বস্তুর স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে। পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল নিয়ে দার্শনিকেরা বহু গবেষণা করেছেন এবং কর্ছেন ও। যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য অমন সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় আত্মপ্রকাশ ক'রে বসে, তবে সাহিত্য রসপরিশূন্য সাহারা হ'য়ে যাবে। যাঁ'র উদ্দেশ্য সমাজের মস্তিষ্ক বড় বড় কথায় উর্বর ক'রে তোলা তিনি যেন কখনো সাহিত্যিক হ'বার রঙিন স্বপ্ন না দেখেন। মানুষের সমাজ নির্লজ্জ সত্য নগ্নতাবাদকে কখনো মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। কবি অথবা সাহিত্যিক যে বাণী প্রচার করবেন, যে নির্দেশ আমাদের দেবেন, তা' রূপে-রসে-রঙে-পরিমলে পরম অনুপম, বৈচিত্র্যে-সৌন্দর্যে পরম উপভোগ্য, হৃদয়-সংবেদ্য হ'য়ে আমাদের কাছে প্রকটিত হবে। রস-গুঞ্জনের নীচে চাপা থাক্‌বে তাঁর বা তাঁদের উদাত্ত গম্ভীর নির্দেশ-বাণী। রস-সঞ্চয়নের সাথে লোকে অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের প্রদর্শিত বিশেষ আদর্শের রূপটিকে আপন ক'রে ঘরে তুলে নেবে।

আর এক শ্রেণীর সমালোচকরা বলেন, কবি বা শিল্পীকে বিদ্যা-বুদ্ধি, তর্ক-যুক্তির রাজত্বে বন্দী ক'রে রেখে লাভ নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচকদের প্রধান কথা হ'চ্ছে—কবি বা সাহিত্যিক তাঁর নীতিগত বুদ্ধি কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করবেন? কবির মধ্যে, সাহিত্যিকের মধ্যে রাত্তির-দিন একটা অদ্ভুত ঐশী শক্তি কথা কইছে, এষণা যোগাচ্ছে, প্রেরণা সঞ্চার কর্‌ছে। সাহিত্যিকের প্রাণ-প্রসূত সেই যে সৃজন তাই-ই সাহিত্য নামে আখ্যাত।

বর্তমানের এই মতের অথবা সিদ্ধান্তের প্রাধান্য দিতে গেলেই সৌন্দর্যের কল্পনা স্বতঃই এসে পড়ে। যে সত্য, যে শিব, যে সুন্দর—যাঁ'র কাছ থেকে কবি বা সাহিত্যিক প্রেরণা পাচ্ছেন, উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছেন, সেই ত্রয়ীসুন্দর পৃথিবীতে সর্বদা যে সুন্দরের ব্যবহার হয়, তা' থেকে কিছু অংশে বিভিন্ন।

প্রথমতঃ, প্রাত্যহিক ব্যবহারে আমরা যে সুন্দর কথাটি প্রয়োগ করি, সে সুন্দরের মৌলিক ভিত্তি আমাদের মনের স্বতোৎসারিত সংস্কার। সেই সংস্কারবশে সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা অনেকটা এই বলা যা'বে—যা'তে বেশ তৃপ্তি দেয় এবং প্রাণটাকে প্রফুল্ল ক'রে তোলে সেই জিনিস এবং আমরা তুষ্ট হ'তে চাই

তা'তেই। অন্তরের স্বতোৎসারিত অনুভূতিপূর্ণ সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী-সাহিত্যিক চান প্রাণ-মন দিয়ে তাঁর নায়ক-নায়িকাকে সুন্দর ও আদর্শ ক'রে তুল্‌তে—যে বিশিষ্টতার জন্য নায়ক-নায়িকা ভাবশীল সাধারণের কাছে প্রীতিপ্রদ হ'য়ে ওঠে। এই প্রীতি বল্‌তে এখানে আমরা সাধারণভাবে অন্তরের একটা হাল্‌কা অনুভূতিই বুঝ্‌বো। এই রকম সাধারণ মন-বিনোদন সাহিত্যে শ্রীরাধার পূর্বরাগের ঐশ্বর্য উৎসারিত হ'তে থাকে : সুন্দর তপোবন, শকুন্তলার সুন্দর চোখ, সুন্দর হরিণ-ই প্রাণের জিনিস হ'য়ে ওঠে। শকুন্তলার চোখের গভীরতা সে সৌন্দর্যের ঝিক্‌মিকিনির মাঝে তা'র প্রশস্ত জায়গা ক'রে নিতে হয়তো পারে না!

গোল এইখানে যে, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি গৌড়ীয় কবিরা যখন রাধিকার কিশোরীরূপ বর্ণনা করেন, তাঁদের ভাবে-ভাষায় যোগান দেয় যে রস-লালিত্য, সৌন্দর্যানুভূতি, শ্রীমতীর বিরহ-বিদগ্ধ শিথিল করুণরূপ আঁকবার কালেও কি তার মূলে সেই একই রকম সৌন্দর্যবোধ সঞ্চিত থাকে? এই সমস্ত নানানরকমের সমস্যা ক্রমশঃ গভীরতর হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে যদি আমরা মূলসমস্যার তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে না ফেলি। তবে কোন জিনিস বা বিষয় বুঝবার আগে সমস্ত সমস্যাকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াই ভাল, এইতো মনে হয়।

বহুবার এ কথা উচ্চারিত হ'য়েছে যে, সাহিত্যিক সৌন্দর্যের পূজারী। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে যে, যে সাহিত্যিক মানুষের মনের এবং মানুষের সভ্যতার ক্লেদ-গ্লানি ভাবাবেগে চিত্রিত ক'রেছেন, তাঁ'কে সাহিত্যিক বল্‌বো কি-না, এবং তাঁ'র সৃষ্টিকে সৌন্দর্যসৃষ্টি বলে অভিনন্দিত করবো কি-না? যে সাহিত্যিক বুকের ব্যাকুল ব্যথা মন্থন করতে গিয়ে সাহিত্যের ভেতর যুগ-পরিব্যাপী দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন, যিনি নিবিড় নিরাশার শুধু নিরবচ্ছিন্ন কুহেলী সংরচনা করেছেন—পদ্মের লালিমা দিয়ে, শেফালির সুরভি দিয়ে, চাঁদের নির্যাস দিয়ে যিনি সাহিত্যকে রাঙিয়ে তুল্‌তে, মাতোয়ারা ক'রে তুল্‌তে, মোহময় ক'রে তুল্‌তে পারেন নি, তাঁ'র ডাকে কি সৌন্দর্য্য-পিয়াসী পরাণ সাড়া দেবে?

আমাদের অন্তরের অন্তরতম দেশে এমন এক ক্রিয়াশীল মহান্ কিছু আছে, যা'র চালনে হয় মনের উদ্বোধন - একটা চেতনা, একটা সাড়া আসে মনের মধ্যে। এই রকম ক্রিয়াশীল মন পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগে যখন পড়ে, সেই সব বিভাগই ক্রিয়াশীল মনের অনুভূতিতে তখনই নতুন ক'রে আলোকিত হ'য়ে ওঠে। সেই বিভাগের সমস্ত কিছু আমাদের এত ভাল লাগে, আর তা'দের আমরা সুন্দর বলি। মনের এই সক্রিয় মহানকে শরীরব্যবচ্ছেদের পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যোগের সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির গভীর গবেষণা হ'লেও, তা'কে যেমন চর্মচোখের সম্মুখে বার করা যায়নি, আমাদের অন্তরতম অন্তস্তলটি-ও তেমনি চিরটি দিন নিগূঢ় ও রহস্যময় থেকে জগতে এতবড় ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে চলেছে। যোগীরা, সাধকেরা এই জিনিসকেই আমাদের ভেতরকার পরমাত্মা ব'লে বুঝিয়ে গেছেন। আত্মার আওতায় ব'সে যে শক্তি কথা কয়, আত্মাকেই জাগিয়ে রাখে, কাজে লাগায়—সেই পরমাত্মাই আমাদের জগতকে চিনিয়ে দিচ্ছে, দরকার হ'লে নতুন কিছু সৃষ্টি ক'রে আমাদের চোখের সাম্‌নে মেলে ধরছে।

আলংকারিকেরাও ঐ গূঢ় মহান্‌টিকে নিয়ে সত্যি বড় গোলে পড়্‌লেন। বেশ জম্‌কালো ক'রে তাঁ'রা বল্‌লেন যে, মনের ভেতর যে জিনিস গোপনে-গোপনে এতবড় কাজ ক'রে চলেছে, তা' আর কিছুই নয়—তা'কে বল্‌বো মনের রস।

এই রসই পৃথিবীর আলো বাতাস সব স্পর্শাপরূপ ক'রে তুল্‌ছে। বাস্তবের সাথে রসের রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে সুন্দরের আবির্ভাব হয়, সেই সুন্দর নিয়ে সাহিত্যের সুন্দরের সৃষ্টি। আমরা যা'কে সাধারণ ভাবে মনের ক্রিয়াশীল মহান্ ব'লে জান্‌লাম, সাধক তা'কে পরমাত্মা ব'লে ভজনা করলেন, আলংকারিকেরা তা'কে নিশ্চিন্ত হ'লেন রস ব'লে, আর, দার্শনিকেরা তা'কে ঐশী শক্তি ব'লে ঘোষণা ক'রে আত্মতুষ্টি নিলেন।

এখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সুন্দর ব'লে সংস্কারবশে যে জিনিসের গুণাগুণ বিচার আমরা করি বা ক'রে আস্‌ছি, তা'কে আমরা খুব বেশী বুঝি না। সুন্দর হ'ল সেই জিনিস, যা'তে ক্রিয়াশীল মনের ছায়া পড়ে, পরমাত্মার স্পর্শে যা' অপার্থিব, অনাবিল এবং মহীয়ান্ হয়, রসের বন্যায় যা' নিরন্তর ভেসে যেতে থাকে। সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলে ঐ অদৃশ্য শক্তির সংঘাত, আর, বাস্তব জগতে নতুন কিছুর আলোক-সম্পাত। সেই জন্যই উর্মিলার অশ্রু, রাধার বিরহ অথবা বিবেকানন্দের মর্ত্য-মর্মতা, রবীন্দ্রনাথের শুভ্রতা পর্যন্ত সৌন্দর্যের চরম আবির্ভাব হ'য়েছে বল্‌লে আমরা বুঝ্‌বো যে, ঐ সমস্ত সৃষ্টির মূলে আমাদের মন হ'য়েছিল ক্রিয়াশীল, আত্মা উঠেছিল জেগে, ঐসবে নিশ্চিতভাবে পড়েছিল রসের স্পর্শ। সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির অর্থ বাস্তবের মধ্যে রসসৃষ্টি—সে রস অতি করুণই হো'ক্, আর অতি আনন্দেরই হো'ক। সুন্দর হ'ল সেই পরমাত্মার এমন এক শক্তি, যা' সুখে ও মিলনে দেখা দিতে পারে; আবার ব্যাকুল বিরহে বা বিপুল ব্যথায়ও তা' অপ্রকট থাকে না।

'মাতৃহীন নোস তোরা'

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত

দিবসের কর্ম্মশেষে
বিমর্ষ মলিন ক্লান্ত দেহে
ফিরি যবে কর্ম্মস্থল হতে
পশিতে চাহে না মন গেহে।
কর্ত্রী ভার্য্যা—পুত্র কন্যা
শুধাইবে কি এনেছ দেখি?
রিক্ত হস্তে পতি আর পিতা
খাটো হতে হয়ে যাব মেকি।
মৃতা জননীর স্মৃতি
নিমেষে জাগিয়া উঠে প্রাণে,
শান্তিময় সেই স্নেহনীড়
সুখে দুঃখে মানে অভিমানে।

দুঃখপূর্ণ ব্যথাময়
মোর মত কত শত প্রাণ
অহর্নিশি ঝলসিয়া
করিতেছে মায়ের সন্ধান।
শান্তি কি পাবে না তারা?
স্নেহ বারি হবেনা সিঞ্চন?
এ লাঞ্ছনা এ গঞ্জনা
সহিতে হইবে আমরণ?
সহসা কে যেন আসি
চুপি চুপি বলে কানে কানে
মাতৃহীন নো'স তোরা
বিশ্বমাতা চেয়ে পথ পানে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠ ও কলিকাতা বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ষণ্ণবতিতম জন্মোৎসব—গত ৭ই পৌষ বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে উভয় স্থানে ষোড়শোপচারে পূজা হোম ভোগ প্রসাদ-বিতরণ ভজন পাঠ ও আলোচনাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

বেদান্ত সোসাইটি, স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কো—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী গত নভেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) "শব্দশক্তি" (২) "মানবের জন্য ভগবানের কোন পরিকল্পনা আছে কি?" (৩) "আমিত্ব-জয়ের উপায় কি?" (৪) "বিশ্বাস বা আত্ম-নির্ভর" (৫) "কর্মের কৌশল কি জান?" (৬) "ভারতের মহত্তম ব্রহ্মজ্ঞ দার্শনিক শঙ্কর" (৭) "ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা কি?" (৮) "অদৃশ্যকে দর্শন"।

এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ধ্যানযোগ এবং বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাগণকে সার্বভৌম বেদান্তের সাধারণতত্ত্বগুলি এবং জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাচার্যগণের উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব এবং নবপ্রতিষ্ঠিত নাটমন্দিরের উদ্বোধন—গত ৭ই পৌষ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমে বিশেষ পূজোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই দিন শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল সরদা মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে নব-প্রতিষ্ঠিত নাটমন্দিরের উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন হয়। পূর্বাহ্ণে পূজা হোম, মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনচরিত আলোচনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। ন্যূনাধিক ৫০০ ভক্ত পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরবর্তী শুক্রবার অপরাহ্ণে স্থানীয় বালিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা উমারাণী সরকারের সভানেত্রীত্বে আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে শহরের বহু নরনারী যোগদান করেন। ছোট মেয়েদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত এবং বড়দের প্রবন্ধ পাঠ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভানেত্রী এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বৈশিষ্ট্য, ত্যাগ, তপস্যা, সরলতা, সেবাপরায়ণতা, সর্বোপরি ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং বিশ্বমাতৃত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

কাটিহার (পূর্ণিয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—গত ৭ই পৌষ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিন পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম হয় এবং দ্বিপ্রহরে বহু ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হ'ন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক অন্তে ভজন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূত জীবনী আলোচিত হয়।

কাশীপুর (উদ্যানবাটী) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে কল্পতরু উৎসব—এই উপলক্ষে গত ১লা জানুয়ারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও ভজনাদি হইয়াছে। উভয় স্থানে বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি— এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সোসাইটি-ভবনে সাপ্তাহিক সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ও "শিবানন্দ-বাণী" এবং পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যার্ণব "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের পূত জীবনী এবং স্বামী যুক্তাত্মানন্দজী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবীর দিব্য জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত কলেজস্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে জনসভায় স্বামী সুন্দরানন্দজী "স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ" এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "তন্ত্রসাহিত্যে ও তান্ত্রিক সাধনায় বাংলার দান" ও সোসাইটি-ভবনে "খৃষ্টের জন্ম ও বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

বার্ণপুর (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সংঘে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে গত ৭ই পৌষ শ্রীকিরণ চন্দ্র দাসের গৃহে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে স্থানীয় ভারতী ভবনে একটি জনসভায়, শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধ্বজাধারী বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জীবনাদর্শ আলোচনা করেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার নাগ মহাশয়ের বিডন ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে পূজা ভোগ ভজন ও আলোচনাদি হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ইংরেজী শিক্ষা রহিত—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শ্রেণীসমূহে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দান বন্ধ করিয়াছেন। জাতীয় সরকারের ঘোষিত নীতি হইতেছে এই যে, শিক্ষার প্রাথমিক ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে না।

গবর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ করার ফলে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকায় যে সময় পাওয়া যাইবে, তাহা ছাত্র-ছাত্রীগণকে হাতের কাজ এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে হাতে কলমে কাজ শিখাইবার জন্য ব্যয় করা হইবে।

আনন্দদায়ক প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্যও এই সময় কাজে লাগান যাইতে পারে। গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় এই যে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া শিক্ষাকে অধিকতর বাস্তব করিয়া তুলিতে হইবে এবং হাতেকলমে কাজ শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। কেবলমাত্র পুস্তকপাঠের সাহায্যে শিক্ষা লাভের উপর জোর না দিয়া নাগরিকতা-বোধ শিক্ষা আরম্ভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই আদর্শের কথা মনে রাখিয়া গবর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন যে, ইংরেজী বাদ দেওয়ার ফলে যে সময় পাওয়া যাইবে, তাহার অর্ধেক মাতৃভাষায় আবৃত্তি, গল্পকথন, ছোট ছোট নাটক অভিনয় বা ছোট গল্পের নাট্যরূপ প্রদান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য কাজে লাগান হইবে। বাকী অর্ধেক সময় নাগরিকতাবোধ ও সামাজিকতা-বোধ শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা হইবে। বিদ্যালয়গৃহ ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি কার্যের ভিতর দিয়া ইহা করা হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শ্রেণীর পরের শ্রেণীগুলিতে ইংরেজী শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের প্রশ্নও গবর্নমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা পূর্ব্বে ৫ বৎসরে যাহা শিখিত, প্রাথমিক শ্রেণী-গুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের ফলে বর্তমানে ৩ বৎসরে (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে) তাহা শিখিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নিম্ন শ্রেণীগুলিতে ভাষাশিক্ষা ও ভাবপ্রকাশের উপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে ছেলেমেয়েরা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে যে ইংরেজী শিখিত, বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে তাহারা তাহা শিখিতে পারে। পূর্বে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে যাহা শেখান হইত, বর্ত্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে তাহা শেখান যাইতে পারে। পাঠ্যতালিকার অবশিষ্ট অংশ ৭ম শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ৫ম শ্রেণীর জন্য নূতন পাঠ্য পুস্তক ঠিক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ৫ম শ্রেণীর ছাত্রগণ ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিবে। কোন ক্ষেত্রেই ছাত্রদিগকে এক শ্রেণীতে একটির অধিক পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না। এই ব্যবস্থা অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য করা হইতেছে। বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী ৫ম হইতে ৮ম শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন না হওয়া পর্যন্ত গবর্নমেণ্ট এই সকল শ্রেণীতে ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যাপারে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন ও প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ নীতি--পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বোর্ড সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মধ্য হইতে মনোনীত ৪২ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। বোর্ডের নিয়ম-কানুন, পরিকল্পনা ও বাজেট সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন-সাপেক্ষ থাকিবে। চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইলে সরকার বোর্ড বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন—এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে 'পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, ১৯৪৮' নামে একটি বিল উত্থাপিত হইবে।

বিলটি আইনে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার ইহাকে কার্যকর করিতে ইচ্ছা করেন। বোর্ডের কার্যপরিচালনার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। বোর্ড স্থাপনের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশিকা পরীক্ষা বর্তমান নিয়মের ব্যতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে গৃহীত হইবে। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্ষতি হইবে, তজ্জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা ও উন্নতির জন্য একটি পৃথক বোর্ড গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেককাল হইতেই উপলব্ধ হইয়া আসিতেছে। ৩০ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন এরূপ একটি বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করেন। ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইবার পর মুসলিম লীগের শাসনাধীনে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনার্থ নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ৩টি বিল উত্থাপিত হয়। কিন্তু এই সকল বিলে সাম্প্রদায়িকতার ভাব বিদ্যমান থাকায় কোন পরিষদেই উহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বর্তমান বিলের সঙ্গে পূর্বেকার বিলগুলির এইখানেই পার্থক্য। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে সাম্প্রদায়িকতার কোন গন্ধ নাই। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন ক্ষেত্রেই বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিতে পারেন না এবং সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক ভাব বিবর্জিত একটি বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্তমানে অন্যান্য দেশে যদিও সরকার কর্তৃক মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ সমীচীন বিবেচিত হইতেছে, তথাপি প্রদেশব্যাপী সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে স্বয়ং এই দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

প্রস্তাবিত বোর্ড সর্বমোট ৪২ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে দুই জন নারী সদস্যা মনোনীতা হইবেন। সরকারের শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরগণ, মাধ্যমিক স্কুল, নারী ও কারিগরী শিক্ষায়তন-সমূহের প্রধান ইন্সপেক্টর—এরূপ ৮ জন পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পদাধিকার বলে ৩ জন সদস্যকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মধ্য হইতে অন্ততঃ ৭ জনকে বোর্ডে মনোনীত করা হইবে। স্কুলসমূহের পক্ষ হইতে ৯ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবেন, তন্মধ্যে ৪ জন প্রধান শিক্ষক, ২ জন প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও ৩ জন পরিচালকমণ্ডলী সদস্যকে গ্রহণ করা হইবে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এমন ৬ জনকে সরকার মনোনয়ন করিবেন। বোর্ডের সদস্যশ্রেণীভুক্ত ১৮ জনকে লইয়া একটি কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হইবে। বোর্ডের প্রেসিডেন্টই ইহার প্রেসিডেন্ট হইবেন। সরকারের জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর এবং মাধ্যমিক স্কুল, নারী ও কারিগরী শিক্ষায়তনের প্রবীণ ইন্সপেক্টরগণ পদাধিকারবলে এই পরিষদে থাকিবেন এতদ্ব্যতীত পরিষদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ ৪ জন সদস্য থাকিবেন। মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। এই কমিটির সকল সদস্যই নারী হইবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারকল্পে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিচালন-ব্যবস্থা ছাড়াও বোর্ড ইহার উন্নতিমূলক পরিকল্পনাদি গঠন করিবেন। পরিকল্পনাসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর কার্যকরী করা হইবে। ইহার পরিচালনাধীন শিক্ষার বিষয়বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়-নিরপেক্ষ অথচ স্বয়ংসম্পন্ন হইবে। পক্ষান্তরে ইহা ক্ষেত্রবিশেষে উদ্যোগী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা লাভেরও সুযোগ দিবে। সরকার মনে করেন যে, প্রস্তাবিত বিলে যে বোর্ড গঠনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা গঠিত হইলে এই প্রদেশের যুবকদের উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার সম্ভব হইবে।

ভারতীয় গণপরিষৎ কর্তৃক 'ধর্মে স্বাধীনতা' সম্পর্কে নাগরিকগণের অধিকার স্বীকার—ভারতীয় গণপরিষদের অধিবেশনে ধর্মে স্বাধীনতা সম্পর্কে কতকগুলি অধিকার স্বীকার করিয়া খসড়া শাসনতন্ত্রের ৩টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হইয়াছে।

একটি অনুচ্ছেদে ধর্মানুষ্ঠান-পরিচালনায় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা সৎকার্যের জন্য ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির মালিকানা, দখল ও পরিচালনার স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে নাগরিকদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম অথবা ধর্মের নাম অব্যাহত রাখার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা-দান নিষিদ্ধ হইয়াছে; তবে অন্যান্য শিক্ষায়তন ইচ্ছা করিলে এই সর্তাধীনে ধর্ম শিক্ষাদান করিতে পারিবে যে, কোন ছাত্রকে ঐ শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করা যাইবে না এবং তাহা সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক অনুচ্ছেদের বিধানাবলীর সর্ত-সাপেক্ষ হওয়া কর্তব্য।

বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—(১) সম্পূর্ণরূপে সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলিতে ধর্মশিক্ষা-দানের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। তবে যে সকল শিক্ষায়তন সরকার দ্বারা পরিচালিত হইলেও ধর্মশিক্ষাদানের সর্তে কোন দান অথবা ট্রাষ্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল শিক্ষায়তনের প্রতি এই ধারার কোন বিধান প্রযুক্ত হইবে না।

(২) রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত অথবা রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষায়তনের কোন ছাত্রকে ঐ সকল শিক্ষায়তনে প্রদত্ত কোন ধর্ম-শিক্ষায় যোগদান করিতে হইবে না অথবা সে (অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে তাহার অভিভাবক) সম্মত না হইলে তাহাকে ঐ সকল শিক্ষায়তনে অথবা শিক্ষায়তনসংলগ্ন কোন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কোন দেব-পূজায় উপস্থিত হইতে হইবে না। (৩) কোন শিক্ষায়তনের ছুটির পর শিক্ষায়তনে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদিগকে ধর্মশিক্ষাদানে বাধা নাই।

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি—ভগবান বুদ্ধের প্রধানতম শিষ্য সারিপুত্ত এবং মৌদ্গল্যায়ন—এই দুই জনের পূতাস্থি প্রায় শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে নীত হয় এবং তদবধি এইগুলি লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই পূতাস্থিসমূহ প্রথমে সাঁচিতে রক্ষিত ছিল। ভারত গবর্নমেণ্ট বর্তমানে তথায় একটি নূতন বিহারে ঐগুলি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন। ১৪ই জানুয়ারী (১৯৪৯) ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সরকারীভাবে কলিকাতায় এক উৎসব-অনুষ্ঠানে এই পূতাস্থিগুলি লইবেন এবং সেখান হইতে কলেজ স্কোয়ারস্থ (কলিকাতা) মহাবোধি সোসাইটির বাড়ীতে শোভাযাত্রা সহকারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উক্ত সোসাইটির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাতে দিবেন। দেশবাসী যাহাতে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসি-দ্বয়ের পূতাস্থি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারেন, তজ্জন্য ১৫ই হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই পূতাস্থিসমূহ সোসাইটির বাড়ীতে জনসাধারণকে দেখান হইবে। এই অস্থির অস্তিত্ব ভারতের, তথা জগতের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর অত্যন্ত আনন্দের বস্তু। সিংহলে যখন এই সকল পূতাস্থি জন-সমক্ষে প্রদর্শিত হয়, অনুমান ৩০ লক্ষ লোক তখন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল সাঁচির এই আবিষ্কার সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যায়ন উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা উভয়েই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আন্তরিকভাবে বুদ্ধদেবকে অনুসরণ করেন। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহারা

দেহরক্ষা করেন। সাঁচি হইতে ৬।৭ মাইল দূরবর্তী সাতধারায় ও অপর একটি স্তূপে তাঁহাদের দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং-এর মতে মথুরায় পুরাণমৈত্রেয়ানীপুত্ত, উপালি, আনন্দ ও রাহুলের স্তূপের পাশে সারিপুত্ত এবং মৌদ্গল্যায়নের স্তূপ আছে।

কলিকাতায় এই পূতাস্থিগ্রহণ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রহ্ম, সিংহল, চীন, তিব্বত, সিকিম, ভুটান, নেপাল, কাম্বোডিয়া, শ্যাম ও অন্যান্য বহু দেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধি ও তীর্থযাত্রী কলিকাতায় আসিবেন। ভারত গবর্নমেণ্ট, পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেণ্ট এবং মহাবোধি সোসাইটি বিদেশী প্রতিনিধিদের থাকা খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন।

লণ্ডনে ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্র—জানা গিয়াছে যে, লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিস হইতে "ইণ্ডিয়া নিউজ" নামক একটি ৪ পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা পণ্ডিত নেহরুর একটি বাণী বহন করিয়া ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ করিবে।

সাপ্তাহিকটিতে ভারত হইতে বিশেষভাবে তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য বিশেষ প্রবন্ধ পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদি থাকিবে। প্রকাশ, পণ্ডিত নেহরুর লণ্ডনে অবস্থানের সময় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি হায়দরাবাদ-গোলযোগের সময় স্বয়ং লণ্ডনে থাকিয়া দেখিতে পান যে, ভারতবর্ষের সংবাদ যথাযথরূপে বিলাতী সংবাদপত্রে স্থান পায় নাই।

লণ্ডনে অবস্থিত কোন ডোমিনিয়ন অফিসের পক্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের ইহাই প্রথম চেষ্টা। লণ্ডনে বৈদেশিক দূতাবাসগুলির মধ্যেও একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই নিয়মিত ভাবে ইহার নিজস্ব সাময়িকপত্র বাহির করিয়া থাকে।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে সংস্কৃত—কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। পার্শী ও পুস্তু সংস্কৃত হইতে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত এবং অনেক শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। এই কারণেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানের কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় যে কারণে সংস্কৃত ভাষা অবশ্য পঠনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দিল্লীস্থিত আফগান প্রতিনিধির এক পত্রে কারণটি প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্য প্রদেশের স্পীকার শ্রীযুক্ত ধনশ্যাম সিং গুপ্তকে তিনি লিখিয়াছেন—

"পারসি ভাষা এবং পুস্তু ভাষা প্রত্যক্ষভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। এই দুই ভাষায় আজিও বহু সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। পুস্তুকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিবার অভিপ্রায় লইয়াই সংস্কৃতকে অবশ্য পঠিতব্য ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।" ইহাতে বোঝা যায়, সংস্কৃত যে এশিয়ার ভাষা-জননী, বহু ভাষার জন্মদাত্রী, একথা শিক্ষিত আফগান সমাজ সম্যক্‌রূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও সংস্কৃত ভাষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য—২৬শে অগ্রহায়ণ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে শ্রীঅরবিন্দকে 'স্যার রামলিঙ্গ চেট্টি জাতীয় পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দ নিম্নোক্ত মর্মে এক বাণী প্রেরণ করেন: "মুক্তি-পাগল বিশ্বের নরনারী আজ আত্মিক গুরুর শুভাশীর্বাদ লাভের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। এইরূপ একটি মহান মুহূর্তে আধ্যাত্মিকতার পীঠভূমি ভারতের পক্ষে তাহার গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য-চ্যুত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।"

বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ভারতীয় নরনারীকে যাহাতে বিশেষ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে না হয় তজ্জন্য তাঁহাদের পুরাতন বৃটিশ-ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়া চলিতে হইয়াছিল। এক্ষণে স্বাভাবিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া কর্তব্য।" যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সমর্থন করিয়া তিনি ইহাও উল্লেখ করেন, "ইহার ফল শুভ হইবে।"

উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "কতক লোভ-নীয় নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত অন্যান্য রাষ্ট্র-শক্তির ন্যায় শিল্প ও বাণিজ্য সম্পদ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সুসংহত এবং সামরিক বল-বৃদ্ধির দ্বারা ক্ষমতাদ্বন্দ্বেও বিশেষ লাভবান হইতে পারিবে বটে, কিন্তু পরিণামে স্বধর্মচ্যুত হইয়া ভারতের আত্মার মৃত্যু ঘটিবার প্রভূত আশঙ্কা বিদ্যমান।"

বাঙ্গালা সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং—পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—সুযোগ্য বাঙ্গলা ষ্টেনো-গ্রাফারের অভাবে এই প্রদেশে বঙ্গ ভাষার বহুল ব্যবহার সম্ভব হইতেছে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এবং বাঙ্গলা রেখা-লিপি আয়ত্ত করার প্রচেষ্টায় উৎসাহদানের জন্য গবর্নমেণ্ট আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমাংশে একটি প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সরকারী কর্মচারী নির্বিশেষে সকল রেখালিপিকার এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। ইহাতে বাঙ্গালা রেখালিপির যে কোন প্রচলিত প্রণালী অথবা নূতন প্রণালী ব্যবহার করা যাইবে। পরীক্ষার জন্য কোন ফি লাগিবে না। ১৯৪৯ সনের ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে পরীক্ষার্থীদের নাম লিখাইতে হইবে। পরীক্ষায় যিনি প্রথম হইবেন তাঁহাকে ৫০০৲ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। অবশ্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে প্রতি মিনিটে ৬০টি শব্দ লিখিবার ক্ষমতা থাকা চাই।

বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারের প্রসারের পক্ষে আর একটি বাধা হইল টাইপিষ্টদের প্রয়োজনানুরূপ "কি বোর্ড" সহ যথোপযুক্ত টাইপরাইটারের অভাব। বাঙ্গালা টাইপরাইটারের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় উৎসাহদানের জন্য একটি বাঙ্গালা টাইপরাইটারের সর্বোৎকৃষ্ট মডেলের আবিষ্কর্তাকে ২,০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে ইংরেজী "কি বোর্ড" সহ একটি সাধারণ টাইপরাইটিং মেসিনকে কেবলমাত্র "কি বোর্ডের" অক্ষর ও চিহ্নসমূহের পরিবর্তনের দ্বারা বাঙ্গালা টাইপরাইটার হিসাবে ব্যবহারের উপযোগিতার উপর। ১৯৪৯ সনের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় যোগ-দানেচ্ছুদের নাম লিখাইতে হইবে। এজন্য কোন ফি লাগিবে না।

প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুদের নাম এবং অন্যান্য চিঠিপত্র ডেপুটি সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক চিঠিতে বাঙ্গালা রেখালিপি, টাইপরাইটার (যে ক্ষেত্রে যেরূপ) প্রতিযোগিতা—এই কথাটি বসাইতে হইবে।

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব—গত ১লা জানুয়ারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কল্পতরু উৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পৌরোহিত্য করিতে গিয়া পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিদ্ধিলাভে দক্ষিণেশ্বরের ধূলি পবিত্র হইয়াছে এবং এই ধূলি স্পর্শ করিলে যে শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বত্র বিরাজমান;

দক্ষিণেশ্বরের ধূলিসংগ্রহে দূরে অবস্থিত লোকের পক্ষে বাধা থাকিলেও যে যেখানেই থাকুক, তাহার মনে অশুভ বুদ্ধি, অন্যায় চিন্তার সঞ্চার হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণেই তাহার শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে। গুরু পরমহংসদেবের নাম কেবল বঙ্গদেশে নহে, সাধারণের সহজগম্য নহে এমন স্থানেও তাঁহার নাম সুবিদিত।

আজ কল্পতরু উৎসবে ভারতমাতার সন্তান হইয়া তিনি কি বর প্রার্থনা করিবেন? খাদ্য, বস্ত্র বা পানীয় নহে। তিনি প্রার্থনা করিবেন, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, লোকের হৃদয়ে সন্তোষ বিরাজ করুক, ভারতের সন্তান হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল জাতি শান্তিতে থাকুক। যত দুঃখ-কষ্টই আসুক, তাহারা নগ্ন থাকুন তাহাতেও ক্ষোভ নাই, কিন্তু যে স্বাধীনতা পাওয়া গিয়াছে তাহা যেন বজায় থাকে। সহস্র বৎসর পর স্বাধীনতা পাওয়া গিয়াছে; সুদীর্ঘ তামসী রাত্রি কাটিয়াছে; গান্ধীজী প্রমুখ মহান্ নেতৃবৃন্দের আত্মোৎসর্গে, সহস্র সহস্র নরনারীর বলিদানে স্বাধীনতা আসিয়াছে; আজ তাই শুধু এই কামনা, কোন দুঃখ কোন কষ্টের জন্য সেই স্বাধীনতা হারাইবার দুর্বুদ্ধি যেন কাহারও না আসে।

ভারতমাতা আজ সকলের ঘরে বিরাজ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আজ পৃথিবীতে নানা মতবাদের ধূলিজাল ছড়াইয়াছে, হাঙ্গামা বিবাদ নিবারণের লক্ষণ নাই, কে কাহাকে কোন অস্ত্রে পরাভূত করিতে পারিবে তাহার দ্বন্দ্ব চলিতেছে; কিন্তু একমাত্র পরমহংসদেবের ধ্যানই সকল দ্বন্দ্ব শান্ত ও সমাহিত করিতে সমর্থ বলিয়া তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, মূল লক্ষ্য হারাইয়া লোকের মনে নানা বিচার-বিশ্লেষণ জাগিতেছে। স্বাধীনতা লাভের পর খাদ্যবস্ত্রাভাবের কথা বড় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তিনি মনে করেন—এই বিচারবুদ্ধি সর্বনাশা। স্বাধীনতা যখন পাওয়া গিয়াছে তখন দীর্ঘকাল নগ্ন থাকিলেও ইহা রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা যদি বজায় থাকে তবে একদিন উৎপাদন সহায়ে সকল অভাব ঘুচিবেই।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা (বিহার)

আবেদন

১৯২২ সনে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ প্রায় ২৬ বৎসর যাবৎ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সকলের সমবেত চেষ্টায় অতি নগণ্য অবস্থা হইতে ইহা একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠানে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, ছাত্র-নিবাস (Students' Home), পুস্তকাগার ও দরিদ্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালকদের শিক্ষার জন্য একটী অবৈতনিক উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় এই আশ্রমকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। অধিকন্তু যাহাতে সকলের অন্তরে ধর্ম্মভাব প্রবুদ্ধ হয় এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুদার আধ্যাত্মিক আদর্শে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে, তজ্জন্য নিয়মিত ভাবে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরেও শাস্ত্রাদির ক্লাশ ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে এবং ভারত ও ভারতেতর দেশের অবতার পুরুষগণের জন্মতিথি দিবসে তাঁহাদের মহিমামণ্ডিত জীবন ও উদার বাণীও সর্ব্বসমক্ষে আলোচিত হয়।

বলাবাহুল্য, এবম্বিধ জাতীয় উন্নতি বিধায়ক কার্য্যকলাপ পরিচালনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটীকে সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই আশ্রমের জনহিতকর কার্য্যনিচয় সুচারুরূপে সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা করি, সহৃদয় দানশীল দেশবাসী এই আশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্য ও অমূল্য অবদান হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সকলের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপরই এই প্রতিষ্ঠানটীর ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রসার নির্ভর করিতেছে। যে কোন প্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে উহা সাদরে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে:

স্বামী তেজসানন্দ,
সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা
১।১।৪৯

স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি

সম্পাদক

ভারতীয় গণপরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, স্বাধীন ভারতে অধিকাংশ পূর্ণবয়স্ক নরনারীর সম্মতিক্রমে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হইবে এবং ইহাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল অধিবাসীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে। এই রাষ্ট্র হইবে ঐহিক বা বৈষয়িক (secular), অর্থাৎ কেবল ইহকালের বা বৈষয়িক উন্নতিবিধানই ইহার একমাত্র আদর্শ। ইহাতে ইচ্ছানুসারে ধর্মবিশ্বাসে সকলেরই স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু এ সম্বন্ধে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। শান্তি শৃংখলা ও সার্বজনীন ন্যায়-নীতি বিরুদ্ধ না হইলে কোন ধর্ম-সম্প্রদায় ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মসাধককে ধর্মশিক্ষা-দান ধর্ম-প্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন প্রকার সাহায্য অথবা বাধাদান করা হইবে না।

স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইতে এই ভাবে ধর্মকে বর্জন করিবার কারণ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ভারতে প্রচলিত অধিকাংশ ধর্ম-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা এবং অনেক আচার-অনুষ্ঠানাদি পরস্পরবিরোধী। কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায় অজ্ঞেয়বাদী ও নিরীশ্বর-বাদী। প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির অধিকাংশই কম-বেশি সাম্প্রদায়িক এবং পারস্পরিক বিরোধ-বিদ্বেষে প্রমত্ত। ইহাদের অনেক দৈনন্দিন ব্যবহারিক সমাজ-ব্যবস্থাও অল্পাধিক গণ-তন্ত্রবিরুদ্ধ। এই অ-গণতান্ত্রিক ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব নয়। এই জন্য প্রচলিত সম্প্রদায়গুলির অভিমতকে গণতন্ত্রের দিক দিয়া রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ করা যায় না। এই কারণে স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।'

এই মতের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর হিন্দুগণ বলেন, 'ভারতের অধিকাংশ নরনারীই হিন্দু। বৌদ্ধ জৈন ও শিখধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ইদানীং ভারতে মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ অ-হিন্দুদের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। সুতরাং গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে অধিকাংশ অধিবাসীর সম্মতিমূলে হিন্দুধর্মকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।'

ইহার উত্তরে গণতন্ত্রবাদিগণ বলেন, 'প্রচলিত হিন্দুধর্ম পরস্পরবিবদমান বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এ জন্য কোন ধর্মসম্প্রদায়বিশেষকে রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করা গণতন্ত্রবিরুদ্ধ। অনেক হিন্দুধর্ম-সম্প্রদায় পরধর্ম-অসহিষ্ণু ও সাম্প্রদায়িক।

প্রচলিত অধিকাংশ হিন্দুধর্মসম্প্রদায় এবং ইহাদের নির্দেশে পরিচালিত সমাজ-ব্যবস্থাও গণতন্ত্রসম্মত নহে। এ জন্য গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম রাষ্ট্রধর্ম হইতে পারে না। ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ন্যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ অ-হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং এ দিক দিয়াও কেবল হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত নহে। পক্ষান্তরে ভারতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে পাকিস্তানেও ইসলামধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি যুক্তি-সঙ্গত হইবে না।'

মুসলমানগণ বিশেষ জোরের সহিত দাবী করেন যে, তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ গণতান্ত্রিক। ইহার উত্তরে গণতন্ত্রবাদিগণ বলেন, 'মুসলমান-ধর্মে অ-মুসলমান কোন ধর্মের একেবারেই স্থান নাই। এ জন্য ইহাকে গণতান্ত্রিক বলা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রচলিত মুসলমান-সমাজে অনেকটা গণতন্ত্র আছে সত্য, কিন্তু ইহা মুসলমানধর্মাবলম্বী-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অ-মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের ইহাতে কোন স্থান নাই। এ জন্য ইহাও যথার্থ গণতন্ত্রসম্মত নয়। হিন্দুধর্মে অসংখ্য মত-পথের সম্মানিত স্থান আছে। বৌদ্ধ জৈন শিখধর্ম হিন্দুধর্মের এক একটি শাখা বলিয়া পরিগণিত। নিরীশ্বরবাদী চার্বাক ও সাংখ্য-পন্থিগণও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ হিন্দুই মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ অ-হিন্দু ধর্মের প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই দিক দিয়া হিন্দুধর্মকে বহুলাংশে গণতান্ত্রিক বলা যায় বটে, কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অনেক সম্প্রদায় কম-বেশি সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। এই জন্য হিন্দু-ধর্মকে সর্বাংশে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। দুঃখের বিষয়—হিন্দুধর্ম সনাতন শাশ্বত এবং হিন্দুসমাজ পরিবর্তনীয় হইলেও এই দুইটিকে এক মনে করা হয়। হিন্দুধর্মাশ্রিত বলিয়া পরিগণিত প্রচলিত হিন্দুসমাজ একেবারেই গণতান্ত্রিক নয়। কারণ, ইহা ভেদ বিরোধ অনৈক্য ও বৈষম্যপূর্ণ।'

ভারতের একশ্রেণীর রাষ্ট্রনায়কগণ প্রচার করেন যে, হিন্দুধর্ম হিন্দুদের ঐহিক উন্নতির বিরোধী। কারণ, তাঁহাদের মতে হিন্দুশাস্ত্র বিষয়-বিরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য বটে, এই মহান শাস্ত্র এক শ্রেণীর নিবৃত্তিপন্থী নরনারীকে শিক্ষা দেন যে, ইহকালের সুখ-দুঃখও বন্ধন এবং পরকালের সুখ-দুঃখও বন্ধন। সুতরাং উভয় কালের সকল সুখ-দুঃখের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই মানুষের পক্ষে পরম পুরুষার্থ। যাঁহারা উভয় কালের বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া মনে-প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহারাই এই মোক্ষধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন। সকল দেশে সকল কালেই এই মোক্ষধর্মীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, "নির্বৈরঃ সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ,"—'সকল ভূতের প্রতি বৈরিতাহীন করুণ এবং মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে।' হিন্দুশাস্ত্র প্রবৃত্তি-পন্থী সংসারী নরনারীকে 'ধর্ম' পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'ধর্ম' মানে—যাহা ইহকাল ও পরকালে সর্বাবস্থায় সুখ অনুসন্ধান করায়। তিনি প্রবৃত্তিপন্থী সাংসারিক-গণের সুখের প্রতিবন্ধকগুলি দূর করাকেই 'ধর্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সকল দেশে সকল কালে এই ধর্মানুসরণকারীদের সংখ্যাই বেশি। গীতাকার অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, "তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্",—'উঠ, যশ লাভ কর, শত্রুগণকে নিহত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।' হিন্দুশাস্ত্র আবশ্যক হইলে

হিংসা সহায়েও সুখের পথের বিঘ্নরাশি দূর করিতে প্রবৃত্তিপন্থিগণকে বিশেষ জোরের সহিত স্পষ্টতঃ উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সংসারিগণকে বলিয়াছেন, "সাম দান ভেদ দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ কর, তবে তুমি ধার্ম্মিক।" হিন্দুর সকল শাস্ত্র ইহজীবনেই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য মোক্ষ লাভ করিতে উৎসাহ দেন, পরলোকের ভরসায় বসিয়া থাকিতে বলেন না। সুতরাং হিন্দুধর্ম একেবারে ইহকালের উন্নতি-বিরোধী বিষয়-বিরাগমূলক, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আশ্চর্যের বিষয় যে, তথাপি এক শ্রেণীর রাষ্ট্রনায়কগণ হিন্দুধর্মকে হিন্দুদের ঐহিক উন্নতিবিরোধী এবং এই জন্য ঐহিক রাষ্ট্রের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নয় বলিয়া প্রচার করেন। অনেকের মতে কেবল হিন্দুধর্ম নয়, পরন্তু সকল ধর্মই মানুষের ঐহিক উন্নতি-বিরোধী এবং বিষয়-বিরাগমূলক। রাষ্ট্রনায়কগণ বলেন যে, এই সকল কারণে ভারতের গণতান্ত্রিক ঐহিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য সকল নরনারীকে ধর্মে স্বাধীনতা দিয়াও রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ করা হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন এই—যাঁহাদের দ্বারা এই রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হইবে, তাঁহাদিগকে ধর্মে স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্রকে একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা কি সম্ভব? ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পূর্ণবয়স্ক অধিকাংশ অধিবাসীর ভোটমূলে গঠিত এবং প্রধানতঃ ভারতীয় কর্মচারীদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। এই উভয় শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিই যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কেবল আইন-বলে এই উভয় শ্রেণীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাখা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা অযৌক্তিক। কেন না, ধর্ম একটি নির্বস্তুক (abstract) তত্ত্ব হইলেও অনেক মানুষ তাঁহাদের জীবনে ইহাকে বস্তুতান্ত্রিক আকার প্রদান করেন। স্পষ্ট দেখা যায় যে, যিনি যতটা ধর্মভাবাপন্ন, তিনি তাঁহার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মকে ততটা রূপায়িত বা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পক্ষে ধর্মকে ক্ষেত্রবিশেষে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। প্রকৃত ধার্মিকের দৃষ্টিতে ইহা ভণ্ডামি। এই জন্য ভারতের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালন করিবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্বগৃহে ধর্ম-জীবন যাপন করিয়া রাষ্ট্র-কার্যে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ থাকিবেন, ইহা আশা করা যুক্তিবিরুদ্ধ। বরং অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় কর্মচারী যে ধর্মভাবাপন্ন হইবেন, সেই ধর্মভাব দ্বারা রাষ্ট্রও নানাভাবে প্রভাবিত হইবে, এইরূপ আশা করাই যুক্তিসঙ্গত। এই কারণে ভারতের সকল নরনারীকে—এমন কি রাষ্ট্রীয় কর্মচারিগণকেও ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রাষ্ট্রকে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। পক্ষান্তরে ধর্মভূমি ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসী অধিবাসিগণের রাষ্ট্রকে আইন-সহায়ে বলপূর্বক ধর্মনিরপেক্ষ রাখা কি গণতন্ত্রসম্মত? গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এইরূপ অ-গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রকে আইন-বলে একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ রাখিলে ইহার প্রভাবে জনসাধারণ ক্রমেই নিছক জড়বাদ এবং উচ্ছৃঙ্খল ভোগের দিকে প্রধাবিত হইবে। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফলস্বরূপে ভারতের জাতীয় জীবনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য—ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সত্য ন্যায় নীতি পরার্থপরতা সংযম প্রভৃতির প্রভাব ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহাতে ভারতের—তথা বিশ্বমানব-সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হইবে—ভারতীয় সমাজে নানাবিধ সমস্যাও বৃদ্ধি পাইবে। ধর্মহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "Politics without a religious backing is a dangerous pastime

reacting in nothing but harms to individuals." 'ধর্মসমর্থনহীন রাজনীতি একটি বিপজ্জনক আমোদ, ইহার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তির অনিষ্ট ভিন্ন অন্য কিছু হয় না।' মহাত্মাজীর এই অভিমতের সঙ্গে তাঁহার মতানুসরণকারিগণের সমর্থিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গতি কোথায়? ভারতের বর্তমান ধর্মহীন রাজনীতির অশুভ পরিণতি মহাত্মাজীর মহতী বাণীর সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধুনা ভারতের অধিকাংশ শাসক ও কংগ্রেস-সঙ্ঘের ব্যাপক দুর্নীতির কারণ তাঁহাদের ধর্মহীনতা। সুতরাং ধর্মই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। এইরূপে ভারতীয় রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার বিরুদ্ধে আরও বহু যুক্তি দেখান যাইতে পারে।

এই সকল কারণে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদকে স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতিরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, ইহাতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সম্মানিত স্থান আছে, তথাপি কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা গোঁড়ামি এবং হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির কোনও স্থান নাই। এই জন্য ইহার তুল্য সর্বাঙ্গীণ গণতান্ত্রিক মতবাদ আর হইতে পারে না। ভারতের সকল ধর্মাবলম্বিগণকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠারও ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্বধর্ম-সমন্বয়বাদ পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের দোষগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মপ্রবর্তক এবং তাঁহাদের মতানুসরণকারিগণ এই বিশ্বজনীন সমন্বয়ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা যথার্থ ধর্মজীবন যাপন যাঁহাদের একান্ত কাম্য, তাঁহারা সকলেই এই সার্বভৌম মতের একনিষ্ঠ সমর্থক। মানব-সমাজ হইতে সর্ববিধ ধর্মবিরোধ দূর করিয়া বিশ্বমানবের ধর্মরাজ্যে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠারও ইহাই একমাত্র উপায়। স্পষ্ট দেখা যায় যে, উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদী স্বার্থান্ধ ধর্মধ্বজিগণ ধর্মের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নানা কৌশলে স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধান্বিত। এই জন্য বলা যায় যে, সর্বধর্মসমন্বয় অধিকাংশ নরনারীর স্বাভাবিক মত।

এই মতবাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহা কোন বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ সম্প্রদায় অথবা সকল ধর্মের সারাংশ-সংগৃহীত সমীকরণ নয়, বিভিন্ন ধর্মের বিশেষত্ব নষ্ট করিয়া উহাদিগকে এক-জাতীয়করণ বা একীকরণও নয়, অথবা সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষতার মনোরম আচ্ছাদনে আবৃত নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনমাত্রও নয়; তাই বলিয়া ইহাকে নির্বস্তুক কাল্পনিক তত্ত্বমাত্রও বলা যায় না। সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মতবাদের মূর্তপ্রতীক। এই মহাপুরুষ নিজ জীবনে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রমুখ প্রধান প্রধান প্রচলিত ধর্ম সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, "যত মত তত পথ।" বিভিন্ন ধর্ম যে ঈশ্বর-লাভের বিভিন্ন উপায় এবং উহাদের লক্ষ্য যে পরস্পরবিরোধী নয়, এই মহান সত্য তাঁহার সাধনালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও যে একাধারে সম্মিলিত হইতে পারে তিনি তাহাও সন্দেহাতীত ভাবে নিজ জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনীতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা কার্যতঃ প্রদর্শন করিবার জন্যই ভারতের জাতীয় জাগ-রণের শুভ প্রভাতে সর্বধর্মসমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের . আবির্ভাব। কেবল পরধর্ম-সহিষ্ণুতা-প্রদর্শন নয়, পরন্তু সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও স্ব স্ব ধর্ম কিরূপ ভাবে পালন করা যাইতে পারে, এই যুগধর্মাচার্য উহা কার্যতঃ স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরবিশ্বাসী, স্বপ্নরাজ্যে বিচরণকারী কিন্তু অকপটচিত্তে তত্ত্বান্বেষী, শুভেচ্ছা-প্রণোদিত, ধর্মগ্রন্থসমূহ-সমাদরকারী, সাকারবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নাস্তিক, বুদ্ধিজীবী এবং নিরক্ষর সকলের নিকটই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহতী বাণী বহন করিয়াছেন।" এই মহাপুরুষ-দ্বয়ের প্রচারিত সমন্বয়বাদ গ্রহণ করিলে কোন মতাবলম্বীকেও কোন কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না,—বর্জন করিতে হইবে কেবল সাম্প্রদায়িকতা সংকীর্ণতা কূপমণ্ডূকতা গোঁড়ামি অসহিষ্ণুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই অনর্থগুলি পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রেই অতীব নিন্দনীয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্বধর্মসমন্বয় কোন ধর্মবিশেষ নয়, পরন্তু ইহা ধর্মমাত্রেরই মুখ্য নীতি। সুতরাং এই বিশ্বজনীন নীতিকে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইহা গ্রহণ করিলে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ধর্মে সকল নরনারীকে স্বাধীনতা দিয়া এই নীতিই পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু পরোক্ষভাবে এই নীতি গ্রহণ করার ফলে ইহা সাধারণের দৃষ্টিতে জড়বাদ-সমর্থনতুল্য বিভ্রান্তিজনক হইয়াছে। এ জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বধর্মসমন্বয়-নীতি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি বলিয়া পরিগৃহীত হওয়া সঙ্গত। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সর্বধর্মসমন্বয়বাদই কার্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। ইহা গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতিরূপে গৃহীত হইলে ইহার প্রভাবে প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়সমূহ সাম্প্রদায়িকতা পরধর্ম-অসহিষ্ণুতা সংকীর্ণতা গোঁড়ামি হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমেই অধিকতর ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ভেদ বিরোধ বৈষম্য বিমুক্ত হইয়া সাম্য মৈত্রীপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত আকার ধারণ করিবে, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নরনারীর সমবায়ে ভারতে যথার্থ জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে, ধর্মবিরোধ চিরতরে অপসারিত হইয়া ধর্মভূমি ভারতের ধর্মরাজ্যে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি পূর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবমণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে এবং স্বাধীন ভারতের মহান উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

'ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে'

কাব্যশ্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়, সাহিত্য-সরস্বতী

ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে গো—
　　তোমার নাচের তালে,
কানন-বীথি নতুন পাতা
　　সাজায় ডালে ডালে।
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে,
বনের পাখী ওঠে গেয়ে
সকাল-সাঁঝে সূর্য্য-শশী
　　কিরণ-প্রদীপ জ্বালে।

তোমার নাচের ছন্দ লভি',
প্রাণ পেয়েছে এই পৃথিবী,
ওই নাচেরি পরশ পেয়ে
　　আকাশ বারি ঢালে।
সাগর পানে ধায় তটিনী,
শুনি তোমার নূপুর-ধ্বনি
প্রাণ-জাগানো নৃত্য চলে
　　আঁখির অন্তরালে।

শোনানে নেতাজী

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী ভাস্বরানন্দ

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Indian Independence League) অধিনায়ক হইয়াই সুভাষ বাবু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সময়ের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তিনি সব কাজই বিদ্যুদ্বেগে চালাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন যে সংগ্রাম চালাইতে হইলে একটা সামরিক শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করা দরকার। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে থাকিবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। জাপানীদের হাতে কারারুদ্ধ প্রায় ৪০।৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্য ছিল। জাপানী শাসনকর্তারা সুভাষ বাবুকে ঐ সৈন্য ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এই সর্তে যে স্বেচ্ছায় যাহারা সুভাষ বাবুর কাজে যোগদান করিতে চায় তিনি তাহাদিগকে লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিতে পারেন। নচেৎ কাহাকেও বলপূর্বক তিনি লইতে পারিবেন না। এই সর্তানুযায়ী তিনি কয়েক-জন অফিসারকে লইয়া এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় সুভাষ বাবু তাঁহার ফৌজ গঠনের উদ্দেশ্য ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারত-বাসীর কর্তব্য কি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিলেন। দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রথমতঃ কয়েক জন অফিসার তাঁহার কাজে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু যাঁহারা বৃটিশ-বিজয়ে পেনসনের আশা করিতেছিলেন এবং জাপানীদের কার্যে সন্দিহান ছিলেন তাঁহারা সুভাষ বাবুর কাজে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই খবর সমস্ত কারারুদ্ধ সৈন্যের ভিতর প্রচারিত হইয়া গেল। প্রচারের ফলে প্রায় ১৫০০০ সৈন্য সুভাষ বাবুর দলভুক্ত হইল। তিনি এই সৈন্য লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী সমস্ত ভারতীয়রাই সুভাষ বাবুর দলে যোগদান করিলেন। এমন কি দাক্ষিণাত্যের কুলি-সম্প্রদায়, যাহারা মালয়ে রবারের বাগানে কাজ করিত, তাহারাও উৎসাহের সহিত তাঁহার দলভুক্ত হইল। সৈন্য-সংগ্রহের কাজে আশাতীত ফল হইতেছে দেখিয়া তিনি সৈন্যগণকে একটা শাসনতন্ত্রের অধীন করিয়া সুগঠিত সৈন্য-বাহিনীতে পরিণত করিতে মনস্থ করিলেন। এই শাসনতন্ত্রের নাম দেওয়া হইয়াছিল "আজাদ্ হিন্দ্ আর্জি হুকুমত্" (Provisional Government of Free India). এই হুকুমত্ প্রতিষ্ঠান উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা আহূত হয়। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে যাহা প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঘটনাটি এই—সভাটি আহূত হয় একটা বিরাট সিনেমা হলে। যথাসময়ে জনসাধারণ নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। সুভাষ বাবু ঠিক সময়ে জনৈক জাপানী প্রতিনিধির সহিত সভামঞ্চে আরোহণ করিলেন। ২২ জন মন্ত্রীও যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ সুভাষ বাবু দাঁড়াইয়া নূতন শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য সবিস্তার জানাইলেন। তৎপর তিনি নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন: "In the name of the Lord we promise to-day to be loyal to this Provisional Government of Free India and we shall remain so till our

Motherland is freed from foreign domination……" ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়া —"In the name of the Lord" এই কয়েকটী শব্দ উচ্চারণ করিয়াই তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া কোন বাক্য স্ফুরণ হইল না। শ্রোতৃবর্গ অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে দেখা গেল তাঁহার নয়নাশ্রু নির্গত হইতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিলেন হয়ত ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্বের চিন্তায় অভিভূত হইয়া কিংবা কোন অতীত ঘটনার স্মৃতিতে তাঁহার ঐরূপ ভাব হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে, শ্রোতৃগণও সহানুভূতিসূচক অশ্রুধারা সংবরণ করিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে সুভাষ বাবু একখানা রুমালে চোখ মুছিয়া পুনরায় ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পড়িলেন এবং মন্ত্রিগণকে পড়িতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেকেই ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান্তে তাঁহার সহিত করমর্দন করিবার সুযোগ পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। সুভাষ বাবু সর্বশেষে শ্রোতৃবর্গকে বলিলেন, "আজ হইতে প্রত্যেক ভারতবাসী যেন মনে রখেন তিনি স্বাধীন। তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারে যেন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি একজন স্বাধীন ভারতবাসী। সকলেই এই আজাদ্ হিন্দ্ হুকুমতের সদস্য হইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান পূর্বক আপন আপন কর্তব্য পালন করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন।"

উপরোক্ত নবপ্রণীত শাসনতন্ত্রের নেতা হিসাবে সুভাষ বাবু নেতাজী বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে "জয় হিন্দ্" ভারতবাসীদের অভ্যর্থনাসূচক বাণী হইল, "দিল্লী চলো" (On to Delhi) হইল সৈন্যদের জয়ধ্বনি। "ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ্", "আজাদ্ হিন্দ্ জিন্দাবাদ," "নেতাজীকী জয়" ধ্বনিতে মালয়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সভা হইতে বহির্গত হইয়া জনমণ্ডলী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "একি প্রহেলিকা! নিশ্চয়ই কোন এক অপূর্ব ঐশী শক্তি নেতাজীর ভিতর দিয়া খেলা করিতেছে। আমাদেরও কর্তব্য এই অভিযানে যোগদান করিয়া নিজেকে ধন্য করা।"

শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজের শৃঙ্খলা বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল। ঝান্সিরাণীর আদর্শ লইয়া মেয়েদের সহায়তায়ও একটি regiment তৈরী হইয়া গেল। তাহাতে সহস্রাধিক নারী ও বালিকা যোগদান করিলেন এবং পুরুষের অনুকরণে বন্দুক ধরিতে শিখিলেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে সকলের ভিতর এক নব জাগরণের সৃষ্টি হইল। উৎসাহ ও উদ্যমে জনসাধারণের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতার আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সামান্য কাঠবিড়ালী যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিল, সেইরূপ সকল ভারতবাসীই এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নেতাজীর আহ্বানে সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ সাড়া দিল।

এইরূপে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সৃষ্টি হইল। এখন সুভাষ বাবুর নিকট সমস্যা দাঁড়াইল এই বাহিনীর আবশ্যকীয় পোষাক, খাদ্য ও হাতিয়ার প্রভৃতি সংগ্রহ করা। স্বেচ্ছাসেবকসহ সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারে পরিণত হইয়াছিল। এইসব সৈন্যের জন্য বন্দুক, গোলাগুলি, Armoured Cars, Tanks, Anti-aircraft Guns, Bombers এবং Fighters অনেক পরিমাণে জাপানীদের সহায়তায় সংগ্রহ হইয়া গেল। পোষাকও যোগাড় হইল। কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ ও খাদ্য সরবরাহের

জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত তিনি প্রায়ই বিরাট সভার আয়োজন করিতেন। এই সকল সভাতে ভারতীয় আবাল-বৃদ্ধবনিতার উপস্থিতি অনিবার্য ছিল। সভায় তিনি সর্বসাধারণকে তাঁহার কার্যপদ্ধতি ও কার্যের প্রসার সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেন। কোন কোন সভাতে বক্তৃতার সময় তাঁহার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। বক্তৃতাগুলি প্রায় হিন্দুস্থানীতেই হইত। তিনি কখনও প্রায় দেড়ঘণ্টা, কখনও দুই ঘণ্টারও অধিক কাল অনর্গল বক্তৃতা করিতেন।

একবার শোনানের এক ময়দানে মালয়প্রবাসী ভারতীয়গণের এক বিরাট সমাবেশ হয়। ঐ সভায় শতাধিক মাল্য দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সভায় বক্তৃতান্তে সুভাষ বাবু ঐ মালা বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অনেকেই এক একটী মালার জন্য এক লক্ষ ডলারও দিয়াছিলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল এবং আজাদ্ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল। সংগৃহীত অর্থের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ, পোষাক পরিচ্ছদ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা হইতে লাগিল। শিক্ষিত সৈন্যদলের কুচ্ কাওয়াজ দেখিয়া সর্বসাধারণ বিস্মিত হইলেন।

এই সময়ে সর্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য নেতাজী একটি সৈনিক প্রদর্শনীর (Military Demonstration) আয়োজন করিয়াছিলেন। শোনানের মিউনিসিপাল ভবনের বিস্তীর্ণ ময়দানে এই প্রদর্শনী হয়। এক বিরাট Mechanised Army সম্মুখে রাখিয়া নেতাজী বক্তৃতামঞ্চ হইতে প্রায় একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। তিনি পদাতিক সৈন্যদলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি আশা করি তোমরা আদেশ পাওয়া মাত্র শত্রুর সম্মুখান হইতে তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া সমরানলে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তোমরা এই মুহূর্তে আমাকে অনুসরণ করিতে তৈরী আছ কি?" নেতাজীর মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বাহির হওয়া মাত্র শত শত বন্দুকধারী পদাতিক মঞ্চে দণ্ডায়মান নেতাজীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই দেখিয়া নেতাজী সেই মুহূর্তে তাঁহার ডান হাতখানা উত্তোলন করিয়া প্রায় ১০ মিনিট কাল জনতার মনে এক প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্তব্ধীভূত দর্শকবৃন্দ নির্বাক হইয়া যেন তাঁহার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরে তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া সৈন্যদল ও জনতা যথাস্থানে উপবেশন করিলে সৈন্যবাহিনী নানাপ্রকার কলা-কৌশল দেখাইয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। নেতাজীও তৎপরে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের নেতার অলৌকিক ব্যক্তিত্বের কথা বলাবলি করিতে করিতে ফিরিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতেই যেন সকলে স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক নেতাজীর পদানুসরণ করিতে হইবে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই।

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের জন্য শোনানে একটি হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালের আহত ও রুগ্ন সৈন্যদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নেতাজী বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি রোগীদের আনন্দ বর্ধনের জন্য এই হাসপাতালে একটি Concert Hall তৈরী করিয়া দেন। সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাসে দুইবার concert-এর আয়োজন করিতেন। ইহাতে গান, বাজনা ও নৃত্যগীতাদির বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিত। নেতাজীর আগ্রহাতিশয্যে গণ্যমান্য সকলেই উহাতে যোগদান করিতেন। যাহাতে অসুস্থ সৈন্যদের প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে তজ্জন্য তিনি নিজে এই সকল উৎসবে উপস্থিত থাকিতেন। ঐ উপলক্ষে

সৈন্যদের জন্য বিশেষ ভোজেরও ব্যবস্থা করা হইত। মাছ, মাংস ও পোলাও প্রভৃতি খাওয়ান হইত। নেতাজী স্বয়ং ঐসব খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধভাবে তৈরী হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতেন। নেতাজীর উপস্থিতি, তাঁহার অনুগ্রহ ও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান এবং খাদ্য সরবরাহের প্রাচুর্য সৈন্যগণকে নেতাজীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল।

শোনানে অবস্থান কালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বাটীতে আসিয়াছিলেন। সেইদিন ঠাকুর ঘরে তিনি প্রায় আধঘণ্টা কাল ধ্যানাবিষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনাদি করেন। প্রায় একঘণ্টা কাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর তিনি একখানা 'চণ্ডীর' জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় আমার চণ্ডীখানি তাঁহাকে উপহার দেওয়ায় তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

নেতাজী আমাদের মিশনের কাজের এক জন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মিশনের অনাথালয়ের জন্য আবেদন জানাইলে তিনি বাড়ীঘর তৈরী করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। বাড়ী নির্মাণের জন্য তিনি নিজে প্রায় ৫০,০০০ ডলার দান করেন এবং আরোও ৫০,০০০ ডলার সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং আসিয়া Boys' Home-এর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অনাথালয়ের ছেলে মেয়েদের জন্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন; কারণ যুদ্ধকালীন Blackmarket ও Food Control-এর দিনে তিন শ ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে একটা কঠিন সমস্যা হইয়াছিল।

আমাদের মিশনের স্কুলটিকে Indian National School রূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এইস্কুলে Military Training-এর বন্দোবস্ত করা হয় এবং নেতাজী ছেলেদের Demonstration দেখিতে একদিন মিশনে আসেন। অন্য একদিন আসিয়া তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত Concertও শ্রবণ করেন। পঞ্চম বারে তিনি নিজেই আমাদের হলে একটী সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাপানীদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে লইয়া ঐ সভা আহূত হয়। মিশন সম্বন্ধেও অনেক কথা তিনি জাপানী বন্ধুদিগকে বলেন।

নেতাজী যখন দেখিলেন প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কর্মকেন্দ্র শোনান্ হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করিলেন এবং বিভিন্ন পথে সৈন্যদল শোনান্ হইতে রেঙ্গুনে সমবেত হইতে লাগিল। সেখানে উপযুক্ত সৈন্যশিবির তৈরী হইল ও খাদ্য সরবরাহের সুবন্দোবস্ত হইতে লাগিল। প্রত্যেক সৈন্যদলকে সীমান্তে পাঠাইবার পূর্বে নেতাজী তাহাদের জন্য Tea Party-র ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহাদের 'see off' করিতেন। ইহাতে সৈন্যগণ বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইত। নেতাজীর মুখ হইতে আশ্বাস বাণী পাইয়া তাহাদের প্রাণে অস্বাভাবিক শক্তির সঞ্চার হইত। সীমান্ত হইতে প্রত্যাবৃত্ত অনেক যোদ্ধার মুখে শুনিয়াছি তাহারা নেতাজীকে তাহাদের পিতামাতা ও দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। কে বলিবে নেতাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের মূল কারণ কি ছিল? ত্যাগের মূলমন্ত্রে ও পূত সাধুসঙ্গেই কি তাঁহার এমন হইয়াছিল? প্রবল প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী হইতেও যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে তাহা সহজেই অনুমিত হইত।

রেঙ্গুন হইতে দলে দলে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ মণিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নেতাজী মাঝে মাঝে কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য সীমান্তে যাইতে লাগিলেন। দ্রুত অভিযানের বার্তা শোনানে

পৌঁছিতে লাগিল। পেলেম, কোহিমা প্রভৃতি অধিকারের সংবাদও আসিল। ইম্ফলও প্রায় পতনোন্মুখ হইল। কিন্তু বিধাতার চক্র মানব-বুদ্ধির অগোচরে কোন পথে ঘূর্ণিত হইতেছিল কে জানিত?

এদিকে বৃটিশ সৈন্য আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে যখন ইম্ফল হইতে বিমানযোগে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতেছিল, তখন চারজন কুচক্রী আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ হইতে অজ্ঞাতসারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইম্ফলে যাইয়া জাপানী ও ভারতীয় ফৌজের খাদ্য এবং ঔষধাদি সরবরাহের অপ্রাচুর্যের কথা তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেয়। এই গুহ্য খবর পাইয়াই বৃটিশ সৈন্য ইম্ফল পরিত্যাগ না করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইতে থাকে। সেই সময় বাস্তবিকই জাপানী ও ভারতীয় সৈন্যদলের অবস্থা খুব শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছিল। তাই শত্রুর আক্রমণে নিরুপায় হইয়া ভারতীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিতে হইতেছিল। নেতাজী তখন রেঙ্গুনে। জাপানীরা তাহাদের সরবরাহের অসামর্থ্যের কথা নেতাজীর নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে অনতিবিলম্বে রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিতে বলায় তিনি বলিলেন, "আমার সৈন্যদলকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব না।" অবশেষে কয়েক জন মন্ত্রী ও জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া ব্যাঙ্ককে উপস্থিত হন। যে রাত্রিতে তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন তাহার পর দিনই প্রাতঃকালে বৃটিশ সৈন্য রেঙ্গুনে আসিয়া পড়ে। তিনি ব্যাঙ্কক হইতে বিমানযোগে শোনানে পৌঁছিয়াই এক সভায় উৎকণ্ঠিত জনতাকে প্রত্যাবর্তনের কারণ জানাইয়া পুনরায় ভীষণতর বেগে শত্রু আক্রমণের জন্য তৈরী হইতে বলিলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। আবার সকলে পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়া গেল। অনেকেই ভাবিয়াছিল যে নেতাজী হয়ত মর্মাহত হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ঘটিল তাহার বিপরীত! তিনিই আসিয়া যেন সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন।

পুনরভিযানের আয়োজন চলিতেছে এমন সময় খবর শোনা গেল যে জাপানীরা আমেরিকানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই সংবাদ নেতাজীর নিকটও পৌঁছিল। তিনি সেই সময় কার্যোপলক্ষে মালয়ের অন্তর্বর্তী সেরেম্বান নামক স্থানে ছিলেন। খবর পাইয়াই তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া আসিলেন। মন্ত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা শোনান ও তন্নিকটবর্তী স্থানে ছিলেন তাঁহাদিগকে লইয়া নেতাজী একটা Conferenceএ স্থির করিলেন যে সমস্ত ভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘকে ভঙ্গ করিয়া ঐ সব টাকা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করিবেন এবং সমস্ত মন্ত্রীরাই বৃটিশ পুনরধিকারের সময় শোনানে উপস্থিত থাকিবেন। সিদ্ধান্তানুযায়ী সমস্ত অর্থই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করা হইল। তিনি তার পর দিন মত পরিবর্তন করিয়া কয়েকজন মন্ত্রী সহ বিমানযোগে ব্যাঙ্ককে পৌঁছিয়া তথা হইতে সাইগন হইয়া ফরমোসাতে অবতরণ করিলেন। ফরমোসা হইতে জাপান যাওয়া স্থির হইলে বিমান খানা ফরমোসার য়্যারোড্রোম হইতে উঠিয়াই অগ্নিসমাচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই সময় নেতাজীর সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। দুই ঘণ্টা হাসপাতালে অবস্থানের পর তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। জাপানী সমর বিভাগের বিবৃতিতে প্রকাশ তাঁহার দেহ কোন উপায়েই সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়া দেওয়া কিংবা কর্পূরাদি দ্বারা

সংরক্ষিত (Embalm) করা সাধ্যাতীত হওয়ায় ফরমোসাতেই ভস্মীভূত করা হয়? সেই ভস্মাবশেষ মিষ্টার হবিবর রহমানের নিকট দেওয়া হয়। তিনি নেতাজীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। টোকিও হইতে ফিরিবার সময়, ঐ ভস্মাবশেষ নষ্ট হইবার ভয়ে তিনি তাহা কোনও বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট রাখিয়া আসেন। উপযুক্ত সময়ে তাহা ভারতে আনিবার ব্যবস্থা হইবে। এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ সিঙ্গাপুরে আসে ৫ দিন পরে। অবশ্য এই খবর তখন কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পরে এই সম্পর্কে যত খবরই কাগজে বাহির হইয়াছে তাহারও কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া কাহারও মনে হয় নাই। নেতাজীকে সিঙ্গাপুরে দেখিয়া আসিয়াছেন এমন কথাও জনৈক সংবাদদাতা বলিয়াছেন। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী ও সন্দেহজনক নানা-রকম সংবাদই তখন প্রকাশিত হইতেছিল। অবশ্য মিষ্টার হবিবর রহমানের বিবরণে অনেকটা সত্য থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার পক্ষেও নানা কারণে সত্য গোপন করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। নেতাজীর অতীত বীরত্বব্যঞ্জক কর্ম-কুশলতার সহিত অনেকেই বিশেষ ভাবে পরিচিত আছেন। তাঁহার এরূপ অভাবনীয় এবং আকস্মিক মৃত্যুর খবরটা যে শত্রুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার একটা লোক দেখান ব্যাপার সেরূপ ধারণাও অনেকে পোষণ করে। কেহ কেহ বলেন 'এখন ত আর তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের প্রতিবন্ধক কিছু নাই।' উত্তরে কেহ কেহ বলেন 'তিনি তাঁহার কার্যসিদ্ধির অনুকূল সময়ে উপস্থিত হইবেন।' প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক, আমাদের অন্তর চায় তিনি আমাদের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসুন এবং তাঁহার অমিত তেজ, অতুলনীয় বীরত্ব, অসাধারণ চরিত্রবল ও ত্যাগের মহিমায় ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতকে পূর্ণ স্বাধীন করুন এবং দেশের সর্ব-প্রকার দারিদ্র্য দূর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন!

উদ্বোধন

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

ওঠ, ওঠ, বীর তুমি
এ কি তব সাজে?
ভুলে গেছ তুমি যে 'অমৃত-তনয়'
রতন-আকর ওগো তোমার হৃদয়
অবগাহি রত্নাকরে
মণি সহ এস ফিরে
প্রদীপ্ত করো ধরা সেই মণি তেজে
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, একি তব সাজে?
বীর্য্যবান্ সিংহ হায়
হ'লে ভীরু মেষ প্রায়
ত্যজ ভীতি মেষ সম
লভ সিংহ পরাক্রম
করো ধরা প্রকম্পিত ভীষণ গরজে
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, একি তব সাজে?

হৃদয়দর্পণে তোর
লেগেছে কালিমা ঘোর
মু'ছে কালো আবরণ
করো তাঁরে দরশন
মাতো মাতো বীর তুমি জ্ঞানের গৌরবে
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, ওঠ বীর এবে।
বাজাও বিজয় ডঙ্কা
ঘুচুক সকল শঙ্কা
জানুক এ বিশ্ব ভূমি
'অমৃতের পুত্র' তুমি
অমৃত বিলিয়ে দাও সারা বিশ্ব মাঝে
ওঠ, ওঠ, বীর তুমি, একি তব সাজে?

গার্ল গাইড আন্দোলনের ইতিবৃত্ত*

ওয়াল্‌টার উওরিং

অনেকেই হয়ত জানেন যে পৃথিবীর সর্বত্র যে যুব-সংগঠন ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে তা গড়ে তুলতে অনেকখানি সংগঠনশক্তির প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এও সত্য যে 'গার্ল গাইড' আন্দোলন কখনো কোন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নি। এ আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত।

আন্দোলনের মূলে ছিল নারীত্বের মর্যাদা-বোধ—সেই মর্যাদাবোধের জোরে মেয়েরা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তারা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে জীবনের সকল দিকে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা রাখে, তাদের জীবনের আদর্শ পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। তাই বয়স্কাউট আন্দোলনের পৃথিবী ব্যাপী সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে 'গার্ল গাইড' জন্মলাভ করে।

স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত আজ হয় নি, সে অনেক দিন আগের কথা। ১৯০৭ সালে বুয়র যুদ্ধের বীর সৈনিক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল প্রথম মাত্র ২১ জন ছেলে নিয়ে আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। তার তিন বছরের মধ্যে এই আন্দোলন এতদূর জন-প্রিয় হয় যে রাজার অনুরোধে ব্যাডেন পাওয়েল সৈন্যবাহিনী ছেড়ে এসে স্কাউট সংগঠনে আত্ম-নিয়োগ করেন। দুঃসাহসিকতা এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, তাই সহজে তরুণ ছেলেদের তা আকর্ষণ করল, সবাই অনাবিল মুক্ত জীবন, অলক্ষ্য বহির্জগতের নিত্য নূতন আবিষ্কার এবং পারস্পরিক সাহচর্য লাভের নেশায় মেতে উঠল।

বৃটেনের ছেলেদের এই আন্দোলন পরিপূর্ণ ভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে না করতেই মেয়েদের মধ্যে অনুরূপ আন্দোলনের স্পৃহা দেখা দিল। তার ফলে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এবং তাঁর ভগ্নী 'গার্ল গাইড' সংগঠন পরিকল্পনায় মন দিলেন, কিন্তু তা কার্যকরী হল সেদিন যেদিন তিনি বিবাহ করে স্ত্রীর সাহায্য নিয়ে সংগঠনে মন দিলেন।

লেডি ব্যাডেন পাওয়েলই পরে 'গার্ল গাইড' আন্দোলনকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলেন। স্কাউট সংগঠনের আদর্শে তিনি 'গার্ল গাইড' গঠন করেন। এই আন্দোলনকে তিনি কেন্দ্রগত না করে তাকে খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করলেন। আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে লেডি ব্যাডেন পাওয়েল এই আন্দোলনের 'প্রধান-গাইড' নির্বাচিতা হন সেও আজ ৩০ বছর আগের কথা।

পৃথিবীর যে কোন মেয়েই জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে ৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। এইখানেই তারা গণতন্ত্রের সত্যিকারের শিক্ষা পেয়ে থাকে। সে জন্য তাদের 'গাইডে'র প্রতিজ্ঞা এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। 'গাইডে'র আইনে আছে যে সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও গাইডকে সর্বদা প্রফুল্ল থাকতে হবে।

স্কাউটদের মত 'গাইড'রাও মুক্ত স্থানে ছুটির দিনে তাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী নানা ধরনের কাজ করে থাকে। ক্যাম্প-জীবন, পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ এবং হস্ত শিল্প তাদের কাজের প্রধান অঙ্গ। আত্মবিশ্বাস, সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং পরোপকারিতা তাদের সংঘজীবনের আদর্শ।

এমন কি যারা হীনস্বাস্থ্য তারাও সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে গাইড হয়ে অন্যের সাহায্য লাভ করতে পারে। প্রত্যেকটি শিশু হাসপাতালে একাধিক গার্ল গাইড কোম্পানী শিশুদের শুশ্রূষার কাজে নিযুক্ত আছে। এ কাজেও তাদের উৎসাহ অপরিসীম।

এই আন্দোলনের আন্তর্জাতিক রূপই এর বৈশিষ্ট্য। ১৯৩৯ সালে ৩২টি দেশ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। আজ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে এবং এমন কি প্রত্যেক সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা চলেছে; উদ্দেশ্য—নূতন আদর্শে সমাজজীবন গড়ে তোলা, সত্যিকারের গণ-তন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও তারা প্রতি বৎসর যে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের শিক্ষা পেয়ে থাকে তার গুরুত্ব ও অনুপেক্ষণীয়।

---

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

মহামানবের সাধনা সৌধচূড়ে,
হে পরম তব গৈরিক ধ্বজা উড়ে,
শঙ্কিতজন-অন্তরে বাজে তোমারি অভয় শঙ্খ !
মরজীবনের দুঃখদৈন্য গ্লানি
তব আগমনে মহাপরাভব মানি,
চকিতে লুকাল পাতাল-গর্ভে পৃথিবীর ক্লেদপঙ্ক।
তুমি হে মূর্ত্ত অনাদি পরমহংস
সৃজিয়া আপন ব্রহ্মতেজের অংশ
ধন্য করিতে মনুর বংশ এসেছিলে রামকৃষ্ণ।

হে সাধক তব সাধনার জ্যোতি হ'তে
বিবেকানন্দ বাহিরিয়া এ জগতে—
শুনাইয়া গেছে মৃত-মানবেরে অমৃত-সিংহ-ভাষা।
শত শতাব্দী শোনেনি যে মহাবাণী—
শুনি সে বারতা ঘুচিল সকল গ্লানি,
রূপায়িত হ'ল নূতন তীর্থ জাগিল নূতন আশা।
হে ভারতগুরু তাইতো ভারতবর্ষ
নবযুগে তব লভিয়া স্নেহের স্পর্শ,
নবজীবনের নূতন হর্ষ পেয়েছে হে রামকৃষ্ণ।

মসজিদে মঠে গীর্জ্জা দেউল মাঝে
হে ঋষি তোমার সিদ্ধির বীণা বাজে,
ধর্ম্মান্ধের দ্বন্দ্ব ঘুচায়ে দিয়ে গেছ মহামন্ত্র।
সবার উর্দ্ধে তোমার আসন খানি,
তুমি যে দিয়াছ অখণ্ড এক বাণী,
বাইবেল গীতা জেন্দাবেস্তা পুরাণ কোরাণ তন্ত্র
একই সুরে বাজে একটি পরমছন্দে
ভুবন ভরিয়া রূপে রসে গানে গন্ধে
বন্দি তোমায় পরমানন্দে জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িছে শকুন নভে,
আকাশে বসিতে কে দেখেছে তারে কবে ?
গো-ভাগাড়ে সদা সতর্ক তা'র উদ্যত শ্যেন-দৃষ্টি,
বাক্য-বাগীশ পণ্ডিত সেই মত,
উঁচু উঁচু কথা মুখে আওড়ায় কত !
কামিনী এবং কাঞ্চন লয়ে করে নিতি মোহ সৃষ্টি।
'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা' শিখিয়া নিত্য
মনে মনে ভাবি পেয়েছি জ্ঞানের বিত্ত,
কেঁদে মরে তাই মলিন চিত্ত হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ।

মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটায় যারা,
সমাজের মহা-অনিষ্টকারী তা'রা
প্রচারিতে হবে তাহাদের মাঝে তব দর্শিত পন্থা !
জগতের বুকে শান্তি সমন্বয়ে
বিশ্বাসহীন আজো যারা সংশয়ে
ঘুমায় যাহারা কূপমণ্ডূক ঢাকিয়া জীর্ণ কন্থা।
হে মহামানব তোমার অভয়বাণী,
শুনাব তাদের জ্যোতির দেউলে আনি,
জীর্ণ কন্থা ফেলে দিব টানি তব নামে রামকৃষ্ণ।

ত্রিভুবন বুকে প্রেমের মশাল জ্বালি'
দেখায়েছ তুমি মহাকাল মহাকালী
নিখিল জীবের বক্ষ জুড়িয়া চির জাগ্রত বিশ্বে,
তাই মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপ ধরে
চেতনা-দীপ্ত সাধকের অন্তরে
দিয়ে গেছ দেব, পরমমন্ত্র অভাগা আতুর নিঃস্বে।
প্রণমি তোমারে দেবতা পরমহংস
আত্মমায়ায় সৃজিয়া আপন অংশ
ধন্য করেছ মনুর বংশ হে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভারতীয় দর্শনের রূপ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতবর্ষের মাটিতে, ভারতের জলবায়ুতে যে দর্শন গড়ে উঠেছিল ও এখনো সৃষ্টি হচ্ছে তার নাম ভারতীয় দর্শন। দর্শনের রূপ ভারতের নিজস্ব সম্পদ নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির ভেতর দর্শনের রূপ গড়ে উঠেছে, অনন্তকাল ধরে এখনো গড়ে উঠ্‌বে। মানুষই তার চিন্তা দিয়ে দর্শনের উপাদান সৃষ্টি করে, সমাজের পরিবেশ সেই চিন্তাকে পরিপুষ্ট করে, দেশের বুকে ঘাত-প্রতিঘাত ও বিচিত্র ঘটনার প্রবাহও কিছু-না-কিছু প্রভাব তার ওপর বিস্তার করে। এজন্যে দেশভেদে, কালভেদে ও ব্যক্তিভেদে চিন্তার জগতে বিচিত্র ধারার সৃষ্টি হয়। একই লক্ষ্য বা একমাত্র কাম্য হোলেও প্রণালীর তারতম্য তাই দেখা দেয়।

'দর্শন' শব্দটির অর্থ দেখা বা সাক্ষাৎ করা; অন্তত ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা তাই। দর্শনের প্রধান অবলম্বন বুদ্ধি; বুদ্ধির সাহায্য নিয়েই যুক্তি ও বিচারের রূপ গড়ে ওঠে। অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যেতে বুদ্ধিই সাহায্য করে মানুষকে তার যুক্তি বা বিচারের আলোক দিয়ে। জীবনের মধ্যে চলার পথে সংগতি রাখাতেই প্রয়োজন হয় বুদ্ধির। বুদ্ধির সচল রূপের নামই যুক্তি বা বিচার। কিন্তু বুদ্ধিও তার সচলতার জন্যে ধার করে প্রেরণা আত্মবোধির কাছ থেকে; আত্মার প্রকাশেই সে হয় আলোকিত, আত্মার ইংগিত না পেলে সে হয় পঙ্গু ও অচল। ভারতীয় দর্শনে আত্মার অনুসন্ধানই তাই একমাত্র সংগত পথ, আত্মার সাক্ষাৎ পরিচিতিই মানুষের চরম কাম্য!

উপনিষদের মর্মবাণী 'আত্মানং বৈ বিজানথ'; আত্মাকেই আমাদের জান্‌তে হবে। এই আত্মার ধারণা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিচিত্র রকমের হোলেও আত্মারই অভিন্নরূপ পরমসত্যকে বা পরমার্থ বস্তুকে লাভ করার কথা সকল দেশের দর্শন বলেছে। উপনিষৎ নিছক অনুভূতিমূলক শাস্ত্র। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন আত্মদ্রষ্টা। আত্মাকে জানাতেই ছিল তাঁদের সাধনার সার্থকতা। উপনিষৎ অনুভূতিমূলক বোলে উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। বেদের অন্ত বেদান্ত বল্‌তে চরম জানা বা আত্মজ্ঞান। বেদান্তের প্রতিপাদ্যই অপরোক্ষজ্ঞান। বেদান্তও দর্শন, কেন না বেদান্তের মারফতে আমরা চরম সত্যের রূপ জান্‌তে পারি। তাই ভারতবর্ষেই কেন, সকল দেশেই সত্যকে জানার ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের কথা বলা হয়েছে। চরম সত্য এক হোলেও দেখার রকমফেরে বিচিত্র রূপের ও আকারের কথাও দর্শনকারেরা বলেছেন। দর্শনের সত্যিকারের অর্থ হবে তাই পথ বা উপায়। একই সত্যকে যিনি যেমন দেখেছেন তেমনই তিনি বর্ণনা কোরে গেছেন। দ্রষ্টাদের মধ্যেও সেজন্যে মতভেদ আছে। ভারতে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত এই ছটি দর্শনের সৃষ্টিই পরিপ্রেক্ষিতের ভিন্নতা নিয়ে। শংকর যে সত্যকে সাক্ষাৎকার করলেন তার মায়া-নির্মুক্ত বোধির মারফতে, রামানুজও তাঁর

বিচার, বুদ্ধি ও আত্মনিবেদন দিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সেই সত্যকে, অথচ মায়া থাকা বা না-থাকার, ঈশ্বর সগুণ বা নির্গুণ এসব মীমাংসার ভেতর মত-বৈষম্যের ত্রুটী রয়েই গেল। সুখ ও শান্তি সকলে চায়, অথচ দেখা বা দৃষ্টির পরিমাপ-ভেদে সুখ-শান্তির রূপেও বিভেদের সৃষ্টি হয়। মোটকথা দর্শনের একটা দৃষ্টিভংগী থাকে, আর সেই দৃষ্টিভংগী দিয়েই সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন: যত মত তত পথ। পথও যত, মতও তত। সাধনায় ও বিশ্বাসেই যত গণ্ডগোল, কিন্তু চরম সত্যরূপ লক্ষ্যের বেলায় কোন মতভেদের বালাই নেই—একথা বলাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্য। চরম সত্যের পরিমাপও সাক্ষাৎকার দিয়ে নির্ণয় করা হয়, অথচ সাক্ষাৎ-কারের মধ্যেও রূপভেদ আছে—একথা দর্শন-কারেরাই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈতবাদের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভংগী আছে। সে দৃষ্টিতে মায়াকে করেছে বিশ্বসৃষ্টির মূল, মায়াই ভাঙে-গড়ে সংসার, মায়াই নিয়ে আসে দুঃখ-যন্ত্রণার প্রবাহ। দর্শন তাই মায়ার পারে যাবার জন্যে মানুষের প্রাণে জাগায় আকুলতা। মায়ানির্মুক্ত জ্ঞানই তার মতে চরম সত্য। মায়াকে ভারতীয় দর্শন বলেছে প্রকৃতি, অব্যক্ত, শক্তি। মায়াই তিনটি রূপ নিয়ে হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অদ্বৈতবাদে দেখার রূপে তাই বৈচিত্র্য নেই, এককেই সে ভালবাসে, একের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার সার্থকতাই তার কাছে বড়। অদ্বৈতবাদে মায়ার সংগে চরমসত্যের বিবাদ কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, পারমার্থিক ভাবে মায়াও নিজের নাম-রূপকে দেয় বিসর্জন। এই পারমার্থিক অবস্থায় মিলনের ভাব নয়, ঐক্য ও অখণ্ডতার চেতনাই থাকে পরিপূর্ণরূপে।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের আসন নির্বাচিত হয়েছে সবার ওপরে। 'জ্ঞান' বল্‌তে বিশ্বের পরমার্থ বস্তুকে জানা, ইন্দ্রিয় বা বিষয়-জ্ঞান নয়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের মমতা বিষয় ও বিষয়ী—এ দু'জনের ওপরে। আপেক্ষিকতাই তার প্রাণ, পারস্পরিক সম্বন্ধের ভালবাসাই তার একমাত্র সহায়। কিন্তু পরমসত্যের জ্ঞানে আপেক্ষিকতার মালিন্য নেই, অখণ্ডতাকেই সে চায় নিজের স্বভাব বোলে বুঝ্‌তে, নিরপেক্ষ প্রেম ও আনন্দকেই সে চায় নিজের প্রকাশ রূপে চিন্‌তে। এই জ্ঞানে মন, বুদ্ধি ও অহংকারের স্থান নেই। বৌদ্ধিক যৌক্তিকতা এই জ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীরই ধূলি-কণার সামিল। বুদ্ধির বৃত্তি দিয়ে চরমসত্যের প্রতিভাসমাত্র নির্ধারণ করা যায়, কিন্তু অপরোক্ষতার রূপ মোটেই দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকে বুদ্ধিকেই সাক্ষাৎ-কারের একমাত্র বাহনরূপে মেনে নিয়েছেন, অনেকে তা আবার স্বীকারও করেন না। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে অতীব পরিষ্কার; বুদ্ধির নির্ধারণকে সে করেছে পার্থিব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তবে আত্মনির্ণয়ের পথে প্রধান সহায় বোলেও সে বুদ্ধিকে স্বীকার করেছে। বুদ্ধির কাজ সত্য নির্ধারণ করা হোলেও তার রূপের মধ্যে ভেদ আছে। বুদ্ধি পার্থিব ও অপার্থিব দুরকম জিনিষের সত্যতা নির্ণয় করতে উন্মুখ, কিন্তু অপার্থিব বস্তু হিসাবে আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করবার কাজেই তার সার্থকতা বেশী। বুদ্ধি পরমার্থ বা চরম সত্যের আভাসের পরিচয় দেয় মাত্র, আর তা থেকেই ক্রমে অপরোক্ষতার নগ্ন রূপ বিকশিত হোয়ে ওঠে।

ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে উদারতা ও সহিষ্ণুতার ভাব সুপরিস্ফুট। বিচিত্র মতবাদ ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করতে সে কোনদিনই পরাঙ্মুখ নয়। সকলের সংগে যোগসূত্র রেখে প্রত্যেকের

বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলাতেই তার মাধুর্য বেশী। আস্তিক্য ও নাস্তিক্য, শূন্যতা ও সত্তা—এই সকল মতবাদীদের ওপর সমদৃষ্টি রেখে ভারতীয় দর্শন সত্যিকার দেখা বা অপরোক্ষতাকেই বল্‌তে চায় জীবনের কাম্য। জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম সকলের যোগ্যতাকে স্বীকার কোরে নিয়ে, সকলকেই সত্য-নির্ধারণের পথ হিসাবে মেনে ভারতীয় দর্শন বলেছে জীবন-রহস্যের সমাধান করাই মানুষের লক্ষ্য, আর এই লক্ষ্যে পৌছানো সকল পথ দিয়েই সম্ভব। অনুদার মনোভাব সত্য-নির্ধারণের পথে অন্তরায়। পার্থিব দৃষ্টিতে মন বন্ধনের সৃষ্টি কোরে বিচিত্রতার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই মনই মহামায়ারূপে দেখিয়ে দেয় সাক্ষাৎকারের পথ, অথবা বলা যায়, মন নিজের সকল মালিন্য ধুয়ে ফেলে পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভেদভাবেই যত গণ্ডগোল। ভেদ-বুদ্ধিই মায়ার আবরণ সৃষ্টি করে। মায়াই বন্ধন। সুতরাং ভেদবুদ্ধি যেদিন দূর হবে, মিথ্যাপ্রত্যয়ের অন্ধকার যেদিন প্রত্যভিজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌বে, ভারতীয় দর্শনের মতে—সেদিনই সকল সন্দেহের হবে অবসান, সকল কর্মশৃঙ্খল হয় ছিন্ন ও মনের সংকীর্ণতা নির্মল ও স্বচ্ছ হয়, আত্মনির্ণয় রূপ আশীর্বাদও সেদিন পার্থিব মানুষের মাথায় বর্ষিত হয়।

আত্মবিস্মরণরূপ ভ্রমই অভিশাপ। অজস্র দুঃখ-যন্ত্রণার বিষবাষ্প এই অভিশাপের দরুনই সৃষ্ট হয় জগতে। মানুষ অচেতন হয় এই বিষবাষ্পে, চেতনাও ফিরে আসে ক্ষণিকের জন্যে, কিন্তু সত্যিকার চেতনা ফিরে পায় না সে সহজে। যথার্থ চেতনা ফিরে আসে সেদিনই—যেদিন মানুষ বোঝে তার জীবনে ভুল ও সে ভুলকে দূর করার সতিকারের উপায়। ভারতীয় দর্শনে এভুল ভাঙানোর অব্যর্থ উপায়ের ইংগিত আছে। সে ইংগিতকে অনুসরণ করার নামই সাধনা। কৃচ্ছ্রসাধন, বাহ্যিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর, ভাব-প্রবণতা ও কেবলই আহার-বিহারে সংযমের আতিশয্য সত্য-নির্ণয়ের পথে যথাসর্বস্ব নয়। আন্তরিকতা ও আকুলতাই সাধনার একমাত্র পথচারী। ভারতীয় দর্শনে এই সত্য-সাধনার রূপকে দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসন। আত্মসাধনাই ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা। ভারতীয় দর্শন মানুষকে দেখ্‌তে চায় দেবমানব রূপে, মানুষের মোহ-মলিনতাকে করতে চায় স্বচ্ছ ও সাবলীল, অনিত্যতার ভেতর শাশ্বত সত্যের দেয় পরিচয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভই ভারতীয় জীবনের সত্যিকার রূপ। এই প্রত্যক্ষ ও অভিজ্ঞতা মানুষ পার্থিব শরীর থাকার সময়েই লাভ করতে পারে, জীবন্মুক্তি লাভ বর্তমান জীবনেই সকলের সম্ভব হোতে পারে। ভারতীয় দর্শনের বাণী তাই চিরসান্ত্বনা ও অমরত্বের পথে মানুষকে উদ্বোধিত করে। মৃত্যুহীন অমর জীবনের পরিচয় দেওয়াতেই ভরতীয় দর্শনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা।

"যদি জেলেকে বেদান্ত শিখাও, সে বলিবে, তুমিও যেমন আমিও তেমন; তুমি না হয় দার্শনিক, আমি না হয় মৎস্যজীবী। কিন্তু তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন, আর ইহাই আমরা চাই—কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুবিধা।"—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

"আমাদের অভাব অনন্ত ; তাহারই গুটিকতক লইয়া পূর্ব্বতন মহৎ লোকেরা নাড়াচাড়া করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির নবীনতার অভাবে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, বিবেকানন্দ স্বামীও তাঁহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য সেই একই দিকে পরিচালনা করিবেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহৎ লোকেরা আমাদের জাতীয় অভাবের যে দিকটা স্পর্শ করেন নাই, সে দিকটা ভাবিবার কথা আমাদেরও মনে আসে নাই ; তাই অতি সহজেই ধারণা হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ মহাতেজস্বী মহাবাগ্মী মহাপণ্ডিত হইলেও বুঝি যথেষ্ট স্বদেশ-বৎসল নহেন। প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের সহায়তা করিয়াছি, অতএব অধুনা পরিবর্ত্তিত মত প্রযুক্ত প্রকাশ্যতঃ পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করাও কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।"

লেখিকা প্রথমেই ভুল করিয়াছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দ কেশব বাবুর উত্তরাধিকারিত্ব গ্রহণ করিবেন—যুবকদলকে মাতাইয়া তুলিবেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আন্দোলনকারীদিগের পদাঙ্কানু-সরণ করিবেন। কেশব বাবুর প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচীকে তাহার ভ্রান্তির জন্য তিরস্কার করিয়া ভারতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—প্রতীচীর নিন্দাপ্রশংসা তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে মাতাইয়া তুলিয়া যশের তুবড়ীর তারা কাটিতে চাহেন নাই। তিনি দেশাত্মবোধকে জাতীয়তার ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্বামিজীর পত্র পাইয়া লেখিকা সে ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সরল ভাবে ভুল স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশবাৎসল্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে, অপিচ সহস্রগুণে ব্যাপক ও কার্য্যকরী তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে প্রমাণ অধুনা আমাদের পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। তাঁহার প্রতি অযথা সন্দেহারোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি, তাহার সম্যক সংশোধনের ক্ষমতা হইতে বিবেকানন্দ স্বামী আমাদের বঞ্চিত করিয়াছেন।"

স্বামীজী তাঁহার পত্র প্রকাশের অনুমতি দেন নাই। কিন্তু সরলা দেবী সে পত্রের যে দুই একটি অংশ প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া "অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত" হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন, তাহা স্বামীজীর উপযুক্ত :—

"আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন অনিশ্চিত ; যদি যাই তাহাও জানিবেন, ভারতের জন্য।—এ দেশে লোকবল কোথায় ? অর্থবল কোথায় ? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয় জন ? * * * পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা

না করিলে আমরা যে উঠিতে পারিব না, ইহা স্থির ধারণা। * * * জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগ সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার আবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনশীল কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।"

স্বামীজীর এই পত্র সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে মনে আছে, তাহাতেই এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন, যে জাতির মাতা, ভগিনী, দুহিতা পথে ঘাটে যানে লাঞ্ছিতা হয়, সে জাতির প্রধান ও প্রথম ধর্ম্ম—শরীরচর্চ্চা। সরলা দেবী সেই উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া বীরাষ্টমী ব্রতাচরণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন কি না, কে বলিতে পারে?

স্বামীজী যে ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাহার প্রধান প্রমাণ। তাহার আরও বহু প্রমাণের মধ্যে আজ একটির উল্লেখ করিব।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রদর্শনীর জন্য আহূত হইয়া প্যারিসে গমন করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন তথায়। তথা হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় প্যারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ প্যারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী নানাদিগ্দেশাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন আজ এ প্যারিসে। এ মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজনমধ্যে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতির বুধমণ্ডলীমণ্ডিত রাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে?"

স্বামীজীর উক্তিতে এই যে বুকভাঙ্গা বেদনা-বিকাশ, তাহা আমরা পাইয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়—"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই, আমার মা? এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?"

যখন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দেশমাতৃকার চরণে আপনার এই বেদনা নিবেদন করিতেছিলেন, তখন জগদীশচন্দ্র, পর দিন সভায় আপনার আবিষ্কার কিরূপে বিবৃত করিবেন, তাহা ভাবিয়া বিব্রত হইতেছিলেন। তিনি যেন সমুদ্রে পড়িয়া কূল পাইতেছিলেন না। শেষে একান্ত নিরুৎসাহ হইয়া তিনি শয়ন করিয়া বিনিদ্র অবস্থায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সহসা দেখিলেন—সম্মুখে ছায়ামূর্ত্তি—বিধবার বেশ। তিনি কেবল মুখের এক পার্শ্ব দেখিতে পাইলেন। দেহ শীর্ণ—মুখ বিষাদলিপ্ত। আশীর্ব্বাদ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মনের উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, তাহা আর ভাবিলেন না—যেন বিচারের প্রয়োজন নাই—তিনি পূর্ণকাম! পরদিন যখন তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি অতি অল্পসময়ের জন্য এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইলেন—তাহার পরে যেন

অন্ধকার দূর হইয়া গেল—আলোকবিকাশ হইল। কে তাঁহার মুখে কথা দিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না—বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। কে বসু মহাশয়কে আশীর্বাদে ধন্য করিয়াছিলেন? যে চিন্ময়ী জননীকে মৃন্ময়ীরূপে উপলব্ধি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বন্দনা গান করিয়াছিলেন, ইনি কি তিনি? না—যে জননী আপনার শেষ সম্বলও দিয়া একমাত্র পুত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে রাখিয়া ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন তিনি? না—জীবনের পরপারে দেশ-মাতৃকা ও তাঁহার জননী এক হইয়া আসিয়া পুত্রের চিন্তাতপ্ত ললাটে জয়টীকা দিয়া গিয়াছিলেন?

সেদিন বসু মহাশয়ের সাফল্যে স্বামীজীর কি আনন্দ! তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"সেই গৌরবর্ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের জন্মভূমির নাম ঘোষণা করলেন - সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বসু। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন। সে বিদ্যুৎঝঙ্কার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু, ভারতবাসী—বঙ্গবাসী। ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্ব্বগুণসম্পন্না গৃহিণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!" দেশের প্রতি—জাতির প্রতি কিরূপ ভালবাসা এই ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মনে করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ—বঙ্কিমচন্দ্রেরই মত—জানিতেন, দেশাত্মবোধ ধর্ম্মের সহিত না মিশিলে মানুষকে—বিশেষ এ দেশের লোককে—স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগে উৎসাহী করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার প্রসঙ্গে সুধী অরবিন্দ তাহা বলিয়াছেন। যে বল উপর হইতে প্রযুক্ত হয়, তাহা প্রহত করিতে হইলে নিম্ন হইতে প্রবলতর বলের উদ্ভব প্রয়োজন—প্রতিক্রিয়াশীল দমনচেষ্টা প্রবল জাতীয় শক্তির দ্বারা দমিত করিতে হয়। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের মা'র হস্তে ভিক্ষাভাণ্ড নাই, তাঁহার করে খরকরবাল। তিনি 'আনন্দমঠে' ও 'দেবী-চৌধুরাণীতে' বাহুবলের পশ্চাতে যে নৈতিক বল থাকা প্রয়োজন তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। নৈতিক বলের প্রথম উপকরণ ত্যাগ। তাঁহার "সন্তানগণ"—দেশ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—তাহারা দেশমাতৃকা ব্যতীত অন্য মা-ও মানে না। তাহার দ্বিতীয় উপকরণ—আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সঙ্ঘবদ্ধতা। আর তাহার তৃতীয় উপকরণ—ধর্ম্মভাব। দেশসেবা ধর্ম্ম। বহুরূপী কর্ম্মযোগের সাধনার সিদ্ধি—দেশের ও জাতির জন্য কার্য্য। সেই ভাবই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। "The bare intellectual idea of the motherland is not in itself a great driving force, the mere recognition of the desirability of freedom is not an inspiring motive." সেজন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন। স্বামীজী যখন বলিয়াছিলেন—এ দেশে "যিশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না" তখন সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন:—

"এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। * * * ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন। মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল।"

দেশাত্মবোধ যতদিন ধর্মের সহিত এক হইয়া যায় নাই, ততদিন ইংরেজ তাহা আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে করে নাই এবং সেইজন্য রাজনীতিচর্চ্চা যতদিন "আবেদন-নিবেদনে" পর্য্যবসিত ছিল—যতদিন তাহা মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবসরবিনোদনের উপায় ও যশ অর্জ্জনের সোপান মাত্র ছিল, ততদিন ইংরেজ তাহাতে বাধা দেয় নাই। এমন কি যে ইংরেজ কংগ্রেসের পরিকল্পনাকারী তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন, এদেশে ইংরেজের শাসনে যে শক্তির উদ্ভব হইয়াছে—ইংরেজ-শাসনের নির্বিঘ্নতার জন্য তাহার প্রাবল্য দূর করিবার উদ্দেশ্যই—safety valve রূপে কংগ্রেস পরিকল্পিত। কিন্তু ইংরেজ নানা দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে, যখন দেশাত্মবোধ ধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে, তখন তাহার জয়যাত্রায় কেহ বাধা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তাহারা কখন সন্দেহশূন্য হইতে পারে নাই। চিরল মন্তব্য করেন—স্বামী বিবেকানন্দের সিকাগোর ধর্ম্ম সম্মিলনে গমন হিন্দুধর্ম্মমতের পুনরুত্থানের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—কিন্তু তিনি প্রতীচী হইতে কয় জন একনিষ্ঠ শিষ্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে বিজয়কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার নিকট তাঁহার বিদেশের কাজও গৌরবে ম্লান।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার জিলাগুলির শাসন-কার্য্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া মত প্রকাশ-জন্য যে কমিটী নিযুক্ত করেন, তাহাতে বলা হয়, বিপ্লবপন্থী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানা ছাত্রাবাসে স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক পঠিত হইত। তাঁহার রচনার আকর্ষণের কারণ, তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় ধর্ম্মভাব-প্রভাবিত দেশভক্তির উদ্ভব হয়।

এই কমিটীতে একজন বাঙ্গালীও ছিলেন—তিনি ইংরেজ সরকারের চাকুরীয়া। ইহাতে ভার্নি লভেট নামক অন্যতম যে সদস্য ছিলেন, তিনি পরে তাঁহার 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' পুস্তকে বলিয়াছিলেন—স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ—"inculcating nationalism and religion had sunk deep into the minds of many of the educated classes, and not long ago might be seen printed as texts on the walls of the rooms of students in Bengal."

এই সন্দেহের জন্য বেলুড় মঠেরও যে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন—রেলের জন্য প্রয়োজন এই কারণ দর্শাইয়া মঠের জমি সরকারের পক্ষ হইতে কিনিয়া লইয়া মঠ নষ্ট করিয়া দিবার হীন চেষ্টাও হইয়াছিল।

যতক্ষণ দেশাত্মবোধ ধর্ম্মে পরিণতি লাভ না করে তত দিন তাহা সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না—তত দিন তাহার শক্তি দলিত করা বাহুবলে বলী সরকারের পক্ষে সম্ভব। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত দেশাত্মবোধে ধর্ম্মের ভাব ইংরেজের অপ্রীতি উদ্ভাবিত করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইংরেজ যে বহু চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়া শেষে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়াছে, তাহার কারণ—সমগ্র দেশে মাত্র ৮০ হাজারের অধিক লোক স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করে নাই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত

ছিল, কিন্তু যিনি স্বামীজীর উপদেশকে মূর্তি দান করিয়াছিলেন সেই সুভাষচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ শক্তিবলে ঐক্যের বন্ধনে লোককে দেশসেবার কার্য্যে বদ্ধ করিয়া ইংরেজের সিপাহী সেনার উপর অবিচলিত নির্ভরের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর রাজনীতিক অবস্থা ইংলণ্ডকে হীনবল করিয়া দিয়াছিল।

আজ ভারতবাসীর পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বামীজীর জন্মভূমি বাঙ্গালার দান উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করাই যেন এখন আদৃত হইতেছে। কিন্তু তিনি সমাজের ও দেশের যে সকল সমস্যা বহুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়া সে সকলের সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে সকল অনেকে এখন লক্ষ্য করিয়া বিব্রত হইতেছেন।

চতুর ইংরেজ ভেদনীতির দ্বারা ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল করিয়া এ দেশে তাহার প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টায় যখন ভারতবাসীকে মুসলমান ও অমুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে না পারায় অমুসলমানকে আবার বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—তখন যাঁহারা রাজনীতিক সমস্যা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতের রাজানীতিক্ষেত্রে আন্দোলনের ধূলি লইয়া আবির খেলা আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বে বিবেকানন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার সমাধানোপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ বলিয়াছেন, বিবেকানন্দ বীর—তিনি পুরুষসিংহ। তিনি সে সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশী সরকারের আইন বা ব্যবস্থা চাহেন নাই—সে জন্য প্রাণ পণ করিয়া স্বদেশী নায়ক ও বিদেশী শাসকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি ত্যাগী-সন্ন্যাসী নেতার অধিকারে হিন্দুসমাজকে কম্বুকণ্ঠে আহ্বান করিয়া—কুরুক্ষেত্রে মহাসমরক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য তাঁহার মুখমারুতে পূর্ণ হইয়া যেমন নিনাদ করিয়াছিল তেমনই নিনাদে—তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ ও আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন··পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ নীচ জাতি, উহারা অনার্য্যজাতি! উহারা আর আমাদের নহে!

তিনি বিদেশীদিগের মত উহাদিগকে—জাতির শক্তির উৎস সমাজের যে স্তর হইতে উদ্গত হয় সেই স্তরকে—অনুন্নত বলিয়া তাহাদিগের ললাটে কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত করেন নাই। তিনি আমাদিগের সংস্কারকামীদিগের মত তাহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়া "হরিজন" আখ্যাও দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—তাহারা ভারতবাসী, সুতরাং ভাই।

পাশ্চাত্যদিগের শিক্ষার অসারতা দেখাইয়া তিনি স্বদেশবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন:—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা এই মাত্র সম্বল তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর—ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র;

ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' "

ইহা অনুরোধ নহে, অনুনয় নহে, আবেদন নহে—ইহা নির্দ্দেশ, ইহা আদেশ। ইহা আদেশদানাভ্যস্ত কণ্ঠের আদেশ-যে ইহা শুনিবে সে-ই ইহা পালন করিবে। যিনি বিশ্বাস করেন —ভারতবাসী তাঁহার ভাই, ভারতবাসী তাঁহার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী তাঁহার ঈশ্বর, ভারতের মৃত্তিকা তাঁহার স্বর্গ—এই আদেশপ্রদানের অধিকারে তিনিই অধিকারী।

স্বামী বিবেকানন্দের অবদান—জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও দেশাত্মবোধ। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই যে, ধর্ম্মমূলক দেশাত্মবোধ তাঁহার দেশের—বিশেষ বাঙ্গালার তরুণদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়াই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহার সাফল্য দ্রুত হইয়াছিল। সে আন্দোলন যে স্বামিকাবর্জ্জিত হইয়াছিল তাহার কারণ, তাহার প্রেরণা সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশে—সেই উপদেশই কর্ম্মীদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছিল। সে উপদেশ—"স্বধর্ম্ম কর"—কারণ—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

ভগবানের প্রথম কথা "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" —"তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।"

সমাজে যে সমস্যা উদ্ভূত হইবেই তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বের সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে। অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্ম্মকর্ম্ম-সহিত সর্ব্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল।' আজ ভারতেও তাহাই দেখা যাইতেছে।

'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করে, তত পরিমাণে তাহা দুর্ব্বল।" আজ ভারতবর্ষের নেতৃসম্প্রদায়কে যে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহা কে না অনুভব করে?

সেই জন্যই আজ স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী উক্ত—পুনরুক্ত হইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করা প্রয়োজন হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষকে আবার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য পথ নাই।

আজ স্বামী বিবেকানন্দ আর আমাদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ আমাদিগকে প্রকৃত মুক্তির দ্বার দেখাইয়া দিতেছে।

অরবিন্দ বলিয়াছেন, তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের বিশ্বাসানুসারে তাহা তাঁহার উদ্যমের ও সৃষ্টি করিবার শক্তির হিসাবে অতি অল্প। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—

"We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, upheaving that has entered the soul of India and we may—'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of her children."

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও আমাদিগের সমাজে কাজ করিতেছে। কিন্তু আজ তাঁহার আদর্শের প্রয়োজন আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অধিক। যখন তিনি কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আমাদিগের দুর্দ্দিন ছিল, কিন্তু আজ আমাদিগের আরও দুর্দ্দিন, আজ আমাদিগের অভাবও অধিক—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, শিল্প, অন্ন—এ সকলের অভাব ত আছেই, তাহার উপর আবার দুর্নীতি ও অসাধুতা সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। এ সময় বিবেকানন্দের আদর্শই আমাদিগের সমাজকে রক্ষা করিতে পারে। যে দিন বাঙ্গালী ন্যায়ের ও সত্যের জন্য হাসি-মুখে মৃত্যুদণ্ডও গ্রহণ করিয়াছে, সে দিনের মনোভাব বাঙ্গালীকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সে জন্য বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দ্দেশ প্রয়োজন। তাঁহার নির্দ্দেশ তাঁহার রচনাভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছে, শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে তাহা আহরণ করিতে হইবে—বিতরণ করিতে হইবে। বিবেকানন্দ সোসাইটী সেই কাজ করিয়া থাকেন—ব্যাপক ভাবে সেই কাজ করিবার জন্য আবশ্যক কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। সে উদ্যোগ সফল হউক, ইহাই আমার একান্ত কামনা। কারণ, যত শীঘ্র দেশে স্বামী বিবেকানন্দের মত প্রচারিত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই আমাদিগের বাঁচিবার উপায় হইবে। সে জন্য আমি আজ আমার আবেদন জানাইতেছি। আমার আবেদন, এই দরিদ্র দেশে সম্ভ্রমের জন্য লালায়িত উচ্চ পদের অধিকারীদিগের জন্য নহে, আমার আবেদন স্বামীজী যাঁহাদিগকে "দশ হাজার বছরের মমি" বলিয়া অভিহিত করিয়া কার্ল মার্কসের মত বলিয়াছিলেন—

"তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে—নীরবে সয়েছে; তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভাল-বাসা, এত চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম! অতীতের কঙ্কালচয়, এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

তাঁহাদিগের নিকটেও নহে। আমার আবেদন স্বার্থসন্ধ স্বদেশীয়দিগের নিকটেও নহে—সেই দলে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আছেন। আমার আবেদন পদলোভী রাজনীতিকদিগের নিকটে নহে—পদলাভতৃপ্তদিগের নিকটেও নহে। আমার আবেদন, বাঙ্গালার তরুণদিগের নিকট, আর

যাঁহারা বাঙ্গালীর কল্যাণ আপনার কল্যাণ অপেক্ষাও আদরের মনে করেন, তাঁহাদিগের নিকট। আমার সৌভাগ্য—আমি স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়াছি; আমার আরও সৌভাগ্য আমি তাঁহার অবদান শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণকারী বাঙ্গালী তরুণদিগকে তাঁহার প্রভাবপূর্ণ পরিবেষ্টনে তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিয়াছেন—বাঙ্গালাকে ভারতের পরিচালনদণ্ড ব্যবহারের উপযুক্ত বলশালী করিয়াছেন—সত্যই মনে করিয়াছেন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—চিন্ময়ী মা'কে মৃন্ময়ীরূপে দেখিয়াছেন—আনন্দ মঠে দেশাত্মবোধের রত্নবেদী নিষ্ঠার গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া তাহার উপর মা'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাধনার পঞ্চপ্রদীপ সঙ্কল্পের ঘৃতে পূর্ণ করিয়া তাহা লইয়া মা'র আরতি করিয়াছেন—উদাত্ত কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন—"বন্দে মাতরম্"।

তাঁহারা অগ্রসর হউন—বিবেকানন্দের আদর্শ জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করুন—সে জন্য তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র রচনায় উদ্যোগী হউন। দেশমাতৃকার আশীর্ব্বাদে সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে—বাঙ্গালা স্বামী বিবেকানন্দের জননী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্পূজিত হইবে—বঙ্গজননীর সম্মুখে প্রণত হইয়া সকলে বলিবে—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।"

অনির্বচনীয়

দেবল

সতের বুকেতে অসতের আভরণ
কেন এল কেবা জানে ?
মরীচিকা-মায়া মরুপ্রাণ-আবরণ
বৃথা বারি-আশা দানে!
অনন্ত-মন সান্ত কিরূপে হয়
বুঝাইতে নারে ভাষা,
অসীম কিভাবে সসীমের রূপে রয়
জানিবারে নাহি আশা।
নিষ্ক্রিয়-জনে প্রকাশন-অভিমান
উপকথা বলা চলে,
স্বরূপ না ছাড়ি' অরূপের রূপে দান
তবু ঘটে পলে পলে।

নাইট্রোজেন ও মানুষ

ডঃ অভীশ্বর সেন, এম্-এস্‌সি, পিএইচ্-ডি

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ মিলিয়া তৈরী হয় নানা যৌগিক পদার্থ। তাহারাই তৈরী করিয়াছে আমাদের জগৎ, নদনদী, জীবজন্তু, পাহাড়পর্ব্বত ও বায়ুমণ্ডল। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, দুইটি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, অতি সহজে তাহারা পরস্পর ও নানা মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হয়। নাইট্রোজেনের স্বভাব কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির, অন্যান্য পদার্থের সহিত সে সহজে মিলিত হইতে চাহে না। মানুষের দিক দিয়া তাহার এই উল্লেখযোগ্য নির্জীবতার প্রয়োজন আছে। অক্সিজেনের সহিত ইহা সহজে যুক্ত হয় না বলিয়া বাতাসের এতখানি অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মুক্ত অবস্থায় আছে। অক্সিজেন নাইট্রোজেনের পরিমাণকে ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছে। বাতাসের ভিতর নাইট্রোজেনের পরিমাণ উদ্ভিদ ও প্রাণি-জীবনের ঠিক প্রয়োজন মত। অক্সিজেনের মত, বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুব সামান্যও নয় খুব বেশীও নয়। কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নয় যে, বাতাসে ঠিক এই পরিমাণ অক্সিজেনই প্রাণিজগতের পক্ষে অপরিহার্য্য? মানুষ বাতাসে শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেনের সহিত পরিচিত। বাতাসে অক্সিজেনের ঠিক এই অনুপাতে থাকার দুইটি অদ্ভুত কারণ আছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর সমস্ত অক্সিজেনই প্রস্তরস্তরে, লৌহ ও নানা মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হইয়া যায় নাই। অথবা হাইড্রোজেনের সহিত মিলিয়া সমুদ্রের জল প্রস্তুত করে নাই। বাতাসে যতখানি অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় আছে, বাতাসের নাইট্রোজেন ঠিক ততখানিকেই জীবজগতের প্রয়োজন মত ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বাতাসে আছে, তাহার যদি কিছু বেশী থাকিত, তাহা হইলে, মানুষকে আমরা যতদূর জানি তাহার জন্ম কখনই সম্ভব হইত না। ইহা প্রকৃতির একটি অদ্ভুত কাজ। বাতাসের নাইট্রোজেন একটি নির্জীব অলস অকর্ম্মণ্য মৌলিকপদার্থ—অন্ততঃ এই ভাবেই তাহাকে আমরা দেখিয়া থাকি।

ঝড়ের বাতাস—তাহাতেও থাকে শতকরা প্রায় আশী ভাগ নাইট্রোজেন। পৃথিবীর মধ্যে নানা বিপদ, অগ্নির উৎপাত হইতে বায়ুমণ্ডলের এই বিরাট নির্জীব অংশ আমাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাতাসের প্রায় কুড়ি ভাগ অক্সিজেন ও আশী ভাগ নাইট্রোজেন—আমাদের নিকট দুইটিরই সমান প্রয়োজনীয়তা আছে।

নাইট্রোজেন আপাত দৃষ্টিতে নির্জীব ও স্বাধীনতা-প্রিয়, কিন্তু বহু রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে নাইট্রোজেন মিলিত অবস্থায় আছে। নানা পদার্থে আবদ্ধ নাইট্রোজেন উদ্ভিদেরা গ্রহণ করে, সেই নাইট্রোজেন আমাদের খাদ্যের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। কোন না কোন প্রকারের নাইট্রোজেন না পাইলে উদ্ভিদেরা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মাটিতে নাইট্রোজেন আসে দুই ভাবে। কোন কোন উদ্ভিদের শিকড়ে একপ্রকার নাইট্রোজেন-গ্রাহী জীবাণু থাকে, তাহারা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া লয়। উদ্ভিদেরা তাহাদের নিকট সেই নাইট্রোজেন নিজের প্রয়োজন

অনুযায়ী গ্রহণ করে। জীবাণুরা নাইট্রোজেন লইয়া নানা যৌগিক পদার্থে পরিণত করে। যখন উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে, তখন এই নাইট্রোজেনের কিয়ৎ পরিমাণ মাটিতে পড়িয়া থাকে। মাটির উপর নাইট্রোজেন আসে আর এক উপায়ে, ঝড় বৃষ্টির সময় বায়ুমণ্ডলে যখনই কোন কারণে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়, তখন সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরস্পর মিলিত হয়। বৃষ্টির জল এই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থগুলিকে ধুইয়া মাটিতে আনিয়া ফেলে।

এই দুই উপায়ে মাটিতে যে নাইট্রোজেন আসে তাহা কিন্তু প্রচুর নয়। যে জমিতে সার না দিয়া অনেক দিন ধরিয়া শস্য উৎপাদন করা হয়, সে সকল জমির মাটির ভিতর খুব কম পরিমাণ নাইট্রোজেনই পড়িয়া থাকে। এই জন্য একই জমিতে একই রকম শস্যের চাষ করা উচিত নয় ;—অভিজ্ঞ কৃষক নাইট্রোজেনবাহী শস্য (কলাই জাতীয়) ও ধান বা গম পর পর একই জমিতে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডের একজন পুরোহিত (ম্যালথাস) বহুদিন পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, চাষ-বাসের জন্য জমি হইতে যেরূপ শস্য উৎপাদন সুরু হইয়াছে, তাহাতে যে একদিন মাটি হইতে উদ্ভিদ খাদ্য সকল নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে গণনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা যদি সত্য হইত, বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই পৃথিবী এই গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইত। ইহা হইতেই নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা,—বাতাসের নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা, অনুভব করা যায়। অথচ এই নাইট্রোজেন, পৃথিবীর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের *তুলনায়, পরিমাণে কত সামান্য! নাইট্রোজেন* না থাকিলে, মানুষ বা পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণী বাঁচিয়া থাকিত না।

এই শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বৎসর,—যখন মনে হইয়াছিল মাটি হইতে সমস্ত নাইট্রোজেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীতে বহুল খাদ্যাভাব ঘটিবে, তখন মানুষ শিখিয়াছে, কিরূপে এই নির্জীব নাইট্রোজেনকে বন্দী করিয়া মাটির ভিতর পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। মানুষ এক অফুরন্ত নাইট্রোজেন-ভাণ্ডারের সন্ধান আজ পাইয়াছে। মাটির নাইট্রোজেনের আর কোন দিন অভাব ঘটিবার নয়। পৃথিবীতে ব্যাপক খাদ্যাভাবের সম্ভাবনা আজ লুপ্ত হইয়াছে।

বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্দী করিয়া আনিবার কৌশল হইল, বাতাসের ভিতর, ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সময়কার অবস্থার অনুকরণ করা। বৈদ্যুতিক ঝড়ের সৃষ্টি হইতে এই আশ্চর্য্য সম্ভাবনা মানুষের নিকট ধরা দিয়াছে। প্রায় ৩০০,০০০ অশ্বশক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত পদার্থগুলির সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আরো বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। দশ হাজার বৎসরের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের পর, সে আজ নির্জীব বায়ুকে কার্য্যকর রাসায়নিক সারে পরিণত করিতেছে। মানুষের যাহা না হইলে খাদ্যাভাব ঘটিত, তাহার সুনিশ্চয় সৃষ্টি আজ সে করিয়াছে। সে ঠিক সময়েই বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়াছে। যাহাতে মানুষ সুখে বাস করিতে পারে, তাহার জন্য কৃত্রিম উপায়ে, তাহার সংখ্যা হ্রাস করার ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা ভাবাও যায় না। যে সময় এই বীভৎস সম্ভাবনা উপস্থিত হইত, সেই সময়ে মানুষ *তাহাকে দূরীভূত করিয়াছে।*

দক্ষিণেশ্বর

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

এই সেই সিদ্ধ পীঠ, মহাতীর্থ নব ভারতের!
সঞ্জীবনী শক্তি আজো মহান্ প্রাণের
হেথা আছে জাগি'!
আজিও ভারত-আত্মা মহাবিশ্বমানবের লাগি',
হেথা হ'তে বিতরিছে শান্তি-মৈত্রী-প্রেমের বারতা!
চাহিছে সমাজে রাষ্ট্রে জগতের একাত্ম একতা!

জাতিগত ভেদ মাঝে ধর্ম্মের যাহারা,
আনিল নামায়ে নীচে ভ্রমান্ধের পারা,
হীনস্বার্থে বাধালো সংঘাত,
মানুষের মর্য্যাদায় হানিয়া আঘাত—,
মনুষ্যত্ব দিল বিসর্জ্জন,
তাহাদের তরে আজো এই তীর্থে আছে জাগি'
প্রেমময় উদার জীবন!

তিমির-মগন-রাত্রে পান্থ চলে হ'য়ে দিশাহারা,
জানে না কোথায় যাবে—বোঝে নাকো বিবেকের
জাগ্রত ইসারা,
ভুল করে পথ,
অন্তরে পায় না আলো, অন্ধকার দেখে ভবিষ্যৎ!
দিক্‌ভ্রান্ত হে মানব! এখানে আসিয়া দেখ—
আত্মভোলা বরেণ্য তাপস—
কি ঐশ্বর্য্য দেছে রাখি'—দেছে রাখি' কোন্
সুধারস!

কুটিল-কামনা পথে আজি তব কলঙ্কিত রুচি,
তনু মন প্রাণ তব করেছে অশুচি!
তোমাদের হৃদয়ের মাঝে,
চিন্তা আর দিবসের কাজে,
অবরেণ্য জীবনের ছেয়েছে সংশয়—
লভ' নাই বক্ষে তাই শান্তি আর কল্যাণ-অভয়!
চারিদিকে সমস্যার বেড়াজালে ঘিরি
আপনার ক্ষুদ্রতায় বদ্ধ হ'য়ে গণ্ডী মাঝে বেড়াতেছ
ফিরি!

পথভ্রান্ত বেদনা-জর্জ্জর
ফিরে এস জীবন-পথিক!
জীবন-যজ্ঞের হোতা তোমারে আহ্বান করে—
ডাকে তোমা ভারত-ঋত্বিক!
অহং-এর সর্ব্ব বোঝা ভার,
নামায়ে পথের প্রান্তে—হেথা এস,
এই তীর্থে মুক্ত আছে দ্বার!
এই তীর্থে ফিরে এস—এস ফিরে মনুষ্যত্ব মাঝে,
তোমাদের মুক্তি লাগি হেথা কার নভঃ ভরি
জাগে ভারতের গীতা, মিলনের পাঞ্চজন্য বাজে!

সহস্র বর্ষের বাণী এত দিন
ছিল যাহা মূক ভাষাহীন,
দীনতার আবরণে ছিল যাহা সঙ্কুচিত ক্ষীণ—
মুখর হইতে চাহে আজি মহানিখিলের 'পরে,
মহা সমন্বয় লাগি'—মানুষের ভেদ শূন্য বাহিরে
অন্তরে,
দেশে দেশে—রাষ্ট্রে ও সমাজে—
জীবনের প্রতি চিন্তা কাজে!

"আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

"তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে—এই কথাটি বল্‌তে দাও হে ব'ল্‌তে দাও"—গীতাঞ্জলিতে এই প্রার্থনা উৎসারিত হ'য়েছে কবির কণ্ঠ থেকে। আমাদের জীবনের গভীরতম আনন্দ ঈশ্বরের মধ্যে—এ কথা সত্য।

এমন ক'রে মুখোমুখি
সাম্‌নে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে, তা'র
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাই। (গীতাঞ্জলি)

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাক্‌বার আনন্দ যে আস্বাদন ক'রেছে একবার—সে তাঁকে ছাড়া আর কিছুই চাইবে না। তার কাছে কামিনী, কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা সবই নীরস মনে হবে। পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে। ঠাকুরের ভাষায়, শাল পেলে বনাত ভালো লাগে না।

কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করবার উপায় কি? ঠাকুর বলতেন, "তিনটান হ'লে তবে তিনি দেখা দেন। বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর, টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে!

কথাটা এই ঈশ্বরকে ভালোবাস্‌তে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালোবাসে। এই তিন জনের ভালোবাসা, এই তিন টান, একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়।"

কেবলমাত্র পরম প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ সম্ভব, আর ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। কামিনী-কাঞ্চন তো অনিত্য—Earth changes but the soul and God stand sure. (Browning) এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "ওঁ তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্।" ভক্তিরই সাধনা কর, ভক্তিরই সাধনা কর।

কিন্তু ঈশ্বরে মন রাখা সহজ নয়। "মাগ-ছেলের জন্য লোক এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোক কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে?" (কথামৃত) ঈশ্বরের জন্য কাঁদবার লোকের সত্য সত্যই অভাব। বেশীর ভাগ লোকই ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা খাটে, খায়-দায়, ঘুমায়, সিনেমায় যায়, ম্যাচ দেখে আর পরচর্চ্চায় দিন কাটায়। যে রাস্তায় হাঁটলে ঈশ্বর দর্শন হয় তা খুবই দুর্গম। ভালো কুস্তিগীর হ'তে গেলে নিয়মিত-ভাবে কুস্তি শেখার অভ্যাস করা চাই। শরীরচর্চ্চার সাধনাকে এড়িয়ে গিয়ে মল্লবীর হবার কোন উপায় নেই। অধ্যাত্মজীবনের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিও সাধনাসাপেক্ষ। তার জন্য অভ্যাসের ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কামিনী, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠার প্রতি মানুষের চিত্তের একটা স্বাভাবিক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। যাদের মন কামিনীতে বাঁধা পড়ে না

কাঞ্চনে তারা প্রলুব্ধ হয়; কাঞ্চন এবং কামিনীকে জয় করে যারা তারা শেষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠার ফাঁদে প'ড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। বৈরাগ্যের পথ এত কঠিন ব'লেই তো ঈশ্বরের রাস্তায় চলার লোক এত দুর্লভ। He who wants to undertake this rough and difficult journey must renounce all the things of this world and, finally, himself. কামিনীকাঞ্চনের আকর্ষণকে যদিও বা জয় করা গেল, প্রতিষ্ঠার মোহকে জয় করা অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার!

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তা'রে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়
তুমি জানো, মন তোমারে চায়।

A man cannot serve two masters. God is jealous. যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম। যেখানে কামিনী আছে, কাঞ্চন আছে, প্রতিষ্ঠা আছে—সেখানে ঈশ্বর নেই। সব ছাড়লে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়। অনাসক্তি ভিন্ন কোন মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সম্ভব নয়।

কিন্তু আসক্তি গিয়েও যায় না। 'যতবার দীপ জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে।' নিজের সংকল্পের দৃঢ়তাকে আশ্রয় ক'রে জয় করতে চাই চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলিকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সংকল্পের বাঁধ যায় ভেঙে। নিজের সংকল্পের জোরে আত্মজয়ের সাধনা ফলবতী না হওয়ার কারণ আছে। সকল দেশের এবং সকল যুগের মনস্তত্ত্ববিদেরা ব'লে থাকেন, কেবলমাত্র সংকল্পের দৃঢ়তাকে আশ্রয় ক'রে মনের শুধু উপরিভাগের দুর্ব্বলতাগুলিকে জয় করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের কামনাগুলির শিকড় রয়েছে মনের অবচেতন প্রদেশের গভীরে। এই অবচেতন মনকে বশে আনতে গেলে পুরুষকার যথেষ্ট নয়। কেবলমাত্র পুরুষকারকে অবলম্বন ক'রে আপনাকে জয় করতে গিয়েছে যারা—সংগ্রামে তারা পরাজিত হয়েছে বারবার। সেই পরাজয়ের অভিজ্ঞতা তাদের অহঙ্কারকে চোখের জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। নম্রশিরে তারা অবশেষে স্বীকার করেছে, Human will can do nothing without God's. To fight the fight it is not enough to will.

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে?

গীতাঞ্জলির কবির এই প্রার্থনার মূলে রয়েছে সাধকের অধ্যাত্মজীবনের একটি পরম অভিজ্ঞতা। সাদাবস্ত্রখণ্ডকে লাল রঙে রাঙানো দুটো উপায়ে সম্ভব। একটা উপায় কাপড়ে রঙ লাগানো। এতে সময় আর পরিশ্রম লাগে বেশী। আর একটা উপায় বস্ত্রখণ্ডকে রঙের মধ্যে ডুবানো। এই উপায় সহজ। এতে কোন কষ্ট নেই। আমাদের আত্মা যেখানে ঈশ্বরের মধ্যে ডুব দেয় সেখানে তার রঙ বদলাতে বিলম্ব হয় না। আগুনের মধ্যে লোহা রাখলে মরচে পড়া সেই লোহা রাঙা হয়ে উঠ্‌তে কতক্ষণ? আমাদের মনও যদি ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে একবার ডুব দিতে পারে সব জড়তা থেকে তার মুক্তি সহজ-সাধ্য হয়ে যায়, মানুষের রূপান্তর ঘট্‌তে ক্ষণমাত্র বিলম্ব লাগে না। নিজের মনের দুর্ব্বলতাগুলিকে জয় করতে হ'লে ভক্তির পথই তাই প্রশস্ত। জ্ঞানের পথেও আত্মজয় যে অসম্ভব—এমন নয়। কিন্তু সে পথ ক্লেশকর। ঠাকুরের কথামৃতে ভক্তির উপরে তাই এত জোর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি এলে আর কোন ভয় নেই। বাপ যদি ছেলের হাত ধরে—সংসার-অরণ্যে তার আর পথ হারাবার ভয় কোথায়?

অল্ডাস্ হাক্সলি (Aldous Huxley) পড়তে পড়তে কথামৃতের কথাই বারে বারে মনে হয়। তিনি বল্ছেন: ধর্ম্ম হ'চ্ছে স্বাবলম্বনের ঠিক উল্টো। ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ ধর্ম্ম। 'জীবনখানি উজাড় ক'রে সঁপে যে তাঁর চরণমূলে'—পরমেশ্বরের কাছে নিঃশেষে এই আত্মনিবেদনের ভাবই হোল আসল ধর্ম্ম-প্রবণতার লক্ষণ। কাঞ্চন অথবা প্রতিষ্ঠাকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে কেন? কারণ অন্তর এবং বাহিরকে পূর্ণ ক'রে ঈশ্বর রয়েছেন—এই বোধকে অম্লান রাখা অসম্ভব যদি মনকে জুড়ে থাকে ঐশ্বর্য্যের এবং খ্যাতির কামনা। A man cannot serve two masters.

তা হ'লে সাধ্য যদি কিছু থাকে তবে তা হচ্ছে ভক্তি। কারণ বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা। ভক্তিতেই শুধু ঈশ্বর পাওয়া যায়, আর ঈশ্বরের মধ্যেই আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে। অনুক্ষণ ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা (Continual and perfect practice of God's presence)—সহজ নয়। মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বাঁদরের মত কেবলই লাফালাফি করছে। কখনও কামিনীতে, কখনও কাঞ্চনে কখনও প্রতিষ্ঠায়। বিক্ষিপ্ত মনকে একাগ্র করতে হলে অভ্যাস চাই। মনে রাখা চাই সব সময়ের জন্য—এই দেহপ্রাণ তাঁরই অমৃতের পিপাসা মেটাবার পানপাত্র। জীবনের আর কোন সার্থকতা নেই। ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে যেন ভুলে না যাই। তাঁকে পাওয়া হয় নি—এই বেদনা শয়নে স্বপনে যেন মনের মধ্যে বিঁধে থাকে। "যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"

মনকে তাঁর পাদপদ্মে নিঃস্পন্দিত করতে হলে অনাসক্তি দরকার, আর ঈশ্বরের কৃপাই শুধু বিষয়তৃষ্ণা থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে পারে। মনের মলিনতা ধৌত হ'তে পারে শুধু চোখের জলে—ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করে নির্জ্জনে চোখের যে জল ফেলি—সেই জলে। আমিকে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ ক'রে ফেলতে হবে। বাঁশের ভিতরটা একদম শূন্য হয়ে গেলে তবে বাঁশ হয় বাঁশী। আমাদের ভিতরটা রয়েছে আমিতে ভরা। সেই আমিটা নিঃশেষ হয়ে গেলে তবে আমাদের জীবন-বাঁশী তাঁর হাতে সুরে সুরে বাজবে। তাইতো হাক্স্‌লির ভাষায়—"Religion consists in the exact opposite of self-reliance and self-esteem—in total self-surrender to a God···incommensurable and yet suffering himself to be experienced by those who are prepared to accept the conditions upon which that experience may be had. The sacrifice of all the elements of their personality, the respectable no less than the discreditable."* "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—ভালোমন্দ, পাপপুণ্য সব তাঁর পায়ে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে একদম নিরহঙ্কার হ'তে পারলে তবেই মনমধুপের পক্ষে তাঁর চরণপদ্মের মধু আস্বাদন করা সম্ভব। এই জন্যই গীতাঞ্জলিতে কবির কণ্ঠ থেকে বারম্বার যে-প্রার্থনা উৎসারিত হয়েছে তার মূল কথাটী হোল:

"আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্মদলে।"

* Grey Eminence by Aldous Huxley, p. 132.

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্ত্তমান যুগসমস্যা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ

সামাজিক জীব মানুষ শুধু সমাজবদ্ধ হইয়াই বাস করে না, তাহার যাহা কিছু স্বভাববৈচিত্র্য, যত কিছু বিচিত্র গুণাবলী সমস্তই সমাজের দান। সমাজের ভাবধারার বাহিরে মানবিক স্বভাব ও গুণাবলীর অভিব্যক্তি আমরা কল্পনা করিতেও অসমর্থ। কিন্তু সমাজ কখনও অচল নয়, স্থাণু নয়, সমাজ চিরকাল একই স্থানে দাঁড়াইয়া নাই। গতিচঞ্চল সমাজ প্রতি মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে আমাদের অজ্ঞাতসারেই। সমাজের এই গতিপ্রবণতার উৎস সন্ধান করিলে দেখা যায়, মানুষের স্বভাব যেমন সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই অভিব্যক্তি লাভ করে, তেমনি মানুষ নিজেই গড়িয়া তোলে তাহার ইতিহাস। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের স্রষ্টারূপেই সমাজের পটভূমিতে মানুষের প্রকৃত ভূমিকা। মানুষের অনুভূতি, তাহার অভিপ্রায়, তাহার ক্রিয়াশীলতা সমাজদেহকে রূপান্তরের পথে প্রতিনিয়তই পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু সমাজবিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতি, অভিপ্রায়, ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্যই যে শুধু নাই তাহা নয়, উহারা পরস্পরবিরোধী। এই যে বিরোধ - বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতি, অভিপ্রায় এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, কালক্রমে উহা এমন একটা স্তরে পৌছে যখন উহাকে অনিবার্য্যতা নামে অভিহিত করা যায়। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই ভগবদ্বাক্যের মধ্যে এই অনিবার্য্যতার প্রকৃত স্বরূপের পরিচয়ই আমরা পাইয়া থাকি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এমনই এক অনিবার্য্যতা দেখা দিয়াছিল ভারতবাসীর জীবনে যাহার পরিণতিস্বরূপ আবির্ভূত হইলেন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

ইংরেজ-শাসন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেমন পরিবর্ত্তন লইয়া আসিয়াছিল, ইংরেজী-শিক্ষা তেমনি ভারতের মানসজীবনেও আনিল এক বিপুল পরিবর্ত্তন। একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচারকার্য্য, অপর দিকে ব্রাহ্মসমাজের নূতন সমাজগঠনের প্রয়াস, এই দুইয়ের সহিত সত্যিকার গণমানসের কোন সংযোগ ছিল না। তাই এই দুইয়ের চাপে পড়িয়া দেখা দিল নয়া হিন্দু জাগরণ। কিন্তু ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। তাহাদের সকলের দাবী পূরণ করিবার সামর্থ্য এই নয়া হিন্দু জাগরণের ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যে নয়া হিন্দু জাগরণের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল ইতিহাসেই রহিয়াছে তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতের অন্তরতম প্রদেশে সমন্বয়ের জন্য একটা তাগিদ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে মহাভারতের মহামানবের অন্তরাত্মা হইয়া উঠিয়াছিল উদ্বেল। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহাপ্রতিশ্রুতি সার্থক করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হইলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল তাহা আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সংস্রবহীন বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। আন্তর্জ্জাতিক জগতে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়, প্রত্যেক দেশের বৃহত্তর সমাজজীবনে দেখা যায় তাহারই প্রতিফলন। শিল্প-বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে উৎপাদনব্যবস্থায় এক যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও যে কত বিপুল তাহারও আভাস পাওয়া গেল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু বৃহত্তর জনগণের অভাব দূর হইল না। বণ্টনব্যবস্থার বৈষম্যের ফাঁকে সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনী লোকের হস্তগত হইল। বিপুল ঐশ্বর্য্যের পাশেই চরম দারিদ্র্যের নগ্নমূর্ত্তির মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল নূতন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্ববিরোধ। এই স্ববিরোধের মধ্যেই জন্মলাভ করিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ। কার্ল্‌মার্ক্স্‌ এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম উদ্গাতা। যুগাবতার রামকৃষ্ণ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারকর্ত্তা কার্ল্‌মার্ক্স্‌ পরস্পর যে সমসাময়িক ছিলেন, ইহা কোন আকস্মিক ঘটনা কি-না তাহা আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না কিন্তু কলযন্ত্রের আবির্ভাব, শিল্পবিপ্লব, ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজে যে সকল সমস্যা লইয়া আসিয়াছে সেগুলির সমাধানের জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং কার্ল্‌মার্ক্স্‌ উভয়েই যে স্বতন্ত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ যে সকল সমস্যা লইয়া আসিয়াছে এবং মানুষ আজিও ঐ সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই কেন, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

দরিদ্রকে শোষণ করিয়া ধনতন্ত্র পরিপুষ্ট হয়, সাম্রাজ্যবাদ পরিপুষ্ট হয় পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করিয়া। ধনতন্ত্রের পূর্ণ অভিব্যক্তি আবার সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই। অথবা একথাও আমরা বলিতে পারি সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রেরই পরিণত বয়সের রূপ। ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে পুরাতন ধনতন্ত্রবাদী দেশে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কতকটা মীমাংসা হইল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতীচীর ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশের জন্য যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। উপনিবেশে পণ্য ও মূলধন রপ্তানি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিপতিগণ যে লাভ করেন তাহার একটা অংশ ঐ দেশের শ্রমিকরাও পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী দেশেই ধনিক-শ্রমিকের বিরোধের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীবনেও ধনিক ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজার বিরোধের মধ্যে তাহারই প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ল্‌মার্ক্স্‌ ধনতন্ত্রের বিলোপ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠাকেই এই সমস্যা সমাধানের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদের সহিত নাস্তিক্যবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বলিয়া অনেকের কাছে রুচিকর বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধির অতল তল হইতে অমূল্য তত্ত্ব-রত্নরাজি আহরণ করিয়া আবার যখন মানবসমাজের কূলে আসিয়া উঠিলেন, তখন ধনিক-শ্রমিক,

জমিদার-প্রজা, শোষক-শোষিত সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান তাহার নিকট হইতে ভারতবাসী লাভ করিল। মানুষের রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ধর্ম্মজীবনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রাখিয়াই সমাধানের শ্রেষ্ঠ এবং সহজ পথ তিনি বিশ্ববাসীকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান লাভের এমন এক পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা একই সঙ্গে ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ।

আন্তর্জ্জাতিক জগতের শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম যেমন প্রত্যেক দেশের জাতীয় জীবনে ধনিক ও শ্রমিক, জমিদার-প্রজার সংগ্রামরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তেমনি আমাদের পরাধীনতার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা আবার গ্রহণ করিয়াছে ধর্ম্মবিদ্বেষের রূপ। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মধ্যে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়া ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরোধ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও ধর্ম্ম-বিরোধের আকার ধারণ না করিয়া পারে নাই। আজ পাকিস্থান, অচ্ছুৎস্থান প্রভৃতি যে সকল সমস্যা ভারতের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করিতেছে তাহা ধর্ম্মবিরোধেরই পরিণতি। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য নয় মানুষ, মানুষের জন্যই ধর্ম্ম, এই পরমসত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার 'যত মত তত পথ' বাণীর মধ্যে প্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মমত যদি একই ভগবান্ লাভের বিভিন্ন পথমাত্র হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম লইয়া গোঁড়ামি করিবার, ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া করিবার স্থান কোথায়? ধর্ম্মসম্পর্ক-বর্জ্জিত সমাজতন্ত্র যে সমস্যার সমাধান করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, 'যত মত তত পথের' বাণী তাহাই সমাধান করিয়াছে অতি সহজে। কিন্তু ধর্ম্মবিরোধের মীমাংসা হইলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীবিরোধ থাকিয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই দুইটী সমস্যা সমাধানেরও সহজ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শুধু স্বদেশ-বাসীর প্রতিই নয়, সমগ্র মানবজাতির প্রতিই তাঁহার গভীরতম প্রেম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে শুধু নির্ব্বিকল্প সমাধির আত্মানন্দে ভুলিয়া থাকিতে দেয় নাই। মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মধ্যে সহজ মানুষ হইয়া বাস করিবার দাবীই তিনি জগন্মাতার নিকট পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দাবী মঞ্জুরও হইয়াছিল। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবার নিজের মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছিলেন সমগ্র মানবসমাজকেই। মানুষের সহিত তাঁহার এই একাত্মবোধের জন্যই মানুষের সকল দুঃখ-কষ্টকে তিনি নিজের দুঃখ-কষ্ট বলিয়াই অনুভব করিতেন। এই অনুভূতি যে কত গভীর ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব। একদিন একজন মাঝি আর একজন মাঝিকে চড় মারিতেছে দেখিয়া তিনি "আমাকে মারছে, আমাকে মারছে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রহারকারীর অঙ্গুলির চিহ্নও তাঁহার পিঠে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কিরূপ গভীরতম সহানুভূতিতে গলিয়া গেলে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা বাস্তব জীবনে ঘটিতে পারে সাধারণ মানুষ তাহা না বুঝিতে পারিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। গভীরতম প্রেমে নিপীড়িত মানবজাতির দুঃখবেদনাকে তিনি নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। মথুর বাবুর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি যখন দেওঘর গিয়াছিলেন তখন সেখানে সাঁওতালদের মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই হতভাগ্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের পার্শ্বে বসিয়া তাহাদের জন্য অশ্রুমোচনই শুধু করেন নাই, দুর্ভিক্ষের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত নিজেও তাহাদের সহিত অনশন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইবার জন্য মথুর বাবুকে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিতে হইয়াছিল। মথুর বাবু একবার মহালে খাজনা আদায় করিতে যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-বর্ত্তী দুই বৎসর ফসল নষ্ট হওয়ায় প্রজাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। তাহারা নিজেদেরই অন্ন সংস্থান করিতে পারিতেছিল না, খাজনা দিবে কোথা হইতে? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় মথুর বাবুকে তো খাজনা আদায়ের অভিপ্রায় বর্জ্জন করিতে হইলই অধিকন্তু প্রজাদিগের খাওয়া পরা এবং অর্থসাহায্যের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। ধনীর ধন তাহার বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করিবার জন্য তো নয়। মথুর বাবুকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "ধন সম্পদ মায়ের, তুমি ত রক্ষক মাত্র। মায়ের ধন মায়ের সন্তানের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।" জাতীয় সম্পদের বণ্টন-ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনী দরিদ্রের যে বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দূর করিয়া মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণের এমন সহজ ও সরল পথ আর নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন ধনীরা দরিদ্রের ন্যাসরক্ষক (Trustee) কিন্তু জগন্মাতার ধনের রক্ষক হিসাবে দরিদ্রের জন্য ধন ব্যয় করার যে উপদেশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ধনীদিগকে দিয়াছেন এই আদর্শ দরিদ্রের ন্যাস-রক্ষক হওয়ার আদর্শ অপেক্ষাও মহত্তর বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে কি? ধনী দরিদ্রের ন্যাসরক্ষক হওয়ার মূলে কোন sanction বা অনুমোদন নাই বলিয়া আত্মাভিমান এবং দানের অহঙ্কারের মালিন্যে উহা মলিন হইয়া উঠিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জীবসেবার ভিতর দিয়া ভগবৎসেবার যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একদিকে যেমন রহিয়াছে অভিনবত্ব, তেমনি উহাই মানুষের ধর্ম্মজীবনের সহিত তাহার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনেরও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মজীবন কতকগুলি আচার-নিয়মের সমষ্টি নয়, তাহার রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনও নয়। মানুষ তাহার সামাজিক, অর্থ-নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টাকেই ভগবৎসেবায় পরিণত করিতে পারে। এইখানেই তাহার ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত সার্থকতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জীব শিব।" সুতরাং দুঃখীর দুঃখমোচনের মধ্যে দয়া বা করুণার কোন স্থান নাই, উহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভগবানের সেবা, নররূপী নারায়ণের সেবাকে দয়া বলিয়া অভিহিত করিলে উদ্ধত স্পর্দ্ধাই শুধু প্রকাশ করা হয় না, ভগবদর্চ্চনাও ব্যর্থ হইয়া যায়। সেবাভিমান ধর্ম্মজীবনের প্রবলতম অন্তরায়। জীবসেবাকে ভগবৎসেবায় পরিণত করার মূলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ sanction আর কিছু হইতে পারে না।

পৃথিবীতে যত কিছু দুঃখ-দৈন্য সমস্তই আত্ম-স্বরূপবিস্মৃত মানুষ স্বার্থপরতার বশেই সৃষ্টি করিয়াছে। ঔপনিবেশিক অভিলাভের লোভেই ১৯১৪ সালে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই যুদ্ধে জার্ম্মেনী পরাজিত হইলেও উপনিবেশের লোভ দূর হয় নাই। তাই বিশ বৎসর পার হইতে না হইতেই আবার বিশ্বগ্রাসী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধেও ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মেনী এবং জাপান ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু ফ্যাসিইজমের ধ্বংস হইয়াছে কি? আজ বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা, শান্তি ও

গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু ঔপনিবেশিক অতিলাভের লোভ যদি নিঃশেষে শেষ না হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা, শান্তিপ্রতিষ্ঠার আশা কি সত্যই দুরাশা নয়? পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ কতটুকু অংশ গ্রহণ করিবে তাহা নির্ভর করে স্বাধীন দেশরূপে ভারতের মর্য্যাদালাভের উপরে। ভারত স্বাধীন হইলেই শুধু হইবে না। ভারতীয় জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা যদি দূর না হয়, তাহা হইলে সে স্বাধীনতার প্রতি জনগণের কোন শ্রদ্ধাই থাকিবে না। আজ বিশ্বমানবের সম্মুখে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার যে সমস্যা দেখা দিয়াছে একমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথেই তাহার সমাধান হওয়া সম্ভব। বিশ্ববাসীর সম্মুখে "জীব শিব" এই মহাবাণী তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। এই বাণীর ভাবধারার মধ্যেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অব্যর্থ পথের সন্ধান নিহিত। আমরা যদি তাঁহার এই বাণী আমাদের জীবনে অনুসরণ করিতে পারি তাহা হইলেই ভারতে তথা বিশ্বে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। "তুমি সুন্দর তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময়"—কবির এই বাণীও সার্থক হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের অন্তরে শুভ বুদ্ধি দিন!

স্পর্শ-কাঙ্গাল

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত

যে অঙ্গচ্ছটায় হার মানে দিনমণি -
সে আলো সহিতে মোর নাহিক শকতি।
যে রঙ্গে খেলিতে সঙ্গে লইয়া গোপিনী—
মূঢ় আমি অভাজন—নাহি সে ভকতি।

হেরিতে নারিব তব শ্যামরূপখানি—
অজ্ঞানের অন্ধকারে আঁখি অন্ধ মম।
একমাত্র ভিক্ষা মোর ওগো পরশমণি—
স্পর্শ শুধু করে যাও মোরে প্রিয়তম।

কোরানে মলা'ইক বা দেবদূতদের রূপ

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

মলা'ইক্ (মল'ক শব্দের বহুবচন; মল'ক্ 'অল্ক বা 'অলুক্ শব্দের ইস্মি-ফা'ঈল্ অর্থাৎ কর্ত্তৃপদ) এর শব্দগত অর্থ, যে বা যাহা ভগবদ্-বার্ত্তা বহন করিয়া আনে। দেবদূতদের রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরানে বলা হইয়াছে যে ইহারা 'পক্ষ-বিশিষ্ট সংবাদবহনকারী' (রসুলান্ · অজ্ নিঃহ্তিন্ ৩৫; ১)। যদিও কোরানের বিশেষ শ্লোককে পক্ষবিশিষ্ট সংবাদবহনকারী অর্থে অনুবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু এই বিশেষণযুক্ত সংবাদ-বহনকারী অর্থে দেবদূতদের শক্তিশালী রূপে প্রকাশ করাই কোরানের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ 'জনাঃহ্' (বহুবচন অজ্ নিঃহ্) এর প্রকৃত অর্থ বল বা পরাক্রম—ইহা পাখীর বর্ণনায় পাখা, আবার মানুষের বর্ণনায় হস্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বস্তুতঃ দেবদূতগণ কোন শক্তিশালী পুরুষ, পাখী বা অন্য কোন প্রকার জীব নহেন। ইঁহারা ভগবানের বিশেষ অদৃশ্য শক্তি। পয়ঘম্বর বা অবতারপুরুষ ভগবদ্‌বার্ত্তা প্রচার উদ্দেশ্যে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন; আর ইঁহারা অদৃশ্য শক্তিরূপে অবতারপুরুষ ও মহাত্মাদের জন্য ভগবদ্‌বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া সকল সময় মহৎ কাজে উদ্দীপনা দিয়া থাকেন। অনেকের অহেতুক ধারণা আছে দেবদূতগণ যে কোন প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন, এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু কোরানে এইরূপ কোন বর্ণনা নাই; বরং কোরানে ইহার বিপরীত বর্ণনাই দেখিতে পাওয়া যায়। অবিশ্বাসীদের এইরূপ অহেতুক প্রশ্নের উত্তরে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "তৎপর যখন মানবসমীপে পয়ঘম্বরের সাহায্যে সুপথ প্রদর্শিত হইল, তাহাদের মধ্যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রতিবন্ধকই ছিল না যে তাহারা বলিতেছিল 'ভগবান কি আমাদের মতই একজন মানবকে তাঁহার সংবাদবহনকারী হিসাবে পাঠাইয়াছেন? এইরূপ অবিশ্বাসীদের বল যে যদি পৃথিবীতে দেবদূতগণই বাস করিতেন ও তথায় সুখশান্তিতে অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে আমরা (ভগবান) নিশ্চয়ই একজন দেবদূতকে সংবাদবহনকারী রূপে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিতাম (১৭; ৯৪-৯৫)।"

ইহা যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত কথা। মানুষমাত্রই কেবল মানুষকেই যথার্থরূপে প্রণিধান করিতে পারে। মানুষের রাজ্যে ভগবানকে প্রকাশ করিবার জন্য মানুষেরই অবতরণ করা শ্রেয়ঃ। কারণ মানুষই মানুষকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে, অন্য কোন শক্তির সাহায্যে ভগবৎশক্তি উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। তাই ভগবান বলিয়াছেন "যদি পৃথিবীতে দেবদূতগণই বাস করিতেন তাহা হইলে আমরা একজন দেবদূতকেই সংবাদবহনকারী রূপে প্রেরণ করিতাম।" কোরানে ও অন্যান্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এইরূপ অনেক প্রমাণ আছে যে ভক্তগণ যখন প্রথম ভগবৎ-সত্তা প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তখন সেই ভগবৎ-সত্তার রূপ পরিগ্রহকারী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কোরান হইতে মুসার প্রথম ভগবদ্দর্শন উল্লেখ করা যাইতে পারে (৭; ১৪২-১৪৪)। বস্তুতঃ ভগবৎশক্তি সকল সময়ই ভক্তগণকে

সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা উপলব্ধির ব্যাপার। পার্থিব চক্ষে ইহা কখনই দৃষ্ট হয় না। প্রবল বিপক্ষ দলের সম্মুখে যে হজরৎ মোহম্মদ তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ সেই ভগবদনুগ্রহ। এই ভগবদনুগ্রহ ভগবদবিশ্বাসিগণ কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাই কোরানে বর্ণিত হইয়াছে "হে বিশ্বাসিগণ, সেই ভগবদ্-অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের পরাজিত করিবার জন্য অসংখ্য বিপক্ষ সৈন্যের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা (ভগবান) তাহাদের প্রতিকূলে ঝড় বৃষ্টি ও সৈন্যশক্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। বস্তুতঃ ভগবান তোমাদের কার্য্যকলাপ সকলই লক্ষ্য করিতেছেন (৩৩ ; ৯)।"

কোরানের মতে যে দেবদূতের সাহায্যে ভগবদ্বাণী হজরৎ মোহম্মদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহার নাম জিব্রীল্। জিব্রীলের শব্দগত অর্থ ভগবদ্ভক্ত, জিবর্, দাস বা ভক্ত, এবং ঈল্ ভগবান। জিব্রীলকে কোরানে শুদ্ধাত্মা (রূঃহ্-অল্ কুদ্দুস্ ১৬; ১০২) বা বিশ্বস্ত ও পবিত্র আত্মা (রূঃহ্-অল্ আমীন্ ২৬ ; ১৯৩) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই শুদ্ধ ও পবিত্র আত্মাদের প্রধান কার্য্য বিশ্বাসীদের মনে-প্রাণে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলা এবং আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত করা। কোরানে হজরৎ মোহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, "মানব-সমাজকে বল যে এই শুদ্ধাত্মা (জিব্রীল্) ভগবানের নিকট হইতে সত্যের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, যাহাতে বিশ্বাসীদের শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন ; এবং ইহা শুদ্ধাত্মা, ভক্তদের পরম গুরু ও সুসংবাদ-স্বরূপ (১৬ ; ১০৩)।"

জিব্রীল্ নানা প্রকার রূপ নিয়াই হজরৎ মোহম্মদের নিকট ভগবদ্বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। তিনি মানবরূপেও আসিয়াছেন, ও অন্যান্য নানাপ্রকার রূপ নিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু এই সকল রূপ কেবল তিনিই দেখিবার উপযুক্ত, যিনি ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে দিব্যচক্ষু প্রাপ্ত হইলেই কেবল সেই পরম শুদ্ধাত্মার দর্শন লাভ হয় এবং সেই রূপ পার্থিব দৃষ্টির বহির্ভূত।

কোরানে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেবদূতগণ মানবসৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিলেন। মানবসৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁহাদের ভগবদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে অভিহিত করা হয়। যখন তাঁহারা ভগবানের মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পৃষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহারা আশঙ্কিত হইলেন যে তাহাতে হয়ত পৃথিবীতে কেবল অন্যায়, অত্যাচার ও রক্তপাতের বন্যা প্রবাহিত হইবে। কিন্তু ভগবানই কেবল মানবসৃষ্টির গূঢ় রহস্য অবগত আছেন ; তাই তিনি আদমকে (আদি মানব) দেবদূতদের হইতেও গুণসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহারা ভগবৎ-শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়া ভগবান ও আদমকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিলেন। তৎপর আদমকে তাঁহার স্ত্রী সহ স্বর্গীয় উদ্যানে বসবাসের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু শয়তানের প্রলোভনে পাপে লিপ্ত হওয়ায় স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া আদম পৃথিবীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। আবার পরম দয়ালু ভগবান তাঁহাকে সৎ-পথে উৎসাহিত করিলেন ও ক্রমে ক্রমে সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া আদম ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিলেন। কিন্তু যাহারা এই পরম দয়ালু ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া অসৎ পথেই ধাবিত হয়,

তাহারা কখনও ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না (২ ; ৩০-৩৯)।

উল্লিখিত কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিত ও সাধকগণ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এই পার্থিব জগতের ন্যায় মানবজীবন সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ ও ইহার মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান। দেবদূত সৎ ও শয়তান অসতের প্রতীক। দুই বিরুদ্ধ ভাব ও শক্তির সংমিশ্রণ না হইলে কোন কিছুর প্রকাশ হইতে পারে না; তাই শয়তান ও মলা'ইক্—ইহার কোনটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয় না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভালমন্দের প্রতীক মলাইক ও শয়তান পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ভগবান ইচ্ছা করিলেন যে এই উভয় শক্তির সংমিশ্রণ মানব ভগবৎশক্তির পরম রহস্য গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাই তাঁহার সৃষ্টির প্রয়াস। মানব তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। লোক যেমন চেষ্টা দ্বারা ও ভগবদনুগ্রহে হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে তাহার পূর্ব্ব অবস্থা হইতেও বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, মানবের ভগবৎপ্রাপ্তিও যেন তাদৃশ অবস্থা।

মানবকে ভগবৎপথে উন্নীত হইতে হইলে তাহাকে শয়তানের প্রভাব ত্যাগ করিয়া দেবদূতের প্রভাববিশিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে। তাই মানবজীবনে দেবদূত ভগবৎপথে প্রকৃষ্ট সহায়। কোরানে ভক্তদের জন্য দেবদূতদের সকল সময়ই ভগবৎ-পথে সাহায্যকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবদূতগণ সৎ ও অসৎ সকল মানুষকেই ভগবৎ-পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সকল কাজ ও সকল বিষয়ে তাহাদের অন্যায় পথ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা সৎপথে চালিত হয় তাহারা ক্রমে ক্রমে ভগবৎপথে উন্নতি লাভ করিয়া দিব্য চক্ষুদ্বারা তাঁহাদের দর্শন লাভ করেন ও দিব্য কর্ণদ্বারা তাঁহাদের বাক্যাদি পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারেন।

বস্তুতঃ দেবদূতগণ ভক্তদের জন্য পার্থিব ও পরজীবনে পরম বন্ধু ও সহায়ক। যাহারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী তাহাদের দেবদূতগণ সকল সময়ই সাহায্য করিয়া থাকেন। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "যাহারা বলিয়া থাকে 'ভগবানই আমাদের প্রভু', এবং সেইমতে সকল সময়ে দৃঢ়মনা ও স্থির-চিত্ত থাকে, দেবদূতগণ সময় সময় তাহাদের নিকট অবতরণ করেন এবং বলিয়া থাকেন 'ভীত ও দুঃখিত হইও না; বরং আমাদের নিকট হইতে স্বর্গীয় উদ্যানের আনন্দ উপভোগের সুসংবাদ জানিয়া রাখ। আমরা এই জীবনে ও পরজীবনে তোমাদের পরম বন্ধু; তথায় তোমাদের আত্মা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হইবে (৪১; ৩০-৩১)।" বদর যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া হজরৎ মোহম্মদকে উদ্দেশ করিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, "বিশ্বাসীদের যাহা বলিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর। ইহা কি প্রকৃতই যথেষ্ট নহে যে ভগবান তোমাদের তিন হাজার প্রেরিত দেবদূত দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন?—বস্তুতঃ যদি তুমি দৃঢ়চিত্ত ও সত্য পথে চালিত হও, তাহা হইলে যদি এই মুহূর্ত্তে কোন শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলেও ভগবান পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা তোমার সাহায্য করিবেন (৩; ১২৪-২৫)।" দেবদূত-প্রেরণের মহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "বস্তুতঃ ভগবান ইহা পরম সুসংবাদ রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে তোমাদের মন

দুঃখে ও কষ্টে শান্তি লাভ করিতে পারে (৮; ১০)।"

পরম দয়ালু ভগবান্ তাঁহার অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ দেবদূতের সৃষ্টি করিয়াছেন (১১; ১২৯); যাহাতে তাঁহাদের সাহায্যে মানব আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ ভগবানের অপরিসীম দয়া পৃথিবীর সব কিছুতেই ছড়াইয়া রহিয়াছে (৭; ১৫৬) এবং এই দেবদূতগণ তাঁহার অপরিসীম দয়ার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যে মহান ব্যক্তি সেই ভগবৎপথে ধাবিত হয়, ভগবান একজন দেবদূত গুরুস্বরূপ তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "ভগবান দেবদূতদের সাহায্যে আশীর্ব্বাদ ও শান্তির বাণী পাঠাইয়া থাকেন যাহাতে তোমাদিগকে অন্ধকারের গভীরতা হইতে আলোর পথে লইয়া যাইতে পারেন। বস্তুতঃ তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি অপরিসীম দয়ালু (৩৩; ৪৩)।"

কোরানের অন্যত্র (৮২; ১১) দেবদূতদের সদসৎ কাজের পবিত্র ও দয়ালু হিসাবরক্ষক (কিরামান্ কাতিবিন্) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং আমরা যাহা করি তাহার সকলই তিনি অবগত আছেন। বস্তুতঃ এই হিসাব-রক্ষকগণ কোন পার্থিব হিসাবরক্ষকের ন্যায় দোষত্রুটিপূর্ণ নহেন। ইহা অনেকটা রূপক এবং মানব তাহার কাজের ফল স্বরূপই তাহার পরম গন্তব্য স্থানে পৌছিবে, ইহা বলাই এই শ্লোকের আসল উদ্দেশ্য। ভগবান বলিয়াছেন, "আমরা মানবের সকল কাজই তাহার কাঁধে জড়াইয়া রাখিয়াছি, এবং সেই পরম দিনে (বা কিয়ামতের দিনে) সেই হিসাবের বই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত করিব (১৭; ১৩)।" অর্থাৎ প্রত্যেক মানব তাহার কর্ম্ম অনুযায়ীই ফল ভোগ করিবে এবং তাহার কাজের ফল শেষ বিচারের দিনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে ও বুঝিতে পারিবে যে প্রতি কাজের ফলস্বরূপই তিনি সেই পরম স্থান লাভ করিয়াছেন, ইহার গত্যন্তর হইবার নহে।

আমরা কোরানে দেখিতে পাইতেছি যে বিশ্বাস ভগবৎপথে উন্নতিলাভের মূল। আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান সহায় দেবদূত। কোরানের মূল বিষয়সমূহে বিশ্বাস রাখিয়া এবং ধর্ম্মের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া সৎকাজ করিয়া যাওয়াই ইসলামের নির্দ্দেশ। তাই কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "তুমি প্রার্থনার জন্য পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইয়াছ না পূর্ব্বদিকে ফিরাইয়াছ তাহা ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম ভগবান, শেষ বিচারের দিন, দেবদূত, ধর্ম্মপুস্তক, এবং ভগবদ্বাণী-বাহকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; ভগবদুদ্দেশ্যে গরীবদুঃখী, আত্মীয়স্বজন ও পথচারীদের জন্য তোমার সঞ্চিত ধন বিতরণ করা; রীতিমত প্রার্থনা করিয়া ভগবানের নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে চেষ্টা করা ..... এবং সকল দুঃখ-কষ্টে ও দুঃসময়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা। এইরূপ লোকই প্রকৃত সত্যান্বেষী (২; ১৭৭)।"

স্বামী প্রকাশানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের তিনজন শিষ্য—স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্তপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বামী বোধানন্দ অদ্যাপি বর্তমান এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষরূপে গুরুর আরব্ধ কার্য সাধনে নিযুক্ত। স্বামী পরমানন্দ বোষ্টনে এবং স্বামী প্রকাশানন্দ সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী প্রকাশানন্দের জ্যেষ্ঠাগ্রজ, স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে রামকৃষ্ণ-সংঘে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ পঞ্চম সংঘাধ্যক্ষপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ প্রায় বিশ বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারান্তে তথায় গুরুপদে বিলীন হইয়াছেন। শেষ এগার বৎসর তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্কো-স্থিত হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত মন্দিরই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত প্রথম হিন্দু মন্দির।

পূর্বাশ্রমে স্বামী প্রকাশানন্দের নাম ছিল সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ১৮৭৪ সনে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী শিক্ষিত, ধর্মনিষ্ঠ, ও দীর্ঘজীবী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কলিকাতার সার্পেন্টাইন লেনে তাঁহার বাসস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান এবং তৎপুত্র-পৌত্রগণ দ্বারা অধিকৃত। সুশীল বাল্যে স্বগৃহের ধর্মভাবে পরিবর্ধিত হন। মাতৃক্রোড়েই মিষ্টভাষী সুদর্শন বালক প্রাথমিক ধর্মশিক্ষা লাভ করেন। স্বগৃহের বয়ঃস্থা রমণীগণের নিকট তিনি হিন্দু শাস্ত্রের আখ্যানসমূহ শুনিতে ভালবাসিতেন। স্কুলেও তিনি সচ্চরিত্র সহপাঠিগণের সহিতই মিশিতেন। অসচ্চরিত্র বালকগণ তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সুশীল নামটী সার্থক হইয়াছিল। কলেজে পড়িবার কালে তিনি অবসর সময় ধর্মভাবাপন্ন বন্ধুদের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যায় কোন বাগানে বা কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া মনোনীত বন্ধুদের সঙ্গে স্বধর্মবিষয়ক প্রসঙ্গ করিতে তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত।*

ঐ সময় আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সুখ্যাতি ও সাফল্যের সংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয় এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করে। সুশীল ও তাঁহার বন্ধুগণ সাগ্রহে ঐ সকল সংবাদ পাঠ ও আলোচনা করিতেন। কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে আমেরিকায় প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতাবলী পাঠে তাঁহারা নবজীবন ও পরম প্রেরণা পাইতেন। স্বামীজীর যুগোপযোগী ভাবরাশি তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিল। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক তাঁহার ভাবে জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। সুশীল বুঝিলেন, স্বামীজিই এই পতিত ও পরাধীন জাতির উদ্ধারক ও যুগাচার্য। নিজের ও স্বদেশের মুক্তির জন্য এবং জগতের হিতার্থ আত্মদান করিতে স্বামীজী যে মর্মস্পর্শী আহ্বান করিলেন তাহা শুনিয়া সুশীল স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণে এবং তৎপদাঙ্কানুসরণে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন

* ১৯২৭ সনের এপ্রিল সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখুন।

১৮৯০ সন হইতে তিনি বরাহনগর ও আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত ভাবে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্যগণের সঙ্গ করিতেন। তাঁহাদের পূত সঙ্গে ঠাকুরের জীবনী ও বাণী শুনিবার এবং মঠের পূজা, ধর্মপ্রসঙ্গ ও কীর্তনাদিতে যোগ দিবার সুযোগ পাইতেন। ১৮৯৬ সনে তিনি যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন তাঁহার মনে বৈরাগ্য প্রবল হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। পরবর্তী বৎসরে স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইলে সুশীল তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রকাশানন্দ নামে পরিচিত হন।

তরুণ সন্ন্যাসী এখন হইতে স্বীয় গুরুর বিরাট ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকিয়া তাঁহার ভাবরাশি, শিক্ষা ও সাধন দ্বারা জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি অচিরে যুগাচার্য স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ-সংঘের এক প্রধান কর্মী হইয়া উঠিলেন। ১৮৯৮ সনে স্বামীজী তাঁহাকে অন্য এক শিষ্যের সহিত পূর্ববঙ্গে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তদুপলক্ষে ঢাকায় প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতাবলী শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক সমাদৃত হয়। ১৮৯৯-১৯০১ সন পর্যন্ত তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালনাদি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি মধ্যে মধ্যে মিশনের সেবাকার্যেও যোগ দিতেন। ১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে স্বামী প্রকাশানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী বোধানন্দের সঙ্গে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন করেন। উভয়ে ৫ই এপ্রিল হৃষীকেশে উপস্থিত হন। সুদীর্ঘ পথ কোথাও কঠিন, বন্ধুর, কোথাও তুষারাবৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নগ্নপদে তীর্থযাত্রা সমাপন করেন। ঐ তীর্থভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বামী প্রকাশানন্দ একটী প্রবন্ধে ১৯০০ সনের আগষ্ট মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯০২ সনের শেষার্ধ হইতে ১৯০৬ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত হিমালয়ের ক্রোড়ে মায়াবতী নামক স্থানে অবস্থিত অদ্বৈতাশ্রমের পরিচালনা এবং তথা হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' শীর্ষক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদন-কার্যে তিনি সহকারী ছিলেন। মায়াবতী যাইবার পূর্বে কিছুকাল তিনি তপস্যা এবং কাশ্মীরে অমরনাথ ও ভারতের অন্যান্য প্রধানতীর্থ স্থান দর্শন করেন। ১৯০৬ সনের এপ্রিল মাসে তিনি সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারিরূপে প্রেরিত হন। ১৯০৬-১৯১৫ পর্যন্ত প্রায় নয় বৎসর তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বামী ত্রিগুণাতীতকে হিন্দু মন্দিরের কার্যে সাহায্য এবং ১৯১৪ সনে ওরিগন ও ওয়াশিংটন প্রভৃতি স্থানে কৃতিত্বের সহিত বেদান্তপ্রচার করেন।

১৯১৫ সনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের দেহত্যাগ হইলে স্বামী প্রকাশানন্দ হিন্দু মন্দিরের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত পদে তিনি প্রায় এগার বৎসর কার্য করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ঐ পদলাভ করিয়া তিনি দেখিলেন, হিন্দু মন্দিরের নির্মাণার্থ লক্ষাধিক টাকার ঋণ হইয়াছে। তিনি বহুকষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করেন। তাঁহার পরিচালনায় হিন্দু মন্দিরের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় এবং বেদান্ত প্রচার অভূতপূর্ব প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার বক্তৃতা ও ধর্মপ্রসঙ্গে লোকসমাগম বাড়িতে লাগিল। তিনি সুপুরুষ, সুবক্তা ও সুভাষী ছিলেন। অপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। ক্যালিফোর্নিয়ার নানাস্থানে ভ্রমণপূর্বক তিনি বেদান্ত প্রচার করিতেন। যেখানে তিনি যাইতেন ও বক্তৃতা দিতেন সেখানে বহু লোক বেদান্ত শ্রবণে ও অধ্যয়নে আগ্রহান্বিত হইত। কোন কোন স্থানে বেদান্তকেন্দ্র স্থাপনের জন্যও তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯১৫ সনের পানামা প্রদর্শনী উপলক্ষে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। উহাতে তিনি কয়েকটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তথায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ মহাসভার সহকারী সভাপতিরূপেও তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। এইরূপে সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য শহরে বেদান্ত-প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করায় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি সিঞ্চন দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত অধিকার করিতেন। আমেরিকার নরনারীগণ তাঁহার নিকট ধর্মসাধনায় সাহায্য পাইয়া শান্তিলাভ করিত।

১৯২২ সনে হিন্দু মন্দিরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ৮৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উৎসবে স্বামী প্রকাশানন্দ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। মূল ভাষণটি সেই বৎসরের আগষ্ট মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন, "ঈশ্বরপ্রেমোন্মত্ত অনেক দেবমানব এই মর্তধামে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুরের জীবনে দিব্য ভাবরাশি যেমন প্রভূত পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছিল এমনটি আর কোন অবতারের জীবনে দেখা যায় নাই। তাঁহার দিব্য জীবনে এত অলৌকিক শক্তি প্রকটিত, এমন স্বর্গীয় সমন্বয় সংসিদ্ধ, এরূপ ভাগবত ভাবের বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়াছিল যে, আমরা যদি উহার আন্তরিক অনুধ্যান করি তবে তাঁহাকে আরাধনা না করিয়া থাকিতে পারিব না। যদিও এই জীবন ভারতেই আবির্ভূত ও যাপিত হইয়াছিল, উহা কোন দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ্ নহে। ইহা সকল জাতীয় জীবন ও ধর্মসম্প্রদায়ের উর্ধ্বে অবস্থিত। এমন দেবমানব সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থ অবতীর্ণ হন জগতের ধর্মজীবনে নবশক্তি সঞ্চারের জন্য।"

হিন্দু মন্দিরের 'শান্তি আশ্রম' নামে একটি শাখা আছে ক্যালিফোর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মকালে হিন্দু মন্দিরের ছাত্রছাত্রীগণ উক্ত আশ্রমের নিভৃত ও শান্তিপ্রদ পরিবেশে যাইয়া ধর্মসাধনায় মগ্ন হন। ১৯২২ সনের জুন মাসে বিশ জন ছাত্রছাত্রী লইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ শান্তি আশ্রমে গমন করেন। শান্তি আশ্রমে প্রত্যহ তিনবার ধ্যান হইত প্রাঙ্গণস্থিত শাখা-প্রশাখাসমন্বিত ওক্ বৃক্ষের তলে। বৃক্ষের কাণ্ডদেশে ওঁকার ও শিবের প্রতীক অঙ্কিত ছিল। ধ্যানকক্ষের মধ্যে সেই বৎসর শ্রীসারদা-দেবীর সুন্দর বৃহৎ ফটোগ্রাফ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ধ্যান আরম্ভ হইত। ধ্যানের জন্য ঘণ্টা বাজিলে ছাত্রছাত্রীগণ স্ব স্ব কেবিন হইতে ওঁকার উচ্চারণ পূর্বক ধ্যানঘরে যাইতেন। প্রাতঃকালীন ধ্যানে শঙ্করা-চার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' ব্যাখ্যাত হইত। মধ্যাহ্নের ধ্যানান্তে তিনি উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন। সান্ধ্য ধ্যানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ হইত। পূর্বাহ্ণে সাড়ে আটটার সময় এবং অপরাহ্ণে সাড়ে চারটার সময় আশ্রমবাসিগণ আহার করিতেন। দুইবার আহারকালেও স্বামিজী ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা ছাত্রছাত্রীগণের মন সচ্চিন্তায় নিযুক্ত রাখিতেন। সানফ্রান্সিস্কো হইতে ১লা জুন যাত্রা করিয়া পরদিবস তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হন এবং ৩রা জুন হইতে আশ্রমে নিয়মিত ভাবে ধ্যানাদি আরম্ভ হয়। ১৪ই জুন বুধবার সমস্ত রাত্রি ধুনি জ্বালান হয়। সকলেই জাগিয়া ধুনির চারিদিকে বসিয়া ধ্যান, পাঠ ও আলোচনাদিতে কাটাইলেন। সেই শুভ সময়ে নূতন ছাত্র-ছাত্রীগণকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইল। সমস্ত রাত্রি প্রকাশানন্দজীর পূত সঙ্গে ধর্মসাধনায় যাপন করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাদের ধর্মজীবন উন্নত করিয়া ধন্য হইলেন। আশ্রমের ছাত্রীগণ রন্ধনাদি

কার্য এবং ছাত্রগণ ধুনি প্রভৃতির জন্য কাঠ কাটার কার্যাদি করিতেন। কর্মোন্মত্ত, ভোগ-চঞ্চল পাশ্চাত্য মনকে কর্মযোগের রহস্য শিক্ষা দিয়া তিনি তাহাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। এই যুগোপযোগী ধর্মসাধন করিয়া আধুনিক মানব সহজেই কর্মময় জীবনকে ধর্মময় করিতে পারে। এইজন্য কর্মযোগের বাণী পাশ্চাত্যবাসীর এত হৃদয়গ্রাহী। জুনের শেষ রবিবারে স্বামীজী উপত্যকাবাসী প্রতিবেশিগণকে হিন্দু আহার্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। প্রায় চল্লিশ জন নরনারী উক্ত ভোজে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জনাদি হিন্দুপ্রণালী-মতে তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত করেন। ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি ছাত্রছাত্রীগণ সহ হিন্দুমন্দিরে ফিরিয়া আসেন।† এইরূপে স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে তিলে তিলে আত্মদান করেন।

সহকর্মিগণ ও বন্ধুগণ বুঝিলেন, স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কর্মক্লান্ত স্বামীজীর বায়ুপরিবর্তন ও সমুদ্রযাত্রা অত্যাবশ্যক। তাঁহারা তাঁহাকে আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান পূর্বক মাতৃভূমি দর্শনে যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হিন্দু মন্দিরের কার্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া তিনি প্রথমে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, হিন্দুমন্দিরের কার্য তাঁহারা সাধ্যমত চালাইবেন এবং ভারত হইতে তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসিলে কার্য আদৌ ব্যাহত হইবে না। তাঁহাদের কথায় স্বামীজী সম্মত হইয়া ১৯২২ সনের ২১শে অক্টোবর ব্রহ্মচারী গুরুদাস ও দুই জন পাশ্চাত্য শিষ্যার সহিত ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। গুরুভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্মিলন, এবং পুণ্যস্মৃতিময় স্থানাদি পুনর্দর্শনের আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার ভারতাগমন সাফল্যমণ্ডিত হইল। কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে স্বদেশবাসিগণের তিনি সাদর সম্বর্ধনা লাভ করিলেন। দীর্ঘকাল পাশ্চাত্য বাস সত্ত্বেও তাঁহার প্রীতিপূর্ণ, সরল, মধুর চরিত্র অপরিবর্তিত ছিল। ১৯২৩ সনের ৬ই জুলাই কলিকাতাবাসিগণ তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। সংস্কৃত ও বাংলায় বহু কবিতা তাঁহার অভিনন্দনার্থ রচিত ও সভায় পঠিত হয়। স্বাগতাভিভাষণের উত্তরে তিনি একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করেন। যেমন আমেরিকাতে তেমনি ভারতেও বক্তৃতা, ধর্মপ্রসঙ্গ প্রভৃতি কার্যে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বাস্থ্যলাভার্থ আবশ্যকীয় বিশ্রাম লাভ সম্ভব হইল না। তিনি এত সুভদ্র ও সুকোমল সন্ন্যাসী ছিলেন যে, কাহারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না। ৩।৪ মাস জন্মভূমিতে কাটাইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৩ সনের এপ্রিল মাসে নিউ ইয়র্ক হইয়া সানফ্রান্সিস্কোয় প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার তিনি স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী প্রভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান। স্বামী রাঘবানন্দ যান নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কর্মিরূপে এবং স্বামী প্রভবানন্দ স্বামী প্রকাশানন্দের সহকর্মিরূপে। হিন্দু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁহাদের ধর্মগুরুকে এবং স্বামী প্রভবানন্দকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। সকলে ভাবিলেন, সহকারী পাইয়া স্বামী প্রকাশানন্দ একটু বিশ্রামলাভে সমর্থ হইবেন। কিন্তু, তাহা সম্ভবপর হইল না। তিনি বলিতেন, "যখন আমার কাজ শেষ হইবে তখনই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। সমগ্র ক্যালিফোর্নিয়াতে বেদান্তবাণী প্রচার না করিলে আমার বিশ্রাম হইবে না।" তিনি তাঁহার সহকর্মী স্বামী প্রভবানন্দকে নূতন নূতন শহরে বেদান্তপ্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রেরণকালে তিনি স্বামী প্রভবানন্দকে

† ১৯২২ সনের নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ক্লারা এম পেটির 'শান্তি আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

বলিলেন, "আমাদিগকে নূতন বেদান্তকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।" স্বামী প্রভবানন্দ নানাস্থানে বেদান্তপ্রচার করিয়া পোর্টল্যাণ্ডে ১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। স্বামী প্রকাশানন্দ উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে পোর্টল্যাণ্ড যাইয়া নব সমিতির উদ্বোধনকার্যে পৌরোহিত্য করেন।

১৯২৫ সনের জুন মাসে স্বামী প্রকাশানন্দ অনেক ছাত্রছাত্রী লইয়া শান্তি আশ্রমে গমন করেন।‡ সেখানে তিনি একমাস অবস্থানপূর্বক ছাত্রছাত্রীগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন। প্রত্যহ প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় শঙ্খধ্বনি দ্বারা আশ্রমবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ করা হইত। ছয়টার সময় সকলে স্ব স্ব কেবিন হইতে 'হরি ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে ধ্যানকক্ষে যাইতেন। সেখানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে ধ্যান করিতে হইত। ধ্যানান্তে তিনি সকলের নিকট 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও ব্যাখ্যা করিতেন। 'কথামৃত' শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের মন ভারতের গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইত এবং ঠাকুরের স্মৃতিপূত স্থানগুলি তাঁহারা মানসচক্ষে দর্শন করিতেন। মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানান্তে স্বামীজী শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে 'কপিল-দেবহূতি-সংবাদ' পাঠ করিতেন। ভাগবতের উপাখ্যানগুলি শুনিয়া ছাত্রছাত্রীগণ মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য ধ্যান সমাপ্ত হইলে স্বামীজী তাঁহার সুললিত স্বরে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতেন। আহারের পূর্বে সকলে সমস্বরে গীতা হইতে ব্রহ্মার্পণম্···শ্লোকটি আবৃত্তি করিতেন। দুইবার আহারান্তে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী হইতে মূল্যবান উক্তিগুলি উদ্ধার করিয়া শুনাইতেন। ধুনি জ্বালিয়া সকলে ধ্যান, ভজন, পাঠ ও আলোচনাদিতে রাত্রি কাটাইতেন। হোমাগ্নিতে প্রত্যেকে স্ব স্ব অসৎ বৃত্তিগুলি আহুতি দিতেন। পরদিবস প্রাতঃকালে সকলে স্ব স্ব চিত্ত অধিকতর সংযত ও সংশুদ্ধ দেখিতেন। কোন কোন ছাত্রকে তিনি কখনো কখনো সমগ্র দিবারাত্র মৌনাবলম্বন পূর্বক ঈশ্বরের নাম জপ করিতে উপদেশ দিতেন। বিদায়োৎসব দিবসে প্রতিবেশি-গণকে যে হিন্দুভোজ দেওয়া হইল সেই উপলক্ষে তাঁহাদের বালক-বালিকাগণ আবৃত্তি ও সঙ্গীত করিল। স্বামী প্রকাশানন্দ এইভাবে বহুবার শিষ্য-শিষ্যাগণ সমভিব্যাহারে শান্তি আশ্রমে যাইয়া গ্রীষ্মের কয়েক সপ্তাহ কাটাইতেন।

স্বামী প্রভবানন্দ পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সমিতির কার্যে সফলকাম হওয়ায় স্বামী প্রকাশানন্দ আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের প্রচারকার্য প্রসারলাভ করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দজীর অমোঘ আশিস আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আমি আরও সন্ন্যাসী চাই। আমাদের সংঘের কর্তৃপক্ষকে আমি শীঘ্রই লিখিব সহকারী সন্ন্যাসী প্রেরণের জন্য।" তাঁহার অনুরোধে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী দয়ানন্দ তাঁহার নূতন সহকারিরূপে ১৯২৬ সনের জুন মাসে সানফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলেন। স্বামী দয়ানন্দ হিন্দু মন্দিরের কার্যে যোগদান করিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, ছয় সাত মাসের মধ্যেই স্বামী প্রকাশানন্দ চিরতরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন। কঠোর পরিশ্রমে প্রকাশানন্দজীর স্বাস্থ্য ইতঃপূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। পূর্বে যে বহুমূত্ররোগের কবল হইতে অতি কষ্টে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা উগ্র ভাবে পুনরায় দেখা দিল। রোগযন্ত্রণায় তিনি অধীর বা মুহ্যমান হন নাই। সৌর তাপ যেমন প্রস্ফুটিত পঙ্কজের সৌন্দর্য ম্লান করিতে অক্ষম তেমনি ব্যাধিবেদনা বা মৃত্যুভয় তাঁহার মুখের হাস্য বা

‡ ১৯২৫ সনের নভেম্বর সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 'শান্তি আশ্রম' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

প্রফুল্লতা হ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রয়াণের আসন্নতা কাহারো মনে ছায়াপাত করে নাই। স্বামী প্রকাশানন্দ ১৯২৭ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীগুরুর চিরসান্নিধ্য লাভ করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন স্থির হইল। এই তিন দিন সানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। যেন ধরিত্রী দেবী তাঁহার প্রিয় পুত্রের বিয়োগে তিন দিন শোকাভিভূতা ও রোরুদ্যমানা রহিলেন! বুধবার প্রাতে অরুণালোকের স্নিগ্ধ স্বর্ণপ্রভা প্রকাশিত হইলে শত শত ভক্ত ও বন্ধু তাঁহাদের প্রিয় ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থ এবং তাঁহার ভৌতিক দেহের শেষ দর্শনমানসে হিন্দু মন্দিরে আসিলেন। টাকোমা, সাউথল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু স্থান হইতে অনাগত বন্ধুগণের পুষ্পোপহার আসিয়া শবদেহের উপর স্তূপীকৃত হইল। স্বামী বোধানন্দ তখন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় শীতকাল কাটাইতে গিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি হিন্দু মন্দিরে আসিলেন। স্বামী প্রভবানন্দ পোর্টল্যাণ্ড হইতে ছুটিয়া আসিলেন। বুধবার এগারটার সময় শবদেহকে পত্রপুষ্পবস্ত্রে শোভিত করিয়া শোকসভা § হইল। হিন্দু মন্দিরের বেদীর যে স্থানে বসিয়া স্বামী প্রকাশানন্দ ধ্যান করিতেন সেখানে পুষ্পমাল্য-শোভিত চেয়ারে তাঁহার বৃহৎ বাঁধান ছবি স্থাপিত হইল। স্বামী বোধানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ বেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও প্রার্থনাদির পর মিসেস্ সাইগ্রিড মিল্‌হাউসার্ স্বরচিত সঙ্গীত গাহিলেন। স্বামী বোধানন্দ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর যাবৎ আমি স্বামী প্রকাশানন্দের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলাম। আমরা যখন স্কুলের বালক তখন হইতেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়। এই ৩৭ বৎসরের মধ্যে আমি তাঁহাকে একটি কর্কশ বাক্য বলিতে বা একটি অপ্রীতিকর কার্য করিতে দেখি নাই। মঠে আমরা উভয়ে একত্রে থাকিতাম। উভয়ে একত্র হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ করিয়াছি। উভয়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আমাদের বাল্যবন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য গুরুভ্রাতৃত্বে পরিণত হইয়াছিল।

স্বামী প্রভবানন্দ বলিলেন, "স্বামী প্রকাশানন্দের দুইটি সদ্‌গুণ আমার চিরকাল মনে থাকিবে। প্রথমটি তাঁহার প্রশান্ত ভাব। দুঃখে বিপদেও এই প্রশান্ত স্বভাব হইতে তিনি বিচলিত হইতেন না। প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে প্রশান্ত ও প্রফুল্ল দেখা যাইত। গভীর আধ্যাত্মিকতা হইতে এইরূপ মানসিক প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা লাভ হয়। দ্বিতীয় গুণটি তাঁহার নির্মল, নিঃস্বার্থ প্রীতি। কেহই তাঁহার এই প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইত না।"

স্বামী দয়ানন্দ বলিলেন, "হিন্দু মন্দিরের বেদী হইতে গত বিশ বৎসর যে মধুর কণ্ঠ বেদান্তবাণী প্রচার করিত তাহা চিরতরে নিস্তব্ধ হইয়াছে। তুলসীদাস বলেন, 'হে তুলসী, তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন জগৎ হাসিতেছিল, আর তুমি কাঁদিতেছিলে। এমন জীবন যাপন কর যে, যখন তুমি জগৎ ছাড়িয়া যাইবে তখন তুমি হাসিবে এবং জগৎ তোমার জন্য কাঁদিবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ এমন গুরুগত জীবন যাপন করিয়াছেন যে, আমরা আজ কাঁদিতেছি, আর তিনি হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। যখন তিনি ভারতে ছিলেন তখন তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'বাবা, ঠাকুরের কাজের জন্য আমি

§ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ১৯২৭ সনের জুন সংখ্যায় শোকসভার বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।

প্রাণপাত করিতেছি। তোমার জীবনও সেই কার্যে উৎসর্গ ও বিসর্জন কর। আরও অনেকে ঠাকুরের কাজে আত্মাহুতি দিবে। সকলের মিলিত আত্মোৎসর্গ হইতে এক মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবে।' স্বামী প্রকাশানন্দ গুরু-বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি খুব উদারচেতা ও উচ্চমনা ছিলেন। নীচতা বা স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।" সমাগত বহু নরনারী অশ্রুবিসর্জন পূর্বক স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করিলেন।

শ্রদ্ধানিবেদন ও সমাপ্তিসঙ্গীত হইবার পর হিন্দু মন্দিরের ছয়টী শিষ্য ও শিষ্যা শবদেহ অপেক্ষমাণ গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ী শ্মশানাভিমুখে ছুটিয়া মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামী প্রকাশানন্দের মৃত দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইল। সমুদ্রের জল সমুদ্রে প্রত্যাগমন করিল। যে গুরুর কার্যের জন্য তিনি ধরাধামে আসিয়াছিলেন তিনিই কর্মক্লান্ত প্রিয় শিষ্যকে বিশ্রামার্থ স্বধামে আহ্বান করিলেন।

১৯২২ সনের পূর্বে সানফ্রান্সিস্কো হিন্দু মন্দির হইতে স্বামী প্রকাশানন্দের এই তিনটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—(১) The Universality of Vedanta (বেদান্তের উদারতা) (২) Inner Consciousness (আন্তর চেতনা) এবং Mystery of Human Vibration (মানবকম্পনের রহস্য)। তাঁহার ইংরেজি বক্তৃতা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এবং বাঙ্গলা প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যে নবযুগপ্রবর্তক মহৎ কার্য ঠাকুরের শিষ্যগণ ভাগবত নির্দেশে আরম্ভ করেন স্বামীজীর শিষ্যগণ সেই কার্য সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। স্বামী প্রকাশানন্দ প্রমুখ-সন্ন্যাসিগণের জীবনকাহিনী হিন্দুধর্মের আধুনিক ইতিহাসের নূতন অধ্যায়। এই সকল অমর কাহিনী নবীন হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের জীবনের দিগ্‌দর্শন স্বরূপ।

পরিপূর্ণ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

যাহা কিছু যত কিছু সুদূরে ও কাছে
আজি আসি এক সাথে মোরে ঘিরিয়াছে।
অনন্ত অতীত যেন এই বর্তমানে
অজানা ভবিষ্য পুনঃ মিলে তার সনে।
গ্রহতারা সহ ঐ অসীম আকাশ
মোর হৃদয়েতে নামি নিল আজ বাস।
বিচিত্রা এ সসাগরা বিশাল পৃথিবী
আমারি অন্তরপটে আঁকা যেন ছবি।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত জীবকুল নানা
বহুরূপে তারা এক আমারি চেতনা।
যতেক আনন্দ জ্ঞান যত অনুভূতি
সতত খুঁজিছে যেন আমার সঙ্গতি।
পরিপূর্ণ সত্য যাহা অক্ষয় ভাস্বর
একান্ত আপন হয়ে রহে নিরন্তর।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীকমলকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক ৬৯, কাঁসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৩৬ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৷৷০ আনা মাত্র।

মহাপুরুষদের জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব অপরিসীম। সঙ্গীত ও সাধনা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। অনুভূতির বিচিত্র বিকাশ বিধৃত হইয়াছে স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতপ্রবাহে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনের ইতিহাসে সঙ্গীতের অমোঘ প্রভাব সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। আলোচ্যমান পুস্তকখানির প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় সঙ্গীত সংকলন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ভক্ত নরনারীর অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবল সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন না, তিনি একজন সুগায়কও ছিলেন। কত গান আপন অনবদ্য ভঙ্গীতে গাহিয়া এবং ভক্তগোষ্ঠীতে শ্রবণ করিয়া তিনি 'রূপসাগরে ডুব' দিয়াছিলেন! শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধকভাব, দিব্যভাব ও গুরুভাবের নিত্যসহচর এই গীতানুরণন তাঁহার কলুষান্তক চরিতকথার মতই সতত অনুধ্যেয়। সংকলনপ্রচেষ্টায় প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলাল দাদা ও শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করেন। পুস্তকখানিতে সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও তানসেনের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি খুবই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। গানগুলির স্বরলিপি সংযোজিত হওয়াতে সঙ্গীতরসিকদের সুবিধা হইবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ

পরিব্রাজকজীবনী ও বাণী—শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামিজী মহারাজের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—যোগাশ্রম, হাউজ কটোরা, ৺কাশীধাম। ৪০ পৃষ্ঠা—অমূল্য।

এই পুস্তকটিতে ধর্মসংস্থাপক ও প্রচারক শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বাণী এবং কয়েকটি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ বিনামূল্যে বিতরিত পুস্তক মানুষের দৃষ্টি বড় একটা আকর্ষণ করে না, উহা না পড়ে ফেলেই রাখে। কিন্তু এই পুস্তকটির নামই—"পরিব্রাজকজীবনী ও বাণী"—পড়তে আগ্রহ জাগায়। আমাদের এই বাংলা দেশে যুগে যুগে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। শতবর্ষ পূর্বে এই মহাপুরুষজীও বঙ্গজননীর কোল অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি মাত্র ৫৩ বছর কাল নরদেহ ধারণ করেছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়েই তিনি সমাজকে, জাতিকে, দেশকে যে মহাসম্পদ দিয়ে গেছেন তা আমাদের রক্ষাকবচ বলা চলে। ধর্মপ্রচারক পরিব্রাজক এবং শক্তিশালী বক্তা এই মহাপুরুষের রচিত বহু পুস্তক ও গানের সন্ধানও আমরা পাই। তাঁর রচিত "গীতার্থ-সন্দীপনী" তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-পাঠকদের কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর একটি গান—'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী'—আজও বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা তন্ময় হয়ে শোনে। এই পুস্তকটি পড়ে আমরা পরম আনন্দ লাভ করেছি এবং সবাইকে পড়তে অনুরোধ করি।

রত্নদ্বীপ (স্ত্রীভূমিকা-বর্জিত কিশোর-নাটক)—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত এবং সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

হইতে শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও 'তারাপ্রেস', ১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে শ্রীননীগোপাল সিংহরায় কর্তৃক মুদ্রিত। ৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য—১৲ টাকা।

কিশোরদের জন্য লেখা এই নাটকটি পড়ে আমরা খুশী হতে পারিনি। এরকম বই কিশোরদের হাতে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। বানান ভুলও অনেক আছে।

জ্যোতিরূপ

Kingdom of God—By B. M. Das. Published by Sri K. K. Das, 20 Chitpore Bridge Approach, Calcutta. Pages 16. Price As. 3

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঈশ্বর এই জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। জাগতিক ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই অথবা তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করি না, কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুভব হইবে যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া আমরা চলিতে পারি না। কারণ, আমাদের প্রকৃতস্বরূপও সেই ঈশ্বরত্ব। এই স্বরূপ অনুভব করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। লেখক সুন্দর ভাবে এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়া ধন্য-বাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠে উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

নিবেদন—(কবিতা) শ্রীমতী উমারাণী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুত যতীন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, ৫৬ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। বিলাতী কাগজে সুন্দর ছাপা—১২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১॥০ আনা।

আলোচ্যমান পুস্তকখানি ভক্তিরসাপ্লুত কবিতা-সম্ভারে সমৃদ্ধ। একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে কবিতাগুলি রচিত। কবিতাগুলি পাঠে মনে বিমল আনন্দের উদ্রেক হয় এবং ঈশ্বরে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। লেখিকার নবোদ্যম প্রশংসনীয়।

এই পুস্তকের সমগ্র আয় কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় ব্যয়িত হইবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—শ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ সংকলিত; শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, খামারগাছি, হুগলি হইতে প্রকাশিত; ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা।

ইহা প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ। সংকলয়িতার অনুবাদাদি মন্দ হয় নাই। প্রস্তাবনার "গুরু ব্রহ্ম হইতে অধিক" এই মন্তব্য সমীচীন হয় নাই। এই প্রকার পুস্তক অধ্যাত্ম-পথিকের নিত্যসহচর হওয়াই উচিত। ক্রমবর্দ্ধমান বহির্মুখীনতার যুগে এই প্রকার সং-সাহিত্য জনপ্রিয় হইলে দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

ত্রৈকালিক স্তবমালা—শ্রীসীতারাম দাস ওঁকারনাথ সংকলিত। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, খামারগাছি হুগলি হইতে প্রকাশিত। মূল্য চার আনা।

আলোচ্যমান পুস্তকখানি ভজনশীলের ভজন-সহায় হইতে পারে। সংকলন প্রশংসনীয়।

স্বামী যুক্তাত্মানন্দ

ধ্রুবতারা—মাসিক পত্র, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৫। সম্পাদক—শ্রীরাখালদাস প্রামাণিক। প্রাপ্তিস্থান—কর্মাধ্যক্ষ, ধ্রুবতারা, ১৫৪ তারক প্রমাণিক রোড, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা—।০ আনা।

এই মাসিক পত্রখানি সিমলা কংসবণিক জাতীয় পরিষদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত। আমরা পত্রিকাখানিকে অভিনন্দন করিতেছি এবং ইহা সত্য, ন্যায়, নীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রচার করিয়া সমাজের যথার্থ কল্যাণ করুক ইহাই কামনা করি। প্রচ্ছদ-পটে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বীরত্বব্যঞ্জক ছবি এবং সর্বপ্রথমে স্বামীজী-রচিত 'সখার প্রতি' কবিতার কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। কাগজ আরও ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন পত্রিকা—দ্বাবিংশ বর্ষ, ১৩৫৫। ছাত্র-সম্পাদকদ্বয়—শ্রীমান্ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ দেবী চরণ খাঁ। বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন, ১০৭ থুরুট রোড্, হাওড়া হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-টি কর্তৃক প্রকাশিত। ৩৮ পৃষ্ঠা।

নব-ভারত-স্রষ্টা স্বামীজী, শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প, অমৃত-পথ-যাত্রী, প্রভৃতি শীর্ষক ছাত্রগণ লিখিত উনিশটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও কবিতায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ। লেখাগুলি নির্ভুল ও সুখপাঠ্য; ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল; কাগজ ও মুদ্রণ উত্তম। বালকগণের এই উদ্যম উত্তরোত্তর সাফল্যমণ্ডিত হউক।

শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

মহেশচন্দ্র চরিতকথা—শ্রীশ্রীশচন্দ্র তলাপাত্র প্রণীত। ৭৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ইকনমিক ফার্মেসী হইতে শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বি-এস্‌সি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৫৩ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

আমরা পুণ্যচরিত মহেশচন্দ্রের জীবনী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে বাংলার এই কৃতী পুরুষের জীবন-আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। মহেশ বাবু বাল্যকাল হইতে কি ভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে ব্যবসা-ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহা এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি সাধারণ ব্যবসায়ীর ন্যায় কেবল অর্থ সঞ্চয়ই করেন নাই, অধিকন্তু হৃদিবান পরার্থপর ব্যক্তির ন্যায় অকাতরে উহা দানও করিয়াছেন। ইহাই মহেশচন্দ্রের জীবনের মহত্ত্ব। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তাঁহার দান অসামান্য। এজন্য তিনি বাংলার অন্যতম দানবীর বলিয়া সুপরিচিত। এই দরিদ্র দেশে সুলভে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রচার এই কর্মযোগীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমরা আশা করি, কর্মবীর মহেশচন্দ্রের এই জীবনী পাঠ করিলে অনেক চাকরিপ্রিয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের মোহ নষ্ট হইবে; তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অধ্যবসায় ও সততা বলে অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিও ব্যবসা-ক্ষেত্রে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারেন। এই গ্রন্থের সুচিন্তিত ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছেন, "মহেশচন্দ্র চিরদিনই চরিত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা মহনীয় মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালী যদি মরে, তবে সে তার বুদ্ধির অভাবে মরিবে না, মরিবে চরিত্রের অভাবে। কোনো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা চাতুরী এই চরিত্রভ্রষ্টদের রক্ষা করিতে পারিবে না'।" বাংলার জাতীয় জীবনের এই দুর্দিনে মহেশচন্দ্রের এই মহতী বাণী বাঙালী যুবকগণের বিশেষ স্মরণীয়। বইখানির ভাষা সহজ সরল ও সাবলীল এবং কাগজ ও মুদ্রণ উত্তম। আমরা এই উপাদেয় গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্দশাধিকশততম জন্মোৎসব—উপলক্ষে আগামী ১লা মার্চ, ১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, তিথিপূজা এবং ৬ই মার্চ, ২২শে ফাল্গুন, রবিবার, সাধারণ উৎসব বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

কামারপুকুরে (হুগলী) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব—আগামী ১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে তাঁহার জন্মতিথি এবং শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

বেলুড় মঠে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—উপলক্ষে গত ৮ই মাঘ, শুক্রবার, পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ, পাঠ ও ভজনাদি হয়। অপরাহ্নে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উৎসবে বহু ভক্ত নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী ও তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী গত ডিসেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদান করিয়াছেনঃ (১) "কাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত," (২) "অবচেতন মন ও ইহার সংযম," (৩) "স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মনীতি," (৪) "ঈশ্বর ও জগতের মধ্যবর্তী মানুষ," (৫) "যোগসাধনার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য," (৬) "আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য মানুষের চেষ্টা," (৭) "ব্রহ্মানুভূতির আনন্দ," (৮) "ঈশদূত যীশুখৃষ্ট"।

বম্বে রামকৃষ্ণ মিশন—গত ২৫শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-নিবাস, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বক্তৃতা-ভবনের ভিত্তি-স্থাপনোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ছাত্র-নিবাসের বিদ্যার্থিগণ কর্তৃক বৈদিক প্রার্থনা উদ্গীত হইবার পর উৎসবের কার্য আরম্ভ হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সম্মানিত অতিথিগণকে অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে স্থানীয় মিশনের গত কয়েক বৎসরের কার্যাবলী ও ইহাদের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত মানুষ তৈয়ারী ও চরিত্রগঠনকারী শিক্ষার সহিত বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধানের উপর জোর দিয়া তিনি বলেন যে ধর্মের সার্বভৌম ভাবের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতভূমিতে কোন প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম বলিতে আচার-অনুষ্ঠান বা মতবাদ বুঝায় না—ইহা সর্ববস্তুর প্রাণস্বরূপ।

ছাত্র-নিবাসের ভিত্তিস্থাপন প্রসঙ্গে বম্বে প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি জি খের বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পূজ্য নামের সহিত যাহা কিছু যুক্ত উহাই পবিত্র এবং তৎকার্যে সহায়তা করিতে আমি আনন্দ অনুভব করি। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপক, সুদীর্ঘ ও গৌরবমণ্ডিত সেবাকার্য সর্বত্র প্রশংসিত। ইহার ছাত্রনিবাসে এতদিন মাত্র পনর জন বিদ্যার্থীকে আশ্রয় দিবার স্থান ছিল, এখন ইহার নিজস্ব প্রশস্ত ভবনে আরও অধিকসংখ্যক ছাত্র বাস করিতে পারিবে। ইহাতে ছাত্রসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই নগরীতে স্থানাভাবে বহু ছাত্র অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, কারণ গভীর বিষয়ের অধ্যয়নের জন্য ন্যূনপক্ষে যতটুকু নির্জনতা দরকার উহাও সর্বত্র

সম্ভব নহে। সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পূর্ণরূপেই সজাগ। রামকৃষ্ণমিশন এই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়ায় সরকার ও ছাত্রসমাজ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য উত্তম আবাসের প্রয়োজন, কেবল ইঁট ও পাথরের প্রয়োজন নহে—বস্তুতান্ত্রিক উপযোগিতা ছাড়া ইহার মহৎ উদ্দেশ্যও আছে। এযাবৎ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি প্রাণহীন ও ধর্মভাববর্জিত ছিল। পুস্তকের বিষয়বস্তু গলাধঃকরণ করিয়া যেন তেন প্রকারেণ পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। যে যত উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহার ভাগ্যে হয়ত তত লাভজনক চাকরী জুটিবে বলিয়া ধারণা ছিল। স্যাড্‌লার কমিশন এই শিক্ষাপদ্ধতিকে 'রক্তাল্প' বিশেষণে আখ্যাত করিয়া ইহার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বাস্তবিক, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পূর্ণতা ও জীবনীশক্তির একান্ত অভাব। এই শিক্ষাপ্রহসনে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক একেবারে অবজ্ঞাত হইয়াছে, ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবার ইহাতে কোন সুযোগ নাই; অথচ ধার্মিক ও নীতিপরায়ণ শিক্ষকের জীবন্ত সংস্পর্শে আসিলেই বিদ্যার্থীর চরিত্রগঠন ও জ্ঞানোন্মেষের পথ প্রশস্ত হয়। এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত আবাসে ইহার প্রকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমি আশা করি, বিদ্যার্থিগণের চরিত্র ও মন এই আবাসে যথোপযুক্তরূপে গঠিত হইবে। মিশনের অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম বেদান্ত-প্রচার ও সেবা-কার্যের আদর্শ ছাত্রগণকে যথার্থ নাগরিক হইবার সুযোগ প্রদান এবং দেশে শান্তি ও সৌভ্রাত্র স্থাপনে সহায়তা করিবে।"

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিত্তিস্থাপন-প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ মোরারজী দেশাই বলেন, "গুরুজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী অনুসরণ করিলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করিবে। বিবেকানন্দ-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা জগৎ-সভায় ভারতের মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। আশ্রম-পরিচালিত বহুবিধ সেবা-কার্যের মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিতর দিয়া রুগ্ন নারায়ণের সেবা অন্যতম। যথার্থ প্রেমই সর্ব আধি-ব্যাধি ও অমঙ্গলের মহৌষধ।"

বক্তৃতা-ভবনের ভিত্তিস্থাপন-প্রসঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি মিঃ মাষ্টার বলেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের নাম কেবল আধ্যাত্মিক উন্নয়নকার্যের জন্য নয় পরন্তু বিবিধ প্রশংসনীয় জনহিতকর কার্যের জন্যও পৃথিবীর সর্বত্র সুবিদিত। মিশনের এই মহৎ সেবাকার্যেই আমি বিশেষরূপে মুগ্ধ। কারণ, 'জীবে প্রেম করে সেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।"

সম্পাদক মিঃ দারু স্থানীয় মিশনের একটি সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে ভারতীয় শুল্ক-সভার সভাপতি মিঃ মেহ্‌তা সমবেত প্রধান অতিথি ও শ্রোতৃ-বৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান এবং পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনের সদস্য মিঃ সাহ উহা সমর্থন করেন।

পাটনা (বিহার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ষষ্ঠ নবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে এই আশ্রমে পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিপ্রহরে প্রায় দেড়শত ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পঠিত হয় ও আশ্রমাধ্যক্ষ সর্বসমক্ষে মায়ের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্যা ও জগৎকল্যাণে তাঁহার অপূর্ব আধ্যাত্মিক অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সারাদিন ভক্তসমাগমে, ভজন ও উৎসবানন্দে আশ্রমটী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, খৃষ্টের জন্মদিবস, পূজ্যপাদ স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী

বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ মহারাজগণের জন্মতিথিও সুষ্ঠুরূপে আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:—

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—গত ৮ই মাঘ হইতে ১১ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা, হোম, উপনিষদাদি পাঠ, কীর্তন ও স্বামীজীর জীবনী আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিবস দুইটি সভার অধিবেশনে ঢাকা জেলা মণিমেলা মণ্ডলীর কিশোরদের ব্যায়াম-প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সভার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী হরিহরানন্দজী মহারাজ এবং সভাপতিত্ব করেন কিশোর দলের শ্রীমান্ হরিদাস বসাক। পরে ছাত্রদের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পৌরোহিত্য করেন স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু। শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন দাস, মোঃ মোকার্‌রম্ হোসেন্ ও শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল দেবনাথ স্বামীজী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা করেন। স্কুল কলেজের অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রের বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উৎসবের তৃতীয় দিবস দুই সহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। অপরাহ্নে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য ও আসামের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে প্রায় তিন সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানে ভারতীয় ডেপুটী হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, ডাঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত অনিল কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু ও অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে সকলকে আহ্বান করেন। চতুর্থ দিবস এক সভায় স্বামীজীর প্রসঙ্গে আলোচনার পর শাঁখারিবাজার মহাবীর সেবাসমিতির বালক-বালিকাগণ সুন্দর ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করে। উৎসবের কয়দিন মাইক্রোফোন্-যোগে বিবিধ সঙ্গীত, ভজন, বৈদিক মন্ত্র পাঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণীপ্রচারে উৎসবপ্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল।

বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—গত ৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্তোত্রপাঠ, ভজনগান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শোপচারে পূজা ও অর্চনা, গীতা, চণ্ডী, উপনিষৎ-পাঠ, হোম, ভোগারতি এবং পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে এক জনসভায় প্রায় পাঁচশত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে উদ্বোধনসঙ্গীত, ভজন, কবিতা আবৃত্তি এবং রামনাম কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। তৎপর স্থানীয় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্বামীজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভান্তে সকলকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ, বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগাদি হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় অক্রূরমণি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের

সভাপতিত্বে মিশনের বিবেকানন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে সহস্রাধিক বালকবালিকা ও নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। প্রারম্ভে বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য এবং ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের স্বামীজী সম্বন্ধীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি এবং আশ্রমাধ্যক্ষ পরশিবানন্দজী স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীগণকে উপদেশ দেন। ৯ই মাঘ, আশ্রমপ্রাঙ্গণে পণ্ডিত শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভারম্ভে স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ঐকতান বাদনের পর বালিকাগণ 'জয় বিবেকানন্দ' গান করে। মালদহ কলেজের দুই জন ছাত্র কর্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মিশ্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দে সরকার এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। কুমারী রমা বক্সির সুমধুর শ্রীরামকৃষ্ণকীর্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী—গত ৮ই মাঘ হইতে ১১ই পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস চণ্ডী পাঠ, কীর্তন, পূজা, ভজন, হোম এবং দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস মহাবীর পূজা, রামনাম-সংকীর্তন ও বিচিত্র গীতি অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিবস বালকবালিকাদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বালকবালিকারা যোগ দান করে। চতুর্থ দিবস উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতপ মিশন-লাইব্রেরীর বর্ধিতাংশের ভিত্তি স্থাপন ও জনসভায় পৌরোহিত্য করেন। ইহাতে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্মা রাও, শ্রীযুক্ত সুকান্ত রাও প্রমুখ ব্যক্তিগণ উড়িয়া, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। শেষে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অল্প বিস্তর সকল কংগ্রেসসেবীই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত; এমন কি মহাত্মা গান্ধীর কার্যধারায়ও স্বামীজীর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সভার শেষে স্বামীজীর জীবনী-বিষয়ক বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকারকারী পুরী কলেজের তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ সাতকড়ি হোতা দশ টাকা পুরস্কার লাভ করে।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভজন, কীর্তন, এবং জনসভা উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। স্থানীয় প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার উকিল মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মতিলাল পুরকায়স্থ, উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিমলানন্দ স্বামীজী-সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। সভায় বহু নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন।

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—গত ৮ই মাঘ এই প্রতিষ্ঠানে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজীর পৌরোহিত্যে একটী আলোচনাসভায় ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক স্বামীজীর বাণী আবৃত্তির পর শ্রীমান্ লাল মোহন জানা ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য স্বামীজী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্থানীয় সুরশিল্পিগণের সঙ্গীতান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে ৮ই মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনমণ্ডলীর সুমধুর কীর্তন, পূজার্চনা, ও শাস্ত্রপাঠ হয়। এক জনসভায় স্বামী জপানন্দজী প্রসঙ্গোচিত বক্তৃতা দেন। গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, মাণ্ডবী পোল ভজন মণ্ডলী দাদু, কবীরের বিশেষ ভজন গান এবং নর্মদার কবীর মঠের ৮০ বৎসর বয়স্ক মোহন্ত মহারাজ কয়েকটি সুললিত ভজন গান করেন। এতদুপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

কলিকাতা ম্যাক্‌লিওড্ ইন্‌ষ্টিটিউট—এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে গত ২রা মাঘ ইন্‌ষ্টিটিউট-গৃহে স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজীর পৌরোহিত্যে শ্রীযুক্ত কালিদাস ঘোষাল "মঙ্গলাচরণ", শ্রীযুক্ত ফণী ভট্টাচার্য "বীরবাণী" হইতে আদ্যাস্তোত্র পাঠ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রায় "মাতৃনাম" কীর্তন করেন। উক্ত স্বামীজী 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রীতি ও সেবা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

বার্ণপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত ৮ই মাঘ প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম হয়। দ্বিপ্রহরে স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা নগর পরিভ্রমণ করে। সন্ধ্যায় আসানসোল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, বার্ণপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও সভাপতি মহাশয় স্বামীজীর পুণ্য জীবনকথা আলোচনা করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত করালীপ্রসাদ রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে উৎসব সমাপ্ত হয়।

মথুরাপুর (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ৮ই ও ৯ই মাঘ বিবেকানন্দ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামীজীর পূজা, ভজন এবং প্রায় পাঁচ শত দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হইয়াছে। এক জনসভায় সেবাশ্রম-পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক 'মূর্ত মহেশ্বর…' সঙ্গীত গীত হইবার পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র শাস্ত্রী, এম্-এ পঞ্চতীর্থ, হিন্দু মহাসভার শ্রীযুক্ত সুধীর মিত্র, কাশীনগর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। ইহাতে চার পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সেবানন্দ পুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভান্তে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীচণ্ডী ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত পৌষ ও মাঘ মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে:

কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'স্বামী শিবানন্দ মহারাজ' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সান্যাল মহাপুরুষজীর জীবনের কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সোসাইটী-ভবনে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী "স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জীবনী" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিলে লবকুশ পালা কীর্তন হয়। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দজী "স্বামী বিবেকানন্দের বার্তা" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিলে ভারত সংগীত বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রী ধ্রুপদ গান করে। সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য কুমারী মনীষা গুপ্তাকে সোসাইটি হইতে একটি রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী "স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের জীবনী" সম্বন্ধে ভাবোদ্দীপক আলোচনা করেন। থিওসফিক্যাল হলে স্বামী সাধনানন্দজী এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন সঙ্ঘনেতা স্বামী "ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জীবনী" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটি-ভবনে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ও "শিবানন্দ-বাণী" এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব—"গীতা" ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কৃষ্ণনগর (নদীয়া) শংকর মিশন—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রচারিত নরনারায়ণ সেবার আদর্শে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, প্রাইমারী স্কুল, ছাত্রাবাস, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিল্প-বিদ্যালয় প্রভৃতি জন-হিতকর কার্য ছয়টি শাখাকেন্দ্র সহায়ে পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি এই মিশনের শ্রীরাজপুর (কুষ্টিয়া) কেন্দ্রটি গৌরী নদীর ভাঙ্গনের ফলে নদীয়া জেলার মুড়াপাড়া ধর্মদার নিকট পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীর তীরস্থিত বিবেকানন্দপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আমরা এই জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি কামনা করি।

ভারতের শিক্ষার প্রসার—কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

(১) উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগের কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া ১০ বৎসরের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের শিল্প ও কৃষিগত উন্নতির জন্য যে উচ্চতর শিক্ষা আবশ্যক তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান বাঞ্ছনীয়।

(২) ক্রমবর্ধমান হারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক-গণের মূল বেতন ৪০৲ টাকা হইতে আরম্ভ হইবে।

(৩) শিক্ষা-সৌকর্যের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় হইলেও জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে, ৫ বৎসরের জন্য ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার আনুপাতিক হার প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের পরিবর্তে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। প্রতি ৩০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষকের ব্যবস্থা সম্ভব হইলে ৫ বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই পুনঃপ্রবর্তন করা উচিত; কিন্তু যাহাই হউক না কেন, পূর্বের আনুপাতিক হার পুনঃপ্রবর্তনের প্রশ্ন ৫ বৎসর অন্তে পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৪) দেশের বর্তমান অবস্থায় কোন প্রদেশ কোন কোন অঞ্চলে দুই দফায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য

হইয়াছে। বোর্ড এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন না এবং অবস্থা অনুকূল হওয়া মাত্র এই ব্যবস্থা বর্জন করিতে বলিতেছেন।

(৫) বাধ্যতামূলক অধ্যয়নকালে পরবর্তী শিক্ষার জন্য কিছু বর্ধিত হারে ফী ধার্য করা যাইতে পারে; তবে যথেষ্টসংখ্যক দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিনাবেতনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৬) গভর্নমেণ্ট আইন দ্বারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁহাদের আয়ের একটা অংশ শিক্ষা বাবত ব্যয়ের জন্য প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারেন; তবে গভর্নমেণ্ট কোন কোন বিশেষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতা হইতে বাদ দিতেও পারেন।

(৭) ছাত্রগণ প্রবেশিকা অথবা অনুরূপ পরীক্ষা পাশের পর আবশ্যক হইলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ও নির্দিষ্ট সর্তে সমাজ শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষকরূপে কাজ করিবে।

(৮) লোকে যাহাতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শিক্ষার জন্য এককালীন ও পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য উৎসাহ দিতে হইবে এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রদান করা সম্ভব সেই পরিমাণ অর্থ-সাহায্য লইয়া স্বয়ংগঠিত সঙ্ঘ প্রভৃতিকে বিদ্যালয় পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

(৯) যেখানেই সম্ভব, বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যয় অথবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যয়ের অংশ-বিশেষ ঋণগ্রহণপূর্বক সংগ্রহ করিতে হইবে।

(১০) কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ১০ ভাগ এবং প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের রাজস্বের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(১১) শিক্ষা বাবত ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের বহন করা কর্তব্য।

(১২) শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত সমস্ত দান আয়কর হইতে মুক্ত থাকিবে।

(১৩) শিল্প অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করিবে তাহা যদি প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয় তবে সেই ব্যয়ও প্রতিষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম বাবত ব্যয় রূপে গণ্য হইবে।

শারীরিক শিক্ষা—বোর্ড শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির মধ্যবর্তিকালীন রিপোর্টও বিবেচনা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নকালে কমিটির নিম্নলিখিত বিষয় দুইটীর প্রতি মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক :—

(১) শারীরিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের কে কি পরিমাণ বহন করিবেন তাহা স্থির করিবার সময় কমিটিকে মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টকে ব্যয়ের শতকরা ৫০ ভাগ বহন করিতে হইবে—৩০ ভাগ নহে।

(২) দেশে শরীরচর্চার উৎকর্ষের জন্য দেশরক্ষা-দপ্তরের সহযোগিতা লাভ করা আবশ্যক এবং পুণায় যে শরীরচর্চা বিদ্যালয় রহিয়াছে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

ভ্রম-সংশোধন—এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার শেষ বাক্য যে ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, উহার স্থলে "কোন ধর্মসম্প্রদায় ধর্ম-প্রতিষ্ঠান ও ধর্মসাধককে ধর্মশিক্ষাদান ধর্মপ্রচার ও ধর্মানুষ্ঠানে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন প্রকার সাহায্য অথবা শান্তি শৃংখলা ও সার্বজনীন ন্যায়-নীতি-বিরুদ্ধ না হইলে বাধাদান করা হইবে না।" হইবে।

পশ্চিম-পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগীদের বৃত্তান্ত

সম্পাদক

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে সর্বত্র সাড়ম্বরে আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। ঠিক এই সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ইহার ফলে দেশব্যাপী বিপুল আনন্দের মধ্যেও গভীর নৈরাশ্য সকলের মনকে বিষাদিত করে। সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, এই অশ্রুতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং উপজাতীয় পার্বত্য অঞ্চল হইতে ৪১,৬২,২৬৯ জন, সিন্ধুপ্রদেশ, খয়েরপুর মুসলমান দেশীয় রাজ্য এবং বেলুচিস্থান হইতে ১১,১৫,০০০ জন এবং দেশীয় মুসলমান রাজ্য বাহাওয়ালপুর হইতে ১,২৫,৮৩১ জন হিন্দু ও শিখ নরনারী নিতান্ত নির্মম ভাবে বিতাড়িত হইয়া তাঁহাদের বাস্তু ত্যাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখনও সিন্ধুপ্রদেশে ৪ লক্ষ হিন্দু ও শিখ ছিলেন এবং তাঁহারা ক্রমে ভারতের নানাস্থানে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন। এতদ্ভিন্ন পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে কত লোক যে ভারতের বহু স্থানে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব-পাঞ্জাব হইতেও প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমান নরনারী বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম-পাকিস্তানের কয়েকটি প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া বাস্তুত্যাগের সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাঞ্জাবের বহু মহিলা অপহৃতা হন। মিঃ গোপালস্বামী আয়েঙ্গার বলেন, এই সময়ে পশ্চিম-পাঞ্জাবের ১১,৭৭৪ জন অপহৃতা মহিলার নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। পূর্ব-পাঞ্জাবের অপহৃতা মহিলাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব-পাঞ্জাব হইতে ৬৯২৭ জন, পূর্ব-পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য হইতে ২৬৭৭ জন এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে ৪৬৯৬ জন অপহৃতা মহিলাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক বিরোধে উভয় ডমিনিয়নের কত লক্ষ নরনারী যে হতাহত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা সঠিক নিরূপিত হয় নাই। অধিকাংশ বাস্তুত্যাগীই সর্বহারা হইয়া কেবল প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে এরূপ অচিন্তনীয় ব্যাপক বাস্তুত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ইহার সঙ্গে তুলনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যে

লোক-বিনিময় হইয়াছে, উহা অতি নগণ্য। পশ্চিম-পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ অধিবাসীদের সঙ্গে পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমান অধিবাসীদের বাস্তুত্যাগ-বিনিময় আপসে হইলে যে উভয় রাষ্ট্রের বাস্তুত্যাগীদের দুঃখ-দুর্দশা বহুলাংশে কম হইত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ উভয় রাষ্ট্রের পরিচালকগণ জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার এইরূপ অচিন্তনীয় পরিণতি কল্পনায়ও স্থান দিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহা তাঁহাদের রাজনীতিক দুরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী বাস্তুত্যাগ করিয়া সর্বহারা অবস্থায় অকস্মাৎ ভারতে আগমন করায় পার্শ্ববর্তী কয়েকটি ভারতীয় প্রদেশের আইন ও শৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট হইয়া ভীষণ অরাজকতা সৃষ্ট হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টের পরিচালকগণের অসাধারণ কৃতিত্বে তাহা হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে, তাঁহারা অত্যন্ত সাহস সহকারে এই সাংঘাতিক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ইহার অনেকটা সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সচিব পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, "ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণ বলিবেন যে, এই প্রকার অতি ব্যাপক ও জটিল সমস্যা যে কোন রাষ্ট্রের এবং সামাজিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটাইত, কিন্তু স্বাধীন ভারতের জনগণ সাহস সহকারে ইহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আমি আশা করি, তাঁহারা ইহার সন্তোষজনক সমাধান করিবেন।" ভারত-গবর্নমেণ্ট কি ভাবে এই বৈপ্লবিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়া ইহার সমাধান করিয়াছেন তাহাই অতি সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ভারত-সরকার যখন বুঝিতে পারিলেন যে অবস্থাধীনে পশ্চিম-পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখদের বাস্তুত্যাগ অপরিহার্য, তখন তাঁহাদের অধিকাংশকে বাঁচাইবার জন্য বাস্তুত্যাগ ত্বরান্বিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। বহুসংখ্যক রেলগাড়ী ট্রাক্ ও এরোপ্লেন পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া বিতাড়িত বাস্তুত্যাগিগণকে ভারতে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

১৯৪৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সামরিক বিভাগ হইতে বাস্তুত্যাগিগণকে সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে এক এক স্থানের ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার বাস্তুত্যাগী পদব্রজে পাকিস্তানের সীমা অতিক্রম করেন। এই দলগুলিকে আবশ্যক অনুসারে এরোপ্লেন হইতে খাদ্য-দ্রব্য ও বস্ত্রাদি সরবরাহ করা হয়। ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ-পথ্যাদিসহ চিকিৎসকগণ ট্রাক মোটর ও এরোপ্লেনে যাইয়া এই দলসমূহের দুঃস্থদের সেবা করেন। ভারতের সীমানায় আসিবার পূর্বে দলে দলে য়্যাম্বুল্যান্স পাঠাইয়া দলের সকলকে আবশ্যক অনুসারে কলেরা বসন্ত প্রভৃতির প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হয়। পাকিস্তানের মধ্য দিয়া বাস্তুত্যাগী দলগুলি অরক্ষিত অবস্থায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে মুসলমান গুণ্ডাগণ এই অসহায় নরনারীগণকে বেআইনীভাবে স্থানে স্থানে খানাতল্লাস করিয়া তাঁহাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের সর্বস্ব লইয়া যায়। ইহার উপর এই সময়ে পশ্চিম-পাঞ্জাব বন্যা-প্লাবিত হওয়ায় এই হতভাগ্য বাস্তুত্যাগীদের দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণে বর্ধিত হয়। ১৯৪৮ সনের মে মাসে মণ্টগোমারী হইতে ১০ হাজার বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখদের একটি দল ভারতের সীমানায় আগমন করে। ইহার পর আর বৃহৎ কোন দল ভারতে উপস্থিত হয় নাই।

পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে বাস্তুত্যাগিগণকে অতি শীঘ্র ভারতে আনয়নের জন্য বহু ট্রেনের বন্দোবস্ত

করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের ২৭শে আগষ্ট হইতে ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত ৬৭৩টি ট্রেনে ২৩ লক্ষাধিক বাস্তুত্যাগীকে ভারতে আনা হয়। এজন্য পূর্ব-পাঞ্জাবের নিয়মিত ট্রেনগুলি বন্ধ করিয়া ঐগুলিকে বাস্তুত্যাগী অপসারণে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে কেবল সামরিক বিভাগ হইতেই ৪২০০ ট্রাক্ নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন যুক্ত-প্রদেশের গবর্নমেণ্ট ৬শত এবং কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কয়েক শত ট্রাক সরবরাহ করেন। ইহা ছাড়া মোটরবাস সহায়ে ৪ লক্ষাধিক হিন্দু ও শিখ এবং ২ লক্ষাধিক মুসলমান বাস্তুত্যাগীকে সরান হয়। এই কার্যের জন্য ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই ট্রাক্ ও বাস চালক আনয়ন করা হইয়াছিল। ১৯৪৭ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বি-এ-ও-সি বাহিনী এবং ভারতে যতগুলি এরোপ্লেন সে সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তৎসমুদয় নিয়োজিত করিয়া ৩৭ হাজার বাস্তুত্যাগীকে অপসারণ করা হয়। এজন্য প্রতিমাসে ৬ লক্ষ গ্যালন স্পিরিট লাগিয়াছে। এ বিষয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং আর-আই-এ-এফ্-এর সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্তানের সীমানা ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাঞ্জাবের অনেক স্থানের রেল, পোষ্ট অফিস, তার ও টেলিফোন একেবারে অচল হয়; ইহাতে বাস্তুত্যাগিগণকে অপসারণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। এই কারণে সৈন্যদের সাহায্যে প্রথমতঃ এইগুলিকে কার্যকর করা হয়।

বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখগণকে আশ্রয়দানের জন্য ভারতের স্থানে স্থানে—বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীতে বহু ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় সামরিক অসামরিক বিভাগ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার ছোট-বড় তাঁবু সংগ্রহ করা হইয়াছিল। পূর্ব-পাঞ্জাবের বড় বড় শহরের ক্যাম্পগুলির এক-একটিতে ৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার বাস্তুত্যাগী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে পূর্ব-পাঞ্জাবের ৮৫টি ক্যাম্পে ৭ লক্ষ বাস্তুত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। পরে ইঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারত-গবর্নমেণ্টের রিলিফ ও পুনর্বসতি বিভাগই বেশী সংখ্যক ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই বিভাগের পরিচালনায় একমাত্র কুরুক্ষেত্রেই ৩ লক্ষ বাস্তুত্যাগী অবস্থান করেন। তাঁহাদের সেবাকার্যের কয়েকটি বিভাগ ভারত-গবর্নমেণ্ট রামকৃষ্ণ মিশনকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মিশন বহু কর্মীর সাহায্যে দীর্ঘকাল এই কার্য সন্তোষজনক ভাবে পরিচালন করিয়াছেন।

সর্বহারা লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগী নরনারীর স্থানে স্থানে আশ্রয় আহার বস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সুশৃঙ্খল ভাবে সকল কার্য পরিচালিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্যাম্পে আশ্রয়প্রার্থিগণকে নিয়মিতভাবে খাদ্য বস্ত্র ঔষধ প্রভৃতি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। গর্ভবতী, শিশু ও বালক-বালিকাগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্রীয় পুনর্বসতি-বিভাগ হইতে বাস্তুত্যাগিগণকে ১৪ লক্ষ লেপ, ৩½ লক্ষ কম্বল, ১½ লক্ষ শীতবস্ত্র এবং ২০ লক্ষ কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৮ সনের জুন মাসে ভারত-গবর্নমেণ্ট বাস্তুত্যাগ সংক্রান্ত সকল কার্যের ভার কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের উপর অর্পণ করেন এবং ৪,৩৯,২১৩ জন বাস্তুত্যাগীকে পূর্ব-পাঞ্জাবে, ৪৫,১৫৫ জনকে দিল্লীতে, ১,৭০,০০০ জনকে কুরুক্ষেত্রে, ৪৬,৬২৩ জনকে রাজপুতানায়, ২৪,৯৩৭ জনকে কাথিওয়াড়ে, ১,৫৮,৯৭০ জনকে বোম্বাই প্রদেশে, ৪৩,৯৯৭ জনকে মধ্য-প্রদেশে এবং ১,৩৬,৬০৭ জনকে যুক্ত-প্রদেশে প্রেরণ করেন। গত আগষ্ট পর্যন্তও দিল্লীতে ৪ লক্ষ,

যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম অংশে ৫ লক্ষ বাস্তুত্যাগী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সিন্ধু প্রদেশ হইতে আগত ৭ লক্ষ বাস্তুত্যাগী বোম্বাই প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও রাজপুতানায় অবস্থান করিতেছেন। পূর্ব-পাঞ্জাবেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাস্তুত্যাগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম-পাকিস্তানের অবশিষ্ট বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

গত জুলাই মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনীতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে আগত গ্রাম্য বাস্তুত্যাগিগণকে পূর্ব-পাঞ্জাব এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থান দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশে ৪ লক্ষ, যুক্ত-প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশ প্রত্যেকটিতে ৩ লক্ষ, মালোয়া দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নে ২ লক্ষ, মৎস্যরাজ্য, উদয়পুর, জয়পুর, দিল্লী, সৌরাষ্ট্র প্রত্যেকটিতে ১ লক্ষ এবং বিকানীর আজমিড় যোধপুর ও বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার বাস্তুত্যাগীকে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বাস্তুত্যাগী নর-নারীর জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা এক বিরাট সমস্যা। ইহার সমাধানের জন্য বাস্তুত্যাগিগণকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে :

ব্যবসা	বাস্তুত্যাগী সংখ্যার শতকরা	কর্মক্ষম বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা	পোষ্যবর্গসহ বাস্তুত্যাগীর সংখ্যা
কৃষিকার্য	৫০'০	৯,১৯,৬৬৭	২৭,৫০,০০০
শিল্পকার্য	২০'০	৩,৬৬,৬৬৭	১১,০০,০০০
বাণিজ্য	১৫'০	২,৭৫,০০০	৮,২৫,০০০
যান-বাহন চলাচল (Transport)	৩'০	৫৫,০০০	১,৬৫,০০০
পুলিশ	২'০	৩৬,৬৬৭	১,১০,০০০
জন-শাসন কার্য (Public Administration)	২'০	৩৬,৬৬৬	১,১০,০০০
মিস্ত্রী	২'৫	৬৪,১৬৭	১,৬২,৫০০
স্বীয় আয় হইতে জীবিকানির্বাহকারী (Persons living on their income)	০'৩	৫,৫০০	১৫,৫০০
চাকর (Domestic servants)	২'৫	৪৫,৮৩৯	১,৩৭,৫০০
অন্যান্য	১'৭	৩১,১৬৬	৯৩,৫০০

স্থির হইয়াছে যে, বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে আনুমানিক ২৫ লক্ষ নর-নারীকে (৫ লক্ষ পরিবার) কৃষি, গ্রাম্য শিল্প, ক্ষুদ্র দোকানদারী ও মজুরের কার্য দেওয়া হইবে। ২০ লক্ষ বাস্তুত্যাগীকে স্থায়ী আশ্রয় স্থান এবং কোন কাজ দেওয়া গত আগষ্ট পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পে অবস্থান করিতেছেন। ভারত-গবর্নমেণ্ট বাস্তুত্যাগিগণের মধ্যে কয়েক লক্ষের সাহায্যে একটি 'অগ্রণী বাহিনী' (Pioneer Force) গঠন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নূতন কয়েকটি শহর সৃষ্টি করিতে এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগী বহু কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পরিমাণ এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। একমাত্র কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেই পশ্চিম-পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখদের ৩,৫৪,৫৪,৭৪৬ টাকা এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের ১,২৮,৯০,৩৮৭ টাকা গচ্ছিত

আছে। কিছু দিন হয় ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের একটি কন্‌ফারেন্‌সে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্রের বাস্তুত্যাগিগণকে তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইবে। ইহা কার্যে পরিণত হইলে বাস্তুত্যাগজনিত গুরুতর সমস্যার সমাধান যে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ লক্ষ সর্বহারা বাস্তুত্যাগীকে আশ্রয়, আহার ও বস্ত্রাদি দানের জন্য ভারতগবর্নমেণ্টকে প্রতিমাসে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। এই কারণে ভারত-সরকার ব্যাপক ভাবে জাতিগঠনমূলক কোন কার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলে ভারত-গবর্নমেণ্টের জাতিগঠনমূলক কার্যাবলী অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

মহাপ্রয়াণ-পথে কবীর

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

একশত বিশ বর্ষ পূর্ণ কহিল কবীর ভক্তদেরে—
"মম ব্রতকাল হয়েছে পূর্ণ যেতে হবে এই ধরণী ছেড়ে,
কাশীবাস মোর হইয়াছে শেষ তল্পিতল্পা গুটাও সবে,
চল মগপুরে আর কেন দেরী জন্মভূমেই মরিতে হবে।"
একথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল শিষ্য-সাধুসমাজ,
দাবানল যেন জ্বলিল সহসা, তপোবন-শিরে
পড়িল বাজ।
নির্ব্বাক সবে প্রধান শিষ্য কহিল তখন নয়ন মুছি'
"শেলসম এই বার্ত্তা দারুণ—তবু এ অশ্রু নয়ক শুচি,
পরমানন্দ—ধামে এযাত্রা মোরা কাঁদি প্রভু
বিমোহ ভরে,
মিছে মায়াডোরে আপনারে ধ'রে রাখিব না
ধরণী' পরে।
শুধু জিজ্ঞাসি বুঝিতে নারিনু একি কথা প্রভু
শুনিনু কানে,
কাশীতে মরণে সদ্য মুক্তি আপনার চেয়ে কে
বেশী জানে?
মরিবার আগে সবে কাশী আসে, ছাড়ি শেষ কালে
কাশী এ হেন
যেথানে মরিলে রাসভ-জন্ম সেথানে হে প্রভু
যাবেন কেন?"
কহিল কবীর,—"এতদিন ধরি সব উপদেশ
সকলি বৃথা
কুরুক্ষেত্রে এ যেন হায়রে ব্যাখ্যাত হলো বৃথাই গীতা।
এতদিনকার প্রেমের সাধনা সকলি বন্ধু বৃথাই সবি,
মাটির মহিমা বিনা, পরিণামে পরমামুক্তি যদি না
লভি।
লোকের মিথ্যা ধারণাই বড় সাধনার নাই কিছুই
দাম?
মাটির দোষেই গর্দ্দভ হব—আমার দয়িত এমন বাম!
স্বর্গাদপি যে গরীয়সী মোর সে পাঠাবে মোরে
রাসভ-লোকে?
দরদী বন্ধু সঙ্গী তোমরা তাই কি কাঁদিছ
আমার শোকে?"

মুক্তি ও সিদ্ধি

শ্রীঅনিলবরণ রায়

এই দেহটা যে আমি নই, এই দেহের অতীত আত্মা আছে, তাহাই আমার প্রকৃত সত্তা, ভগবানের অংশ, অজর, অমর, সচ্চিদানন্দ—ইহাই হইতেছে আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। কিন্তু ইহাই সব নহে, আমার মধ্যে যে প্রাণের ক্রিয়া চলিতেছে, মন বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতেছে, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, সঙ্কল্প বিকল্প, প্রেম, ঘৃণা—এ-সবও বস্তুতঃ আমি নই, এ-সব হইতেছে আমার মধ্যে প্রকৃতির খেলা। আমাদের মনের মধ্যে যে-সব ক্রিয়া চলিতেছে, সে সবই শুদ্ধ মনের ক্রিয়া নহে, শুদ্ধ মনের ক্রিয়া হইতেছে—পর্য্যবেক্ষণ করা, বুঝা, বিচার করা, জ্ঞান অর্জ্জন করা—জ্ঞানলাভ করাতেই ইহার শান্ত আনন্দ। মনের মধ্যে বাসনা কামনা যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে সে-সব হইতেছে মনের উপরের প্রাণ-শক্তির ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। যতদিন প্রাণের এই উপদ্রব শান্ত না হইতেছে ততদিন মনের পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। অতএব মনের এই প্রাণাত্মক ক্রিয়া হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মনোময় পুরুষকে বলিতে হইবে—"এই যে বস্তুটি কষ্টকর প্রয়াস করিতেছে, শোক করিতেছে, হর্ষ করিতেছে, প্রেম করিতেছে, ঘৃণা করিতেছে, আশা করিতেছে, নিরাশ হইতেছে, ক্রুদ্ধ হইতেছে, ভীত হইতেছে, উল্লসিত হইতেছে, বিষণ্ণ হইতেছে—আমি এই বস্তু নই, এ-সব হইতেছে প্রাণের আবেগ, হৃদয়ের ভাব—a thing of vital moods and emotional passions. এ-সব হইতেছে নিম্নতর মনের মধ্যে কেবলমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতির গতানুগতিক অভ্যাসপরম্পরা।" মন এই সব ভাব ও আবেগ হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবে এবং যেমন দেহের ক্রিয়াকে দ্রষ্টা ভাবে দেখিতে শিখিয়াছে, তেমনই এ-সবকেও দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে কেবল দেখিয়া যাইবে। মনের মধ্যেই একটা বিভাগ হইবে। প্রকৃতির গুণসকলের অভ্যাসের বশে এই ভাবাত্মক মনের মধ্যে এই সব ভাব ও আবেগের খেলা চলিতে থাকিবে, আর একদিকে থাকিবে দ্রষ্টা মন, তাহা এই সবকে দেখিবে, বিচার করিবে, বুঝিবে কিন্তু সে-সব হইতে নিজেকে আলাদা করিয়া অনাসক্ত হইয়া থাকিবে। সে দেখিবে যেন মনের রঙ্গমঞ্চে অপর লোক আসিয়া অভিনয় করিতেছে। প্রথম প্রথম এই অভিনয় দেখিতে তাহার ভাল লাগিবে, কখনও বা সে নিজেকে ইহাদের সহিত এক করিয়া ফেলিবে, সম্পূর্ণ শান্ত ও অনাসক্ত থাকিতে পারিবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু শান্তভাবই লাভ করিবে না, নিজের স্বতন্ত্র নীরব সত্তায় আনন্দ উপলব্ধি করিবে। ছোট ছেলে খেলা করিতে করিতে যেমন নিজেকে খেলার মধ্যে হারাইয়া ফেলে, কাল্পনিক সুখ দুঃখে অভিভূত হয়, সেইরূপ ঐ সব ভাব ও রাজস আবেগের খেলাকে ছেলেখেলার মত অসার দেখিয়া হাসিবে।

দ্রষ্টাভাবের পর আসিবে অনুমন্তা ভাব—পুরুষ উপলব্ধি করিবে সে শুধুই দ্রষ্টা নহে, সে প্রভু, সে অনুমতি সরাইয়া লইলে ঐ সব খেলাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারে। অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লইলে কি ঘটে তাহা দ্রষ্টব্য। ভাবাত্মক মন সাধারণতঃ শান্ত ও শুদ্ধ হয়,

ঐ সব প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত হয়; আর যদিও তাহারা পুনরায় আইসে, তথাপি তাহারা আর ভিতর হইতে উঠে না, পরন্তু মনে হয় যেন বাহির হইতে আসিতেছে। ভিতরের তন্তুগুলি তখনও সে-সবে সাড়া দিতে সক্ষম রহিয়াছে। কিন্তু সাড়া দিবার এই অভ্যাসও ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় এবং কালক্রমে ভাবাত্মক মন যে-সব রাজস আবেগকে বর্জ্জন করিয়াছে সে-সব হইতে সম্পূর্ণ ভাবেই মুক্ত হয়। আশা ও আশঙ্কা, অনুরাগ ও দ্বেষ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, সন্তোষ ও অসন্তোষ, উল্লাস ও বিষণ্ণতা, বিভীষিকা, ক্রোধ, ভয়, বিরক্তি, লজ্জা এবং প্রেম ও ঘৃণার আবেগ মুক্ত পুরুষের চৈতন্য হইতে খসিয়া পড়ে।

তাহাদের স্থানে কি আসে? যদি চাহ, তাহা হইলে আসিতে পারে পূর্ণ শান্তি, নীরবতা ও উদাসীনতা। কিন্তু যদিও সাধককে সাধারণতঃ এই অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়, এই দিকেই আমরা আমাদের যোগের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। অতএব পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা ও অনুমন্তা হয় না, সে হয় ঈশ্বর,—সে সঙ্কল্প করে, আর তাহার সঙ্কল্প হয় অশুদ্ধ ভোগের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ ভোগ গ্রহণ। সে যাহা সঙ্কল্প করে, প্রকৃতি তাহাই পালন করে। যাহা ছিল কামনা ও আবেগের উপাদান তাহাই শুদ্ধ, সম এবং শান্ত অথচ নিবিড় প্রেম আনন্দ ও ঐক্যে পরিণত হয়। প্রকৃত পুরুষ সম্মুখে বাহির হইয়া আইসে এবং বাসনাত্মক মনের শূন্য স্থানটি গ্রহণ করে। পাত্রটি পরিষ্কৃত ও শূন্য করা হইলে তাহা দিব্য প্রেম ও আনন্দের সুরায় পূর্ণ হয়, তাহা আর রাজস আবেগের মধুর ও তিক্ত গরলে পূর্ণ থাকে না। সকল রকম রাজস আবেগ (passions), এমন কি শুভের জন্য আবেগও হইতেছে দিব্য প্রকৃতির বিকৃতি। যে প্রেম কামনা করে এবং ধরিতে যায়, আনন্দে আত্মহারা, সুখে বিক্ষুব্ধ হয়, দুঃখে বিচলিত হয়—তাহাকে বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহার পরিবর্ত্তে চাই সমভাবাপন্ন সর্ব্ব-আলিঙ্গনকারী প্রেম, তাহার মধ্যে ঐ সব বিক্ষোভ নাই, তাহা ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করে না, সাড়া পাওয়া গেল কি না গেল তাহাতে তাহা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না। এই ভাবে চিত্তের অন্য সব ক্রিয়াকেই শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। তিতিক্ষা, নিরপেক্ষ উদাসীনতা, সুখ বা দুঃখের কারণ যাহাই আসুক শান্ত-ভাবে মাথা পাতিয়া লওয়া, উল্লসিত বা দুঃখিত না হওয়া এ-সব হইতেছে সমতার প্রাথমিক সাধনা, নেতিমূলক (negative); কিন্তু সমতা সিদ্ধ হয় না যতক্ষণ তাহা সক্রিয় (positive) প্রেম ও আনন্দের রূপ না গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় সর্ব্বত্র সর্ব্বসুন্দরের রস গ্রহণ করিতে শিখিবে, হৃদয় সকলকে সমান ভাবে ভালবাসিতে শিখিবে, শুদ্ধ প্রাণ এই রস, এই প্রেম, এই আনন্দ উপভোগ করিতে শিখিবে। কিন্তু ইহা হইতেছে চরম পূর্ণতা ও সিদ্ধি; তাহার পূর্ব্বে চাই বাসনাত্মক মন হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র করা এবং সকল রাজস আবেগ বর্জ্জন করা; প্রথমে চাই মুক্তি, তাহার পর আসিবে পূর্ণতা।

প্রথমে মনের চিন্তা দিয়াই আমাদিগকে দেহ ও প্রাণের খেলা হইতে, বাসনাত্মক মনের খেলা হইতে মুক্ত করিতে হইবে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই চিন্তাশীল মনকেও বর্জ্জন করিতে হইবে। পুরুষ তখন বলিবে—"আমি এইটিও নহে, আমি চিন্তা নহি, চিন্তাকারীও নহি; এই সব চিন্তা, অভিমত, জল্পনা কল্পনা, বুদ্ধির প্রয়াস, বুদ্ধির পক্ষপাতিত্ব, গোঁড়ামি, সংশয়, আত্ম-সংশোধন—এ-সব আমি নহি।" এইভাবে

একটি বিভেদ সৃষ্ট হয়, যে মন চিন্তা করিতেছে, সঙ্কল্প করিতেছে এবং যে মন শুধু এই সব দর্শন করিতেছে। পুরুষ হয় শুধু দ্রষ্টা; চিন্তার ধারাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, অনুধাবন করে কিন্তু সে-সবে জড়িত হইয়া পড়ে না, নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে। তাহার পর প্রভুরূপে সে মনের এই সব খেলা হইতে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া লয়, বুদ্ধির নির্ব্বন্ধশীল ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। সে তখন চিন্তাকারী মনের বশ্যতা হইতে মুক্ত হয়, সম্পূর্ণ নীরবতায় সমর্থ হইয়া উঠে।

পূর্ণ সিদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োজন যে পুরুষকে পুনরায় তাহার প্রকৃতির ঈশ্বর হইতে, হইবে এবং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে ঋতম্বিত (truth-conscious) চিন্তনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তাহা ঊর্দ্ধ হইতে জ্যোতি স্ফুরণ করিবে। কিন্তু নীরবতা না হইলে চলিবে না; চিন্তার মধ্যে নহে, পরন্তু নিশ্চল নীরবতার মধ্যেই আমরা আত্মার সাক্ষাৎ পাইব, আমরা আত্মাকে আর শুধুই কল্পনা বা ধারণা করিব না পরন্তু তাহাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিব এবং আমরা মনোময় পুরুষ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মনের যাহা মূল উৎস সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হইব।

জীবন-মরণ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জীবনে আমি মরিতে চাহি আজ
বিনাশহীন জীবন যদি মিলে—
বাঁধনে ঘেরা বাঁচিয়া কিবা কাজ
মরণ তাই বরিব অবহেলে।
দেহের সীমা যদিরে নাহি ঘুচে
যদি না থামে মনের ছুটাছুটি—
দেহের জীবন বৃথাই তবে মিছে
মনের মায়া যাক্ না তবে কাটি।
শতেক ক্ষুধা জাগিছে অবিরত
শতেক মোহ চিত্তে ব্যাপি রহে
ব্যাকুল প্রাণে বিফল আশা কত
বিরাম নাহি—এরেই জীবন কহে?

ক্ষণিক আলো ক্ষণেতে ছায় তম
নিমেষে সুখ নিমেষ পরে ব্যথা
সত্যে রাখে বেড়িয়া বিপুল ভ্রম
এই কি শ্রেয়, এই কি জীবন-গাথা?
শৃঙ্খলিত দাসের মত বহা
দুঃসহ রে মিথ্যা-জীবন-ভার
জীবন বেশে কুটিল মৃত্যু যাহা
প্রকাশরূপে গহন অন্ধকার।
জীবন-নিশা কাটুক তাই, চলি—
নাইরে যথা ভ্রান্তি-মোহ-শোক
জীবন-পারে জীবন সনে মিলি
মরণে মোর জীবন সত্য হোক্।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

"নাস্তি মায়াঞ্জনং যস্য রঘুবীরপরাক্রমম্।
ন্যাসিনাঞ্চ বরিষ্ঠং বৈ বন্দে ভক্ত্যা নিরঞ্জনম্॥"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোল জন সন্ন্যাসী শিষ্যের অন্যতম ছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণের ছয়জনকে ঠাকুর ঈশ্বরকোটি বলিতেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে তিনি অন্যতম ঈশ্বরকোটিরূপে নির্দেশ করিতেন। ঈশ্বরকোটি নিত্যমুক্ত এবং অবতারতুল্য শক্তি-সম্পন্ন। ঠাকুর বলিতেন, 'নিরঞ্জনের একটু অঞ্জন নেই, অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত।' ঠাকুর ইহাও বলিতেন, 'ভগবান রামচন্দ্রের অংশে নিরঞ্জনের জন্ম।' স্বামী প্রেমানন্দ ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, নিরঞ্জন স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তীরধনু লইয়া খেলা করিতেছেন।

পূর্বাশ্রমে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে নিরঞ্জন এই সংক্ষিপ্ত নামে ডাকিতেন। চব্বিশ-পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজারহাট গ্রামে নিরঞ্জন স্বামী জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় তাঁহার মামার বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। বাল্যকালে তিনি গরুর গাড়ীতে বসিয়া উঠানামারূপ খেলা করিতে ভালবাসিতেন। ঐ সময় তিনি কলিকাতার একদল প্রেততত্ত্ববাদিগণের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহারা নিরঞ্জনের মধ্যে প্রেত আনাইতেন। প্রেততত্ত্ববাদিগণের সাধনায় তিনি কিছু অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই শক্তির বলে তিনি আশ্চর্যরূপে দুরারোগ্য ব্যাধি সারাইতে পারিতেন। কলিকাতার জনৈক ধনী প্রায় আঠার বৎসর অনিদ্রারোগে ভুগিতেছিলেন। নিরঞ্জনের অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার আরোগ্য হয়। এই আরোগ্যের কথাপ্রসঙ্গে নিরঞ্জন পরবর্তী জীবনে বলিতেন যে তখন হইতেই তাঁহার মনে জীবনের অনিত্যত্ববোধ জাগ্রত হইল।

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একদিন বৈকালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার প্রেত-তত্ত্ববাদী বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। ঠাকুর নিরঞ্জনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পূর্বপরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। নিরঞ্জন ও তাঁহার বন্ধুগণ ঠাকুরকে মিডিয়াম (medium) হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সরল শিশুর ন্যায় ঠাকুর তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া তাঁহাদের পার্শ্বে বসিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে উহা তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তখন তিনি উঠিয়া গেলেন। ঠাকুর একটু পরে নিরঞ্জনকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি ভূতের কথাই সদা ভাব, তুমি ভূত হয়ে যাবে। আর যদি তুমি ঈশ্বরের চিন্তা কর, দেবতুল্য মানুষ হবে। কোন্‌টা তুমি পচ্ছন্দ কর?' নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, 'নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টা।' ঠাকুর তাঁহাকে সেই রাত্রি মন্দিরে যাপন করিতে বলিলেন। কিন্তু বালক নিরঞ্জন মামার ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে পারিলেন না।

ঠাকুর তাঁহাকে নিরঞ্জন বলিয়া ডাকিতেন। সেইজন্য তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে নিরঞ্জন মহারাজ

বা নিরঞ্জন স্বামী নামে পরিচিত। ঠাকুরের প্রথম দর্শন অল্পক্ষণের হইলেও ইহা নিরঞ্জনের তরুণ মনে গভীর রেখাপাত করে। মামার বাড়ী যাইবার পথে এবং অন্য সময়েও ঠাকুরের চিন্তা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। কয়েক দিন পরে আবার তিনি কালীবাড়ীতে ঠাকুরকে দর্শন করেন। দ্বিতীয় দর্শন কালে ঠাকুর উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভাবাবেগে বলিলেন, 'বাবা, জীবনের দিনগুলি যে চলে যাচ্ছে, কবে ঈশ্বর দর্শন করবে? ঈশ্বরলাভের জন্য কবে তুমি সর্বান্তঃকরণে আকুল হবে, তা' দেখবার জন্য আমি ব্যগ্র হয়েছি। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত মানবজীবন নিষ্ফল ও দুঃখময়।' বৈদিক ঋষি সত্যই বলিয়াছেন,

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

'ইহজীবনে যদি ঈশ্বর লাভ হয়, তবেই জীবন সার্থক। আর ঈশ্বরলাভ না হইলে জীবন বৃথা, সর্বনাশ, মহতী বিনষ্টি।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, 'য এতদবিদিত্বা অস্মাদ্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।' অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ভাগ্যহীন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বালক আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, যিনি অন্যের মুক্তির জন্য এত চিন্তিত হন তিনি নিশ্চয়ই দেবমানব। তিনি তিন দিন ঠাকুরের পূত সংসর্গে অতিবাহিত করিয়া তাঁহার দিব্য জীবনের সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য হইলেন। তিনি গৃহে ফিরিতেই মামা তাঁহাকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য ভৎর্সনা করিয়া নজরবন্দী রাখিলেন। এখন হইতে নিরঞ্জন প্রেততাত্ত্বিকগণের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে প্রকৃত ধর্মজীবন গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৮৮২ সনের প্রথমভাগে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হয়। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে থাকিয়া নিরঞ্জন বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ নিরঞ্জনের গুরুভক্তি-নিদর্শক একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। নিরঞ্জনের ছিল উগ্র স্বভাব, দীর্ঘ দেহ, বিশাল বক্ষ, সবল স্বাস্থ্য এবং তেজোব্যঞ্জক আকৃতি। একদা তিনি গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাইতেছিলেন। কয়েকজন নির্বোধ সহযাত্রী অযথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিন্দা আরম্ভ করে। নিরঞ্জনের মৃদু প্রতিবাদ তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না। গুরুনিন্দা শ্রবণে তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তিনি সন্তরণপটু ছিলেন। নিন্দুকগণকে ভয় দেখাইবার জন্য তিনি নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের সুদৃঢ় ও সবল দেহ দর্শনে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। অবিবেচক নির্বোধগণ শীঘ্রই ভীত হইয়া অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ইহাতে নিরঞ্জনের ক্রোধ প্রশমিত হইল। উক্ত সংবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি বিরক্ত হইয়া নিরঞ্জনকে বলিলেন, 'ক্রোধ ভীষণ রিপু। তুমি এর বশবর্তী হলে কেন? অজ্ঞ লোকে কত কি বলবে। এসকল বাজে কথায় কর্ণপাত করলে তোমার জীবন বাজে চিন্তায় ব্যয়িত হবে। সাধুর রাগ জলের দাগের মত ক্ষণিক হওয়া উচিত। কখনও ক্রোধের বশীভূত হবে না।'

বিবাহিত জীবনের প্রতি বাল্যকাল হইতেই নিরঞ্জনের ঘৃণা ছিল। তিনি চিরকুমার ছিলেন। জননীর ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় চাকরী গ্রহণ করিতে হয়। ইহা শুনিয়া ঠাকুর

দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'এর মৃত্যুসংবাদ শুনলেও আমি এত দুঃখিত হতাম না।' কিন্তু ঠাকুর যখন জানিলেন যে, বৃদ্ধা গর্ভধারিণীর নিমিত্তই তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বে চাকরী লইয়াছেন তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

ঠাকুর যখন অন্তিম অসুখের সময় চিকিৎসার্থ কাশীপুর বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন নিরঞ্জন চাকরী ছাড়িয়া ঠাকুরের কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় ব্রতী হন। একদা ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে এক অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার দর্শন ও কৃপা প্রার্থনা করেন। নিরঞ্জন তখন একটি লম্বা লাঠি হাতে করিয়া উক্ত বাটীর দ্বাররক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নবাগতকে ঠাকুরের নিকট যাইতে দেন নাই। কিন্তু ঠাকুর ভাগ্যবান্ অভ্যাগতকে স্বসমীপে ডাকিয়া কৃপা করেন। ঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার পূত ভস্মাস্থি একটি তাম্রপাত্রে রক্ষিত হয়। পাত্রটি উক্ত বাটীর যে গৃহে ঠাকুর থাকিতেন তথায় অস্থায়ী ভাবে স্থাপিত হয়। নিরঞ্জন ও শশী উক্ত পাত্র হইতে অধিকাংশ ভস্মাস্থি লইয়া একটি পাত্রে বলরাম বসুর বাটীতে প্রেরণ করেন। উক্ত ভস্মাস্থি রামকৃষ্ণ-সংঘের মূল কেন্দ্র বেলুড় মঠে প্রোথিত আছে ও নিত্য পূজিত হয়। ঠাকুর কাশীপুর বাগানে যে এগার জন শিষ্যকে সন্ন্যাস দেন তন্মধ্যে নিরঞ্জন অন্যতম। শশীর ন্যায় নিরঞ্জনও ঠাকুরের ভস্মাস্থি-পূজায় একনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৮৬ সনের শেষভাগে বরাহনগরে যখন রামকৃষ্ণ-সংঘের মঠ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন নিরঞ্জন সংসার ত্যাগ করিয়া মঠে যোগদান করেন। 'নিরঞ্জনের অঞ্জন নাই'—ঠাকুরের এই বাক্য স্মরণে তাঁহার নাম নিরঞ্জনানন্দ রাখা হয়।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশকাল বরাহনগর, আলমবাজার এবং বেলুড় মঠে অতিবাহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলম্বো গমন করেন। স্বামীজীর উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহার সঙ্গে বহুস্থানে যান। স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে অসুস্থ হন তখন নিরঞ্জন মহারাজ পাগড়ী মাথায় ও দীর্ঘযষ্টি হস্তে দিগ্বিজয়ী গুরুভ্রাতার দ্বাররক্ষক হইতে গৌরববোধ করিতেন। তিনি কাশীতে কিছুকাল মাধুকরী করিয়া তপস্যা করেন। শেষজীবনে নিরঞ্জন স্বামী রক্তামাশয়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করেন। হরিদ্বারে বায়ুপরিবর্তনার্থ যাইয়া তিনি ১৯০৪ সনে মে মাসে কলেরা-রোগে দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর ন্যায় তিনিও মাত্র চল্লিশ বৎসর ইহধামে ছিলেন। সংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তিবিশ্বাস ছিল। শেষ সাক্ষাতের সময় নিরঞ্জন স্বামী মাতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে থাকেন। মাতাও পুত্রের দুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'নিরঞ্জনের গভীর মাতৃভক্তির জন্য আমি তার হাজার দোষ ক্ষমা করতে পারি।'

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন নির্ভীক, সরল, বজ্রবৎ কঠোর এবং কুসুমবৎ কোমল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ছিল অসামান্য। কেহ প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিলে তিনি তাহার প্রতি বিরক্ত ও বিমুখ হইতেন। কোনও ভদ্রলোক কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে প্রচুর অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কোন কারণে তাঁহার উৎসাহ হ্রাস হওয়ায় প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া সামান্য অর্থ দিতে চাহেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় দাতা সত্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। এইজন্য সত্যনিষ্ঠ নিরঞ্জনানন্দ উক্ত অর্থ লইতে অস্বীকার করেন। তখন কাশীর সেবাশ্রম প্রাথমিক ও অসচ্ছল অবস্থায় ছিল। উক্ত দান অস্বীকার করায় সেবাশ্রমের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইল।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহার অল্পপরিসর পার্থিব জীবন সত্যদ্রষ্টার ন্যায়, মুক্তপুরুষের ন্যায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, সংসারের প্রশংসা বা নিন্দায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচররূপে রামকৃষ্ণ-সংঘে অমর। পৃথিবীর বহু দেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-ভক্তগণ চিরকাল তাঁহাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করিবে।

গুপ্তযুগের স্তম্ভ

শ্রীমণীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত

সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্ত্তি হইতে বোঝা যায়, গুপ্ত-যুগে ধাতুবিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আরো আশ্চর্য্যজনক। ৪১৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম কুমারগুপ্ত তাঁহার পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) স্মৃতির উদ্দেশে স্থাপন করেন; স্তম্ভটি ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ। ইহা পেটান লোহা। খুব অল্পদিন পূর্ব্বেই ইউরোপে এই রকম স্তম্ভ নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। ইহা একটি বিস্ময়ের বস্তু।

অশোকের ন্যায় গুপ্তযুগের রাজারাও কয়েকটি মোনোলিথিক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কোনো কোনো স্তম্ভশীর্ষ চতুষ্কোণ, উপরে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সংলগ্ন সিংহ আছে। অশোকের ঘণ্টাকৃতি পারসিপলিটান ক্যাপিটাল গুপ্তযুগের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের কুম্ভশীর্ষে পরিণত হইয়াছে।

গুপ্তযুগের স্থাপত্য

গুপ্তযুগের স্থাপত্যকে এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। (১) স্তূপ (২) গুহাচৈত্য ও বিহার (৩) নির্ম্মিত চৈত্য হল ও চৈত্যাকৃতি (Apsidal) হিন্দু মন্দির (৫) শিখর-মন্দির (৬) প্রাসাদ, সাধারণ বাসগৃহ ও নাট্যগৃহ।

গুপ্তযুগের স্তূপের মধ্যে সারনাথের ধামেক স্তূপ (৬ষ্ঠ শতাব্দী) সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত; ইহারা আকারে নলাকৃতি (cylindrical), অন্য স্তূপের মত অর্দ্ধগোলাকার (hemispherical) নহে। ধামেক স্তূপ পাথরের ঢাকের (drum) উপর ইঁটের স্তূপ। মোট উচ্চতা ১২৮ ফুট। মাঝপথে চারিদিকে কুলুঙ্গি আছে; কুলুঙ্গির নীচে লতাপাতা ও জ্যামিতির আলঙ্কারিক কারুকার্য্য আছে। এই জাতীয় অপর স্তূপ রাজগৃহের 'জরাসন্ধ-কা-বৈঠক' নামে পরিচিত।

অজন্তার ১৬, ১৭, ১৯নং গুহা গুপ্তযুগের। ১৬, ১৭নং গুহা হইল বিহার (৫০০ খৃঃ); ১৯নং চৈত্য (৫৫০ খৃঃ)।

১৬, ১৭নং গুহায় স্তম্ভযুক্ত হল রহিয়াছে; দেয়াল হইতে ছোট ছোট কুঠরী বাহির হইয়াছে—ভিক্ষুদের বাসস্থানের জন্য। শোয়ার জন্য পাথরের উচ্চস্থান (তক্তাপোষের মত) রহিয়াছে। পিছনে কুঠরীতে "প্রলম্বপাদ আসনে" বুদ্ধমূর্ত্তি আছে (ইউরোপীয় ধরনে বসা); এই ধরনে উপবিষ্ট মূর্ত্তি এই প্রথম।

১৯নং গুহার ভিতর নলাকৃতি স্তূপ আছে, মোনোলিথিক। স্তূপের গায়ে মকরতোরণের ভিতর দাঁড়ান এবং বসা বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। গুহার সম্মুখভাগ বা ফাসাদ (facade) লক্ষণীয়। প্রবেশদ্বারে ৪টি স্তম্ভের উপর ঢাকা ছাদওয়ালা অলিন্দ আছে। অলিন্দের উপর চৈত্য-জানালা। এই চৈত্য-জানালার আকারকে ইউরোপীয় লেখকগণ ঘোড়ার পায়ের লোহার নালের (horse-shoe) সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহা আমাদের মতে অশ্বত্থপাতার আকার হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দরজার দুই পাশে বুদ্ধের মূর্ত্তি খোদিত আছে। সম্পূর্ণ ফাসাদ রিলিফ মূর্ত্তি ও স্থাপত্যের অলঙ্করণে পূর্ণ। ১৯নং গুহার নাগরাজ ও রাণীর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

১৬, ১৭, ১৯নং এই তিন গুহাতেই গুপ্ত-যুগের চিত্র দেখা যায়।

বৌদ্ধ চৈত্যকে হিন্দু মন্দিরে পরিবর্ত্তিত হইতে

দেখা যায়; কৃষ্ণা জেলার চেজারলাতে কপোতেশ্বর মন্দির (চতুর্থ শতাব্দী) আছে। ইহা চৈত্য হল ছিল, ছাদ গুহাচৈত্যের ন্যায় পিপাকৃতি (Barrel-shaped)। বৌদ্ধচৈত্য ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে রূপান্তরিত হইয়াছে; ইহাকে য়্যাপসাইডাল মন্দির (apsidal temple) বলে। এই ধরনের মন্দির আরো আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আইহোলের দুর্গামন্দিরে সমতল ছাদ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), শুধু গর্ভগৃহে শিখর আছে। গুপ্তযুগের সমতল ছাদযুক্ত অনেক মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা গুপ্ত-স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। সাঞ্চির (৫ম শতাব্দী) ছোট মন্দির উল্লেখযোগ্য; মন্দির একটি ছোট কুঠরী, ছাদ সমতল, সম্মুখে বারান্দা আছে।

গুপ্তযুগের একটি বৈশিষ্ট্য মন্দির ঘেরিয়া বারান্দা; ইহা হইল পূজার্থীদের প্রদক্ষিণপথ। দরজার উভয়পার্শ্বে গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি; কারুকার্য্যখচিত দ্বারপথের বেষ্টনী (jamb) আছে। দরজার উভয় পার্শ্বে গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি মধ্যযুগেও ছিল। আইহোলের কয়েকটি মন্দিরে গুপ্তযুগের স্থাপত্যের উত্তম নিদর্শন মিলিবে।

গুপ্তযুগের শিখরমন্দিরের মধ্যে বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। হুয়েন্‌শাঙ্‌ ইহাকে "বজ্রাসনের গন্ধকুটি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮০-৮১ সনে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়। বর্ম্মীরা ১১০৫, ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহার সংস্কার করিয়াছিল। ইহা ইঁটের নির্ম্মিত। চূড়া ৯ তলা, সোজা উঠিয়া গিয়াছে; পরবর্ত্তী যুগের শিখরের বক্রতা (যেমন ভুবনেশ্বরের মন্দির) ইহাতে নাই। প্রত্যেক তলার মধ্যে কোণাকৃতি আমলক আছে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিহার) গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পালযুগ পর্য্যন্ত, অনেক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন মিলিবে। নালন্দা বিহার স্থাপন করেন গুপ্তসম্রাট নরসিংহ বালাদিত্য (৪৬৭-৪৭৩ খৃষ্টাব্দ)। এই সম্রাটের নির্ম্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ ইঁটের মন্দিরের কথা হুয়েন্‌শাঙ্‌ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত ছিল, মন্দিরে প্রচুর কারুকার্য্য ও সাজসজ্জা ছিল। এখন এ মন্দিরের ভিত্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নাই। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা ইহা ধ্বংস করে; বিরাট লাইব্রেরী আগুনে পুড়াইয়া দেয়।

উত্তর ভারতে নাগর বা শিখর টাইপের উদ্ভব হইয়াছে, এবং দক্ষিণে হইয়াছে দ্রাবিড়। নাগর মন্দিরের চূড়া সোজা উঠিয়া গিয়া উপরে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাকে ইংরেজীতে বলে curvilinear. দ্রাবিড় মন্দিরের চূড়া থাকে থাকে উঠিয়া পিরামিডাকৃতি হইয়াছে; উপরে গম্বুজ আছে। প্রত্যেক থাকে ছোট ছোট কুঠরী খোদিত আছে। দুই মন্দিরেই চতুষ্কোণ গৃহ হইতে চূড়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মদেশে দেখা যায়, গোলাকৃতি গম্বুজ উর্দ্ধে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, যেমন, রেঙ্গুনের সোয়েডাগন প্যাগোডা। ইহার বক্রতা convex, অর্থাৎ আভ্যন্তর বক্রতা; সাধারণ স্তূপের বক্রতা বাহিরের দিকে। এই স্থাপত্যের পরিণতি ইমোশন্ (emotion) সূচিত করিতেছে। গুপ্তযুগের মন্দির হইতে, পরবর্ত্তী শিখর মন্দিরের পরিণতিতে এই ইমোশন্ পাওয়া যাইবে। ইউরোপের রোমনস্‌ক্ স্থাপত্য হইতে গথিক স্থাপত্যের পরিণতিতেও ইহা লক্ষ্য করা যায়। বারহুতের জাতকের ভাস্কর্য্য শুধু narrative অথবা আখ্যানমূলক। ইহা হইতে অজন্তার চিত্রের পরিণতিতে ইমোশনের প্রাচুর্য্য মিলিবে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যের ক্রম-পরিবর্ত্তনে ইহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীনকালের প্রাসাদ কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত বলিয়া তাহার নিদর্শন নাই। অমরাবতীর ভাস্কর্য্য ও অজন্তার চিত্রে রাজপ্রাসাদের মডেল্ পাওয়া যাইবে—একতল অথবা অধিকতল বিশিষ্ট। স্তম্ভযুক্ত হল লইয়া প্রাসাদ নির্ম্মিত হইত। ছাদ ছিল সমতল অথবা চুঁচল। স্তম্ভের কার্ণিসে প্রচুর কারুকার্য্য এবং দেয়ালে ফ্রেস্কোপেন্টিং (fresco-painting) থাকিত। বর্ত্তমানে মান্দালয় (ব্রহ্মদেশে) ও জাপানে এই জাতীয় কাঠের বাড়ী দেখা যায়।

রাজপ্রাসাদের সঙ্গে আর্টগ্যালারি (চিত্রশালা), সঙ্গীতশালা, অথবা নাট্যমণ্ডপ থাকিত। নাট্যশালা হইল স্তম্ভযুক্ত খোলা হল। হলের একপাশে অল্প উচ্চমঞ্চের উপর স্টেজ; স্টেজের তিনদিক খোলা, ষ্টেজের পিছনে থাকিত পর্দ্দা, গ্রীনরুমে যাইবার জন্য তাহাতে দুটি দরজা থাকিত।

অনুরাগী

শ্রীরবি গুপ্ত

সুর-সবিতার দীপন-মন্ত্রে
জীবন-বাঁশি
আজি তব করে তোলো নিঃস্বনি'
আঁধার নাশি'।

মোর অন্তর-নীরবতা-তলে
ত্রিদিব দিনের জ্যোতি প্রতিপলে
বহ তব চির হিরণে এ-হিয়া
সমুদ্ভাসি'।
সুর-সবিতার মূর্ছনে সাধো
জীবন-বাঁশি।

করো বিহ্বল চরণ-নূপুর
অনুরণনে,
মর্ম মেদুর রাম-ধনু-রঙে
তোমা-বরণে।

বাঞ্ছিত মোর জীবন-শাখায়
আনো নভোমণি-প্রভাত-পাখায়;
চির উদয়ের অনাবিল বাণী
তব শরণে।
করো বিহ্বল চরণ-নূপুর
অনুরণনে।

জন্ম-যামিনী তব শশী করে
তন্দ্রাহারা।
ওগো সুদূরিকা তব পথে আমি
পন্থাহারা

এ-পথিক শুধু তোমারি লাগিয়া
নিথর রজনী নীরবে জাগিয়া,
খুলিছে কি দ্বার সব সাধনার—
রুদ্ধকারা!
জন্ম-যামিনী তব শশিকরে
তন্দ্রাহারা।

তোমার মন্ত্র এ-জীবন ভরি'
আমি যে সাধি,
ছন্দ আমার তব সুষমায়
সকল রাতি।

নিশা-অঞ্চল বিসারিত পথে
তব অবিচল দিশা-রবি-রথে
তোমার অতল রশ্মি অচলে
তুলি' প্রভাতি'।
তোমার মন্ত্র এ-জীবন ভরি
আমি যে সাধি।

কোন মর্মের মণি-মালঞ্চে
রয়েছ জাগি,'
স্বপনী, ধরার ধূলিকার চির
বিকাশ লাগি'।

তব করুণার প্লাবনে আমার
জীবনতরণী ভাসাও আবার—
ঢালো তব সুর অন্তর-তলে
হে অনুরাগী।
কোন মর্মের মণি-মালঞ্চে
রয়েছ জাগি'।

সুর-সবিতার দীপনমন্ত্রে
জীবন-বাঁশি
আজি তব করে তোলো নিঃস্বনি'
আঁধার নাশি'।

মোর অন্তর-নীরবতাতলে
ত্রিদিব-দিনের জ্যোতি প্রতিপলে
বহ তব চির হিরণে এ-হিয়া
সমুদ্ভাসি'।
সুর-সবিতার মূর্ছনে সাধো
জীবন-বাঁশি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মযোগ

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, সাহিত্যবিনোদ

সাংখ্য বলেন, প্রকৃতিজাত ত্রিবিধ গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতেই মানুষের প্রকৃতি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। তমঃ নিকৃষ্ট বৃত্তি, অজ্ঞান ও জড়ের প্রকৃতি; রজঃ কর্ম্মী ও ভোগীর প্রকৃতি; আর সত্ত্ব প্রকৃত জ্ঞানীর প্রকৃতি—অর্থাৎ যে জীবন সমস্ত অজ্ঞান ও কামনার উর্দ্ধে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সুসমঞ্জস জীবন কেবলমাত্র জ্ঞান বা কর্ম্মের সাধনায় লাভ করা যায় না। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একত্র পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা মুক্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন:

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"
—ঈশোপনিষৎ।

কর্ম্ম না করিয়া আমাদের উপায় নাই—কিন্তু যে কর্ম্মে আমাদের বন্ধন, তাহা জ্ঞানলাভের বিরোধী। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন:

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" (৩৯)

'হে অর্জ্জুন, তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মযোগ আচরণ কর। ক্রমে ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ-দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইবে।'

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের মধ্যে মানব-জীবনের গভীর সত্য নিহিত আছে। মানবসভ্যতার প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ যে কর্ম্ম আচরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার নিজ শরীরপোষণের জন্য। ক্রমে সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিল, তখন তাহার দৃষ্টি ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাইয়া পড়িল। মানুষের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যে কেবল নিজের জন্য নহে, তাহা মানুষ ক্রমে ক্রমে ধারণা করিতে শিখিল। জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সভ্যতার ক্রমবিকাশ অসম্ভব। মানুষের এই মনোবৃত্তি আছে বলিয়াই মানুষ সমষ্টিগত কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা সভ্যতার ক্রমোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

কিন্তু দেশকাল-ভেদে কর্ম্মেরও তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যজাতি ভোগপরায়ণ—তাই আজ কর্ম্মপ্রচেষ্টা দ্বারা তাহারা ভোগবাদের চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, জড়-শক্তির উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইয়া পার্থিব জীবনের সকল সুখের অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ঋষি প্রথম হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এইরূপ কর্ম্মে আত্মার উন্নতি হইতে পারে না। ইহাতে মহতী বিনষ্টি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও সেইজন্য উপদেশ দিতেছেন—

"তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার।"

কর্ম্ম যদি কেবল আত্মসুখ আহরণের জন্য

আচরিত হয়, তাহাতে আসক্তি আসিবে। আসক্তি হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে তমঃ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে। সেইজন্যই ঈশোপনিষদের প্রথম কথাই হইতেছে "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও সম্পূর্ণ আসক্তিহীন হইয়া কর্ম্মযোগ আচরণ করিতে করিতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইবে। ভারতবর্ষের ইহাই সনাতন আদর্শ। আত্মাকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতবর্ষের সাধনা। বহুপথ ও বহুমতের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ সেই পরম আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। উপনিষদের যুগে যে জীবনাদর্শের পরিচয় আমরা পাই, তাঁহাতে ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটি আশ্রমের কথা আছে। জীবনকে সুসমঞ্জস করিয়া গড়িতে হইলে কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না। সেইজন্যই কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়া সন্ন্যাস-জীবনের দিকে অগ্রসর হইবার নির্দ্দেশ আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনা দ্বারা ব্যক্তিগত ধর্ম্মোন্নতি হইলেও জাতির উন্নতি করা যাইবে না। সেইজন্য তিনি কর্ম্ম-যোগের উপর বেশী জোর দিয়াছিলেন। তিনি একাধারে কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী। স্বামীজী ভারতের দুরবস্থা উপলব্ধি করিয়া পরিষ্কাররূপে ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় রজোগুণের উদ্বোধন একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া শিথিল ও জড় হইয়া পড়িতেছে। এই নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে তাহারা সত্ত্বগুণ মনে করিয়া অবনতির দিকেই চলিয়াছে। সেইজন্যই তিনি এই তামসিকতাকে দূরীভূত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার যুবশিষ্যদের তিনি বলিতেন,—"You shall realise your God more by your football than by your Geeta." ইহার তাৎপর্য্য এই যে দৈহিক শক্তি বাড়াইয়া আগে তমো-গুণজাত জড়তা ও অলসতাকে দূর কর, কর্ম্মবীর হও, তারপর সত্যলাভের পথ মুক্ত হইবে। কেহ তমঃ হইতে একেবারে সত্ত্বে পৌঁছিতে পারে না। তাই যুবকগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ ছিল—'রজোগুণের অধিকারী হও।'—কর্ম্মশৈথিল্য ও কপট বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামীজী এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যুবক-সমাজের 'প্যানপ্যানে' ভাব, 'বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলা', 'লতিয়ে লতিয়ে চলা' আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি চাহিতেন তাহাদের মাংসপেশী ইস্পাতের মত দৃঢ় হউক, চিত্ত বজ্রের মত কঠিন হউক, হৃদয় সততায় ও নির্ম্মলতায় সমুজ্জ্বল হউক। তিনি বলিতেন—বীর্য্যবান হইতে চেষ্টা কর—তোমাদের উপনিষদ সেই বলপ্রদ আলোক। দিব্যদর্শন শাস্ত্র অবলম্বন কর, তবেই ভারতের উদ্ধার হইবে।

স্বামীজী যুগধর্ম্ম ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মস্তিষ্কচর্চ্চা করিয়া দিন অতিবাহিত করেন নাই। তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন জাতিকে, সমগ্র দেশকে—ভালবাসিয়াছিলেন মানুষকে। সেইজন্য স্বামীজী নিজেকে সমাজের সেবক বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন, সেবাধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি উদারকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন:

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেবাধর্ম্মের ভিতর দিয়া মানুষ তাহার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও সমস্ত কামনা-বাসনাকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সেই কারণেই, যাঁহারা মানুষকে বাদ দিয়া কেবল মন্দিরে বসিয়া দেবার্চ্চনা করেন, অথবা কেবল স্বকীয়

উন্নতির চেষ্টায় দিন অতিবাহিত করেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। একদিন কথামৃতের সংকলয়িতা মাষ্টার মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন যে, অমুকের কীর্ত্তনে বেশ ভাবাবেশ হয়। স্বামীজী অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, কীর্ত্তনে ভাবাবেশ বা অশ্রুপাত জীবনের বড় পরিচয় নহে। জীবনের গৌরব ত্যাগে, নিষ্কাম জীবসেবায়। স্বামীজী নিজ জীবন দিয়া সেবাধর্ম্মের গৌরব বুঝাইয়া গিয়াছেন।

স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা ও অনুদারতা লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—ছুঁৎমার্গ ছুঁৎমার্গ করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। আমাদের ধর্ম্ম এখন রান্নাঘরের ভাতের হাঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তা ছুঁয়ে দিলেতো সব গেল। এই দুর্ব্বলতা ও সংকীর্ণতাকে জয় করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে হইবে। এই সংকীর্ণতা-জয়ের একমাত্র উপায় হইতেছে জীবসেবা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবাই মানবজীবনের অবশ্য করণীয়। তিনি ইহা নিজে আচরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীর জীবনের মহান আদর্শ আমাদের ভিতর জীবন্ত হইয়া উঠুক। অশিক্ষায় কুশিক্ষায় দেশ আচ্ছন্ন, দুঃখ-দুর্দ্দশায়, অনাচারে ব্যভিচারে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, এই সময় স্বামীজীর আদর্শ আমাদের নিত্য চলার পথে অধিকতর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনি স্বামীজী-প্রসঙ্গে তাঁহার 'Discovery of India' গ্রন্থে কয়েকটি মূল্যবান উক্তি করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থানের যুগে যে কয়জন সংস্কারক ভারতকে অগ্রগতির পথে চালিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বামীজীই যে যুগপ্রধান এ কথা বলিতে তিনি দ্বিধা করেন নাই :

'He was a fine figure of a man, imposing, full of poise and dignity, sure of himself and his mission, and at the same time full of a dynamic and fiery energy and passion to push India forward. He came as a tonic to the depressed and demoralised Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past."

স্বামীজীর একটি মূল্যবান উক্তি ঐ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শের দিক দিয়া কথাটি যে কত মূল্যবান, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে :

"Liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well-being. Where it does not exist, the man, the race and nation must go."

রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়াও স্বামীজী যে রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহা তাঁহার এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। আজ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতালাভ করিয়াছি। আজ যদি আমরা রাষ্ট্রকে প্রভুত্ববাদী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তুলি, ব্যক্তির বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ না দিয়া স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মূল্য কতটুকু থাকিবে? স্বামীজীর বাণী স্বাধীন রাষ্ট্র পরিকল্পনার আদর্শ হউক, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। উপরোক্ত গ্রন্থে ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বামীজীর যে মহামূল্য বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই ভারতীয় জীবনে

প্রতিফলিত হউক। যাহাদিগকে আমরা হীন বলিয়া ঘৃণা করিয়া জনসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছি, সেই অস্পৃশ্য পদদলিত জাতিই যে সমাজ ও রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড, স্বামীজী ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন—ভারতবাসী, ভুলিও না, যাহাকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিতেছ—সেও তোমারই ভাই। স্বামীজী কেবল বক্তৃতায় নহে, নিজের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের জাতীয় যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছেন। আজ যে ভারতে অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাহার অমর বীজ যে স্বামীজীই বপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তেয় জাতির উপর স্বামীজীর কতখানি দরদ ছিল, তাহা তাঁহার এই কয়টি কথা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়—"নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে,—চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে ·· এরা সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে।"

স্বামীজী নূতন যুগের চিন্তাধারার আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনে তিনি আস্থাবান ছিলেন না। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"In Politics and sociology, problems that were only national twenty years ago, can no longer be solved on national grounds only···they can only be solved when looked at in the broader light of international grounds."—এই আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার বেদান্ত-সাধনার ফল। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তিনি এই উদার মানবিকতার বাণী বহন করিয়াছেন। আমাদের অবনতির কারণ আমাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারায় সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার অপচেষ্টা। স্বামীজী বলিয়াছেন—"The fact of our isolation from all other nations of the world is the cause of our degeneration, and its only remedy is getting back into the current of the rest of the world. Motion is the sign of life."

স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মিশন ও উহার শাখাপ্রশাখা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেবাধর্ম্ম দ্বারা স্বামীজীর বিরাট আদর্শকে কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা। উদার মানবিকতার উপর যে কর্ম্মের ভিত্তি, তাহাই প্রকৃত জনকল্যাণ, তাহাই প্রকৃত মানবধর্ম্ম, তাহাই স্বাধীনতার সহায়ক। স্বামীজীর এই কর্ম্মযোগের আদর্শ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে নূতন বেগবত্তা সঞ্চার করুক—ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সারিগাছি, মহুলা পোঃ আঃ
জেলা—মুর্শিদাবাদ
তারিখ—২৬শে আষাঢ়, ১৩৪১

পরমশুভাশীর্ব্বাদোহস্তু

বিশেষ পরে সমাচার এই যে আমি গত পরশ্ব দিবস এখানে আসিয়াছি। তৎপূর্ব্বে মঠে তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে পত্র দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার কল্যাণ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে কখনও ভুলিও না।

তুমি বেশ মনের আনন্দে প্রভুর নাম করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর মঠে ও এখানে তেমন ভাল যাচ্ছে না। সুতরাং পত্রের জবাব আমি নিজে লিখিলাম না বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইও না। তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর নিম্নে লিখিলাম:—

১। শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুর ধ্যান করিতে কোন আপত্তি নাই। শৌচাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ধ্যান করা ভাল। শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুকে ভক্তিসহকারে প্রণাম ও আত্মনিবেদন করিলেও চলে। হাত-মুখ প্রভৃতি ধোয়ার পর শ্রীগুরুর ধ্যান করা ভাল।

২। শ্রীগুরুর ধ্যান তুমি এখন কোথায় কর তাহা আমাকে লিখিবে। পরে এই সম্বন্ধে আমি লিখিব।

৩। গুরুগীতা বা যে কোন পূজা অর্চ্চনাদি পুস্তকে ঐ প্রণামমন্ত্র পাইবে। গুরুগীতাতে অনেক মন্ত্র আছে। তোমার যেইটি হৃদয়গ্রাহী হয় তাহাই আওড়াইও।

৪। শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ মনন কালে জপের দরকার তেমন নাই। শুধু শ্রীগুরুমূর্ত্তি চিন্তা করিবে বা বড় জোর বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে "শ্রীগুরুঃ" শব্দটী মনে মনে জপ করিতে পার।

৫। প্রাতে ব্যায়ামের পূর্ব্বে ইষ্টধ্যান ও মূলমন্ত্র জপ করিবে। সর্ব্বপ্রথমে এই অত্যাবশ্যকীয় কাজ সারিয়া লইবে। তার পর অন্য কাজ আরম্ভ করিবে।

আজ আর অধিক কিছু লিখিব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিও। প্র—বাবুকে এবং তাঁহার বাড়ীর সকল ভক্তগণকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ দিও। তিনি তোমার খুব উপকার করিয়াছেন। তোমার তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা খুব ভাল।

আমার শরীর ভাল নয়। তুমি কেমন আছ? তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

বন্দিশালায় মুক্ত জীবন

হেলেন য়্যাষ্ট্

অপরাধীদের কয়েদ করে রাখার যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে প্রত্যেক সভ্য দেশেই সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বৃটেনে কারাগারগুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বৎসর পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে এবং তদুদ্দেশ্যে চেষ্টাও চলছে। কিছুদিন পূর্বে বৃটেনের সংবাদপত্রগুলিতে এক সপ্তাহকালের মধ্যে এই কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়: লৌহবেষ্টনীহীন আর একটি কারাগার স্থাপন করা হয়েছে; একটি কারাগারে যুবক কয়েদীদের জন্য একটি ক্লাব স্থাপিত হয়েছে; লণ্ডনের পেণ্টনভীল কারাগারে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন এবং বক্তৃতার পরে কয়েদীরা উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করে। ছুটি যুদ্ধজনিত বাধা সত্ত্বেও বৃটেনে কারাগার-সংস্কারের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে উপরোক্ত সংবাদগুলি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

বৃটেনে কারাগারপরিচালন-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনের যে চেষ্টা বর্তমানে চলছে তার সূত্রপাত হয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। সেই সময় গ্ল্যাডষ্টোন কমিটি কারাগারগুলির অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কতকগুলি সংস্কারমূলক সুপারিশ দাখিল করেন। সুপারিশে বলা হয়েছিল যে কারাগারগুলি নির্যাতনাগার না হয়ে চরিত্র-সংশোধনাগার হওয়া উচিত। দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হলে অপরাধীদের চরিত্রের অবনতি না হয়ে উন্নতি হওয়াই উচিত।

বৃটেনের জেলখানাগুলির কর্তৃপক্ষরা বহু বৎসর ধরে গ্ল্যাডষ্টোন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী কাজ করে আসছেন এবং এই ব্যাপারে তাঁরা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে অর্জিত বিস্তৃত জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাচ্ছেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় হল উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা আইনভঙ্গকারীদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা। দিনে তাদের উপযুক্ত কাজ দিতে হবে, রাত্রে বয়স্কদের জন্য ক্লাস পরিচালনা করতে হবে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের এমন কারিগরী শিক্ষা দিতে হবে যাতে দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তাদের সহজেই কর্মের সংস্থান হয়।

১৯২৩ সনে বৃটেনের বোর্ড অব এডুকেশনের (বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রি-দপ্তর) সহযোগিতায় কারাগারগুলিতে কয়েদীদের অবসর সময়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে বৃটেনের প্রত্যেক কারাগারে একজন শিক্ষা-উপদেষ্টা আছেন। শিক্ষাবিভাগের স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ এবং বেতনভোগী ও অবৈতনিক সাহায্যকারীরা তাঁর সহযোগিতায় পাঠ্যতালিকা-প্রস্তুতি, বক্তৃতা ও আলোচনা-সভাদির অনুষ্ঠান, এমনকি নাটকাভিনয় ও সঙ্গীতের জলসা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করে থাকেন।

বহির্জগতের সঙ্গে যাতে কয়েদীদের সংযোগ

থাকে, তাদের অবসর সময় যাতে শিক্ষা ও নির্দোষ আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটে এবং কারা-দণ্ডের কারণ সম্বন্ধে অহরহ চিন্তা ও আলোচনা না করে তারা যাতে পরস্পরের সঙ্গে নানা বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

বৃটেনের কারাগারগুলিতে বিদেশী ভাষা, পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনাবলী, সঙ্গীত ও অন্যান্য চারুকলার রসগ্রহণ করার ক্ষমতা, বেতারবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, সর্টহ্যাণ্ড, ব্যবসায়সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা, অংকন, দাবা খেলা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই শিক্ষা যাতে কার্যকরী হয় সেই জন্য যারা তিনমাস বা ততোধিক কালের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে কেবল তাদেরই এই ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয়। ক্লাশে যোগদান বাধ্যতা-মূলক নয়। শিক্ষাদান-কার্যে লাইব্রেরী, রেডিও সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির সাহায্যও নেওয়া হয়।

১৯৪৬ সন থেকে আটমাসাধিক কালের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত প্রায় এক হাজার কয়েদীকে ব্যবসায়-সংক্রান্ত পত্রলিখন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই সময়ের মধ্যে বুক কিপিং, বিদেশী ভাষা ও সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রায় ৬২টি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হতে পারে।

পাপোষ, বুরুষ ও ঝুড়ি তৈরী, বোনা, ডাকথলি মেরামত করা ইত্যাদি চিরাচরিত কাজ ছাড়াও কয়েদীদের দর্জির কাজ, জুতো তৈরী, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ছুতোরের কাজ, দড়ি তৈরী, ঘোড়ার সাজ তৈরী, ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধাই, এমন কি শস্য ও ফুল ফলের চাষ পর্যন্ত নানা প্রকার নূতন নূতন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অধীনে নানা রকমের কাজ শেখার ফলে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাদের পক্ষে ভাল বেতনে স্থায়ী কাজ সংগ্রহ করা কঠিন হয় না।

বর্তমানে বৃটেনের কারাগারগুলির অধিকাংশ কয়েদীই শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রথম অপরাধের জন্য অভিযুক্ত এবং সংস্বভাব-সম্পন্ন ছ'মাসাধিক কালের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী-দের পুরাতন পাপীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে পৃথক শিক্ষাকারাগারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

কারাগারগুলিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হল অপরাধীদের মনের পরিবর্তন এবং চরিত্রের উন্নতি সাধন করা। কয়েদীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের লুপ্ত আত্ম-বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। কারিগরী শিক্ষাদানের ফলে তাদের মনে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে একটা নিশ্চিন্ততার ভাব আসে।

২১ বৎসরের অনধিকবয়স্ক অপরাধীদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। শ্রমমন্ত্রি-দপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী যারা শিক্ষাপটু ও উৎসাহী তাদের আধুনিক কারখানায় কোন বিশেষ ধরনের কারিগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

বৃটেনের কারাগারসমূহে এই নূতন ব্যবস্থা খুব অল্পকাল হল চালু হয়েছে। ১৯৩৯ সন ইয়র্কসায়ারের অন্তর্গত ওয়েকফিল্ডে প্রথম শিক্ষা-কারাগার স্থাপিত হয়। কিন্তু এই অল্পকাল পর্যবেক্ষণের ফলে যে হিসাব সংগৃহীত হয়েছে তা এতই সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ যে বৃটেনের কারাগার-কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। *

ইতোমধ্যে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সনে কেণ্টের অন্তর্গত মেড্‌ষ্টোনে এবং গ্লসেষ্টারশায়ারের অন্তর্গত লেহিলে আরো দুটি শিক্ষা-কারাগারের দ্বারো-দ্ঘাটন করা হয়েছে। জেলখানা-সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে কৃষি-শিক্ষা-শিবিরে থেকে কয়েদীরা কৃষিকার্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে। লেহিল কারাগারটির দ্বার উন্মুক্ত থাকে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, কারাগার-সংস্কার আন্দোলনের জন্মদাতা স্যার আলেকজাণ্ডার প্যাটারসন এইরূপ জেলখানা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

* নয়া দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

সুদীর্ঘ পরাধীনতার কঠোর নাগপাশ হইতে সত্তোমুক্ত ভারতে মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের মূর্তপ্রতীক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিবস স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম করিতেছি।

ভারতের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া উহাকে নিজস্ব মহিমময় রত্নসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে আজ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন দেশবাসীর ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সম্যক্ উদ্বোধন ও উজ্জীবন। এই দুরূহ কার্য সমাধানের জন্য ভগবান ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের পরিপূর্ণ প্রকাশরূপে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন।

এই অমিতশক্তিধর মহাপুরুষের পিতা ছিলেন তেজস্বী, স্বাধীনচেতা, প্রতিভাবান্ ও ধর্মানুরাগী; আর মাতা ছিলেন ধর্মশীলা, গম্ভীরা, তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী। এরূপ পিতামাতার গৃহেই স্বামী বিবেকানন্দের মতো ধর্মবীর ও কর্মবীর পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রমুখদর্শনাভিলাষিণী তপঃক্লিষ্টা ধ্যানস্থা জননী স্বপ্নে দেখিলেন—স্বয়ং শিব শিশুমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মাতা বুঝিতে পারিলেন, করুণাময় মহেশ্বর তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। স্বপ্নদর্শন সফল হইল—এক দিব্যকান্তি শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেন। স্বপ্নস্মরণে পিতামাতা নবজাত শিশুর নাম রাখিলেন বীরেশ্বর। বীরেশ্বর স্বয়ং শিবের নাম। পরে বালকের নাম রাখা হইল নরেন্দ্র। আশ্চর্যের বিষয়, উভয় নামেরই সার্থকতা হইয়াছে। উত্তরকালে বালক প্রকৃতপক্ষেই 'মূর্তমহেশ্বর উজ্জ্বল ভাস্কর' এবং নরশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালক দুর্দমনীয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। মাতার নিকট রামায়ণ-মহাভারতোক্ত বীর যোদ্ধাদের অসীম বীরত্ব, নিপুণ সমরকৌশল ও অসম সাহসিকতার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া বালকের ধমনীতে ক্ষাত্রবীর্যের তাণ্ডব উদ্দীপনা হইত। রামের কার্যে উৎসর্গীকৃত-জীবন বীরভক্ত হনুমানের দুর্জয় সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত। পরবর্তী কালে আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় যুবকগণকে মহাবীর হনুমানের চরিত্র-আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিতেন, "দে দিকি দেশে মহাবীর হনুমানের পূজা চালিয়ে! দুর্বল বাঙ্গালী জাতের সম্মুখে এই মহাবীরের আদর্শ ধর। দেহে বল নেই, হৃদয়ে সাহস নেই—কি হবে এই সব জড়পিণ্ডগুলো দিয়ে? আমার ইচ্ছে ঘরে ঘরে মহাবীরের পূজা হোক্।"

তাঁহার দেহখানি ছিল বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ ও সুগঠিত। ব্যায়াম-অভ্যাসে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। গুণগ্রাহী পিতা শৈশবেই পুত্রকে একটি ঘোটক ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। বালক অশ্বচালনায় সুদক্ষ হইয়া উঠেন। এতদ্ভিন্ন জিমন্যাষ্টিক, কুস্তি, মুদ্গরহেলন,

লাঠিখেলা, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি শারীরিক বলবিধায়ক ও শক্তি প্রয়োগ-কৌশলের উৎকর্ষসাধক ব্যায়ামাদিতে পারদর্শী হইলেন। হিন্দুমেলা-প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত সিমলার ব্যায়ামশালায় তিনি নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন এবং তৎকালীন ছাত্রসমাজে উত্তম ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল।

পরবর্তী কালে ভারতের যুবসম্প্রদায়ের দৈহিক দুর্বলতা, অপটুতা ও শক্তিহীনতা দেখিয়া স্বামীজী মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং উহার প্রতীকারের নিমিত্ত আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "যুবকগণ, তোমাদের ধমনীতে সবল ও সতেজ রক্ত প্রবাহিত হইলেই তোমরা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা, অপরিসীম শৌর্য-বীর্য ও তেজোগর্ভা বাণী, উপনিষদের ওজস্বী অভীঃ-মন্ত্র এবং অবিনশ্বর আত্মার মহিমা অধিকতর স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তোমাদিগকে শৌর্য-বীর্য অনুশীলনের সহিত আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে হইবে। তোমাদের সর্বদাই সচেতন থাকিতে হইবে যে, তোমরা অমৃতের সন্তান, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তোমাদের নিকট দুঃসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। তোমরা মহৎ কার্য সম্পাদন ও সুমহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, আমি চাই তোমাদের লৌহের মতো শক্ত পেশী, ইস্পাতের ন্যায় দুর্ভেদ্য স্নায়ু এবং বজ্রদৃঢ় উপাদানে গঠিত মন। স্ত্রীসুলভ কোমলতা আর চাই না। মহাশক্তি, সিংহসাহসিকতা ও প্রচণ্ড পৌরুষ—এক কথায়, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ চাই। আমি চাই লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছা ও নির্ভীক হৃদয়—যাহা বিপদকে গ্রাহ্য করে না, বিপর্যয়ে কম্পিত হয় না।"

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্, স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

স্বামীজী ক্ষাত্রবীর্যের অনুশীলন, ব্রহ্মচর্য-পালন ও শরীর-মনের পবিত্রতা রক্ষার দিকে যুবসম্প্রদায়ের সবিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মাতৃ-ভূমি ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ পরাধীনতাজনিত দুঃসহ গ্লানি, অপরিসীম দুঃখ-নির্যাতন ও শোচনীয় পরাভব-মনোবৃত্তি দেখিয়াও তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে ১৮৯৭ সনে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—"আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রতা হইতেছেন। আর কেহই ইঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে। আর ইনি নিদ্রিতা হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এক্ষণে আর ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে। উঠ, তাঁহাকে জাগাও, আর নূতন জাগরণে নব প্রাণে পূর্বাপেক্ষা মহাগৌরবমণ্ডিতা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার অনন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর।" স্বামীজীর ভিতর স্বদেশ-প্রেমের দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিত। পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি সকলকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়া বলিতেন—"হে স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়-বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরিতেছে? যদি বুঝিয়া থাক, মনে প্রাণে অনুভব করিয়া

থাক, তাহা হইলে ইহাদের দুঃখ-বিমোচনের জন্য, ইহাদের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর। প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর আত্মীয়স্বজনের দিকে ফিরিয়া চাহিও না, তারা কাঁদুক। কাজে লেগে যাও—জীবন উৎসর্গ কর। হৃদয়বত্তা, কৃতকর্মতা ও দৃঢ়তা—স্বদেশহিতৈষীর এই তিনটি অপরিহার্য গুণে মণ্ডিত হইয়া জন্মভূমির দুর্দশামোচনে অগ্রসর হও। আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত - তোমাদের স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্রই তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের পূজা, নরনারায়ণের পূজা। এই স্বদেশবাসিগণই তোমার ঈশ্বর, তোমার আরাধ্য দেবতা হউন। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া, বিবাদ-বিসংবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা কর।"

স্বামীজীর দেশসেবার উদাত্ত আহ্বান বৃথা যায় নাই। ভারতের যুবশক্তি স্বদেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন, স্বদেশবাসিগণের দুঃখ-অপনোদন, নরনারায়ণ-সেবার জন্য দলে দলে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, অমানুষিক দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। ভারতের বিপ্লবপন্থিগণও স্বামীজীর নিকট হইতে ত্যাগ, সেবা ও উদগ্র স্বদেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর ক্ষাত্রবীর্যদীপ্ত ও ব্রহ্মতেজোমণ্ডিত মূর্তি ছিল তাঁহাদের ধ্যানের বস্তু, তাঁহার অগ্নিগর্ভা বাণী ছিল তাঁহাদের দেশসেবায় আত্মোৎসর্গের উদ্বোধক। কুখ্যাত রাউলেট্ রাজদ্রোহ কমিটির রিপোর্টও স্বামীজী সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিল—"Swami Vivekananda was a violent politician in the garb of a Sannyasin." অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে এক জন বিপ্লবপন্থী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতাবলীতে কিন্তু কোথাও হিংসাবাদের উল্লেখও নাই—তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে উদগ্র স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগের জ্বালাময় আহ্বানের কথাই আমরা পাই, যাহা বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বঙ্গমাতার বরেণ্য সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে চমকপ্রদ ক্ষাত্রবীর্য ও সামরিক শৌর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার মূলে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদীপ্তা বাণীর অনুপ্রেরণা। নেতাজী সুভাষ বলিয়াছেন, "স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড পৌরুষে ভরা—তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একজন যোদ্ধা, শক্তিসাধনায় সিদ্ধ সাধক। তাঁর ঐশ্বর্যশালী, উন্নত, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তিত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলার উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই পৌরুষের আদর্শ বাংলার যুবকদের যেমন আকৃষ্ট করে তেমন আর কাহাদের করে না। স্বামীজীকে আমি গুরু বলিয়া মানি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তা'হলে আমি শিষ্যরূপে তাঁর পায়ের তলায় থাকতুম। আমি বলতে চাই যে, বর্তমান বাংলা স্বামীজীরই সৃষ্ট। তাঁর বাণী ও আদর্শই আমার জীবনকে গঠন করিয়াছে।" মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও জনহিতকর কার্যাবলী পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি স্বামীজীরই উত্তরসাধক হইয়া মহান আচার্যের বাণীই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তৎপ্রবর্তিত নরনারায়ণসেবার কার্য অনুবর্তন করিয়াছেন। গান্ধীজী নিজেই বেলুড়

মঠে একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাময়ী মহতী বাণী হইতেই দেশসেবার যাহা কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন—এজন্য তিনি এবং দেশসেবকমাত্রেই স্বামীজীর নিকট 'অপরিসীমরূপে ঋণী। স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই সকল দেশপ্রেমিক যুবক ও নেতৃবৃন্দের গৌরবোজ্জ্বল আত্মবলিদান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছে। স্বামীজীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে। অসংখ্য ত্যাগী, সেবাব্রতধারী স্বদেশ-প্রেমিকগণের অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়া ভারতমাতা শৃঙ্খলমুক্তা হইয়াছেন। বৈদেশিক-শাসন-মুক্ত ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং অন্তর্বিপ্লব কঠোর হস্তে দমন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য চাই যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে শারীরিক ব্যায়ামচর্চা ও সামরিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন। ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনই রাষ্ট্ররক্ষার প্রধান সহায়ক হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রের আর একটি দিকের প্রতি ভারতীয় যুবকগণের সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—সেটি হইতেছে তাঁহার ব্রহ্মতেজের পরিপূর্ণ প্রকাশ। ক্ষাত্রবীর্যের সহিত ব্রহ্মতেজের মধুর সংমিশ্রণ হইলেই আদর্শ চরিত্রের উদ্ভব হয়। স্বামীজীর ধ্যানপরায়ণতা, সমাধিনিষ্ঠা, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, যোগাসনে অধিষ্ঠান, দিব্য প্রশান্ত মূর্তি, বসন্ত-কালের মতো অহৈতুক লোককল্যাণচিকীর্ষা তাঁহাকে যথার্থই 'শিবের অবতার' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে প্রথম দিনই দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "বালকের শরীর, চক্ষু, চুল, বেশভূষা, অন্তর্মুখী মন দেখে মনে হল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব!" আবার বালকের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি দেবতার মতো সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "জানি প্রভো, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি দূর করিবার জন্য পুনঃ শরীর ধারণ করিয়াছ।" নরেন্দ্রের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত আধ্যাত্মিক শক্তির, ব্রহ্মতেজের পরিচয় পাইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ' মহাপুরুষ। তার দিকে চেয়ে দেখি ভেতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে।"

স্বামীজীর আবাল্য ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণা, প্রেম-ভক্তি, বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞানপিপাসা, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য, কঠোর তপশ্চর্যা ও সমাধিনিষ্ঠা, তদুপরি মহান্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যস্পর্শজনিত আধ্যাত্মিক শক্তির সঞ্চার তাঁহাকে ব্রহ্মতেজের মূর্তপ্রতীকে রূপায়িত করিয়াছিল। যুব-ভারতের একমাত্র লক্ষ্য হইবে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ অর্জন করিয়া নিজেদের জীবনকে যথার্থরূপে সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ করিয়া তোলা। স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবনই তাহাদের সম্মুখে সেই মহান আদর্শ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যুব-সম্প্রদায়কে ভারতের সনাতন জাতীয় আদর্শ ত্যাগের পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ত্যাগের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আচার্য-দেবের এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে—"ত্যাগই ভারতের সনাতন জাতীয় পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে—সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না—উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। ··· ··· মানুষ চাই, মানুষ চাই। আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। বিশ্বাস কর, তোমরা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তোমাদের ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। উঠ, জাগো। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

ঋষি নাম্মালোয়ার

ব্রহ্মচারী বাসুদেব

সংসারের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ভিতর থাকিয়া মানুষের মন সকল সময় সুখী হইতে পারে না; সমস্ত রকমের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর থাকিয়াও কি যেন এক বস্তুর অভাব তাহাকে ব্যথিত করিয়া তোলে। অনেক সময় সে নিজেই বুঝিতে পারে না এই অপ্রাপ্ত বস্তুটি কি। এই মাত্র সে জানে বর্ত্তমান অবস্থা তাহাকে প্রকৃত সুখী করিতে পারিতেছে না। এই যে অ-সুখ বোধ, এই যে 'কিছু' একটা না পাওয়ার বেদনা, ইহাই তাহাকে ধীরে ধীরে অসীমের দিকে লইয়া যায়। এই অসীমই ভক্তের নিকট ভগবান, আর জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম।

মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ভগবান লাভ অথবা আত্মোপলব্ধি করা। ভগবান লাভের পর তাহার আর কোন অভাব বা দুঃখ থাকে না; তখন সে নিজেই নিজেকে লইয়া তৃপ্ত ও সুখী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে আর কোন রকমেই বিচলিত করিতে পারে না—

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"—কেনোপনিষৎ

'যিনি এই জীবনেই ভগবান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন সফল হইয়াছে; ব্যর্থ তাহার জীবন, যাহার এই জীবনে ভগবান লাভ হয় নাই।'

পার্থিব জীবনে কোন কাজ করিতে হইলে যেমন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ আত্মানুসন্ধানের পথেও অগ্রসর হইতে হইলে যিনি আত্মতত্ত্ব জানিয়াছেন তাঁহারই আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্য এইরূপ লোকের সঙ্গ-লাভ করিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, কিন্তু তাঁহাদের পূত-জীবনালোচনায় নিজেদের জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করা যায়।

দক্ষিণ-ভারতে যে সমস্ত মহাপুরুষ ভাগবৎপ্রেমে দেশবাসীকে ভগবদনুসন্ধানের প্রেরণা জাগাইয়াছেন, বিষ্ণুভক্ত নাম্মালোয়ার তাঁহাদের অন্যতম। বর্ত্তমান তিন্নেভেলি হইতে ২৮ মাইল দূরে তিরুনগরী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে একদিন তাঁহার পিতামাতা তিরুন্-নুরুনগুড়ি গ্রামের মন্দিরে ঠাকুরের পূজা করিবার সময় কাতর ভাবে একটি সন্তানের প্রার্থনা করেন; তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিজেই তাঁহাদের সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ আশ্বাস দেন। উপযুক্ত সময়ে বালকের জন্ম হয় এবং মাতাপিতা তাঁহার নাম রাখেন 'মারণ'। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জন্মের পর এই অদ্ভুত বালক কখনও হাস্য, ক্রন্দন এমন কি মাতৃস্তন্য পান পর্য্যন্ত করেন নাই। মাতাপিতা এই অদ্ভুত বালককে একটি তেঁতুল গাছের নীচে রাখিয়া আসেন। সেখানে দীর্ঘ ১৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনও কোন কথা, এমন কি চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বতঃই বৃন্দাবনের শ্রীরাধিকার কথা মনে পড়ে। জন্মের পর তিনিও প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনেক সময় পর্য্যন্ত চোখ বুজিয়া ছিলেন; অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে চোখ খুলিয়া প্রথমে তাঁহাকেই দেখিলেন। আমাদের সাধকও বোধ হয় মনে মনে বলিতেছিলেন, "হে

ঠাকুর, তোমায় ছাড়া আর কাহাকেও আমি দেখিতে চাহি না।"

এদিকে মধুরকবি নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উত্তর-ভারতে তীর্থ পর্য্যটনের সময় একদিন রাত্রিকালে দক্ষিণ দিকে একটি অপার্থিব আলোক দেখিতে পাইয়া তখনই সেই আলোকের উৎপত্তিস্থান ও তাহার কারণ জানিবার জন্য রওনা হইলেন। প্রতি রাত্রিতেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে এবং অবশেষে তিরুনগরী গ্রামে আসিয়া হঠাৎ একদিন সেই আলোক অদৃশ্য হইয়া যায়। মধুরকবি এদিকে এই অদ্ভুত দৃশ্যের কারণ জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং লোকমুখে মারণের অদ্ভুত জীবনকথা শুনিতে পাইলেন। মধুরকবি সেইখানে আসিয়া বালকের ধ্যাননিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মোহিত হন এবং বালককে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি বড় প্রস্তর উচ্চস্থান হইতে নিক্ষেপ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই শব্দে বালক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মধুরকবির দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। মধুরকবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রকৃতেরুদরে জীবো যদি জাতস্তদাহনঘ।
কিং ভক্ষয়ন্ বা কুত্রার্য্য বর্ততে স পুমান্ গুরো॥"
(প্রপন্নামৃত, ১০৪ অধ্যায়)

'যদি জড় পদার্থের উদরে সূক্ষ্ম দ্রব্যের জন্ম হয়, তাহা হইলে উহা কি খায় এবং কোথাই বা থাকে?' প্রশ্ন শুনিবা মাত্র তিনি উত্তর করিলেন—

"তদ্বস্তু ভক্ষয়ন্ সম্যাগ্ জীবস্তত্রৈব বর্ততে।"
(প্রপন্নামৃত, ১০৪ অধ্যায়)

উহা তাহাই খায় এবং সেইখানেই থাকে।

প্রশ্ন-নিহিত অর্থ এই যে, যখন এই শরীরে (জড় পদার্থে) আত্মজ্ঞান (সূক্ষ্ম বস্তু) লাভ হয় তখন তিনি কি ভোগ করেন এবং কোথাই বা থাকেন? উত্তরে তিনি বলিলেন আত্মা শরীর হইতেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে এবং শরীরেই থাকে।

উত্তর শুনিবা মাত্র মধুরকবির সকল সংশয় দূর হইয়া গেল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া পূজা করিলেন।

ইহার পর মধুরকবির তীর্থপর্য্যটনের স্পৃহা চলিয়া যায় এবং তিনি এই গুরুর ভিতরেই তাঁহার জীবনের পূর্ণ সফলতা দেখিতে পাইলেন। অবশিষ্ট কাল তিনি গুরুর সঙ্গ ও সেবা করিয়াই কাটাইয়া দেন।

কথিত আছে যে, একদিন শ্রীরঙ্গম মন্দিরে ঠাকুরের পূজাকালীন, ঠাকুর তাঁহাকে নাম্মা (আমাদের) আলোয়ার (ভক্ত) বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহার পর হইতেই তিনি জনসাধারণের নিকট নাম্মালোয়ার নামে পরিচিত হন।

নাম্মালোয়ারের জীবনের আর বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে তিনি অনুমান ৩৫ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করেন। নাম্মা-লোয়ারের দেহত্যাগের পর মধুরকবি তাঁহার গুরুর রচিত ভগবদ্‌বিষয়ক গান দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়ান।

নাম্মালোয়ার তাঁহার হৃদয়ের ঠাকুর বিষ্ণুর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যিনি অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ, যিনি জগতের আদি ও অন্ত, যাঁহার ভিতর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে এবং যিনি অচিন্তনীয় তিনিই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।" ভগবদ্দর্শন ও তাঁহার সান্নিধ্য-লাভের ব্যাকুলতায় তিনি যে সমস্ত গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেক বিষ্ণুমন্দিরে গীত হইয়া থাকে। তাঁহার এই সমস্ত রচনার মধ্যে অনেক সময় তিনি নিজেকে কৃষ্ণ-বিরহে কাতরা গোপীদের সহিত তুলনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন,—"সেই অদ্ভুত গোপবালক কৃষ্ণ, যিনি বিশ্বের রচয়িতা ও পালনকর্তা, তাঁহাকে না পাইয়া আমার জীবন

বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। যদি তিনিই আমাকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমার আর বাঁচিয়া কি হইবে? গোধূলি-লগ্নে গাভীকুল গোষ্ঠে ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার কৃষ্ণের এখনও দেখা নাই। যদি তুমি আমাকে দয়া করিয়া দেখা না দাও, তাহা হইলে আমার আর বাঁচিবার পথ কোথায়?

"কৃষ্ণের অভাবে মলয়ের মৃদু সুগন্ধ ও সুখ-স্পর্শ বায়ু আমাকে ব্যথিত করিতেছে; কোকিলের সুমিষ্ট স্বর আমার কর্ণে বিষ ঢালিয়া দিতেছে। কৃষ্ণ তাঁহার বাঁশি শুধু গোপিকাদের জন্যই বাজাইতেন; এই সমস্ত চিন্তাও আমার প্রাণ-বায়ু হরণ করিতেছে। তাঁহাকে না পাইয়া আমার জীবন দুর্বিবহ হইয়া উঠিয়াছে।" আবার তিনি কৃষ্ণকে পশুচারণে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, তুমি আমার কথা শোন; বনে তোমার পায়ে কাঁটা বিঁধিবে; বনে যদি কোন অসুর তোমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে যে কি হইবে ভাবিতেও আমার ভয় হয়। তুমি স্বর্গের সুখ হইতেও পশুচারণ ভালবাস; এদিকে কংস অনেক অসুর বনে নিযুক্ত করিয়াছে; তাহারা বনে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ঋষিদের যন্ত্রণা দেয়। তুমি পশুচারণে তোমার বড় ভাই রামকে পর্যন্ত লইয়া যাও না; এই সমস্ত ভাবী বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে শান্তি হইতেছে না।" নাম্মালোয়ারের এই সমস্ত বিরহ-গাথা আমাদের আবার নূতন করিয়া গোপিকাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং
নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং
মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥"

আবার—

"অটতি যদ্ভবাহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং
পক্ষকৃদ্ দৃশাম্॥"

'তুমি যখন ব্রজে পশুচারণ করিতে যাও, তখন তোমার কোমল চরণ তৃণাঙ্কুর হইতে কষ্ট পাইবে, এই ভাবিয়া আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। দিনান্তে ধূল্যাবৃত নীলকুন্তলে আবৃত তোমার মুখ-মণ্ডল আমাদের পীড়া দেয়। তুমি যখন বনে ভ্রমণ করিতে যাও, তখন তোমার ক্ষণেক অদর্শনও আমাদের শতযুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার কুটিল-কুন্তলশোভিত মুখ আমরা অনিমেষে দেখিতে চাই, কিন্তু হায়, আমাদের চোখের পলকের জন্য তাহা সম্ভব হয় না।'

অনেক সময় নাম্মালোয়ার ভগবানকে অরূপ ও গুণাতীত ভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া, প্রকাশের ভাষা হারাইয়া ফেলিতেন। তিনি সেই সমস্ত ভাব প্রকাশে অসমর্থ হইয়া বলিতেছেন—"দেবতা ও জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। সমস্ত জড় ও চেতন-পদার্থ তাহাতেই অবস্থিত; তিনি জ্ঞানের উৎস। শ্বেত-বৃষারূঢ় মহেশ্বর, চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার স্তব করেন। তিনি অনন্ত; তিনি আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার স্তব-গান করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু হায়, আমার কথা আর জোগায় না। তিনিই পরম মোক্ষ, তিনি নর অথবা নারী নন। তাঁহাকে দেখা যায় না। পৃথিবীতে যাহা আছে, তাহা তিনি নন; পৃথিবীতে যাহা নাই তাহাও তিনি নন্। তিনি অরূপ; ভক্তদের ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি রূপ গ্রহণ করেন।"

আবার সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারই প্রতিচ্ছবি দেখিয়া নাম্মালোয়ার তাঁহাকে সম্বোধন করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। "পৃথিবীরূপে তুমি অভিব্যক্ত, আমি কি তোমায় পৃথিবী বলিয়া ডাকিব? সাগরের জলে তুমি অবস্থিত; অতএব সাগরই কি তোমার নাম? বহ্নিরূপে তুমি ব্যক্ত, তবে বহ্নিই কি তোমার পরিচয়? ·····আমি তোমার চিন্তা করিতেও অসমর্থ। তুমিই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ।"

তাঁহার এই সমস্ত গানের সহিত উপনিষদ্-নিহিত সত্যের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় তিনিও পরম সত্যকে অরূপ অব্যয় ও 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

গীতায় আছে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥"

অর্থাৎ "যাঁহারা আমাকে ছাড়া আর অন্য কাহাকেও জানেন না এমন যে সকল নিষ্কাম সম্যগ্‌দর্শী পুরুষ আমাকে চিন্তা করেন ও সেবা করেন, সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ধনাদিলাভ এবং তাহার রক্ষার ব্যবস্থা আমিই করিয়া থাকি।" ইহার ভাষ্য করিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরস্বতী একটি গম্ভীর প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তাহার যে সদুত্তর দিয়াছেন সেই যুগ্মমতের সার মর্ম্ম এই। অন্যান্য ভক্তদেরও যোগক্ষেম ভগবানই বহন করেন, তবে যাঁহারা তদেকশরণ নহেন তাঁহাদের ভিতর প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া ঐ দুইটি ব্যাপারের যোজনা করেন, আর যাঁহারা অনন্যদর্শী তাঁহাদের যোগক্ষেম তদীয় প্রযত্ন-ব্যতিরেকে ভগবান নিজেই বহন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানযুগে আমরা কোন কথাই—তা গীতারই হৌক আর বেদেরই হৌক—বিনা পরীক্ষায় মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করি। "শ্রীভগবান্ উবাচ" বলিয়া চালাইয়া দিলেই হইবে না—হাতেনাতে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। তিনি হাত দিয়াছেন, পা দিয়াছেন, একাদশটি অনবরত ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, অথচ সে সব গুটাইয়া বসিয়া শুধু চক্ষু বুজিয়া কি মেলিয়া ভগবানের চিন্তা করিব আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া যাইবে, এমন আজগুবি কথা আজকালকার এই ভীষণ কর্ম্মশীল ও দ্বন্দ্বশীল জগতের কোন্ লোক বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ এই অগ্নিমূল্যে রেশন করা চাল-কাপড়ের দিনে? অসম্ভব কথা। তবে তো সকলেই হাত পা গুটাইয়া চোখ বুজিয়া হরি হরি করিত, আর আকাশ হইতে চাল ডাল, কাপড় কোলের কাছে আসিয়া পড়িত। ওসব সেকেলে মুনিদের লেখা। তখন সব জিনিষ সস্তাও ছিল, সুলভও ছিল—এখন যেমন অগ্নিমূল্য তেমনই দুর্ল্লভ। ওসব শ্লোকের আজকাল কোনও মূল্য নাই।

কিন্তু আসলে তা নয়: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত অমূল্য শাস্ত্রের কথা কখনও মূল্যহীন হয় না। অনেক আস্তিকেরই ধারণা যে গীতা চিরন্তন সত্যেরই একটি অনন্ত আধার। যাহা পূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, এখনও তাহাই ঘটিতেছে এবং পরেও ঘটিবে। আকাশবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া অতীব সুকঠিন—দুঃসাধ্য বলিলেই হয়। তাই, আমাদের দৃষ্টিতে অজগরবৃত্তিসম্পন্ন ভগবদেকশরণ মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত সচরাচর পড়ে না। কিন্তু যদি দৃষ্টান্তই না মিলে, তবে এমন অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত কথায় আস্থাই বা কিরূপে স্থাপন করা যাইতে পারে? প্রশ্নটি খুবই সত্য। বিশ্বাস ও ভক্তি-প্রবণচিত্তেও এই ধরনের প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহাকে দোষ দেওয়া চলে না। বিচারশীল মনস্বীদের স্বভাবই বোধ হয় এই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাঁহারা অতিবাস্তব কথা সহজে গ্রহণ করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের সম্মুখে নিম্নলিখিত সত্য কাহিনীটি উপস্থিত করিতেছি। দেখিবেন ইহা হইতে গীতোক্ত উক্তিটির পরিপোষক প্রমাণ, পূর্ণতঃ না হইলেও অংশতঃ পাওয়া যাইবে। ফলে

নিষ্কাম কর্ম্মীদের প্রাণে প্রভূত পরিমাণে আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে বলিয়া মনে হয়। স্মৃতি-শক্তির ত্রুটিতে হয়তো কাহিনীটি যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনই ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিব না—ভাষার অবিকল আবৃত্তি তো অসম্ভবই। তবে আমি যতটুকু শুনিয়াছি তাহার সত্য সার নীচে দিতেছি—

স্থান গঙ্গাতীরবর্ত্তী মন্দিরপ্রাঙ্গণ, আস্তরণ হরিৎশষ্পশোভিত ক্ষেত্র, বক্তা একজন সাধু—শিক্ষিত, তেজস্বী, অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, মুক্তসঙ্গ, অনহংবাদী ও ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত; শ্রোতা—একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ যুবক চিকিৎসক—ধীর, স্থির ও শ্রদ্ধালু। আর একটি বৃদ্ধ অনুমন্তা ও উপদ্রষ্টা; কাল অপরাহ্ণ, যোগমঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবির্ভাবোৎসব, পুণ্য গন্ধবায়ু বহমান—'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'। প্রশান্তাত্মা সাধু উৎসাহ-প্রদীপ্ত বদনে ও পূর্ণ বিশ্বাস-সম্ভূত বচনে বলিতেছেন,—

"আমি যখন অন্য মঠে ছিলাম,—আমার কর্ম্ম-সঙ্গী ছিল চব্বিশটি সেবক। সকলকেই বলিলাম কেহ কাহারও কাছে অর্থ চাহিবে না—ইঙ্গিতেও যেন কেহ না জানিতে পারে যে অর্থ চাই। শুধু কাজ ক'রে যাবে—শুধু কাজ. কাজের কি একটা দাম নেই? labourএর কি একটা মূল্য নেই? খাঁটী, আন্তরিক সেবার কি একটা ফল নেই? খেটে যাও, শুধু খেটে যাও,—যিনি জোটাবার তিনিই সব জোটাবেন। আমার সঙ্গীরা অক্ষরে অক্ষরে আমার কথা মেনে নেয়। কিছুকালের জন্য আমি সে স্থান থেকে সরে যাই। ফিরে এসে দেখি খরচের অঙ্কে বাড়তি হ'য়েছে; অন্য খাত থেকে পাঁচশো টাকা এনে এই ঘাটতি মেটানো হয়েছে। এটাতো বিধিসঙ্গত নয়—এক জায়গায় যাহা আর এক বাবদে তাহা ব্যয় করা, এটা তো ন্যায্য নয়। আমার মন একটু খিচ্‌ড়ে গেলো—একি হোলো. ভগবান? একটু যেন অভিমানও হোলো, ব'সে ব'সে তোলপাড় করচি মনের ভেতর। এমন সময় একটি লোক এলো—একটি পা খোঁড়া মতন।

"তখন খাবার সময় হ'য়েচে—আমি উঠ্‌বো উঠ্‌বো এমন সময় লোকটি একথা সে কথা নানাকথা জিজ্ঞাসা করে—আমিও জবাব দিয়ে যাচ্চি। তারপর, প্রশ্ন করে, 'আপনার কি কোনও দিকে টাকার টান পড়েচে? প্রশ্ন শুনে আমি অবাক! একি, এতদিনের মধ্যে কই কেউতো আমায় এমন প্রশ্ন করে নি। আজ এই মুহূর্ত্তে একি অপরূপ প্রশ্ন? আমি লোকটিকে দেখাইলাম যে এই বাবদে পাঁচশো টাকা বেশী খরচ হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ লোকটি চেক্ বই বাহির করিয়া একটি আড়াই হাজার টাকার চেক্ কাটিয়া দিল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি কেন এই চেক্ দেওয়া—জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি ইচ্ছে করেন, এই আড়াই হাজার টাকা জমা রেখে তার সুদ থেকে কোনও বাবদে খরচ কোরবো?' সে উত্তর দেয় "আজ্ঞে না, আপনি এ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে আপনার এই ঘাটতি মেটাবেন, আর বাকী দুই হাজার, আপনার আর আর খাতে যা জিনিসের দরকার তাই কেনবার জন্য খরচ ক'র্ব্বেন।"

এই কাহিনী শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। ইহাই কি "যোগক্ষেম" বহনের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নয়? ঠিক যখন ঐ সাধু সংশয়াকুলমনা হইয়া চিন্তা-বিব্রত, ঠিক তখনই এই অনাহূত ও একান্ত অপ্রত্যাশিত রসদদারের আকস্মিক আবির্ভাব, উক্ত তত্ত্বের পরিপোষক শত শত পুরাণকাহিনী ও সাধকদিগের মধ্যে প্রচলিত "ভক্তের ভগবান" কাহিনীর সার্থকতা সম্পাদন করে না? বা নিরুদ্যম অথবা ভগ্নোদ্যম সাধকের প্রাণে আশা সঞ্চারিত করিয়া সদ্য বলাধান করে না?

প্রতীক্ষা

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ওগো প্রিয় আমার,
রুদ্ধ দুয়ার
করেছো সৃজন
তোমার আমার মাঝে।

তাই সব কাজে
ভুলে যাই
তুমি আছো এত কাছে।

স্বপ্নহীন নিদ্রাকোলে
পড়ে থাকি যবে,
কোন্ ইন্দ্রজালে
দেহ ও মন হ'তে
কেড়ে নিয়ে যাও
সব সত্তা মোর?

সেই শুভক্ষণে
ওগো প্রিয়,
খুলে দিয়ে
বদ্ধ দুয়ার
আলিঙ্গন কর মোরে?

ভোরে
নিদ্রা ভেঙ্গে যায়।
দেহ মন ঝেড়ে ফেলে
অবসাদ যত
কর্ম্মক্লান্ত দিনান্তের।

ফিরিয়া তাকাই
মধুযামিনীর সেই স্মৃতিপটে।
কোন স্মৃতি নাহি ফোটে
অন্তরে আমার।

খুলেছিলে যে দুয়ার
সুষুপ্তির মাঝে,
বদ্ধ তাহা
করিলে আবার
তোমার নিঠুর হাতে।

আঁখিপাতে
তবু রহে ঘুমের আবেশ।
সহসা চমকি উঠি
ফিরাই নয়ন—
হেরি কী মোহন
রূপ ল'য়ে প্রকৃতি দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার
ভোগের সম্ভার
ঢেলে দেয় উজাড় করি।

মোর হাত ধরি
কত খেলা খেলে দিন রাত।
দিনশেষে
শ্রান্ত হ'য়ে ফিরি ঘরে।
ধীরে অতি ধীরে
প্রকৃতি আমায়
ঘুমের কোলেতে রাখি
কোথা চলে যায়।
নিস্তব্ধ নিশুতি রাতে
মনে পড়ে
তুমি এসে
খুলিবে দুয়ার
আপনার হাতে।
সুষুপ্তিতে
তাই আমি এলাইয়া দেই আপনারে।

বিবেক-বৈরাগ্য

ডাঃ সারদাচরণ দাস

বিবেক মানে আলাদা করা। পরমহংসদেব বলতেন, চালুনি খইগুলিকে ধান ও বালি থেকে যেমন আলাদা করে! এখানে কিসের থেকে কি আলাদা করা? অনিত্য থেকে নিত্য আলাদা করা। সংসার সংসরণ করে, অর্থাৎ সতত পরিবর্ত্তিত হয়—তাকে ধরে রাখা যায় না। সংসার অনিত্য জেনেও আমরা ভুল করে নিত্য ভাবি। সন্ন্যাসীরও দেহ আছে, সেই দেহ-পোষণের জন্য তাঁকে খেতে হয়, শীত-নিবারণের জন্য বস্ত্রাচ্ছাদনাদি ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু তিনি বিরক্ত—কোন জিনিষের প্রতি তাঁর আসক্তি নেই, 'যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্ট'।

ভগবান কিংস্বরূপ? যা সংসারের উল্টা। অর্থাৎ যাহা নিত্য। নিত্য বলেই সত্য। সংসার অনিত্য বলেই মিথ্যা। মিথ্যা মানে একেবারে অস্তিত্ব নেই তা' নয়। তবে অনিত্য প্রবাহরূপে তার অস্তিত্ব আছে। যেমন নদীর প্রতি জলকণা প্রতি মুহূর্ত্তে বদলে যাচ্ছে, তবুও নদীর নাম ও রূপ আছে। মেঘে কত রকম রং সৃষ্ট হচ্ছে, আবার বদলে যাচ্ছে। জগৎটা অত তাড়াতাড়ি বদলায় না বলে যেন স্থায়ী বলে মনে হয়। তাই তার দিকে আকৃষ্ট হয় সকলে। কিন্তু আত্মীয় স্বজন কেউ যখন ফাঁকি দিয়ে চলে যায়, তখন হঠাৎ খেয়াল হয় তাইত হল কি? মহামায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, না করতে পারেন এমন কাজ নেই, বিধবার অনিন্দ্য-সুন্দর একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নেন। অনেক সময় তাতে ভালও হয়।

সংসার করতে শাস্ত্র বারণ করেন না, তবে জেনে সংসার করতে বলেন। প্রস্তুত হয়ো ভোগের জন্য নয়, কর্ত্তব্যপালনের জন্য। কি কর্ত্তব্য? পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য। সমস্ত গীতায় এই কথা—কর্ত্তব্য কর। তাতে তোমার উপকার হবে। গুরুগৃহে যে theoretical training হয় সংসারে practical lifeএ সেটা পাকা হয়। যুদ্ধ করবো না বলায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ ধমকালেন। সব বুঝাবার পর অর্জ্জুন বললেন, "এখন সব বুঝেছি। তুমি যা বলছ তাই করবো।" শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলে খালাস। বলছেন, "আমি তোমায় সব বোঝালাম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।" ঠাকুর তাই বলতেন, "কারো ভাব ভাঙ্গতে নেই"—প্রত্যেকে তার নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী বলতেন, ভুল করেই লোক শেখে। দেয়াল চুরি করে না, গরু মিথ্যা কথা বলে না। তাই বলে তোমাদের চেয়ে দেয়াল এবং গরু কি শ্রেষ্ঠ? রত্নাকর দস্যুই শেষে হলেন বাল্মীকি, জগাই-মাধাই হলেন ভক্ত।

ভগবানের কাছে জাতিবিচার নেই। পণ্ডিত মূর্খ সব সমান। ধনীর চেয়ে গরীব বেশী প্রিয়। যীশুখৃষ্ট বলছেন, "উট ছুঁচের ছিদ্রে ঢুকতে পারে, কিন্তু বড়লোক ভগবানের রাজ্যে ঢুকতে পারে না।" ঠাকুরও তাই লোককে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। গৃহস্থের মনে ত্যাগ।

ত্যাগ ও তপস্যার উপর সংসার ও সন্ন্যাস উভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজী বল্‌ছেন, 'গৃহস্থ, তোমার ধর্ম্ম সমাজের নিকট আত্ম-বলিদান। ভোগ তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়।' Minimum ভোগের ভেতর দিয়ে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া গৃহস্থের ধর্ম্ম। ঠাকুর বলতেন, সন্ন্যাসীর "নির্জ্জলা একাদশী"। যাঁরা আত্মতৃপ্ত আত্মকাম তাঁরা শিষ্যকল্যাণের নিমিত্ত কিছু ভোগ স্বীকার করতে বাধ্য হন। লোকে দেখে ভুল করে।

এ সব কথা উত্থাপনের উদ্দেশ্য এইটি দেখান যে, শুধু বিবেক দ্বারা কোন লাভ হয় না, যদি বৈরাগ্য সেই সঙ্গে না থাকে। ঠাকুর বলতেন, 'চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু দৃষ্টি তাদের ভাগাড়ে।' অর্থাৎ খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা, কিন্তু কাজে কামকাঞ্চনে জড়িয়ে থাকা।

কাঞ্চন থেকে কাম এসে জোটে। আবার কামের মোহে পড়ে কাঞ্চনের জন্য হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হয়ে কাজ করে বেড়ায়। হয়ত স্ত্রীবিয়োগ হল। ছেলে মেয়ের জন্য ভাবতে হয় না। তবুও সংসার ছাড়তে পারে না। মনকে বুঝায় duty (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) করছি। কার প্রতি কর্ত্তব্য? 'আমার রোগীরা আমায় চায়।' হায়রে মহামায়া! এতদিন ডাক্তারী করেও বুঝতে পারছে না 'রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?' ঠাকুর বলতেন, 'বৈদ্য এসে যখন বলে, ভয় কি মা, আমি তোমার ছেলেকে সারিয়ে দেব, তখন ভগবান হাসেন।' ডাক্তার বোঝে না। তার নিজের কি হবে তার ঠিক নেই, পরের ভাবনা নিয়ে অস্থির। যেন তার রোগীরা তাকে কাঁধে করে বৈকুণ্ঠে বয়ে নিয়ে যাবে!

টাকার মায়াই কি কম? স্ত্রী পুত্র নেই। টাকাও যথেষ্ট আছে। স্বভাবও ভাল। সব জেনেছে এবং বুঝেছে মরে যেতেই হবে, তখন টাকা নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু ঐ টাকার চিন্তাই মহামায়ার প্যাঁচ। কোন সৎ কার্য্যে টাকা দিতে বল্‌লে বলে ভেবে দেখবো। মাঝে মাঝে দিতে ইচ্ছাও করে, তবুও পারে না। ঠাকুর বলতেন, 'কামিনীকাঞ্চনই মায়ার দুইটি রূপ'। প্রত্যক্ষ। কোন ভুল নেই।

'জীব সাজ সমরে'। যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে এই কামকাঞ্চনের মোহ থেকে আত্মরক্ষা কর। সংসার কর ক্ষতি নেই, মোহগ্রস্ত হয়ে সংসার করো না। ঠাকুর বলতেন, 'বড়লোকের বাড়ীর দাসীর মত সকলের সেবা কর কিন্তু মনে জানবে এরা ভগবানের, যখন ইচ্ছে কেড়ে নিতে পারেন।' কলকাতার বড় বড় ডাক্তারের ছেলেগুলিকে কেড়ে নিলেন, তাঁরা রক্ষা করতে পারলেন না, কেবল যিনি ভগবানকে ধরে আছেন তাঁকে টলাতে পারেন নি, বরং এগিয়ে দিয়েছেন। অন্যদের চোখ ফোটাবার উদ্যোগপর্ব্ব। পাখীর ছানার সময় হলে চোখ ফোটে। চাষীর ছেলে খেতে পাচ্ছে না বলে মাঠের ধান শীঘ্র পাকে না। দশ মাস পূর্ণ না হলে পোয়াতীর সন্তান প্রসূত হয় না। এই বিবেকের নাম নিত্যানিত্য-বিবেক। সংসার অনিত্য জেনে তাকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে নিত্যবস্তু ভগবানকে পাওয়া যায়।

"তুমি নিবে তুলে"

শ্রী—

বন্ধুর কঙ্করময় বিপৎসঙ্কুল
দীর্ঘপথ প'ড়ে আছে সম্মুখে আমার;
কত যে স্খলন হায়, কত কিছু ভুল
পদে পদে দিবে দেখা, সংখ্যা কোথা তার!

তবু যদি অনুক্ষণ রহ সাথে সাথে,
মোরে ঘিরি রহে তব বরাভয় কর,—
আকাশের যত বাজ পড়ুক এ মাথে,
হে মোর ঠাকুর, মোর আছে কিবা ডর?

প'ড়ে যাই, বিপথেতে চলি পথ ভুলে,—
তুমিই দেখাবে পথ, তুমি নিবে তুলে।

দিব্যমাতার দিব্যপ্রকাশ

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত

All here shall be one day her sweetness's home,
All contraries prepare her harmony;
Towards her our knowledge climbs, our passion gropes,
In her miraculous rapture we shall dwell,
Her clasp will turn to ecstasy our pain.

Savitri, Book III, Canto II

ইষ্ট বা উপাস্যকে একান্ত আপনার করবার জন্য যতপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় তন্মধ্যে মাতৃ-সম্বন্ধটি সব চাইতে শ্রেষ্ঠ। অন্য সব সম্পর্কে সম্ভ্রম, সঙ্কোচ প্রভৃতি একটু না একটু থাকে; কিন্তু মায়ের কাছে সন্তানের কোন দ্বিধা নেই। জগন্মাতার সঙ্গে তাঁর বিশ্বের সন্তানদের সম্পর্ক আপনার হতেও আপনার—পরম আত্মীয়তার কোমল বন্ধনে আবদ্ধ। অবোধ শিশুসন্তান মাকে যেমন পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করে, তেমনটি জগতে আর কাহাকেও করে না। সর্ব্বপ্রকারে অসহায় শিশুর যেমন মা-ই একমাত্র সম্বল, তেমনি সতত বিপদাপন্ন নিখিল বিশ্বসন্তানের পক্ষে একমাত্র আশ্রয়-ভূতা সর্ব্বদুঃখান্তকারিণী জগজ্জননী মা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

চিন্ময়ী বিশ্বজননী নিজের স্বরূপে বিশ্বোত্তীর্ণা (Transcendent)—তিনি আবার বিশ্বের প্রত্যেকটি ধূলিকণায় স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার নিবিড় সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে চির বিশ্বগতা (Eternally Immanent)। জগন্মাতার এই বিশ্বাতীত ও বিশ্বানুগ ভাবের কথা অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে এভাবে ঘোষিত হয়েছে—

"অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥"

(ঋক্‌বেদ—দেবীসূক্ত)

অর্থাৎ, আমিই এই বিশ্বের পিতাকে প্রসব করিয়াছি। পরমাত্মা মহাসমুদ্রে ব্রহ্মচৈতন্যই আমার উৎপত্তিস্থান; তাহা হইতে প্রকাশের পরই আমি সমগ্র বিশ্বে অনুপ্রবিষ্টা। আমিই নিজ দেহ দ্বারা দূরস্থিত স্বর্গলোককেও স্পর্শ করিয়া আছি।

যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম—বিশ্বসৃষ্টিতে তিনিই সগুণা লীলাময়ী মহাশক্তি, যিনি পরমাত্মা পুরুষ—তিনিই সনাতনী ভগবতী,—তিনিই মহেশ্বরী-মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীরূপে জগৎকে মানব-মনবুদ্ধির ধারণার অতীত কোনও এক দিব্য চরম লক্ষ্যের দিকে ক্রম-বিবর্ত্তনের পথে নিয়ে চলেছেন। ঋষি-দৃষ্টিতে, সৃষ্টি-লীলায় মহাশক্তির কর্তৃত্ব সুপ্রকট—জগদ্‌ব্যাপারে শক্তিই শাসয়িত্রী। সেই ঋতম্ভরা দৃষ্টিতে এটাও সুপ্রতিভাত যে তত্ত্বময়ী মা তাঁর সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান ও শক্তির বিকাশলীলা এবার জড়স্তরে পর্য্যন্ত ফুটিয়ে তুলবেন এবং তজ্জন্য ভগবান্ সাধকের কাছে চেয়েছেন ভাগবতী জননীর কাছে অকুণ্ঠ ও নিঃশেষ আত্মসমর্পণ। "The Supreme demands your surrender to Her."—Sri Aurobindo.

জগন্মাতার ধ্যানে তন্ময় হয়ে কোলের শিশুর ন্যায় তাঁর উপর নির্ভর করা ও শ্বাসে প্রশ্বাসে মায়ের দিব্য ছন্দের অনুবর্ত্তন করে সর্ব্বাবস্থায় চলা—এই যে পূর্ণযোগীর সাধনপথে চলার প্রাথমিক রূপ, তার একটা ভাবমূর্ত্তি বা প্রতীক মাইকেল য়্যাঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্ত্তি "মা" মূর্ত্তিটির মধ্যে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। মূর্ত্তিটি এই: একটি পেলব কোরকের মত সুন্দর কোমল শিশু মায়ের কোলে সমস্ত বক্ষস্থলটি জুড়ে কেমন নিশ্চিন্ত বসে। মায়ের মুখে পবিত্র স্বর্গীয় স্নেহ। শিশুর চোখ দুটি মায়ের মুখের প্রতি নিবদ্ধ। মায়ের আঁখি স্নেহের আবেগে ঈষৎ নিমীলিত। উভয়েই নির্ব্বাক! মৌনে যেন মা ও সন্তানের মধ্যে ভাব-বিনিময় হচ্ছে!

ইষ্ট বা উপাস্যের সঙ্গে যত প্রকার সম্বন্ধ সাধক এযাবৎ পৃথিবীতে স্থাপন করে এসেছেন তন্মধ্যে এটিই কি সব চেয়ে অপূর্ব্ব, সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে সুন্দর, নয়? মাতৃ-সাধনার এই যে ভাববীজ—এই যে মধুর প্রেমযোগ—এর যথাযথ পরিশীলনের দ্বারাই মাতৃ-সাধক সাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠবেন। তবেই জাগতিক জীবনের যে পরিপূর্ণ সার্থকতার ছবি তন্ত্র-শাস্ত্রে আমরা পেয়েছি—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"—সেই বাণীমন্ত্রের সিদ্ধি মায়ের প্রসাদে আমাদের করায়ত্ত হবে।

অজ্ঞাত রাসায়নিক

ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্‌সি, পিএইচ-ডি

মানবশরীরে খাদ্য পরিপাক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গিয়াছে, অনেক কিছু আজও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে। এই সকল তথ্যের অনেকই এত অদ্ভুত যে মনে হয় বিষয়খানি চিরনূতন থাকিবে। খাদ্য-পরিপাক-প্রণালীকে রাসায়নিক কোন শিল্পকেন্দ্রের যদি কোন একটি বিশেষ কার্য্যধারা এবং আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে যদি সেই শিল্পের প্রাথমিক দ্রব্যসম্ভার বলিয়া মনে করা যায়, তখনই বুঝিতে পারা যায় কি অদ্ভুত উপায়ে পরিপাকক্রিয়া চলিতে থাকে—আমরা পরিপাক করিতে পারি না কেবল আমাদের পাকস্থলীকে।

আমরা যখন খাইতে আরম্ভ করি, ভাবিয়াও দেখি না এতগুলি জিনিষপত্র লইয়া কিরূপে পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হইবে। আমরা ভাত ডাল রুটি তরকারী মাছ মাংস বহুবিধ খাদ্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করি, সকলের শেষে জল দিয়া সকল কিছু উদরে পৌছাইয়া দিই। কেহ কেহ খাবারের শেষে মিষ্ট কোন দ্রব্য খান। এই সকল বহুবিধ খাদ্য হইতে পাকস্থলী ঠিক করিয়া লয়, কোন জিনিষগুলি সে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারিবে। যে দ্রব্যগুলি তাহার কার্য্যে প্রয়োজন হয় না, সেগুলি সে পরিত্যাগ করে। প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি লইয়া সে বিভিন্ন জীবকোষের খাদ্য নানা নূতন প্রোটিন দ্রব্যে পরিণত করে। পাকস্থলী ক্যালসিয়ম, গন্ধক, লৌহ ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহাদের বাছিয়া লয়। ঠিক রাখে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি যাহাতে বিনষ্ট না হয়, বৃদ্ধি-উৎপাদক ক্ষুদ্রপরিমাণ রাসায়নিক পদার্থগুলি যাহাতে প্রস্তুত হইতে পারে, প্রতি

প্রয়োজনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পাকস্থলী ঠিক রাখে, জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজন পদার্থগুলি যাহাতে নিকটবর্ত্তী থাকে। উপবাসের মত দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্য স্নেহজাতীয় ও অন্যান্য পদার্থ সঞ্চিত হয়। মানুষের দুশ্চিন্তা অথবা অন্যান্য নানা কারণ সত্ত্বেও পাকস্থলীতে এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকে। কি গ্রহণ করিতেছে, তাহার কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া মানুষ এই শিল্পকেন্দ্রে অসংখ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে। তাহার একমাত্র বিবেচনা, কি করিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে। এই খাদ্য পদার্থগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, অসংখ্য নূতন নূতন খাদ্য সেখানে তৈরী হয়। তাহারা সর্ব্বক্ষণ লক্ষ লক্ষ জীবকোষকে খাদ্য সরবরাহ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে যত মানুষ আছে তাহাদের অপেক্ষাও এই জীবকোষগুলির সংখ্যা বেশী। প্রতি জীবকোষে এই খাদ্যবিতরণ সকল সময়ে চলিতে থাকা চাই। যে খাদ্য মাংস নখর অস্থি রোম চক্ষু ও দন্তে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন, জীবকোষগুলি শুধু সেই খাদ্যই গ্রহণ করে। মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার যে কোন একটিতে যতগুলি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার অপেক্ষাও বেশী দ্রব্য প্রস্তুত হয় আমাদের পাকস্থলীর রসায়নাগারে। এখানকার বিতরণ-ব্যবস্থা, পৃথিবীর যে কোন যাতায়াত বা বিতরণ-ব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নততর। বাল্যকাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই শিল্পকেন্দ্রে কোন মারাত্মক ভুল হয় না যদিও যে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে গৃহীত হয়, তাহা হইতে অসংখ্য নূতন বস্তু এমন কি বহু বিষাক্ত দ্রব্যও তৈরী হইতে পারিত। অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার করার ফলে যখন এই বিতরণব্যবস্থা মন্থর হইয়া আসে তখন আসে দুর্ব্বল স্বাস্থ্য, সকলের শেষে আসে বার্দ্ধক্য।

যে খাদ্য জীবকোষ গ্রহণ করে সে খাদ্যই তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য। প্রতি জীবকোষের কার্য্যপ্রণালী ঠিক অগ্নিকুণ্ডের মত। তাহার ফলে আমাদের শরীরে এত তাপ। না জ্বালাইলে কোন বস্তু জ্বলে না। আগুনকেও জ্বালাইতে হয়। কাজেই জীবকোষের ভিতর প্রকৃতিকে এমন রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগ ঘটাইতে হয়, যে তাহার ফলে প্রয়োজনীয় তাপের উৎপত্তি হয়। আগুন হইতে যেমন অঙ্গারক বাষ্প ও জল উৎপন্ন হয়, জীবকোষ হইতেও পাওয়া যায় এই অঙ্গারক বাষ্প ও জল। অঙ্গারক বাষ্পকে রক্ত ফুস্‌ফুসে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং ইহার জন্যই আমাদের নিঃশ্বাস লইতে হয়। এক একজন লোকে প্রতিদিন প্রায় একসের করিয়া অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। প্রতি প্রাণীই খাদ্য পরিপাক করে এবং প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য নিশ্চয় আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক প্রাণীর রক্তের ভিতর, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য আছে। সুতরাং প্রত্যেকের পরিপাকপ্রণালীও বিভিন্ন।

সংক্রামক রোগের সময়ে, শরীরের মধ্যে একদল নূতন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। তাহাদের কার্য্য বিশ্বস্ত সৈনিকের মত। তাহারা আক্রমণকারী রোগবীজাণুদের সম্মুখীন হয় ও তাহাদের পরাভূত করে। মানুষকে তাহারা অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করে। জীবনের অনুপস্থিতিতে, এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার সমাবেশ কখনও ঘটে না। ইহাদের প্রত্যেকটি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং ইহা কখনও ঘটনাক্রমে হয় না। জীবন লইয়া যে অজ্ঞাত বুদ্ধি এখানে কাজ করিতেছে মানুষের রসায়ন তাহার অভাবে কোনদিন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে কি?

স্বামী স্বরূপানন্দ

শ্রী—

স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। গীতার যে ইংরেজি অনুবাদ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়া দেশে বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহা স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক সম্পন্ন। তিনি হিমালয়স্থ অদ্বৈতাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আট বৎসর কাল।

পূর্বাশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের নাম ছিল অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁহার বাটি ছিল। তিনি ডন সোসাইটীর সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। উক্ত সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত 'ডন' নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি কয়েক বৎসর করিয়াছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতির সংরক্ষণের প্রধান উপায় সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একজন সুপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া একটী চতুষ্পাঠী চালাইতেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃতশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী-পাঠে অনুরক্ত ছিলেন।

১৮৯৮ সনে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের অধুনালুপ্ত পুরাতন ভগ্নবাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে উপবিষ্ট আছেন। তখনও মঠের বর্তমান গৃহ নির্মিত হয় নাই, জমি মাত্র ক্রীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৩০৪।৫ সালের বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণ। কলিকাতা হইতে অনেক লোক আসিয়া স্বামীজীর পদতলে বসিয়া মধুর ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতেছেন। কয়েক ঘণ্টা বাক্যালাপের পর সকলে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু ষড়্‌বিংশতি-বর্ষবয়স্ক কৃশোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটী ব্রাহ্মণ যুবক একান্তে অবস্থিত স্বামীজীর নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণের সংকল্প জানাইলেন। যুবকের স্থির উজ্জ্বল নয়নে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আলাপে বিদ্যা, বিনয় ধৈর্য ও অমায়িকতা এবং যথার্থ ধর্মজীবন-লাভের সুদৃঢ় সংকল্প প্রকটিত। স্বামীজী সানন্দে তাঁহাকে মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন। সদ্‌গুরু সংশিষ্য লাভে উল্লসিত হইলেন। যুবক অন্য কেহ নহেন; ইনিই উপরোক্ত অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়।*

স্বামীজী যুবকটীকে বলিলেন, "অজয়হরি, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে তো? সাপের মুখে যাইতে বলিব, বাঘের মুখে যাইতে বলিব, অগ্ন্যুদ্‌গারী তোপের মুখে যাইতে বলিব। নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও বিচারমাত্র না করিয়া অবিচলিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে হইবে। সুখাভিলাষী হইলে চলিবে না। কাম-কাঞ্চনের সম্বন্ধমাত্র রাখিতে পাইবে না। হৃদয়ের মমতা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিসর্জন দিতে হইবে। 'অভিমানঃ সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা' জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। পারিবে তো? জানিয়া শুনিয়া অগ্রসর হও। নতুবা এখনও নিরস্ত হইয়া সংসারে পরিবারবর্গ লইয়া যেরূপ সদ্‌ভাবে এতদিন কাটাইয়া আসিয়াছ সেইভাবে আমৃত্যু থাক।" অজয়হরি সর্বান্তঃকরণে সম্মতি

* 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় স্বামী সারদানন্দের প্রবন্ধ দেখুন। প্রবন্ধটী উক্ত সালে ও মাসে 'উদ্বোধন' পত্রেও পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

জানাইলেন। তিনি ইতঃপূর্বে বিবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক তেজ, উদ্যম ও অধ্যবসায় অদ্ভুত হইলেও শরীর বহু বর্ষ যাবৎ অজীর্ণতা ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা রোগে আক্রান্ত এবং তজ্জন্য কঠিন পরিশ্রমে অপটু ছিল। তাহা সত্ত্বেও তিনি গুরুর আদেশ শিরে ধারণপূর্বক কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনে অগ্রণী হইলেন। আত্মত্যাগের উন্মাদনা আসিলে মানুষের দুর্বল দেহেও অসীম তড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হয়।

বেলুড় মঠে কয়েক সপ্তাহ বাস করিবার পর স্বামীজী অজয়হরিকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে অমাবস্যানিশিতে বিরজা হোম সমাপ্ত হইল। গৈরিক বসনে ভূষিত, মুণ্ডিতশির, ভস্মলিপ্তললাট তরুণ শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ' গুরুর পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইলেন। জগতে অজয়হরির মৃত্যু হইল এবং স্বামী স্বরূপানন্দ জন্মগ্রহণ করিলেন। অপরাহ্নে ধীরা মাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া স্বামীজী বলিলেন, "We have made an acquisition today." (আমরা অদ্য একটী রত্ন লাভ করিয়াছি)। মঠাধ্যক্ষ গুরুভ্রাতাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "স্বরূপের শরীর খারাপ, ডাল চচ্চড়ি সইবে না। তার জন্য দুধের বন্দোবস্ত করে দাও।" গুরু শিষ্যকে যথারীতি কিছুকাল ব্রহ্মচারিরূপে না রাখিয়া একেবারে সন্ন্যাসদান করায় প্রতীত হয়, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি-জাত ধারণা ভবিষ্যতে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

১৮৯৮ সনের এপ্রিল মাসে স্বামীজীর শিষ্য ক্যাপ্টেন সেভিয়ার আলমোড়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজী স্বাস্থ্যলাভার্থ তথায় ১৬ই মে যাইয়া লালা বদ্রিসাহের টমসন হাউসে উঠিলেন। জুন মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদক রাজম্ আয়ার দেহত্যাগ করেন। তখন এই মাসিকের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় তিন হাজার হইয়াছিল। স্বামীজীর নির্দেশে মান্দ্রাজ হইতে উহার কার্যালয় উঠাইয়া আলমোড়ায় আনা স্থির হইল। আলমোড়া হইতে ৪৮ মাইল দূরে মায়াবতী নামক স্থানে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের অর্থে জমি ও গৃহ ক্রীত এবং ১৮৯৯ সনের মার্চ মাসে আশ্রম স্থাপিত হয়। স্বামীজী স্বামী স্বরূপানন্দকে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক এবং অদ্বৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। সেভিয়ার-দম্পতী অদ্বৈত আশ্রমের পার্শ্বে পৃথক্ গৃহে বাস করিয়া পত্রিকা পরিচালনায় সহায়তা করিতে লাগিলেন। একটী ছাপাখানা কেনা হইল। একটী সাহেবের চা-বাগান ও গৃহাদি ক্রয় করিয়া অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। সেভিয়ার-দম্পতী স্বামী স্বরূপানন্দকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাদের স্নেহের অবমাননা কখনও করেন নাই।

কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বামী স্বরূপানন্দ অসামান্য যোগ্যতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রদান করেন। পত্রিকা-সম্পাদন এবং আশ্রমপরিচালন ব্যতীত তিনি নানা লোকহিতকর্মেও ব্যাপৃত হইলেন। তিনি আশ্রমস্থ স্বদেশী ও বিদেশী ব্রহ্মচারী এবং তরুণ সন্ন্যাসিগণকে শাস্ত্রজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা দানে এবং বেদান্তসাধনায় ব্রতী হইলেন। পাশ্চাত্য দেশাগত ম্যাকোনেল সাহেবের সহায়ে হিমাচলে কৃষির উন্নতি ও তৎপ্রচারের চেষ্টা করিলেন। হিমাচলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টাও তাঁহার আন্তরিক ছিল। পাহাড়ী বালক-দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য মায়াবতীতে এবং শোর নামক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। একজন উপযুক্ত ডাক্তার আনাইয়া মায়াবতীতে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলেন। উক্ত চিকিৎসালয় গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ পার্শ্ববর্তী শত শত পাহাড়ী নরনারীকে ঔষধপথ্য দান করিতেছে। আশ্রমে এবং তৎসংলগ্ন বাগানে যে সকল ভৃত্য ও যুবক কাজ করিত তাহাদিগকে তিনি হিন্দি ও ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাঝে মাঝে

তিনি নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে যাইয়া পাহাড়ীদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ১৮৯৯ সনে রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে যাইয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টগণের সেবা এবং বালকবালিকাদিগের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। ঐ বৎসর নৈনিতালে ৪ঠা মে হইতে ১৯শে জুন পর্যন্ত দেড় মাস দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহপূর্বক কনখলে সাধু ও তীর্থ-যাত্রিগণের জন্য দাতব্য ঔষধালয় ও সেবাশ্রম স্থাপন করিলেন। ১৯০২ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিন মাস এলাহাবাদে অবস্থানপূর্বক তিনি বক্তৃতাদি দানে জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান বিতরণ করেন। ঐ সকল বক্তৃতার ফলে সাধারণের চিত্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা স্বামী স্বরূপানন্দকে তথায় মঠস্থাপনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানান। ১৯০৫ সনের কাংড়া জেলার ধর্ম-শালা নামক স্থানে ভূমিকম্প হইলে তিনি অর্থসংগ্রহ করিয়া মঠ হইতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পাঠাইয়া তথায় দুর্গতিদের সেবা-কার্য আরম্ভ করেন। এত সেবাকার্যের মধ্যেও স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশের সম্যক্ আয়োজন করেন। স্বামীজীর জীবিত কালেই তাঁহার রচনা ও বক্তৃতাগুলির সংগ্রহ ও সম্পাদন আরব্ধ হয়। কিন্তু গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সনে।

দেশের যুবকগণকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার অসীম আগ্রহ লক্ষিত হইত। কলিকাতা, এলাহাবাদ, নৈনিতাল ও আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে যখনই তিনি যাইতেন তখনই ছাত্রদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সেবাকার্যে উৎসাহ দিতেন। স্বামী স্বরূপানন্দের জীবনে সেবা ও সাধনার সুন্দর সমন্বয় ছিল। সেবাবাহুল্যে সাধনার হ্রাস তাঁহার জীবনে কখনো দেখা যায় নাই। মায়াবতী আশ্রমের অনতিদূরে জঙ্গলে তাঁহার সাধনকুটীর অদ্যাপি বিদ্যমান। কর্মের অবসরে বা অবসানে তিনি ঐ কুটীরে বেদান্তসাধনায় মগ্ন হইতেন। চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে নিবিড় অরণ্য যখন জ্যোৎস্নাস্নাত হইয়া অপূর্ব শোভাধারণ করিত এবং চিরনীহার-মুকুটিত উত্তুঙ্গ নন্দাদেবী ও ত্রিশূল শৃঙ্গ উমামহেশের কাঞ্চনজড়িত কর্পূর ধবলাঙ্গের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইত, তখন স্বামী স্বরূপানন্দের হৃদয় ব্রহ্মভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। সেই গভীর রজনীতে যষ্টিমাত্র অবলম্বনে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে গুরুভ্রাতাগণ সমভিব্যাহারে তিনি বিচরণ করিতেন। এই সময় কখনও বা কয়েক ঘণ্টা ভ্রমণান্তে আশ্রমে ফিরিতেন, কখনও বা সাধন-কুটীরে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন। শোনা যায়, এক গভীর নিশীথে ধ্যানান্তে আশ্রমে যাইবার জন্য কুটীরের দ্বার খুলিয়া দেখেন, সম্মুখে একটী ব্যাঘ্র উপবিষ্ট!

হিমালয়ের কার্যভার গ্রহণ করিবার পর স্বামী স্বরূপানন্দ মাত্র দুইবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রথমবার তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার শরীর পূর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও বলিষ্ঠ দেখিয়া আনন্দিত হন এবং আশা করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনেক কাজ এখনও তাঁহার দ্বারা সাধিত হইবে। শ্রীগুরুর সেবা ও সৎসঙ্গ লাভের জন্য তিনি সেবার কলিকাতায় আসেন। গুরুভক্তি ছিল তাঁহার জীবনের মূলশক্তি। কিষণগড়ে অবস্থান কালে তিনি তথাকার দেওয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দেওয়ান তাঁহার আলাপে পরিতুষ্ট হইয়া জনৈক বন্ধুকে স্বামী স্বরূপানন্দের পরিচয় প্রদানকালে বলিলেন, "এই

মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা।" স্বামী স্বরূপানন্দ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিলেন "আমি স্বামী বিবেকানন্দের অনুগত ও নগণ্য শিষ্যমাত্র।" দেওয়ান স্বরূপানন্দজীর বিদ্যাবুদ্ধিতে যতদূর না মুগ্ধ হইয়াছিলেন এতাদৃশ বিনয় ও গুরুভক্তি দর্শনে তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদবধি দেওয়ান তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিলেন। ১৯০১ সনে দিল্লী-দরবারের সময় দেওয়ান স্বামী স্বরূপানন্দকে স্বসমীপে লইয়া যান এবং ঐ উপলক্ষে সমাগত রাজপুতানা ও গুজরাটের রাজন্তবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। স্বামী স্বরূপানন্দের সদালাপে বরোদার মহারাজা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

১৯০৩ সনে জানুয়ারী মাসে এলাহাবাদের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' নামক ইংরেজি মাসিকে পুণা ডেকান কলেজের অধ্যাপক জে নেলসন ফ্রেজার স্বামী বিবেকানন্দকে সমালোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন। স্বামী স্বরূপানন্দ উক্ত পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ইহার প্রতিবাদ করেন। অধ্যাপক ফ্রেজারের মতে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসংস্কার ও শিল্পসমৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দের বহু উক্তি উদ্ধৃতিপূর্বক স্বরূপানন্দজী প্রতিপন্ন করেন যে, অধ্যাপক সর্বৈব ভ্রান্ত। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন, "দরিদ্রের প্রতি ভারতমাতার কোন সন্তানের এত দরদ ছিল না।...অন্ততঃ বর্তমান ভারতের ইতিহাসে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ স্বামীজীর প্রচারকার্য যুগান্তকারী ঘটনারূপে স্মরণীয় হইবে।"* স্বামী স্বরূপানন্দের প্রতিবাদ পাঠে অধ্যাপক ফ্রেজার নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকায় অধ্যাপক ফ্রেজারের যে পত্র প্রকাশিত হয় উহাতে তিনি স্বীয় ভ্রম স্বীকার করেন। গুরুবাণীর প্রচার এবং গুরুনিন্দার প্রতিবাদ করিয়া স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

এত কাজের মধ্যেও স্বামী স্বরূপানন্দ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার একটী প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ করেন ১৯০১ হইতে ১৯০৩ সনের মধ্যে। ইহাতে মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়মুখে সংস্কৃত শব্দের ইংরেজি অর্থ, সরল ইংরেজি অনুবাদ ও পাদটীকা আছে। ইহাতে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী শব্দার্থ, অনুবাদ ও টীকাদি প্রদত্ত। বেদান্তে তাঁহার কি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি এবং ইংরেজি ভাষায় কি অদ্ভুত দখল ছিল তাহা এই বই-খানিতে জানা যায়। তাঁহার দেহত্যাগের পর ১৯০৭ হইতে ১৯০৯ সন পর্যন্ত সমগ্র বইখানি ধারাবাহিকরূপে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা পুস্তকাকারে প্রথম বাহির হয় ১৯০৯ সনে। ইতোমধ্যেই পুস্তকখানির আটটী সংস্করণ হইয়াছে। দিল্লী এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেন। উক্ত পত্রিকায় ১৯০২ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটীতে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচিত। ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত 'মায়াবাদ ও হিন্দু সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটী সারগর্ভ। উইলিয়াম জেম্‌স, হাক্সলি এবং ডাঃ ওয়ালেস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাক্যোদ্ধৃতি পূর্বক তিনি মায়াবাদের মূলতত্ত্বটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে মায়াবাদ দুঃখবাদের চরম পরিণতি। এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন-পূর্বক স্বামী স্বরূপানন্দ দেখাইয়াছেন, বেদান্ততত্ত্ব

* ১৯০৩ সনের এপ্রিলের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় স্বামী স্বরূপানন্দজীর প্রতিবাদ পুনঃ প্রকাশিত হয়।

দার্শনিক চিন্তার শেষ সীমা। তিনি এই প্রসঙ্গে বর্ণাশ্রমধর্মের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেও ভুলেন নাই। হিন্দু সংস্কৃতি তাঁহার মতে মায়াবাদের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

স্বামী স্বরূপানন্দ গুরুকৃপায় তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইত। শোনা যায়, জনৈক যুবক তাঁহার বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণে ত্যাগবৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শিষ্যের অসাধারণ ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি তিনজন কামজয়ী দেখেছি; আমার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, আমার গুরুভ্রাতা যোগানন্দ এবং আমার শিষ্য স্বরূপানন্দ।" ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠে এবং মায়াবতী আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিখ্যাত The Master as I saw Him নামক ইংরেজী পুস্তকে ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরে ব্রহ্মচর্যব্রতে আমার দীক্ষা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই স্বামী স্বরূপানন্দ মঠে গৃহীত হন। অল্প কয়েক সপ্তাহ মাত্র ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকিবার পর তিনি মদীয় গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসি-পদে উন্নীত হন। তাঁহার মানসিক বিকাশের কাহিনী আমার নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণব ভাবধারার পরিবেশে পালিত হন। বৈষ্ণবমতে ঈশ্বর দয়ালু প্রেমিক পিতা ও পালক এবং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধারক অবতার পুরুষ। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্মের সহিত বৈষ্ণবধর্মের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। ভাবপরিবর্তন আমাদের সকলের নিকট পরিচিত এবং সাধারণের জীবনে ঘটে। স্বামী স্বরূপানন্দকে স্বীয় জীবনে তুমুল ভাবপরিবর্তনের সম্মুখীন হইতে হয়। যৌবনের প্রারম্ভে জীবনের কয়েকটি অন্যায় ঘটনা তাঁহার চোখে পড়ে। তিনি তিক্ত প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে জীবন-সংগ্রামে কেবল বলবানেরাই জয়ী হইতে পারে। বাল্যের দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার নিকট অলীক প্রতীত হইল। তাঁহার জীবনের দিক্-পরিবর্তনকারী একটী ঘটনা আমার মনে আছে। একদিন কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ রাস্তায় যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন, একটী দরিদ্রা রমণী হাঁটু গাড়িয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ধূলিময় রাস্তা হইতে কণা কণা চাউল কুড়াইতেছে। এইরূপে মাত্র সে একমুঠা চাউল হাতে পাইয়াছে। সারাদিনের ভিক্ষালব্ধ চাউল তাহার পাত্র হইতে জনৈক পথিকের ধাক্কায় রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে; তদ্দর্শনে যুবকের কোমল হৃদয় গভীর করুণায় দ্রবীভূত হইল। তিনি ব্যথিত চিত্তে চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'যদি ভগবান্ সত্যই থাকেন তবে সেই শয়তান এই হৃদয়বিদারক অন্যায়ের প্রতিকার কচ্ছেন না কেন?' এইরূপ দুই তিনটী অভিজ্ঞতায় তিনি এমন মর্মাহত হইলেন যে, তিনি বৎসরখানিক মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইলেন। যন্ত্রণা এত দুঃসহ হইল যে, তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল এবং তিনি আর পূর্ব স্বাস্থ্য কখনও ফিরিয়া পান নাই। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের ফলে যে শান্তি মনে আসিল তাহাতে তিনি সেই যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু এই জীবন-স্বপ্ন ভাঙ্গিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। অর্থাৎ তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই জগৎ মিথ্যা, মায়িক। ভগবান বুদ্ধের পূর্বে এবং পরে সহস্র সহস্র ভারতীয় সাধক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব যুবক অজয়হরি মায়াবাদী হইলেন। এখন হইতে তাঁহার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব হইল যে, সিংহাসনারূঢ় কোন ঈশ্বরের সম্মুখে মানবাত্মা ভক্তিভাবে নতজানু হইলে জীবন-সমস্যার চরম সমাধান সম্ভব। বরং তিনি দেখিলেন, মানব-

মনের এই স্বার্থ ও অজ্ঞতাই এইপ্রকার সকল স্বপ্নের মূল। সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্বমূলক স্বপ্নদ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট এবং জীবন সীমিত সেইগুলির কারণও এই অজ্ঞান। এই অজ্ঞাননাশের জন্য, এই স্বপ্নভঙ্গের নিমিত্ত তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। এই দ্বন্দ্বসমূহের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে, মুক্তি-নামক অদ্বৈতানুভূতি লাভ করিতে এবং সেই অন্তর্দৃষ্টি ও চরম নিশ্চয়ে উপস্থিত হইতে প্রাণপণ করিলেন। এখন হইতে সেই সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষানুভবের সাধনা তাঁহাকে জ্বরের মত পাইয়া বসিল। নানাভাবে বোঝা যায়, পিতৃগৃহে তাঁহার জীবনের বাকী বৎসরগুলি অধিকাংশ মঠবাসী সন্ন্যাসিগণের জীবন অপেক্ষা কঠোরতর হইয়াছিল। বহু বৎসর পরে আলমোড়ায় তাঁহার কাছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়িবার সময় বুঝিয়াছিলাম, বিবেকবৈরাগ্য প্রাণান্তকারী পিপাসার ন্যায় তাঁহার জীবনে কত তীব্র ছিল। স্বামী স্বরূপানন্দের প্রেরণায় আমি ধ্যানাভ্যাসের আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার সহায়তা ব্যতীত আমার জীবনের এক মহত্তম মুহূর্ত আমি হারাইতাম।”

শিষ্যের জীবনে গুরু-প্রদর্শিত আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্মজীবনে বেদান্ত কিরূপে পরিণত হয় তাহা স্বামী স্বরূপানন্দ সুদীর্ঘ আট বৎসর দেখাইয়াছেন। মানবচরিত্রের এক সুন্দর চিত্র তাঁহার জীবনে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ সাহসী, সবল ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার চিত্ত সহজে চঞ্চল বা নিরাশ হইত না। তিনি সর্বদা উন্নতিকামী ও প্রগতিশীল ছিলেন। নিষ্কাম কর্মে সন্ন্যাসী কেমন উন্মত্ত হন, আহার নিদ্রা ভুলেন এবং স্বীয় সুখসুবিধা অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকে দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য! গুরুর ন্যায় শিষ্যও নারায়ণসেবায় তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়া জীবন সার্থক করিলেন। *

আলমোড়ায় গুরুদেবের সঙ্গে স্বামী স্বরূপানন্দের যে সকল কথাবার্তা হইত উহার কিয়দংশ ১৮৯৮ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যা ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত। স্বরূপানন্দজী শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করেন, “প্রচার বা বাণীর বিশেষত্ব কি?” তদুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “হিন্দুধর্মকে খ্রীষ্টান ধর্ম বা ইসলামের মত গতিশীল ও সংগ্রামশীল করিতে চাই। বুদ্ধদেবের সময় হইতে আমাদের ধর্মের সেই শক্তি বিলুপ্ত। তাই বিদেশাগত প্রত্যেক ধর্ম হিন্দুগণকে ধর্মান্তরিত করিয়া হিন্দু সমাজকে দুর্বল ও ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছে। ধর্মের দ্বারা ভারতের বিজয়াভিযান আবশ্যক। পূর্বে আমাদের দেশে ষাট কোটি হিন্দু ছিল।”

সেভিয়ার-দম্পতী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের ভূমিগৃহাদি দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিতে চাহিলে স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁহাদের সহিত দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাঃ আর এল দত্তের চিকিৎসায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি কার্যশেষে ঔষধ লইয়া পুনরায় মায়াবতী প্রত্যাগমন করেন। মায়াবতী হিমালয়ের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ প্রকাশের নানা অসুবিধা হইতে লাগিল। সেইজন্য প্রেস ও প্রকাশন-আলয় আলমোড়ায় বা নৈনিতালে উঠাইয়া লওয়া সম্ভব কি না—এই বিষয় নির্ধারণ করিবার জন্য স্বামী স্বরূপানন্দ ১৯০৬ সনের ৬ই জুন মায়াবতী ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার শরীর খুব খারাপ যাইতেছিল। নৈনিতালে বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রাম দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি

* ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রের ১৯০৬ সনের আগষ্ট সংখ্যায় ‘স্বামী স্বরূপানন্দ’ শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সাধন উক্ত যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রবুদ্ধ ভারত প্রেসের জন্য একটী স্থান দেখিয়া যখন তিনি লালা অমরনাথ সাহের ভবনে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। আর্দ্র বস্ত্র দীর্ঘ সময় শরীরে থাকায় ঠাণ্ডা লাগিয়া পরদিন হইতে তাঁহার সর্দি ও জর হইল।

তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও গুরুবাণী-প্রচারে ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীগুরুর ফটোর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সমাগত জনগণকে সদুপদেশ-দানে নিযুক্ত রহিলেন। লোকসমাগমের বিরাম নাই, সদালাপে তাঁহারও ক্লান্তি নাই। তিনি যখনই নৈনিতাল যাইতেন, তখনই বহু নরনারী তাঁহার সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে আসিতেন। দুই চারি দিনের মধ্যেই তাঁহার জর বৃদ্ধি পাইল এবং নিউমোনিয়া দেখা দিল। তখনও তিনি সদালাপ করিতেন এবং চিঠিপত্রাদির উত্তর অপরের দ্বারা লিখাইতেন। কানপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী তখন বায়ুপরিবর্তনের জন্য নৈনিতাল গিয়াছিলেন। তিনিও স্বামী স্বরূপানন্দের সদালাপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং অসুখের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত স্থানীয় আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনও স্বামীজীকে রোজ দেখিয়া যাইতেন। ২৬শে জুন রোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল, ডাক্তারগণ চিন্তিত হইলেন। লালা অমরনাথ প্রমুখ বন্ধু ও ভক্তগণ দিবারাত্র সপ্রেমে স্বামী স্বরূপানন্দের সেবশুশ্রূষা করিলেন। ২৭শে জুন বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি নিদ্রিতের ন্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বাহ্য বস্তু দেখিতে বা লোক চিনিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেই নিদ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। শিষ্য গুরুর চিরসান্নিধ্য লাভ করিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দের শবদেহ পুষ্পসজ্জিত, ভস্মলিপ্ত এবং নবীন গৈরিকাবৃত করিয়া নৈনিতালের নিকটবর্তী ভাওয়ালী নামক স্থানে অগ্নিসাৎ করা হইল।

১৯০৭ সনের ৮ই জুলাই মায়াবতী আশ্রমে স্বামী স্বরূপানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত আশ্রমে সঙ্গীত ও ভজনাদি হয়। আশ্রমের বেতনভোগী কর্মচারিগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হয়। সমগ্র দিবস আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দের মতে ১৮৯৮ সনের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় স্বামী স্বরূপানন্দের বয়স ছিল ছাব্বিশ বৎসর। ইহা হইতে অনুমিত হয়, স্বরূপানন্দজীর জন্মদিবস ১৮৭২ সনের ৮ই জুলাই। তিনি প্রায় চৌত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সন্ন্যাসিজীবন প্রায় আট বৎসর কাল ছিল। শিষ্য গুরুর ন্যায় অল্পায়ু ছিলেন।

মায়ের আশীষ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস

তোমার পরশ বহ্নি
মাগো, দাও বুলাইয়া,
মাটীর শ্যামল অঙ্গে,
প্রাণের তরঙ্গ ভঙ্গে ;

মনের জাঙ্গাল যত
হুতাশন যজ্ঞ পূর্ণ
দিতির জঠরাসীনা
আদিত্য সেবনব্রতী
অন্তর্লীন অদিতির
অতলের নিশ্চেতন পঙ্কে,

ভস্ম হয়ে যাক্ সবি,
বুদ্ধির সমিধ লভি ;
অভীপ্সার অগ্নিশিখা
মোর মৃন্ময় দীপিকা,
অগোচরী দৃষ্টি রাগে
দীপ্তি তব মাগে,

কঙ্করের ক্ষুদ্রতম
নটরাজ পদরজে
তড়িৎ অঙ্গুলি তব
আনন্দের মহাব্যোমে
ভূলোকের ধূলি পরে
মায়ের আশীষ সুধা

সুপ্তিমগ্ন পরমাণু,
নিস্পন্দিত শশী ভানু ;
তারে ছন্দিয়া বিকাশে,
সঞ্চরিছে প্রতিভাসে ;
দ্যুলোকের জ্যোতির্ধারা,
শিশু তাই শঙ্কাহারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্দশাধিকশততম জন্মতিথি-পূজা—গত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা হোম গীতা-চণ্ডী-উপনিষৎ-পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি হয়। পূর্বাহ্ণে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে পশ্চিমবঙ্গের বিচার-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে এক জন-সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী এবং অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণান্তে সভার কার্য শেষ হয়। এই উৎসবে বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন।

এই দিন রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা হয় এবং ১৪জন সন্ন্যাস এবং ১২ জন ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন।

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব—গত ২২শে ফাল্গুন রবিবার বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিন কয়েক লক্ষ ভক্ত নরনারীর সমাগম হইয়াছিল এবং কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে এবং হাওড়া ও শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে বেলুড় মঠে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র দিন মাইক্রোফোন-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক প্রচারিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কীর্তন ও ভজন সংগীতের বহু দল উপস্থিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য, পুস্তক, ছবি, খেলনা ও খাবার প্রভৃতির অনেক দোকান বসিয়াছিল। বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বেচ্ছাসেবক সুশৃঙ্খলভাবে সকল কার্য নির্বাহ করিয়াছেন। অপরাহ্ণে পশ্চিম বঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর কৈলাস নাথ কাট্‌জু এই উৎসবে যোগদান করেন। বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী এবং স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া মন্দিরে লইয়া যান। অতঃপর তিনি প্যাণ্ডেলে যাইয়া ভজন গান শোনেন।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহৃত জিনিষের একটি প্রদর্শনী হয়। সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক আলোকমালায় মন্দির ও উৎসবক্ষেত্র শোভিত হইলে আতসবাজী প্রদর্শনান্তে উৎসব-কার্য শেষ হয়।

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—গত ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুরে বেলুড় মঠের সহকারী সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র জন্মস্থানে প্রস্তাবিত মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন-কার্য সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচার পূজা ও হোম সম্পাদিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১০০০ ভক্ত নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার অধিবেশন হয়। বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব শিক্ষাধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ পাঁচালী' গান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ দান করেন। ভিত্তি-

প্রতিষ্ঠা-উৎসবে বেলুড় মঠের বহু সাধু এবং শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীকিরণ চন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় প্রায় দুই সহস্র-নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির—গত ১৭ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গল আরাত্রিক ও ভজনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ষোড়শো-পচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগাদির পর উপস্থিত সাধু ও ভক্তগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ, কীর্তন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী আলোচিত হয়। পর দিবস বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য সাধু এবং বহু ভক্ত নরনারী কামারপুকুর হইতে এখানে আগমন করেন। রাত্রিতে "দক্ষযজ্ঞ" কথকতান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:—

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং স্বামীজীর জীবনালোচনা হয়। ১১ই মাঘ হইতে পূর্ণ এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। প্রথম দিবসে স্বামী ভাস্বরানন্দজী ইংরেজীতে "ভারতীয় কৃষ্টির মূল" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলে স্বামী ওঁকারানন্দজী উহার বঙ্গানুবাদ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় দিবসে শ্রীপ্রভাত কুমার শেঠ ইংরেজীতে 'বর্তমানের উপযোগী শিক্ষা' এবং অধ্যাপক শ্রীসত্যাংশু মুখোপাধ্যায় 'ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতির ইতিহাস' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তৃতীয় দিবস অধ্যাপক শ্রীবলদেব উপাধ্যায় সুললিত হিন্দীতে 'কর্মজীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে এবং চতুর্থ দিবস স্বামী ওঁকারানন্দজী 'বর্তমান সমাজের অপূর্ণতা কোথায়?' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। পঞ্চম দিবস শ্রীকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় 'আচার্য বিবেকানন্দ' নামক প্রবন্ধে স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর বিস্তৃত আলোচনা করেন। অতঃপর শ্রীমতী সুভাষিণী দেবী, বি-এস্‌সি, বি-টি, 'ভারতের নারী' প্রবন্ধে হিন্দুর জাতীয় আদর্শে বর্তমান নারীদিগের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা যাইতে পারে উহার একটি নির্দেশ দেন। ষষ্ঠ দিবস স্বামী ওঁকারানন্দজী 'সার্বভৌম ধর্ম' সম্বন্ধে আর একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির নিয়ম, সার্বভৌম ধর্ম সার্বকালিক ও সার্বজনীন—ইহাই ছিল তাঁহার বক্তৃতার মূল কথা। সপ্তম দিবস প্রায় ২৫০০ দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত এবং অপরাহ্নে একটি বিরাট সভান্তে সাপ্তাহিক কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। এই সভায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্ চ্যান্সেলর ডক্টর জি পি মেহতা সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে বিভিন্ন বক্তা ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে স্বামীজী-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ অমলেন্দু বসু ইংরেজীতে, শ্রীসীতারাম ত্রিপাঠী হিন্দিতে বলেন। অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্তের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি ডাঃ মেহতা বলেন, ভারতের এক মহাদুর্গতির সময় ভগবান যেন গীতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ

সন্ন্যাসী বা সাধক ছিলেন না। নিজের মুক্তিও তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার আদর্শ ছিল সকল জীবের মধ্যে শিব বা নারায়ণকে অনুভব করা —তাঁহার সেবা করা, এবং সেই সেবার মধ্য দিয়া নিজের ও সকলের মুক্তিসাধনা। শ্রীপ্রভাত কুমার শেঠ ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৪শে মাঘ পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ-পাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাট্‌জুর পৌরোহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। বৈদিক স্তোত্র-পাঠের পর অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীনলিনবিহারী লাল সিংহ তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দজী রাষ্ট্রগঠনে স্বামীজীর অভিমত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—রাষ্ট্র যদি ঈশ্বর-বিষয়ে উদাসীন হয় তাহা হইলে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজেকে অপরের সেবায় বিলাইয়া দেওয়াই স্বামীজীর আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ। বিচারপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে ইহা বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণদেবের আদর্শই ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। যেদিন সত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হইবে সেই দিন বিপ্লবী হিসাবে পুরোভাগে থাকিবে স্বামী বিবেকানন্দের অমর নাম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ঋত্বিক। তিনিই ভারতের নরনারীকে আত্মচেতনায় ব্যাপকভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেন। সর্ব্বশেষে প্রদেশপাল ডাঃ কাট্‌জু বলেন, স্বামীজী যে ভাবধারার আলোকবর্তিকা আনয়ন করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন তাহা দেদীপ্যমান রাখিয়া প্রশংসনীয় ভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তিনি সভাস্থ জনমণ্ডলীকে আশ্রমের উন্নতি-কল্পে সর্ববিষয়ে অবহিত হইতে এবং সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া যথাশক্তি দানের দ্বারা আশ্রমটীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনুরোধ জানান। বিদ্যালয়ের ভূমিক্রয় ও গৃহনির্মাণাদির জন্য শিয়াড়শোলের রাজষ্টেট্ ১০০১৲, উখ্‌রা জমিদারি ষ্টেট্ লিমিটেড্ ১০০১৲, আসানসোলের গুরুবচন সিং আটোয়াল ১০০১৲ ও সাঁকতোড়িয়ার শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৫০১৲ দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩০শে মাঘ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী এবং স্থানীয় শ্রীপ্রীতিনিধান রায়, শ্রীকুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সুগায়ক শ্রীমান কৃষ্ণসূদন দাসের উদ্বোধন এবং সমাপ্তি সঙ্গীত সকলের উপভোগ্য হইয়াছিল। সভায় প্রায় এক সহস্র শ্রোতার সমাবেশ হয়।

উক্ত স্বামীজী স্থানীয় কলেজ, বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার এবং সোনাউল্লা হাই স্কুলেও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন।

পাটনা (বিহার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই আশ্রমে গত ৮ই মাঘ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্নে যথাবিধি পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, কীর্তনাদি হয়। মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সায়াহ্নে একটি আলোচনা-সভায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গান্তর্গত "দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ" এবং স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী" হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। তৎপর আশ্রমাধ্যক্ষ "স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিসাধনা ও মানবকল্যাণে তাঁহার অমূল্য অবদান" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শ্রীভূতনাথ সিংহ হিন্দীভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে সুগায়ক শ্রীভবানীচরণ মিত্র মধুর সঙ্গীত দ্বারা সভাস্থ সকলকে আপ্যায়িত করেন।

কাটিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই মাঘ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। প্রত্যূষে ঊষাকীর্তন, দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং হোমাদি, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, ভজন এবং স্বামীজীর জীবনী আলোচিত হয়।

কাঁথি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে তৃতীয় বার্ষিক সারস্বত সম্মেলন আশ্রম বিদ্যার্থি-ভবনের ছাত্রগণের উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ২১শে মাঘ স্থানীয় বিশিষ্ট সুরশিল্পীদের সমবায়ে শ্রীরামেশ্বর পাণ্ডা, এম্-এ, বি-এল্, কাব্যব্যাকরণতীর্থের সভাপতিত্বে সঙ্গীতবাসরের ও ২৩শে মাঘ শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক, এম্-এ, বি-এল্ এর সভাপতিত্বে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও কলেজের অধ্যাপকগণের সহযোগিতায় এক সাহিত্যবাসরের অধিবেশন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উভয় দিন ছয়শত নরনারী ও ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব—উপলক্ষে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব এই মঠে আগমন করেন। সভামণ্ডপে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি সুশোভিত ছিল। বহুসংখ্যক ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ও ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক শান্তিপাঠ ও গানের পর স্বামী শর্বানন্দজী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রী স্বাগত ভাষণের উত্তরে বলেন "আমার মতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ আলোকস্তম্ভসদৃশ। জাহাজের পরিচালক যেমন জলপথে যাইবার সময় আলোকস্তম্ভ দেখিয়া লক্ষ্য ঠিক রাখে, তেমনি ইহারা ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় ও সত্যের পথ দেখায়।" শ্রীউপেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নব প্রকাশিত গ্রন্থ

Mimamsa Paribhasa of Krishnayajvan — By Swami Madhavananda, Published by Swami Vimuktananda, Secretary, Ramakrishna Misson Sarada Pitha, Belur Math, Dt. Howrah, Pages 96, Price Rs. 2/-

এই গ্রন্থে কৃষ্ণযজ্বন্-কৃত মীমাংসাদর্শনের পরিভাষা দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত এবং ইংরেজীতে যথাযথ অনূদিত ও সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে এই আশ্রমে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি পরিচালিত মডেল হাইস্কুল ও সরস্বতী মন্দিরের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকমণ্ডলী, সাধু ও ভক্তবৃন্দ-সমক্ষে শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রতনলাল ঠাকুর গুজরাটীতে, ব্রহ্মচারী অশেষ চৈতন্যজী হিন্দিতে এবং শ্রীমৎ ওঁম্ স্বামীজী মহারাজ হিন্দি ও গুজরাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। পরিশেষে উপস্থিত ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী অশেষ চৈতন্যজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীরামকৃষ্ণভজনমণ্ডলী কর্তৃক সুমধুর ভজনসঙ্গীত গীত হয়। প্রসাদবিতরণান্তে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু-গত ১৭ই ফাল্গুন সুপ্রসিদ্ধ দেশ-প্রেমিকা বিদুষী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু হৃদ্-রোগে আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্ণৌ লাটভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। তিনি কর্মব্যপদেশে হায়দরাবাদে অবস্থান করিতেন। কন্যা সরোজিনী স্বদেশে ও বিলাতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাদ্রাজের ডাক্তার এম জি নাইডুর সহিত পরিণীতা হন। সরোজিনী একাধারে কবি, বাগ্মী, রাজনীতিজ্ঞা ও দেশনায়িকা ছিলেন। তাঁহার বহু বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। তিনি স্বাধীন ভারতে যুক্তপ্রদেশের প্রদেশপালের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্বশক্তি এবং বাগ্মিতার সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। সরোজিনী দেবী রচিত কবিতা-গ্রন্থের মধ্যে "The Golden Threshold" এবং "The Broken Wing" আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাব-ধারার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আহূত বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনে তিনি একদিন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়া-ছিলেন যে তাঁহার মনীষী পিতার ভবনে তিনি বাল্যকালে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে রাণী তরঙ্গিণী—গত ১১ই মাঘ খুলনা জেলার অন্তর্গত নুরনগরের মহারাজ বসন্তরায়ের সুপ্রসিদ্ধ যশোহর-রাজবংশীয় জমিদার স্বর্গীয় রাজা সুরথনাথ গুহরায়ের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিতা রাণী তরঙ্গিণী ৯০বৎসর বয়সে তাঁহার নুরনগরস্থিত ভবনে সজ্ঞানে পর-লোক গমন করিয়াছেন। তিনি উন্নতচরিত্রা মহীয়সী নারী ছিলেন। নুরনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভূমি তিনি দান করেন এবং নিজভবনে

শ্রীরামকৃষ্ণের শিলামণ্ডিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গত ২৮ বৎসর যাবৎ একনিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাত্যহিক সেবার্চনা ও সাধুসেবা করিয়াছেন। কবি শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায় কাব্যশ্রী তাঁহার একমাত্র পুত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসে কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে বেলুড় মঠের স্বামী অজয়ানন্দজী "স্বাধীন ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। সোসাইটি-ভবনে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী "স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের পূত জীবনী", শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত "স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কর্মময় জীবন ও শিক্ষা" এবং বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে 'দেশ'-সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন "শ্রীভগবানের রূপ" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত সোসাইটি-ভবনে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ", "শিবানন্দ-বাণী" (২য় ভাগ), ও "গীতা" ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিশ্বের সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান-সাধকের দায়িত্ব—এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে স্যার কে এস কৃষ্ণনের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশত্তম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইহার উদ্বোধন করেন। ভারতের ও বাহিরের নানাস্থান হইতে ছয়শতাধিক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার উদ্বোধন-ভাষণে বলেন, আমরা আজ এমন একটি যুগে বাস করিতেছি যে সময়ে মানুষ বিজ্ঞানের কথা বলে, বিজ্ঞানের স্তুতি করে এবং বিজ্ঞানের ভাষাতেই চিন্তা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অবদান অতি বিরাট এবং বৈজ্ঞানিকগণকে আজ উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর শক্তি নিবদ্ধ করিতে হইবে। গবর্নমেণ্টের মধ্যে থাকিয়া এবং ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশকে আজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্নমেণ্ট অনুভব করিয়াছেন যে, আজ বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভবপর নহে। তিনি বলেন, অগ্রগতির ধারা কোন পথে চালিত হইবে বিজ্ঞানকে তাহার ইঙ্গিত দান করিতে হইবে এবং তাঁহারা গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি হিসাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবেন। তবে প্রকৃত প্রয়োজন যে কেবলমাত্র অর্থ, প্রতিষ্ঠান বা সরকারী সুযোগ-সুবিধা তাহা নহে, যথার্থ মনীষাসম্পন্ন মানুষেরই আজ প্রয়োজন বেশী। তাঁহার বিশ্বাস, বর্তমানে বিজ্ঞান-জগতে বহু যুবক আছেন যাঁহারা যথার্থ মনীষাসম্পন্ন এবং তাঁহারা সুযোগ-সুবিধা পাইলে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবেন।

"আমি ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এখানে আসিয়াছি, বিজ্ঞান কংগ্রেসে আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতে এবং শুধু যে আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছি তাহা নহে, আপনাদের কার্যে গবর্নমেণ্টের ঐকান্তিক আগ্রহের কথাও জানাইতে আসিয়াছি। আমার দেশের এই শহরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সমারোহপূর্ণ অধিবেশন

হইতেছে, এলাহাবাদের নাগরিক হিসাবে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্যও আমি আজ এখানে আসিয়াছি। এলাহাবাদ শহরটিকে জ্ঞানসাধনার কেন্দ্রহিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতীতকালে বহু মানব জ্ঞানলাভের আশায় এখানে সমবেত হইত।

"বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু শুধু পরিমাপের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, উৎকর্ষের বিচারেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং তাহা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পরিমাপের ভাষায় চিন্তা করিলে ভারতের জনসাধারণ প্রকৃত বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান পাইবে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক কার্যের প্রয়োজন, ভাসাভাসা কাজে চলিবে না।

"আজ আমরা সর্বাপেক্ষা বেশী যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি তাহা হইল অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যা কেবলমাত্র রাজনীতির সমস্যা নহে। ইহা একটি মানবিক সমস্যা। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরাও ইহার সহিত জড়িত। বৈজ্ঞানিক-দের সব সময়েই অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের কথা চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে। কারণ এই সমস্যাই আজ সর্বাপেক্ষা বড় এবং ইহার সমাধান ব্যতীত তাঁহারা অন্য সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন না। অর্থনৈতিক সমস্যা যদিও প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের সহিত জড়িত নয়, তথাপি বিজ্ঞানীরা যে সব কাজ করিয়া থাকেন তাহার সহিত ইহা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং এই যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণও বটে। বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান সমস্যা হইতে বিজ্ঞানীরা আজ বিচ্ছিন্ন, ইহাতে আমি দুঃখিত।

"গত দুইশত বৎসর ধরিয়া যান্ত্রিক সভ্যতার যে নিদর্শন আমরা পাইয়াছি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এ সম্পর্কে কোন কিছু বলা সমীচীন হইবে না। এই সভ্যতা আমাদিগকে এতটুকুও অগ্রসর করে নাই। বরঞ্চ ইহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। যান্ত্রিক সভ্যতা জীবনের সহজ ছন্দ ও সামঞ্জস্যের পথগুলিকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। সামঞ্জস্যের অভাবে ইহা মানুষকে ভয়াবহ বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে। মৌলিক জ্ঞানসাধনা কি ভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কি ভাবে মানুষ মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে বৈজ্ঞানিকদের তাহা বুঝিবার মত মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকদের মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আপনারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্যার বিচার করিবেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীও আপনাদের থাকা চাই। বর্তমান বিশ্ব অতীতের তুলনায় উন্নততর। অতীতে সামঞ্জস্য ছিল নিম্নতর স্তরে। বর্তমানে সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু সামঞ্জস্য চাই উচ্চতর স্তরে। আমি চাই এই উচ্চতর স্তর ও সামঞ্জস্য—উভয়ই।

"বৈজ্ঞানিকগণ যেন ধ্বংসকর ও অকল্যাণকর শক্তিকে পুষ্ট না করেন এবং ধ্বংসকর শক্তি কি তাহা যেন উপলব্ধি করেন, বিরোধ ও ঘৃণার ঊর্ধ্বে থাকিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আত্ম-অনুভূতির দ্বারা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। বৈজ্ঞানিক সর্বোপরি একজন দার্শনিক। আবার দার্শনিক হইলেন বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীহীন দার্শনিকের কোনই মূল্য নাই। একটি পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন হইতে দার্শনিক মনকে বিমুক্ত করিলে নিছক বৈজ্ঞানিকের অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে। অবশ্য দর্শন বলিতে আমি শুধু তত্ত্ববিদ্যার কথা বুঝি না, দর্শন বলিতে আমি বুঝি মানবজীবনের সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপলব্ধি।"

আণবিক গবেষণায় ভারতবর্ষ—কিছু দিন হয় এলাহাবাদ বিজ্ঞান কংগ্রেসের

অধিবেশনের সভাপতি স্যার কে এস কৃষ্ণন্ তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "আণবিক শক্তির উন্নতি সাধনের সমস্যা আজ বিশ্বের সর্বত্রই বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। স্বভাবতঃই ভারতবর্ষ এবিষয়ে পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।" তিনি প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুকে সভাপতি করিয়া একটি আণবিক কমিশন গঠনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। এদেশের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল প্রধান মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণামন্দির স্থাপন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় রসায়নাগার প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু আইন সংশোধন বিল—ভারত সরকারের আইনসচিব ডাঃ বি আর আম্বেদকর ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু আইন সংশোধন বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। সিলেক্ট কমিটির ১৭ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও শ্রীযুক্তা অম্মু স্বামিনাথন্ সহ মোট ১১ জন সদস্য স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করিয়া মূল বিবরণীর সহিত মন্তব্য সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

কমিটি সুপারিশে বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি, এক জন নারী উত্তরাধিকারী ও এক জন পুরুষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য করার সাধারণতঃ কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কন্যা পুত্রের সমান অংশ পাইবে এইরূপ বিধানের সুপারিশ আমরা করিয়াছি।"

উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে কমিটি হিন্দু পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারসংক্রান্ত ক্রম-নির্ণায়ক তালিকায় নিম্নরূপ পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) মৃতব্যক্তির পৌত্র ব্যতীত ঐ পর্যায়ের অপর সকল আত্মীয়ের নাম নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর নামের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(২) বিধবা মাতা বা বিমাতা এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ ব্যতীত অপর সকল গোত্রজ বিধবার নাম নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৩) যে সকল উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হয় নির্ধারিত উত্তরাধিকারীর নামের তালিকায় তাহাদের নাম প্রেম ও প্রীতির সম্পর্কের নিবিড়তা অনুযায়ী নূতন করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। যুগপৎ উত্তরাধিকার-সম্পর্কে আমরা কয়েক শ্রেণীর আত্মীয় যথা : ভ্রাতা ও ভগিনী, পিতা ও মাতা প্রভৃতিকে একত্র তালিকাবদ্ধ করিয়াছি।

(৪) পিতাকে বাদ দিয়া ৫ পুরুষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারের সীমা নির্ধারণ করিয়া আমরা পিতৃকুলে এবং মাতৃকুলের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর সংখ্যা হ্রাস করিয়াছি।

(৫) মারুমাক্কাত্তায়ম্ অলিয়াসন্তান বা নম্বুদ্রি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সম্পর্কে যে ব্যতিক্রম আছে আমরা অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি। কারণ, আমরা মনে করি, সমগ্র দেশে যখন একরূপ আইন প্রচলিত করাই আমাদের লক্ষ্য, তখন উল্লিখিত আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রম রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

(৬) সম্পত্তির নীট মূল্য যদি ৫ সহস্র টাকার অধিক না হয়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী পাইবে এইরূপ বিধান করার যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। সুতরাং আমরা এই সম্পর্কিত বিধি বাদ দিয়াছি।

(৭) আমরা মনে করি, একজন নারী

উত্তরাধিকারী এবং একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে পার্থক্যের সাধারণতঃ কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কন্যা পুত্রের সমান অংশ পাইবে এইরূপ বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে।

(৮) হিন্দু নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিধান আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তবে কোন হিন্দুনারী সম্পত্তির আইনসঙ্গত উইল না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে মৃতা নারীর স্বামী এবং সন্তানদের একটি পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

(৯) যে যে কারণে উত্তরাধিকারে অযোগ্যতা নির্ধারিত হয় আমরা তাহা আরও ব্যাপক করিয়াছি। নিম্নরূপ কারণও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যথা: পিতার মৃত্যুর পূর্বে যে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিধবা পত্নী, বিধবা মাতা বা বিমাতা এবং ভ্রাতার বিধবা পত্নী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র গোত্রজ সপিণ্ড বিধবারাই উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

(১০) বর্তমান হিন্দু আইন বা অপর কোন আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির খোর-পোষের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না এইরূপ একটি বিধি আমরা অতিরিক্ত সংযোগ করিয়াছি।

জীবৎকালে কোন হিন্দুর তাহার কতিপয় আত্মীয় স্বজনকে ভরণপোষণের যে দায়িত্ব রহিয়াছে তৎসম্পর্কে কমিটি একটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করিয়া সন্তানবর্গ ও বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

অপর একটি কমিটি নূতন ধারায় কমিটি এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন যে কোন নারীর স্বামী সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইলে এবং স্ত্রীর এইরূপ ব্যয় নির্বাহের সংগতি থাকিলে তাঁহাকে অবশ্যই তাঁহার জীবৎকালে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা—ভারত গবর্নমেণ্টের শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন—ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রের শিক্ষার কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া চাই। উহার পক্ষে কোনরূপ বৈষম্য না করিয়া উহার সমস্ত অধিবাসীর জন্য একরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ইহার জাতীয় রূপ থাকা উচিত। ইহার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের প্রগতি ও সমৃদ্ধি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কোন দল বা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ বা বৈষম্য না করিয়া এইরূপ এক সাধারণ শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছে যে, যে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনরূপ শিক্ষার উপর জোর দেয় তৎসমুদয়ের অস্তিত্ব আবশ্যক। তবে ঐ সমুদয়ের দ্বার ঐরূপ শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো তাঁহার বিদ্যালয়ে খোদাই করিয়া রাখিয়াছিলেন—"যাহারা জ্যামিতি জানে না, তাহাদের এখানে স্থান নাই।" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেন এইরূপ কোন নিবারক বাক্য না থাকে। আমাদের নীতি এই হওয়া উচিত যে, "যাহারা জ্যামিতি জানে" এবং "যাহারা জানে না" উভয় প্রকার লোককেই সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে।

হিন্দী শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন "আলিগড়ে আধুনিক উর্দু সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্র অতীতের অপেক্ষা বিস্তৃততর হওয়া উচিত। হিন্দী সাহিত্যের প্রতিও আমাদের সমান আগ্রহ থাকা উচিত। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের জন্য মুসলমানদের খ্যাতি আছে। ভারতের হিন্দুদের নিকট হিন্দী সাহিত্যের যে দাবী আছে, মুসলমানদের নিকটও ঠিক সেই দাবী আছে। উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের বিকাশে উভয় সম্প্রদায়ের অবদান সমান। মুঘল শাসনকালে ব্রজ ভাষায় যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল উহা আকবর ও জাহাঙ্গির প্রমুখ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মহম্মদ জয়েসি, খান খানান্ এবং আবদুল জলিল বিলগ্রামী প্রমুখ প্রতিভাবান লেখকদের অবদানের ফল। আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন এরূপ মুসলমান কবিদের সংখ্যা অনেক। এখন ঐ প্রাচীন প্রথার পুনরুজ্জীবনের সময় আসিয়াছে। এরূপ বহুসংখ্যক লেখক সৃষ্টি করিতে হইবে যাঁহারা হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যে সমান পারদর্শী।

"লিপিসম্পর্কিত প্রশ্ন বর্তমান সময়ে একটি বিতণ্ডামূলক সমস্যা। এই সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত সকলের সুবিদিত। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা এই ছিল যে, প্রত্যেক ভারতীয় যেন উর্দু ও দেবনাগরী উভয় প্রকার লিপি জানে। সেইজন্য তিনি হিন্দুস্থানী প্রচার সভা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহার কর্মীদের পক্ষে উভয় প্রকার লিপি জানা অপরিহার্য করিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ আমার অভিমতও এই। আমার মতে বর্তমান অবস্থায় ইহাই একমাত্র সম্ভবপর সমাধান। আমি আশা করি উর্দু সাহিত্যের অনুরাগিগণ হিন্দী সাহিত্যানুরাগীদের প্রতিক্রিয়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা যাহা দেশের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করিবেন তাহাই করিবেন। জীবন-যাত্রার অপর সমস্ত ক্ষেত্রে অপরে কি করে, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অপরের জন্য অপেক্ষা করিলে নিজেদের সুনাম নষ্ট করা হইবে। যদি অপরে মাত্র একটি লিপি শিখিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে দুইটী লিপি শিখিয়াছি বলিয়া আমাদের দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, ভারতের প্রত্যেক মুসলমান উভয় প্রকার লিপি শিক্ষা করিয়া দেশে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুক। ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী ছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, মুসলমানগণ উৎসাহের সহিত ইহা কার্যে পরিণত করিবেন।"

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তাৎপর্য— বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশসহস্রাধিক ছাত্র ও অধ্যাপকের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গীতার নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিতে ইহা বুঝায় না যে ইহার অধিবাসিগণকে শুধু পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পূজারী হইতে হইবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানুষের নিকট হইতে মানুষকে দূরে রাখা ধর্মের অভিপ্রেত হইবে না। ধর্ম বলিতে মানুষের সংসার ত্যাগ বুঝায় না; ধর্মের অর্থ এই যে, মানুষ ধর্মের আদর্শসমূহ বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য জীবনধারণ করিবে।

ধর্মের আদর্শগুলি রাষ্ট্রের নবজীবন সঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ভগবদ্গীতায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহ বিবৃত হইয়াছে। গীতা এই শিক্ষা দেন যে, ধর্ম মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে না; গীতায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য জীবনের প্রতি সক্রিয় অথচ অনাসক্ত আগ্রহ থাকা উচিত।"

সূর্যের উত্তাপ সৃষ্টি—"পৃথিবীতে সূর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ পরমাণু বোমার দ্বারা সৃষ্টি করা যাইতে পারে"—বাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর স্যার জে সি ঘোষ নয়াদিল্লী কেমিকেল সোসাইটিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ ঘোষ বলেন যে, এক লক্ষ ডিগ্রি উত্তাপ পরমাণু বোমার দ্বারা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। আইনষ্টাইনের মত উদ্ধার করিয়া তিনি বলেন যে, পৃথিবী সূর্যের একটি অংশই ছিল এবং দুইশত কোটি বৎসর সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরে ইহার উত্তাপ হ্রাস হওয়ার ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। হাইড্রোজেন কার্বন ও অক্সিজেন প্রতিক্রিয়ার ফলেই পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। হাইড্রোজেন এত হাল্কা পদার্থ যে তাহা পৃথিবীর বায়ুস্তরে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। এমন কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সূর্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন খরচ করিয়া ফেলিতেছে এবং এক দিন যদি সমস্ত বিশ্বে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয় তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই; বরং ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, একদিন সূর্যের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত হাইড্রোজেন ফুরাইয়া যাইবে। সৃষ্টির আদিক্ষণে সূর্যের মধ্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন ছিল তাহার শতকরা ৭০ ভাগ ইতোমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। যে ৩০ ভাগ হাইড্রোজেন এখনও আছে তাহা নিঃশেষিত হইতে প্রায় একশত কোটী বৎসর লাগিবে।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীর উন্নয়ন-পরিকল্পনা—ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এয়ার মার্শাল স্যার টমাস ডব্লিউ এলমহার্ষ্ট নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন—"বিমানবাহিনীর লড়াইয়ে ও ভারবাহী এবং পর্যবেক্ষণকারী উভয় প্রকার স্কোয়াড্রনগুলি কাশ্মীর যুদ্ধে ও হায়দরাবাদে শান্তি অভিযানে সামান্য কাজ করে নাই। এই দুই ব্যাপার শেষ হওয়ার পর লড়াইয়ে স্কোয়াড্রনগুলি রাডার ও রাডার-কণ্ট্রোল সাহায্যে শত্রুবিমানের গতিরোধ সম্বন্ধে শিক্ষায় অতি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিমানচালনা-বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভার্থ শিক্ষার্থীদিগকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে পাঠাইবার জন্য এক পরিকল্পনা আছে। মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থীদিগকে যুক্তরাষ্ট্রে যন্ত্রবিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ দিবেন।

"অফিসারদের জন্য একটি ষ্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নীলগিরিস্থ বর্তমান মিলিটারী ষ্টাফ কলেজে এই বৎসরের মে মাস হইতে বিমান-বিভাগের অফিসারদের জন্য একটি বিশেষ ক্লাস খোলা হইবে। বিমানবাহিনীর বাছাই করা অফিসার ও বৈমানিকদিগকে যন্ত্রবিজ্ঞান-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দিবার জন্য একটি টেকনিক্যাল কলেজ স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, এই বৎসরের মধ্যেই কলেজ চালু হইবে। যাহাতে বৈদেশিক বিমানবাহিনী-গুলির আধুনিকতম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভারতে বিমানবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে তথ্য সরবরাহ করা যায়, তজ্জন্য বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে ও হাইকমিশনারদের অফিসগুলিতে বিমানবাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইতেছে।

"বর্তমান বিমানবাহিনী ক্ষুদ্র বলিয়া উহার কার্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যে রাষ্ট্র যত বড় বিমানবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে, উহার তদপেক্ষা বৃহত্তর বিমানবাহিনী থাকিতে পারে না। বর্তমান বিমানবাহিনীর সম্প্রসারণ ভারত-গবর্নমেণ্টের নির্ধারণসাপেক্ষ। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর সম্প্রসারণে ইংলণ্ড সম্ভবপর সর্বপ্রকার সাহায্য করিবে।

"ভারতীয় বিমানবাহিনীতে এখন দশজন বৃটিশ অফিসার আছেন। তাঁহারা সকলেই যন্ত্র-বিজ্ঞানবিভাগে নিযুক্ত; প্রধান সেনাপতি ব্যতীত এই সমস্ত অফিসারদের মধ্যে কেহই পরিচালনামূলক পদে নিযুক্ত নহেন।

"তাঁহারা যে যান্ত্রিক শিক্ষা দিতে চাহেন উহার মান ইউরোপের যে কোন দেশের শিক্ষার মানের সহিত তুলনীয়। বিমানচালনা-বিষয়ক যান্ত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে ভারত বর্তমান সময়ে বৃটেনের নিকট হইতে অগ্রাধিকার লাভ করিতেছে।

"দিল্লীর ৫ মাইলের মধ্যে শুধু বিমানবাহিনীর লোকদের শিক্ষার জন্য একটি বিমানক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে। উহা দুই বৎসরের মধ্যে ব্যবহারোপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উহা সম্পূর্ণ হইলেই পালাম বিমান বন্দর অসামরিক বিমান বিভাগের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। দুর্গম ভূপৃষ্ঠ এবং বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থা বিবেচনা করিলে তাহারা পৃথিবীর যে-কোন বিমানবাহিনীর সহিত খুব ভালভাবে তুলিত হইতে পারে।

"বিমানবাহিনীর লোকদের বেতনের হার পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা গবর্নমেণ্টের নাই। তাঁহারা বিমানবাহিনীর জন্য নিযুক্ত লোকদিগকে সরকারী ব্যয়ে ৯ বৎসরকাল যান্ত্রিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর তাহারা বিমানবাহিনীতে থাকিতে চাহিলে থাকিতে পারিবে। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে কোন নারী নাই।"

ভারতের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন—১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া ভারতের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠিত হইবে বলিয়া চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ঐ বাহিনীতে লোক নিয়োগ করা হইবে। জাতি-নির্বিশেষে অপটু শ্রমিক হইতে উচ্চ শিক্ষিত কারিগর প্রভৃতি সকল ভারতীয় যুবকই এই বাহিনীতে অবসরকালে যুদ্ধবিদ্যা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে। শিক্ষার্থীদিগের বয়স অনূ্যন ১৮ ও অনধিক ৩৫ বৎসর হওয়া চাই। তবে লড়াই-ফেরৎ ও অভিজ্ঞ কারিগরদের ক্ষেত্রে উক্ত বয়স-সীমার কড়াকড়ি হ্রাস করা হইবে।

প্রয়োজনের সময় নিয়মিত সৈন্যদের সাহায্যের জন্য আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে একটি আইন পাশ করা হয়। যুদ্ধকালে এই বাহিনীর উপরে বিমানবিধ্বংসী ও উপকূল রক্ষা ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া জাতীয় বিপৎকালে এই বাহিনী নিয়মিত সৈন্য-বাহিনীর সহিত একযোগে কাজ করিতে পারিবে।

ভারতের আঞ্চলিক সেনাবাহিনী একটি অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান হইলেও এখানে নিযুক্ত প্রত্যেকটি লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ও দৈহিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহাদিগকে সামরিক নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়া হইবে। নিযুক্ত লোকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাহাদের শিক্ষাকালের তারতম্য হইবে। শহরাঞ্চলে শিক্ষার্থীদিগকে দিনের সাধারণ কাজকর্মের পর অথবা সপ্তাহের শেষভাগে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তবে তাহাদিগকে অল্পদিনের জন্য বার্ষিক শিক্ষাকেন্দ্রেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদিগকে সুদূর পথ অতিক্রম করিতে হয় এবং কৃষির সময়ে তাহাদের কোনও অবসর থাকে না। সেইজন্য তাহাদিগকে একমাত্র বার্ষিক শিক্ষাকেন্দ্রেই একযোগে বেশী দিন শিক্ষা দেওয়া হইবে।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার অনুসারে ভারতের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। এ বিষয়ে ১৯২০ সনে একটি আইনও পাশ করা হইয়াছিল। ১৯২৯ সনে ঐ আইনটির সংশোধন করিয়া আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ করা হয়। প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর—প্রাদেশিক পদাতিক বাহিনী, শহরাঞ্চলের দল ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদল—লোক লইয়া এই বাহিনীটি গঠিত। সর্বপ্রথমে ৮টি প্রাদেশিক দল লইয়া বাহিনীটি গঠিত হইয়াছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উহাদের সংখ্যা ২০টি হয়। যুদ্ধকালে ইএ বাহিনীর অধিকাংশ লোক নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া প্রত্যেক রণক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে।

আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের উদ্দেশ্যে ভারতকে নিম্নলিখিত আটটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে।

১। দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব, রাজস্থান, মৎস্য ইউনিয়ন, মধ্যভারত, ভূপালরাজ্য, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব ইউনিয়ন এবং হিমাচল প্রদেশ।

২। যুক্তপ্রদেশ, কাশী রাজ্যসমূহ, রামপুর ও তেহরী গারোয়াল রাজ্য এবং বিন্ধ্য প্রদেশ।

৩। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং উক্ত প্রদেশান্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহ।

৪। বোম্বাই বরোদা ও কোলাপুর রাজ্যদ্বয় এবং সৌরাষ্ট্র।

৫। মাদ্রাজ ও মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহ, কুর্গ, মহীশূর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য।

৬। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য এবং উক্ত প্রদেশদ্বয়ান্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহ।

৭। পশ্চিমবঙ্গ।

৮। আসাম ত্রিপুরা মণিপুর ও কুচবিহার।

ব্রিগেডিয়ার গুরদয়াল সিং আঞ্চলিক বাহিনীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে উহার সাহায্য ও পুনর্বসতি সাব-কমিটির এক অধিবেশনে আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধান অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর পুনর্বসতি সাব-কমিটিতে স্থির হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রতিনিধিমণ্ডলী পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার সমাধান-কল্পে উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা করিবেন।

সাব কমিটিতে আরও স্থির হয় যে, এই আলাপ-আলোচনার পর প্রয়োজন হইলে এই সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরিত হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সম্মিলিতভাবে—

(১) বাস্তুত্যাগ বন্ধের চেষ্টা করিবেন।

(২) যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থী ইতোমধ্যে আসিয়া গিয়াছে তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

(৩) খাদ্যসাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর কিছু কালের জন্য তাহাদের কোন না কোন কাজের বন্দোবস্ত করিবেন।

সাব-কমিটি আশ্রয়প্রার্থীদিগকে যথাসত্বর পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন বলিয়া মন্ত্রিসভার সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহারা পতিত জমি দখলের প্রসঙ্গও উত্থাপন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ইতোমধ্যে সাব-কমিটি বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কে কোন বৃত্তির উপযুক্ত তাহার এক খতিয়ান রচনা এবং তদনুসারে কাজ দিবার আয়োজন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শীঘ্রই এক বিবরণী প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান

সম্পাদক

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতবর্ষ ছোট বড় বহু দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত। এই রাজ্যসমূহের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত অনৈক্য ও বিরোধ ভারতের পরাধীনতা ও জাতীয় অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ। ইংরেজের আমলে ভারতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ১৯৪১ সনের আদম সুমারি অনুসারে ৫৬২টি। ইহাদের আয়তন ৭,২৫,৯৬৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৯,৩১,৮৯, ২৩৩। এই আয়তন ও জনসংখ্যা সমগ্র ভারতের আয়তনের ৪৫ ভাগ এবং জনসংখ্যার ২৪ অংশ।

দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবৃন্দ বংশানুক্রমে রাজ্যশাসন করিতেছেন। এই গুলিতে প্রধানতঃ রাজতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি (Monarchism) প্রচলিত। এই রাজ্যসমূহে সার্বভৌম বৃটিশ প্রাধান্য (British Paramountcy) ছিল। ইহাদের কোন আন্তর্জাতিক সত্তা ছিল না এবং এখনও নাই। ইংরেজ-রাজ এই রাজ্যগুলির কেবল রক্ষণ-ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন না, অধিকন্তু ইহাদের শাসকনির্বাচনে ও আভ্যন্তর সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেন।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইলে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে এই দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশের অধীনতা-পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। উক্ত মিশন এই রাজ্যগুলির রাজন্যমণ্ডলীকে পার্শ্ববর্তী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্রে যোগদান করিয়া উহার হস্তে রাজ্যের রক্ষণ (Defence) বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ ও পূর্তবিভাগ এবং এই তিনটি বিভাগ পরিচালনের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার ভারার্পণ করিতে পরামর্শ দেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতের শত্রুগণ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত ও দুর্বল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে রাজন্যগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে প্ররোচিত করেন। সুখের বিষয় যে, এতগুলি রাজ্যের মধ্যে মুসলমান রাজ্য জুনাগড় ও হায়দরাবাদ ভিন্ন কোন রাজ্যের অধিপতিই ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ভারত গবর্নমেন্টের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ঐকান্তিক চেষ্টায় পাকিস্তানের অন্তর্গত বাহাওয়ালপুর খয়েরপুর দীর সোয়াৎ চিত্রল কোহাট লাসবেলা এবং বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান দেশীয় রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্তর্গত হিন্দু মুসলমান সকল দেশীয় রাজ্যই ভারতের স্বাধীনতা-লাভের

পর কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। এই রাজ্যসমূহের রাজন্যবৃন্দ পূর্বোক্ত সর্ত কয়টি ব্যতীত তাঁহাদের রাজ্যে জনপ্রিয় (popular) শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেও সম্মত হইয়াছেন। জুনাগড়ের নবাব সাহেব প্রথমতঃ পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যের সংখ্যাবহুল হিন্দু অধিবাসিগণ সংঘবদ্ধভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় কয়েক মাস পরই তাঁহাদের ভোটাধিক্যে এই রাজ্যটি বাধ্য হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের নিজাম সাহেব আভ্যন্তর ও বাহ্য প্ররোচনায় তাঁহার রাজ্যকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হয় ভারত-সরকার এই রাজ্যটি অধিকার করিয়া তথায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই রাজ্যের শতকরা ৮২ জন অধিবাসীই হিন্দু। কাজেই তথায় গণভোট গৃহীত হইলে এই রাজ্যটি যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার আয়তন ৮২,৩১৩ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১,৯৬,৩৬,১৫৭ এবং বার্ষিক রাজস্ব ১৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইতে আগ্রহান্বিত। হিন্দুরাজশাসিত এই রাজ্যটির শতকরা ৭৭.১ জন অধিবাসী মুসলমান। এই কারণে পাকিস্তান গবর্নমেণ্ট ইহাকে পাকিস্তানভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাতে এই রাজ্যের পক্ষে ভারত-গবর্নমেণ্ট বাধা প্রদান করেন। বর্তমানে ইউ এন ও কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ স্থগিত আছে। এই রাজ্যটি ভারত কি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা তথাকার গণভোট-সহায়ে নির্ণীত হইবে। ইহার আয়তন ৮৪,৪৭৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪০,২১,৬১৬ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের পরই বরদা মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর কোচিন প্রভৃতির স্থান। এই সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে।

ইতোমধ্যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। উড়িষ্যার পূর্বাঞ্চলের ২৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথমে ঐ প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহাদের আয়তন ২৪,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৯৯ লক্ষ টাকা। ইদানীং ময়ুরভঞ্জ রাজ্যও এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। ঐ সনের জানুয়ারী মাসে ১৪টি ছত্রিশগড় দেশীয় রাজ্য মধ্যপ্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই রাজ্যসমূহের আয়তন ৩২,০০০ বর্গ মাইল। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশীয় রাজ্য মাক্রাই (১৫১ বর্গ মাইল) মধ্যপ্রদেশের সহিত, বাঙ্গানাপল্লী (২৫৯ বর্গ মাইল) মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত, লোহারু (২২৬ বর্গ মাইল) ও পটৌড়ি (৫৩ বর্গ মাইল) পূর্ব-পাঞ্জাবের সহিত এবং এইগুলি অপেক্ষা বৃহৎ দেশীয় রাজ্য পুডোকোটা (১১৮৫ বর্গ মাইল) ঐ সনের মার্চ মাসে মাদ্রাজ প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোলাপুর ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের ১৬টি দেশীয় রাজ্য (৭৬৫১ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ) এবং গুজরাটের বিলাসিনার কাম্বে ছোটউদয়পুর ধরমপুর প্রমুখ ১৮টি দেশীয় রাজ্য এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য (১৯০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষাধিক) বম্বে প্রদেশের সহিত একীভূত হইয়াছে। এই রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ তাঁহাদের রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিতে সম্মত হইয়াছেন। বরদা রাজ্যকেও

বোম্বাই প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করিবার কথাবার্তা চলিতেছে। স্থির হইয়াছে যে, টিহিরী গাড়োয়াল ব্যতীত পূর্ব-পাঞ্জাবের পার্বত্য দেশীয় রাজ্যসমূহের সমবায়ে হিমাচল প্রদেশ নামক একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে। এই প্রদেশ ১১,০০০ বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ। বেনারস রামপুর (যুক্তপ্রদেশ), জয়সালমার (রাজপুতনা), কোচবিহার, ত্রিপুরা, খাসিয়ার পার্বত্য রাজ্যসমূহকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।

কাথিওয়ার এবং রাজপুতনার কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সমবায়ে দুইটি ইউনিয়ন করিয়া দুইজন শাসক সভাপতি (Ruler President) বা রাজপ্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে কাথিওয়ার প্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আন্দোলন আরম্ভ হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে এবং নয়ানগরের জাম সাহেব ও ভবনগরের মহারাজের চেষ্টায় ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৩টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রাজ্য, ১০৭টি ক্ষুদ্র রাজ্য এবং ছোট ছোট তালুকসহ বিভিন্ন ধরনের মোট ৮৬০টি (পরগনা) লইয়া একটি সৌরাষ্ট্র রাজ্য ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৩১,৮৮৫ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮ কোটি টাকা। ইহার পার্শ্ববর্তী কচ্ছের দেশীয় রাজ্যসমূহকে সরাসরি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শে আলোয়ার ভরতপুর ধোলপুর ও কুরৌলি এই চারিটি দেশীয় রাজ্যের অধিপতিগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া মৎস্য যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ৭৬০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ এবং বার্ষিক আয় প্রায় ৩ কোটি টাকা। এই মাসে কোটা বনসাওরা বুন্দি ডোঙ্গরপুর ঝালোয়ার কিষণগড় প্রতাপগড় সাপুরা টঙ্ক বেওয়ার ও উদয়পুর এই কয়টি দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে 'রাজস্থান যুক্তরাজ্য' গঠন করা হইয়াছে। উদয়পুরের মহারাজা ইহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এই যুক্তরাজ্যের আয়তন ১৩,১৭০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৯ লক্ষাধিক এবং রাজস্ব প্রায় ১২॥০ কোটি টাকা। মালোয়া গোয়ালিয়র প্রমুখ কতকগুলি দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া মালোয়া বা মধ্যভারত ইউনিয়ন নামক একটি বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছেন। ইহার আয়তন ৪৬,৩০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৭২ লক্ষ এবং বার্ষিক রাজস্ব ৮ কোটি টাকা। ১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে রেওয়া ও ৩৪টি বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের সমবায়ে বিন্ধ্যপ্রদেশ যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ২৪,৬১০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষ এবং বার্ষিক রাজস্ব ২॥০ কোটি টাকা। এতদ্ভিন্ন পাতিয়ালা কর্পূরতলা নাভা ফরিদকোট ঝিন্দ মালেরকোটলা নলগড় কালসিয়া এই কয়টি দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে পূর্ব-পাঞ্জাব যুক্তরাজ্য গঠিত হইয়াছে। পাতিয়ালার মহারাজা ইহার রাজপ্রমুখ এবং কর্পূরতলার মহারাজা উপরাজ-প্রমুখ নির্বাচিত হইয়াছেন।

এই ভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর অত্যল্প কালের মধ্যেই দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান যথার্থই অতীব বিস্ময়কর। ইহার ফলে বহু কালের খণ্ডিত বিখণ্ডিত ভারতবর্ষ এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ও অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে। এই মহান কার্য সংসাধনে কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট তথা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দুরদর্শিতা ও কর্মকুশলতা এবং রাজন্যবৃন্দের স্বদেশপ্রেম ও ত্যাগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এখন ভারতবর্ষস্থ ফরাসী গবর্নমেণ্টের চারিটি এবং পর্তুগীজ গবর্নমেণ্টের তিনটি ক্ষুদ্র কলোনী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেই স্বাধীন ভারতের একত্ব ও অখণ্ডত্ব সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে। স্বাধীন ভারতকে বৈদেশিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার জন্য ইহা অতি শীঘ্র কার্যে পরিণত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তটি "দেবীসূক্ত" নামে অভিহিত হয়। এই সূক্তের ঋষি অম্ভৃণকন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। ইহাতে আদ্যাশক্তি জগজ্জননী মহাদেবী নিজের স্বরূপ ও মহিমা বিবৃত করিয়াছেন। সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) পাঠান্তে দেবীসূক্ত অবশ্য পঠনীয়। চণ্ডীতেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য দেবীসূক্ত জপ করিয়া জগদম্বিকার দর্শনাভিলাষে তপস্যা করিয়াছিলেন :—

"স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।"

দেবীসূক্তে দেবীর কোনও বিশেষ নামের উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদের পরিশিষ্টে রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্টের দ্বাদশ ঋকে "দুর্গা" নামের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই —

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ
সুতরসি তরসে নমঃ॥"

'যিনি অগ্নিবর্ণা, তপঃশক্তিতে জাজ্বল্যমানা ও স্বপ্রকাশা, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গরূপ কর্ম্মফল লাভের নিমিত্ত যিনি সেবিতা হইয়া থাকেন, সেই দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে পরিত্রাণকারিণী, সংসারসাগর পার হইবার জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি।'

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে "দুর্গা-গায়ত্রী" পাওয়া যায়—

"কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।"

সায়ণাচার্য্য বলেন, 'দুর্গা' শব্দ স্থলেই এখানে 'দুর্গি' প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই মন্ত্র দ্বারা কাঞ্চনবর্ণাভা, ইন্দুখণ্ডভূষিতমস্তকা আগমপ্রসিদ্ধা দুর্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। (হেমপ্রখ্যাম্ ইন্দুখণ্ডাঙ্কমৌলিম্ ইত্যাগমপ্রসিদ্ধ-মূর্ত্তিধরাং দুর্গাং প্রার্থয়তে।)

কেন উপনিষদে আমরা "হৈমবতী উমার" পরিচয় পাই। ইনি ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা। মোহান্ধ দেবতাগণকে ইনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। হিমবৎকন্যা উমা দুর্গারই নামান্তর মাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন "পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ব্রহ্মের পরমাশক্তি নানা নামেই অভিহিতা হইয়া থাকেন। (৬।৮)

মহানারায়ণ উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে, "—দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে" (৬।৩)—আমি দুর্গাদেবীর শরণ লইতেছি।

মহাভারতের দুইস্থানে দুইটি দুর্গাস্তব দেখিতে পাই; প্রথমটি বিরাট পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে। দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পাণ্ডবেরা বিরাট রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে যুধিষ্ঠির ঋষিদের উপদেশমত অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের নিমিত্ত দুর্গাদেবীর স্তব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্তবটি মহাবীর অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মত পাঠ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রপ্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

"শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়॥"

তুমি শুচি ও যুদ্ধভূমির অভিমুখী হইয়া শত্রু-পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্তোত্র উচ্চারণ কর।

মহাভারতোক্ত স্তোত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, "দুর্গা যশোদাগর্ভসম্ভূতা, নন্দগোপকুলে জাতা, বাসুদেবের ভগিনী। কংস তাঁহাকে শিলাতটে নিক্ষেপ করিলে তিনি আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুমারী, ব্রহ্মচারিণী এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতনিবাসিনী। তিনি মহিষাসুরনাশিনী, মদ্য মাংস ও পশুবলি প্রিয়া। তিনিই কালী, কপালী, মহাকালী এবং চণ্ডী।"

মৎস্য পুরাণ, কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মহাভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও উপপুরাণে ভগবতী দুর্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ, দেবী-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপূজা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। শেষোক্ত পুরাণটি বর্ত্তমানে প্রাপ্ত না হইলেও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি অংশ পাওয়া যায়। প্রচলিত মৎস্যপুরাণে দুর্গাপূজা পদ্ধতি অংশটি পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূজাপদ্ধতি না থাকিলেও তাহাতে যে দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) রহিয়াছে তাহা দুর্গাপূজায় অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। কালীবিলাসতন্ত্রে শারদীয়া দুর্গাপূজার বিবরণ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে।

একাদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব বিষয়ে বহু নিবন্ধ রচিত হয়। জিকন ও বালক (বা বালরূপ) নামক দুইজন বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারের দুর্গোৎসব-বিষয়ক নিবন্ধ ছিল। শূলপাণি তাঁহার "দুর্গোৎসব-বিবেকে" ইঁহাদের নিবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইঁহারা প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীমূতবাহন তদীয় "কালবিবেক" নামক গ্রন্থের একাংশে "দুর্গোৎসব-নির্ণয়" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকার শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০ খ্রীঃ) দুর্গোৎসব সম্বন্ধে তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়, যথা—(১) দুর্গোৎসববিবেক, (২) দুর্গোৎসব-প্রয়োগবিবেক ও (৩) বাসন্তীবিবেক। শ্রীনাথ আচার্য্যচূড়ামণি (১৪৭০-১৫৪০ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন। তিনি "দুর্গোৎসব-বিবেক" নামক নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার রচিত কৃত্যতত্ত্বার্ণব ও কৃত্যকাল-নির্ণয়েও দুর্গোৎসব প্রকরণ রহিয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকৃত (১৫০০-১৫৭৫ খ্রীঃ) তিথিতত্ত্বে "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" নামক প্রকরণ আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি "দুর্গাপূজাতত্ত্ব" নামক একখানি পৃথক্ নিবন্ধও রচনা করেন। ইহার দুইভাগ—(১) দুর্গাপূজা প্রমাণতত্ত্ব এবং (২) দুর্গাপূজা-প্রয়োগতত্ত্ব। তাঁহার পরবর্ত্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণ; ইঁহার রচিত নিবন্ধের নাম দুর্গার্চ্চন-কৌমুদী।

মৈথিল নিবন্ধকারদের মধ্যে বিদ্যাপতি (১৩৭৫-১৪৫০ খ্রীঃ) রচিত "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা মিথিলাধিপতি ধীরসিংহ রূপনারায়ণের আদেশে সঙ্কলিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী মৈথিল নিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০ খ্রীঃ) রচিত "কৃত্যচিন্তামণি" নামক নিবন্ধে দুর্গোৎসব প্রকরণ রহিয়াছে। তাঁহার রচিত অপর নিবন্ধের নাম "বাসন্তীপূজাপ্রকরণ"।

কামরূপ বা আসামেও দুর্গোৎসব-বিষয়ক নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। কামরূপীয় নিবন্ধের অন্তর্গত "দুর্গোৎসব-প্রকরণ" উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রামচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক রচিত "দুর্গোৎসব-চন্দ্রিকা" নামক নিবন্ধও দৃষ্ট হয়।

রঘুনন্দনের পূর্ব্ব হইতেই দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ

প্রভৃতি পুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দনের "দুর্গাপূজা প্রয়োগ" রচিত হইবার পরেও সকলেই স্ব স্ব কৌলিক রীতি অনুসারে পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসরণক্রমেই পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে রঘুনন্দনের "দুর্গাপূজা-প্রয়োগ" তেমন প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু দুর্গাপূজা সম্বন্ধে ব্যবস্থার জন্য সকলেই রঘুনন্দনের "দুর্গোৎসবতত্ত্বের" উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে যতদূর পর্য্যন্ত রঘুনন্দনের মতের প্রসার ততদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক পদ্ধতিক্রমে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টে, ময়মনসিংহের উত্তরভাগে ও নোয়াখালি জেলার অনেকাংশে, রঘুনন্দনের প্রভাব যেখানে নাই, সেখানে মিথিলার "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর" মতেই দুর্গাপূজা হয়। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও তান্ত্রিকমতেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা, বিহার এবং আসামের বাহিরেও ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। পশ্চিমভারতে ইহা "নবরাত্রিব্রত" নামে পরিচিত। "রাত্রি" শব্দে তিথি বুঝায়। ঘটের সম্মুখে নয়দিন সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) পাঠ হয়; দশমীতে ঘটের বিসর্জ্জন। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে নবরাত্রি উৎসবের সময় নারীরা "গর্ব্বা" নৃত্য করে। একটি শতছিদ্র শ্বেতরঞ্জিত মৃৎপাত্রের ভিতর প্রজ্বলিত দীপ রাখিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া নারীরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে করিতে গান করে। এই নৃত্য ও গীতের নামই "গর্ব্বা"। দক্ষিণভারতের দেবীমন্দির সমূহেও ভগবতীর পূজা ও সপ্তশতীস্তব পাঠ হইয়া থাকে। সেখানে শরৎ ও বসন্ত ঋতু এই দুই সময়েই শারদা ও বাসন্তীর পূজা হয়। মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে দেবী ভগবতীর পূজা প্রথা বাঙ্গলা, বিহার ও আসামেই প্রচলিত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার তিথিতত্ত্বের দুর্গোৎসব তত্ত্বপ্রকরণে বলেন, শারদীয়া দুর্গাপূজার নিম্নোক্ত সাতটি কল্প বা বিধি আছে। ইহাদের মধ্যে শক্তি অনুসারে যে কোন একটি কল্প অবলম্বন করিয়া পূজা করিতে হইবে। (১) কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে দেবীর বোধন করিতে হয়; তদবধি আশ্বিনের শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত ১৬দিন পূজা করিতে হয়। (২) প্রতিপদাদি কল্প—আশ্বিনের শুক্লাপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্য্যন্ত এই নয় দিন পূজা করিতে হয়। প্রতিপদে দেবীকে কেশ-সংস্কার দ্রব্য দিতে হয়। দ্বিতীয়ায় কেশবন্ধনের পট্টডোর, তৃতীয়ায় পদরঞ্জনের জন্য অলক্তক, ললাটের জন্য সিন্দুর, মুখ দর্শনের জন্য দর্পণ; চতুর্থীতে মধুপর্ক, তিলক দ্রব্য, নেত্রের কজ্জল; পঞ্চমীতে অগুরু চন্দন প্রভৃতি অঙ্গরাগ দ্রব্য ও অলঙ্কার দিতে হয়। (৩) ষষ্ঠ্যাদিকল্প—সন্ধ্যা-কালে বিল্বশাখায় দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস। পূর্ব্বোক্ত তিন কল্পেই ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ঘটে পূজা এবং সপ্তমী হইতে তিন দিন মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা করিতে হয়। (৪) সপ্তম্যাদি কল্প—পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিমার পার্শ্বে নব পত্রিকা স্থাপন; সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত তিন দিন পূজা। (৫) মহাষ্টম্যাদি কল্প—অষ্টমী, নবমী এই দুইদিন পূজা এবং দশমীতে বিসর্জ্জন। (৬) মহাষ্টমী কল্প—কেবল অষ্টমীতেই পূজা এবং সেইদিনই বিসর্জ্জন। (৭) মহানবমীকল্প—কেবল সেইদিনই পূজা ও বিসর্জ্জন। অষ্টম্যাদি, কেবল অষ্টমী ও কেবল নবমী এই তিনকল্পে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়।

শাস্ত্রকারগণ বলেন, সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ কল্পের যে কোন একটি কল্পকে আশ্রয় করিয়া শারদীয়া মহাপূজা প্রত্যেকেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অসাম্প্রদায়িক উদারতা

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অমর স্মৃতি, অনশ্বর আদর্শ এই দীর্ঘ সাড়ে তিন শ' বছর ধরে বাংলাকে সুরভিত ক'রে রেখেছে। বাংলার আকাশ এখনো সেই স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল, বাংলার বাতাস এখনো সেই আদর্শের তূর্যনাদে মুখরিত। বাঙালীর হৃদয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য যে স্বাধীনতার শিখা জ্বালিয়েছিলেন, সে শিখা আজও অম্লান জ্যোতিতে জ্বল্‌ছে। পুরুষের পর পুরুষ গত হ'য়েছে কিন্তু বাঙালী-সমাজ দীপাধার থেকে দীপাধারে সেই পবিত্র হোমানল-শিখা ব'য়ে ফিরেছে। আজ বাঙালী সকল তনুমন দিয়ে সমগ্রভাবে দেখ্‌বার পরিপূর্ণ অধিকার ও অবকাশ পাচ্ছে, শতাব্দীর তমসাজাল ছিন্ন ক'রে বাংলার একমাত্র শেষ স্বাধীন নৃপতি বীরর্ষভ প্রতাপাদিত্যকে।

তাঁর দেশপ্রেমের, তাঁর বীরত্বের, তাঁর আত্মোৎসর্গের শাশ্বত কাহিনী জাতির মুখে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে। সে ঝংকার, সে সংগীত ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্মরণ করিয়ে দেবে যে, স্বাধীনতা—যে মুক্তির আলোর স্পর্শ তা'রা পেল—সে আলোর রূপ, সে আলোর রাঙিমা ফুটে উঠেছিল চার শতাব্দী আগে এক বাঙালী প্রতাপের রক্তে। নূতন ঊষার সে আলোককে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে তা'দের স্মরণ হ'বে যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের কথা। শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠ্‌বে তা'দের প্রাণ, তা'দের অশ্রুতে হ'বে "বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর" স্মৃতি-তর্পণ।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষভাগে যখন মোগল-সম্রাট আকবরের প্রচণ্ড প্রতাপে বাঙালীর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা গভীর নৈরাশ্যে নিমগ্ন, পূর্বাশার সিংহদ্বারে ঠিক সেই সময় ভবানী-সহায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মহা অভ্যুদয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনে মুদ্রিত W. Pertsch সম্পাদিত "ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতম্‌" নামক প্রাচীন গ্রন্থে আছে—"* * প্রতাপাদিত্যো মহাসত্ত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধন-সম্পন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরেশ্বরোঽপি করং গ্রহীতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশ নৃপতীন্‌ স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্ত পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরবহুসৈন্যানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ।" চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন ঘটক-কারিকায়ও পাওয়া যা'বে—

"বিক্রমাদিত্যপুত্রশ্চ প্রতাপাদিত্যসংজ্ঞকঃ।
রাজরাজেশ্বরো বীরো মহাধনুর্ধরোঽভবৎ ॥

* * *

উদ্ধারিতো বঙ্গদেশঃ মোগলস্য করাৎ বলাৎ।
তস্য বীর্যপ্রভাবেণ দিল্লীশঃ কম্পিতঃ সদা ॥

* * *

কালিকাচরণাসক্তো রক্ষিতোঽপি তয়া কিল।
তৎ প্রসাদাৎ বভূবাসৌ নৃপতির্ভীমবিক্রমঃ ॥"

প্রতাপাদিত্যের জীবনী পর্যালোচনা কর্‌লে তাঁকে প্রধানতঃ তিনভাবে আমরা পাই—বাংলা সাহিত্যে ও ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রতাপাদিত্য এবং সামাজিক অর্থাৎ জাতীয় জীবনে প্রতাপাদিত্য। আজ

কেবল আমি তাঁর মহান্ জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো, যা'তে শ্রেণী-বিশেষের ভুল ধারণা ও প্রচারণা নিঃসন্দেহে ও নিঃসংশয়িত ভাবে দূর হয়।

প্রতাপাদিত্য খ্রীষ্টীয় ১৫৬০ অব্দে জন্মেছিলেন এবং পঞ্চাশ বছর বয়সে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে। তাঁর মৃত্যু হয় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও অনভীপ্সিত ভাবে জীবনের গৌরবময় অথচ গ্লানিকর এক অশ্রু-করুণ মধ্যাহ্নে! এই মহান্ বঙ্গীয় মহাবীর স্বকীয় কর্মবহুল জীবনের ভেতর যে অভূতপূর্ব দক্ষতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগী, অসামান্য সংগঠন শক্তি এবং উদার প্রজাবৎসলতার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে দেখ্তে পাই যে, রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোক সেই স্বভাবসুলভ গুণে তাঁর সবিশেষ অনুগত ও অনুরক্ত ছিল। প্রীতির ব্যবহারিক মাধুর্যে রাজ্যবাসী প্রজাসাধারণ তাঁকে অবিচলিত বিশ্বস্ততায় সহায়তা ক'রেছিল, এমন কি সর্বস্বপণে জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিচারে সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বকে গৌরবদান করবার যে মহানুভবতা—সেই মহানুভবতাই ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতাপাদিত্যের জীবনের অভ্যুদয় এবং মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান প্রধান কথা নয়। বিদেশী মোগলের দাসত্ব মোচনের জন্যে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকলকে সাড়ে তিন শ' বছর আগে প্রীতির পরিবেশে তিনি যে কী বিপুল ও বিস্ময়কর ভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তা'-ই লক্ষণীয়।

শৈশব ও কিশোর জীবনের মহত্তর শিক্ষাই প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে ও কর্মধারায় প্রতিফলিত হ'য়েছে দেখা যায়। একমাত্র পরম স্নেহশীল পিতৃব্যদেব পুণ্যভাক্ শ্রীমন্মহারাজ বসন্তরায় ও মমতাময়ী মহীয়সী পিতৃব্যাদেবী—মহারাজ বসন্তের প্রথমা মহিষী সে শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, অংকুরিত করেছিলেন এবং দিয়েছিলেন বাস্তব রূপ। প্রতাপাদিত্যের জীবনের মহত্ত্ব ফুটে উঠেছিল—নৈতিক বা জাতীয় জীবনের সর্বাংগীণ প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই অনাবিল, অনুপম শিক্ষার সৌকর্যে। রাজর্ষিকল্প রাজেন্দ্র বসন্তের জীবনাদর্শ মন্ত্রশক্তির মত অভাবিতভাবে ফলপ্রসূ হ'য়েছিল প্রতাপের ওপর।

একদিকে তাঁর হৃদয় পবিত্র উদারতায়, কোমলতায় ও মধুরতায় পূর্ণ ছিল, অন্যদিকে তেমন তিনি কর্তব্যে বা ন্যায়নিষ্ঠায় সুকঠোর ছিলেন। তাঁর চরিত্রে ঔদার্যের পরিচয়ই সর্বত্র। সাম্প্রদায়িকতার লেশ ছিল না তাঁর চরিত্রের কোনখানে—সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ক্ষণিকের জন্যেও তাঁ'র মনে উঁকি মারেনি। সকল সম্প্রদায় সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি সমবিশ্বাসাপন্ন, সম-শ্রদ্ধাপন্ন, অবাধ সহানুভূতিশীল তিনি ছিলেন। মন ছিল তাঁর সংকীর্ণতার অনেক ঊর্ধ্বে। তাই, তাঁর সোনার যশোর রাজ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের ঠাঁই ছিল না।

ইতিহাসে তাঁর বহু সদ্‌গুণের পরিচয় এবং তাঁর যশোর রাজ্যে ও রাজধানী ধুমঘাটে (অধুনা ঈশ্বরীপুর) তাঁর অসাম্প্রদায়িক ঔদার্যের বহু বাস্তব নিদর্শন আজো আমরা পাই। মুসলমানেরা তাঁ'র রাজ্যমধ্যে অবাধে আড়ম্বরে আপনাদের ধর্মকার্য সম্পাদন করতে পারতেন। জেসুইট পাদ্রিগণকে সমাদরে আহ্বান ক'রে তাঁদেরকেও ধর্মপ্রচারের জন্যে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু এইটুকুই নয়—ধূমঘাটে মুসলমানদের জন্যে যেমন তিনি টেংগা মসজেদ ক'রে দিয়েছিলেন, তেম্‌নি করেছিলেন পর্তুগীজদের উপাসনাগার স্থাপনে সর্ববিধ সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান (পর্তুগীজ) সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদেরও

তিনি সমভাবে ধর্মকার্যে সহায়তা ক'রেছেন। অন্তর সমাত্মক উদারতায় পূর্ণ না থাক্‌লে এমন অনুষ্ঠান করা কথনো সম্ভব নয়।

যশোরের অধিবাসীদের সুবিধার্থ, প্রজা-সাধারণকে সমতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানার্থ রাজ্যের মধ্যে বহু বড় বড় ছায়াস্নিগ্ধ রাজপথ, বহু বহু কূপ, বহু বহু দীঘি-পুষ্করিণী, বহু বহু অতিথিশালা নির্মাণ করেছিলেন।' Major Ralph Smyth এর Statistical & Geographical Report of the 24 Parganas (1857) প্রমাণ দিচ্ছে—"Dhumghat was the seat of a very powerful Raja by name Pratab Audit, who was looked on as the greatest sovereign that had ever reigned in Bengal. He adorned the seat of his government with noble buildings, made rounds, built mosques, temples, dug tanks, wells and in fact did everything that a sovereign desiring the well-being of his subjects could do."

সারাটি যশোর রাজ্যে ও রাজধানী ধূমঘাটে মুসলমানদের কত যে মস্‌জেদ, হিন্দুদের কত যে মন্দির প্রতাপাদিত্যের উদার মহাপ্রাণতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন ক'রে আজো বিজন প্রান্তরে, অগম্য অরণ্যে অবহেলায় নিরন্তর লবণাক্ত বায়ুপ্রবাহে তিলে তিলে ক্ষয়োন্মুখ, ক'জন সে সবের হদিস্‌ রাখেন? হদিস্‌ রাখেন না বা রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না ব'লেই প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে এত মনগড়া আজগুবি ধারণা ও বিতর্কের আজ এত ভীড়। কিন্তু জোর ক'রে বল্‌বো যে, প্রতাপের লীলাস্থল দর্শন করলে প্রতাপ সম্পর্কে কা'রও কোন গবেষণার কারণ থাকে না।

প্রতাপাদিত্যের যশোর-রাজ্যের রাজধানী ধূমঘাট—তা' আগে বলেছি। ধূমঘাটে ছিল মুসলমানদের টেংগা মস্‌জেদ, হিন্দুদের মহাপীঠ মাতা যশোরেশ্বরী দেবীর ও চণ্ড ভৈরবের মন্দির, পর্তুগীজদের যীশুর গীর্জা। তিন জাতির এই তিনটি উপাসনালয় এমন পরিকল্পনায় নির্মিত হ'য়েছিল—একটি কল্পিত রেখাদ্বারা এই তিনটিকে সংযোজিত করলে যেন একটি ত্রিভুজাকার ধারণ করে এবং এই তিনটী ত্রিভুজের তিন কোণে পড়ে। "ত্রিকোণ"—প্রতাপের নীতিগত কোন গূঢ় লক্ষণ (significance) বা চিহ্ন ছিল ব'লে বিশ্বাস করা চলে। কারণ তা'র এই যে, প্রতাপের নামীয় মুদ্রা (coin) ছিল ত্রিকোণ, পঞ্চবর্ণযুক্ত পতাকা ছিল ত্রিকোণ, নির্মাল্যাধার ত্রিকোণ, খর্পর পুষ্করিণী ত্রিকোণ, চণ্ডভৈরবের মন্দির ত্রিকোণাকার, চণ্ডভৈরবলিংগের গৌরীপট্টের পরিবর্তে যে শ্বেতপ্রস্তর-পীঠ প্রতাপ তৈরী করেন, তাও ছিল ত্রিকোণাকৃতি ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রথম ধরা যা'ক্‌ (১) ধূমঘাটের সুবিখ্যাত টেংগা মস্‌জেদ। রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের উপাসনার জন্য প্রকাণ্ড উপাসনালয়। মস্‌জেদটি এক শ্রেণীতে পাঁচটি পরস্পর-সংলগ্ন ঘরে বিভক্ত এবং পাঁচ গুম্বজ-বিশিষ্ট। Ralph Smyth এর report-এ পাওয়া যাবে—"A few of the edifices remain to this day, especially Tengah Musjid, 150 feet long with five domes."

List of Ancient Monuments এ আছে--"Tengah Mosque—A building said to be mosque erected by Raja Pratapaditya."

Hunterএর Statistical Accounts, 24 Pargs তেও এই একই সমর্থন।

(২) টেংগা মস্‌জেদের উত্তরাংশে অষ্টকোণ গুম্বজযুক্ত ইষ্টকালয়—বিবির আস্তান—মুসলমান

মহিলাগণের নেমাজ কর্‌বার ঘর। প্রধান প্রধান জুম্মা মস্‌জেদের একাংশে স্ত্রীলোকদিগের নেমাজের ব্যবস্থা দিল্লী-আগ্রায়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের জনবহুল ধূমঘাট নগরীতে রমণীবর্গের জন্য এমন রাজোচিত বিশেষ ব্যবস্থা যেমন প্রশংসনীয়, তেম্‌নি মহৌদার্যের নিদর্শন। যশোহর খুল্‌নার ইতিহাস, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

(৩) বার ওমরাহের কবর—প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহের আগে যে বার জন মোগল ওম্‌রাহ-সেনানী মোগলসম্রাট কর্তৃক প্রেরিত হন, তাঁরা সবাই যুদ্ধে নিহত হ'লে প্রতাপের সুব্যবস্থায় তাঁদের মৃতদেহ ধূমঘাটে কবর দেওয়া হয়। এ একপক্ষে বিজয়স্তম্ভ হ'লেও, অপর পক্ষে যে প্রতাপের সদন্তঃকরণের পরিচায়ক তা'তে সন্দেহ নেই।

"The Bara Omra Gor—Raja Pratapaditya of Jessore having declared himself independent of the authorities of the empire of Delhi, the Emperor successively sent twelve Omraos with large armies to subdue him, but Pratapaditya defeated and killed them all in battle, their dead bodies were afterwards collected by the Raja and buried in this tomb."—Ancient Monuments of Bengal.

(৪) পরবাজপুরের মস্‌জেদ—গড় মুকুন্দপুরের (যশোর দুর্গ) পূর্বপার্শ্ববর্তী পরবাজপুরে এক অপূর্ব মস্‌জেদ নির্মিত হয়। পরবাজ খাঁ নামে প্রতাপের এক পাঠান সেনানীর নামানুসারে হয় পরবাজপুরের নামকরণ। দুটি ঘর, চার গুম্বজ ও ছয় মিনার যুক্ত এই মস্‌জেদ পাঠানস্থাপত্যে ও সুন্দর কারুশিল্পে গৌরবান্বিত। বাংলার শ্রেষ্ঠ মস্‌জেদ-গুলির মধ্যে এর স্থান দ্বিতীয়। এখনো বেশ সুন্দর অবস্থায় বর্তমান। স্থানীয় মুসলমানগণ ব্যবহার করেন। যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

তা' ছাড়া মৌতলার, চকশ্রীর, বেদকাশীর মস্‌জেদাদি উল্লিখিত বিখ্যাত টেংগা মস্‌জেদ ও পরবাজপুরের মস্‌জেদের মত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিপুল মহানুভবতার জলন্ত দৃষ্টান্ত নিয়ে অবিচল।

এবার পর্তুগীজদের গীর্জা। জেসুইট্ পাদ্‌রী ডোমিংগো-দে-সৌজা (Domingos de Souza), ফ্রান্‌সিস্‌কো ফার্ণাণ্ডেজ (Francisco Fernandez) ও মেলকিয়োর-দা-ফন্‌সেকা (Melchior da Fonseca) ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্যে ধূমঘাটে প্রতাপাদিত্যের নিকট আসেন। তাঁদের আবেদনে প্রতাপ তাঁদের ধর্মপ্রচারের ও গীর্জা স্থাপনের সনন্দ দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী পাদ্‌রীরা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ধূমঘাটে "যীশুর গীর্জা" নাম রেখে এক গীর্জা স্থাপন করেন। তা' বাংলার সর্বপ্রথম গীর্জা। Peirre Du Jarric এর Histoire des Indes Orientales" নামক মূল ফরাসীয় বিবরণীর ২৯ অধ্যায়ে ফ্রান্‌সিস্‌কো ফার্ণাণ্ডেজের লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য। Beveridge এর History of Bakargunj এ পাই—"It was the first church in Bengal and was on this account dedicated to Jesus Christ." পেরী-ডু-জারিকের উল্লিখিত বিবরণীর মেল্‌কিয়োর ফন্‌সেকা লিখিত অংশ এবং নিকলাস্ পাইমেণ্টার (Nicolas Pimenta) "Relatio Historica De Rebus in India Orientali" (অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ১৩২৮, আষাঢ়ের প্রবাসীতে অনুবাদ প্রকাশ করেছেন) আলোচনা কর্‌লে সুপ্রমাণিত হ'বে যে, প্রতাপাদিত্যের অসাম্প্রদায়িক উদারতা, মহাপ্রাণতা কত বিশাল আর কত গভীর ছিল। কোন খ্রীষ্টান রাজা ধর্মপ্রচারকদের এমন সম্মান

ক'রতে পার্‌তেন কিনা সন্দেহ—একথা পাদরিরাই স্বীকার ক'রে গেছেন নিজেদের বিবরণীতে।

মহারাজ প্রতাপের রাজ্যের দেওয়ানী ও সামরিক বিভাগের শ্রেষ্ঠ ও দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতেও অধিষ্ঠিত ছিলেন বহুতর যোগ্য মুসলমান। দেওয়ানী অংশের পররাষ্ট্রবিভাগের প্রধান ছিলেন মাওয়ালী বায়জিদ হাজারী, জলযানসমূহের সচিব ছিলেন খ্বাজা আব্বাজ, প্রধান রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেখ বদি প্রভৃতি। আর সামরিক বিভাগে সেনাধ্যক্ষ পদে খ্বোজা কামাল উদ্দীন, ধুলিয়ান বেগ, হায়দর মানক্রী, নূরউল্যা খাঁ, মাহীউদ্দীন, মীর্জা আস্‌গার, মুয়াজিম, পরবাজ খাঁ, ইম্‌দাদ আলি, জাহান্দার, জামাল খাঁ, নাসির উদ্দীন, মীরণ, তেজ খাঁ প্রভৃতি। তাঁর সৈন্যবিভাগে মোট সৈন্যসংখ্যার অর্ধাংশ ছিল সর্বশ্রেণীর মুসলমান সৈন্য। এও কি কম বড় কথা!

প্রতাপাদিত্য কয়জন প্রধান মুসলমান কর্মচারীর বিশ্বস্ততায়, আনুগত্যে, সাহসে ও কর্মিষ্ঠতায় এতখানি মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁদের স্মৃতি ও সম্মানের জন্য তিনি তাঁদের প্রত্যেকের নামানুসারে বিভিন্ন স্থানের নাম-করণ করেছিলেন। যেমন—দুর্গাধ্যক্ষ খ্বোজা কামালের নামে গড় কমলপুর, দুর্গাধ্যক্ষ হায়দরের নামে মাত্‌লা দুর্গ নামের পরিবর্তে হায়দর গড়, সেনানী মাহী উদ্দীনের নামে মাইহাটী পরগণা, সেনানী নূরউল্যার নামে নূরনগর, সেনানী ধুলিয়ান বেগের নামে ধুলিয়াপুর পরগণা, সেনানী পরবাজ খাঁর নামে পরবাজপুর, মহব্বত খাঁর নামে মহব্বতপুর, খ্বাজা আব্বাজের নামে খাজা বাড়িয়া ইত্যাদি।

আরো বিস্ময় যে, রাজধানী ধূমঘাট মহানগরী ও ধূমঘাট দুর্গ নির্মাণের যাবতীয় ভার বা দায়িত্ব প্রতাপ এবং মহারাজ বসন্ত কোন হিন্দুর ওপর ন্যস্ত করেন নি, ক'রেছিলেন যোগ্য মুসলমানের ওপর—সে যোগ্য মুসলমান হ'চ্ছেন সেনানী কামাল উদ্দীন। মুসলমানদের ওপর ঠিক এমনভাবের উদারতার উদাহরণ বিরল কিনা, এবং কতখানি বিরল তা' বিস্মিত মনে অনুভাব্য।

প্রতাপাদিত্য পরবর্তী জীবনে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও আবাল্য তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামিতে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু। প্রসিদ্ধ ও প্রধান বৈষ্ণবকবি গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতি প্রতাপের রাজসভার ছিলেন গৌরবস্তম্ভ। কীর্তনগান অত্যন্ত ভালবাসতেন প্রতাপ। কবিরাজ গোবিন্দ দাসের "পদাবলী"র মাথুর প্রসংগে (২৪১ পৃষ্ঠা) আছে ঃ

"এত হি বিরহে আপহি মূরছই শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত এ রস ভাসিত দাস গোবিন্দ গান॥"

মহারাজ বসন্ত রায়ের যোগ্য বংশধর, যশোর রাজবংশীয় রাজগণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রধান রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন……"প্রতাপ একাকী প্রবল মোগলের সহিত লড়িয়া স্বাধীন বাংলার গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। প্রতাপ পরাভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে পরাভবের গৌরব জয়ের গৌরবকে ম্লান করে। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য তিনি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শ্রেণীস্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁহার নিকট কখনো প্রশ্রয় পায় নাই। * * * তাঁহার ন্যায় স্বাধীনতা-সর্বস্ব লোকোত্তর পুরুষের মহিমা যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা সহজ নয়। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে সে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবে।"

স্বর্গত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের অভিমত—"তাঁহার (প্রতাপের) রাজ্যমধ্যে কত ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি এবং কত কত মুসলমান যে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার চরিত্র ইন্দ্রিয়দোষশূন্য ছিল এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্বদা ধাবিত হইত। কোন ধর্মের প্রতি তিনি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন

না। প্রতাপ নিজে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক হইয়া তাঁহারই পদে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। বাঙালীজীবনে এরূপ বীরধর্ম অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিকট বাঙালী সাধারণে যে মস্তক অবনত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্রও লিখেছেন—"তিনশত বর্ষ পূর্বে প্রতাপ যে নূতন মন্ত্র উদ্গীত করিয়াছিলেন এবং তাহার উদ্‌যাপনে নিজের অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীরব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার কীর্তি চির-স্থায়িনী হইয়াছে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা ক'রেছেন—"প্রতাপাদিত্যের মত স্বাধীন নৃপতি, শক্তিশালী রণবীর ও প্রতিভাশালী কর্মবীর বঙ্গদেশে আর কখনও আবির্ভূত হন নাই।"—(ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৫)

স্বনামধন্য চারণকবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় রচিত প্রসিদ্ধ 'বঙ্গ আমার জননী আমার' সংগীতের অংশবিশেষ হ'চ্ছে—

"যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত মা সে ধন্য দেশ।
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তা'দের রক্তলেশ॥"

তাই বলি, প্রতাপের কথাই বাঙলার প্রকৃত মর্মবাণী। বাঙলা যেন প্রতাপময়। সত্যসত্যই প্রতাপের গৌরবে বাঙালী চিরগৌরবান্বিত, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর দানধর্ম ও উদার শাসনের প্রমাণ নিয়ে আমার বাঙলা চিরসম্মানিত।

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র যে অখণ্ড গরিমা-মণ্ডিত মহত্ত্বের কত উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল, এ প্রবন্ধে যথাসম্ভব তা' উদ্ঘাটিত ক'রে দেখা'তে প্রয়াস পেলাম। কেবলমাত্র ১৯২০ সালের 'Calcutta Review'তে "Where Pratapaditya Reigned" নামে P. L. 'Faulkner, District Superintendent of Police, Khulna, যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেন, তা'র শেষাংশ দেখিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি··· "Iswaripur (old Dhumghat) is not only of interest to the Hindus for shrine to Kali, and to the Moslems for the well-prepared Tenga Mosjid, but it is hallowed with sacred memories for Christians in general and Catholics in particular, as the site of the first church created in Bengal."*

* কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট্ হলে প্রতাপ-জয়ন্তীর উৎসব-সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

"সত্ত্ব ও রজঃ এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করাই 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

কবীর

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

কবে তব আবির্ভাব, কবে তব হ'লো তিরোধান,—
কিছু তার নাহি জানি। গণিতের অঙ্কপরিমাণ
তোমারে বাঁধিতে নারে কোন ইতিহাসের পাতায়।
তব জাত-পত্রখানি নাহি মিলে কালের খাতায়।
তুমি চিরদিনকার, নহ তুমি কোন শতাব্দীর;
গোষ্ঠীহারা, কোষ্ঠীহারা, গোত্রহীন হে সাধু কবীর!
কালসিন্ধু মাঝে তব জীবনের নাহি পাই সীমা,—
মহাসিন্ধুময় হ'য়ে আছে তার বিশাল মহিমা।
কেবা তব পিতামাতা—তার মোরা পাইনি সন্ধান।
তুমি নারদের মত বিধাতার মানস-সন্তান।
সংসার-সন্ন্যাস ভেদ যাঁর মাঝে পাইল বিলয়
গৃহী, কি বৈরাগী তিনি কেমনে তা হইবে নির্ণয়?
জানি না, কি ছিলে তুমি ধর্মরাজ্যে সহজী মরমী,
রামাত বৈষ্ণব সুফী বৌদ্ধ জৈন কিংবা বর্ণাশ্রমী,
কতটা মোস্‌লেম ছিলে, কতটা বা হিন্দু নাহি বুঝি;
কুড়ানো ছেলের আর পিতৃধর্ম্ম কোথা পাব খুঁজি?

কোন সম্প্রদায় তোমা' জাতিহারা, ভাবেনি আপন,
মহামানবের ছিলে, তারি ধর্ম্ম করেছ পালন।
জানিনা জীবন-কথা। কি কি ভাবে করিলে সাধনা
জানি না করিলে কারে কি প্রথায় পূজা আরাধনা।
গ'ড়েছিলে সম্প্রদায় জানিনাকো কি বিধি-বিধানে,
তাহার প্রতীক বেশ জীবযাত্রা কি ছিল, কে জানে?
কোন্ গ্রন্থ প'ড়েছিলে, কোন্ মন্ত্র জপিতে ধীমান্
কত বার? কি আসনে কতক্ষণ করিতে ধেয়ান?
তব দীর্ঘ জীবনের বহিরঙ্গ কোন পরিচয়
করিয়া রাখেনি হায়, ইতিহাস অমর অক্ষয়।
সমস্ত জীবনখানি নিঙাড়িয়া দিয়াছ যে বাণী
তার এক বর্ণ মোরা হারাইনি—এই শুধু জানি।
ব্যাপ্ত হ'লো দিগ্বিদিকে স্নেহবিন্দুসম খরস্রোতে,
বঞ্চিত হইনি তব জীবনের সার ধন হ'তে।
ভারতের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হ'য়ে অনুস্যূত
তব ব্রত, তব মন্ত্র চিরদিন তার অঙ্গীভূত।
কলামূর্ত্ত করি তারে ইতিহাস গম্বুজ মিনারে
নমস্ত করিয়া রাখি' আপনার দায়িত্ব না সারে।

শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

(আমেরিকার শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের বেদান্তসাধন ও যোগশিক্ষাদান সম্বন্ধে ক্যালিফোর্নিয়ার তদানীন্তন বিখ্যাত সংবাদপত্র 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্'এ ১৯০০ সনের ২৬শে আগষ্ট রবিবার নিম্নোক্ত হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রকাশিত হইয়া ছিল।* উক্ত বিবরণ 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্'এর নিজস্ব সংবাদদাত্রী কর্তৃক লিখিত। ঐ মহিলা শান্তি আশ্রম পরিদর্শনান্তে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছিলেন।)

'তাঁহারা থিয়সফিষ্ট' 'তাঁহারা অলট্রুরিয়ান'। 'তাঁহারা শেফার'। 'তাঁহারা বেলামীদলভুক্ত'। 'তাঁহারা মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন'। 'তাঁহারা অবিবাহিত, নিরামিষাশী, বিশ্বাসে রোগারোগ্যকারী ক্ষেপার দল'! হিন্দু দর্শনমার্গে সাধনশীল কয়েক জন নরনারী সম্বন্ধে সান আনতোন উপত্যকার বিস্ময়বিমুগ্ধ অধিবাসীরা এই সকল অজ্ঞজনোচিত অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিত। মাসাধিক পূর্বে সান আনতোন উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের শান্তিপ্রদ নিম্নভূমিতে সমাগত কয়েকজন লোক সম্বন্ধে এই সকল কৌতূহলোদ্দীপক জনরব রটিয়াছিল। সানজোস হইতে ঐ অদ্ভুত যাত্রিদল সভ্যতার প্রচলিত পথ ছাড়িয়া হ্যামিলটন্ পাহাড় অতিক্রম করিয়া খাড়া ও বাঁকা উৎরাই পথে মনোরম ইসাবেল উপত্যকায় পৌছিলেন। তৎপরে তাঁহারা শুষ্কপ্রায় কোয়োট নদী পার হইয়া একটি পশুচারণ-ভূমির মধ্য দিয়া সান আনতোন উপত্যকায় পৌছিয়াছেন। এই অদ্ভুত লোকদের সুখ্যাতি চারিদিকে লোকমুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে লোকে বিচিত্র ও চমকপ্রদ বর্ণনা দিতেছে।

শান্তি আশ্রমে যাত্রার অদীর্ঘ পথে উক্ত সানতোন উপত্যকায় আগত দার্শনিকদের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের মনোভাব জানিবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যেকেই একবাক্যে আমাকে বলিত, 'আপনি তাঁহাদের জানেন না?' আমি যথার্থ অথচ কপট উত্তর দিতাম, 'আমি সানফ্রান্সিস্কো হইতে এতদূর আসিয়াছি তাঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার জন্য। গ্রামবাসী তোমরা ভদ্র ও অকপট। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্ররোচনায় নিশ্চয়ই তোমাদের নবাগত প্রতিবেশীদের সমালোচনা করিবে না।' আমার সামান্য জিজ্ঞাসাদ্বারা যতটুকু আশা করিতাম তদপেক্ষা অধিক তথ্য তাহাদের উত্তরে পাইতাম। এই নবাগতদের রহস্যজনক কার্যাবলী সম্বন্ধে উপত্যকাবাসীদের ধারণা এত চমৎকার এবং কল্পনা এত ব্যাপক ও চিত্তাকর্ষক যে, তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার জন্য পথিপার্শ্বে শ্রোতার আসন গ্রহণ করিলাম। যতই আমরা বিজন উপত্যকার নিকটবর্তী হইলাম ততই জনরব

* ১৯০০ সনের নভেম্বর মাসে 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাদ্বয়ে 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিক্‌ল্' হইতে উদ্ধৃত এবং স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

ঘনিষ্ঠ ও বিচিত্র হইতে লাগিল। আমরা যতই হ্যামিলটন পাহাড়ের উৎরাইতে নামিতে লাগিলাম ততই শ্যামল স্বর্ণাভ পাহাড়ের মনোরম নয়নরঞ্জক দৃশ্য আমাদের উভয়পার্শ্বে দৃষ্টিগোচর হইল। যে ছোট পরিষ্কার গাড়ীতে আমি যাইতেছিলাম উহার চালক আমাকে স্থানীয় জনশ্রুতির কথা বলিতে লাগিল।

যতই প্রদোষের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রাত্রিতে পরিণত হইল ততই জনরব আরও আশ্চর্যজনক ও নিবিড় হইল। নবাগতদের গতিবিধির আভাস পাওয়া গেল দূরস্থিত তাঁবুর আলোকে। গাড়ীর চালক আমাকে বলিতে লাগিল, কিরূপে ক্ষুদ্র সত্যান্বেষী দলের নেতা শ্যামাঙ্গ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার আমেরিকান শিষ্যদের সম্মোহিত করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহারা রাত্রিতে শিবিরাগ্নির চারিদিকে ধ্যানচক্রে বসেন এবং অদ্ভুত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, কিরূপে অগ্নিশিখা হইতে উত্থিত অদ্ভুত বস্তুরাশি চতুর্দিকস্থ প্রাচীন. পুরাতন ওক গাছের মধ্যে ও পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। সে বলিল, যাহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের মুগ্ধকর প্রভাবের গণ্ডীর মধ্যে সাহসপূর্ব্বক যাইতে পারে তাহারা এই সকল অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পায়।

এই পাহাড়ী লোকটি আমাকে বলিল যে, সে এই সকল গল্প আদৌ বিশ্বাস করে না। শিকারী যেমন শিকার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহশূন্য, খেলোয়াড় যেমন খেলা ছাড়া অন্য সকল কার্যে উদাসীন, তেমনি ছিল অনুৎসাহ ও ঔদাসীন্য এই গাড়ীচালক পাহাড়ীর মন্তব্যে। আমরা কৌতূহলপূর্ণ নীরবতায় অভিভূত হইয়া শান্তি আশ্রমে পৌঁছিলাম। কল্পনাপ্রিয় গ্রামবাসীদের বর্ণিত স্থানে উপস্থিত হইয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আশ্রম নিবিড় নীরবতায় সমাচ্ছন্ন। প্রজ্বলিত অগ্নির যে শিখাসমূহ নীলাকাশে উঠিতেছিল, উহার সামান্য সোঁ সোঁ শব্দে নীরবতা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইতেছিল। দূরস্থিত পাইনবৃক্ষের অস্পষ্ট ধ্বনি কর্ণগোচর হইতে লাগিল। হিন্দুগণ যে দেবতার উপাসনা করেন সেই দেবতার উপাসকগণ প্রজ্বলিত অগ্নির চতুর্দিকে সুখাসনে ধ্যানমগ্ন। উহার একপার্শ্বে বুদ্ধমূর্তির ন্যায় নিস্পন্দ এবং সেই প্রাচীন জগদ্গুরুর ন্যায় ধ্যানাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে ছিলেন শিষ্যগণ। সকলের চক্ষু স্তিমিত এবং সকলের মুখে তন্ময়তার শান্ত ভাব সুস্পষ্ট। মাঝে মাঝে সুমধুর সঙ্গীতবৎ সংস্কৃত শ্লোকের উচ্চারণধ্বনি নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। তৎপরে আবার পাইন বৃক্ষের ভাষাহীন সঙ্গীত শ্রুত হইল। উপাসকগণের ধ্যানমগ্নতা এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা এত গভীর ছিল যে, অভ্যাগতের আগমন এবং জড় জগতের অস্তিত্ব তাঁহারা আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না। যে হিমালয় হইতে তাঁহাদের আচার্য সমাগত, সেই হিমালয়ের গভীরতম নির্জন প্রদেশে যেন তাঁহারা বাস করিতেছেন!

অবশেষে এক শান্তমূর্তি ব্যক্তি উঠিয়া আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যে ভদ্র গাড়ীচালক এবং শিষ্ট শিকারী আমাকে শেষ কয়েক মাইল পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল তাহাদিগকেও তিনি মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর তিনি আমাকে রান্নাঘরে লইয়া যাইয়া আমার জন্য আবশ্যকীয় আহার্য প্রস্তুত করিলেন এবং ধুনির পাশে ধ্যান সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমার আপ্যায়নে নিযুক্ত রহিলেন। পরে আমরা অন্যসকলের সঙ্গে যোগ দিলাম। 'যখন অগ্নিচক্রের মধ্যে উপবিষ্ট

এবং উহার পবিত্র উত্তাপসীমার মধ্যবর্তী হইলাম তখন উক্ত ক্যাম্প অন্য অন্য ক্যাম্পের মতই প্রীতিদায়ক মনে হইল। কিন্তু, ঐ ক্যাম্পের অসাধারণত্ব ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দের সুদর্শন ও সমুজ্জ্বল মূর্তি। স্বামী তুরীয়ানন্দ গেরুয়া রঙের পোষাকপরিহিত ছিলেন। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের ন্যায় তাঁহার গায়ের রঙ শ্যামল। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল ও কালো, কপালে গভীর চিন্তাসূচক সূক্ষ্মরেখাশ্রেণী, প্রফুল্ল সুঠাম দেহ অথচ উচ্চ আভিজাত্যের অবর্ণনীয় ভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল। অন্য সকলে তাঁহার শিষ্য এবং আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় দ্বাদশ। তাঁহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুসভ্য নাগরিক। তাঁহাদের গাত্রবর্ণ এবং পরিচ্ছদাদি সাধারণ ও স্বদেশীয়। স্বামী তুরীয়ানন্দের শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

কল্পনা করুন, যে স্থান হরিণ, শশক, কপোত, ভারুই প্রভৃতি শিকারযোগ্য বন্য পশু পক্ষীতে অধ্যুষিত সেখানকার আশ্রমে একটিও বন্দুক নাই! কল্পনা করুন, নৈশ শিবিরাগ্নির পাশে ক্লীমেণ্টাইন এবং স্পেনীয় ক্যাভেলিয়ারের পরিবর্তে সংস্কৃত শান্তি-পাঠ! কল্পনা করুন, অরণ্যে শিকারীর অসম সাহসিকতার গল্পের পরিবর্তে বিশ্বের ক্রম-বিকাশ এবং উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা! সংক্ষেপে কল্পনা করুন, সাধারণ ক্যাম্পের প্রত্যেক আদর্শ এখানে নির্বাসিত এবং তৎপরিবর্তে রহিয়াছে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা। তাহা হইলে আপনি শান্তি আশ্রমের একটি স্পষ্ট চিত্র পাইবেন। অবশেষে ধ্যানের পরিবেশ কিঞ্চিৎ অপসারিত হইলে আমি তুরীয়ানন্দজীকে বলিলাম, 'স্বামী, আমি আপনার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আসিয়াছি।' স্বামী তুরীয়ানন্দ হাসিয়া বলিলেন, 'আমরা সভ্যতার পরিবেশ হইতে দূরে থাকিবার জন্য শহর হইতে বহু মাইল দূরে আসিয়াছি। কি আশ্চর্য! দেখিতেছি সেই সভ্যতাই আমাদের পশ্চাতে পুনরায় ধাবমান!' আমার হস্তস্থিত ক্যামেরাটি তাঁহার একটি সাধারণ ছবি লইবার অভিপ্রায়ে বিধৃত হওয়ায় তিনি সুমিষ্ট-স্বরে বিস্ময়মিশ্রিত বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন, 'শিব, শিব, শিব!' পরে জানিলাম, অপ্রীতিকর বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিলে ঐ সকল হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ উক্তপ্রকার মাঙ্গলিক শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি আমাকে একটি প্রশ্ন করিতে অনুমতি দিবেন? আপনি কি সংক্ষেপে বলিবেন এখানে কি করিতে চান, কি আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত?' তিনি উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই। স্বামী বিবেকানন্দ যে রাজযোগ লিখিয়াছেন এবং যাহাতে পাতঞ্জল যোগসূত্রের অনুবাদ আছে, উহার প্রারম্ভেই আমরা তাহা পাইব। বইখানি এখানে আছে, আসুন আমরা পড়ি।'—

'প্রত্যেক মানবহৃদয়ে দেবত্ব নিহিত। বাহ্য ও অন্তরপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, যোগ বা জ্ঞান, এইগুলির একটি বা একাধিক বা সকলমার্গ অবলম্বনে এই দেবত্ব প্রকাশ কর এবং মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের সারতত্ত্ব। মতবাদ, দার্শনিক তত্ত্ব, অনুষ্ঠান, পুস্তক, মন্দির বা অন্যান্য পদ্ধতি—সকলই সহায়ক মাত্র, মুখ্য নহে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনি কোন কোন আহার্য ত্যাগ, নিশ্বাস-নিরোধ প্রভৃতি কয়েকটি দৈহিক প্রক্রিয়া অভ্যাস করেন? উহাদের তত্ত্ব কি?'

স্বামী তুরীয়ানন্দ—'কেবলমাত্র এইজন্য যে, যাহা সূক্ষ্ম তাহাকে সংযত করা অপেক্ষা যাহা স্থূল তাহাকে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ নিশ্বাস সংযত করিয়া দেহকে বশীভূত

কর। কারণ, নিশ্বাসই দেহের প্রধান স্থূল গতি। উক্ত অভ্যাসবলে দেহের সূক্ষ্ম গতিগুলি অনিবার্য-রূপে অধীন হইবে। মনঃসংযমের শক্তিতে সকল জ্ঞান লাভ হয়। প্রাণবায়ু স্থির হইলে সহজে মন স্থির হয়, মনের চিন্তাশীলতা জাগ্রত হয়। বাহ্যবস্তুর উপর মনকে একাগ্র করা শক্ত নয়। মনের দ্বারা মনকে পর্যবেক্ষণ করিলে আত্মাকে জানা যায়। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সরল ও সহজসাধ্য উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেছি। এই উপায়সমূহ 'রাজযোগ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত।'

আগ্রহান্বিত দলের সকলেই সুস্পষ্ট প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের আচার্যের জ্ঞানোদ্দীপক শিশুসুলভ মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইতে ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা কি সকলে সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে চান?' তন্মধ্যে এক জন সহাস্যে বলিলেন, 'সুদূর ভবিষ্যতে হইতে পারি। এই প্রকার আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্য এই আশ্রম স্থাপিত। আমরা আশা করি, সমস্ত আমেরিকায় এই আশ্রম বেদান্তসাধনের কেন্দ্রস্থল হইবে। ভারতের বাহিরে ইহাই একমাত্র শান্তি আশ্রম এবং ক্যালিফর্নিয়া নির্জন প্রান্তরবহুল হওয়ায় আশ্রমের পক্ষে এই দেশ প্রশস্ত।'

তারপর তাঁহারা আমাকে বলিলেন, তাঁহাদের অন্যতম কুমারী মিনি বুক কর্তৃক আশ্রমের জমি প্রদত্ত। জমির আয়তন ১৬০ একর। স্থানটি মরুভূমিতুল্য নির্জন ও অনুর্বর, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী, এবং চিত্ত-বিক্ষেপকারী সভ্যতার পরিবেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অবাঞ্ছিত ক্যামেরাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ আবার 'শিব! শিব! শিব!' উচ্চারণান্তে কোন এক আশ্রম-বাসীকে সহাস্যে বলিলেন, 'চেতন! তুমি বলিয়াছিলে যে আমাদের আশ্রমটী আর একটু মার্কিন-ভাবাপন্ন হইলে ভাল হয়। এই দেখ, সভ্যতার এক বাহন আসিয়াছে! শিব, শিব, শিব!'

চেতন কেবল বলিলেন আজকাল কোন কিছুই ফটোগ্রাফির চক্ষু হইতে গোপন রাখা যায় না। তিনি পরে আমাকে ঘনজনাকীর্ণ এই উপত্যকার অদ্ভুত গল্প করিলেন। সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী এবং জার্মেনির লোক এই সমতলভূমিতে চাষ করিতে আসিয়াছিল। তখন স্থানটী মনুষ্যকণ্ঠধ্বনিতে মুখরিত ছিল। কিন্তু জলাভাব এবং জিনিষপত্রের আমদানি-রপ্তানির অসুবিধার জন্য সেই ক্ষুদ্র উপনিবেশ এই সুন্দর উপত্যকায় আর রহিল না। এখন এখানে পড়িয়া আছে জনহীন গৃহ, ছাত্রছাত্রীশূন্য বিদ্যালয়, জলশূন্য কূপ এবং শস্যশূন্য গোলাঘর। শস্যক্ষেত্র এখন পশুচারণ-ক্ষেত্রে পরিণত। পার্শ্ববর্তী একটি মাঠের আয়তন ৪৪৫০০ একর। এই সকলের জন্য আশ্রম-বেষ্টিত নির্জনতা সম্ভব হইয়াছে।

মার্কিনোচিত নির্ভীকতায় হিন্দু ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামী! ক্যাম্পের আগুনের পাশে আমরা সব সময় ভূতের গল্প করিয়া থাকি। আপনি ভারতীয় ভূতের গল্প আমাকে আজ বলিবেন? আপনি কি নিজে কখনো ভূত দেখিয়াছেন?' স্বামী তুরীয়ানন্দ নিরতিশয় সরলতার সহিত বলিতে লাগিলেন, 'হাঁ। মনে হয় আমি একবার ভূত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা মনের ভ্রমও হইতে পারে। ভারতে আমাদের মঠে এইটি ঘটিয়াছিল। একটি বন্ধুর সহিত আমি আমাদের মঠের হলঘরে পায়চারি করিতেছিলাম। হঠাৎ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম। মুহূর্তমধ্যে সে মুখ ফিরাইয়া মঠের একটি অব্যবহৃত কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। উক্ত কক্ষে কেহ নাই—ইহা বলিবার জন্য উহার পশ্চাতে যাইয়া দেখি, সে অন্তর্হিত! কক্ষে ঢুকিয়াও তাহার

কোন সন্ধান পাইলাম না। আমার বন্ধুটী তাহাকে আদৌ দেখে নাই। পরে শুনিলাম, উক্ত আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি সেই কক্ষে আত্মহত্যা করিয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার মনের খেয়ালও হইতে পারে। এই কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহা মনের ভুল নাও হইতে পারে। প্রেতাত্মাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনরায় বলিলেন, 'ইহা ছেলেখেলা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। মৃত ব্যক্তিগণের স্থূল শরীরহীন আত্মাই ভূত। তাহারা অশরীরী—আমরা ইহা ভুলিয়া যাই তাই তাহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।' তৎপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে আশীর্বাণী প্রেরণ করিয়া তিনি স্বীয় তাঁবুতে গেলেন। আশ্রমে তেরটী তাঁবু এবং একটী কাঠের ঘর আছে। পরম সমাদর পূর্বক গৃহতুল্য কক্ষ একটি তাঁহারা আমার রাত্রিবাসের জন্য ঠিক করিলেন। সেই রাত্রিতে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম—মহাত্মাগণ, পবিত্র অগ্নি, ভ্রাম্যমাণ ভূতাদির স্বপ্ন! রাত্রি প্রভাত হইলে আমার ক্ষুদ্র কাষ্ঠনির্মিত কেবিনের ফাঁকে ফাঁকে যখন স্বর্ণাভ অরুণকিরণ প্রবেশ করিল তখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল। গির্জার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতবৎ মধুরধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহা স্বামী তুরীয়ানন্দের কণ্ঠস্বর। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহা তখন বুঝিতে বিলম্ব হইল চক্ষুকর্ণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রমত্ততা হেতু। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রাতঃকালীন সূর্যস্তব আবৃত্তি করিতে করিতে নিদ্রিত আশ্রমবাসিগণকে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রাতঃকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য সস্নেহ আহ্বান করিতেছিলেন। পার্বত্য প্রাতের সুন্দর সূর্যোদয় উপভোগ করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, শেষ সন্ধ্যাগ্নির ভস্মের চারিপার্শ্বে বহু শিষ্য সমবেত। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমি বসিতেই স্বামী তুরীয়ানন্দ আমার সম্মুখে একটী ধূপকাঠি জ্বালিয়া সম্মুখস্থ বালিতে পুঁতিয়া দিলেন। প্রত্যেক উপাসকের সম্মুখে এইরূপ ধূপ জ্বলিতেছিল। সুবাসিত শুভ্র ধূপের তেরটি সরু শিখা প্রাতঃকালীন আকাশে বাতাসে মিশিয়া গেল। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি ইহাই এই সকল উপাসকের একমাত্র ক্রিয়ামূলক ধর্মানুষ্ঠান। অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে আমি চক্ষু বুজিলাম। সকালটি খুব মনোরম ও ধ্যানোদ্দীপক ছিল। চাতকের তরল স্বরকম্পন, দূরাগত গরুর ঘণ্টার টুংটুং ধ্বনি, কাঠঠোক্‌রা পাখীর ঘন ঘন মৃদু আঘাত, চিতাবাঘের তীব্র চীৎকার, শীতল বায়ুর শ্রুতিমধুর সোঁ সোঁ শব্দ, ধূমায়মান ধূপের সূক্ষ্ম সুগন্ধ এবং সংস্কৃত শব্দের সুমধুর উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কিছুই কিছুক্ষণের জন্য আমার মনের বিষয়ীভূত হইল না। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে অসাধারণ শারীরিক স্থৈর্য, হয়ত বা নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস, দৃশ্যের বিচিত্র রমণীয়তা এবং আর কিছু—দিব্য পরিবেশ বা অন্য যাহাই বলুন—আমি অন্তরে তাহার ভাষাহীন অনাহূত সঙ্গীতের সন্ধান পাইলাম। বোধ করিলাম, যেন আমি অনন্ত সঙ্গীতের অসীম সুরের একটী যন্ত্র। অনির্বচনীয় অপূর্ব স্বস্থতা ও স্থিরতার আবেশ নিদ্রার মত আমাকে অভিভূত করিল। এমন অনুকূল পরিবেশের মধ্যে মনকে দুঃসাধ্য একাগ্রতায় নিমগ্ন করিয়া ঘণ্টাধিক স্বেচ্ছাপ্রসূত নিশ্চলতা অভ্যাসের উপকারিতা সাধারণ আমেরিকান কিরূপে বুঝিবে? সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন। কারণ, ইহা পরীক্ষার যোগ্য। ইহাতে বিন্দুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কা নাই।

প্রায় একঘণ্টা নীরবতা ও স্থিরতা অভ্যাসের পরে প্রথমে এক জন, পরে আর এক জন শিষ্য সেই সাধকচক্র ছাড়িয়া দৈনন্দিন সাধারণ কর্মে ব্যাপৃত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ব্যবহার্য সমুদয়

জল চার মাইল দূর হইতে বাল্‌তিতে ভরিয়া বহিয়া আনিতে হইত। কিন্তু সম্প্রতি শিবির হইতে সিকি মাইলের মধ্যে একটী ভাল প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ জল আনিতে কূপের কাছে গেলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, ইহাদের গুরু কি কোন দিব্য অধিকারের বলে শ্রমসাধ্য নিত্যকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন? কিন্তু আমার বিস্ময়ের অবকাশ বেশীক্ষণ রহিল না। স্বামী তুরীয়ানন্দ শিবিরের কর্মে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বাল্‌তি হাতে সকলের সহিত শীঘ্র মিলিত হইলেন। নারীগণ প্রাতরাশ প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃতা হইলেন এবং অচিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণরূপ ভোজনশালার দোদুল্যমান চন্দ্রাতপের তলায় পরিবেশন করিলেন বৃক্ষের ধূমপানের নল, ভাল রুটীমাখন, ঈষৎ সিদ্ধ ফল। বলা বাহুল্য, এই আশ্রম-শিবির নিরামিষাশী। বন্ধুদের প্রীতিপ্রদ প্রসঙ্গে, ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমানে প্যারিসে অবস্থানকারী স্বামী বিবেকানন্দের কথায় এবং মাঝে মাঝে দার্শনিক প্রসঙ্গে প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত হইল।

'মানুষ এত পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার পবিত্রতা যেন স্পর্শযোগ্য হয়। স্থূল অর্থে দেহও এত বিশুদ্ধ করা যায় যে, সে বিশুদ্ধি বাস্তব হয়, এবং যেখানে থাকে সেখানে ইহার বিশুদ্ধি বিকীর্ণ করে।

'যদি তুমি যোগাভ্যাস কর তোমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভবশক্তি এত সূক্ষ্ম হইবে যে, তুমি এই তন্মাত্রগুলি দেখিতে পাইবে। যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি যে দৈহিক ও মানসিক পরিবেশ বিকীর্ণ করে তাহাই তন্মাত্র।

'আমরা স্বাধীন ও পরাধীন উভয়ই। আমাদের আত্মা মুক্ত, কিন্তু দেহ ও মন বদ্ধ। সেইজন্য বন্ধন ও মুক্তির পরস্পর-বিরুদ্ধ জ্ঞান সমকালে সম্ভূত হয়। আমরা মনে করি, আমরা মুক্ত কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে, আমরা বদ্ধ। যদি তুমি বল যে, মুক্তির ভাব ভ্রান্তিমাত্র, তাহলে আমি বলবো যে, বন্ধনের ভাবও সম-শ্রেণীর ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কারণ, বন্ধন ও মুক্তির জ্ঞান একই ভিত্তিতে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে আরূঢ়। রাজযোগের ইহাই বাণী।' এইরূপে স্বামী তুরীয়ানন্দ মানজানিতা গাছের শাখায় নির্মিত আসনে টেবিলের শিরোদেশে বসিয়া কণ্ঠস্থ শাস্ত্রবাণী একটীর পর একটী প্রশান্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শুনাইলেন।

'কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি আপনাদের, স্বামী?' একজন বিস্ময়বিমুগ্ধ আশ্রমবাসী বলিয়া উঠিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, 'এখন আমার তত নাই। অতীতে অনেকের ছিল এবং বর্তমানে কাহারো কাহারো আছে। একটী পুস্তক এক বার মাত্র পড়িলেই মুখস্থ হইত।' আহার সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে আপনার একটী ফটোগ্রাফ লইতে পারি কি?' আশ্রমবাসিগণের সম্মতিক্রমে চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত ওকবৃক্ষরাজির নিম্নে লতাকুঞ্জে অবস্থিত সশিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দের একটী ফটো লইলাম। উক্ত কুঞ্জে তিনি ও তাঁহার অধিকাংশ শিষ্যগণ একত্রে বসিয়া আহার করেন। সকলের একত্র আহারে বসিবার সুযোগ হয় না। অল্প কয়েকজন ছাত্রী তাঁহাদের ক্ষুদ্র স্থানে একত্র বসেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এই হিন্দু দার্শনিকের পদানুগ হইয়াছেন।

সুস্পষ্ট স্বস্তিবোধ প্রকাশানন্তর স্বামী তুরীয়ানন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। মামুলি উচ্ছ্বসিত শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি বাগানের

মধ্যে উষ্ণ গৃহে গেলেন। থালাবাসন ধৌত এবং তাঁবুগুলি পরিষ্কৃত হইলে সেখানকার অক্লান্ত দার্শনিক-গণ তাঁহাদের অগণিত কর্তব্য সম্পাদনার্থ পুনরায় মিলিত হইলেন। এইবার ধ্যানের পূর্বে 'রাজযোগ' হইতে পড়া হইল। 'রাজযোগে'র পরে আদি হিন্দু শাস্ত্র বেদের সংস্কৃতবাক্যাবলী প্রথমে অবর্ণনীয় সুমধুর স্বরে পঠিত এবং তদন্তে অনূদিত হইল। পঠিত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার কপাল কুঞ্চিত করিয়া ভাবপ্রকাশক ভঙ্গীতে এবং সরল বাক্যে শিষ্যগণের সুসূক্ষ্ম সন্দেহসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আলোচিত সামান্য সমস্যা-গুলির মধ্যে ছিল, সৃষ্টিতত্ত্ব, নৈতিকতা বনাম আধ্যাত্মিকতা, প্রকৃতির স্থান ও সীমা এবং ক্রমবিকাশ। হাক্সলে এবং জন ফিস্কের বাক্য উদ্ধৃত হইল। হাক্সলে বলিয়াছিলেন, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নৈতিক আদর্শের সম্বন্ধ নাই। ইহার প্রতিবাদে জন ফিস্কের উক্তি এই যে, বিশ্বপ্রকৃতি কি একমাত্র নৈতিক আদর্শের জন্য বিদ্যমান নহে? স্বামী তুরীয়ানন্দ আলোচনা-সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য শিষ্যগণকে আত্মস্বরূপের ধ্যান করিতে বলিলেন।

এইবার আমাকে ফিরিবার কথা ভাবিতে হইল। সত্যান্বেষিগণের সৎসঙ্গ করিবার সময় অতীত হইল। বহির্জগতের লোকের ন্যায় আমিও তাঁহাদিগের তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। শান্ত সন্ন্যাসীর সুভদ্র মুখমণ্ডল এবং তৎপশ্চাতে গভীর নীলাকাশ, নবীনা ও প্রাচীনা শিষ্যাদের গুরুর ন্যায় প্রশান্ত ভাব, শিষ্যদের তন্ময়তাপূর্ণ এবং স্তিমিত বা উন্মুক্ত নয়নসমূহ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। আমি আশ্রমে আরও এক ঘণ্টা কাটাইলাম। রোজ চার ঘণ্টা তাঁহারা ধ্যান ও উপাসনা করেন। আমি তাঁহাদের সাধননিষ্ঠায় স্তম্ভিত হইলাম।

মাঝে মাঝে সঙ্গীতবৎ সুমধুর অদ্ভুত ধ্বনি 'ওম্' 'ওম্' 'ওম্' আশ্রমে শুনা যাইত। 'আইডা' গ্রন্থে 'থ'র প্রতি মিশরীয় একটি স্তোত্রের কথা এই ওঁকার ধ্বনি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। 'ওম্' 'ওম্' 'ওম্' শব্দে নিশ্চয়ই কোন যাদু আছে। ধ্যানচক্রে যোগ দিবার লোভ হইল। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। আমি আমার কেবিনে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলাম। প্রাচীনতম ধর্মের মঙ্গলসূচক 'ওঁ'কার ধ্বনি ক্যালিফর্নিয়ার উপত্যকায় ধ্বনিত হইতেছে! ভারতের এই বেদান্তধর্মের উৎপত্তির কাহিনী অতীতের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন।

কিন্তু যে দেশে নিত্য এই 'ওঁ'কার ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিতেছে বা মর্মান্তিক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। ইন্দ্রিয়-ভোগের আত্যন্তিক ত্যাগ শিক্ষা দাতা এই ধর্ম এবং তদবলম্বী হিন্দু জনসাধারণের দুরবস্থা—এই উভয়ের মধ্যে কি কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে? এই পর্বতবাসী ভাবুকের কথা হয়ত সত্য যে, পাশ্চাত্যের বাস্তববাদ এবং প্রাচ্যের আদর্শ-বাদের সম্মিলন হইতে সমুদ্ভূত সত্যযুগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে। কে জানে? এই মুষ্টিমেয় সদয় নরনারীগণের নিকট বিদায় লইয়া শান্তি আশ্রম ত্যাগ করিলাম। প্রত্যাগমনের পথে 'ওম্' 'ওম্ 'ওম্' সুর কর্ণে বাজিতে লাগিল।

সর্দির কারণ ও তাহার প্রতিকার

ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্‌স্

মানুষের নানা অসুখের মধ্যে সর্দি একটি সমস্যা। এর সঠিক চিকিৎসাও নেই। অনেকে তাই বিরক্তির সঙ্গে বিদ্রূপ করে বলে থাকেন যে ডাক্তারী চিকিৎসায় সর্দি সারতে যদি এক সপ্তাহ লাগে ত' বিনা চিকিৎসায় লাগবে সাত দিন। দুঃখের বিষয় কথাটি সত্য। সর্দির উপদ্রব নিবারণের জন্য এত কাল অনেক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে এবং এই অসুখের ফলে প্রতি বছর দেশের উৎপাদনপ্রচেষ্টায় কাজের সময়ও কম নষ্ট হয় নি।

গত আড়াই বছর ধরে বৃটেনে স্যালিসবারীর 'হার্ভার্ড হাসপাতালে' এই সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। যদিও এই রোগের চমকপ্রদ প্রতিষেধক এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তবু 'মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল' এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রি-দপ্তরের কর্তৃত্বাধীনে যে 'ইউনিট'টি সেখানে কাজ করছে তাদের গবেষণার ফলাফল আশাপ্রদ।

এই গবেষণার কাজে একটা সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে শিম্পাঞ্জি ছাড়া অন্য কোন জন্তুর মধ্যে এই রোগ জন্মানো যায় না, আবার এই অসুখও এমন কিছু কঠিন নয় যে রোগীকে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে রেখে সময় নিয়ে যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা সম্ভব। তার ফলে গবেষণার কাজও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। স্যালিসবারীতে এই বারই প্রথম মানুষের উপর ব্যাপক গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে, গত আড়াই বছরে প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক দশ দিন ধরে হাসপাতালে থেকে এই কাজে সাহায্য করেছেন।

হাসপাতালে আসার পর তাঁদের মধ্যে যাতে বাইরে থেকে রোগ সংক্রমণ না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, কারণ তা'হলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। এমনি করে মানুষের উপর দিয়ে গবেষণার কাজ চল্‌লেও রোগপ্রবণ জন্তুর সন্ধান বন্ধ রাখা হয়নি, যদিও তা অসাধ্য। শজারু, বাঁদর, নকুল, ইন্দুর এবং আরও অনেক রকম জন্তু নিয়ে কাজের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কারো মধ্যে এই রোগ জন্মানো সম্ভব হয়নি, এরা সবাই মানুষের এই বিরক্তিকর অসুখ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পরীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে যে রোগ প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগেই মানুষের মধ্যে রোগের বিষ ঢুকে রয়েছে। অনেককে বাইরে থেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হলেও তারা আসলে হয়ত রোগের বিষ বহন করে বেড়াচ্ছে।

নাকের শ্লেষ্মার মধ্যে যে বীজাণু থাকে তার কাজ করার শক্তি অত্যন্ত বেশী। এই শ্লেষ্মাকে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখতে পারলে তার সংক্রমণক্ষমতা দু'বছর বা তারও বেশী দিন পর্যন্ত থাকতে পারে, অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে এবং সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

মুরগীর ডিমের মধ্যে এক বার সর্দির বীজাণু প্রবেশ করিয়ে বীজাণু-অনুশীলনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। যে বীজাণু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পরম স্বাস্থ্যবান লোককেও কাবু করতে পারে, তা মুরগীর ভ্রূণের কোমল কোষসংস্থার মধ্যে কোন কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সাধারণতঃ মানুষের সর্দির কারণ সম্বন্ধে

প্রচলিত কতকগুলি ধারণা আছে—অনেকের মতে যারা সর্দিতে ভুগছে তাদের কাছ থেকেই সর্দি সংক্রমিত হয়, আর এক দল মনে করেন যে পায়ে ঠাণ্ডা লাগলে বা বাইরের হাওয়ার ঝাপটায় সাধারণতঃ সর্দি হয়ে থাকে। স্যালিসবারীতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে উপরের দুই রকমের মতই প্রায় ঠিক।

সর্দির কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে সর্দির বীজাণুর কথাই প্রথমে মনে হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সর্দি তখনই হয় যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে দেহের প্রতিরোধক্ষমতা সাময়িকভাবে কমে যায় বা কেউ যদি যে লোকটি সর্দিতে ভুগছে এবং অনবরত হাঁচছে তার সংস্পর্শে আসে।

এই সব লোকের সর্বঘটে বর্তমান রুমালও রোগসংক্রমণের আর একটা বড় কারণ। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে রোগের বিষ এবং বীজাণু সমান ভাবে রুমালে বাহিত হয়ে হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংক্রমণের এই বিপদ এড়ানো খুবই সহজ যদি রুমালে সব সময় প্রয়োজনীয় রোগবিনাশক ঔষধ লাগিয়ে রাখা যায়।

সর্দিপ্রতিরোধ করার ক্ষমতা সকলের মধ্যে সমান ভাবে নেই, তা ছাড়া প্রত্যেক বছরে মানুষের প্রতিরোধক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়। স্যালিসবারীতে পরীক্ষার সময় স্বেচ্ছাসেবকদের দেহের মধ্যে হাজার হাজার গুণ বেশী শক্তিসম্পন্ন রোগের বিষ প্রবেশ করিয়ে দেখা গিয়েছে যে তাতে পাঁচজনের মধ্যে দুজনের সেই সময়ের মত কিছুই হয়নি, তাঁদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই আবার সারা বছর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেননি।

অনেকের ধারণা একবার সর্দিতে ভোগার পর কিছু দিন আর রোগসংক্রমণের ভয় থাকে না, কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে যে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে কেউ কেউ একবার রোগভোগের পর পনর দিনের মধ্যে আবার রোগাক্রান্ত হয়েছেন।

অনেকের আবার বিশ্বাস যে সর্দি একান্তভাবে শীতকালীন রোগ, কারণ ঠাণ্ডার মধ্যেই তার জন্ম। স্যালিস্‌বারীর গবেষকরা অবশ্য তা স্বীকার করতে রাজী নন। 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে' ডিসেম্বর মাসে যখন মধ্য-গ্রীষ্মের তুলনায় তাপ সামান্য কম থাকে তখনও সর্দির ব্যাপক আক্রমণ হতে দেখা গিয়েছে। অন্যান্য দেশেও বর্ষারম্ভে সর্দির প্রাদুর্ভাব হয়েছে। অতএব রোগসংক্রমণের ভয় গ্রীষ্মকালেও বর্তমান, তখন তার পরিমাণ কম হওয়ার কারণ এই যে মানুষে সাধারণতঃ সেই সময় বদ্ধ ঘরের মধ্যে ভিড় করে থাকে না, বাইরের মুক্ত হাওয়ায় তাদের বেশীর ভাগ সময় কাটে এবং মুক্ত হাওয়ায় রোগসংক্রমণের ভয় অনেক কম।

স্যালিসবারীর গবেষণাগারে যাঁরা আজ এই নিয়ে নানা রকমের পরীক্ষা করছেন তাঁরা হয়ত এখনও সর্দির প্রতিষেধক সম্পর্কে সঠিক কিছু নির্ণয় করতে পারেন নি কিন্তু তাহলেও তাঁদের এই গবেষণার ফলাফল যে অদূর ভবিষ্যতে এক দিন নূতন পথের সন্ধান দেবে তাতে সন্দেহ নেই। *

* নিউদিল্লীস্থ ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্‌-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

শ্রীরঙ্গম্

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

পুণ্যতোয়া কাবেরী কুর্গ প্রদেশের ব্রহ্মগিরি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ ভারতকে পবিত্র করিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর তিনটী দ্বীপে তিনটী মন্দির আছে। প্রথম দ্বীপটী মহীশূরে শ্রীরঙ্গপটনমে অবস্থিত। ইহাকে পশ্চিম রঙ্গ বা আদি রঙ্গ বলা হয়। দ্বিতীয়টীও মহীশূরে শিবসমুদ্রমে বিদ্যমান। ইহার নাম মধ্য রঙ্গ। তৃতীয়টী ত্রিচিনাপল্লীতে অবস্থিত। ইহা অন্তরঙ্গ নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবগণ শ্রীরঙ্গম্ বা কোবিল বলিতে সাধারণতঃ ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গমকে বুঝিয়া থাকেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড মহাপ্রলয়ে প্লাবিত ছিল, তখন ভগবান ঐ অনন্ত জলরাশির মধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন। এই পবিত্র কাবেরীর দ্বীপসমূহের মধ্যেও ভগবান সেই রূপ অনন্ত শয্যায় শায়িত ভাবে নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন।

ত্রিচিনাপল্লী শহর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। এই কাবেরীর কোল্লিড়ম্ (Coleroon) নামে একটি শাখা বিভক্ত হইয়া শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপের সৃষ্টি করে। এই নদীতে একদা কতিপয় দস্যুর হত্যা সাধিত হয় বলিয়া ইহার নাম "কোল্লিড়ম্" হইয়াছে। কোল্লি=হত্যা ইড়ম্=স্থান্; যে স্থানে হত্যা হইয়াছে অর্থাৎ হত্যাস্থল। স্থানটিকে তামিল ভাষায় কোল্লিড়ম্ বলে। নদী দুইটী পুনর্মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে বিলীন হইয়াছে। এই দ্বীপেই ভগ্ন মন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথজীর পূজা হইত।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বার জন আলোয়ার আছেন। তামিল ভাষায় সিদ্ধপুরুষ বা মহাপুরুষকে আলোয়ার বলে। তিরুমঙ্গাই আলোয়ারগণের অন্যতম। তিনি বাল্যকাল হইতেই পরম ভক্ত ছিলেন এবং দেশবিদেশে তীর্থ পর্যটন করিয়া নানা দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার মত পণ্ডিত ও সুকবি দ্বিতীয় কেহই ছিলেন না। তাঁহার চারিজন শিষ্য ছিলেন। একদা তিনি সশিষ্য নানা তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে এই শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিতে আসিলেন। মন্দিরটীর অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় ছিল। চারিদিকে গভীর জঙ্গল, তাহাতে হিংস্র জীবজন্তুর বাস! ঐ অবস্থাতেই তিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহকে ফুলচন্দন নিবেদন করিয়া হিংস্র জন্তুর ভয়ে ফিরিয়া আসিতেন। ভগ্ন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কি উপায়ে এই ভগ্ন মন্দিরের পরিবর্তে সুন্দর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিত্যপূজা ও ভোগরাগাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তিনি সেই চিন্তাই অহর্নিশ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মন্দির নির্ম্মাণের বাসনা তাঁহার অত্যন্ত প্রবল হইল।

তিনি একদিন শিষ্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া নানা দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট মন্দির নির্ম্মাণার্থ আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্থলিপ্সু ধনিগণ সাহায্য করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে কটূক্তি করিতে কুণ্ঠিত

হইল না। ইহাতে তিরুমঙ্গাই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি শিষ্যদের বলিলেন 'শ্রীভগবানের মন্দির নির্ম্মাণ করিতেই হইবে। কি উপায়ে ইহা সম্ভব? আমি পথের ভিখারী, কোথা হইতে অত টাকা সংগ্রহ করি?' এসব শুনিয়া শিষ্যগণ বলিলেন 'আমরা আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।'

প্রথম শিষ্য বলিলেন, 'আমার নাম "তোরাবড়ক্কুন।" (তোরা=পরাস্ত হয় না, বড়ক্কুন=তর্কে, যিনি তর্কে পরাস্ত হন না অর্থাৎ তার্কিকশিরোমণি)। আমি যখন ধনশালীর পার্ষদগণকে তর্কজালে বদ্ধ করিব, তখন আপনি লোকজন সহ ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবেন।' দ্বিতীয় শিষ্য বলিলেন, 'আমার নাম—"তাড়-উদুয়ান" (তাড়=তালা, উদুয়ান=খোলা, যিনি তালা খুলিতে পারেন অর্থাৎ দ্বারোদ্ঘাটক)। আমি চাবি ছাড়া সমস্ত তালা খুলিতে পারি। ধনভাণ্ডার যতই দৃঢ়ভাবে বদ্ধ থাকুক না কেন, আমি অনায়াসেই সব খুলিয়া দিতে পারিব। আপনি সেই সময় লোকজন সহ ভাণ্ডার হইতে ধনাদি লুণ্ঠন করিবেন।' তৃতীয় শিষ্য বলিলেন, 'আমার নাম "নেড়েলাই মেরিপ্পান।" (নেড়েলাই=ছায়া, মেরিপ্পান=পদ দ্বারা স্পর্শ, যিনি পদ দ্বারা ছায়াস্পর্শ করেন)। আমি পদদ্বারা যাহার ছায়া স্পর্শ করিব, তাহার চলচ্ছক্তি রোধ হইয়া যাইবে। সেই সময় আপনি লোকজন সহ ধনশালী পথিকের ধন লুণ্ঠন করিবেন।' চতুর্থ শিষ্য বলিলেন, 'আমার নাম "নীলমেন নড়প্পান্।" (নীলমেন=নীরমেন=জলের উপর, নড়প্পান=হাঁটা, যিনি জলের উপর হাঁটিতে পারেন অর্থাৎ জলোপরিচর)। রাজপুরী যত বড় পরিখাদ্বারা বেষ্টিত হউক না কেন, আমি অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিব; কাজেই রাজ-ভাণ্ডারের ধন আপনার।'

শিষ্যগণের অদ্ভুত গুণের কথা শুনিয়া তিরুমঙ্গাই খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং একটী দস্যুদল গঠন করিলেন। তিনি নিজে তাহার দলপতি হইয়া দস্যু ও শিষ্যগণসহায়ে নানা দেশ হইতে অনেক ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপের কোন এক নিভৃত স্থানে রাখিতে লাগিলেন। পরে নানা দেশদেশান্তর হইতে ভাল ভাল শিল্পিগণকে আনাইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথম দুই বৎসরে গর্ভমন্দিরের কাজ শেষ হইল। এই ভাবে হাজার হাজার শিল্পীর সাহায্যে ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রাকার-বেষ্টিত অন্তঃপুর এবং মহোচ্চ গোপুরমের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে প্রায় ষাট বৎসর লাগিয়াছিল। তখন তিরুমঙ্গাই প্রায় অশীতি বৎসরে পদার্পণ করেন। এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা এবং ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া স্থানীয় ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনেকে আবার ভয়েও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কারণ, প্রথমতঃ তিরুমঙ্গাই যথার্থ ভক্তিসহকারে মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য করিতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি খুব পরাক্রমশালী, তাঁহার অধীনে সহস্র সহস্র দস্যু ছিল। এই সময় সাহায্য না করিলে হয়ত ধনরত্ন সবই লুণ্ঠন করিয়া লইবেন। সেই সময় তাঁহার রাজার ন্যায় প্রতাপ ছিল।

কিন্তু তাঁহার আচারব্যবহার সন্ন্যাসীর ন্যায় ছিল। তিনি ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিনান্তে স্বপাকে ভোজন করিতেন এবং অহর্নিশ ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিতেন। মন্দিরের কার্য্যে তিনি

সমস্ত অর্থই ব্যয় করিলেন, হাতে এক কপর্দ্দকও রাখিলেন না। সেই সময় তাঁহার পূর্ব্বগঠিত দস্যুদলের কয়েক জন তাঁহার নিকট অর্থপ্রার্থনা করে। অর্থ না পাওয়াতে তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হয়। কপর্দ্দকশূন্য তিরুমঙ্গাই উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে নীরমেন নড়প্পানকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিয়া দিলেন। শিষ্য দস্যুদের বলিলেন, "চল ভাই, আমরা নৌকাযোগে কাবেরীর অপর পারে যাইয়া নিভৃত স্থানে আমাদের প্রভুর যে ধন রত্ন লুক্কায়িত আছে, সেই সব বণ্টন করিয়া লইব।" এই কথা শুনিয়া দস্যুরা সকলেই নড়প্পানের সঙ্গে গেল। তখন বর্ষাকাল, কাবেরী দুই কূল প্লাবিত করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে তীব্রবেগে চলিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘোর অন্ধকারময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা নৌকাযাত্রা করিলেন। ধীরে ধীরে নৌকা অদৃশ্য হইল। হঠাৎ ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল। পরে সবই শান্ত! নড়প্পান দ্রুতবেগে আসিয়া গুরুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। তখন তিরুমঙ্গাই বলিলেন, "বৎস, বিচলিত হইও না। শ্রীরঙ্গনাথজীই উহাদের দস্যুবৃত্তি ও অপকর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও নিজ সকাশে আশ্রয় দিয়াছেন। আর যে উদ্দেশ্যে আমরা দস্যুবৃত্তি করিতেছিলাম, তাহাও সুসম্পন্ন হইয়াছে। চল, বাকী জীবন শ্রীরঙ্গনাথজীর সেবায় অতিবাহিত করি।" কিছুকাল পরে শিষ্যবর্গসহ তিরুমঙ্গাই শ্রীরঙ্গনাথজীর পাদপদ্ম লাভ করেন। দস্যুবৃত্তির সময় তিরুমঙ্গাই কোন এক রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দেবমন্দিরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া বিগ্রহের হস্তের অঙ্গুলিতে একটি সুন্দর হীরক অঙ্গুরীয় দেখিতে পান। অঙ্গুলি হইতে কোন প্রকারে তাহা খুলিতে না পারিয়া অবশেষে দন্ত দ্বারা কাটিবার চেষ্টা করেন। দন্তে অঙ্গুলিস্পর্শ হওয়া মাত্র তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়। সেই অবধি তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর থাকিতেন এবং ভগবদ্‌বিষয়ক অনেক স্তব রচনা করেন। তামিলে ঐ স্তবকে "তিরুবাইমোড়ি" বলে। তিরু=শ্রী, বাই=মুখ, মোড়ি=কথা, অর্থাৎ শ্রীমুখকথা।

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরটী সাতভাগে বিভক্ত। যথা :—গোপুরম্, দ্বারম্, বলীপীঠম্, দ্বিজস্তম্ভ, মহামণ্ডপম্, গরুড় ও গর্ভমন্দির। ইহার প্রত্যেকটিই মনের এক একটি সোপান বলিয়া অভিহিত। এক এক স্তর অতিক্রম করার পর যেমন সহস্রারে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ হয়, সেইরূপ মন্দিরের এক একটি অংশ অতিক্রম করিলে গর্ভমন্দিরে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়। গোপুরমে বা রাজ-গোপুরমে স্তরে স্তরে নয়টী জানালা আছে। এই সকল পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ, বাক্, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গোপুরমে নানা রকম দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে। তারপর ছয়টি প্রাকার-বেষ্টিত দ্বার আছে। ইহারা ষট্‌চক্রের অনুরূপ। দ্বার অতিক্রম করিয়া পরে একে একে কুলকুণ্ডলিনীর প্রতীক বলীপীঠম্, প্রাণায়ামের প্রতীক স্তম্ভ, মহামণ্ডপম্ ও জীবাত্মার প্রতীক গরুড় অতিক্রম করিয়া গর্ভমন্দিরে আসিতে হয়। গরুড়ের একটী মন্দির আছে। প্রথমে তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করিতে হয়। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হয়,—তিনি যেন মনের সব কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া শুদ্ধা ভক্তি দেন, যাহাতে ভগবানকে দর্শন করিতে পারা যায়। গরুড়ের পর অর্দ্ধমণ্ডল ও রত্নবেদী। গর্ভমন্দির প্রদক্ষিণকালে মন্দিরের ডানদিকে বার জন আলোয়ারের মূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পরিক্রমা সমাপনান্তে গর্ভমন্দিরে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে হয়। গর্ভমন্দিরের একটী মাত্র দরজা। একপাশে একটী তেলের প্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। বিগ্রহ কষ্টিপাথরের তৈয়ারী, প্রায় ১৫ ফুট লম্বা

শায়িত মূর্ত্তি। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবান রত্নবেদীতে বিরাজ করিতেছেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ কর্পূর, ধূপ, পুষ্পমাল্য, নারিকেল ও কলা প্রভৃতি পূজার জন্য আনিয়া থাকেন। পূজারী নারিকেলটি ভাঙ্গিয়া কলাসহ নিবেদন করেন। পরে কর্পূর জ্বালিয়া সামনের পর্দ্দাটী সরাইয়া তিনি ভগবানের আরতি করেন। ঐ আলোতেই বিগ্রহকে ভাল ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইলে ভগবদ্দর্শন হয়। বিগ্রহ নানারকম ফুল, পাতা, চন্দন, মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত। অতি সুন্দর ভাব! প্রথমে শ্রীভগবানের ভোগ হয়। সেই নৈবেদ্য পর পর লক্ষ্মী, গরুড় ও বলীস্তম্ভকে নিবেদন করা হয়। শয়নগৃহের দ্বারকে তামিলে স্বর্গবাসান বলে। স্বর্গ=ইন্দ্রলোক, বাসান=দরজা অর্থাৎ স্বর্গদ্বার। নারায়ণ ও লক্ষ্মী একসঙ্গে থাকেন, তাই শয়নগৃহকে "বৈকুণ্ঠধাম" বলে। "বৈকুণ্ঠ-একাদশী" উপলক্ষে একাদিক্রমে নয় দিন উৎসব হইয়া থাকে। সেই সময়ে শ্রীভগবান আলোয়ারগণসহ শোভাযাত্রা করিয়া শহরে ভ্রমণে বাহির হন। অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং ভক্তদের দর্শন দিতে বাহিরে আসেন। শোভাযাত্রা প্রথমে তিরুবাইমোড়ি, পরে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র, প্রতীক, স্থানীয় ভক্ত, আলোয়ারগণের উৎসব-বিগ্রহ, পূজারী, রৌপ্যদোলায় ভগবানের উৎসব-বিগ্রহ লইয়া "বেদপরায়ণম্" পাঠ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়।

আলোয়ার

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বার জন আলোয়ার আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। তাঁহাদের নামঃ—পোইহে, পূদত্ত, পে, তিরুমড়িশি, নাম্মা (শঠারি), মধুরকবি, রাজা কুলশেখর, পেরিয়া, অণ্ডাল, তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি, তিরুপ্পান ও তিরুমঙ্গাই।

পোইহে

পোইহে=পুকুর। তামিল ভাষায় পুকুরকে পোইহে বলে। দ্বাপরযুগে তিনি কাঞ্চিনগরে (কাঞ্জিভরমে) দেব-সরোবরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুর পাঞ্চজন্য শঙ্খের অবতার-রূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান বিষ্ণু যেমন পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনিতে শত্রুপক্ষের ভীতিসঞ্চার করিয়া তাহাদের সমুদয় বলবীর্য্য হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পোইহে আলোয়ারও তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে নাস্তিকদিগের তেজবীর্য্য হরণ করিতেন। তাই তিনি পাঞ্চজন্যের অবতার। সরোবরে জন্ম হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে পোইহে বলিয়া থাকে।

পূদত্ত

তাঁহার জন্ম পঞ্চভূত হইতে হইয়াছে। মাদ্রাজ শহর হইতে বার মাইল দক্ষিণে মল্লা-পুরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান তিরুবড়লমলইর পূর্ব্বনাম মল্লাপুরী। তিনি পদ্মের ভিতর হইতে শ্রীবিষ্ণুর গদাংশে অবতীর্ণ হন। ভগবান যেমন গদা দ্বারা অসুরগণকে দমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূদত্তও তাঁহার পাণ্ডিত্যে অসুরপ্রবৃত্তি লোকদিগকে নিরস্ত করিতেন। তাই তিনি গদার অবতার। পদ্মফুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে পূদত্ত বলিয়া থাকে।

পে

পে=উন্মাদ। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণপ্রান্তে ময়লাপুর বা ময়ূরপুরের একটি কূপেতে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বিষ্ণুর খড়্গাংশে অবতীর্ণ হন। পাণ্ডিত্যে মোহান্ধদের মোহপাশ ছেদন করিতেন, তাই তিনি খড়্গের অবতার। অহর্নিশ ভগবৎপ্রেমে উন্মাদের ন্যায় বিভোর থাকিতেন বলিয়া তাহাকে পে বলা হইয়া থাকে।

তিরুমড়িশি

তিরু=শ্রী, মড়িশি=শহরের নাম। এই শহরের নামানুসারে তাঁহার নাম হয়। তিনি মহীসারপুরে ব্রাহ্মণবংশে শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনাংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহীসারপুরের বর্ত্তমান নাম তিরুমড়িশি। তিনি তীক্ষ্ণ জ্ঞানবিচারে মোহাচ্ছন্নদের মোহ দূর করিতেন, তাই তাঁহাকে সুদর্শন চক্রের অবতার বলা হয়। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি এত প্রবল ছিল যে তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। উপরোক্ত চার জন আলোয়ার দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম তিন জন এক দিন ঘটনাচক্রে একই স্থানে মিলিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করেন এবং প্রত্যেকেই এক একটী "তিরুবাইমোড়ি" রচনা করেন। ঘটনাটি এই :—

একদা এক পথিক বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া পথ চলিতে ছিলেন। সেই সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় ঝড়বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। ক্রমেই বাত্যা প্রচণ্ডতর হইতে লাগিল। পথিক এই ঘোর বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণ পরে পরিশ্রান্ত হইয়া আশ্রয়ের অভিলাষে এদিক ওদিক তাকাইবার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। পথিক ঐ আলোকে দূরে একটি জীর্ণ পর্ণকুটির দেখিতে পাইলেন। প্রাণভরা আশা নিয়া পথিক সেথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু কুটিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় পর্ণাচ্ছাদিত বারান্দার এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ জায়গাটি এত ছোট যে একটী লোক কোন প্রকারে শুইতে পারে। ঐ স্থানেই পথিক ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া সানন্দচিত্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর এক জন পথিক ঐরূপ দৈব দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া আশ্রয়লাভের আশায় ঐস্থানেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, এখানে কি একজন লোকের স্থান হইতে পারে?' প্রথম পথিক উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন 'হাঁ, আসুন, যে স্থানে একজন শুইতে পারে, সে স্থানে দুই জন বসিতে পারে।' উভয়েই বসিয়া আরাম করিতেছেন এমন সময় আর একজন পথিক ঐরূপ বিপদে পড়িয়া আশ্রয়লাভের আশায় ঐ স্থানেই আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়গণ, এইখানে কি একজন পথিকের স্থান হইতে পারে?' পথিকদ্বয় দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'হাঁ, আসুন্, যে স্থানে দুই জন বসিতে পারে, সেই স্থানে তিনজন দাঁড়াইতে পারে।' তিন জন একত্র হইলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই অপরিচিত ভাবে নীরবে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বাত্যা ও করকাধ্বনি বন্ধ হওয়াতে আকাশের ঘনঘটা কাটিয়া গেল সূর্য্যদেব সহাস্যবদনে প্রকাশিত হইলেন। এমন সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। এই ঘোর বিপদের মধ্যে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া সকলেই মোহিত হইলেন এবং প্রত্যেকেই এক একটি তিরুবাইমোড়ি রচনা করিয়া শ্রীভগবানের বন্দনা করিলেন।

প্রথম পথিক—

বৈয়াম তকালিয়া বারকাডালে নেইয়াকা,
বৈয়া কাদিরোণ বেলাক্কাকা সেইয়া,
সোডর আড়িয়ান আডিক্কে চুটিনেন চোলমালাই,
ইডার আড়ি নিঙ্গুকারে এণ্ড্রু।

নালাইর দিব্যপ্রবন্ধ, পোইহে ১ম।

বৈয়াম=পৃথিবী, তকালিয়া=দীপপাত্র, বারকাডালে=বড়সমুদ্র, নেইয়াকা=ঘৃতের মত। বৈয়া=গরম, কাদিরোণ=সূর্য্য, বেলাক্কাকা=দীপ, সেইয়া=লাল। সোডর=উজ্জ্বল, আড়িয়ান=চক্রধারী, আডিক্কে=পদে, চুটিনেন=অর্পণ করা, চোলমালাই=বাক্‌মালা (স্তব)। ইডার=বিপদ,

আড়ি=সমুদ্র, নিঙ্গকারে=দূর করা, এণ্ডে্া= এই ভাবে। হে চক্রধারী পৃথিবীরূপ দীপপাত্র, সমুদ্ররূপ ঘৃত ও সূর্য্যরূপ দীপ দিয়া তোমার পাদপদ্মে আরতি ও স্তব করিতেছি। তুমি এই ভাবে বিপদসাগর হইতে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় পথিক—

আনবে তাকালিয়া আড়োয়ামে নেইয়াকা,
ইনবুরুকে ছিন্দাই ইড়ুতিরিয়া নান বরুহি,
জ্ঞান সুড়ার-রেড়াক্কু এটানেন নারাণারকু,
জ্ঞান তামিল পুরিন্দণান।

নালাইর দিব্যপ্রবন্ধ, পূদত্ত, ১ম।

আনবে=প্রেমই, তাকালিয়া=দীপপাত্র, আড়োয়ামে=অনুরাগ, নেইয়াকা=ঘৃত। ইনবুরুকে =আনন্দে গলান, ছিন্দাই=চিন্তা, ইড়ু=দেওয়া, তিরিয়া=পলতে, নানবরুহি=মঙ্গলময়। সুড়ার= জ্বালাইয়া, রেড়াক্কু=দীপ, এটানেন =জ্বালিয়াছি, ণারানারকু=নারায়ণকে। পুরিন্দ=স্তব, ণান =করি। অর্থাৎ প্রেমরূপ-দীপপাত্রে, অনুরাগরূপ ঘৃতে, আনন্দময় চিন্তারূপ পলিতাতে, মঙ্গলময় জ্বলন্ত জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া, নারায়ণকে তামিল স্তব করিতেছি।

তৃতীয় পথিক—

তিরুকণ্ডেইন পোনমেনি কন্তেইন; তিহাড়ুম,
আড়ুক্কানআনি নিরামোন কন্তেইন; সেরুক্কিলাড়ুম
পোন আড়ি কন্তেইন পুরী শঙ্খম্ কাই কণ্ডেইন;
এন আড়ি বন্নান পাল ইণ্ড্।

নালাইর দিব্যপ্রবন্ধ, পে, ১ম।

তিরু=শ্রী, কণ্ডেইন=দেখেছি, পোন=সোনা, মেনি=শরীর, তিহাড়ুম= উজ্জ্বল, আড়ুক্কান= সূর্য্য, আনি=ধারণ, নিরামোম = বর্ণের মত, সেরুকিল্লাড়ুম =দর্পহারী, আড়ি=চক্র, পুরী= দক্ষিণমুখ, কাই=হাত, এন=আমার, আড়ি=সমুদ্র, বন্নান=বর্ণ, পাল=পুরুষেতে, ইণ্ড =আজ।

অর্থাৎ যাঁহার সোনার মত সুশ্রী শরীর, যিনি সূর্য্যের মত উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, যিনি দর্পহারী, স্বর্ণচক্র ও দক্ষিণমুখ শঙ্খহস্তে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার সমুদ্রের মত বর্ণ দেখিয়াছি, তাঁহাকে আজ স্তব করিতেছি।

পথিকরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই অপর দুই জনের দর্শনাভিলাষে বাহির হইয়া, দৈবদুর্বিপাকের ভিতরে পরস্পর মিলিত হন এবং শ্রীভগবানের দর্শনলাভে নিজেদের ধন্য মনে করেন। প্রথম পথিকের নাম পোইহে আলোয়ার, দ্বিতীয় পূদত্ত আলোয়ার, তৃতীয় পে আলোয়ার।

নাম্মা

নাম্মা=আমাদের। তিনি প্রেমিক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার প্রেমালাপে সকলেই তাঁহাকে পরম আত্মীয় ও আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য তাঁহার নাম হয় নাম্মা। তিনি ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণে কুরুকাপুরীতে বিষক্সেনের অংশে মহাত্মা কারির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীচকুলোদ্ভব এবং তাঁহার পিতা এক জন সমৃদ্ধিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নাম্মা আলোয়ার, শঠরিপু, শঠারি, পঠকোপা ও পরাঙ্কুশ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। অঙ্কুশ রূপ জ্ঞান দ্বারা তিনি অপরকে মোহান্ধকার হইতে উদ্ধার করিতেন বলিয়া তাঁহাকে পরাঙ্কুশ বলা হইত। মহাত্মা কারি অপুত্রক ছিলেন। একদা কারিদম্পতি নারায়ণের নিকট পুত্রপ্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদের ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ আশ্বাস দেন। শ্রীভগবানের আদেশেই শটারিপুর জন্ম হয়। বিষক্সেন নারায়ণের দ্বিতীয় মূর্ত্তি। তিনি নারায়ণী সেনার অধিনায়ক ছিলেন। শঠারিপু তাঁহারই অংশে অবতীর্ণ হন।

মধুর কবি

মধুর কবি সুমিষ্ট ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম মধুর কবি হয়। তিনি ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণে নাম্মা আলোয়ারের জন্মভূমির নিকট গরুড়াংশে জন্মগ্রহণ করেন। নাম্মা আলোয়ার তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

রাজা কুলশেখর

ইনি রাজা হইয়াও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে রাজা কুলশেখর বলা হয়। মালাবার দেশে তিরুভঞ্জিকোলম্ নগরে বিষ্ণুর কৌস্তুভমণির অংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কেরলের অধিপতি ও রাজর্ষির ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কৌস্তুভমণির অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন বলা হয়। মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর এই তিনটী দেশের সমাবেশকে কেরল বলে। উক্ত তিন আলোয়ারই কলিযুগের প্রথমে অবতীর্ণ হন।

পেরিয়া আলোয়ার

পেরিয়া=শ্রেষ্ঠ। আলোয়ার=মহাপুরুষ। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। তিনি শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে (ধন্বিপুরে) বিষ্ণুর রথাংশে অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব্বদাই ভগবানের ভাবে বিভোর থাকিতেন। তাঁহার কন্যাকে শ্রীরঙ্গনাথের সহিত বিবাহ দেন। শ্রীরঙ্গনাথের শ্বশুর হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পেরিয়া আলোয়ার বলা হয়।

এই ভক্তবীরের কন্যার নাম অণ্ডাল। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। অণ্ডাল বয়স্কা হইলে পিতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করেন; কিন্তু বালিকা বলেন, 'শ্রীরঙ্গনাথজীই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছি, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। ইহা শুনিয়া পিতা একটু চিন্তান্বিত হইলেন। সেদিন রাত্রে স্বয়ং নারায়ণ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "অণ্ডাল স্বয়ং লক্ষ্মী, তাঁহাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে দ্বিধা করিও না।" তিনি মন্দিরের পূজারীকেও স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন "আগামী কল্য প্রাতে বিবাহ উপযোগী জিনিষপত্রসহ অণ্ডালের চিত্রালয়ে যাইবে ও অণ্ডালকে নানা রকম বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া মন্দিরে লইয়া আসিবে।" পূজারী স্বপ্নাদেশানুযায়ী কার্য্য সমাপন করিলেন। অণ্ডালের পিতা ইহাতে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। অণ্ডালও নানা সাজ-সজ্জায় ভূষিতা হইয়া পালঙ্কে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথকে বিবাহ করিতে চলিলেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীভগবান তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার শরীর শ্রীভগবানের অঙ্গে মিশিয়া গেল। পিতা অণ্ডালকে দেখিতে না পাইয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীরঙ্গনাথজী তাঁহাকে বলিলেন "অদ্য হইতে আপনি আমার শ্বশুর, আপনার কন্যা সর্ব্বদা আমাতেই থাকিবেন।" তখন অণ্ডালের পিতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীরঙ্গনাথকে প্রণামপূর্ব্বক স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অণ্ডাল

তিনি গোদা, চুড়ি কড়ুও নাচিয়ার, শ্রীরঙ্গনাথমহিষী বা রঙ্গনায়িকা এই তিন নামে অভিহিত হইতেন। গোদা=মিষ্টভাষী মেয়ে, চুড়ি=সাজান, কড়ুও=দেয়, নাচিয়ার=সাধ্বী মেয়ে; অর্থাৎ সুসজ্জিতা সাধ্বী মেয়ে। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথমহিষী বা রঙ্গনায়িকা বলা হয়। তিনি ত্রিচিনাপল্লীর দক্ষিণে তুলসীকাননে শ্রীলক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা হন। স্বয়ং লক্ষ্মী তিন রূপে বিরাজ করেন। শ্রীদেবী হইয়া নারায়ণের বক্ষে, ভূদেবী

হইয়া নারায়ণের দৃষ্টিরূপে, লীলাদেবী হইয়া নারায়ণের মাধুর্য্য ও মহিমারূপে বিরাজ করেন। অণ্ডাল নীলাদেবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পেরিয়া আলোয়ার অপুত্রক ছিলেন। এক দিন নারায়ণের পূজার্থে উদ্যানে তুলসী সংগ্রহ করিতে গমন করেন। তথায় একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেখিতে পাইলেন। শিশুদর্শনে তাঁহার সুপ্ত বাৎসল্য জাগ্রত হইল। তিনি উহাকে গৃহে আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। বাল্যকাল হইতেই বালিকার নারায়ণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখা যাইত। অনান্য বালকবালিকার সহিত খেলাধূলা না করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে আপন ভাবে বিভোর হইয়া খেলা করিতেন। কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা নৃত্য করিতেন,—এইরূপই ছিল তাঁহার খেলা। কখন কখন বা শ্রীরঙ্গনাথের নিবেদনার্থ মালা নিজ গলায় পরিতেন। এক দিন তাঁহার পিতা বালিকাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পান এবং ভর্ৎসনা করেন। সেদিন মালা নারায়ণকে আর নিবেদন করা হইল না। শ্রীরঙ্গনাথজী পেরিয়া আলোয়ারকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আজ আমাকে মালা দাও নাই কেন? অণ্ডাল সাধারণ মেয়ে নয়। তাহার অঙ্গস্পর্শযুক্ত দ্রব্যে আমি খুবই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি।" পর দিন দেখা গেল মালাটির কোনই রূপান্তর হয় নাই। তিনি সেই মালাটি ভগবানকে নিবেদন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব্ব রূপদর্শনে মোহিত হইলেন। অণ্ডাল মিষ্টভাষী ও বিদুষী ছিলেন। তিনি তামিল ভাষায় অনেক স্তোত্র (তিরুবাই মোড়ি) রচনা করিয়াছেন।

তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি

তোণ্ডার=ভক্ত, আড়ি=পদ, প্পোড়ি=রেণু, অর্থাৎ ভক্তপদরেণু। তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ছিলেন এবং নিজেকে ভক্তপদরেণু বলিয়া মনে করিতেন। ত্রিচিনাপল্লীর নিকট শ্রীবিষ্ণুর বনমালা অংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ভগবানের সেবাতে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন। ভগবানের জন্য মালা গাঁথিতে খুব ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার বনমালা অংশে জন্ম হইয়াছে বলা হয়। একদিন নারায়ণ লক্ষ্মীর নিকট এই ভক্তটির প্রেমের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহাতে এই প্রেমডোর ছিন্ন হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মী বলিলেন, "স্ত্রীকটাক্ষের অসাধ্য কিছুই নাই।" নারায়ণের অগোচরে লক্ষ্মী দেবী তাঁহার কোনও দাসীকে সুসজ্জিত বেশে ঐ ভক্তবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। রমণী আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নবতী হইল। সে এক দিন বাগান হইতে সুন্দর সুন্দর ফুল তুলিয়া একটি অপূর্ব্ব মালা প্রস্তুত করিল। সে মালাসহ ভক্তবীরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল 'আমি বিদেশিনী, আমার কেহ নাই। আপনি মহাপুরুষ, সকলেরই পরমাত্মীয়, দয়া করিয়া স্বহস্তে রচিত মালাটি নারায়ণকে নিবেদন করুন।' ভক্তবীর সুন্দর মালা দেখিয়া গ্রহণ করতঃ শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলেন। এই ভাবে রমণী নিত্যই মালা আনিতে লাগিল। ক্রমেই ভক্তবীরের মন ভগবানের পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে রমণী ভক্তবীরের মনপ্রাণ হরণ করিল। এক দিন ভক্তবীর মনোভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রমণীর নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রমণী তখন কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিল। দরিদ্র ভক্ত, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইবেন এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেইদিন আর তাঁহার শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে যাওয়া হইল না। ভগবান ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া

দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে ভক্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন? এই নাও স্বর্ণমুদ্রা, যাও, অভিলাষ পূর্ণ কর। ভক্তটি স্বর্ণমুদ্রা সহ রমণীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন রমণীর স্থলে তথায় স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথজী বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি নিজেকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান উদয় হইল এবং একটী তিরু-বাই-মোড়ি রচনা করিয়া বন্দনা করিলেন :—

পাচ্চাই মা মালাই পোল মেণী, পাবলবাই, কামাল চেঙ্গন।
অচ্যুত, আমরা এড়ে আয়ড়দম্, করুন্দে, এন্নুম্।
ইচ্চোবাই তাবিরো ইয়ান পোই ইন্দ্রলোকম্ আলুম্।
অচ্যুবাই, পেরিণু ওয়েন্ ডে আরাঙ্গা মা নাহার উলানে।

নালাইর দিব্যপ্রবন্ধ তোণ্ডা রাড়ি ১ম। পাচ্চাই=সবুজ, মা=মহা, মালাই=পর্ব্বত, পোল=মত, মেণী=শরীর, পাবল=মুক্তা, বাই=মুখ, কামাল=পদ্মনেত্র, চেঙ্গন=লাল। অচ্যুত=পড়ে না (কৃষ্ণ), অমর=দেবতা, এড়ে=শ্রেষ্ঠ, আয়ড়দম্=গোপবংশজাত, করুন্দে=শ্রেষ্ঠতর, এন্নুম্=আমিই সেই। ইচ্চোবাই=এই আশীর্ব্বাদ, তাবিরো=ত্যাগ করিয়া, ইয়ান=আমি, পোই= চলিয়া, ইন্দ্রলোকম্= ইন্দ্রলোক, আলুম্=শাসন করা। অচ্যুবাই=সেই জায়গা, পেরিনু=পেতে, ওয়েন্ ডে=চাইনা, আরঙ্গ=শ্রীরঙ্গম্, মা=মহা, নাহার=নগর, উলানে=শাসনকর্ত্তা।

অর্থাৎ হে শ্রীরঙ্গম শহরের শাসনকর্ত্তা! যাঁহার সবুজ পাহাড়ের মত শরীর, মুক্তার মত মুখ, লালপদ্মলোচন, এবং যিনি অচ্যুত, দেবতাশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ গোপবংশজাত, (তোমাকে ডাকিয়া যে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি) সেই আমি, এই আশীর্ব্বাদ অবহেলা করিয়া ইন্দ্রলোকও লাভ এবং শাসন করিতে চাই না।

তিরুপ্পান

তিরু=শ্রী, প্পান=যন্ত্র (বীণা)। তিনি সর্ব্বদাই বীণাহস্তে ভগবানের নাম গুণ গান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় তিরুপ্পান। তিনি নিচুলাপুরে বিষ্ণুর শ্রীবৎসাংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিরুপ্পান ছিলেন প্যারেয়া বংশোদ্ভব। দক্ষিণভারতে চণ্ডালকে প্যারেয়া বলিয়া থাকে। উচ্চ কুলোদ্ভবেরা তাহাদিগকে অতি হেয় জ্ঞান করেন; এমন কি দূর হইতে তাহাদের দেখিলেও নিজেদের অপবিত্র মনে করেন।

একদা তিরুপ্পান বীণা সহযোগে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভোর হইয়া কাবেরী নদীর ধারে, রাস্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় মুনি নামে জনৈক পূজারী পূজার্থ নদী হইতে জল লইয়া আসিতে-ছিলেন। রাস্তার মাঝে এই নীচকুলোদ্ভব লোকটিকে দেখিয়া রাস্তা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য তিন চারবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াও তাঁহার কোন সাড়া শব্দ পায় নাই। পরে ঢিল ছুড়িয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। তিরুপ্পান দেখিলেন, সত্যই তিনি শ্রীরঙ্গনাথজীর পূজারীর পথ রোধ করিয়াছেন। এই অপরাধের জন্য পূজারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পথ হইতে দূরে পলায়ন করিলেন। পূজারী জলসহ মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ। মনে হইল কে যেন ভিতর হইতে বন্ধ করিয়াছে। সহকর্ম্মীরা হয়ত এইরূপ করিয়া থাকিবে ভাবিয়া তিনি একে একে সকলকের ডাকিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে সকলেই মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলকেই দেখিয়া পূজারী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন হয়ত আমার কোন অপরাধ হইয়াছে, সেইজন্য শ্রীরঙ্গনাথ স্বয়ং দরজা বন্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন 'হে প্রভো, আমার অপরাধ হইয়া থাকিলে

আমি তাঁহার জন্য প্রায়শ্চিত করিব।' তখন ভিতর হইতে দৈববাণী হইল, "মুনি, তুমি আজ আমাকে আঘাত করিয়াছ; সেইজন্য তোমার আনীত জল গ্রহণ করিব না।" পূজারী বলিলেন "প্রভো! কখন আপনাকে আঘাত করিয়াছি?" উত্তর আসিল "কাবেরীর ধারে যে লোকটি বীণাসহায়ে আমার নাম কীর্তন করিতেছিল তিনি একজন মহাপুরুষ, আমার দ্বিতীয়বিগ্রহ স্বরূপ! তুমি তাঁহাকে কাঁধে করিয়া আমার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং মন্দিরের দ্বার খুলিবে।" এই আদেশ পাইয়া মুনি তাড়াতাড়ি তিরুপ্পানের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিরুপ্পান পূজারীকে দেখিয়া ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন, এবং বলিলেন 'আমি নীচবংশজাত, আমাকে স্পর্শ করিয়া আপনি অপবিত্র হইবেন না। আমি রাস্তা অবরোধ করিয়া ঘোর অন্যায় করিয়াছি, সেইজন্য আপনি আমাকে শাস্তিপ্রদান করুন।' পূজারী দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং স্কন্ধে করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির পরিক্রমা করিলেন। মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গেল! পূজারী মনের আনন্দে শ্রীভগবানের পূজাকার্য্য সমাপন করিলেন। মুনি তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপর নাম মুনি-বাহন।

তিরুমঙ্গাই

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমেই বলা হইয়াছে। তিনিই বর্তমান মন্দির অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিগত অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে কালীয়ন নামে জনৈক ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর অংশে অবতীর্ণ হন। তিনিই তিরুমঙ্গাই নামে পরিচিত।

যে স্থান দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্রস্থল, যে স্থানে আচার্য্য রামানুজ গুরু-পরম্পরায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যে স্থান হইতে আচার্য্য জগৎকে নূতন এক পথের আলো দেখাইয়াছেন,—যাহা জগতের তিনটি মতবাদের মধ্যে অন্যতম,—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলিয়া খ্যাত, এই সেই স্থান শ্রীরঙ্গম্।

বিস্ময়

শ্রীপ্রণব ঘোষ, বি-এ

জীবনসমুদ্রে তীর তোমার চরণ,
মনের তরঙ্গ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই,
আকাশ-ছোঁয়ানো নীল তোমার নয়ন,
অনিমেষ আঁখিভরে চেয়ে থাকি তাই।

কখন হয়েছে ভোর আকাশের পারে,
সে আলো সোনার মতো; কালোজল ঘিরে
মুঠো মুঠো হীরা চমকায়!

সুদূর দিগন্ত হ'তে এ হাসি তোমার
হৃদয়ের কূলে কূলে অগণন দীপ জ্বেলে যায়
চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে শুধু মনে হয়,
তুমি আছ, তুমি আছ—এ কী বিস্ময়

অভিভাষণ*

অধ্যাপক শ্রীসুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ

কত লোক আসে, কত লোক যায় এ বিরাট বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে—দুদিন তাদের নাচগান, হাসি-কান্না দেখে আমরা আবার ভুলে যাই তাদের। এমন কি যাদের অদর্শনে জীবন হোত অসহনীয় তাদেরও থাকি ভুলে। এই তো নিয়ম এ দুনিয়ার! একেই তো বলে মায়া ও ভ্রান্তি। সেই ভ্রান্তির কুজ্ঝটিকার অন্ধকার সত্য হতে আমাদের ভ্রষ্ট কোরে সর্ব্বদাই সাংসারিক জীবনের বিচিত্র কুহকে আচ্ছন্ন কোরে রাখে! আমরা হাসি, কাঁদি, ছুটাছুটি করি সারা দুনিয়ায় কিসের লোভে, কি পাবার জন্য, নিজেরাই ঠিক জানি না - অথচ ছুটি, পড়ে যাই, আবার উঠি—ছেলেরা যেমন ওঠে পড়ে, পড়ে ওঠে তাদের খেলায়। যাঁরা এই মায়া ও ভ্রান্তির কুহকে মগ্ন না হোয়ে শুধু সত্যদর্শনে জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়োগ করেন, মিথ্যার প্রলোভনে, শত আকর্ষণে ধরা দেন না, তাঁদেরই বলি আমরা মহাপুরুষ। এই দু'চার জন মহাপুরুষের জন্ম ও তিরোধান আমাদের ইতিহাসকে মহিমান্বিত ক'রে তোলে, গরীয়ান করে তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বে ও আলোকিত ক'রে রাখে তাঁদের অমর জ্যোতিতে। এঁরাই থাকেন বেঁচে মানুষের স্মৃতিতে, সমাজের কৃতজ্ঞ পূজা-ঞ্জলিতে, এঁরাই গড়ে তোলেন সে সমাজ। মানুষ আসে, মানুষ যায় সত্য, কিন্তু অমর হয়ে থাকে তার মনুষ্যত্ব। বিশেষ বিশেষ মানুষের বেঁচে থাকার প্রণালী, আইনকানুন, জনসমাজের দেহে ও মনে রেখে যায় তাঁদের জীবনীশক্তি। তাই আজ শত শত মানুষ দেশে দেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি হৃদয়ে রেখেছে সজীব, জড়িয়ে রেখেছে সে স্মৃতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্যমাল্যে। আমাদের এ অর্ঘ্য তখনই হয় সার্থক যখন আমাদের নিজ নিজ জীবনের সব দুঃখ ও সব কলুষ, সব দৈন্য ও সব নীচতা ডুবে যায় সেই অর্ঘ্যের চিরন্তন সুষমায় ও আশীর্ব্বাদে।

বৎসরে একটি দিন সেই অর্ঘ্য অর্পণ ক'রে আর ৩৬৪ দিন সংসারের মোহ-গর্ত্তে নিমগ্ন থেকে কিন্তু সেই অর্ঘ্যের সার্থকতা লাভ করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে লালসা, প্রবঞ্চনা, "পাটোয়ারী বুদ্ধি" দ্বারা চালিত হয়ে, এক দিনে সে সব পাপ ধৌত করা যায় না। এ পূজার নাম ভণ্ডামি। আজ আমরা সব স্বাধীন। এত দিন শুনে এসেছি বিদেশী বণিকের নিকট আমরা শিখেছি আমাদের সব পাপবুদ্ধি, ভুলেছি ভারতের সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির সনাতন বাণী, ভুলেছি—ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্, ভুলেছি আমাদের জীবনের পূর্ণত্ব, দায়িত্ব ও গুরুত্ব। কিন্তু ভারতের বিশেষত্ব, তার বিস্তৃত আকাশ, বিরাট হিমালয়, সীমাহীন সাগর, আর সেই আকাশ, বাতাস, পাহাড় ও সাগরের অণু-পরমাণুতে ধ্বনিত মহাপুরুষদের বাণী—নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করতে কি আমরা প্রয়াসী হয়েছি? স্বাধীন বাংলায়, স্বাধীন ভারতে, এখনও কি আমরা নানা অসৎ উপায়ে ভাল ভাল চাকরি

* বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব-সভায় পঠিত।

যোগাড় করবো, শুধু কামিনীকাঞ্চনের পূজায় ও সেবায় জীবন উৎসর্গ করবো? আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিশেষত্বের কথা অনেক শুনতে পাই—শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির কথা ও উপদেশ কত শুনি ও কত বলি! কিন্তু জীবনের বাস্তবতায় সে সব কথা ও উপদেশ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা কি আমরা করছি? আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রের নানাবিভাগে এখনও কত পাপ, কত নীচতা, কত কলুষতার পরিচয় পাই, কত অত্যাচার অনাচার ও নির্ম্মমতা এখনও সংঘটিত হচ্ছে আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে! আজ স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষ কোথায়? কোথায় তাঁর পবিত্র প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, আমাদের জীবনে নব নব প্রেরণা দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সার্থক ক'রে তোলার জন্য?

আজকাল আমাদের শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ (যাঁদের সহিত আমার সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘকালব্যাপী) রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত এ সবেরই উপাসক কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁদের লক্ষ্য নেই, আগ্রহ নেই। যা কিছু অতীন্দ্রিয়, এই জড় জগতের বহুদূরে ও ঊর্দ্ধে, তাঁরা তাতে বিশ্বাস করেন না। ধর্ম্ম, ভগবান, ঈশ্বর এসবের অস্তিত্ব তাঁরা বড় একটা স্বীকার করেন না। আজকের এই উৎসব-সম্মেলনেও তাঁদের সংখ্যা কত অল্প। অবশ্য এর জন্য আমি তাঁদের তত দায়ী করি না, যত করি আমাদের নিজেদের, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের, যাঁরা এই তরুণ-তরুণীদের চালাবার, তাঁদের শিক্ষাদানের গর্ব্ব ক'রে থাকেন। আমাদের কথায় ও কাজে, আমাদের পূজায় ও জীবনে বহু অসামঞ্জস্য ও গরমিল তাঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বিনষ্ট ক'রেছে—আমাদের উপদেশ হতে জীবনযাপনের রূপ ভিন্ন দেখে, আমাদের 'মন মুখ এক' নয় বলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় আমাদের যুবক-যুবতীদের টেনে আনতে হবে, ভারতের অবিনশ্বর বাণী তাঁদের শোনাতে হবে, সজীব করে তুলতে হবে তা' আমাদের নিজেদের জীবনে, আমাদের কার্যে, আমাদের সঙ্গীতে ও আনন্দে। তবেই সার্থক হবে আজকের এই তিথিপূজা, তবেই অর্জ্জন করবো আমরা আমাদের অধিকার, পাব আমাদের চাপরাশ তাঁর পূজার পূজারী হবার ও তাঁর শিক্ষা প্রচার করবার। বিরাট প্রাচ্যের শিক্ষাগুরু হবার অধিকার তখনই হবে আমাদের সম্যক্।

আজ আমরা মনে রাখব, সেই সরল শিশু পূজারীর ব্যাকুল প্রার্থনা। মায়ের চরণে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যে, মনে রাখব তাঁর জীবনের বাস্তবতা, মনে রাখব তাঁর সাধারণত্বের ভিতর তাঁর বিশালত্ব, তাঁর শিশুত্বের মধ্যে তাঁর প্রবীণত্ব, তাঁর আপনভোলা ভাবের মধ্যে তাঁর মানবপ্রেম। বিংশ শতাব্দীতে এই জগদ্গুরুর আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, এই গর্ব্বিত যুগের মোহান্ধ মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে সত্য কি ও কোথায় দেখাতে। আজ তাঁকে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করি, অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করি।

"তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন—কিছু জানতে দেন না! ...এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়।"

— শ্রীরামকৃষ্ণ

সমাজে নারীর স্থান

শ্রীসুহাসিনী দেবী, বি-এস্‌সি, বি-টি

যে মহাপুরুষ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভারতীয় নারীর উন্নতির চিন্তা করিয়াছেন, তাহাদের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তদ্‌গতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা বিদেশিনী হইয়াও আমাদের নারীসমাজের জন্য অকালে মৃত্যুবরণ করিলেন—সেই মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও চিন্তার আলোকে নারীসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সমাজে নারীর স্থান বিচারের সময় প্রথমতঃ আমাদের সমাজের উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং সমাজের সহিত নারীর সম্বন্ধ বুঝিয়া নিতে হইবে। মানবের স্নেহ, প্রীতি, প্রেম এবং সহানুভূতি সমাজগঠনের প্রেরণা দিয়াছে। সমষ্টির সুখশান্তির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়া চলাই হইল সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি। সামাজিক উন্নতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, ব্যষ্টির উন্নতি-অবনতিও সমাজের উপর নির্ভর করে। মহাপ্রাণ মহাপুরুষরাই সমাজের উন্নতিসাধন করেন, আবার সুন্দর সুগঠিত সমাজ হইতেই উন্নতমনা বীরপুরুষের উদ্ভব হইয়া থাকে।

পুরুষ এবং নারী সমাজের পক্ষস্বরূপ। সমাজ-বিহঙ্গমকে মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে দিতে হইলে পুরুষ ও নারীকে সমভাবে ভারসাম্য রক্ষা করিতে হইবে। সমাজের উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারীর সমান প্রয়োজন, আবার সমাজের অধোগতির জন্য উভয়েই সমপরিমাণে দায়ী, উভয়েরই কর্তব্য এবং দায়িত্ব ভাগ করিয়া নিতে হইবে।

পৌরাণিক যুগে সমাজের আদর্শ এবং সামাজিক প্রথাসমূহ অধ্যাত্মবাদ ও নীতিবাদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন হইতে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজকে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বহু সামাজিক নীতি এবং প্রথা সুবিধাবাদিগণের হাতে পড়িয়া মূল ভাব হারাইয়া বিকৃত অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে।

বর্তমান মানবসমাজ বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া জড়বাদের পূজায় রত। কালের প্রভাবে বিকৃতিপ্রাপ্ত প্রথার এবং নীতির প্রকৃত অর্থ নিরূপণের চেষ্টা না করিয়াই যাহা কিছু পুরাতন, যাহা কিছু প্রাগ্‌বৈজ্ঞানিক, তাহাকেই ত্যাগ করিবার নীতি এখন প্রবল—বিংশ শতাব্দীতে এই মনোবৃত্তি চরমে উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের লীলাভূমি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারপূর্ব্বক পাশ্চাত্যানুকরণে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠানাদি গড়িয়া হিন্দু সমাজের যাবতীয় রীতিনীতির পরিবর্তনের প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু উন্নতি কোথায়? অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বেষ হিংসায় মানবমন ক্ষতবিক্ষত, মানবসমাজ বিপর্য্যস্ত। সমাজতান্ত্রিকতার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব বাড়িয়া মানবসমাজকে নিদারুণ স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতার নামে স্বার্থপরতা—সাম্যবাদের মুখোস পরিয়া পরমত-অসহিষ্ণুতা উঁকি মারিতেছে। এই অশান্তি, এই

উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানবের চিন্তাশক্তিকে দ্রুত প্রগতির পথে লইয়া যাইতেছে কিন্তু কোনও প্রবল নৈতিক আদর্শনিষ্ঠা না থাকায় সেই চিন্তাশক্তির সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ নাই—ফলে মানব হৃদয়হীন সুনিপুণ দানব হইয়া উঠিতেছে। ভোগই হইল জীবনের লক্ষ্য। ভোগসামগ্রীর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাচুর্য্যের সমাবেশের জন্য বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি চলিতেছে। "Everything is relative"—ইহাই হইল পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব কৃষ্টির মূল নীতি। সুতরাং ভালমন্দ, সত্য-মিথ্যা, সুনীতি-দুর্নীতির সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে; আর সমাজ মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিরোধের মধ্যে দোল খাইতেছে।

এই ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব কৃষ্টির প্রভাব সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরই জনৈক মনীষী বলিতেছেন—"Instead of peace they witnessed the bloodiest of wars, instead of order and stability an inferno of anarchy and revolution, instead of a sound mind mental disease, instead of the maximum of happiness for the maximum number of human beings only universal weariness and miseries, hopelessness and suicide."

প্রাচ্যের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—মুক্তি যে সংগ্রামের বাহুল্যে নয়, ভোগের প্রাচুর্য্যে নয়, মুক্তি আত্মপ্রকাশের সত্যতায়—আজকের দিনে এই কথাটাই মানুষকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেই সাবধান বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের realist সমাজের অন্যতম প্রধান Aldous Huxley সেদিন ভারতীয় বেদান্তমন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছেন। কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

জগদ্ব্যাপী এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলিতেছে। Capitalism এর ধ্বংস সাধন করিলেই সমাজে শান্তি আসিবে—ইহাই হইল সমস্যা-সমাধানের নবতম আবিষ্কৃত পন্থা। ইহাতে বর্তমান অর্থসমস্যা ঘুচিবে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না। Capitalism, Nazism, Communism আদি সর্ব্বপ্রকার 'ism' ই আদর্শহীন জড়বাদ এবং ভোগসর্ব্বস্বতাবাদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং মত বা মতপ্রবর্ত্তকের বিনাশসাধনে সমস্যাসমাধান সম্ভব নহে। বর্ত্তমান সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে বর্ত্তমান জীবনের যাবতীয় সমস্যা—নৈতিক অবনতি, চোরাবাজার, পুরুষদের বেকারসমস্যা, নারীর বিবাহসমস্যা, সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা, প্রান্তীয়তা—সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির মূল হইল ভোগসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রবাদ। ত্যাগ না করিয়া সকলেই ভোগ করিতে চায়, ফলে ভোগও হয় না—কেবলমাত্র নৈরাশ্য; নৈরাশ্য হইতে জিঘাংসা।

সর্ব্বত্যাগী অনাসক্ত ব্যক্তিই একমাত্র ভোগের অধিকারী হইতে পারেন। স্বামীজী বলিতেন—ছবির দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রেতা বিক্রেতা এবং দ্রষ্টার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ছবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে? ক্রেতাও নয়, বিক্রেতা ও নয়; উভয়েরই লাভক্ষতির দিকে দৃষ্টি—অনাসক্ত দ্রষ্টাই একমাত্র উহা ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারে।

আমাদের মূল ব্যাধি হইল—শিথিল আদর্শ-নিষ্ঠা, বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রাচীন সংস্কৃতিতে অনাস্থা। ব্যাধি-নিরাকরণের উপায় আমাদের

ভারতেই রহিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটা সাধারণ সনাতন সত্য রহিয়াছে যাহাকে কালের প্রভাব নষ্ট করিতে পারে না। হিন্দু সমাজ বিভিন্ন বিজাতীয় বিদেশীয় ভাবকে আপনার করিয়া লইয়াও আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার 'Discovery of India' পুস্তকে বলিতেছেন—"It is not some secret doctrine or esoteric knowledge that has kept India vital and going through these long ages but a tender humanity, a varied and tolerant culture and a deep understanding of life and its mysterious ways." আধ্যাত্মিকতা হইল সেই সনাতন ভিত্তি।

বৃদ্ধি, উন্নতি, সমৃদ্ধি বা অবনতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধারণাই আপেক্ষিক সত্য কিন্তু এমন একটা সাধারণ ভিত্তি আছে, একটা সাধারণ মানবধর্ম্ম আছে যাহাকে সার্ব্বজনীন ভিত্তি ধরা যাইতে পারে। আনন্দ শান্তি এবং স্বাধীনতা সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির আদর্শ; এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্যই বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত—ত্যাগ, প্রেম এবং অপ্রতিকারই ঐ লক্ষ্যে পৌছিবার একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাত্যাগী জাতিই দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

আমাদের প্রশ্ন হইল বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে সামাজিক উন্নতিবিধানে নারীর স্থান কি এবং কোথায়। এক বিভাগের হিন্দুনারীর অভিযোগ হইল যে হিন্দুর সামাজিক বিধান হিন্দু নারীকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, শাস্ত্রানুশাসন পুরুষের হাতে থাকায় নারীর যাবতীয় অধিকার শৃঙ্খলাবদ্ধ। এই সামাজিক প্রথার অবসান না ঘটাইলে নারীসমাজের উন্নতির আশা বৃথা। সমাজে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার চাই।

উপনিষদ্ হইতে আমরা পাই—স্বরূপতঃ পুরুষ এবং নারীতে ভেদ নাই, আত্মা বা ব্রহ্ম লিঙ্গভেদের অতীত—

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।'

বৈদিক ঋষিকুল পুরুষের ন্যায় নারীতেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া তাহার পূজা ও সম্মান করিয়াছেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে নারীও যে পুরুষের ন্যায় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। নারীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য হইল আত্মজ্ঞান-লাভ। আত্মজিজ্ঞাসু নচিকেতা যেরূপ যমরাজকে উত্তর করিলেন "ন বিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ", মহীয়সী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠেও আমরা সেই একই সুর শুনিতে পাই—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্নে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন, মহর্ষি তাঁহাকে নারী বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর এবং পণ্ডিতপ্রবর মণ্ডনমিশ্রের বিতর্কের বিচারক ছিলেন মনস্বিনী উভয়ভারতী।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে দেশকাল-গণ্ডীর মধ্যে পুরুষ আলাদা, নারী আলাদা—শারীরিক এবং মানসিক গঠনই তাহার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্যে এবং অধিকারেও পার্থক্য থাকিবেই। ব্যবহারিক জগতের প্রতিক্ষেত্রে নারীপুরুষের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না—ইহা পরীক্ষিত সত্য। রুগ্নের সেবা, শিশু-প্রতিপালন, বালকবালিকার শিক্ষা নারী যেরূপ তৎপরতার সহিত অনায়াসে করিতে পারেন, শত চেষ্টায় পুরুষের দ্বারা সেরূপ হয় না; কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কাজেও সেইরূপ

নারী পুরুষের সমকক্ষ নহেন। স্ব স্ব কাজ পরিত্যাগ করিয়া একে অন্যের কাজ গ্রহণ করিলে সমাজের সমধিক ক্ষতি।

আমরা স্বাধীনা হইব, পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিব না—এই হইল আর এক শ্রেণীর নারীদের অভিযোগ। স্বাধীনতা বা মুক্তিই হইল হিন্দু-জীবনের লক্ষ্য। মানব যখন স্বস্বরূপ উপলব্ধি করে, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ করে, তখন আর তাহার জন্মমৃত্যু হয় না; তখন সে স্বাধীন হইয়া যায়। স্বাধীনতাই আত্মার লক্ষ্য—ইহাই আমাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব। আমাদের শাস্ত্র বলেন—শ্রেষ্ঠতম স্বর্গেও জীব প্রকৃতির দাস মাত্র। যত দিন শরীর থাকে ততদিন আমরা সুখের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস মাত্র, স্বাধীন হইতে হইলে আমাদের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়কে জয় করিতে হইবে।

আমাদের মন-মেজাজ স্ববশে নয় বলিয়াই আমরা পরমত-অসহিষ্ণু। ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষ্যার দাস এবং শতশত দৈনন্দিন সাংসারিক তুচ্ছতার দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা? সুতরাং কেবলমাত্র পুরুষের হাত এড়াইতে পারিলেই আমরা স্বাধীন হইব—ইহা নিরর্থক যুক্তি।

মনু বলিয়াছেন—যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা জগজ্জননীর হ্লাদিনী, সৃজনী এবং পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপা। জ্ঞান, বিত্ত সৌন্দর্য্য সমস্তই নারীরূপে কল্পনা করা হয়।

আমাদের বক্তব্য হইল আমরা দেবী হইতে চাহি না, মানবের মাঝে মানবীরূপে থাকিতে চাই। হিন্দুধর্ম্মের গ্রন্থাদিতে নারী দেবী কিন্তু ব্যবহারে দাসী। কোনও বিশিষ্ট কাজ করিলেই আমি দাসী হইয়া গেলাম, আর কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মের জন্য আমি দেবী হইয়া গেলাম—শিক্ষিতা নারীসমাজের *এরূপ চিন্তাধারা লজ্জাকর। পাশ্চাত্য বলিতেছেন* "dignity of labour", প্রাচ্য বলিতেছেন 'কর্ম্মেই কর্ম্মের সার্থকতা'।

নারী ও পুরুষ একই বৃত্তের দুই অংশ স্বরূপ। উভয়ে মিলিলে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। স্ব স্ব অংশে তাহারা স্বপ্রধান। কর্ম্মে প্রধান-অপ্রধান ভেদ আরোপ করা কুশিক্ষার প্রভাব। দুর্ভাগ্য আমাদের এই সাম্যবাদের যুগেই ইহা বিশেষরূপে দেখা দিয়াছে—অবশ্য ছদ্মবেশে। একটী স্কুল চালাইতে প্রধান শিক্ষকের যেমন প্রয়োজন, দারোয়ানেরও ঠিক ততখানি প্রয়োজন। প্রধানের কাজের যে মর্য্যাদা, ভৃত্যের কাজেরও তদনুরূপ মর্য্যাদা দিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাগের সেনাপতির জয়পরাজয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী রসদ্দার সৈনিকের তৎপরতার উপর নির্ভর করে। স্বীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বপ্রধান, প্রত্যেকের কাজের ভাল-মন্দের উপর সমাজের ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। হল্যাণ্ডের সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা মনে হইতেছে; বাঁধের কোনও অংশে জল চোয়াইবার লক্ষণ দেখিতে পাইয়া বালক সমস্ত রাত্রি সেখানে অঙ্গুলি চাপিয়া বসিয়া রহিল। এই বালকের অন্যমনস্কতায় সমস্ত দেশ ভাসিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে পারিত।

অধ্যাপক, ডাক্তার হইতে আরম্ভ করিয়া মুচি, মেথর প্রত্যেকে সমাজের অঙ্গ, সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রত্যেকের সমান গৌরব। মজা হইল সকলেই রাজার অভিনয় করিতে চায়, ভৃত্যের অভিনয়ে কেহই রাজী নহেন। তাহা হইলে অভিনয়ই বন্ধ করিতে হয়।

হিন্দু সমাজেই ইহার রীতিনীতির মধ্যে মানুষ হইয়া বহু মহীয়সী নারী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই হিন্দু সমাজেই আমরা বিশ্ববারা, সিকতা, লোপামুদ্রার ন্যায় বৈদিক মহিলা কবি, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মত ব্রহ্মবাদিনী, খনা ও লীলাবতীর

ন্যায় শাস্ত্রদর্শিনীর উদ্ভব দেখি। তদানীন্তন সাহিত্য হইতে আমরা স্বয়ম্বরপ্রথা, সহশিক্ষা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত পাই। সীতাচরিত্রের সহিষ্ণুতা, সাবিত্রীর সাহস, সুভদ্রার নির্ভীকতা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহার পরও রাণী দুর্গাবতী, রাণী ভবানী, অহল্যাবাঈ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, ভক্তিমতী মীরাবাঈ প্রভৃতি মহীয়সীদের চরিত্রে আমাদের ইতিহাস অলঙ্কৃত। ইঁহারা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না বা স্বগৃহের বাহিরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন নাই, কিন্তু সমাজই তাঁহাদের মহত্ত্ব মানিয়া নিয়াছে।

তবে কি বর্তমানের আদর্শ—"পৌরাণিক যুগে ফিরিয়া যাও"? তাহা নহে। প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উদার বহির্দৃষ্টির মিলনসাধন করাই হইবে বর্ত্তমানের আদর্শ। নারীর মধ্যে প্রাচ্যের মাতৃভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জায়াভাব, বীরোচিত দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকিবে; পুরাতন মহীয়সীদের পথানুসরণের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকার সাহস অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রেম এবং কোমলতাই নারীর বৈশিষ্ট্য। প্রেম কর্ত্তব্যচক্রকে স্নেহসিক্ত করিলেই উহা মসৃণভাবে চলে। প্রেমার্দ্র হইলেই কর্ত্তব্য মধুর হয়। আজকাল 'প্রেম' শব্দের বহুল প্রচার। পাশ্চাত্যে প্রেম করিয়া বিবাহ হয়, কিন্তু সেখানেই বিবাহ-বিচ্ছেদ বেশী। প্রেমের নামে স্বার্থপরতা চলিতেছে। প্রেম চিরকালই দাতা—গ্রহীতা নহে; যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তাহাই প্রেম-শব্দবাচ্য।

হিন্দু সমাজ প্রণয়ঘটিত বিবাহে আপত্তি করে না—আপত্তি হইল স্বার্থপরতায়। শকুন্তলা দুষ্মন্তের সহিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ—ক্ষতি নাই, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি প্রেমাস্পদের চিন্তায় কেবলমাত্র নিজের কল্পনাবিলাসে মগ্ন, নিত্যকরণীয় অতিথিসৎকারে বিমুখ, তখনই তাঁহাকে সমাজের সতর্কবাণীর সম্মুখীন হইতে হইল। দুর্বাসার অভিশাপ এখানে রূপকমাত্র। সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া সকলের কল্যাণকামনা-মিশ্রিত যে আশীর্ব্বাদ, তাহাই মঙ্গলপ্রদ। ত্যাগ করিলেই ভোগ করিতে পারিবে, নচেৎ নহে।

ত্যাগনীতিমূলক অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত শিক্ষানীতি অগ্রসর হইবে। বিশ্বাত্মার সর্ববব্যাপিত্ব এবং সমত্বরূপ বেদান্তের মহনীয় তত্ত্বই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং অভীতি জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

নারীকে মনে রাখিতে হইবে তিনিই কেন্দ্রস্থল। সামাজিক উন্নতি-অবনতি প্রধানতঃ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। মহাপুরুষ এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহাদের ঐরূপ চরিত্রগঠনে স্ব স্ব জননীর দান কতখানি।

মহীয়সী মদালসা প্রতিটি সন্তানকে দোলনায় দোল দিতে দিতে "ত্বমসি নিরঞ্জন" শুনাইতেন, ফলে সকলেই সংসারবিরাগী হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিল। সেই মদালসাই আবার স্বামীর অনুরোধে পরবর্ত্তী সন্তানকে সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ সংসারি-রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং চাবিকাঠি মাতৃজাতির হাতে। সমাজের আদর্শ তাহার নারীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া ভবিষ্যৎ সন্ততিকে কল্যাণপথে পরিচালিত করা।

ভারতে যখন আমরা আদর্শ নারীর কথা ভাবি তখন একমাত্র মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে। মাতৃত্বেই তাহার আরম্ভ, মাতৃত্বেই তাহার শেষ। স্বার্থলেশহীনা সর্ব্বংসহা ক্ষমা-স্বরূপা মাতাই আমাদের আদর্শ। মাতৃভাবের অর্থ এই নহে যে, মাতা নিজের আনন্দ লাভের

জন্য ইচ্ছানুযায়ী পুত্রকে অত্যধিক আদর দিয়া গড়িয়া তুলিবেন। পুত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনাই মায়ের আদর্শ। কুন্তীদেবী পঞ্চপুত্রকে সত্যনিষ্ঠ নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছিলেন; কিন্তু সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে লাঞ্ছিতা দেখিয়াও যখন পঞ্চপুত্র নীরব, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞায় যখন সকলে বনগমনে প্রস্তুত, তখন পুত্রদের এই ক্লীবত্ব দেখিয়া কুন্তীদেবী ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—বীরমাতা বিভিন্ন উত্তেজক বাণীদ্বারা পুত্রদের পৌরুষ জাগাইয়া তুলিলেন।

মাতৃভাব নারীজনোচিত বিভিন্ন সদ্গুণাবলীর প্রতীক মাত্র। বালিকা, কুমারী, নিঃসন্তানা বিধবা সকলের মধ্যে মাতৃভাবের বিকাশ হইতে পারে —ইহাই আমাদের প্রধান আদর্শ।

যুগধর্ম্ম চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল, যে সব প্রথা যুগধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রতিকূল তাহার সংস্কার সাধন করিতেই হইবে, কিন্তু আইনের দ্বারা বা প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের দ্বারা কোনও সামাজিক দোষের প্রতিকার হইতে পারে না, সমাজকে কেবল গালিবর্ষণ করিলেও হইবে না। সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ধীর সহিষ্ণু সংগঠনকার্য্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতীয় নারীকে ভারতীয় নারীর প্রকৃতি-অনুযায়ী ভারতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

সংস্কারের প্রধান অঙ্গ হইবে শিক্ষা। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন—"Ofcourse women have many and grave problems but none that are not to be solved by that magic word—Education."

বালিকাদের প্রথমেই পুরাণ, ইতিহাস, গৃহ-কার্য্য, শিল্প, স্বাস্থ্যনীতি, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হইবে। রামায়ণ-মহাভারত হইতে আদর্শ নারীচরিত্র এমন ভাবে তাহাদের সামনে ধরিতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহাদিগকে সামাজিক এবং নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে। পুরুষের মত মেয়েরাও বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষা পাইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শান্তভাব, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম এবং পরধর্ম্মে দ্বেষ-রাহিত্যরূপ মহতী শিক্ষাও তাহাদিগকে দিতে হইবে। কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় হইবে না। পুরাতন ভাব-ধারাকে, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে।

নির্ব্বিচারে পরানুকরণ-বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন-সাধন বিশেষ প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের অনুকরণ-মোহ আমাদের এতই প্রবল যে ভালমন্দের বিচার বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গজাতি (বর্ত্তমানে রাশিয়া) যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইবার জন্য আমরা দিনরাত অকাতরে পরিশ্রম করিতেছি, মার্ক্সবাদ বুঝিবার জন্য প্রতিটী অক্ষর প্রবল নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিতেছি, পাঠগোষ্ঠীতে যোগদান করিতেছি, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতে কি আছে—কি উপাদান সীতা-সাবিত্রীর মত নির্ভীক, সহিষ্ণু চরিত্র সৃষ্টি করিল, কেন সেই মহাভারতীয় সংস্কৃতি আবহমান কাল ধরিয়া প্রবাহাকারে চলিয়া আসিতেছে, কালের প্রভাব যাহাকে রুদ্ধ করিতে পারিতেছে না—তাহা পড়িবার সময় নাই বা জানিবার স্পৃহা আমদের নাই।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি, কৃষকমজুরের উন্নতি প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্য্যে সকলেই ব্যাপৃত, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ব স্ব কর্ম্মনিষ্ঠায় যে শিথিলতা আসিয়াছে তাহার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে কোনও বিষয় আমাদের চরম লক্ষ্যে (নিত্যবস্তু সাক্ষাৎকার)

লইয়া যাইতে পারে, তাহারই সার্থকতা আছে। মহাভারতের সেই যোগবিভূতিতে স্পর্দ্ধান্বিত যোগীরও নগরে গিয়া রুগ্নপতির শুশ্রূষানিরতা নারীর ও পরে ধর্ম্মব্যাধের সহিত সাক্ষাতে শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই আত্মবহতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠারূপ সাধনমার্গে থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বালিকাদের স্বধর্মনিষ্ঠ ও নীতিপরায়ণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে তথাকথিত ধারণার পরিবর্ত্তন করিয়া ত্যাগই যে আমাদের ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য ইহা বুঝাইতে হইবে। নিঃস্বার্থতা এবং সহৃদয়তাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ। "Religion is the manifestation of the divinity already in man"—মানবের সত্যস্বরূপের (সৎ, চিৎ, আনন্দ) অভিব্যক্তি হইল ধর্ম্ম ; ত্যাগ এবং প্রেম অবলম্বনে ইহা অভিব্যক্ত হয়।

প্রাচ্যের ধর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্ম্মনিষ্ঠাকে মিলাইয়া দিতে হইবে—ইহাই হইবে আমাদের গীতোক্ত কর্ম্মযোগসাধন।

আমাদের মেয়েরা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বাগ্মিতা ও সাহসের সঙ্গে পুরাতন সীতাদেবীর ত্যাগ এবং সহিষ্ণুতা নিয়া বড় হইবে। তাহাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডুর প্রতিভা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রেয়ীর আত্মজ্ঞান-তৃষ্ণা থাকিবে। ভবিষ্যৎ নারীসমাজ একাধারে সেবা, স্নেহ, তুষ্টি, ভক্তি, শক্তি ও নির্ভীকতার প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

নারী সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গৃহে গৃহকর্ম্ম সাধন করিবে, সভাসমিতিতে বেদান্ত আলোচনা করিবে, আবার প্রয়োজন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া আহত সৈনিকের পরিচর্য্যা করিবে ; নারীর প্রসন্ন দৃষ্টি এবং সেবাহস্ত সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যাপৃত থাকিবে।

স্বামীজী বলিতেন, আমাদের বৃত্তিগুলির, শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে —শিক্ষা বলিতে মানুষকে এমন ভাবে গঠিত করা যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্‌বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। যাহাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, লোক নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, প্রয়োজন মত আত্মরক্ষা করিতে পারে—এই রকম শিক্ষাই চাই।

ব্রহ্মচর্য্যব্রতী কুমারী এবং বিধবারা এই শিক্ষার ভার লইয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন ; এইরূপ নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা নিজ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিতসাধন করা হইবে। বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য এইরূপ পবিত্রস্বভাবা, তেজস্বিনী, নিঃস্বার্থ, পারদর্শিনী কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন। স্বামীজী বলিতেন—এরূপ কর্ম্মীদের কোনও গৃহ থাকিবে না ; তাহারা যেখানে থাকিবে, তাহাই তাহাদের গৃহ হইবে, ধর্ম্মের বন্ধন ব্যতীত তাহাদের কোনও বন্ধন থাকিবে না ; গুরু, স্বদেশ এবং আপামর সাধারণ এই তিনের প্রীতি ভিন্ন অপর কোনও প্রীতি তাহাদের থাকিবে না।

সম্মুখে বিভিন্ন সমস্যা দেখিয়া আমাদের হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। এই যুগ নারী-উন্নতির যুগ। স্ত্রীজাতির অভ্যুদয়রূপ কল্যাণ-সাধনের জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীগুরু গ্রহণ করিলেন, নারীভাবে সাধন এবং মাতৃভাবের প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীসারদাদেবী আপন জীবন দ্বারা আদর্শ স্থাপন করিলেন ; যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ নারীদের উন্নতির জন্য চিন্তা করিলেন, নির্দ্দেশ দিলেন। সর্ব্বোপরি এদেশের ভবিষ্যৎ নারী কিরূপ হইবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ তদীয় মানসকন্যা নিবেদিতা-চরিত্র আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা একাধারে কোমলতা, পবিত্রতা, প্রেম, বৈরাগ্য এবং তেজস্বিতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-সম্পন্না নারীকে আমরা তদানীন্তন সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার আদি যাবতীয় ক্ষেত্রে দেখিতে পাই। নিবেদিতাচরিত্রে আমরা পাশ্চাত্যের বহির্মুখী প্রতিভার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং নারীজনোচিত কোমলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ লক্ষ্য করি।

আসুন আমরা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা যুগপ্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণীর অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধির চেষ্টা করি—

"হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।"

সুফী অত্তার্ ও তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'মুন্‌ত্বিকুৎ-ত্বয়র্'

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এম-এ

শেখ্ ফরীদ্ উদ্দীন্ মংহম্মদ 'অত্তার্ একজন শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈরানের অন্তর্গত নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পারশ্য সম্রাট সঞ্জরের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একশত বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সুফী ও সাধকদিগের নিকট হইতে তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান হন ও পরে একজন প্রসিদ্ধ সুফী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার গ্রন্থরাজি হইতে অনুমিত হয় যে তিনি মিশর, দামস্কস, মক্কা, ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও ছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহার কবি নাম অত্তার (ঔষধ-বিক্রেতা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার ইলহী নাম্‌হ্ ও মস্বীবৎ নাম্‌হ্ নামক কাব্য-দ্বয় তাঁহার চিকিৎসালয়ে বসিয়াই তিনি প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাও শোনা যায় যে প্রত্যেক দিন প্রায় পাঁচশত লোককে তাঁহার চিকিৎসা করিতে হইত।

কবির শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে ইহাই বলা যথেষ্ট যে, প্রসিদ্ধ সুফীগণের অনেকেই তাঁহার প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। মৌলানা রূমী তাঁহার সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, "অত্তার প্রেমের সপ্তনগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আমরা এখনো প্রেমরূপ গলির এক কোণে অবস্থান করিতেছি মাত্র (হফ্‌ৎ শহর-ই-'ইশ্‌ক্ রা 'অত্তার্ গশ্‌ত্— মা হনূজ্ অন্দর্ খম্-ই-য়ক্ কূচ্‌হ্-য়ম্)"। অথবা, "অত্তার্ সুফীতত্ত্বের আত্মা স্বরূপ ও কবি সনয়ী ইহার দুই চক্ষুস্বরূপ, আমরা (অর্থাৎ মৌলানা রূমী) তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি মাত্র ('অত্তার্ রূহ্‌ বূদ্‌······মা আজ্ পয়-ই······ আমাদেম্)"। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অলাউদ্দৌলা সম্‌নানী নামক আর একজন সুফী কবি বলিয়াছেন, "যে গোপন তত্ত্বের বিষয় আমার মনে উদিত হইতেছে, তাহার ভাবধারা কেবল অত্তার ও রূমীর উপদেশাদি হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।" তাঁহার জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখিতে পাই যে, অন্যান্য ফারসী কবিদের ন্যায় তিনি কখনো কোন রাজন্যবর্গের প্রশংসা বা স্তুতি-বাক্যাদি দ্বারা সম্পদ ও অনুগ্রহাদি লাভে যত্নবান হন নাই।

'অত্তারের গ্রন্থরাজি ও কাব্যাদির সংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট অত্যুক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাহারো কাহারো মতে তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত কাব্যদ্বয় ছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটি কাব্যের উল্লেখ মাত্র দেখিতে পাই; যেমন—পন্দ্ নাম্‌হ্, খসরু-নাম্‌হ্, আসরার্ নাম্‌হ্, জবাহর্-নাম্‌হ্, লিসানুল্ ঘয়েব ইত্যাদি। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার মস্‌নবী কবিতা 'মুন্‌ত্বিকুৎ-ত্বয়ের' (পাখীদের আলোচনা), কসীদ্‌হ্ ও ঘজল্-সম্বলিত দীবান্ (গ্রন্থাবলী) ও তজকিরতুন্ ঔলিয়া (সাধকজীবনী) নামক গদ্য সাহিত্য রচনা দ্বারা।

'মুন্‌ত্বিকুৎ-ত্বয়র' সুফীদের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে সুফীতত্ত্ব রূপক দ্বারা বেশ

সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কাব্যের কাহিনী এইরূপ :—একদিন সকল পাখী সমবেত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল যে সকল দেশ ও জীবজন্তুর মধ্যে যখন একজন রাজা আছেন, তখন আমাদেরও নিশ্চয়ই কোন রাজা বর্ত্তমান আছেন। আমাদের তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। তখন পাখীদের সংবাদ-বাহক (পয়গম্বর) হুদ্‌হুদ্ তাহাদিগকে জানাইলেন যে বস্তুতঃই তাহাদেরও একজন রাজা আছেন এবং তাঁহার নাম সী মুরঘ্। হুদ্‌হুদ্ পাখীদের সী মুরঘ্ বা তাহাদের রাজার নিকট তাহাদিগকে এই সর্ত্তে পথ দেখাইয়া নিয়া যাইতে রাজী হইলেন যে তাহাদিগকে এই দীর্ঘ পথের দুঃখ কষ্ট ও নানাবিধ অসুবিধা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার সময় দেখা গেল যে কেবল ৩০টি পাখী (সী মুরঘ্) এই দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল; অন্যান্য সকলেই নানা ওজর ও অসুবিধা দেখাইয়া ভ্রমণ হইতে বিরত হইল। এই ত্রিশটি পাখী হুদ্‌হুদের নেতৃত্বে বিপদসঙ্কুল সাতটি উপত্যকা পরিভ্রমণ করার পর সী মুরঘের রাজদরবারে আসিল। এই সাতটি উপত্যকার নাম করা হইয়াছে,—ত্বলব (অনুসন্ধান), ইশ্‌ক্ (প্রেমাকর্ষণ), ম'রিফৎ (জ্ঞান), ইস্তিঘ্‌না (নির্ভয় বা স্বাধীনতা), তৌহীদ্ (ঐক্য), হয়রৎ (বিস্ময়) ও ফণা (আত্মোৎসর্গ)। যখন এই ত্রিশটি পাখা সী মুরঘের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা মনে করিল যেন তাহারা একটি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সী মুরঘ্-এর দর্শনলাভ করিতে গিয়া, তাহাদের নিজেদেরই প্রকৃষ্ট সত্তা উপলব্ধি করিল। তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে সেই সী মুরঘ্ আর কেহ নহে, তাহাদের নিজেদেরই প্রকৃষ্ট সত্তা।"—এই রূপক সুস্পষ্ট। পাখীদের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সী মুরঘ্ বা ভগবান্ তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা। হুদ্‌হুদ্ হইল তাহাদের নেতা, ভগবদ্-রাজ্যে নিয়া যাইবার উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। মানুষ অজ্ঞান-বশতঃ ভগবানকে বাহিরে খুঁজিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন সে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করে, তখন সে বুঝিতে পারে যে ভগবান তাহাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন, "যখন এই ত্রিশটি পাখী কালক্ষেপ না করিয়া দর্পণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তাহারা প্রকৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে সী মুরঘ্ ও তাহারা বস্তুতঃ এক।

চুন্ নিগাঃ কর্‌দন্দ্ ঈন্ সীমুরঘ্ জুদ্।
বীশক্ ঈন্ সীমুরঘ্ আন্ সীমুরঘ্ বুদ্॥

ভগবানকে উপলব্ধি করিবার পথে সাতটি উপত্যকা সাতটি অবস্থান্তর মাত্র, যাহার মধ্য দিয়া ভগবানকে জানিতে হইবে। তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার পথে প্রথম অবস্থা হইল তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা; কারণ যে প্রকৃতই জানিতে ইচ্ছুক হইবে, সেই ভগবানকে লাভ করিবে (জুবীন্দ্‌হ্ ইয়াবন্দ্‌হ্ শুবদ্)। সেইজন্য প্রথম মকাম্ বা অবস্থার নাম করা হইয়াছে 'ত্বলব'। কবি এই অবস্থা সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, "অনেক বৎসর চেষ্টা ও উদ্যমের পর এই অবস্থায় পৌছা যায়; কারণ এই অবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাসমূহ একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়। ধনসম্পত্তি এখানে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং খেলার পুতুলের ন্যায় সমস্তই ছাড়িয়া আসিতে হইবে।

জদ্ ও জহদ্ ঈন্‌জা বায়দ্ সাল্‌হা।
জান্‌কি ঈন্‌জা কল্‌ব্ গর্‌দদ্ হাল্‌হা॥
মাল্ ঈন্‌জা বায়দৎ আন্দাখ্‌তন্।
মুল্‌ক্ ঈন্‌জা বায়দৎ দর্‌বাখতন্॥

দ্বিতীয় মকামের নাম করা হইয়াছে

'ইশ্‌ক্' বা ভালবাসা ও প্রেমাকর্ষণ। মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হাওয়ার পরই সে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শীঘ্রই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হয়। তাঁহাকে পাইবার জন্য সে তখন সকল দুঃখকষ্টকেই একেবারে নগণ্য মনে করে এবং ভগবৎচিন্তাতেই সকল সময় ব্যাপৃত থাকে। তখন তাহার আর কোন চিন্তা নাই; তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে না হইবে ইহা ভাবিয়া অস্থির হয় না। কবির ভাষায়ও ইহাই ধ্বনিত হইতেছে "...... তারপর প্রেমের উপত্যকা সম্মুখে দেখা গেল; যে এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে ভালবাসার আগুনে একেবারে পতিত হইয়া যায় (··ঘরক্-ই-আতিশ্ শুদ্ কসী আনজা রসীদ্।"

তৃতীয় অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, পৃথিবীতে নানাপ্রকার মত আছে; এক মতের সঙ্গে কখনও অন্য মতের মিল নাই। আবার পার্থিব অনুসন্ধানী ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানীর তফাৎ সকল সময়েই থাকিবে। কাজে কাজেই যে সকল পথ বা আদর্শ আমাদের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাদের সকলই আমাদের চিন্তাধারার সীমানুযায়ী। প্রত্যেকেরই লক্ষ্যপথ তাহার আদর্শ পর্য্যন্তই পৌঁছিবে। অবস্থা অনুযায়ীই মানুষ ইহার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে। এখানেই জ্ঞানের পার্থক্য দেখা যায়—একজন মিহ্‌রাব্ (মুসলমানদের প্রার্থনার লক্ষ্যস্থল) এর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও আর একজন প্রতিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। শত শত মানুষ এখানে বিপথগামী হইতেছে; দুই এক জনই ইহার গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। জ্ঞানের সর্ব্বময় প্রভুত্ব চিরকালই বর্ত্তমান রহিয়াছে। চেষ্টা ও যত্ন সহকারেই এই গুণের প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবে (···হস্ত্ দায়ম্ সুল্‌ত্বানৎ দর্ ম'রিফৎ; জহদ্‌কুন্ তা হাস্বিল্ আয়দ্ ইন্ স্বিফৎ)।"

মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা অনুযায়ীই তাহার আদর্শের প্রতি ধাবিত হয়। যতই সে অগ্রসর হয়, ততই তাহার জ্ঞানের বিকাশ হয়। তখন সে আর পার্থিব কোন কিছুর প্রতিই আকৃষ্ট হয় না। তখন সে নির্ভয়; দুনিয়ার কাহাকেও সে আর ভয় করে না। তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। সে তাহার সম্মুখে অবস্থিত পৃথিবীকে একটি মাটির স্তূপমাত্র মনে করে। তাহাকে ইহার মধ্যে বাহ্যিক ভাবে লিপ্ত থাকিতে হয়ত দেখা যায়, কিন্তু ইহার কোন কিছুতেই সে আর আকৃষ্ট হয় না। কবির চতুর্থ অবস্থান্তর 'ইস্তিঘ্‌না'তে এইরূপ বর্ণনাই আমরা দেখিতে পাই—"তুমি সেই জ্ঞানপুরুষকে দেখিতে পাইবে তিনি তাঁহার সম্মুখে মাটির ডেলা নিয়া বসিয়া আছেন এবং ইহাতে নানারকম নক্সা ও চিত্র আঁকিতেছেন। বাহ্যিক সত্যিকার ও পরিবর্ত্তনশীল উভয় রকম রূপই ইহাতে প্রদর্শিত হয়।···কিন্তু এই পৃথিবীর গঠন একেবারে ফাঁকা; ইহা সেই মাটির ডেলার ন্যায় একেবারে অস্তিত্বহীন (···স্ব্‌রৎ-ই-ইন্ আলম্ পুর্ পীচ্ পীচ্; হস্ত্ হমচুন্ স্ব্‌রৎ-ই-আন্ তখ্‌ৎ হীচ্)।"

তারপর যখন সে পঞ্চম অবস্থা বা মকাম্-এ পৌঁছে, তখন সে বুঝিতে পারে যে এই দুনিয়ায় কিছুই স্থায়ী নহে,—কেবল সেই এক ভগবানই বিরাজমান। তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। আমি তুমি ও এই পৃথিবীর সকল বস্তু সেই একের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত তখন সকল জিনিষ ও অবস্থার মধ্যেই কেবল ভগবানকেই দেখিতে পান। এই অবস্থার নাম হইয়াছে তৌহিদ্। কবি বলিতেছেন, "যখন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন দ্বৈতভাব থাকিতে পারে না—

আমি, তুমি উভয়ই সেই অবস্থায় লোপ পায় (চুন য়কী বাশদ্ হমী নবাশদ্ তুয়ী ; হম্‌মনী বর্ খীজদ্ ইন্‌জা হম্ তুয়ী ।"

ষষ্ঠ অবস্থা ঃহয়রৎ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "বিস্ময়াভিভূত ব্যক্তি যখন এই অবস্থায় পৌছে, সে তখন স্তব্ধ, নিজের রাস্তা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর তাহার কোন খেয়াল নাই। এই পথে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে ; তাহার নিজ অস্তিত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে (•• গুম্ শু বদ্ দর্ রাহ্-ই-ঃহয়রৎ মঃহব ব মাৎ)।" সে তখন বলিতে থাকে, 'ইহা নয়, আমি কিছুই জানি না'।

সপ্তম বা শেষ মকামে আমরা দেখিতে পাই মানুষ তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত ভগবানের অস্তিত্বের নিকট বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাঁহার নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। কিন্তু সে সকল হারাইয়াও কিছুই হারায় নাই—ভগবানের অস্তিত্বে বিলীন হইয়া সে তাঁহার নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, "যে কেহ সেই পূর্ণ সমুদ্রে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, যদিও সে চিরকালের জন্য নিজেকে হারাইয়াছে, তথাপি চিরশান্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সে নিজেকে হারাইয়া 'ফনা' অবস্থায় পৌছিয়াছে। এই 'আত্মোৎসর্গ' অবস্থায়ও তাহার কোন খেয়াল নাই—ইহাই 'বকা' বা নিত্যস্বরূপ অবস্থা (•• চূণ্ ফনা গস্ত্ অজ্ ফনা ইন্‌কি বকা)।"

'মুন্‌তিকুৎ-ত্বয়র্' প্রায় ৪৬০০ বয়ৎ বা দ্বিপঙ্‌ক্তির সমষ্টি। ইহা অনেক ভাষায়ই তরজমা হইয়াছে। ইহার ভাষা ও ছন্দঃ অতি সরল ও সাবলীল।

পরশ

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্

এত দিন পরে কেন যে ছোঁয়ালে
তোমার পরশ খানি,
আমার যন্ত্রে কে দিল আজিকে
তোমার মন্ত্র আনি।
কর্ম্মমুখর জগৎ চক্রতলে,
তোমারে ছিলেম ভুলে,
আজি কেন এই সাঁঝের গোধূলি
আভাসে জানালো বাণী,
আলো আঁধারের মাঝে
বিস্মৃত মোর জীবনকক্ষে
আবার জ্বালিলে আলো,
নতুন করিয়া মানুষে বাসিনু ভালো।

আমারো জীবনে স্বপ্ন এসেছে,
হৃদয়ে জেগেছে মায়া,
অকরুণা এই ধরণীর বুকে
চেয়েছিনু শুধু ছায়া,
পশ্চিম আর পূর্বগগনে
রক্তের গাঢ় আলো,
আমার জীবন, আমার স্বপ্ন,
করে দিয়েছিল কালো।
স্বার্থমুখর জীবনের তলে তলে
তাইতো আমি আমারে ছিলেম ভুলে,
আমিতো জানিনে গোধূলি-আলোয়
তোমার পরশ খানি,

হঠাৎ আজিকে আনিবে আবার
নব জীবনের গান,
হিংসাপ্লুত মানুষের যেথা
নেই কোন অভিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সনাতনানন্দজীর দেহত্যাগ—গত ৬ই চৈত্র রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় স্বামী সনাতনানন্দজী ৮২ বৎসর বয়সে হাঁপানি রোগে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। কার্তিক মহারাজ ১৯২৬ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া হুগলি জেলাধীন দশ্বরকুণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকিয়া ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৯৩৪ সনের শেষভাগ হইতে বেলুড় মঠে বাস করিতে থাকেন। কার্তিক মহারাজ সাধনভজনশীল এবং সেবাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

উত্তর-ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত জানুয়ারী মাসে অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী ও তাঁহার সহকর্মী নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন:—(১) নববর্ষ হুসিয়ার, (২) বর্তমান ভারতের একজন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের জীবনবেদ, (৩) খৃষ্টের পন্থা ও বেদান্তের নীতি, (৪) আধ্যাত্মিক অনুভূতির আপাতবিরোধিতা, (৫) জগৎ-শাসন-সৃজনকারী মন, (৬) তুমি কি জীবনের আদর্শ বাছিয়া নিয়াছ? (৭) স্বামী বিবেকানন্দের ভাগবত জীবনব্রত, (৮) ঈশ্বর ও আত্মা, (৯) আত্মিক শক্তি কি?

সিয়াটল্ (আমেরিকা) রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক (অক্টোবর ১৯৪৭—সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) বিবরণী পাইয়াছি। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী প্রতি রবিবার প্রাতে 'বেদান্তের তত্ত্ব ও কার্যকারিতা', প্রতি মঙ্গলবার 'ভগবদ্গীতা' এবং প্রতি শুক্রবার আচার্য শঙ্করকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ভগবান্ বুদ্ধের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত এবং তদুপলক্ষে তাঁহাদের পূত জীবনী আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীদুর্গাপূজা, খৃষ্টমাস এবং ইষ্টার পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী দেবাত্মানন্দজী ও স্বামী বিবিদিষানন্দজী এই সকল অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বামী বিবিদিষানন্দজী সিয়াটলের বাহিরে নানাস্থানে বক্তৃতাদি করেন।

হলিউড শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—যে সকল আমেরিকান মহিলা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইতে বা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করিতে চান তাঁহাদের জন্য সান্টা বারবারায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তথায় বর্তমানে ১১ জন আমেরিকান মহিলা আছেন। ৫ বৎসর অবস্থানের পর যোগ্য বিবেচিত হইলে তাঁহাদিগকে দীক্ষা দেওয়া হয়। তাঁহারা রীতিমত ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হিন্দু দেবদেবীগণের পূজা করেন। এই আশ্রমের পরিচালক স্বামী প্রভবানন্দজী হলিউডে ঐরূপ আর একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমে গত ৩১শে অক্টোবর সমারোহের সহিত কালীপূজা হয়। আমেরিকায় ইহাই বোধ হয়

প্রথম প্রতিমা-পূজা। আশ্রমে বহু আমেরিকান স্ত্রীপুরুষ ছিলেন। এক জন আমেরিকান মহিলা তন্ত্র-ধারকের কাজ করেন। তাঁহার নাম সারদা। আমেরিকান ভক্তগণ প্রচুর ফল, ফুল ও মিষ্টি উপহার দেন। মেয়েরা পূজার ভোগ রান্না করেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় স্বামী প্রভবানন্দজী পূজায় বসেন। রাত্রি সাড়ে তিনটায় পূজা শেষ হয়। পূজার পর হোম অনুষ্ঠিত হইলে স্বামীজী সকলকে শান্তিজল দেন। পরে প্রসাদ-বিতরণ হয়। তন্ত্রধারিকা সারদা চমৎকার সংস্কৃত পাঠ করেন। আমেরিকান ভক্ত-নরনারীতে পূজা-মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে :—

কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব ১৭ই ফাল্গুন হইতে ছয় দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন ভজন, পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রসাদ বিতরণ, কীর্তন প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দিন রামায়ণের রাবণবধ পালা কীর্তন হয়। ১৯শে ফাল্গুন হইতে ২১শে ফাল্গুন তিন দিন সভায় বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বিভিন্ন দিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের জীবন আলোচনা করেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত কুমার চন্দ্র ভট্টাচার্য গীতায় ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করেন। স্বামী ওঁকারানন্দজী শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পিতা, পুত্র, সখা, পতি, রাজা প্রভৃতি-রূপে দৈনন্দিন জীবনে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশদভাবে বলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ শাস্ত্রী হিন্দি ভাষায় শ্রীরামচন্দ্র-চরিত্রের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করেন। উৎসবের শেষ দিবস এক মহতী সভায় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পি এল বৈদ্যের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভায় ডাঃ শর্মা ও অধ্যাপক সেন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভাপতি ডাঃ বৈদ্য পরমহংসদেবের ধর্মের মৌলিকতা-সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীসত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৭ই ফাল্গুন পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভজন এবং পূজান্তে প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় আলোচনাসভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সখীলাল ঝা, শ্রীভূতনাথ সিংহ ও আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ১৯শে ফাল্গুন কীর্তন-বিশারদ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'বৃন্দাবনলীলা' কীর্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। ২১শে ফাল্গুন বিহারের মাননীয় প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে আশ্রমপ্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা হয়। শহরের প্রায় দুই হাজার গণ্যমান্য নরনারী সভায় যোগদান করেন। আশ্রম-স্কুলের ও স্থানীয় টি কে ঘোষ একাডেমীর বালক স্কাউটগণ প্রদেশপালকে সামরিক কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করে এবং কুমারী বন্দনা দেবী, সুধা দেবী ও বাণী দেবী কর্তৃক মিলিতকণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হয়। স্বামী তেজসানন্দজী কর্তৃক আশ্রমের কার্যাবলীর বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হইলে পাটনা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এডভোকেট শ্রীযুক্ত ঈশ্বরীনন্দন প্রসাদ, কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী চিদাত্মানন্দজী ও পাটনা

বি এন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন মিশ্র অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বশেষে মাননীয় সভাপতি তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিবিধ লোকহিতকর কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রার্থনাগৃহসমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরনির্মাণ-কল্পে অর্থসাহায্যের জন্য সাধারণের নিকট আবেদন জানান। সভান্তে আশ্রমকমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২২শে ফাল্গুন আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমতী রামপিয়ারী দেবীর সভানেত্রীত্বে শ্রীমতী কমলকামিনী প্রসাদ, বি-এ, সিষ্টার পুষ্প, অধ্যাপিকা শকুন্তলা সিংহ, এম-এ, শ্রীমতী প্রতিভা বসু, অধ্যাপিকা মৃণালিনী ঘোষ, এম-এ এবং স্বামী তেজসানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে শ্রীমতী কনক দে ও করুণা ঘোষ ভক্তিরসাশ্রিত সুমধুর সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করেন। ২৩শে ফাল্গুন গদানীবাগ ঠাকুরবাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বামী তেজসানন্দজীর পৌরোহিত্যে এক সভা হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চন্দ্র, স্বামী বেদান্তানন্দজী ও স্বামী তেজসানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। ২৯শে ফাল্গুন আশ্রমপ্রাঙ্গণে দরিদ্র-নারায়ন সেবা হয়।

ভিজাগাপটম্ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন ও ২২শে ফাল্গুন দুই দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস পূজা, ভজন, উপনিষদ্-পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিবস আশ্রম-প্রাঙ্গণে মিঃ নঞ্জুন্দিয়ার পৌরোহিত্যে আহূত এক মহতী সভায় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, মিঃ কে ভি রতনম্, স্বামী সর্বগানন্দজী ও সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ডাঃ পেরাজু কর্তৃক ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য শেষ হয়।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই হইতে ২২শে ফাল্গুন ছয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৭ই ফাল্গুন মঙ্গলারতি, কীর্তন, পূজা, পাঠ, হোম, সঙ্গীত ও প্রসাদবিতরণ হয়। রেডিও-শিল্পী শ্রীপ্রিয়লাল চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল দাস প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীত দ্বারা উৎসবের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিলেন। আসামের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সভাপতিত্বে আহূত এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচিত হয়। সঙ্গীত ও বৈদিক শান্তি-বচনাদি পাঠের পর বক্তৃতা করেন স্বামী হরিহরানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পঞ্চতীর্থ ও ডাঃ সুকুমার চক্রবর্তী (ব্যারিষ্টার)। ১৮ই হইতে ২১শে ফাল্গুন চারি দিবস ভজন-কীর্তন, রামায়ণগান (লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও অশ্বমেধযজ্ঞ), পালা-কীর্তন (মান-মাথুর ও সুবল-মিলন) হয়। আশ্রমবিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্রদের একটি সভায় স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। উহাতে বিভিন্ন বক্তা ছেলেদের উপযোগী বক্তৃতা দেন। ২২শে ফাল্গুন পূর্ব-পাকিস্তানে ভারতীয় সহকারী রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা কেন্দ্রের বাৎসরিক সভা ও মিশন-চালিত বিদ্যালয়দ্বয়ের পুরস্কার-বিতরণ হয়। ডাঃ মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিয়া শিক্ষাসম্বন্ধে মনোজ্ঞ একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা

ও ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় তাঁহার সুন্দর অভিভাষণে বলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতি ও বাণীর মধ্যে রহিয়াছে বর্তমান যুগের উপযোগী এক মহান্ জীবনাদর্শ। মানুষ তাহার কর্মময় জীবনে ভগবন্মুখী হইয়া চলিলেই যথার্থ শান্তির অধিকারী হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৫ই ও ৬ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা এবং ছাত্রদের উদ্যোগে "রামধুন" গান হয়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র উকিল, বি-এল্-এর সভাপতিত্বে স্বামী বিমলানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ এবং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, যন্ত্রসঙ্গীত, ভজন, পদাবলীকীর্তন ও প্রসাদবিতরণ হয়। উৎসবে সৌহার্দ ও সর্বধর্মসমন্বয়ের উদার মনোভাব পরিস্ফুট ছিল।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্নে মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, গীতা ও উপনিষদাদি পাঠ এবং মধ্যাহ্নে সমাগত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মহিলাগণ ভজন গান এবং মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং পরমহংসদেবের জীবন-বেদের আলোচনা করেন।

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন হইতে ২২ ফাল্গুন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে পূজা এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনকীর্তন ভক্তগণের আনন্দবর্ধন করে। ১৮ই ফাল্গুন মহিলাসম্মেলনে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান মহিলাগণ সমবেত হন। ১৯শে ফাল্গুন দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্বামী পরশিবানন্দজীর পৌরোহিত্যে আহূত একটি সাধারণসভায় ঐকতান বাদন ও রচনা-পাঠ হয়। ২০শে ফাল্গুন একটী মহতী সভায় জেলা জজ জনাব কে এম ইসলাম সাহেব সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সাবজজ জনাব আবুল কাসেম সাহেব বলেন - রামকৃষ্ণ মিশনের উদার-নীতি ও পরধর্মসহিষ্ণুতা সকলেরই গ্রহণীয় আদর্শ। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিগণকে পাকিস্তানবাসিগণের সেবায় নিবিড় ভাবে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করেন। সভান্তে পোলষ্টার ক্লাবের সদস্যগণ ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া সকলকে আনন্দ দেন। ২১শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত জীবিতনাথ দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীও উপদেশ আলোচিত হইলে ঐকতান বাদন ও পুরস্কার-বিতরণ হয়। বহিরাগত ও স্থানীয় ভক্তগণকে লইয়া ভক্তসম্মেলন ও আদর্শ সমাজ গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্বামী গদাধরান্দজী, স্বামী পরশিবানন্দজী ও ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব আলোচনা করেন।

বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৪ঠা চৈত্র হইতে দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী

সুন্দরানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত সভায় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট হিন্দুধর্মের মূল সূত্রসমূহ সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিবস পূজা, হোম, কালীকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে প্রায় ৬০০০ নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। কলিকাতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কালীকীর্তন সমিতির "কালীকীর্তন" ও "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন" খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সন্ধ্যায় এক জনসভায় জাতীয়তাবাদী নেতা জনাব রেজাউল করিম্ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—ভারতকে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লইতে এবং পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ করিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও তাঁহাদের উত্তর সাধক মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথে চলিতে হইবে। স্বামী সুন্দরানন্দজী ভারতের নবজাগরণে স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় মনোজ্ঞ অভিভাষণ দান করিলে সভার কার্য শেষ হয়।

টাকী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৬ই চৈত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অর্চনা, ভজন-কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী, শ্রীযুক্ত স্বরজিৎ দত্ত এবং সভাপতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিলে আশ্রম-সম্পাদক স্বামী দয়াঘনানন্দজী আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী উপ-স্থাপিত করেন। সভার পর আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'যমরাজার ফ্যাসাদ' নামক হাস্যকৌতুকাত্মক নাটক এবং 'ভরতের রাজ্যাভিষেক' নাটিকা অভিনীত হয়।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব ৫ই হইতে ৭ই চৈত্র পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস উষাকীর্তন, ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুরস্কারবিতরণ হয়। বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইলে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দজী আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিবস উষাকীর্তন, প্রভাতফেরী, মীরার কীর্তন, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, চণ্ডীকীর্তন ও ধর্মালোচনা হয়। তৃতীয় দিন স্বামী মৈথিল্যানন্দজী, স্বামী গদাধরানন্দজী, স্বামী পরশিবানন্দজী মালদহের পল্লী অঞ্চলে একবর্ণা, মিল্কী, আড়াইডাংগা, নঘরিরা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক স্থানে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান—এই মঠে গত ১৭ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূজা, রাজভোগ, ভজন, শাস্ত্রাদি-পাঠ, ভক্তসমাগম ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ২২শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওঘর বৈদ্যনাথ পিকচার প্যালেসে শ্রীযুক্ত কীর্তিরাম সিংহের পৌরোহিত্যে একটি সভায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বিদ্যার্থিবৃন্দ, কর্মিবৃন্দ এবং শহরের বহু সুধী-জনের সমাগম হইয়াছিল। স্তোত্রপাঠ, ভজন, আবৃত্তি যন্ত্রসঙ্গীত ও বক্তৃতা সভার প্রধান

অঙ্গ ছিল। বিদ্যাপীঠের শ্রীমান অসীমকুমার সেনের ভজন সকলকেই আনন্দ দান করে। শ্রীযুক্ত কে ডি শর্মা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও ভারতীয় ধর্মজাগরণের নূতন রূপ সম্বন্ধে হিন্দীতে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী তাঁহার সুন্দর ভাষণে হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত শিবসাগর অবস্থি ঠাকুরের জীবনী-সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করিলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি যে ধর্মের উপর এবং এই ধর্মের বিকাশই অধুনা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজজীবনকে পুনরায় সুগঠিত করিতে পারে এই কথাই বলেন। জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য শেষ হয়।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভা—গত ১৩ই ফাল্গুন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বাৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণী উৎসব বিহারের প্রদেশপাল মহামান্য শ্রীমাধব শ্রীহরি আনের সভাপতিত্বে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভায় বহু সুধীজনের সমাগম হইয়াছিল। বালকগণ ঐকতান বাদন, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও কুচকাওয়াজ দ্বারা সকলের আনন্দ বর্ধন করে। অধ্যক্ষ বিদ্যাপীঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। স্বামী অচিন্ত্যানন্দজী সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। প্রদেশপাল মহামান্য শ্রীযুক্ত আনে তাঁহার সুচিন্তিত হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণে বলেন, "যে সকল বালক এই প্রতিষ্ঠানে মিশনের ত্যাগী কর্মিবৃন্দের পরিচালনায় শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, তাহারা সত্যই ভাগ্যবান। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে বুঝায়, চরিত্রগঠন, মানুষ তৈয়ারী—সেই মানুষ যাহারা আমাদের দেশকে করিবে মহান, জগৎকে দিবে আলোকের সন্ধান। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মী ও তাঁহাদের কার্যের সহিত পরিচিত বহু বিদেশীর সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ ও কার্যপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বার সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। ইহা অসাম্প্রদায়িক; ইহার উপর আমার গভীর আস্থা আছে। তাঁহারা পবিত্র, তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টা আন্তরিক, তাঁহারা দরদী। সহযোগিতার জন্য তাঁহাদের হস্ত সর্বদা প্রসারিত। সমগ্র পৃথিবী অশান্তির মধ্যে বাস করিতেছে। দিনে দিনে আত্মকলহ বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবী আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আমরাই অশান্তির মধ্য হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে পারি। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন মানুষ মাত্রেরই কল্যাণ হউক।"

রহড়া (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম—গত ২৫শে ফাল্গুন হইতে ২৯শে ফাল্গুন পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপিয়া এই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন আশ্রমের বালকগণের বেদ ও গীতা আবৃত্তি, পূজা ও হোম, পতাকা-উত্তোলন, ছাত্রসভা এবং ভজনসঙ্গীত হইয়াছে। পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। ছাত্রসভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত তামসরঞ্জন রায়, ভজনসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন স্বামী চণ্ডিকানন্দজী এবং পূজা ও হোম অনুষ্ঠান করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী। দ্বিতীয় দিন বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতপ্রতিযোগিতা, বালকগণের রামনাম-সংকীর্তন এবং শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কথকচূড়ামণির "শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" কথকতা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনের কার্যসূচী ছিল নগরসংকীর্তন,

ধর্মসভা এবং ওরিয়েণ্ট্যাল জিম্‌নাসিয়াম কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শন। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন ও সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। চতুর্থ দিন বিশিষ্ট শিল্পিগণের সংগীত, সুহৃদ্-সঙ্ঘের কালীকীর্তন, বালকগণের ব্রতচারী নৃত্য, সাধু ও ভক্তগণের সমাবেশ ও ভোজন, পুরস্কারবিতরণী সভা, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সাহার প্রাচ্যনৃত্যানুষ্ঠান, এবং বালকগণের 'কালচক্র' নাটকাভিনয় উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই দিন পুরস্কারবিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। সভাপতি মহাশয় আশ্রমের বালকগণকে উদ্দেশ করিয়া এক সময়োপযোগী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। বালকগণ কৃতিত্বের সহিত সঙ্গীত আবৃত্তি ও অভিনয় সম্পন্ন করে। পঞ্চম দিন 'নারায়ণ-সেবা' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় ছায়াচিত্র-প্রদর্শনী হয়। পরে একদিন রহড়াসংঘ কর্তৃক 'মহিষাসুর' যাত্রা অভিনীত হইয়াছিল। উৎসবের এই কয় দিন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজীর সাদর আপ্যায়নে অতিথি, অভ্যাগত ও দর্শকমণ্ডলী পরম পরিতোষ লাভ করেন। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু বালকাশ্রমে হোলি উৎসবে যোগদান করেন। আশ্রমের দুই শত বালক এক ঘণ্টা প্রদেশপালের সহিত হোলি উৎসব করে। তাহারা সময়োপযোগী গান করে এবং প্রদেশপালকে আবির ও কুঙ্কুম প্রদান করে। ডাঃ কাটজুও ছেলেদের প্রত্যেকের মাথায় রং দিয়া আশীর্বাদ এবং বিবিধ রকমের মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। এই হোলি উৎসবে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। মোহিনী মিলের ম্যানেজার মিঃ মেটা, রহড়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ ও তাঁহার সহকর্মীদের সাহায্যে উৎসবের কয় দিন আশ্রম বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের প্রতিষ্ঠা-দিবস—২৯শে ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ হলে রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু বলেন, "সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে হইলে বিদ্যায়তনগুলিকে শহরের বাহিরে স্থানান্তরিত করা কর্তব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শহরের যে অঞ্চলে অবস্থিত তাহা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানোপযোগী নহে। তাঁহার মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উহার যাবতীয় বিভাগ, ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলীসহ শহরের দূরে অপসারিত করা কর্তব্য। শান্ত পরিবেশে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভাল হইবে। বিদ্যায়তনগুলি শহরাঞ্চলে থাকিত না। এখনও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহার সবগুলিই শহরের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ সারদা পীঠের পরিচালনায় যে আবাসিক কলেজটি চলিতেছে, উহার পরিবেশ খুবই মনোরম। শহরের বাহিরে এরূপ মনোরম স্থানে বিদ্যায়তন স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত। সারদাপীঠের সম্পাদক তাঁহার বার্ষিক কার্যবিবরণীতে বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহারা একটি সমাজকল্যাণ-শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবেন। সমাজ-কল্যাণ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি শহরাঞ্চলে না হইয়া শহর হইতে দূরে হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। নিঃস্বার্থ কর্মীদের সেবায় দেশের কল্যাণ হয়। কিন্তু শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে সেবাধর্মীর মন গ্রামের দুর্গতদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না। কর্মীদের শহরে না থাকিয়া গ্রামাঞ্চলে যেখানে লোকের শিক্ষা নাই, ঔষধ নাই, জ্ঞানের আলোক হইতে লোক যেখানে

বঞ্চিত, সেখানে গিয়া কাজ করিতে হইবে। আজিকার দিনে সমাজসেবামূলক কাজের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। গ্রামগুলি নির্জীব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার অদূরে গ্রামগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কী দুরবস্থার মধ্যে গ্রামবাসীরা কালাতিপাত করিতেছে। সেবাধর্মী কর্মীদিগকে গ্রামে চলিয়া যাইতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত গ্রামের পুনর্জীবন না হয়, গ্রামের সাধারণের অবস্থার উন্নতি না হয়, ততদিন দেশের অগ্রগতি হইবে না। গ্রামের লোক বৈদ্যুতিক দীপমালাশোভিত শহরের প্রাচুর্য চাহে না, কিন্তু তৃষ্ণানিবারণের জন্য পানীয় জল চাহে। পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে একটুকু ভাল জল নাই। এই চরম অবস্থা সেবাপ্রাণ কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টায় বহুলাংশে দূর করা যাইতে পারে। গান্ধীজী কস্তুরবা স্মৃতিরক্ষা ভাণ্ডারের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কস্তুরবার স্মৃতিকে জাগরূক রাখিতে হইলে প্রত্যেক মহিলা কর্মীকে গ্রামে—শহর হইতে ৩০।৪০ মাইল দূরে নিভৃত পল্লীপ্রান্তে চলিয়া যাইতে হইবে। শহরসুখের স্বাচ্ছন্দ্য পাইলে কোন কর্মী গ্রামে যাইতে চাহিবে না। এইজন্য গান্ধীজী সকল সময়ই শহর হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। আজকাল বহু বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐগুলিতে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। সারদাপীঠে এই ব্যবস্থা আছে, পুঁথিগত বিদ্যালাভের সহিত হাতে কলমে শিক্ষালাভও হওয়া দরকার। দুঃস্থ মানবের সেবায় সারদাপীঠ আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান বহু দুঃস্থ ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষাদান করিতেছে। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সারদাপীঠ কাজ চালাইয়া গিয়াছে। এই প্রচেষ্টা অতীব মহান।" প্রারম্ভে ডাঃ কাটজু বিবেকানন্দ হলে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের একখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্রের আবরণোন্মোচন করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় স্বামীজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন যে, স্বামীজী ভারতের শাশ্বত মূর্ত প্রতীক। তিনি আমাদের জীবনে মহান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আমেরিকা হইতে সদ্য-আগত স্বামী নিখিলানন্দজী সভায় বক্তৃতা করেন। সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজী বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি পীঠের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। স্বামী অজয়ানন্দ সভাপতিকে ধন্যবাদ দেন। প্রারম্ভে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ বেদ গান করে। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

Srimad Bhagavad Gita— With the gloss of Sridhara Swami—Translated by Swami Vireswarananda; Publisher: The President, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras—4; Pages 536. Price Rs 7.

এই গ্রন্থে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মূল শ্লোক দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত ও ইংরেজীতে শ্রীধর স্বামীর টীকা অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:—

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আরারিয়া (পূর্ণিয়া)—এই আশ্রমে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, ভোগ, হোম, কথামৃতপাঠ, ভজনগান, দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং প্রসাদবিতরণ হয়। দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গদাধরানন্দজীর পৌরোহিত্যে আহূত এক ধর্মসভায় স্বামী আদিভবানন্দজী, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর রায় এডভোকেট এবং সভাপতি সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে ভজনান্তে উৎসব শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পূর্ণিয়া—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৭ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গল আরাত্রিক, ভজন, পাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগরাগ ও প্রসাদবিতরণ হয়। স্থানীয় জেলা ও সেসন্স্ জজ শ্রীযুক্ত গোবিন্দশরণ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় উদ্বোধনসঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত অমূল্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। স্বামী আদিভবানন্দজী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নবদ্বীপ—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে নগরকীর্তন সহ শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ ও প্রসাদবিতরণ হয়। অবসরপ্রাপ্ত একাউন্টান্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়। পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী, পৌরনায়ক শ্রীশচীন্দ্রমোহন নন্দী, আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ কর্তৃক গীতা এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ব্যাখ্যাত হয়। স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞগণের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতআলাপন, শ্রীতারক সেতারীর সেতার বাজনা এবং প্রভুপাদ নন্দকিশোর গোস্বামীর তবলাসঙ্গত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোহর—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৯শে ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি, পূজা, হোম, শোভাযাত্রা, এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন তর্কতীর্থের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মজুমদার ও সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দুই সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ধ্যারতির পর পালাকীর্তন গীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চারিগ্রাম (২৪ পরগনা)—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১৩ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, রামকৃষ্ণ-কীর্তন, চণ্ডীপাঠ, বিশিষ্ট গায়কদের ভজন ও কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মালোচনা হয়। স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম সম্পাদন করেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ঘোষের পৌরোহিত্যে আহূত

সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। আশ্রম-সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র নস্কর আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে বজবজ বিবেকানন্দ সংঘের সম্পাদক শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

পরলোকে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র—গত ৪ঠা চৈত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ফরিদপুর কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্র ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার আগড়পাড়া বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তিনি দিল্লী, পাবনা, পাটনা, কাশ্মীর, দৌলতপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি কলেজে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছেন। তিনি অমায়িক ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব—৫ই চৈত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন, "ভারতবর্ষ যাহাতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রতিযোগিতামূলক অভিযানে পশ্চাৎপদ না হয় এবং বিজ্ঞান-জগতে ভারতীয়গণও তাঁহাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভারতীয় বিদ্যার্থিগণকে সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদান করা অত্যাবশ্যক।" বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি ও জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী আদর্শবাদ সম্বন্ধে স্নাতকগণকে সতর্ক করিয়া কাটজু তাঁহাদিগকে জাতীয় মনীষা ও ঐতিহ্যের সহিত সুসমঞ্জস আদর্শ এবং নিজেদের প্রাচীন ভিত্তি-ভূমির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার এবং সম্মুখে ভগবদ্গীতার কর্মযোগীর আদর্শ স্থাপন করার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষে বহু শিক্ষায়তনের অপ্রীতিকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উল্লেখ করিয়া প্রদেশপাল অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ভারতের সন্তানসন্ততিগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমাবর্তন-ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী বিবৃত করিয়া বলেন, "বাঙ্গলার যে দুর্লভ কৃষ্টি একদিন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নরনারীর মনে শান্তি এনেছিল, মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে তুলেছিল, বাঙ্গলার সেই কৃষ্টি সেই সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলবার গুরুভার আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর পড়েছে।'

তরুণ গ্র্যাজুয়েটগণকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নয়—একথা তাহাদিগকে স্মরণ রাখিতে পরামর্শ দিয়া বলেন, "পৃথিবী আজ ভয়ে, দুঃখে, দুর্ভাবনায় সঙ্কুচিত। ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসের এক সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্দিনের ঘনান্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে বের করতে হবে আপনাদের।"

নিরক্ষরতা দূরীকরণ—পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং আগামী আর্থিক বৎসর হইতে ইহা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট ঐ পরিকল্পনার জন্য ১৯৪৯-৫০ সনে ৮ লক্ষ ৩৯ হাজার

টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টও উহার জন্য আরও ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্যাপক ভিত্তিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং অক্ষর-পরিচয় ও গণ-তন্ত্রসম্মত নাগরিক জীবনযাপন সম্বন্ধে শিক্ষা-দানই ঐ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ১২ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আনুমানিক ৯০ লক্ষ। প্রথম পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর আরও পাঁচ বৎসর পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট আশা করেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে প্রদেশে নিরক্ষরতা দূরীভূত হইবে।

ঐ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করার জন্য পাঁচশত নারী ও পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আগামী আর্থিক বৎসর হইতে বাইগাছি বনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষায়তনের সঙ্গে একটি ট্রেনিং কলেজ খোলা হইবে। আট হইতে দশ সপ্তাহ তথায় ট্রেনিং দেওয়া হইবে। বলা হইয়াছে যে, উহার ফলে প্রত্যেক বৎসর আট শত হইতে এক হাজার পর্যন্ত ব্যক্তি ট্রেনিং লইতে পারিবেন।

প্রথমে সমগ্র প্রদেশে ছয়শত কেন্দ্র খোলা হইবে এবং প্রত্যেক বৎসর অন্ততঃপক্ষে আরও তিন শত কেন্দ্র খোলা হইবে। পাঠাগার, আলোচনা, বক্তৃতা ও চিত্রপ্রদর্শনের দ্বারা সাংস্কৃতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের সামাজিক শিক্ষাদানকার্যে অগ্রসর হইবেন, গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে অন্ততঃ এক শত লোক শিক্ষালাভ করিবে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র—পাকিস্তান ডোমিনিয়নের জন্য কি ধরনের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া পাকিস্তান গণপরিষদে একটি মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, শাসনতন্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, সমুদয় ক্ষমতা ইসলামের নীতি অনুযায়ীই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইসলামিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ থাকিলেও তাঁহারা অমুসলমানদের অধিকারসমূহ উপেক্ষা করিবেন না। শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের প্রতি-নিধিদের দ্বারাই শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনের বিধান করা হইয়াছে, মুসলমান ধর্মযাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয় নাই। গণপরিষদে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্বায়ত্তশাসনশীল কয়েকটি প্রদেশকে লইয়াই পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। শাসন-তন্ত্রে পাকিস্তানকে একটি সার্বভৌম ক্ষমতাযুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিরোধী দলের নেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের মতে রাজনীতির সহিত ধর্মকে মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে। কায়েদ-ই-আজম এই পরিষদে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতে রাষ্ট্রের আদর্শসম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কারণ ইংরেজরা তখনও ছিলেন এবং তাঁহাদের চলিয়া যাইবার পর শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের ব্যাপার অন্যরূপ। প্রায় ১৮ মাস পূর্বে ইংরেজরা এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছেন এবং এদেশবাসী এখন নিজেদের ইচ্ছা-অনুযায়ী কাজ করিতে পারে।

ভ্রম-সংশোধন—উদ্বোধনের এই সংখ্যার ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের ৮ম পঙ্‌ক্তিতে লিখিত '১৯৪৮ সনের' স্থলে '১৯৪৭ সনের' এবং ১৩শ পঙ্‌ক্তিতে 'ঐ সনের' স্থলে '১৯৪৮ সনের' হইবে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক
গত ২০শে মার্চ তারিখে আহূত জনসভায়
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর

অভিভাষণ *

স্বামীজী ও বন্ধুগণ,

এই উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এই সুযোগ পাইয়া আনন্দিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী এবং উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বিশেষ যোগ্যতা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি না; কারণ, তিনি ছিলেন ঈশ্বর-ভাবান্বিত লোক, আর আমি সংসারের লোক,—সংসারের কার্যে নিযুক্ত এবং ইহাতেই আমার সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত, কিন্তু সংসারের লোকও ঈশ্বর-ভাবান্বিত লোকের প্রশংসা করিতে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইতেও পারে। এইজন্য আমি ঈশ্বর-ভাবান্বিত লোকের প্রশংসা করি, তবে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সময়ে সময়ে আমি একেবারেই বুঝি না। আমি এই মহাপুরুষ-গণের প্রশংসা করি, কেননা শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত তাঁহাদের কথা পাঠ করিয়া আমিও প্রভাবিত হইয়াছি। এই অভি-মানবগণ তাঁহাদের যুগ এবং পরবর্তী যুগ-সমূহকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহারা মহৎ ব্যক্তিগণের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহাদের সমগ্র জীবন-ধারা পরিবর্তন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্পষ্টতঃ সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ বাহিরে ছিলেন। তিনি ভারতের মহান ঋষিগণের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই মহাপুরুষগণ উন্নত জীবন এবং ভাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষ তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্যান্য পার্থিব কর্ম-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য কখনও অস্বীকার করে নাই। এই দেশ সর্বদাই সত্যের অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং এই অনুসন্ধিৎসাকে, যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। এই ভাবে ভারতবর্ষ সত্য এবং মূল সত্তার অনুসন্ধানের একটি পরম্পরাগত রীতি সৃষ্টি করিয়াছে। অধিকন্তু যাঁহারা আপন-আপন ভাবে ঐকান্তিকতার

* সম্পাদক-কর্তৃক অনূদিত

সহিত সত্যের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের প্রতি অপরিসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবার নীতিও এই দেশ অবলম্বন করিয়াছে। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সম্প্রতি এই পরমত-সহিষ্ণুতা ব্যাহত হইয়াছে—সময়ে সময়ে আমরা বিপথগামী ও সংকীর্ণমনা হইয়া থাকি। আমরা মনে করি যে, যাহারা সংকীর্ণ ভাব প্রকাশ করে, কেবল তাহারাই ঠিক পথে এবং অন্যান্য সকলে ভুল পথে চলিয়াছে।

ইহা কখনও ভারতের নীতি নহে। ঔদার্যই ভারতবর্ষকে মহান করিয়াছে। ভারতের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সত্যের বহু দিক আছে এবং ইহাদের প্রকারভেদ সংখ্যাতীত। সুতরাং লোকে কেমন করিয়া অভিমানে বলে যে, সকল সত্য কেবলমাত্র সেই জানিয়াছে? যদি সে সত্যের অনুসন্ধানে উৎসাহী হয়, তাহা হইলে বলিতে পারে যে, সত্যের একটি বিশেষ অংশ মাত্র দেখিয়াছে। কিন্তু অপর কেহ সত্য দেখে নাই, ইহা তাহার পথ অনুসরণ না করিয়া সে কিরূপে বলে? ভারতবর্ষ সত্য ও নীতির মূল্য স্বীকার করে এবং সম্ভবতঃ ইহাই তাহার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাহার ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতন সত্ত্বেও যুগ-যুগান্তর যাবৎ একটি মৌলিক চিন্তাধারা সে রক্ষা করিয়াছে।

যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি একটি বিশেষ ভাবে যে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেক সময় দূর হইতে অনেকে এই শিক্ষাহীন ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যখন তাঁহার নিকটে গিয়াছেন, তখনই এই ঈশ্বর-ভাবান্বিত লোকটির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ না করিয়া তাঁহার বন্দনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ জীবন-যাত্রা ও কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্ত-সংঘে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা মহৎ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহাদের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ভারতে নয়, পরন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সুপরিচিত। আমি জানি না আধুনিক যুবকদের মধ্যে কয়জন তাঁহার বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমি বলিতে পারি আমার সমসাময়িক অনেকে তাঁহার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং আমি মনে করি যে, যদি আধুনিক যুবকগণ স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং অনেক বিষয় শিখিতে পারিবেন। এইরূপ করার ফলে, স্বামী বিবেকানন্দের মনে ও হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা তাঁহাকে অল্প বয়সেই পোড়াইয়া মারিয়াছে, উহার একটি আভাস আমাদের অনেকে যেমন পাইয়াছেন, যুবকগণও সম্ভবতঃ তেমনি পাইবেন। তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি ছিল, ঐ মহান ব্যক্তিত্বের অগ্নি তাঁহার বাগ্মিতা এবং মহতী ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ইহা ফাঁকা কথার প্রশ্রয়-দানমাত্র নহে। তিনি যে শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উহাদের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় ও আত্মার সংযোগ ছিল। কেবল বাক্য-বিন্যাস দ্বারা নহে, পরন্তু গভীর আত্মপ্রত্যয় এবং ঐকান্তিকতা-সহায়ে তিনি বাগ্মিপ্রবর হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ভারতে বহু লোকের মন অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছেন এবং দুই-তিন পুরুষ যুবক-যুবতীগণ তাঁহার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দেশে অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিপর্যায়-ভুক্ত অপর একজন মহাপুরুষও সমগ্র ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন—তিনি গান্ধীজী।

তাঁহার পূর্বে যাঁহারা দুর্দিনে আবির্ভূত হইয়া ভারতকে সংগঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্ভবতঃ অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে বিস্ময়কর এই দেখিতে পাইবেন যে, ঐগুলি পুরাতন নয়। উহা ৫৬ বৎসর পূর্বকার হইলেও আজও নূতন। কারণ, যাহা তিনি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ও পৃথিবীর সমস্যা-সমূহের অনেক মূলতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইয়াছে। এই জন্য ইহা পুরাতন হয় নাই। আপনারা এখন পাঠ করিলেও ইহাকে নূতন মনে করিবেন। তিনি আমাদিগকে এমন কতকগুলি জিনিস দিয়াছেন যাহা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়া আমরা গৌরব বোধ করি। তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অকৃতকার্যতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামীজী কিছুই গোপন রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দোষগুলি গোপন করিয়া রাখা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই; কেননা, এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হইবে। এইগুলি সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও এরূপ মহত্ত্ব পরিব্যক্ত যে, উহা ভারতের আদর্শকে এবং ভারতবর্ষের অধঃপতনের দিনেও কতকাংশে তাহাকে গৌরবান্বিত রাখিয়াছিল।

অতএব স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা অবশ্যই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া সঙ্গত। এইগুলি ভবিষ্যতে বহুকাল যাবৎ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। সাধারণ অর্থে রাজনীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি মনে করি, তিনি ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মহান 'প্রবর্তক' (ইচ্ছা করিলে আপনারা অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করিতে পারেন) ছিলেন। পরবর্তী কালে যে বহু-সংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে কম-বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছেন। আমি আশা করি, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রজ্ঞা, তেজস্বিতা ও স্বাদেশিকতার যে প্রস্রবণ নিঃসৃত হইয়াছিল, আমাদের যুব-সম্প্রদায় উহার সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

ভারতে ও জগতে আমরা অনেক সমস্যা—ভয়াবহ জটিল সমস্যার সম্মুখীন। ইহাদের সমাধানের উপায় কি? রাজনীতিকগণ এক ভাবে এবং রাষ্ট্রবিদ্‌গণ অপর ভাবে উহাদের সমাধান করিতে চান—সুবিধাবাদীদের কথা আমি বলিতেছি না। দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাজনীতিক বা রাষ্ট্রবিদ্‌কে কতকাংশে সুবিধাবাদী হইতে হয় এই জন্য যে, বাস্তব জগৎ—যে সকল উপাদান তাঁহার হাতে আছে—তাহা লইয়াই তাঁহাকে কাজ করিতে হয়। সাধারণ লোক যাহা বুঝিতে পারে না বা যে ভাব অনুসরণ করিতে অসমর্থ, উহা তিনি তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন না। তাঁহাকে সর্বদা এই সমস্যা অন্য ভাবে সমাধান করিতে হয়—বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে। আমার বিশ্বাস গণতন্ত্র মূলতঃ উত্তম, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, আপনারা যাহা করেন, তাহা পরিণামে অধিকাংশ নরনারী অবশ্যই বুঝিবে, ভাল বলিয়া মনে করিবে এবং তদনুযায়ী কার্য করিবে। অধিকাংশ লোক যাহা বুঝিতে বা ভাল বলিয়া মনে করিতে

পারে না, তাহা সত্য হইলেও তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া চলে না। কাজেই রাজনীতিক ও রাষ্ট্রবিদ্গণকে অনেক সময় সত্যের সহিত আপস করিতে হয়। কারণ, জনসাধারণের সত্য-গ্রহণ-ক্ষমতা যথেষ্ট নহে। ইহা ভাল কি মন্দ আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতিক বা রাষ্ট্রবিদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, এরূপ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেন না, অন্য রকম করিলে তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে হইবে এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠদের সীমাবদ্ধ ভাব সম্বন্ধে যাঁহাদের স্পষ্টতর ধারণা আছে, তাঁহারাই তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। পক্ষান্তরে, মহাপুরুষগণ সত্য সম্বন্ধে পৃথক উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা ফলাফল গ্রাহ্য না করিয়া সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকেন। সত্যকে তাঁহারা আঁকড়াইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া, গুলি করিয়া অথবা অন্যান্য প্রকারে নিহত করা হয়। ইহাই মহাপুরুষদের সম্বন্ধীয় নীতি। অতীত কালেও এই নীতি ছিল এবং এখনও ইহাই অনুসৃত। অবশ্য মহাপুরুষকে মারিয়া ফেলিলেও হত্যাকারী সত্যকে মারিয়া ফেলিতে পারে না। মহাপুরুষ অপেক্ষাও সত্য মহত্তর এবং তিনি, জীবিতাবস্থা অপেক্ষা মৃতাবস্থায়ই সেই সত্যের মধ্যে আরও অধিকতর জীবন্তরূপে বাস করেন।

এই দুই প্রকার মনোভাব সর্ব্বদাই দেখা যায়—ইহাই মহাপুরুষ এবং রাজনীতিক নেতা বা রাষ্ট্রবিদের মনোভাব। অন্ততঃ বর্তমানে কিম্বা সীমাবদ্ধকালে এই উভয় মনোভাবকেই সম্পূর্ণ কার্যকর বলা যায় না। ভবিষ্যতে হয় তো কেহ বলিবেন যে, এ বিষয়ে মহাপুরুষদের মনোভাবই উত্তম, কিন্তু এই রূপে কোন দেশের রাজনীতিক বা জনসাধারণের হিতকর কার্য অধুনা কেহ পরিচালন করিতে পারেন না। তবে কয়েক পুরুষ পরে এইরূপ রাষ্ট্রবিদ্ বা রাজনীতিকের অনুসৃত সত্যকে লোকে ভাল মনে করিবে বটে, কিন্তু তিনি এই সত্যের পথ প্রথমেই অবলম্বন করিলে এই সুযোগই পাইবেন না। এ বিষয়ে মহাপুরুষের পথ কাল্পনিক ভাবে উত্তম হইলেও তাঁহার পক্ষেও জীবনকালে উহা কার্যকর করা যে শক্ত ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। পক্ষান্তরে রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রবিদের কর্মপদ্ধতির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও উহা আপসপরম্পরা-চালিত পিচ্ছল পথ। একবার এই পথে পদক্ষেপ করিলে পরবর্তী প্রত্যেক আপস সত্য হইতে মানুষকে ক্রমেই অধিকতর দূরে সরাইয়া দিতে পারে। যাহা লোকে চায় তাহা বর্তমান অবস্থায় উপেক্ষিত হইতেছে, আমরা ইহা বুঝিয়া কি সত্যকে ধরিয়া থাকিব, অথবা বর্তমান অবস্থা বেশি চিন্তা না করিয়া পরে যাহা সত্য হইয়া দাঁড়াইবে তাহাই করিব? জগতে এই অবস্থার উদ্ভবের জন্য জনগণই দায়ী এবং এই সমস্যাই আমাদিগকে অবিরত সমাধান করিতে হইবে। ইহা অতি জটিল সমস্যা। বক্তব্য এই যে রাষ্ট্রবিদ্ সাময়িক আপসের প্রশ্রয় দিলেও তাঁহার পক্ষে যতদূর সম্ভব সত্যকে আশ্রয়, অথবা অন্ততঃ সত্যকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, একবার তিনি লক্ষ্যচ্যুত হইলে বিপথে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে পারেন।

জনসাধারণের সত্য অবধারণ ও গ্রহণের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রাষ্ট্রবিদের কাজ করা কঠিন। জনগণ সত্যকে কতটা বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা তাঁহার জানা দরকার। তিনি ইহা না জানিলে, তাঁহার বক্তব্য জনসাধারণ বুঝিতে না পারিলে মহাপুরুষের বাণীও তাহাদের নিকট নিরর্থক। জনগণ সত্যকে যে পরিমাণে গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই পরিমাণেই

তাহাদের নিকট সেই সত্যের ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে বাস করিতেছি যখন বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে—বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে ঐ দেশ অত্যন্ত উন্নত এবং তাহাদের পার্থিব ও ব্যবহারিক জীবনের মান উচ্চশিখরে পৌঁছিয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃতিতেও যে নানা দিকে উন্নত ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। তথাপি জগৎ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানবজাতির বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় অগ্রগতি তাহাদের মানসিক বা নৈতিক উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা বিপজ্জনক। কারণ, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রচণ্ড শক্তির উৎসস্বরূপ। আমরা আণবিক শক্তির মধ্যে ইহার সন্ধান পাইয়াছি। এই শক্তিকে সাধারণ ভাবে কাজে লাগাইলে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মানুষের ব্যাপক ধ্বংস সাধনেও আণবিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়। বিজ্ঞান ও শিল্প ভালও নয়, মন্দও নয়; ব্যবহার দ্বারাই উহাদের ভাল মন্দ নির্ণীত হয়। মানুষ এই অসীম শক্তিশালী অস্ত্র পাইলে ইহার যথার্থ প্রয়োগবিধি তাহার জানা আবশ্যক। ইহার অর্থ—যথার্থ প্রয়োজনে ঠিক ঠিক ভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি অপরিহার্য। তাহার জানা দরকার যে, সে পরিণামে কি উদ্দেশ্যে ইহা প্রয়োগ করিবে। বহু ধর্ম, বহু গির্জা, বহু মন্দির ও বহু মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ইহা বলা যাইতে পারে যে, ব্যষ্টিভাবে না হইলেও সমষ্টিভাবে মানুষ এ পর্যন্ত সেই উচ্চ আদর্শে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহাই এ যুগের দুর্ভাগ্য। আমরা নগণ্য মতবাদ ও রীতিনীতি লইয়া পরস্পর মারামারি করি, আমরা নিজেদের ধার্মিক অথবা ঐরূপ কিছু বলিয়া থাকি, পক্ষান্তরে আমাদের প্রতিবেশীর সহিত আমরা যথার্থ ভদ্র ব্যবহার করিতেও জানি না। ইহার ফলে পৃথিবী বারংবার ধ্বংসকর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে। এই জন্য জগতে দুইটি শক্তির বিকাশ আমরা দেখিতে পাই—ইহাকে আপনারা সংগঠন ও ধ্বংসের শক্তি বলিতে পারেন। এক্ষণে আমি যদি বলি যে, সংগঠন-শক্তিতে আমার বিশ্বাস আছে, তাহা হইলে ইহা আমার বিশ্বাস এরূপ বলা ভিন্ন ইহার সমর্থনে আমি আর কিছু বলিতে পারি না; এই অভিমতের পশ্চাতে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। আমি ইহার সমর্থনে কিছু বলিতে না পারিলেও বলিব যে, ইহা ঠিক আমার বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহা সত্ত্বেও আপনারা বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, কিরূপে ঐক্য-বিধায়ক ও সংগঠন-মূলক শক্তিসমূহকে উজ্জীবিত এবং ধ্বংসাত্মক বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি সেই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস—আপনাদের নৈতিক ভিত্তি ও ধারণা কতকটা থাকিলেই আপনারা উহা করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাই আপনাদের জীবন এবং আদর্শের সংযোগ রক্ষা করিবে। ইহা না থাকিলে ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ মস্তকোত্তোলন করিতে বাধ্য হইবে।

আমি প্রথমে যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম উহা অনুসরণে বলিতে চাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষগণ জগতে ঐক্যবিধায়ক এবং সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন মহান শক্তি (উচ্চ ও দীর্ঘ হর্ষধ্বনি)। এই শক্তি কেবল তাঁহাদের স্ব স্ব প্রচারিত শিক্ষায়ই অভিব্যক্ত নহে, পরন্তু জগৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব এবং জগতের উপর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তাঁহাদের প্রভাব আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতিক বা অন্যবিধ ক্ষেত্রে

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ-বিশেষ আপনারা গ্রহণ করিতেও পারেন এবং না-ও করিতে পারেন, কিন্তু মানব-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক মনোভাব, ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁহার গঠনমূলক ঐক্যবিধায়ক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা স্বীকার না করিলে বলিব যে, আপনারা প্রকৃত পক্ষে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পক্ষপাতী। তিনি যে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন, উহার কথা একেবারে ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার মনোবৃত্তি মূলতঃ ভারতের মনোবৃত্তি, ভারতবাসীর মনোবৃত্তি এবং ভারতের প্রতিভার মনোবৃত্তি (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর ও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন এবং রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, তথাপি তাঁহার মৌলিক মনোবৃত্তিই লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমি রাজনীতিতে লিপ্ত থাকিলেও এবং আধ্যাত্মিকতা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হইলেও আমি বিশেষভাবে অনুভব করি যে, আমাদের ঐ আধ্যাত্মিক ভাব এবং নৈতিক আদর্শ যদি না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জনকল্যাণকর কার্যাবলী এবং সাধারণ জীবনযাত্রা গুণতঃ দরিদ্রতর হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষও এই সকল সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন এবং আমাদের সকলেই ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, সংঘগত ও জাতিগতভাবে কঠিন সমস্যায় নিপতিত। ভারতের ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস আছে; এই জন্য আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষ কেবল এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হইবে না পরন্তু আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহার মূল জীবনী-শক্তি—যাহা যুগযুগান্তর যাবৎ তাহাকে পরিচালিত করিয়াছে, এখন সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইহা আরও অধিকতর ফলপ্রদ হইবে এবং স্পষ্টভাবে কার্য করিবে। আমার এই বিশ্বাস আছে; কিন্তু বিশ্বাসই পর্যাপ্ত নহে, আমাদিগকে এজন্য কার্য করিতে হইবে। কেবল কাজ করিলেই চলিবে না, পরন্তু স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা ভারত সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পারি, কিন্তু ইহা মূলতঃ সমগ্র জগৎ সম্বন্ধেও প্রয়োগযোগ্য একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী। ইহা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নয়। আমাদের জাতীয়তা অবশ্য একটি সংকীর্ণ জাতীয়তা হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত জাতীয়তাবাদী হইয়াও ইহা ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করেন নাই। তিনি এরূপ জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন, যাহা আপনা-আপনি ভারতীয় জাতীয়তায় পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার অংশ। অতএব এই উদার মনোবৃত্তি আমরা এই সকল মহাপুরুষ হইতে অবশ্য শিক্ষা করিব। আমরা যদি ইহা শিক্ষা করি এবং সর্বপ্রযত্নে কার্যে পরিণত করি, তাহা হইলে তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে, দেশের সেবার সুযোগ ঘটিবে এবং সম্ভবতঃ ইহাতে মানবজাতিরও সেবা করা হইবে। "জয় হিন্দ্"।

"লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ব্রহ্ম-দর্শন *

ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি

ঠাকুরের অলৌকিক, অদ্ভুত ও রহস্যময় জীবনের ও তদীয় ধর্ম্মবিষয়ক অমৃতস্বরূপ মহাসত্য-সমূহের মূল্যনির্ণয়ের সময় এখনও হয় নাই। আমরা তাঁহার বিষয়ে যতই আলোচনা করি না কেন, তাহাদ্বারা আমরা এই বাঙ্গালী 'সম্প্রদায়প্রভু' যুগাবতারের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সামগ্র্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ধর্ম্ম-জগতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যে কত বড় অবতার ছিলেন, আমরা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণাও করিতে সমর্থ হই না। এই অবতার ছিলেন সর্ব্বধর্ম্মমতের সমন্বয়ের প্রতীক। গীতার মহাবাণী—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ 'যাহারা যে ভাবেই আমাকে আশ্রয় করে (নিজ নিজ নানারূপ মতবাদদ্বারা) আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগৃহীত করি; কারণ, তাহারা যে সব ভাবেই ধর্ম্মসেবক হউক না কেন, আমারই ভজনাতে তাহারা সঞ্চরণ করে।' পরমপুরুষ গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সূক্তি স্মরণ করিয়া, এই অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর রামকৃষ্ণ 'যত মত—তত পথ' এইরূপ মহাবাণীর প্রচারক হইয়া ধর্ম্মবিষয়ক উদারতার জন্য সারা বিশ্বের উপাস্য হইবেন, তাহা কোন আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হওয়া উচিত নহে। পরম বৈদান্তিক, অথচ ঈশ্বরপ্রেমিক রামকৃষ্ণ সর্ব্ব-কালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতকে একই গন্তব্যস্থানে অর্থাৎ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম বা ভগবানে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মনে করিতেন। তিনি নিজ জীবনে প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ধর্ম্মমত সাধন করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মরসের আস্বাদ উপলব্ধি করিয়া নানাশাস্ত্রে উল্লিখিত ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের অপেক্ষাও যেন উচ্চতর স্থানে আরূঢ় হইয়া, জগজ্জনকে নিজের দৃষ্ট আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। ভক্তভাব-সমন্বিত ব্যক্তিরা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেমে বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া মনে করিতেন। যোগীরা তাঁহাকে প্রসন্নাত্মা বিগতভীঃ ব্রহ্মচারি-প্রধান মনে করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ শান্তির অনুভবকারী বলিয়া মনে করিতেন। আবার দার্শনিকগণ মনে ভাবিতেন যে, ঠাকুর এক রূপ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সব আধ্যাত্মিক সত্য নির্গত হইত, তাহা বেদবেদান্তের সার কথা। সুতরাং ইহা বলা একেবারেই অসঙ্গত হইবে না যে, ঠাকুর সর্ব্বধর্ম্মগুরুদিগেরও এক সমন্বয়-স্বরূপ ছিলেন। বেদান্তের (বা উপনিষদের) সত্য ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে নিহিত ধর্ম্মসত্য যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছিল, এরূপ বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর যেন উপনিষদের মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। জ্ঞানী পণ্ডিতেরা স্বোপার্জ্জিত বিদ্যাবলেও যে-সমস্ত দুর্ব্বোধ ও দুরূহ ঔপনিষদিক তথ্যের ধারণা করিতে সমর্থ হইতেন না, ঠাকুর তদীয় আধ্যাত্মিক প্রতিভাবলে অতি সরল

* ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৪-তম জন্মোৎসব-সভায় পঠিত।

ভাষায় সেই সব তথ্য শিষ্যবর্গ ও ভক্তমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মস্পৃহা ও আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও ভগবৎপ্রীতি বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিতেন। রেলগাড়ীর এঞ্জিন যেমন নিজ যন্ত্রশক্তিবলে বহুসংখ্যক অন্যান্য গাড়ীকে টানিয়া লয়, তেমন এইরূপ বিরাট মহাপুরুষ ও অবতারেরা নীচ-উচ্চ, হিন্দু-অহিন্দু, স্ত্রী-পুরুষ, পতিত-অপতিত নির্ব্বিশেষে লোকদিগকে ধর্ম্মের দিকে টানিয়া নিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধনের পথ খুলিয়া দিতে পারেন। ঠাকুরের আবির্ভাবসময়ে ভারতবর্ষে যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন ছিল, তাহাতে দোষভাগ ও গুণভাগ উভয়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও জড়বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষার ফলে, দেশ হইতে সনাতন ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক বা ঔপনিষদিক ধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। তখন সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার তিরোধানের আভাসও লক্ষিত হইতে লাগিল। কে না জানে যে, ঠাকুর সগুণ ও নির্গুণ উভবিধ ব্রহ্মের উপাসনাতেই সমভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে ঠাকুর তৎকালিক "পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মুখে (স্বজীবনের শেষ) দ্বাদশ বৎসর নিজ আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে এইকালে ধর্ম্মসংস্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যভাবরূপ বন্যা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিষম সঙ্কট হইতে ভারত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে।" ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্যের জড়বাদের ভাব-প্রবাহে ভরপূর নিজের ধর্ম্মতরণী ভাসাইয়া চলিয়াছিল, সে-সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণই সৎ কর্ণধার সাজিয়া সেই তরণী হইতে অনিষ্টকর অনুপাদেয় ভাবজল যথাযথরূপে সিঞ্চন করাইয়া ইহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই তরণী ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য কোন ধর্ম্মবাত্যাহত হইয়া নিমগ্ন না হইতে পারে, তজ্জন্য পাকা পাকা কাণ্ডারী ও শিক্ষিত মাল্লা রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা আজ পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্মনৌকা ঠিক চালাইয়া যাইতেছেন, কারণ, ইহা সনাতন সত্য দিয়া গঠিত হইয়াছে। সেইজন্য বর্ত্তমান যুগেও কেবল বাঙ্গালায় নহে, সমগ্র ভারতে, এমন কি পৃথিবীর আরও অন্যান্য স্থানে ঠাকুরের উপলব্ধ ধর্ম্মমতের প্রতি শিক্ষিত জনসমাজের এত বড় আদর ও শ্রদ্ধা। সর্ব্বঘটে, সর্ব্ব বস্তুতে ও সর্ব্ব নরনারীতে যাঁহার ঈশ্বরদর্শন পাকা হইয়াছিল, তাঁহার আচরণ সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ঠাকুর ছিলেন গৃহি-সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সংসারের কামকাঞ্চনে আসক্তি-রহিত, এবং তাঁহার মনে বৈরাগ্যের প্রতি প্রকৃষ্ট প্রেরণা থাকিলেও, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ শ্রমণদিগের মত অনাগারিক বা গৃহত্যাগী হন নাই। "আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা—সেত স্বার্থপরতা, যাহাতে ইহারা (অর্থাৎ জনসাধারণ ও ভক্তেরা) সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর"—ইহাই ছিল ঠাকুরের উপদেশ। ইহা যেন ঠাকুরের একরূপ বোধিসত্ত্বভাব—সকলেরই নির্ব্বাণলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটুক এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার মনে থাকিত সর্ব্বদা। এইজন্য ঠাকুর গৃহস্থ থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিয়া লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তবে গৃহস্থ হইলেও তিনি ত্যাগের শেষ সীমায় আরূঢ় ছিলেন। অনিত্য সংসার-প্রপঞ্চ-রূপী বৃক্ষকে তিনি অসঙ্গশস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। দুরুচ্ছেদ, অনর্থকর ও বিনাশশীল এই সংসার-বৃক্ষের উচ্ছেদ করিতে হইলে, একমাত্র অসঙ্গ বা অনাসক্তি, এবং অহঙ্কার ও মমকারের বর্জ্জনদ্বারাই তাহা

সম্ভবপর হয়। এই প্রপঞ্চের মূল (অর্থাৎ ইহার উৎপত্তির কারণ) যে সেই ঊর্দ্ধস্থিত বস্তু, পরমজ্যোতিষ্মান্, সর্ব্বমহান্, অমৃত বা অবিনশ্বর-স্বভাব পরমাত্মা—ইহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া, শত শত পাষণ্ড অর্থাৎ তাৎকালিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বাদীরা নিজ নিজ যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা ইহার স্বরূপের নানারূপ বিকল্পকল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কেহ কেহ ইহাকে (জগৎকে) সংঘাত, পরিণাম, আরব্ধ, সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"—ইত্যাদি কঠোপনিষদের বাক্যের ভাষ্যে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সংসার-বৃক্ষের মূলগুলি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে মানুষের মনোমধ্যে, এবং এগুলি নানাপ্রকার ফলভোগতৃষ্ণারূপ সলিলাবসেকের দরুন অত্যন্ত গভীরভাবে প্ররূঢ় হইয়া জটা বাঁধিয়া বৃক্ষকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মানুষের বিষয়াসক্তি বিষয়তৃষ্ণাদ্বারাই জীবন্ত থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত মানুষের তৃষ্ণা বা কামনা, বা (ভাগবতের ভাষায়) 'কামজটা' বিদূরিত বা উচ্ছিন্ন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সংসৃতির কবল হইতে মুক্তি নাই। বুদ্ধের ন্যায় ঠাকুর রামকৃষ্ণও মারবিজয়ী বা কামবিজয়ী বা তৃষ্ণাবিজয়ী ছিলেন। উপনিষদের বাক্য স্মরণ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঠাকুর ছিলেন অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম, সুতরাং তিনি "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" অর্থাৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থাকিয়াই (বর্ত্তমান দেহেই) ব্রহ্মে লীন ছিলেন, অর্থাৎ তিনি ছিলেন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে এই বিষয়ে এই মহাসত্য এই-ভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, যথা—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধিতে যে সব তৃষ্ণা বা কামনা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সে সব যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহান্তরপ্রাপ্তি আর ঘটে না। অতঃপর তিনি অশরীর ও অমৃত ব্রহ্মই হইয়া যান। ঠাকুর যে কত বড় কামনাত্যাগী ছিলেন, সে বিষয়ের অনেক কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে একটি কথা এইরূপ প্রচলিত আছে—রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন ঠাকুর পাগলের মত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী কর্‌তে চাস্?'

ঠাকুরের নির্গুণ, নিরাকার ও নির্ব্বিকল্প তুরীয় ব্রহ্মরূপের সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে দুই চারিটি কথা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। ঠাকুর অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী জগন্মাতাকে নানাভাবে ও নানা-রূপে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন—সেইজন্যই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের সাধনেও প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর বলিতেন—"কৃপাময়ী মাও তখন তাঁহার ঐভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা যোগাইয়া, এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া, সেই ভাবে দেখা দিতেন।" অনেকেই হয়ত জানেন যে, ঠাকুর মধুরভাব বা বৈষ্ণবভাব সাধন করিয়া ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের বা বেদান্ত-সাধনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। সেই সময়ে পরম-বৈদান্তিক, ব্রহ্মজ্ঞ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে ছিলেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়াই এই ব্রহ্মজ্ঞানী

আচার্য্য তাঁহাকে বেদান্তসাধনের উত্তম অধিকারী মনে করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত করাইলেন। তোতাপুরী ঠাকুরকে শিখাসূত্র ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়া ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাইলেন। তখন গুরুর সম্মুখে ঠাকুর যে সন্ন্যাসমন্ত্র পাঠ করিলেন তাহার সার কথা এই :—"হে সংসারদুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর! দ্বৈতপ্রতিভারূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর।...আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই।... চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি ; দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি।" দ্বৈতভাবের আমূল বিনাশ না হইলে, অদ্বয় ব্রহ্মের দর্শন বা উপলব্ধি সম্ভাবিত নহে। আচার্য্য তোতাপুরী সেইজন্য বেদান্তের প্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের সহায়তা করিবার জন্য ঠাকুরকে ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখানে স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায় শুনান হইতেছে, যথা—

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, দেশকালাদিদ্বারা সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজ প্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব, নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না। তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর ; দেখিবে নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় বিলুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজস্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে।"

উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, যখন পরমার্থ অদ্বৈত ব্রহ্মে অবিদ্যাকল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টিরূপ উপাধি হইতে সম্ভূত ব্যষ্টিভাব উদিত হয়, তখন যে-হেতু দ্বৈতাভাস হইয়া থাকে, অতএব তখন আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তরও লক্ষিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে বিখণ্ডিত জীব অপর কোন বস্তুকে দর্শন করে, তখন একে অপরের আঘ্রাণ লয়, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু, যখন সমস্তই তাঁহার (জীবের) নিকট আত্মাই হইয়া যায় (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর আর লক্ষিত হয় না) তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কি দিয়া কাহাকে বলিবে, কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া কাহাকে ভাবিবে, কি দিয়া কাহাকে স্পর্শ করিবে, কি দিয়া কাহাকে জানিবে? তার পরই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে :—

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, স এষ নেতি নেতি আত্মা, অগৃহ্যো ন গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে, অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ।"

যাঁহার দ্বারা এই সবই জানা যায়, তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে? যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হয়, ইনিই সেই আত্মা। ইনি অগ্রহণীয়, কারণ, ইনি গৃহীত হন না ; ইনি অক্ষর, কারণ,

ইঁহার ক্ষয় নাই; ইনি অসঙ্গ, কারণ ইঁহার আসক্তি নাই; ইনি বদ্ধ নহেন অতএব ইঁহার ব্যথা নাই ও বিনাশ নাই। (যিনি সকলের জ্ঞাতা) সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে এইরূপ যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ করিয়াছিলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই শাস্ত্রীয় উপদেশ নিজ সাধন দ্বারা পালন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুর খুব অল্পসময়ের মধ্যে এই ভাবাতীত অদ্বৈতভাব-সাধনায় সফলতা লাভ করিয়া, গুরু তোতা-পুরীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর সবই সমান অর্থাৎ ব্রহ্মময় উপলব্ধি করিতেন। আর এই সমত্বই অচ্যুতের আরাধনা বলিয়া বিষ্ণুপুরাণেও কীর্ত্তিত হইয়াছে—"সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"।

ভাবাতীতভাবে তন্ময় হইয়া অবস্থান করাটা যে কিরূপ, ঠাকুর অনেক সময় তাঁহার উপলব্ধিটা অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু, সেই অবস্থায় পৌছিয়া কি কেহ কাঁহাকে কিছু বলিতে পারে? তখনই সাধকের সম্পূর্ণ তূষ্ণীংভাব আসে, কণ্ঠরোধ উপস্থিত হয়, বলিবার চেষ্টা বিফল হয়। যোগসাধনে ব্রহ্ম-দর্শনের তত্ত্ব ঠাকুর সরল ভাষায় শিষ্যদিগকে বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন যে, কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে ষট্চক্রভেদ হয় এবং যখন সমাধি উপস্থিত হয় "তখন আর দেখাশুনাই থাকে না, তা কথা কওয়া! কথা কইবে কে? আমি' 'তুমি' এই বুদ্ধিই চলে যায়। মনে করি তোদের সব বল্‌বো—সেটা উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত কি দর্শন-টর্শন হয়, সবকথা বল্‌বো।... কিন্তু, কুণ্ডলিনী যখন কণ্ঠ ছাড়িয়ে উঠ্‌লো, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্‌ভুল হয়ে যাই—সাম্‌লাতে পারি নি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাব্‌চি কি রকম দেখ্‌ছি, আর অমনি মন হুস্ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না!" একদিন তিনি শিষ্য-দিগকে এই ষট্চক্রে কিরূপ দর্শন ঘটে বলিতে যাইয়া, ভ্রূমধ্যস্থলরূপ চক্র দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—এইখানে মন উঠ্‌লেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। বাস্তবিকই মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দেহযন্ত্রের বাইরে না যাইতে পারিলে অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবস্থায় না পৌছিলে, পরমাত্মার দর্শন ঘটে না। 'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' বেদান্তের এই সার বাক্যের ধারণা করিতে হইলে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ পাঠ ও তদ্বিচার করিলেই তাহা হইবে না—সাধনভজন ব্যতিরেকে বৈদান্তিক সত্য উপলব্ধ হয় না। জগৎ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে একদেশী ভাব দূর করিবার জন্যই বুঝি ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়পাদ-কারিকার একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥"

অর্থাৎ আমাদের জীবাত্মা অনাদি মায়া-শক্তির বশে থাকিয়া সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন—যখন (বিদ্যাবলে) তিনি অবিদ্যারূপিণী নিদ্রা হইতে একবার জাগিতে পারিবেন, তখনই তিনি অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন অদ্বৈত ব্রহ্মকে বুঝিতে পারিবেন।

"অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।"

সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

মরণ তোমার স্বীকার করি না।
নয়ন আড়ালে গিয়াছ বটে,
আজো বঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে
তোমার বিজয় বারতা রটে।
আবির্ভাবের শুভ খন স্মরি
হে সাধক তোমা অন্তরে বরি,
ভৌতিক তব তনুর অভাবে
আজি পূজি প্রভু তোমারে পটে।

বিজাতিপ্রভাবে কুশিক্ষা লাভে
যাহারা হইল বিপথগামী
বেণুরবাহূত ধেনুর মতন
ফিরালে তাদেরে হে গোস্বামী।
তব নাম স্মরি ধূলায় লুটায়
কত জন মোহলোচন ফুটায়,
স্মরি পরিণাম করি হরিনাম
তোমার জটিয়া বাবার মঠে।

চর্য্যাপদের কৌলিক ব্যাখ্যা

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত টীকাসমেত "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থকে "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। তিনি ইহাকে "বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অতি পুরান বাঙ্গালা গান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কেন না গ্রন্থের সংস্কৃত টীকাকার বোধ করি নিজে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, চর্য্যাপদের ধর্ম্মতত্ত্বগুলি বৌদ্ধ দর্শনের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৺শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতত্ত্বের দিকেই প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং তিনি চর্য্যাপদগুলির ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার চেয়ে ভাষাতত্ত্বের দিকে বেশী মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তিব্বতী ভাষায় লিখিত চর্য্যাপদের টীকা অবলম্বনে পদগুলির শুদ্ধ পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত দুই জনের প্রকাশিত পাঠ ও টীকা অবলম্বন করিয়া চর্য্যাপদগুলির ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক বিশদ আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, সকলেই বৌদ্ধ টীকাকারের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া মূলতঃ ভাষাতত্ত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চর্য্যাপদগুলির ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চর্য্যাপদগুলি

আদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বমূলক না তান্ত্রিক কৌলমার্গীদের ধর্ম্মতত্ত্বমূলক—এই প্রশ্ন বিচার করা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালে কৌলমার্গী ব্রহ্মানন্দদেব (শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক) আদির প্রধান কেন্দ্র ছিল; এবং তাঁহাদেরই রচিত পদগুলিকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কালে নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া টীকা লিখিয়া গিয়াছেন কিনা, ইহাও বিচার করা প্রয়োজন।

বসু মহাশয় লিখিতেছেন—"চর্য্যাগুলি সন্ধ্যাভাষায় লিখিত হইয়াছে। এইজন্য টীকা ব্যতীত সহজে ইহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না।" —অবশ্য আজকালও স্থানে স্থানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সাধকগুরু একেবারে বিরল নহেন, এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময় ভাষাতত্ত্ব অপেক্ষা সাধনাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অধিক—ইহা সহজেই অনুমেয়।

টীকাকার স্থানে স্থানে অনেক পদের ব্যাখ্যায় —"সন্ধ্যাভাষায় ইহার অর্থ এই" এইরূপ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি ইহাই বুঝায় যে—সমগ্র গ্রন্থখানি বা সমস্ত পদগুলি সন্ধ্যা নামক কোনও ভাষায় লিখিত? ৺শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যাভাষাকে—"আলো-আঁধারি ভাষা; কতক আলো, কতক অন্ধকার; খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না"—বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় (সন ও সংখ্যা মনে নাই) কোনও একজন প্রবন্ধলেখক প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলের দেশখণ্ড-বিশেষের নাম "সন্ধ্যাদেশ", এবং সেই অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার নাম সন্ধ্যাভাষা। এই ভাষা সেই অঞ্চলবাসী সকলেরই বোধগম্য, সুতরাং ভাব-গোপন করিয়া ভাষা রচনা করার কোনও অর্থ হয় না। বসু মহাশয় ভাষাগত বিশ্লেষণ করিয়া—"সম্-ধ্যৈ (ধ্যান করা) + অ + আপ্ = সন্ধ্যা" শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া অর্থ করিয়াছেন—"বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়।"

প্রকৃতপক্ষে—সনাতন সাধনশাস্ত্র সর্ব্বত্রই ত্রিবিধ ভাষা বা ত্রিভাবাত্মক; অর্থাৎ লৌকিকী ভাষা, পরকীয়া ভাষা ও সমাধি ভাষা;—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সাধনার্থ-প্রকাশক তিনপ্রকার ভাবাত্মক অপূর্ব্ব ভাষার দ্বারা একাধারে—নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অধিকারী ভেদে—তিন শ্রেণীর সাধকেরই কল্যাণপ্রদ। যেমন বৈষ্ণব শাস্ত্রকার লিখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীর সহিত রতিক্রীড়া করিলেন। লিখিত ভাষা—সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ব্রজবুলী আদি যে কিছুই হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বব্যাখ্যার সময় লৌকিকী ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইবে—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীদের যৌন সম্মিলন হইল; পরকীয়া ভাষা বা আধিদৈবিক ভাষায় ব্যাখ্যা হইবে—ইহা দৈবিক লীলা; এবং সমাধিভাষা বা সন্ধ্যাভাষায় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাষায় ইহার ব্যাখ্যা হইবে মধুর রসের চরম তত্ত্ব। সুতরাং লিখিত ভাষার নাম সন্ধ্যা ভাষা নহে; ইহা ভাবাত্মক ও তত্ত্বমূলক একটি ভাবমাত্র।

এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে চর্য্যাপদগুলির ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

লুইপাদের দোঁহা

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল॥১
(পাঠান্তর—পইঠা)

টীকাকারের ব্যাখ্যা:—মানবদেহ বৃক্ষস্বরূপ; রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ ইহার পাঁচ ডাল (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ছয় পল্লব)। প্রাকৃতিক সংযোগ-

দোষ-দুষ্ট চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু চিত্তবিচ্যুতি ঘটে, এবং এই চিত্তবিচ্যুতিই রাহু বা কালস্বরূপ (মানবদেহকে কবলিত করে)।

বসু মহাশয়ের ব্যাখ্যা—মানবদেহ বৃক্ষস্বরূপ, এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় তাহার পাঁচটি শাখা। চিত্তের চাঞ্চল্য অবলম্বন করিয়া রাহুরূপ কাল মানবকে গ্রাস করিয়া থাকে।

পদে আছে পঞ্চ ডাল, বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে পঞ্চস্কন্ধ, সুতরাং টীকাকার তৎক্ষণাৎ সেই ব্যাখ্যাই আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ হইল —রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও জ্ঞান—মানবদেহের অন্তর্নিহিত বস্তু; আর বৃক্ষের ডাল হইল—তাহার বহিঃপ্রকটিত অঙ্গ। সুতরাং টীকাকারের ব্যাখ্যায় উপমার সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। সহজিয়া গানে মানবদেহ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে দেখ আছে এক বৃক্ষ।
তাহাতে আছয়ে সব দেবের সে লক্ষ্য ॥
তিন মূল, চারিরস, পাতা তার দশ
নয় গাঁঠি, শত ছাল, দুই ফল, পাঁচ ডাল
তাতে থাকে দুটি পক্ষ ॥"

সুতরাং মানবদেহরূপ বৃক্ষের পঞ্চডাল, তাহার বহিঃপ্রকটিত অঙ্গ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বটে।

'চীত্র' শব্দের অর্থ সকলেই 'চিত্তে' করিয়াছেন; কিন্তু শব্দটি—চিঅ+ই=চিত্তই।

পইঠো=প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে। বসু মহাশয় পদের পরবর্ত্তী 'দিঠা' ও 'বইঠা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া 'পইঠা' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন;—কিন্তু দিঠা ও বইঠা বর্ত্তমানকালে ব্যবহৃত হইয়াছে; পইঠো—অতীতকাল।

সুতরাং পদের অর্থ হইবে—

মানবদেহ বৃক্ষস্বরূপ, হস্তপদাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইহার পঞ্চশাখা। এই বৃক্ষের মধ্যে চঞ্চল চিত্তই কালস্বরূপে প্রবেশ করিয়াছে।

এই চর্য্যাপদে চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করিয়া মন স্থির করিবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; দেহের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই।

দিট করিঅ মহাসুহ-পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥২
(পাঠান্তর—দিঢ়)

টীকাকার—সাধক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বিভিন্ন স্তরে যথাবিধি অভিষিক্ত হওয়ার পর যখন মধ্যরাত্রে প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক লাভ করেন, তখন তিনি যেরূপ স্থির ধীর শান্ত সমাহিত হইয়া তুরীয়ানন্দ লাভ করেন ও চতুর্থ স্তরের মহাসুখ উপভোগ করেন, সেই মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলিতেছেন—সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিবানিশি সেই সহজানন্দ মহাসুখ উপলব্ধি কর বা অবগত হও (জানীহি)।

বসু— দৃঢ় করি মহাসুখ কর পরিমাণ।
লুই ভণে গুরুকে পুচ্ছিয়া ইহা জান ॥

তিনি টীকাকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন।

সাধনমার্গে দীক্ষার পর স্তরে স্তরে আটটি অভিষেকের বিধান আছে। পূর্ণাভিষেক সাধন মার্গের প্রথম অভিষেক, এবং মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক শেষ ও সর্ব্বোচ্চাভিষেক। ইহাকে রাজযোগদীক্ষাভিষেক বা প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেকও বলে। এই অভিষেকের পর সাধক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া—"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্"—ভাবে তন্ময় হইয়া পড়েন। ইহাই মহাসুখের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। —"সে বড় বিষম ঠাঁই—গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।"

সুতরাং এই অবস্থায় মহাসুখের পরিমাণ করা আর শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্নই উঠে না। কার সাধ্য আছে—মহাসুখের মাপ করিতে

পারে?—এ যেন অনন্ত আকাশের সীমানির্দ্দেশ করার কথা।

সুতরাং টীকাকারের ব্যাখ্যা মোটেই সমীচীন হয় নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী পদে চঞ্চলচিত্তের কথা বলিয়া—তাহার দমনের উপায় কিছু না বলিয়া, একেবারে মহাসুখের তত্ত্ব আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

দিট=ডাট=টীট—নড়ে চড়ে না, নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া বসিয়া আছে, এমন অবস্থাকে টীট হইয়া বসিয়া আছে বলা হয়। পরিমাণ—প্র—মী (মীঞ্—হিংসায়াং)+ণিচ+যুট্।

"পরাসু প্রাপ্তপঞ্চত্বপরেতপ্রেতসংস্থিতাঃ।
মৃতপ্রমীতৌ ত্রিষ্বেতে চিতাচিত্যাচিতিঃ স্ত্রিয়াম্॥"
—অমরকোষ

প্র—মী+ক্ত, কর্ম্ম। আবার পাণিনি ৬।১।৫০—"মীনাতিমিনোতিদীঙান্ ল্যপি চ" মতে প্র—মা+যুচ্=প্রমাণ (পরিমাণ)=হননকারী, বিনাশকারী। "সুরবৈরীপ্রমাণা, নিশাচরনাশনিদানা রামচন্দ্র" (শঙ্করদেবের বরগীত)।

সুতরাং মহাসুহ-পরিমাণ পদের অর্থ—মহাসুখনাশকারী, মহাসুখের অন্তরায়;—সেই কালস্বরূপ চঞ্চলচিত্তের বিশেষণ।

পদের অর্থ—মহাসুখনাশকারী চঞ্চল চিত্তকে স্থির কর। লুই বলিতেছেন—ইহাকে স্থির করিবার উপায়—গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া (পরিপ্রশ্নেন) জানিয়া লও।

সঅল সমাহিঅ কাহি করি অই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরি অই॥৩
(পাঠান্তর—মরিআই)

টীকা—ইন্দ্রিয়-সংযমাদি কষ্টসাধ্য নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া নানারূপ সমাধি সাধন দ্বারা কি করিবে? সমাধিতে মহাসুখ লাভ হইলেও সমাধিভঙ্গের পর আবার দুঃখজ্ঞানের উদয় হওয়াতে জন্মমৃত্যু তোমার সহচর হইয়া থাকিবে।—এখানে দুঃখের চিরশান্তির জন্য সমাধির অনাবশ্যকতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বসু—টীকাকারের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মর্ম্মানুবাদে লিখিয়াছেন—

"সকল সমাধিদ্বারা কিবা করা যায়।
সুখদুঃখে নিশ্চিত মরিবেই হায়॥"

যোগশাস্ত্রানুসারে—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥"

*　*　*

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি! প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
ধ্যানং সমাধিরেতানি—যোগাঙ্গানি বরাননে!"

সমাধি আবার দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। আসনাদি সমাধি সংপ্রজ্ঞাত যোগাঙ্গ বলিয়া খ্যাত, এবং তৎপর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি মুখ্য সমাধি।

কিন্তু কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন—

"একভক্তোপবাসাদ্যৈর্নিয়মৈঃ কায়শোষণৈঃ।
মূঢ়াঃ পরোক্ষমিচ্ছন্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ॥
দেহদণ্ডনমাত্রেণ কা সিদ্ধিরবিবেকিনাম্।
বল্মীকতাড়নাদ্দেবি—মৃতঃ কোঽত্র মহোরগঃ॥"

আবার—"সর্বযোগসাধনঞ্চ কেবলং দেহকিল্বিষং"

আবার—"যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাৎ, ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্বাধিকঃ প্রিয়ে।"

নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদি নিরোধ করিয়া অন্তিমে যদিও পরম সুখ লভ্য হয়, কিন্তু সুখভোগকারী ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি পূর্ব্বকৃত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে নিজেদের ভোগশক্তির নির্জ্জীবতা বা শক্তিহীনতার কারণ তাহা ঠিকভাবে ভোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য সমাধিদ্বারা লব্ধ সুখ পূর্ব্বাচরিত দুঃখকষ্টদ্বারা যেন

আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অতলে মারা যায়।

কাহি=কি প্রকারে; করিঅই=করিবে।

মরিআই=মরিয়াই (অসমীয়া—ণিজন্ত) আঘাত করিয়া।

লাঠিরে মরিয়াই খেদি দিছে,—অর্থাৎ লাঠির দ্বারা আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে।—এখানে মরিয়াই শব্দই বিশেষ সমীচীন।

এড়ি এউক ছান্দক-বান্ধ-করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি ল্যাহুরো পাস ।৪
(পাঠান্তর—এড়িএউ; লেহুরে)

টীকা—মনঃসংযমনের হঠযোগবিধি—মূলবন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ আদি ত্যাগ কর, এবং শূন্যবাদের বা নৈরাত্ম ধর্ম্মের পাশে বা সমীপে গমন কর, অর্থাৎ সেই মত গ্রহণ কর।

বস্তু—ছন্দের (বাসনার) বন্ধন এবং করণের (ইন্দ্রিয়ের) পাটের (পারিপাট্যের, তৃপ্তির) আশা পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিবার চেষ্টা কর।

ছান্দ-বান্ধ করণ=ছান্ধিয়া বন্ধনক্রিয়া—ঘরের খুঁটার উপরে আড়াআড়িভাবে ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া বান্ধা হয়। এরূপ বান্ধাকে ছান্দিয়া বান্ধা বলা হয়। ইহা হইতে—জড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরাকে ছান্দ-বান্ধ বলে।—"যুজিলন্ত মাল বন্ধে, ছান্দি বান্ধি পায়ে পায়ে"।

"বিষয় বিলাস পাশ ছান্দি ইন্দ্রিয় মোহি ওহি—
লুটে বাটুয়ারি"—শঙ্কর দেব, বরগীত॥

পাটের আস (আঁশ)=পাটের তন্তু। উল্লিখিত ছান্ধি না হইলে শক্ত বন্ধন হয় না। পাটের দড়িও এই কাজে খুব শক্ত নহে, পাটের আঁশ বা তন্তুর ত কথাই নাই।

সুতরাং চঞ্চল মনকে স্থির ধীর নিশ্চল করিবার জন্য ছান্দিয়া বান্ধিতে হঠযোগ সমাধি আদি পাটের আঁশের মতই শিথিল ও ক্ষণভঙ্গুর।

এড়ি এউক=এড়িয়োক (অসমীয়া)=ত্যাগ করুন। অর্থাৎ ঐসব শিথিল ও অশক্ত বস্তু ত্যাগ করুন।

সুনুপাখ=শূন্যে সঞ্চরমাণ পক্ষী। মন শূন্যে সঞ্চরমাণ পক্ষীর মত; মনের নৌকা পবনের বৈঠায় চলে। সুতরাং তাহাকে ছান্দিয়া বান্ধিতে হইলে অন্য বস্তুর প্রয়োজন।

ভিতি লাহুরো পাশ=ঐ শূন্যে সঞ্চরমাণ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া লাহুরো—হুরণ=নিক্ষেপ করা; ভিতি=দিকে। সহজিয়া ধর্ম্মে জাল নিক্ষেপ করিয়া সংসার জয় করার অনেক নিদর্শন আছে এবং গুরুকে জালধারী ধীবরের সঙ্গে অনেক স্থলে তুলনা করা হইয়াছে। ধীবর যেরূপ জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া পরে ইহার শীর্ষস্থিত দড়ি ধরিয়া জালের মধ্যে একসঙ্গে বৃহৎ রুইকাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পুঁটি মাছকেও টানিয়া তুলে, গুরুও সেইরূপ নিজের শক্তিদ্বারা জগতের বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলকেই একত্র সমাবেশ করেন। এইজন্য মৎস্যেন্দ্রনাথও মহাধীবর এবং শিব সেই ধীবরকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। একটি গীতে আছে—

"তুনিয়া এদিনে, তুনিয়া তুদিনে
তুনিয়া ফুলনি বাড়ী।
কিন্তু ছলবল কর তই তুনিয়া
ধরিব খেওয়ালি মারি॥
খেওয়ালি জালত—গোড়া বার কুড়ি
পাশর লেখজোখ নাই।
টিকনিত ধরি, চোঁচনি মারিলে
সবাকে একে ঠাইত পাই॥"

(গোড়া—জালের অগ্রভাগে যুক্ত লৌহের গুটি। পাশ—জালের তন্তু; টিকনি=জালের খুঁট। চোঁচনি মারা=টানিয়া আনা)

ভণই লুই আমৃহে সানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥৫

(পাঠান্তর—ঝাণে ; পাণ্ডি ; বইন)

টীকা—লুই বলিতেছেন—ধবণ (শশিশুদ্ধ আলি) এবং চবণ (রবিশুদ্ধ কালি) এই দুইয়ের মধ্যে আসন করিয়া আমার দেবতা উপবিষ্ট আছেন—ইহা আমি সাক্ষাৎ দেখিয়াছি।

বস্তু—লুই বলিতেছেন—আমি ধ্যানে (ঝানে) দেখিয়াছি যে লোকজ্ঞান-লোকভাস বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব পরিশুদ্ধ করিয়া এই দুই পীড়ির (পিণ্ডি) উপর বসিয়া আছি।

এই পদে লুইপাদ পূর্ব্বপদে বর্ণিত শূন্যে সঞ্চর-মাণ পক্ষীর স্থিতি নির্দ্দেশ করিতেছেন।

ঝানে—ধ্যানে ; সিদ্ধাচার্য্যের পক্ষে ধ্যানের কথা উল্লেখ করা অশোভন।

সানে—সান্ধী=সন্ধানের লক্ষ্য ; সন্ধান করিয়া।

দিঠা=দৃষ্ট হইয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। দি=দিবস, ঠ=সূর্য্য ; সূর্য্যালোকে প্রভাসিত দিবসের মত।

বেণি=ধারা—যথা ত্রিবেণী, দ্বিবেণী।

লুই বলিতেছেন আমি সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি ঐ শূন্যে সঞ্চরমাণ পক্ষীটি ধমণ-চমণ নামক দুই বেণিকে পীড়ি করিয়া বসিয়া আছে।

ধমণ—ধবন=শশি, চন্দ্র, গঙ্গা, আলি, ঈড়া-নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের বামদিক দিয়া মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার রূপ শুভ্র বা ধবল, ভাগীরথী গঙ্গারূপে সুশীতল চন্দ্র-কিরণবৎ প্রবাহিতা। ইহা ধবল বেণি।

চমণ—চবণ=রবি, সূর্য্য, যমুনা, কালি, পিঙ্গলা নাড়ী। ইহা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পাশ দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহার বর্ণ শ্যামধূসরাঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, উষ্ণস্পর্শা, সৌরকিরণবৎ। সাধারণতঃ ছাই-ঢাকা সূর্য্যকিরণবৎ। সুতরাং ইহা ছাইবেণী, বা চবেণী বা চবণ।

এই ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মূলাধার হইতে যথাক্রমে মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ দিক বাহিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, কিন্তু ষট্‌চক্রের প্রতিটি চক্রকে বেণীর ন্যায় জড়াইয়া প্রতিটি চক্রের নিকট দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবং শেষে আজ্ঞাচক্রে গিয়া পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া নাসাপথে শেষ হইয়াছে।

আজ্ঞাচক্র ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানের বিপরীত দিকে মস্তিষ্কের ভিতর অবস্থিত। এই স্থানে ঈড়াপিঙ্গলার ছেদবিন্দুর মধ্য দিয়া মেরুদণ্ডা-ভ্যন্তরস্থ সুষুম্না নাড়ীও অতিক্রম করিয়াছে। তিন নাড়ীর এই মিলনস্থানকে ত্রিবেণী-ক্ষেত্র বলে। এখানে একটি ঊর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দুতে প্রণবের উপরিস্থ বিন্দু অবস্থিত। এই বিন্দুতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে, অর্থাৎ মনকে এই স্থানে আনিয়া বসাইতে পারিলেই—ইহা স্থির ধীর নিশ্চল হইয়া লয়যোগ প্রাপ্ত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে—এই ত্রিকোণের প্রতি বাহু ও কোণে অক্ষরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের একান্নবর্ণ মাতৃকাশক্তি স্থাপন করা হইয়াছে।

এই ত্রিকোণকে অকথাদি ক্ষেত্র, এবং হলক্ষ ক্ষেত্রও বলা হয়। ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মূলাধারের নিকট যথাক্রমে মেরুদণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বহিয়া উর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং প্রতি চক্রে ঘুরপাক দিয়া উঠিয়া আজ্ঞাচক্রে ঈড়া দক্ষিণ কর্ণের পাশ দিয়া এবং পিঙ্গলা বাম কর্ণের পাশ দিয়া আনিয়া শীর্ষবিন্দুতে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং বর্ণমালানুযায়ী নামকরণ করিলে শীর্ষবিন্দুতে ঈড়ার নাম হইবে—অঃ-ল বা আলি, এবং পিঙ্গলার নাম হইবে ক-ল বা কালি।

কৌলিক সাধকরা এই ত্রিকোণ ক্ষেত্রে গুরুপাদুকা ও গুরুর মূর্ত্তির ধ্যান করেন। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রমতে এই স্থানে বীরাসনে উপবিষ্ট

গুরু এবং তাঁহার বাম উরুতে সমাসীনা প্রিয়তমা শক্তির ধ্যান করিতে হয়।

নাথ-যোগীরা এই স্থানে বিন্দুর ধ্যান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে প্রণব-ধ্বনি-নাদ শ্রবণ করেন। বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে প্রণবধ্বনি শ্রবণের সহায়তাকল্পে গোরক্ষনাথ কর্ণে একটি ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণে নাদ শ্রবণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু-ধ্যান করিলে ত্রিবেণীক্ষেত্রে মন সহজেই নিবদ্ধ হয়, এবং তখনই লয়যোগ প্রাপ্ত হওয়া সহজ হইয়া পড়ে।

সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ এই বিন্দুতত্ত্বই—এই দোঁহাতে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বইঠা=বসিয়া আছে।

বইন=বসেন—(আইন=আসেন, যাইন=যান, খাইন=খান)। 'বইন' শব্দই অধিক সমীচীন। মন কখন কখন ঐ স্থানে গিয়া থাকে, সুতরাং সেই সময় যদি তাহাকে ঐখানে ধরিতে পার, তাহা হইলেই সে নিশ্চল হইয়া থাকিবে।

দোঁহার মর্ম্মানুবাদ—

নরদেহ তরুবর পঞ্চেন্দ্রিয় তার ডাল।
পশেছে চঞ্চলচিত্ত তাতে যেন কাল॥
স্থির কর সুখনাশী সে চঞ্চল মনে।
উপায় জানিয়া লও গুরু সন্নিধানে॥
শম যম সমাধিতে কি করিতে পারে।
দুঃখ শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগশক্তি মারে॥
ছান্দিয়া বান্ধিতে বৃথা হেন পাটের আঁশ।
শূন্যপক্ষী ধরিবারে ফেল মহাপাশ॥
লুই বলে আমি তারে দেখেছি সন্ধানে।
বসে থাকে ঈড়া-পিঙ্গলা বেণীসন্ধিস্থানে॥

কামনা

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস, এম-এ

সুরের তরে আমার মনে যে গান বেড়ায় ঘুরে,—
ত'রে তুমি আপন বীণায় নাচিয়ে তোল সুরে।
আমার মনের যে কুঁড়িটি ফোটার লাগি' কাঁদে,—
তোমার আলোয় ফুটুক্ সে আজ আপন মনের সাধে
সে নদীটি আমার প্রাণে হারিয়ে ফেলে পথ—
সফল কর হে মোর প্রভু! তাহার মনোরথ।
যে স্বপনের রূপটি লাগি' ব্যাকুল আমার প্রাণ,
যে পাখীটি প্রাণের শাখায় গায়নি আজও গান;
যে আশাটি কনকরেখায় জাগ্‌ছে মেঘের ফাঁকে,
যে মিনতি জাগছে নিতি আমার কাজল আঁখে,
যে হাসিটি লুকিয়ে আছে আমার সকল দুখে,
যে কথাটি ফুটল না হায়! আজও আমার মুখে,
সেই সকলে আপন করে ফুটিয়ে তোল আজ,—
আলো-ছায়ার মধুর গানে ওগো হৃদয়-রাজ!

প্রাক্-শংকর বৌদ্ধ-প্রগতি

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বৈদিক যুগে আর্য্যদের মধ্যে দুবার গোলযোগ বাধে। তার মধ্যে একবার অসুরবরুণ ও ইন্দ্রদেবের প্রাধান্য নিয়ে, যে জন্য আর্য্যদের পারসিক শাখা বেরিয়ে গেল। তাদের প্রধান দেবতা ছিলো "অহুর-বরণ" এবং ভারতীয় আর্য্যদের প্রধান দেবতা হলো ইন্দ্রদেব। ঋগ্বেদের প্রথম ভাগে দেখা যায় "অসুর" মানে 'বলশালী', পরন্তু শেষের দিকে "অসুর" মানে হলো 'পাপমতি'—অর্থাৎ তখন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। "জেন্দ্-অবস্তা" হলো অসুর-বেদ, তারও প্রথম ভাগে "দেব" শব্দের অর্থ 'দ্যোতনশীল', আর খুব ইন্দ্রের স্তুতি, কিন্তু শেষের দিকে "দেবতা" একবারে 'devil'এ পরিণত হয়েছে এবং কেবল ইন্দ্রের নিন্দা। ব্রাহ্মণ ও পুরাণের অন্তর্গত বৃত্রাসুর উপাখ্যানে ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপের বধ পড়লে এই বিবাদ কেমন ঘনিয়ে উঠেছিল বেশ বুঝা যায়।

আর একবার বিবাদ বাধে "হেলিঃ" অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনা নিয়ে। ঋগ্বেদে 'জ্যোতির্ম্ময়াত্মক' "হেলিঃ" শব্দও দুর্ব্বার্থক হয়ে পড়ে। গ্রীক্ ইতিহাসে এই "হেলিঃ" শব্দই Helos।

এ বেদ-ব্রাহ্মণ যুগের পর এলেন শ্রীবুদ্ধ। ইনি বেদ ও কর্মকাণ্ড না মানায় আবার হিন্দুস্থানীদের মধ্যে দুটো ভাগ হলো—বৈদিক ও বৌদ্ধমার্গ। পরিশেষে বৌদ্ধমার্গ ভারতবর্ষে পরিত্যক্ত হলো, এবং উহা প্রসার লাভ করল তাতার থেকে টোকিও এবং সিংহল থেকে শ্যাম পর্য্যন্ত।

শ্রীবুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছু কাল পরেই, তাঁর উপদেশগুলি সম্বন্ধে নানা বিচার আরম্ভ হলো। তাঁর ছিল সাধারণের জন্য একরকম উপদেশ, যাকে মহাযানীরা "ব্যক্ত উপদেশ" (exoteric) বলেন, এবং উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীদের জন্য ছিল আর এক প্রকার, যা "গুহ্য উপদেশ" (esoteric) বলে খ্যাত। [ঠিক যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের পৃথকভাবে উপদেশ করতেন এবং ভাবী সন্ন্যাসী ভক্তদের উপদেশ-কালে গৃহস্থ ভক্তদের সেখানে থাকতে দিতেন না।] ত্রিপিটকের বিনয়-পিটক এবং অভিধম্ম-পিটক ব্যক্তোপদেশ, পরন্তু সুত্ত-পিটকগুলিতে তাঁর গুহ্যোপদেশের নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণ লোকের জন্য তিনি চারি-আর্য্য-সত্য, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশপারমিতা, দশভূমি প্রভৃতি উপদেশ করেছেন। কিন্তু প্রাথমিক সুত্ত গ্রন্থে (যেমন ধম্মচক্ক পবত্তনসুত্ত, মহাপরিনিব্বান সুত্ত ইত্যাদিতে) পারমার্থিক জ্ঞানের বিবরণ থাকলেও পরবর্ত্তী কালীন মহাযানীদের 'সূক্ত' ও 'শাস্ত্র'-যুগের বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। "সব অনিত্য, সব দুঃখময় এবং সব অনাত্মা"—এই ত্রিসত্য বৌদ্ধ সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ সত্য হলেও অষ্টশীলাদি যাবতীয় বিনয়-পিটক ও অভিধর্ম-পিটকের ব্যাপার সব সাধন-মূলক ব্যবহারিক বা সাংবৃতিক (Phenomenological); এ সব গ্রন্থে, শ্রীবুদ্ধের পারমার্থিক জ্ঞান (Ontological

perception) সম্বন্ধে মাত্র মাঝে মাঝে উল্লেখ দেখা গেলেও কোন বিশেষ অভিব্যক্তি নেই। শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় শিষ্যদের গোপনে এ সম্বন্ধে উপদেশ করতেন। [যেমন শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ তাঁর গুহ্যোপদেশ নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গুটিকয়েক বিশিষ্ট অধিকারীদেরই বলতেন। এইজন্য পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দের "জ্ঞানযোগ" প্রভৃতি শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন যে, এ সব শ্রীরামকৃষ্ণের মত নয়; কারণ কথামৃত, পুঁথি প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভগবানের এই সকল উপদেশের মাঝে মাঝে উল্লেখ থাকলেও, এ সকলের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলে যান নি।]

যা'হোক শ্রীবুদ্ধের ঐ সকল গুহ্যোপদেশ অধিকারী শিষ্য-পরম্পরাক্রমে তাঁর পরি-নির্ব্বাণের পর প্রায় এক শত বৎসর গুপ্তভাবেই চললো, কিন্তু অতঃপর ধীরে ধীরে ঐ সকল মতবাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্তগ্রন্থকারে অভিব্যক্ত হয়ে পড়তে লাগলো। তারপর মহাদেব ও ভদ্র নামক দুই ভিক্ষু প্রকাশ্যে মহাপরিনির্বাণ প্রভৃতি প্রাথমিক সূত্রগ্রন্থের সহিত প্রজ্ঞা-পারমিতা, অবতংশক, অমিতার্থ, বিমল-কীর্ত্তি, আগম, বৈপুল্য, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক প্রভৃতি অপ্রকাশিত বুদ্ধতত্ত্ব সূক্ত-গ্রন্থগুলি প্রকাশ্যে প্রচার আরম্ভ করলেন। ক্রমে তাঁদের দল "মহাসঙ্ঘিক" বলে পরিচয় লাভ করল এবং প্রাচীনপন্থীরা তখন "স্থবির" বলে পরিচিত হলেন। [ঠিক এইরূপ বর্ত্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘেতিহাসেও দেখা যায় যে, ভগবানের তিরো-ধানের অব্যবহিত পরেই, তাঁর কয়েক জন গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট সাধনা ও আদর্শকে একমাত্র গৌড়ীয় ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চান। অথবা পরবর্ত্তী কালে অপর কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সার্বজনীন মতকে একমাত্র বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক শক্তিবাদের অবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগ-চক্রকে একটা বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক করবার প্রয়াস পান।]

স্থবিরদের গ্রন্থ সব পালিতে, পরন্তু মহা-সঙ্ঘিকেরা সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা তাঁদের ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীতে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই হলো বিরোধের দ্বিতীয় কারণ। বিরোধের প্রথম কারণ পূর্বেই বলেছি—স্থবিরমতে শীলাদির আচরণ করলেই নির্বাণ হবে, দার্শনিকতার কোন প্রয়োজন নেই। [এ যেন অনেকটা পরবর্ত্তী কালীন মীমাংসকদের তত্ত্বজ্ঞানের হেতু-নির্ণয়ে – কর্ম, অথবা মনন-নিদিধ্যাসন-সহায়-বেদার্থ-শ্রবণ নিয়ে বিবাদ]। আর এই দ্বিতীয় কারণ হলো, পালিভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বুদ্ধতত্ত্বের আলোচনা হতেই পারে না। [যেমন বর্ত্তমানে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলছে।] তারপর তৃতীয় কারণ উপস্থিত হলো ভগবানের ত্রিকায়-তত্ত্ব (Buddhalogy) নিয়ে—মহা-সঙ্ঘিকেরা বুদ্ধের তিনটে দিক প্রচার করলেন—(১) রূপকায় (গৌতমবুদ্ধ) (২) ধর্মকায় (ধর্মস্বরূপ বুদ্ধ) এবং (৩) সম্ভোগকায় (নির্বাণ-স্বরূপ বুদ্ধ)। এসব স্থবিররা স্বীকার করলেন না, বললেন, ওরা "পাপভিক্ষু," "অধর্ম্মবাদী" ইত্যাদি। তারপর বিচ্ছেদের চতুর্থ কারণ হলো যখন "অবতংশক-সূত্তে"র প্রত্যেক পুদ্গলের (প্রাণীর) অন্তর্নিহিত বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধত্ব প্রচারিত হলো।

অতি প্রাচীন এই সকল ঘটনা ও মতগুলির প্রতি অনতিপ্রাচীন ও অত্যাধুনিক শাংকর বেদান্তীদেরও একটু নজর পড়া উচিত। কারণ মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও পূর্ণত্ব

তত্ত্বটী শুধু তাঁদেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়, তথা কোন উচ্চতত্ত্ব ধনতান্ত্রিকদের মত দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্য, কোন বিশিষ্ট ভাষার দুর্বোধ্য শব্দ-সুরক্ষিত পেটিকায় আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তাঁদের আর একটি বিষয়েও লেখক নজর আকর্ষণ করিতেছেন যে, শ্রীবুদ্ধের আত্যন্তিক শূন্যতা মানে "emptiness" নয়, পরন্তু "ভূততাথাত্য" অর্থাৎ "suchness"। প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্তে জগতের মিথ্যাত্বকেই নেতিমুখে "শূন্যতা" বলা হয়েছে, পরন্তু অবতংশক-সূত্তে বিধিমুখে উহাকেই "নির্বাণধাতু" বলা হয়েছে এবং সদ্ধর্মপুণ্ডরীক-সূত্তে তার সমন্বয় হয়েছে। তথা লোকোত্তর-বাদী বৌদ্ধদের "মহাবস্তু", যোগাচার সম্প্রদায়ের কর্ত্তা মৈত্রনাথের "বিমলস্বভাব-নির্বাণ" এবং মাধ্যমিক নাগার্জ্জুন ও মৈত্রনাথের সমন্বয়কারী দ্বিতীয় অশ্বঘোষের "ভূততাথাত্যে"র সঙ্গে বেদান্তের ব্রহ্মের পার্থক্য করা বড় কঠিন। এইজন্যই বোধ হয় কোন চিন্তাশীল শাংকর-দার্শনিকই বৌদ্ধ "সর্বাস্তিত্ব", "মাধ্য-মিকা"দি দার্শনিক গ্রন্থ খণ্ডনকালে, একথা বলতে সাহস করেন নি যে, 'ভগবান বুদ্ধের মত আমরা খণ্ডন করছি', পরন্তু বলেছেন, 'ভগবান বুদ্ধে আরোপিত মতবাদ আমরা খণ্ডন করছি'। কেবল অতি অর্বাচীনেরাই বলতে পারে যে, ভগবান বুদ্ধের মত খণ্ডনীয়।

যাহোক, অতঃপর মহাসঙ্ঘিকদের প্রসার দেখে স্থবিরেরা মগধ ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গন্ধার-কাশ্মীর দেশে প্রস্থান করলেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যেই এইবার ধীরে ধীরে কণিষ্ক রাজাদের সময় দর্শন-শাস্ত্রের উন্মেষ হতে লাগলো, নইলে ক্রমবর্দ্ধমান "ভাগবত-সম্প্র-দায়ের" হাত থেকে তাঁদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কারণ জীবন্ত জাতির মন বড় অনুসন্ধিৎসু,—তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্ব ও সাধনমার্গ প্রকাশ করলেও জিজ্ঞাসা এসে মানুষকে বরাবরই দার্শনিক করে তুলেছে; কেবল হুকুমৎ ও তরবারির উপর কোন অযৌক্তিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাসাদি অনন্ত কাল-প্রবাহে নিত্য করে রাখা অসম্ভব।

গান্ধার-কাশ্মীর দেশীয় স্থবিরদের মধ্যে কাত্যায়নী-পুত্র বলে একজন মহাপ্রতিভাশালী পনর হাজার শ্লোকে এক বই লিখলেন, "অভিধর্ম-জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্র"—যার দার্শনিক নাম হলো "সর্বাস্তিত্ববাদ"। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বোধ হয় মনুষ্য-সমাজে এই প্রথম আরম্ভ হলো। মনস্তত্ত্ব হিসাবে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, সাংখ্য-কারিকা বা গ্রীক্‌ প্রতিভা এর কাছে নগণ্য এবং পর-মাণুবাদ হিসাবে এ গৌতম ও ডিমক্রিটাসের চাইতে কম নয়। এই দার্শনিক মতবাদ শ্রীশংকর লোকপরম্পরায় শুনে ও এই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী কালীন একখানি গ্রন্থ "অভিধর্ম-বিভাষ-শাস্ত্র" তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে খণ্ডন করলেন। তাঁর খণ্ডনটী যে সবটা ঠিক ঠিক ঐ শাস্ত্র-সম্মত, তা নয়—প্রায় সহস্র বৎসর পরে ঐ সকল শাস্ত্রের যে অবশেষ ছিল এবং প্রতি-বাদীর কাছ থেকে যেরূপ সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা পেয়েছেন, তারই খণ্ডন তিনি করেছেন।

যাহোক এই দার্শনিক মতের জন্য ঐ প্রাচীন স্থবির-সম্প্রদায়ীদের মধ্যে আবার বিবাদ উপস্থিত হলো। একেবারে যাঁরা গোঁড়া এবং দর্শন-শাস্ত্র-বিরোধী তাঁরা দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের দিকে প্রস্থান করলেন। এদিকে মহাসঙ্ঘিকেরা ধীরে ধীরে 'একায়ন', 'বোধি-সত্ত্বায়ন', 'বুদ্ধায়ন' প্রভৃতি শ্রীবুদ্ধের স্বীয় মত সম্বন্ধে নানা আখ্যার মধ্য দিয়ে সর্বশেষে

নিজেদের মতের নামকরণ করলেন, "মহাযান" এবং স্থবিরদের নাম দিলেন "হীনযান"। তাঁরা যখন নিজেরা নাম নেন, "একযান", তখন স্থবিরদের নাম দেন "দ্বিযান", যখন নিজেরা নাম নেন "বোধিসত্ত্বযান", তখন স্থবিরদের নাম দেন "শ্রাবকযান", যখন নিজেরা নাম নেন, "বুদ্ধযান", তখন স্থবিরদের নাম দেন "অর্হতযান"। সর্বশেষে মহামতি নাগার্জ্জুন নিজেদের মতের নামকরণ করলেন, "মহাযান" এবং স্থবির মতের নাম দিলেন "হীনযান"। ভগবান এক জায়গায় (সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে) স্বীয় মতকে "ব্রহ্মযান" আখ্যাও দিয়েছেন, কিন্তু মহাসঙ্ঘিকেরা এ নামটী নিতে সাহস করেন নি, কারণ তাহলে বেদ ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে নিজেদের সম্প্রদায় একেবারে সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

এদিকে ভাগবতধর্মের প্রবল প্রতাপে কণিষ্কবংশের একজন সম্রাট নাম নিলেন "বাসুদেব"। গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা নিজেদের নামের সঙ্গে লিখতে লাগলেন, "পরম-ভাগবত"। তখন সর্বাস্তিত্ববাদী এবং মহাযানীরা, উভয়েই, নিজেদের মার্গকে আবার দু'ভাগে বিভাগ করে ফেল্লেন—(১) আর্য্য-মার্গ বা কঠিন যান এবং সুখবতী-মার্গ বা সহজ যান। তথাপি অদ্বৈতভক্তি ভাগবত মত খুব প্রসার করতে লাগলো, কারণ ভগবানের আশ্রয় ও সেবার দ্বারাই যখন মুক্তি সুলভ, তখন অত দার্শনিক দ্বৈরথের প্রয়োজন কি? কিন্তু বৌদ্ধেরা তার পালটা জবাব দিলেন সুখবতী-মার্গ বা সহজ যান খুলে। শ্রীবুদ্ধের পাঁচটি ভাবাবস্থাকে তাঁরা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠা করলেন—(১) বিরোচন বুদ্ধ— শ্রীভগবান এখানে যোগীশ্বর ; (২) প্রভূতরত্নপাণি বুদ্ধ—ভগবান এখানে প্রভূত ধর্মরত্নদাতা ; (৩) অক্ষোভ্য বুদ্ধ—ভগবান এখানে নেতিমার্গী সর্বশূন্যবাদী ; (৪) বিমল-চন্দ্রপ্রভা বুদ্ধ—ভগবান এখানে বিধিমুখ অদ্বৈত মহাবস্তু-স্বরূপ ; এবং সর্বশেষ (৫) অমিতাভ বুদ্ধ—ভগবান এখানে একেবারে ভাগবতের করুণাময় ঈশ্বর। এঁদের একজনের সেবা ভক্তি করলেই তুষিত বা সুখবতী স্বর্গে (ভাগবত-মতে লীলাধাম, বেদান্ত-মতে ব্রহ্মলোক) গিয়ে তাঁদের কৃপায় স্ব স্ব উপায়ে প্রাণীর নির্বাণ লাভ হবে। এই সুখবতী স্বর্গ বৈষ্ণবদের বৈকুণ্ঠ, শৈবদের কৈলাস, শাক্তদের দেবীস্থান এবং পরবর্ত্তী কালের খৃষ্টানদের হেভেন এবং মুসলমানের বেহেস্তের অনুরূপ ব্যবহারিক বা সাংবৃত্তিক কল্পনা। আধুনিক বৌদ্ধদের মধ্যে অমিতাভ বুদ্ধের প্রভাব খুব বেশী। জাপানী জেন্ বৌদ্ধেরা, কিন্তু বিমলচন্দ্রপ্রভার ভক্ত। তান্ত্রিক তারা উপাসকদের ঋষি হলেন অক্ষোভ্য। এঁদের গ্রন্থে "শূন্য" শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

হীনযানের সহিত মহাযানের পঞ্চমবিরোধ হচ্ছে, প্রথমোক্তদের আদর্শ প্রত্যক্ বুদ্ধত্ব অর্থাৎ নিজের মুক্তি। পরন্তু মহাযানীদের আদর্শ বোধিসত্ত্বের মধ্য দিয়ে বুদ্ধত্ব, যা ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দিয়ে গেছেন—

"আত্মনো মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ"।

[অতঃপর পরবর্ত্তী প্রবন্ধে, ব্রহ্মসূত্রাদি-ভাষ্য-গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধ দার্শনিক মত সকল খণ্ডিত হয়েছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভাষ্যগ্রন্থ পঠনেচ্ছুদের সুবিধার জন্য আমাদের বিবৃত করবার ইচ্ছা রহিল।]

দেহ, মন ও আত্মা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন ভয়ে ভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন,

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৬।৩৪

'আমার মনকে তো আমি আয়ত্তে আন্‌তে পারছি না, কিরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করবো? মন যে বড় চঞ্চল!

হে কৃষ্ণ, মন যে শুধু চঞ্চল তা নয়, উহা প্রমাথি, প্রমথনশীল, শরীরকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে বিক্ষিপ্ত করে। অথবা পরের বশীভূত করে যাহা তাহাই প্রমাথি'। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলেছেন, "দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভজনক যাহা তাহাই প্রমাথি। তারপর, মন অতিশয় প্রবল—অজেয়, পরন্তু দৃঢ়—দুর্ভেদ্য। সেই মনকে বশীভূত করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য—সুদুষ্কর। কার মত? কোনো একটি কলসের ভিতর বায়ুকে পূর্ণ ক'রে যদি বাতাস দেওয়া যায়, সেই অবস্থায় চঞ্চল বায়ুকে অচঞ্চল করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার, তেমনি কঠিন চঞ্চল মনকে অচঞ্চল করা।

এই প্রশ্ন শুনে ভগবান্ উত্তর দিচ্ছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥
৬।৩৫

হে মহাবাহো কুন্তীনন্দন, মন যে চঞ্চলস্বভাব এবং দুর্নিগ্রহ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অভ্যাসদ্বারা এবং বৈরাগ্য বা বিষয়বিতৃষ্ণা-দ্বারা মনকে আয়ত্ত করা সম্ভবপর।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন মহাবাহু ধনঞ্জয়।
চঞ্চল দুর্বার মন নাহিক সংশয়।
বিষয়-বৈরাগ্যে আর অভ্যাসে নিশ্চিত।
হে পার্থ হইয়া থাকে মন নিগৃহীত।

কোনো একটি স্থির পদার্থের উপর, বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট মনকে পুনঃপুনঃ স্থাপন করার নামই অভ্যাস। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এই অভ্যাস পদের উল্লেখ আছে, আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃপুনঃ স্থাপনম্ অভ্যাসঃ।"

পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত আছে—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"

মনকে স্থির পদার্থে স্থাপন করতে হবে—ইহা ত শুনা গেল, কিন্তু প্রশ্ন এই—'স্থাপন' ক্রিয়ার কর্ত্তাটি কে? কে স্থাপন করবেন? উত্তরে বলতে হয় আত্মা হ'লেন কর্ত্তা। এর সমর্থনে একটি প্রমাণ উদ্ধার করা হচ্ছে—

"আত্মা মনসা সংযুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ,
ইন্দ্রিয়ম্ অর্থেনেতি ক্রমঃ।"

আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, মন সংযুক্ত হয় ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযুক্ত হয় পদার্থের সঙ্গে। যে-পর্য্যন্ত মন স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে স্থূল, সেই পর্য্যন্ত তার সঙ্গে স্থূল পার্থিব বস্তুর সম্পর্ক, কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে অভ্যাসের বলে জাগতিক স্থূল পদার্থের আকর্ষণ হ'তে সূক্ষ্ম পরম পদার্থে আকর্ষণ যাবে, সেই মুহূর্ত্তে ঘট্‌বে আত্মমনঃসংযোগ—'আত্মা মনসা

সংযুজ্যতে।' স্বয়ং আত্মারূপী ভগবান্ তখন কৃপা ক'রে মনকে টেনে নিবেন নিজের সঙ্গে। এই অবস্থাটি অজ্ঞেয়বাদ নামে খ্যাত। মানুষ যে মুক্তি পায় বা মুক্ত হয়, তা কি সশরীরে অথবা সূক্ষ্ম শরীরে ?—স্থূল শরীরসহ মানুষ সূক্ষ্ম পরম পদার্থের সঙ্গে তাদাত্ম্যভাব পেতে পারে না। কাজেই সূক্ষ্ম মন, আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য বা অভিন্নতা লাভ করে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সেই সময় মনের মধ্যে আর কোনরূপ সংস্কার থাকে না, সংকল্প বিকল্পও থাকে না। বিশুদ্ধ মন বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গে সঙ্গত হয়,—'সংযুজ্যতে'—সংযুক্ত হয়।

কেহ কেহ এই অজ্ঞেয়বাদের অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন—মন আত্মার সমীপবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ সামীপ্য ভাব প্রাপ্ত হয়, কেহ বলেন, সমান রূপ প্রাপ্ত হয়, সারূপ্য। কেহ কেহ বলেন সমানভাবে যুক্ত হয়, সাযুজ্য ; অপর কেহ বলেন সমান ঋষ্টি বা ঋদ্ধি প্রাপ্ত হয়—সাষ্টি।

এই একই মনকে বলা হয়েছে মুক্তির কারণ এবং বন্ধের কারণ, উভয়ই। "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" স্থূল বিষয়ের সঙ্গে সর্বদা সংযোগবশতঃ মনের স্থূলতা বা মলিনতা, এই অবস্থাতেই মন মানবের বন্ধের কারণ ; সেই মন যখন ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তরীণ ভগবদ্-ধ্যান-জন্য সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম রূপ প্রাপ্ত হবে তখনই তা মোক্ষের কারণ।

উপনিষদের বাণী—'যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বদ্বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে।" 'যেই পরম পদার্থকে মন দ্বারা মনন করা যায় না, বরঞ্চ যাহা দ্বারা মন মনন শক্তি লাভ করে তাহাকেই ব্রহ্ম বা বৃহৎ ব'লে জান্‌বে। তাহাই পরম পদার্থ বা পরমাত্মা। ইহা ভিন্ন অন্য যাহাকে উপাসনা করা হয় তাহা ব্রহ্ম নহেন অর্থাৎ বৃহৎ নহে। যাহা ব্রহ্ম তাহাই বৃহৎ বা বৃহত্তম, যাহা ব্রহ্ম নহেন তা বৃহৎ নহেন। নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ব্রহ্মের পার্থক্য এই জায়গায় ধরা পড়ে। যাঁর আকার আছে, তিনিতো আর বৃহৎ হ'তে পারেন না, তিনিতো সসীম। যাঁর আকার নাই, তিনি বৃহত্তম, অনাদি, অনন্ত, অজ, অব্যয়, অসীম।

আমরা সকলে স্থূলদেহধারী, সীমার ভিতর থেকে অসীমের সন্ধান করি। তাঁর কৃপা—বলে এক জন্মেই খোঁজা শেষ হয়, বহু জন্মেও হয় ; কৃপা না হ'লে অনন্ত জন্মেও হয় না। মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গের ন্যায় শুধু জন্ম আর মৃত্যু, 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' অবস্থা।

উপনিষদের অন্যস্থানে বলা হয়েছে—'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' = মনসা + এব + ইদম্ + আপ্তব্যম্। মন দ্বারাই ইহাকে (পরমাত্মাকে) পাওয়া যায়। এব শব্দের বলে (ইতর ব্যাবৃত্তি) অন্য সব বর্জিত হ'য়েছে, অর্থাৎ অন্য কিছু দ্বারা পাওয়া যায় না।

উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রে বলা হ'য়েছে যাঁকে মন দ্বারা মনন করা যায় না, আর এখানে বলা হ'লো মন দ্বারাই একে পাওয়া যায়। অতএব দুই বিভিন্ন-মুখী ব্যাখ্যার এক-বাক্যতা বা সমীকরণ কিরূপে সম্ভব ? উত্তর-পক্ষে বলা যেতে পারে মনের বিশেষণ দুইটি, 'অসংস্কৃত মন ও সংস্কৃত মন।' যাহা স্থূল বস্তুর সংস্পর্শে স্থূল বা মলিন তাহাই অসংস্কৃত বা অশুদ্ধ। এই অশুদ্ধ মন দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সাযুজ্য সম্ভবপর নয়। অতএব সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ মনের প্রয়োজন। সর্বপ্রকার জাগতিক চিন্তা বর্জনপূর্বক যখন একমাত্র পরম পদার্থে

মনের ব্যাপার সংঘটিত হবে তখন ভগবান্ বলবেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৩৬

সর্ব্বপ্রকারের ধর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন।
হে অর্জ্জুন লও শুধু আমার শরণ।
পাপতাপ শোকদুঃখ যাহা আছে ভবে।
সবে মুক্তিদাতা আমি, শোক কেন তবে?

মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক সর্বধর্ম পদে ব্যাখ্যা করেছেন সর্বপ্রকার গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ। এই তিন গুণের উর্দ্ধে উঠতে পারলেই ত্রিগুণাতীত পরম পদার্থের সহিত সাযুজ্য সম্ভব। অদ্বয়ভাবে সেই পদার্থ নিগুর্ণ, নিরাকার। দ্বৈতভাবে সগুণ, সাকার। উপাস্য ও উপাসক দুই তত্ত্ব। প্রভু ও দাস সম্পর্ক। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত তথ্য দ্রষ্টব্য।

বঞ্চিত কি হ'য়ে র'ব?

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

আকাশের নীল স্রোত, পৃথিবীর সবুজের বর্ণিল্ বিস্তার,
তারার তির্যক্ অনিমেষ দৃষ্টি, চন্দ্রমার স্বপ্নিল্ স্বপন
আমারে চলার পথ দেখায়েছে; জীবনের মধুবনে আর
উন্মাদ উৎসব-রাত্রি আনিয়াছে সমারোহে করিয়া বহন।
আজ কেন অকস্মাৎ অভাবিত ছন্দঃপাত দেখি মূর্তিমান্?
বিপুলা পৃথিবী ইঙ্গিতেরে হানে নয়নেরে করিয়া কুঞ্চিত,
প্রাপণীয় অধিকার কোথা' হেথা, নাই নাই মানুষের স্থান,
কল্যাণ ও শিব শুধু সমুখেতে দিবালোকে ধূলায় লুণ্ঠিত।
চাঁদের অজস্র হাসি বেশ জানি মোর প্রতি আজ উদাসীন,
উদয়াচলের আরক্তিম বাণী ত্যজি মোরে গিয়াছে যে থামি,
পৃথিবীর প্রীতি-মায়া চিনিতে যে পারিল না—বুঝি ভাগ্যহীন!
গ্লানিগ্রস্ত পরাজয়ে দিন যায় চলে যায় তবু আছি আমি।
আয়ুর তরণী বেয়ে রৌদ্র ঝড়ে ভীড় ভাঙি' আমার বিবাগী
জীবনের সামুদ্রিক মোহনায় চলিয়াছে সর্পিল্ গতিতে,
বহু জীবনের বহু গান, বহু সাধ, ব্যাকুলতা ব্যর্থতায় জাগি'
ব-দ্বীপ রচেছে যেথা হতাশ্বাস, বিফলতা, ব্যথার পলিতে।
দুর্ভগ বন্দরে সেই একদিন পঁহুছিবে বিবাগী আমারো;
সত্য ও সুন্দরে তা'র অসহায় ভীরু দ্বিধা বিবশ বিমুখ,
সঞ্চিত যে আমি শিবে ও সুন্দরে বঞ্চিত কি হ'য়ে র'ব আরো?
পরিণতি কী যে হ'বে এই ভেবে আক্ষেপেতে ভ'রে ওঠে বুক।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অভিনয়-প্রণালী

শ্রীঅমূল্য নাগ-চৌধুরী, নাট্যভূষণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য মহাকবি নটগুরু গিরিশচন্দ্র মহামুনি ব্যাস রচিত মহাভারত ও কবিগুরু বাল্মীকি রচিত রামায়ণ অবলম্বনে যে সকল উচ্চাঙ্গের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক (যেমন, পাণ্ডবগৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, লক্ষ্মণবর্জ্জন, তপোবল, জনা, বিল্বমঙ্গল. সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, সীতার বনবাস, রাবণ বধ, দক্ষযজ্ঞ, চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, বুদ্ধদেব, বিষাদ, পূর্ণচন্দ্র, কালাপাহাড় ও শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি) লিখিয়া নাট্যজগতে অমর হইয়াছেন. দুঃখের বিষয় এগুলি আর এখন অভিনীত হয় না। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সব দিক দিয়া যেরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে এমন আর পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তখনকার দিনে গিরিশচন্দ্রের এই সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়া অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রেরণা জাগিত। আমার পরিচিত কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক বিল্বমঙ্গলের অভিনয় দেখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে আমার নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে উহা গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করিয়া ও অভিনয় দেখিয়া। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণবস্তু। এদেশে সর্বজনপ্রিয় নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের এই ধর্ম্মভাব বিদেশীর তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয় নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ষ্টার থিয়েটারে গিরিশ-রচিত চৈতন্যলীলা অভিনয় দেখিতে আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে পদাশ্রয় দিয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী পরমহংসদেব গিরিশের অন্তরের সকল সন্দেহ মোচন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন. "গিরিশের পাঁচসিকা পাঁচআনা বিশ্বাস, উহা আঁকড়ে পাওয়া যায় না।" 'চৈতন্যলীলা'-অভিনয়ের পর হইতেই জনসাধারণ গিরিশ বাবুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে 'নিমাইসন্ন্যাস', 'বুদ্ধদেব' ও 'বিল্বমঙ্গলের' অভিনয় দর্শনে গিরিশের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়। 'নিমাইসন্ন্যাস' অভিনয় দর্শনে পরমহংসদেব গিরিশ বাবুকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেব' অভিনয় দর্শনে, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু বাহাদুরের জীব-হিংসায় এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে তিনি সেই বৎসর হইতে তাঁহার বাটীতে পূজায় বলি বন্ধ করিয়াছিলেন। 'বিল্বমঙ্গল'-পাঠে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।"

রঙ্গালয় সভ্যসমাজের অঙ্গ বিশেষ। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন একটি না থাকিলে মানব দেহ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি জাতীয় রঙ্গালয়ের অভাবে বিরাট সমাজশরীরও অসম্পূর্ণ থাকে। আহার যেরূপ স্থূল দেহের পুষ্টিসাধন করে, কাব্য ও নাটক সেইরূপ মনের পুষ্টিসাধন করে। এইজন্য বঙ্গসমাজ গিরিশচন্দ্রের নিকট অপরিসীমরূপে ঋণী। কেবল জাতীয় নাট্যশালা সংস্থাপন নয়, আদর্শ অভিনয় ও দৃশ্যোপযোগী উচ্চাঙ্গের কাব্য-রচনা—এই তিনটী গুরুতর কার্য্যর একটী

মাত্র সুসিদ্ধ করিতে পারিলে, মানুষ অমর যশোলাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কার্য্য-মাত্রেরই শুভাশুভ উভয়বিধ ফল অবশ্যম্ভাবী এবং যাঁহারা অভিনব কার্য্যের পথপ্রদর্শক তাঁহাদের জীবনে নিন্দাস্তুতি উভয়ই অপরিহার্য্য। তাঁহাদের জীবনে বরং পুরস্কার অপেক্ষা তিরস্কারের, যশ অপেক্ষা নিন্দার, মিত্রতা অপেক্ষা শত্রুতার, সুধা অপেক্ষা বিষের ভাগই বেশী লাভ হয়। কিন্তু এরূপ অলৌকিক প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের কার্য্য যেমন অসাধারণ, কার্য্যপ্রণালীও তেমনি অলোক-সামান্য! গিরিশচন্দ্র একদিন কাতর হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—

"লোকে কয় অভিনয়, কভু নিন্দনীয় নয়,
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।
পরের বেদনা হায়, পরে কি বুঝিবে তায়,
হায়রে ব্যথার ব্যথী আছে কোন জন?"

গত বৎসর শ্রীরঙ্গম্‌ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্মরণার্থ যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার তদানীন্তন প্রদেশপাল চক্রবর্ত্তী রাজা-গোপাল আচারিয়া সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালাদেশের চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সকল স্বত্বাধিকারীদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া-ছিলেন যাহাতে তাঁহাদের উদ্যোগে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি অভিনীত হয় এবং বাঙ্গালার গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি আরও বলেন, "এখন যে সকল নাটক বাঙ্গালাদেশে অভিনীত হইতেছে সেগুলি দেখিয়া সমাজের সর্বপ্রকার অধঃপতনই সূচিত হইতেছে। রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের স্বত্বাধিকারি-গণ যদি ধর্ম্মমূলক, ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটকগুলি অভিনয়ের চেষ্টা করেন তাহা হইলে বাঙ্গালার সমাজ এই শোচনীয় অধঃপতন হইতে কতকটা রক্ষা পায়। শুনিয়াছি আগেকার স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, ধর্ম্ম-মূলক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলি অভিনয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।"

এখনকার অভিনেতারা সুর-বর্জ্জিত আবৃত্তি করেন কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাটক-গুলি বিনা সুরে অভিনয় করা যায় না, কারণ তাঁহার নাটকগুলি পদ্যে লিখিত। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের শিষ্য মহেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, দানীবাবু প্রভৃতি অভিনেতৃগণের অভিনয় এত হৃদয়গ্রাহী হইত যে উহা চিরদিনের জন্য মনে অঙ্কিত থাকিত। সুর শব্দ-ব্রহ্ম; সুর শুনিলে সকলের চেয়ে হিংস্র জীব সর্পও মুগ্ধ হইয়া শোনে। তবে বাচন-ভঙ্গি, সংযত গম্ভীর কণ্ঠস্বর দরকার। ইহা চরিত্র পরিস্ফুটনের সর্ব্বোত্তম অস্ত্র। যে অভিনেতার এই অস্ত্র নাই, তাহার পক্ষে অভিনেতৃ-জীবনের সর্ব্বোচ্চ গৌরবের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। শুধু বাচনের জন্য অভিনেতার থাকা চাই বেগবান সংযত কণ্ঠ ও সেই কণ্ঠের মধুর ধ্বনি। লোকে কথায় বলে, অমুক লোকের থিয়েটারী ঢং বেশ আছে কিন্তু গলা নাই। সত্যই থিয়েটারী গলা নাই বলিয়া যে কত প্রতিভাবান্‌ শিল্পীকে অকালে অভিনয়ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, প্রকৃত অভিনেতার উপযুক্ত গলা কচিৎ দু একজনের কণ্ঠেই শোনা যায়। আর দুর্লভ বলিয়া লোকে বলে উহা ঈশ্বরের দান। বেগবান্‌, গম্ভীর অথচ সংযত ধ্বনি-প্রধান কণ্ঠের আবৃত্তি যখন কড়ি কোমল পর্দ্দায় ঘা দিয়া আমাদের দুটী কর্ণে মধু বর্ষণ করিতে থাকে, তখন স্বভাবতঃই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করিতে হইলে বেগবান্‌, গম্ভীর অথচ সংযত কণ্ঠ ও

সেই কণ্ঠের মধুর ধ্বনি প্রয়োজন। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে অনুশীলনের দ্বারা অভিনেতারা সেই কণ্ঠৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারেন। অবশ্য ইহার জন্য রীতিমত শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। ক্লাসিক্ থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ৺মহেন্দ্রলাল বসু 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ বৃহন্নলার ভূমিকা অভিনয় করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পুত্র দানী বাবুকে স্বয়ং ঐ ভূমিকা শিক্ষা দিতেছিলেন। রিহারশ্যালে আমি উপস্থিত ছিলাম। দানী বাবু বলিলেন, "বাবা, আজ তিন চারিদিন হইল সামান্য একটু অংশের আবৃত্তি অভ্যাস করিতেছি, তবু আপনি বলিতেছেন ঠিক হইতেছে না।" গিরিশ বাবু উত্তরে বলিলেন, "আমি যেভাবে আবৃত্তি করিতেছি ঠিক সেই ভাবে আবৃত্তি কর, তাহা হইলে উহার সহিত অর্থ, ধ্বনির গভীরতা, গতি. ছন্দ এবং বর্ণ সবই ঠিক হইয়া যাইবে।" এখনকার অভিনেতারা যে যাহার ইচ্ছামত একটা Type লইয়া অভিনয় করেন; ইহা শিখিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য গিরিশ-চন্দ্রের কোন নাটকে এই Type-acting চলে না, কারণ গিরিশ নাট্যকার ও অভিনেতা দুই-ই ছিলেন, ইহারই জন্য তিনি অভিনেতার সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিতেন। এই আবৃত্তির ধারা তাঁহার নিজস্ব ছিল। ইহা লিখিয়া ঠিক বুঝান যায় না, আবৃত্তি করিয়া বুঝান যায়। আমি কয়েক বৎসর এই আবৃত্তির ধারা গিরিশ বাবু ও দানী বাবুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলাম। ইহা খুব হৃদয়গ্রাহী। এখনকার অভিনেতারা অধিকাংশই Cinema artist, Stage artist খুব কম। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে সেক্সপীরিয়ান অভিনেতারা প্রায়ই কলিকাতায় অভিনয় করিতে আসিতেন। Sir Major Warwick, Charles Vane, Allenwilkis, Matheson Lang প্রভৃতির অভিনয় আমি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি ইঁহারা সকলেই গিরিশ বাবুর আবৃত্তির ধারা অনুযায়ী অভিনয় করিতেন। মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন "Drama is the highest literature—" নাটক অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। সেক্সপীয়ার Dramatist কবি, এইজন্য তিনি সমগ্র পাশ্চাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। গিরিশচন্দ্রের মত জগতে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ও ধর্মপরায়ণ কবি আর কেহই নাই। আর ইনিও একজন dramatist কবি।

কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশ-চন্দ্রের ধর্ম্মমূলক পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণের মনে ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও নীতির আদর্শ উদ্দীপিত করিলে সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

"বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত। ... ... জন্ম মৃত্যু এসব ভেল্কীর মত। এই আছে এই নাই।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সাধক একনাথ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রে ধর্মজাগরণের মূলে রহিয়াছে মুসলমান-আক্রমণ। নামদেব একনাথ তুকারাম প্রভৃতি সাধকগণ উদারনীতির ব্রহ্মাস্ত্রে বলীয়ান হইয়া পতনোন্মুখ হিন্দুসংস্কৃতি রক্ষা করেন। এই মহাপুরুষগণ মারাঠাজাতির মধ্যে এক নূতন জাতীয় ভাব জাগাইয়া তোলেন। মারাঠাগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের সংগে এই সাধক-প্রবরগণের মৈত্রী ও শান্তির বাণী সাধারণে প্রচারিত হইতে থাকে। এই জাতীয়তাবোধ মহারাষ্ট্র সমাজ-জীবনে ঐক্য ও সংহতির বীজ বপন করিয়া নবজীবনের সূত্রপাত করে। এই মহাপুরুষদের সাধন-ভজন আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। স্বীয় মুক্তির পথ—অমৃতের আস্বাদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া মানব-কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া ইঁহারা ধন্য হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান একটি প্রাচীন নগর। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা পৈঠন নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। পৈঠন মহারাষ্ট্রের বারাণসী। বৈষ্ণব-গণের নিকট ইহা অতি পবিত্র তীর্থভূমি। কিন্তু পৈঠন শুধু তীর্থক্ষেত্র নহে, দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠও বটে। বহু নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেখানে বাস করেন। বিদ্যার্থি-গণ শাস্ত্রানুশীলন-মানসে সেখানে আগমন করিয়া থাকেন। পরম বৈষ্ণব ভানুদাস এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের তুলুব বংশীয় রাজা কৃষ্ণরায়ের সমসাময়িক। এই বিদ্যোৎসাহী দানশীল ও ধর্মপরায়ণ রাজা খৃষ্টীয় ১৫০৯ হইতে ১৫২৯ অব্দ পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেন। ভানুদাস পন্ধরপুরের বিঠুবা-দেবের উপাসক ছিলেন। কথিত আছে রাজা কৃষ্ণরায় দেব তীর্থদর্শন মানসে পন্ধরপুর উপনীত হন। সেখানে তিনি বিঠুবাদেবের অপরূপ সুষমামণ্ডিত শ্রী দর্শনে মোহিত হন। অবশেষে তিনি মূর্তিটি স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান। ইহাতে বিঠুবামন্দিরস্থ ভক্তবৃন্দ ও তত্রত্য অধিবাসিগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। কিন্তু ভক্তপ্রবর ভানুদাস কৃষ্ণরায় দেবের অনুসরণ করিয়া বিজয়নগর গমন করেন। গভীর রাত্রির অন্ধকারের আশ্রয়ে তিনি রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেখানে বিঠুবাদেবের বিগ্রহ রহিয়াছে—সেখানে উপনীত হইলেন। দুই বাহুদ্বারা মূর্তিটি বেষ্টন করিয়া তিনি অবিরলধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। একনিষ্ঠ ভক্তের আকুল আবেদনে ভগবানের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিঠুবাদেব নিজের কণ্ঠদেশ হইতে হীরকহার খুলিয়া ভক্তের হস্তে প্রদান করিয়া আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ভানুদাসের সহিত পুনরায় পন্ধরপুর গমন করিবেন। পরদিবস বিগ্রহের হীরকহার ভানুদাসের নিকট দেখিতে পাইয়া রাজাধিরাজ ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাঁহার ফাঁসির আদেশ প্রদান করিলেন। ভগবানের লীলা অপূর্ব! ফাঁসির মঞ্চে ভানুদাসকে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে ফাঁসির মঞ্চ একটি বৃক্ষে পরিণত

হইল। মহারাজ এই বৈষ্ণব চূড়ামণির অধ্যাত্ম মহিমা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। উপরন্তু তিনি ভানুদাসকে বিঠ্‌ঠবাদেবের মূর্তিসহ স্বদেশগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। এহেন বৈষ্ণবকুলতিলক ভানুদাস সাধক একনাথের প্রপিতামহ ছিলেন। একনাথের পিতার নাম সূর্যনারায়ণ। একনাথ স্বামীর জন্ম-তারিখ সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টীয় ১৫২৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অত্যল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই পরলোক গমন করেন। পিতামহ চক্রপাণি ও তদীয় সহধর্মিণী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। পিতামহ ও পিতামহীর যত্নে তিনি মাতৃপিতৃহীন হইয়াও পরমসুখে দিন যাপন করেন। সাধারণ বালোচিত খেলাধূলায় তিনি মোটেই আকৃষ্ট হইতেন না। তিনি গোদাবরী-তীরে গমন করিয়া সেখানে নানাবর্ণের প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ঐ গুলিকে শিবজ্ঞানে পূজা করিতেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। একনাথের সান্নিধ্য সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করিত। তিনি অসাধারণ মেধাবী এবং অধ্যয়নশীল ছিলেন। ছয় বছর বয়সে তাঁহার উপনয়ন হয়। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেদান্তশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও সময় সময় তাঁহার দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই। তিনি সন্দেহের নিরসন-মানসে নিকটস্থ শিবমন্দিরে গিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। অবশেষে একদিন তিনি সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া দেবগিরি দুর্গের প্রধান কর্মচারী এবং প্রসিদ্ধ সাধু জনার্দন স্বামীর নিকট গমন করেন।

জনার্দন স্বামীর জীবনে গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত সন্ন্যাস-ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ১৫০৪ অব্দে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জনার্দন স্বামীর জন্ম হয়। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ বাহমনীরাজগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জনার্দন স্বামী একাধারে হিসাবনবীশ যোদ্ধা ও বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন। এই সমস্ত চরিত্রের পটভূমিকায় তাঁহার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিকতার আলো চির দেদীপ্যমান ছিল। সেই সময় মালিক আহমদের দরবারে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্রের পূর্ণ রাজত্ব চলিতেছিল। জনার্দন স্বামী স্বীয় প্রতিভা এবং চরিত্রবলে সেখানে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। কথিত আছে—তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীদত্তাত্রেয়ের উপাসনা উপলক্ষে দৌলতাবাদের সমস্ত রাজকার্য বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকিত। জনার্দন স্বামীর গৃহের দ্বার অতিথি-অভ্যাগতের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। একনাথ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নগ্নপদে শ্রান্তদেহে জনার্দন স্বামীর নিকট উপনীত হইলেন। তিনি একনাথকে দেখিবামাত্র অতি পরিচিতের ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। একনাথ স্বীয় পরিচয় এবং সেখানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলে জনার্দন স্বামী সানন্দে তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন।

সাধক একনাথ একাগ্রচিত্তে বাক্-মনঃ-কায় ও কর্মদ্বারা গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। স্বামী তাঁহাকে নির্জনে তপস্যার জন্য মাঝে মাঝে নিকটবর্তী পাহাড়ে প্রেরণ করিতেন। অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্বামি-শিষ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধে তত্ত্বালোচনা হইত। ইহাতে একনাথ কিছুমাত্র ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেন না। এ সময় তাঁহার হৃদয়ে এক অব্যক্ত মোহন ভাবের সঞ্চার হইত। তিনি দুর্গের নিভৃতকোণে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

কথিত আছে—যখন তিনি ভগবচ্চিন্তায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, সেই সময় একটি সর্প আসিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে কুণ্ডলী পাকাইত। সর্পটি প্রথমতঃ তাঁহাকে দংশন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সাধকের পবিত্র অঙ্গের সংস্পর্শে তাহার কুটিল স্বভাব দূরীভূত হইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক মহিমার প্রভাবে সর্পটি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। অধিকন্তু সর্পটি সাধকের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া স্বীয় ফণাবিস্তারে সূর্যকিরণ প্রতিহত করিত। গভীর ধ্যানমগ্ন একনাথ ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইতেন না, কারণ তাঁহার সংজ্ঞালাভের পূর্বেই সর্পটি চলিয়া যাইত। একদিন একটি রাখাল বালক একনাথের গলদেশে সর্পটিকে তদবস্থায় দেখিয়া ভয়ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠে। ইহাতে তাঁহার ধ্যান ভাঙিয়া যায়। অহিংসার পূজারী একনাথ সর্পটিকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া যাইতে দেন। তিনি সর্বজীবের মধ্যে 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা' ও 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' বলিয়া জানিতেন। তিনি সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বস্তুতেই ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন।

জনার্দন স্বামীর প্রতি একনাথের কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন এক বৃহস্পতিবার গুরুদেব তদীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীদত্তাত্রেয়ের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল—প্রবল শত্রুসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দুর্গমধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। কিন্তু দুর্গরক্ষক জনার্দন স্বামী তখন গভীর ধ্যানমগ্ন। মন্দির দ্বারে প্রভুভক্ত শিষ্য একনাথ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি ক্ষণকালের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। নায়কবিহীন সৈন্যদল শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে পরাজয় সুনিশ্চিত। অথচ তিনি গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া পাতকী হইতে পারেন না। মুহূর্ত-মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করিলেন। তিনি গুরুদেবের বর্ম ও পোষাক পরিধান করিয়া যোদ্ধৃবেশে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে জনার্দন স্বামী মনে করিয়া 'হর হর মহাদেও' নাদে বিপুলবেগে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে দুর্দমনীয় বেগ শত্রুপক্ষ প্রতিহত করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কল্পিত জনার্দন জয়ধ্বনি ও বিপুল সম্বর্ধনার ভিতর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় জনার্দন স্বামী ধ্যানান্তে আসন ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত শিষ্য!

ভগবানের সান্নিধ্যলাভের উপযুক্ত অস্ত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে একদা জনার্দন স্বামী একনাথকে একটি নির্জন প্রদেশে লইয়া গেলেন। একনাথ গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার হৃদয় অপূর্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইল। স্থানটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপরূপ। সেখানে একটি শিবালয় অবস্থিত। মন্দিরটিকে বেষ্টন করিয়া বৃক্ষরাজি বিরাজমান। তপোবনের অপরূপ গাম্ভীর্য সর্বত্র বিরাজিত। জনার্দন স্বামী একনাথকে বলিলেন—'বৎস, কিছুকাল এখানে অবস্থান কর। স্মরণ রেখ, আজ তোমার জীবনের সাধন-সোপানের শেষ মার্গ। প্রভু শ্রীদত্তাত্রেয় ছদ্মবেশে তোমাকে ছলনা করতে চেষ্টা করবেন। তাতে তুমি কিছুমাত্র ভয় পেও না।' মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে শ্রীদত্তাত্রেয় সেখানে উপনীত হইলেন। ফকিরের সাথে একটি কুকুরী। কুকুরীর অদ্ভুত এবং ভীষণ মূর্তি দর্শনে প্রথমতঃ একনাথ ভীতসন্ত্রস্ত

হইয়া পড়িলেন কিন্তু পর মুহূর্তে গুরুদেবের উপদেশ স্মরণ পূর্বক নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। ফকিরবেশী শ্রীদত্তাত্রেয় এবং জনার্দন স্বামীর মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হইল। অবশেষে স্বামীর নির্দেশক্রমে তিনি কুকুরী দোহন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান একনাথ! ভগবান শ্রীদত্তাত্রেয় স্বীয় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া একনাথকে দর্শন দিলেন। কুকুরী আর কেহই নহে—দেবমাতা কামধেনু। শ্রীদত্তাত্রেয় একনাথকে আশীর্বাদ-পূর্বক ভাগবত পুরাণের একাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখিতে অনুশাসন দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর স্বামিশিষ্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা পঞ্চবটী উপস্থিত হন। ইহা নাসিক শহরের নিকটে অবস্থিত। তথা হইতে তাঁহারা ত্র্যম্বকেশ্বর উপনীত হইলেন। এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাধকগণের নিকট ইহা অতি পবিত্র স্থান। কিংবদন্তী আছে ইহা মনুষ্যনির্মিত নহে। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর জনার্দন স্বামী একদিন একনাথকে বলিলেন—'বৎস, এখান হতে আমি বিদায় নিচ্ছি। তুমি যেখানেই থাক না কেন—আমার আশীর্বাদ তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সংগে তোমার সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু সাবধান কোথাও তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করবে না।' অতঃপর স্বামী শিষ্যের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। একনাথ দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং দেবদেউলগুলি পরিদর্শন করিয়া পৈঠনে গমন করিলেন। তীর্থপর্যটনকালে একনাথ গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মুসলমান আক্রমণের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী তাঁহাকে সবিশেষ ব্যথিত করিয়া তুলে। তাই মহারাষ্ট্রের মুক্তিযজ্ঞের যাজ্ঞিক হোতা মারাঠাজাতিকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং সংঘবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। কম্বুকণ্ঠে সমগ্র মারাঠাজাতিকে অশিবের বিরুদ্ধে তিনি আহ্বান করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাই। মারাঠাজাতিকে তিনি আত্মদর্শনের ভিতর দিয়া শক্তির বীভৎসতাকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেন। কারণ—

"..........যে নপুংস কোনো দিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়; আপনার
মনুষ্যত্ব, বিধিদত্ত নিত্য অধিকার
যে নির্লজ্জ ভয়ে লোভে করে অস্বীকার
সভামাঝে; দুর্গতির করে অহংকার,
দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়,
অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়;
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তার
রাজকারা-বাহিরেতে নিত্য কারাগার।"

একনাথ স্বীয় বাসভূমে প্রত্যাবর্তন করিয়া জনার্দন স্বামীর নির্দেশক্রমে রাজুবাঈ নামে কোন এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল পঞ্চবিংশতিবর্ষ। এই সময় হইতে তিনি মারাঠী ভাষায় কতিপয় পুস্তক এবং কবিতা রচনা করেন। তাঁহার ভাগবত পুরাণের ভাষ্য 'চতুঃশ-শ্লোকী ভাগবত' মারাঠী সাহিত্যে এক অমর অবদান। বেদান্ত-শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। একনাথের রচনা-শৈলী সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর ছিল। তিনি কবি-যশঃ কামনা করেন নাই। তাঁহার সরলতা এবং নম্রতাগুণে সকলে মুগ্ধ ছিল। বেদান্তশাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

কিন্তু তিনি আত্মম্ভরি ছিলেন না। তিনি প্রত্যহ পুরাণ পাঠ করিতেন। আপামর জনসাধারণ সকলেই তাঁহার নিকট সমভাবে সমাদৃত হইত। তৎকালে অব্রাহ্মণের নিকট শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু একনাথ উক্ত বিধি-নিষেধ মোটেই মানিয়া চলিতেন না। কারণ তিনি সমস্ত সত্তা দিয়া মানবতার আদর্শকে পূজা করিতেন। মানবমাত্রই সেই অমৃতের সন্তান। সুতরাং ভগবানের জগতে সকলেই মুক্ত। এই মুক্তির অধিকার হইতে মানুষকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। মুষ্টিমেয় তথাকথিত কতকগুলি লোক দেশের অধিকাংশ লোককে নীচ অধম অন্ত্যজ অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে—তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবী স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে সভ্যতা ও ধর্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। একনাথ স্বামী বুঝিয়াছিলেন. জাতি বলিতে দেশের সকল শ্রেণীর লোককেই বুঝায়। দেশের অধিকাংশ লোককে যদি পদদলিত অবজ্ঞাত করিয়া রাখা হয়, তবে জাতীয় সমুন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সামাজিক অসাম্যের অবসানও স্বাধীনতার একটি প্রধান অংগ। নরের মাঝেই তিনি নারায়ণকে দেখিয়াছেন। একনাথের ভগবৎ-প্রেম মানবীয় প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছে। তিনি সমস্ত নর-নারীকে মুক্তি-পথের সহজ উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"কলিযুগে হরিনাম স্মরণ-মনন করাই মুক্তির একমাত্র সহজ উপায়। জন্মদ্বারা কাহারও মুক্তি নির্ধারিত হইতে পারে না, কর্মদ্বারাই ইহা নিরূপিত হইয়া থাকে। ভক্তিভাবে হরিনামগুণগান করিলেই স্বর্গলাভ ঘটিতে পারে। বেদ শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র; বেদজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই ঈশ্বরের স্বরূপ চিনিতে পারে। কিন্তু ইহার গণ্ডী সীমাবদ্ধ। শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ ইহার অধিকারী। কিন্তু হরিনাম কীর্ত্তনে সকলেই সমান অধিকারী। তথাকথিত হিন্দুসমাজের 'হরিজন'গণও হরিনাম সংকীর্তনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে—কিছুমাত্র যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। একবার হরিনামামৃত পান করিলে পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি কিছুমাত্র স্পৃহা থাকিতে পারে না। ইহাতে যোগাভ্যাসের কঠোরতার প্রয়োজন হয় না।" একনাথ স্বামী এই মধুর হরিনাম-মাহাত্ম্য খোল-করতাল-মৃদঙ্গের সাহায্যে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অতি সুমধুর। তাঁহার মধুময় স্বরে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য নরনারী সংকীর্তনে যোগদান করিত। 'ভাগবত ধর্ম' প্রচার করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 'ভাগবত পুরাণে'র একাদশ অধ্যায়—যাহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট উপদেশ-ছলে প্রচার করেন, সাধারণতঃ 'ভাগবত ধর্ম' নামে পরিচিত। একনাথ স্বামী বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রচারিত 'প্রস্থানত্রয়ে'র (ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও গীতা) পরিবর্তে তিনি ভক্তিমার্গের প্রাধান্য সাধারণ্যে প্রচার করেন। সমাধির পথ অতি কঠোর। তাঁহার মতে একমাত্র জ্ঞানবৃদ্ধের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু অচলা ভক্তির সাহায্যে যে কেহ ভগবানের করুণালাভে সমর্থ হইতে পারে। কায়মনো-বাক্যে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিলে তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন। বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল ক্রিয়াকলাপ দার্শনিকের জন্য। উহা অশিক্ষিত জনগণের জন্য নহে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ ও ব্যাকুলতার সহায়ে আত্মদর্শনের পথই তাহাদের

পক্ষে শ্রেয়। হিন্দুধর্মের বাহ্য আড়ম্বরের বিরুদ্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। একমাত্র ভক্তিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক ক্ষেত্রে একনাথের দান বিস্ময়কর। একজাতি একপ্রাণ একতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সমস্ত মারাঠাজাতিকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করেন। মারাঠাগণ উচ্চনীচ ভেদ ভুলিয়া অভীঃ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ঐহিক ও পারমার্থিক উন্নতির পথে তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। তিনি জীবমাত্রকেই শিবজ্ঞানে পূজা করিতেন। তিনি বলেন—'সত্যিকারের ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পায়। একমাত্র অন্ধকারেই আলোকের প্রয়োজন হয়; কিন্তু জ্ঞানসূর্য হৃদয়ে উদিত হইলে বেদরূপ আলোকের আর প্রয়োজন হয় না। সত্যদ্রষ্টার নিকট পেরিয়া ও ব্রাহ্মণে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত বিরাটের স্বরূপ তাঁহার নিকট অনুভূত হইয়া থাকে। সাম্যবাদের ভিতর দিয়া মানুষ পরমার্থের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে।'

সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টের মধ্যেও একনাথ অচল অটল থাকিতেন। তিনি জানিতেন, জীবনযাত্রা-পথে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াই শ্রেয়কে লাভ করিতে হয়। অভীষ্ট-লাভের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, তাই তো কবিরা বলিয়াছেন—দুর্গং পথস্তৎ। সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইলে পরিণামে অমৃতের আস্বাদ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়। তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনীতে এই সত্যের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। একবার একনাথ স্বামী গোদাবরী নদীতে স্নান সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এমন সময় একজন বিধর্মী তাঁহার শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে। এই বিধর্মীকে তিনি চিনিতেন না বা জীবনে তাহার কোন অনিষ্ট-সাধনও কখন করেন নাই। বোধ হয় তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়াই সে ঐ কুকার্য করিয়াছিল। একনাথ তাহার এই কার্যের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে পুনরায় স্নান করিয়া গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে লোকটি আবার তাঁহার শরীরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। এই ব্যাপার একশ আটবার ঘটিল। কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় একনাথ তাহার এই দুর্ব্যবহার সহ্য করিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণে বিধর্মীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সাধক-প্রবরের চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একনাথ তাহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দান করিয়া প্রস্থান করেন। তাঁহার এই মহত্ত্বই ধর্ম এবং সমাজ-জীবনে তথাকথিত গোঁড়াদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দেয়। তিনি সমাজের সমস্ত গ্লানি দূর করিয়া মহারাষ্ট্রের ভাবধারায় নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিতে সমর্থ হন।

মারাঠী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া একনাথ স্বামী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। সংস্কৃত দেবভাষা সত্য, কিন্তু সর্বসাধারণের পক্ষে উহা বোধগম্য নহে। উহা শুধু পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং মারাঠী ভাষার মাধ্যমে আর্যধর্মের সারমর্ম সাধারণ্যে প্রচার করা অতি সহজ। তাই তিনি ভক্ত-গণের অনুরোধে 'ভাগবত পুরাণের' একাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য মারাঠী ভাষায় রচনা করেন। পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার রচনাকে প্রথমে আমল দেন নাই। তাঁহারা একনাথকে প্রথমতঃ

ভীতি-প্রদর্শনে সত্যভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু সত্যের পূজারী একনাথ কর্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। ফলে তাঁহারা একনাথকে হত্যা করিবার জন্য সশস্ত্র তিনশত লোক নিযুক্ত করিলেন। এই দলে অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও ছিলেন। কিন্তু কার্যকালে বিপরীত ফল ফলিল। এই সময় একনাথ পুণ্যতীর্থ বারাণসী-ধামে এক মহতী সভায় সমবেত জনতা এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে স্বরচিত ভাষ্য পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং রচনার অন্তর্নিহিত মাধুর্য আক্রমণ-কারীদের মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাহারা প্রস্তর-মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। পণ্ডিতগণ তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠতা পরীক্ষার জন্য তদীয় ভাষ্য গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে সকলে দেখিল, স্বয়ং গঙ্গাদেবী একনাথের পাণ্ডুলিপি রক্ষা করিতে-ছেন। দেবভাষা সংস্কৃতের সহিত মারাঠী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। পণ্ডিতগণ তাঁহার ভাষ্য একটি হস্তি-পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রাসহ সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। তিনি পণ্ডিতগণের একান্ত অনুরোধে কাশীধামে প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত করেন এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে 'ভাগবত পুরাণের' টীকা লেখেন। অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ 'রুক্মিণীর স্বয়ম্বর' নামক কবিতা এই সময় তিনি রচনা করেন। এক হাজার সাত শত পয়ার ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

একনাথের সান্নিধ্যে পণ্ডিতগণের সর্বপ্রকার অহমিকা অন্তর হইতে দূরীভূত হয়। তাঁহারা বুঝিতে পারেন সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপাকণা লাভে পুঁথিগত বিদ্যা অকিঞ্চিৎকর। একমাত্র ভক্তিমার্গই প্রশস্ত। পার্থিব যশোলিপ্সার মোহে অন্ধ হইয়া তাঁহারা শুধু আলেয়ার পানে ধাবিত হইয়াছেন। অনুশোচনায় তাঁহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সত্যদ্রষ্টা একনাথের নিকট তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল্ সত্যই বলিয়াছেন—"To abandon this struggle for private happiness, to expel all eagerness of temporary desire, to burn with a passion for eternal things,—this is Emancipation and this is the Free Man's Worship."

একনাথের পুত্র হরি পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। মারাঠী ভাষায় ভাষ্য রচনা করায় তিনি পিতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার মতে ইহা দ্বারা একনাথ বেদান্তের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন। পিতাপুত্রে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়; কিন্তু একনাথ পুত্রকে কিছুতেই স্বীয় উদ্দেশ্য বুঝাইতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে হরি বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করেন। একনাথ তাঁহার ভ্রম অপনোদনের জন্য কাশীধাম হইতে পুত্রকে গৃহে লইয়া আসেন এবং তাঁহাকে বেদান্তপ্রচারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত বক্তৃতা সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় অল্পসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। একনাথের বাণী সরল মারাঠী ভাষায় রচিত হওয়ায় সহস্র সহস্র লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ব্যাপারে হরি পণ্ডিত স্বীয় ভ্রম এবং পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। একনাথ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে একটি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি রচনাটি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ অব্দে এই মহাপুরুষ সমগ্র মহারাষ্ট্রের নরনারীকে কাঁদাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। কথিত আছে—মহাপ্রস্থানের দিবস ভক্তবৃন্দ

পরিবৃত হইয়া তিনি সংকীর্তন গাহিতে গাহিতে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীতে গমন করেন। সেদিন ছিল ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষ। ভজন গানে সমস্তদিক মুখরিত হইয়া উঠে। ভজনান্তে একনাথ পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরী সলিলে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন।

একনাথ স্বামী যে সময় আবির্ভূত হন তখন বাহমণীরাজ্য অবনতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। এই বিশাল সাম্রাজ্য বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি পাঁচটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একনাথ মহারাষ্ট্রের জীবনে ধর্মবোধের সহিত স্বাদেশিকতার বীজও বপন করেন। মারাঠাগণ ক্লৈব্যবর্জিত এক অসাধারণ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। একনাথ আজ নাই—কিন্তু বিঠবাদেবের নামের সহিত তাঁহার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। সমগ্র মারাঠাজাতি বিঠবাদেবের চরণে একনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে তাহাদের হৃদয়-নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতে প্রতি বৎসর দুই বার করিয়া পন্ধরপুরে সমবেত হইয়া থাকে। একনাথ স্বামী মারাঠাজাতির মধ্যে 'এক জাতি একপ্রাণ ও একতার' যে আদর্শ স্থাপন করেন তাহা রামদাস স্বামীর নেতৃত্বে শিবাজীকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণতা লাভ করে। স্বদেশের জন্য ছত্রপতি শিবাজীর প্রাণোৎসর্গকে লক্ষ্য করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"হে রাজ তপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির-যুগ যুগান্তর তরে
ভারতের ধন।"

মানবতার পূজা বিস্মৃত হইয়া মানুষ আজ হিংসায় উন্মত্ত। নানা মতবাদের সংঘর্ষে ধরিত্রী প্রপীড়িতা। অমৃতের পুত্রেরা আজ মৃত্যুক্ষুধায় ম্রিয়মাণ। হে মধ্যযুগের সাধক—আবিরাবির্ম এধি! হে জ্যোতির্ময়ের পূজারী 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র বারতা নিয়া আমাদের মাঝে আবার তোমার 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়' হউক।

আলো ও আঁধার

শ্রীভোলানাথ দাস

অন্ধকারের গোপন তলে মুখ লুকালো সোনার রবি,
নদীর কূলে, তরুর মূলে কল্পলোকের মোহন ছবি।
শেষ আলোক মধুর শোভা বিলিয়ে দিয়ে গগন গায়ে,
মিলিয়ে দিয়ে সবটুকু তার, আত্মগোপন আঁধার ছায়ে।
ক্ষণেক আগেও যাহার শোভা দেখেছিলাম মেঘের গায়,
চক্ষু আমার আঁধার করি' এখন গেল কোথায় হায়।

স্বরের শক্তি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ

স্বরে যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তাহা শাস্ত্রসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে উল্লিখিত আছে—

'ব্যাপিনীর্ব্যোমরূপাঃ স্যুরনন্তাঃ
স্বরশক্তয়ঃ।' (১।২৬)

অর্থাৎ স্বরের শক্তি অনন্ত এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ঐ শক্তি কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ স্বরের বিচার না করিয়া সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় স্বরের দিক হইতে আলোচনা করা যাইতেছে। বৈদিক শাস্ত্রসমূহে স্বরশব্দের প্রয়োগ মুখ্যতঃ সঙ্গীতস্বর সম্বন্ধেই করা হইয়াছে।

সঙ্গীতসম্বন্ধীয় স্বরে সাধারণ স্বর অপেক্ষা অধিকতর শক্তি বিদ্যমান। মানবের উপর সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়। মানবেতর প্রাণিগণের উপরও সঙ্গীতের প্রভাব যথেষ্ট। সঙ্গীতে যিনি বিশেষজ্ঞ ও মধুরকণ্ঠ, তিনি ইচ্ছামত শ্রোতৃবর্গকে কাঁদাইতে, হাসাইতে, বিদ্বেষ ভাবে উত্তেজিত করিতে অথবা তাহাদের অন্তরে শান্তি উৎপাদন করিতে পারেন। ইহার কারণ, তিনি সকলের মন সহজেই আপন বশে আনিতে সমর্থ হন।

সঙ্গীতে দ্বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করে—এক, মানবের আন্তরিক শক্তি, অন্য, স্বরের শক্তি। স্বর আন্তরিক শক্তিকে বাহিরে নিঃসারণ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং এই উপায় এতই শক্তিমান্ যে, আন্তরিক শক্তিকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বাহিরে নিঃসারণ করে। যাঁহার স্বর অতি মধুর ও শক্তিসম্পন্ন, তিনি তাঁহার ভাবকে তত বেশী শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে স্বরের প্রবল শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। উহা মানবের প্রচ্ছন্ন তথা গুহানিহিত দিব্যশক্তিসমূহকে বাহিরে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য রাখে। সামবেদকেই স্বর বা সঙ্গীতের আদিস্রোত গণ্য করা হইয়াছে। বেদসমূহে সামবেদের পৃথক সত্তা এই স্বরের কারণেই হইয়াছে। 'বেদানাং সাম-বেদোঽস্মি'—গীতার এই বাক্যদ্বারা সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র সঙ্গীতের দরুনই ঋগ্বেদ হইতে সামবেদের পার্থক্য। ঋক্ ও সঙ্গীত উভয় যাহাতে আছে, তাহাই সামবেদ। জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণে (১।৬।১। ৮-১০) উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বর ব্যতীত মন্ত্রকে সামবেদীয় বলা যায় না। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—'সা চ অমশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্' (১।৩।২২)—অর্থাৎ ঋক্ ও স্বরের মিলনেই সামের সামত্ব বুঝিতে হইবে। এইজন্য কেবল মন্ত্রসমূহকে সাম বলা যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৌতমীয় তন্ত্রমতে স্বরের অনন্ত শক্তি। কিন্তু এস্থলে স্বরের কেবলমাত্র দ্বিবিধ শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) স্বরের এক শক্তির দ্বারা নানাবিধ রোগ ও কষ্ট দূর করিতে পারা যায়।

(২) স্বরের দ্বারা অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি তথা অন্যান্য দিব্য শক্তিসমূহ বর্দ্ধিত করা যায়।

স্বরের যে রোগ নিবারক শক্তি আছে,

তাহা বৈদিক শাস্ত্রসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে রোগের উৎপত্তির কারণ বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন ধাতুর বৈষম্য। এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্যের মুখ্য কারণ—মনের অশান্ততা, ক্ষুব্ধতাদি। যে সব মানবের মন চিন্তা, শোক, কাম ও ক্রোধাদির আবেগবশতঃ অশান্ত ও ক্ষুব্ধ থাকে, তাহাদের মনে এই বৈষম্য শীঘ্র উপস্থিত হয় এবং তাহারা সহজেই রোগাদি-দ্বারা আক্রান্ত হয়। সঙ্গীত মানুষের মনকে শান্ত করে। সঙ্গীতের সময় কামক্রোধাদির আবেগ শান্ত থাকে এবং মনও শান্ত হয়। মনের শান্তিতে বাতপিত্তাদির বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং তাহাদের মধ্যে সাম্যাবস্থা আসিয়া থাকে। এই সাম্যাবস্থার ফলে রোগাদি শান্ত হয় এবং মনুষ্য নীরোগ ও স্বস্থ হয়। নিরন্তর স্বর-সাধনা করিতে থাকিলে চিররোগী মানবও স্বতঃই নীরোগ ও স্বস্থ হইতে পারে। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন ঋষিগণ রোগ দূর করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সামের উল্লেখ করিয়াছেন। আজকাল পাশ্চাত্য জগতেও রোগ দূর করিবার জন্য সঙ্গীতের নানা ভাবের ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং আমাদেরও উচিত বিভিন্ন রোগের উপর বিভিন্ন প্রকার সামের প্রয়োগ-পূর্ব্বক প্রাচীন পদ্ধতির উদ্ধার সাধনে অবহিত হওয়া।

এক্ষণে আলোচ্য, স্বরদ্বারা শক্তিবৃদ্ধি ও দিব্যশক্তি লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? এতদ্বিষয়ক আলোচনার পূর্ব্বে শক্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। হৃদয়ই মস্তিষ্কের ভাণ্ডার এবং হৃদয় হইতেই শরীরের সর্ব্বত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই শরীর অসংখ্য জীবাণুর মিলন দ্বারা গঠিত। এই জীবাণুসমূহের কেন্দ্রেও শক্তি আছে এবং ঐ কেন্দ্র হইতে জীবাণুসমূহে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই প্রকারে সৌরমণ্ডলে সূর্য্য এক কেন্দ্রগত শক্তি। সব গ্রহ উপগ্রহ এই সূর্য্য হইতে শক্তি পাইয়া থাকে। বনস্পতি-জগতে ওষধি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণশক্তি-সম্পন্ন তত্ত্বের কেন্দ্রেও শক্তি রহিয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শক্তি সর্ব্বদা কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তথা হইতে চারিদিকে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ঐ শক্তি যখন কেন্দ্র হইতে প্রসৃত হয়, তখন উহা অবশ্যই ক্ষীণ হইতে থাকে। এইজন্য বিচার্য্য এই যে, ঐ কেন্দ্রগত শক্তি-ভাণ্ডারকে কি প্রকারে বর্দ্ধিত ও পূর্ণ রাখা যায়? প্রাকৃতিক জগতে এই ক্ষীণতা বা হ্রাসকে দূর করিবার জন্য ভগবান ঐ শক্তির যাওয়া আসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরীরে রক্তসংস্থান, শ্বাসসংস্থান প্রভৃতির দ্বারা শক্তির যাওয়া আসা চলে। রক্তাদি শরীরের সর্ব্বত্র চলাচলের জন্য শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকিলেও ঐ ক্ষীণ শক্তি পুনরায় কেন্দ্রে ফিরিয়া আসিলে বলসঞ্চয় করে। সূর্য্য যে শক্তি পৃথিব্যাদিকে দান করে, উহা পুনরায় ফিরাইয়া আনে। এই নিমিত্ত জল, ওষধি ও বনস্পত্যাদির রস শুকাইয়া যায়। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। কিন্তু যে মানব নিজ প্রাণিক, মানসিক ও আত্মিক শক্তিকে কেবল বাহিরের দিকেই সঞ্চালিত করে এবং কখনও মনোরূপী কেন্দ্রগত শক্তির দিকে প্রত্যাহার করিবার অভ্যাস না করে, তাহার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণই হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন মানব রোগ ও পাপাদি অসুরের সহিত যুঝিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করে, তাহার যে কেবল পাপ রোগাদি দূরীভূত হয় তাহা নহে, অধিকন্তু সে আরও অনেক আন্তরিক দিব্যশক্তি বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হয়। অতএব শক্তিলাভের জন্য উহাকে কেবল

বাহিরের দিকে চালিত না করিয়া ভিতরে কেন্দ্রিত করা মানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে, শক্তি-প্রাপ্তির জন্য একাগ্রতা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে যত আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা একাগ্রতার ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। এই একাগ্র ভাব মানুষ এতদূর বর্দ্ধিত করিতে পারে যে, তাহার শরীরের ভান পর্য্যন্ত থাকে না এবং সে সমাধিতে মগ্ন হইতে পারে। এই অবস্থা লাভের জন্য যত প্রকার সাধনার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে স্বর-সাধনা বিশিষ্ট। মনকে একাগ্র বা লীন করিতে স্বর যে এক মহাশক্তি, তাহা উপনিষদেও স্বীকৃত হইয়াছে। ত্রিপুরতাপিন্যুপনিষদে বলা হইয়াছে—যোগী স্বরের দ্বারা আপন চিত্তকে সম্যক্‌রূপে লীন করিবে ('স্বরেণ সল্লয়েৎ যোগী'—৫।৭)। 'ব্রহ্মবিন্দু'-উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—স্বরদ্বারা যোগের সন্ধান করিবে ('স্বরেণ সন্ধয়েদ্ যোগম্')। এই সব বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তের লয়বিষয়ে স্বর এক বড় সাধনা। যখন স্বরের দ্বারা মানবের চিত্ত এক বস্তুতে বা শরীরের কোনও এক অংশে কেন্দ্রিত হয়, তখন তাহার চিত্ত অনেকগুণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া সেই বস্তু বা শরীরাংশের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। মনের এই কেন্দ্রীয়করণ ব্যাপারে স্বর এক মহদুপায় এবং শক্তি-বৃদ্ধি ও দিব্যশক্তির লাভ-বিষয়েও উহা এক মহৎ সাধন। বেদসমূহেও স্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। 'সকলের অন্তরে বিরাজমান হে ভগবন্! স্বীয় উত্থানকারী মানব হৃদয়-গুহা হইতে বাহিরে আসিবার জন্য তোমার প্রতি ভক্তিরস সিঞ্চন করিতে গিয়া স্বরের প্রয়োগ করিয়া থাকে' (ঋগ্ ৮।৩৩।২)। এই মন্ত্র হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হৃদয়-গুহা হইতে আত্মাকে বহিঃপ্রকাশিত করিবার জন্য বেদমন্ত্রে স্বরপ্রয়োগের বিধান আছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার জন্য তথা ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য স্বর যে মহৎ সাধন, বেদেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্বর এতদূর প্রভাব বিস্তার করে যে, মনোরূপী বিদ্যুৎপুঞ্জ হইতে যে সব কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, তাহাদিগকে স্বর ঘনীভূত করে এবং যে লক্ষ্যে এই সব কিরণ নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় উহাদিগকে কেন্দ্রিত করে এবং তৎফলে মানসিক কিরণের আঘাতকেও অতিশয় তীব্র করিয়া তোলে। যে ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্যও ভগবানের ধ্যান করিতে পারে না, সেও স্বরের সাহায্যে অধিক সময় ধ্যানস্থ হইতে পারে। এই প্রকারে শরীরের যে কোনও স্থানে ধ্যান করা হউক না কেন, তথায় যদি সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে স্বর উচ্চারিত হয়, তবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান করা যায়, এবং তাহা ঠিক ঠিক হয়। এই ভাবে বাসনারূপী বলাসুরের উপর মনোরূপী বিদ্যুতের আঘাত স্বরের সাহায্যে তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তোলা যায়। বাসনা পরাজিত হইলে আত্মিক দিব্যশক্তি-সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এতৎপ্রসঙ্গে মন্ত্রের শক্তির কথাও প্রণিধান-যোগ্য। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে মন্ত্রের শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। স্বরের দিক হইতে বিচার করিলে ঋচা বা মন্ত্র অস্থিমাত্র—অস্থি বা ঋক্ (শতপথব্রাহ্মণ, ৭।৫।২।২৫)। মন্ত্রে বা ঋচাতে বিশেষ শক্তি নাই। উহাতে স্বরসংযোগ করিলে অর্থাৎ স্বরের সহিত উহা গীত হইলে, উহাতে শক্তি বা প্রাণ আসে—'প্রাণো বৈ স্বরঃ'। স্বর ব্যতীত ঋচা বা মন্ত্র সম্বন্ধে জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণের এক প্রকরণে বলা হইয়াছে—"দেবতা-গণ মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বর-শূন্য ঋচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মৃত্যু প্রবিষ্ট দেবতাদিগকে দেখিয়া মণির মধ্যে

স্তেত্রের ন্যায় মনে করিলেন। মৃত্যুর এই ভাব বুঝিয়া দেবতারা ঋচা হইতে বাহির হইয়া স্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বরে প্রবিষ্ট দেবতাগণকে মৃত্যু জানিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বরের মধ্যে যে ঘোষ বা শব্দ আছে, তদনুরূপ শব্দ করিয়া মৃত্যু দেবতাগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর দেবতারা 'ওঁ' এই অক্ষরে সমারূঢ় হইলেন। তথায় মৃত্যু দেবতাদিগের কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। এই 'ওঁ'-ই ত্রয়ী বিদ্যা। এই ওঁ রূপী অমৃতকে প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

উপর্য্যুক্ত প্রকরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বর ভিন্ন ঋচায় বা মন্ত্রে এমন শক্তি নাই, যাহাতে মৃত্যুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমরত্ব লাভ করা যায়। এইজন্য মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য দেবতারা স্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বরের প্রাধান্যই প্রমাণিত হয়। এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, স্বরগান অর্থাৎ তান-আলাপাদি যুক্ত স্বর যদি এত শক্তি-প্রদামকারীই হয়, তবে সংগীতজ্ঞগণ কেন বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হন না? এতৎ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, স্বর-সাধনার দিক হইতে সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সঙ্গীত-কলাকে অভ্যাস করেন না। যে মানবের মনে এইরূপ সংকল্পাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে যে, স্বরকে মনের একাগ্রতা-কল্পে সাধন স্বরূপে গ্রহণ করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যিনি নিরন্তর প্রযত্ন করেন, তাঁহাকে স্বরও এতদ্বিষয়ে সাহায্য করে। দেখাও যায়, অনেকেই কোন বিশেষ বিষয় চিন্তা করিবার সময় গুন্‌গুন্ শব্দ করিতে থাকে। এই গুন্‌গুন্ শব্দ কেন করা হয়? ইহার কারণ, ঐ সময় মনুষ্য নিজমনের বৃত্তিসমূহকে একাগ্র করিয়া পূর্ণভাবে উক্ত বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করিতে চাহে। এই গুন্‌গুনানি উক্ত বিষয়ের দিকে মনকে পূর্ণভাবে একাগ্র করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু গুন্‌গুনানি তখনই সহায়ক হয় যখন মনে এই ভাব উৎপন্ন হয় যে অমুক বিষয় চিন্তা করিতে হইবে এবং মনও ঐ বিষয়ের চিন্তায় লাগে। এই প্রকারে, মন্ত্রে গান, তান, আলাপাদি তখনই সহায়ক হয়, যখন প্রথম হইতে মনে এই প্রকার সংকল্পাগ্নি প্রজ্জলিত হয়, যে অমুক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতেই হইবে। সেই অভীষ্টসিদ্ধির দিকে অগ্রসর মনকে স্বরাদি সাহায্য করে। এইজন্য মন্ত্র, গান, ওঁ, আদির দ্বারা ততক্ষণ পূর্ণসাফল্য লাভ করা যায় না, যতক্ষণ হৃদয়ের তার উহাদের সহিত সংযুক্ত না হয়—যতক্ষণ হৃদয়াগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া না উঠে।

স্বরগান সম্বন্ধে মনে রাখা উচিত, মুখ বন্ধ করিয়া যে স্বর নির্গত করা হয় তাহার মহত্ব অধিক। মুখ বন্ধ করিয়া স্বর বাহির করিলে শক্তি ভিতরেই থাকিয়া যায় এবং মুখ খুলিয়া স্বরগানে শক্তি বাহিরে চলিয়া যায়। এই প্রকার উক্তি শতপথব্রাহ্মণের ১১।৪।২।১০-১১ প্রকরণদ্বয়ে পাওয়া যায়। ঐ প্রকরণদ্বয়ের ভাবার্থ এই যে, স্বরের দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা বাহিরেও যাইতে পারে, ভিতরেও থাকিতে পারে। দেখাও যায়, সঙ্গীতজ্ঞ ও বক্তৃতাকারিগণ গান গাওয়ার পর এবং বক্তৃতা দিবার পর আপনাদিগকে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত বলিয়া অনুভব করেন; কেন না, গান গাইতে বা বক্তৃতাদি দিতে গিয়া তাঁহারা শক্তির অপচয় করেন, তাঁহাদের শক্তি বাহিরে নির্গত হইয়া যায়। এই শক্তিকে ভিতরে নিবদ্ধ করিতে হইলে তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনা মুখ বন্ধ করিয়া স্বরের নিঃসারণ ও হৃদয়ে ধ্যান। স্বর-শক্তি ভিতরে নিবদ্ধ হইলে, তাহার সাহায্যে দিব্যশক্তি লাভ করা যায় এবং দেহস্থ মলিনতা ও রোগাদি সহজে দূরীভূত করা যায়। যেমন বক্তৃতাদি দ্বারা অন্যের মনকে নানাভাবে উত্তেজিত বা দ্রবীভূত করা যায়, তেমনি সঙ্গীতেরও তদনুরূপ শক্তি আছে। মনের উপর এই সব ক্রিয়া স্বরের প্রভাবেই হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে স্বর আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে, এবং মলিনতা ও রোগাদি বিনাশ করে। এইজন্য যোগশিখোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যটি সতত স্মরণ রাখা উচিত—

'সদা নাদানুসন্ধানাৎ সংক্ষীণা বাসনা ভবেৎ' (৬।৭)।

অনাথ শিশুদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব

গর্ডন কলার

আগামী দশ বছরের মধ্যে বৃটেনের ছেলেমেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য যে কোন ইউরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক উন্নত হবে—বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই উক্তি যদি কোন দিন সত্য হয় তা হলে তার কৃতিত্বের ভাগী হবে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমিতিগুলি, কারণ তাদের উপরই দেশের শিশুকল্যাণ-ব্যবস্থার সমস্ত ভার রয়েছে।

বিশিষ্ট ফরাসী জীববিৎ প্রোফেসর হেনরী বনেট্ সম্প্রতি এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। ইনি ফ্রেঞ্চ য়্যাকাডেমী অব্ মেডিসিনের একজন সদস্য এবং ফ্রেঞ্চ রেড-ক্রসের ডাইরেক্টর। প্রোফেসর বনেট সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিশু-মঙ্গল ভাণ্ডারের (International Children's Emergency Fund) পক্ষ থেকে ১২-টি বিভিন্ন দেশের শিশু-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৃটেন পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই সময় তিনি ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত হাজার হাজার ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ থেকে সমগ্র ভাবে বৃটেনের ছেলেমেয়েদের তৎকালীন অবস্থা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন। তা ছাড়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুস্বাস্থ্যের 'ন্যুফিল্ড প্রোফেসর' অধ্যাপক য়্যালান মনক্রিফের সঙ্গেও তিনি শিশুকল্যাণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা-পরিষদ

বিগত ৫ই জুলাই 'চিল্ড্রেন য়্যাক্ট্' অনুসারে শিশুকল্যাণ-ব্যবস্থার জন্য যে উপদেষ্টা-পরিষদ গঠিত হয়েছে প্রোফেসর মনক্রিফ তার চেয়ারম্যান। পরিষদের কাজই হল বৃটেনের দুঃস্থ অনাথ শিশুদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত এই আইনটিকে সর্বতোভাবে কার্যকর করা এবং সেই সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টকে সময় মত উপদেশ দেওয়া। আইন অনুযায়ী বৃটেনের সর্বত্র স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষরা শিশু-কল্যাণ সমিতি স্থাপন করে তাদের উপর সমস্ত শিশুদের, বিশেষ করে যারা গৃহহীন বা গৃহ থেকে নানা কারণে অপসারিত তাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তাদের প্রতিপালন করার ভার অর্পণ করেছেন।

উপদেষ্টা-পরিষদের পরিচালনভার শিশু-কল্যাণ সমিতিগুলির মতই জন-সাধারণের হাতে থাকবে। পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি লণ্ডন এবং অন্যান্য দেশের শিশু-হাসপাতালে শিশু-মঙ্গল ব্যবস্থায় যুক্ত থেকে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন, তিনি ছাড়া এতে আরও চার জন পুরুষ এবং সাত জন নারী সদস্য থাকবেন। এঁদের সকলেরই জীবনের ব্রত এক। এঁরা সবাই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যথা—ডাঃ বার্নাডোর অনাথ আশ্রম, শিশু ক্লেশ নিবারণ সমিতি, সংশোধনালয়, শিশুদের বিচারালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে এসেছেন। গত মার্চ মাসে স্কটল্যাণ্ডেও এই ধরনের বঞ্চিত হতভাগা

শিশুদের জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিশু কল্যাণ সমিতি স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবন

আইনের নির্দেশ-মত বৃটেনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা অনেকেই ইতোমধ্যে 'চিলড্রেন অফিসার' নিযুক্ত করে তাদের উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে সব শিশুরা প্রধানতঃ অনাথ এবং যাদের পিতামাতা লালন-পালনে অক্ষম বা অনুপযুক্ত তাদের যথাসম্ভব স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবনের আনন্দ দান করাই এই আইনের উদ্দেশ্য।

কি ভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র ও শক্তির পূর্ণ বিকাশ হতে পারে এবং তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে—আইনে সে কথাও চিন্তা করা হয়েছে। ইংরাজরা বিশ্বাস করে যে পরিবারই সমাজের প্রাণশক্তি, সেইজন্য এইসব গৃহহারা অনাথ ছেলেমেয়েদের যথা-সম্ভব স্থানীয় পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে মানুষ করার চেষ্টা হচ্ছে। যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম বা বৃটেনের বিভিন্ন স্থানের পরিবারের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় তাদের গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে তাদের মধ্যে রেখে প্রতিপালন করা হবে। এইসব ছেলে-মেয়েরা যেন সামান্য জিনিসের জন্য কোন দিন কোন অভাব না বুঝতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে কারণ তা অনেক সময় সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের মনের উপর গভীর ভাবে আঘাত করে—সকলের মত একটা ব্লেজার কোট বা বই-এর থলি না পাওয়ার দুঃখ তাদের কাছে অনেক খানি।

গত জুন মাসের শেষে কমন্স সভায় যখন এই আইন পাশ হয় তখন পার্লিয়ামেন্টের স্বতন্ত্র সভ্য, বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধি মিঃ কে লিণ্ডসে এই সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেন তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মন্তব্য করেন যে এর পর দেশের কাজ হবে যে সব ছেলে-মেয়ে নিজগৃহে পিতামাতার আশ্রয়ে থেকেও অসুখী এবং অবহেলিত তাদের সুখী করা।

পরিবারের মধ্যে শিশুর জীবন

লণ্ডনের 'টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় পত্রমারফত শিশু-ক্লেশ-নিবারণ সমিতির চেয়ারম্যান জানান যে সমিতির ৪০,০০০ সভ্য প্রতি বৎসর ৪০,০০০ পরিবারভুক্ত ১,০০,০০০ শিশু যারা আইনের আওতায় পড়ে না তাদের নানাভাবে সাহায্য করছেন। আইনের সাহায্যে যদিও ১,২৫,০০০ অনাথ শিশুর জন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে তবু এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে যে-সব ছেলেমেয়ে পিতামাতার আশ্রয়ে থেকেও নানা কারণে কেবল অবহেলা বা অসদ্ব্যবহার পেয়ে এসেছে তাদের জন্য আইনে কোন ব্যবস্থা নেই। এই সব ছেলে-মেয়েদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এতদিন বৃটেনের বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু সম্প্রতি জন-মঙ্গল সমিতির নারী বিভাগ বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তাব করেছেন যে শিশুদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও সমস্ত দায়িত্ব থাকা উচিত স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর।

বৃটেনের কোন কোন জায়গায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ ইতোমধ্যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। নরউইচ্‌ সিটি কাউন্সিলের 'স্বাস্থ্যসমিতি' একটি উপ-সমিতি গঠন করে এবং একজন নারী উপদেষ্টার সাহায্যে গত পাঁচ বছর ধরে এই দিকে কাজ করে আসছেন। নারী

উপদেষ্টার কর্তব্য হল দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে এবং রোগভোগে যে সংসার ভেঙ্গে পড়েছে তাকে পুনরায় গড়ে তুলবার জন্য পিতামাতার মধ্যে আশার সঞ্চার করা। সে জন্য তাঁকে দেখতে হবে কি ভাবে তাদের সাংসারিক অসচ্ছলতা দূর করা সম্ভব এবং কি ভাবে গৃহের ও ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে পারিবারিক প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনা যায়। এই ভাবে তাদের দুর্দিনের বন্ধু হয়ে তাদের সকল দিক দিয়ে রক্ষা করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হবে।

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সিটি কাউন্সিল এই সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করবার পরিকল্পনা করেছেন। আর একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করার প্রস্তাব ইতোমধ্যে সেখানে হয়েছে। এই উপদেষ্টার কাজ হবে যে সব পরিবারে আপাততঃ জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি অথচ ভবিষ্যৎ আশানুরূপ নয়, তাদের সময়মত পরিদর্শন করা এবং পরিবারস্থ ছেলেমেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া। অবশ্য স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষগণ, এমন কি নরউইচ কাউন্সিল, এই সব ক্ষেত্রে অবাধ কাজ করবার পূর্ণ অধিকার লাভের জন্য পার্লিয়ামেন্টের অনুমোদন প্রার্থনা করেছেন। তাই আজ বৃটেনে শিশু-কল্যাণ আইনকে ব্যাপকতর করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

স্বেচ্ছা সমিতি

ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা এলাকাবিশেষে যে সব স্বেচ্ছা সমিতি এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করেছে তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; এই ধরনের সংগঠনগুলির মধ্যে 'ফ্যামিলী সার্ভিস ইউনিটস্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শহরে শহরে, যেমন ম্যানচেষ্টার এবং লিভারপুলে, সমিতি গঠন করে প্রত্যেক শহরের প্রায় ৯০টি পরিবারের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রেখেছে।

লণ্ডনেও সম্প্রতি এই ধরনের একটি 'ইউনিট' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে স্বেচ্ছাসেবকরা এখনই গভর্নমেন্টের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য তৎপর হয়েছে। কিন্তু তা যাই হোক যে হতভাগ্য দুঃস্থ ছেলে-মেয়েরা আজ গৃহহীন অনাথ তাদের উন্নতিই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কাম্য। সেইজন্য নবগঠিত শিশুকল্যাণ আইনকে বাস্তবরূপ দান করার জন্য সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতে হবে। *

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। —উঃ সঃ

সমালোচনা

সামবেদী সন্ধ্যা-বন্দনা—ডাক্তার রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোল্ড মেডালিষ্ট প্রণীত এবং কলিকাতা কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেনস্থ শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কর্তৃক প্রকাশিত। ১০১ পৃষ্ঠা; দাম এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বিদ্যারত্ন মন্দির (পুস্তক বিভাগ), ৬নং দর্জীপাড়া বাই লেন, বিডন রো, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

গ্রন্থকার সামবেদী সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রগুলি বাঙলা ভাষায় এবং পদ্যে অনুবাদ করেছেন। মন্ত্রগুলির সঠিক ভাব বজায় রেখে পদ্যে প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তিনি ইহা অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে আমরা হিন্দু বাঙ্গালীর জীবনে, চরিত্রে যে সব দুর্বলতা ও অধঃপতন লক্ষ্য করছি, তার একটি বিশেষ কারণ বোধ হয় সন্ধ্যাবন্দনায় অনাস্থা, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে নিষ্ঠার একান্ত অভাব এবং ধর্ম-জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তায় উপেক্ষা। সন্ধ্যা-বন্দনা বা ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক যে ব্রাহ্মণদের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম ছিল, না করে জলটুকুও গ্রহণ করতেন না—স্কুল-কলেজে-পড়া তাঁদের বংশধরেরা এখন সে পাট উঠিয়ে দিয়েছেন বল্লে অত্যুক্তি হয় না; এবং সেজন্য তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকেও কোন শাসন বা তাগিদ তাঁরা পান না। এমন অবস্থায় গ্রন্থকার এমন একখানি বই সমাজে উপস্থিত করায় তাঁকে আমরা অভিনন্দিত করি। গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' গ্রন্থকার বহু বিশেষ তথ্যের সন্নিবেশ করে গ্রন্থখানির মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তিনি মুদ্রণ-রাক্ষসের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। যে সব মন্ত্র ও বিষয়বস্তু তিনি পাঠকদের জন্য পরিবেশন করেছেন তাতে একটি ভুল থাকাও অনুচিত. কিন্তু এই ১০১ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে ৭৩টি ভুলের ৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি শুদ্ধি-পত্র সংযোজিত হয়েছে। তবুও আমরা চাই গ্রন্থখানি সবারই গৃহে প্রবেশ করুক।

'ল্যালেগ্রো ও এল্ পেন্সারসো'—(মূল সমেত বাংলা ছন্দানুবাদ) ডাঃ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডি-এইচ্-এস্ সি, এ-এম্-ডি, কবিতোপাধ্যায়, জ্যোতিষ-শাস্ত্রী কর্তৃক রচিত এবং শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসেবী কর্তৃক 'বিদ্যারত্ন মন্দির' ৬নং দর্জীপাড়া বাই লেন, বিডন রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বিষয়-নির্ঘণ্ট-সহ মোট ৪৪ পৃষ্ঠা; দাম আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের ঠিকানায় এবং নৃত্যলাল শীল লাইব্রেরী ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি মিল্টনের 'ল্যালেগ্রো ও এল্ পেন্সারসো' বিশ্বে সুবিদিত। রচয়িতা ইহাকে মূল সমেত বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ প্রশংসনীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাঝে মাঝে কবিতা দু'টিকে আই-এ কোর্সের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত করেন। কিন্তু বইখানিতে বহু ভুল রয়েছে। মনে হয় ছাপায় ভুল থাকা না থাকা সম্বন্ধে রচয়িতা সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি, যে শুদ্ধিপত্র দিয়েছেন তাতেও ভুল রয়েছে।

ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের রামকৃষ্ণ, ছোটদের গান্ধিজী—(মহামানুষ রচনামালার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই)। বিশ্বভারতীর বাংলা-সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-এ কর্তৃক লিখিত এবং কলিকাতা সাত-সি গোখেল রোডস্থ 'প্রকাশনা'র পক্ষ হতে প্রকাশিত ও ২৭।৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীটের শক্তিপ্রেসে শ্রীঅজিতকুমার বসু কর্তৃক মুদ্রিত। বই তিনখানির পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪৮, ৪৮ ও ৮৮ এবং দাম দশ আনা, দশ আনা ও এক টাকা দুই আনা।

কানন বাবুর লেখা 'মহামানুষ রচনা-মালার' এই তিনখানি বই পড়ে আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করেছি—আনন্দে মন ভরে উঠেছে। ছোটদের মনের গ্রহণযোগ্য ক'রে, তাদের মন থেকে যাতে ভবিষ্যতেও তার ছাপ ম্লান হবে না—এমনি ভাবে, ভাষায় রূপ ও ভাব দিয়ে মহামানুষদের জীবনকে তাদের কাছে ধরা কম বাহাদুরী নয়। লেখকের লেখার ভঙ্গী এমনই সহজ সরল ও মনমাতানো যে একখানা বই পড়তে আরম্ভ করেই তার ভেতর তলিয়ে যেতে হয় এবং শেষ না করে ওঠা বুড়োদের পক্ষেও সম্ভব হয় না। বইগুলোর কাগজ, ছবি, ছাপা ও বাঁধাই সবই বেশ পরিপাটি। আমরা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে, স্কুলে, লাইব্রেরীতে এই বইগুলি দেখতে চাই।

স্বামীজীর স্বপ্ন ও নেতাজী—শ্রীহৃষীকেশ শীল কর্তৃক লিখিত এবং ২২।১ গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা হতে প্রকাশিত ও শ্রীভারতচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক ৮।৩-এ হাতিবাগন রোডস্থ ভারত প্রিন্টিং ও বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্‌এ মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন সাইজ, ৮৪ পৃষ্ঠা, দাম ১৲ টাকা।

লেখকের এই বইখানি পড়ে আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ধ্বংসোন্মুখ ভারতবর্ষকে গঠনমূলক সংস্কারের ভেতর দিয়ে গৌরবান্বিত মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সব আদর্শ বাণী প্রচার করেছেন তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার সুভাষ কিরূপে স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়ে ভারতের 'নেতাজী' হয়েছিলেন, লেখক তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তাধারার সাথে পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তিনি 'যুগস্রষ্টা বিবেকানন্দ', 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ', 'জাতিভেদ প্রথা ও বিবেকানন্দ,' 'খাদ্যবিচার ও বিবেকানন্দ,' 'নারীজাতি ও বিবেকানন্দ,' 'মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ,' 'খাঁটি ভারতীয় বিবেকানন্দ,' 'ধর্ম্মানুষ্ঠান, কুলগুরু ও বিবেকানন্দ,' 'সাহিত্যিক বিবেকানন্দ,' 'হিন্দু-মুসলিম সমস্যা ও বিবেকানন্দ', 'বিবেকানন্দ ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলন' প্রভৃতি বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। লেখা ও বর্ণনাভঙ্গী সহজ সাবলীল এবং চিত্তাকর্ষক। আশা করি বইখানি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন।

জ্যোতিরূপ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—পদ্যানুবাদক শ্রীঅসিত কুমার হালদার। প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ধর, ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১।এ টেগোর ক্যাশেল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৩২০+১৮০; মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার সমগ্র গীতা মূল সংস্কৃতসহ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। পদ্যানুবাদ মোটের উপর সুন্দর ও সরস হইয়াছে। শেষের দিকে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেওয়ায় পাঠকের পক্ষে অনুবাদ মিলাইয়া বুঝিতে সহজ হইবে। পড়িবার সময় অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি

ও প্রমাদ চোখে পড়িয়াছে; ধর্মগ্রন্থে ভুল-প্রমাদ না থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন যে গীতার 'জন্মান্তর-বাদে' তাঁহার খট্‌কা লাগে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে বর্ণিত 'সমরে বিনষ্ট হ'লে স্বর্গপ্রাপ্তি ও জয়লাভে পৃথিবীসম্ভোগ' তাঁহার মতে গীতার বিরুদ্ধ মত। হিন্দুধর্ম্ম জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাসী, আর জন্মান্তর-বাদ বিজ্ঞানসম্মত ও সূক্ষ্মবিচারসহ। গীতায় যে শুধু মোক্ষধর্ম্মই প্রচারিত হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গসাধনের কথা, নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের কথা সমভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে মোক্ষধর্মী নিবৃত্তিমার্গীর জন্য যেমন অহিংসার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আবার জাগতিক অভ্যুদয়কামীর জন্য 'অনার্যোচিত, অকীর্তিকর ক্লীবতা পরিত্যাগ করিয়া উঠ, জাগ; যুদ্ধে মরি যাবে স্বর্গে, জয়ে ভোগ করিবে ধরণী'—এই উপদেশও ভগবান দিয়াছেন। আর প্রকৃতপক্ষে, ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সুসমঞ্জস উজ্জীবনই ভারতীয় জীবনের আদর্শ। লেখকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ থাকিলেও গ্রন্থখানি সুলিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (দ্বিতীয় বর্ষ) ১৩৫৫ — সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৮৮।

এই বার্ষিক পত্রিকাখানি শিক্ষালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান বিদ্যার্থিগণের বিবিধ কবিতা ও রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ। ইহাতে ধর্ম, নীতি, সমালোচনা, জীবন-চরিত, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। কয়েক খানা মনোরম ছবিও পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। কাগজ ও ছাপা উত্তম। আমরা বালকগণের এই সাহিত্যিক উদ্যমের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

ঈশ্বরদর্শনম্ অথবা শ্রীতপোবন-চরিতম্ (দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ)—শ্রীস্বামী তপোবনম্ প্রণীত; পণ্ডিত বল্লভরাম শর্মা আয়ুর্বেদাচার্য কর্তৃক ভাবনগর হইতে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত; ৩৬২ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲ টাকা মাত্র।

শ্রীস্বামী তপোবনম্ দাক্ষিণাত্যের কেরল দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন—মহাপণ্ডিত। বাল্য-কাল হইতেই তাঁহার অধ্যাত্মজীবন-যাপনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণ-পূর্বক তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণ-কাহিনী যুগপৎ চমকপ্রদ এবং গভীর ভাবদ্যোতক। 'বিবিক্তসেবী' এই সন্ন্যাসি-প্রবর উত্তুঙ্গ গঙ্গোত্রী-প্রদেশে পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। আলোচ্যমান গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহা তাঁহার জীবনস্মৃতি, আত্মচরিত। গ্রন্থখানির সংস্কৃত সহজ, সুললিত এবং ভীতিপ্রদ দীর্ঘসন্ধি-সমাসবর্জিত। যাঁহারা বাণভট্টের বিসর্পিত সমাস-বাহুল্যে বিরক্তি বোধ করেন, তাঁহাদিগকে একটু ধৈর্য-সহকারে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভাবের গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভাষার সারল্য যেন ওতপ্রোত! বহুগ্রন্থ-প্রণেতা হৃষীকেশের স্বামী শিবানন্দজী শ্রীস্বামী তপোবনম্ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"He is verily Tapovanam, but not wild Vanam or jungle grown with rough

growth of dry austerity and cynical seclusion. He is rather an Upavanam full of fragrance of the flowering of Vedanta and filled with the fruits of his mature realisation. It is an Upavanam wherein countless bees in the form of seekers, sadhakas and sannyasins crowd to drink of the honey of true wisdom." লেখকের অনবদ্য প্রকাশভঙ্গীরও উদাহরণ দিতেছি—

"সত্যং ধ্যেয়ং ধ্যেয়মন্যন্ন নিত্যং
সত্যং বাচ্যং সর্বদান্যন্ন বাচ্যম্।
সত্যং কার্যং নিত্যমন্যন্ন কার্যং
ভূয়াদেবং সন্মনোবাগ্‌বিচেষ্টঃ ॥"

সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ইহা সুপ্রচারিত হইলে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ হইবে মনে করি। কয়েকখানি প্রশান্তিব্যঞ্জক চিত্রও গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে।

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী প্রণীত; গ্রন্থকার কর্তৃক কাশী গোবিন্দমঠ হইতে প্রকাশিত; ১৪৬ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা মাত্র।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার বিবিধ সদ্‌গ্রন্থের প্রণেতৃরূপে বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত। আলোচ্যমান গ্রন্থেও তাঁহার গভীর শাস্ত্রানুশীলন ও ধর্মভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি বেদান্তাচার্য শক্ত্যুপাসক ছিলেন। অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে শক্তিবাদের কোন প্রভেদ নাই—ইহা গ্রন্থকার উপপত্তিসহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। উপনিষৎ, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, গৌড়পাদকারিকা প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতির অগণিত প্রামাণিক উদ্ধৃতি-সাহায্যে তিনি ব্রহ্ম ও শক্তির ভেদাভাব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "সংশয়নিরসন, তত্ত্ববিচার সমস্তই আচার্যদিগের মতানুসারে কৃত, আমার কল্পনাপ্রসূত নহে"-রূপ উক্তি গ্রন্থকারের 'ভূতার্থব্যাহৃতি'-মাত্র নহে, পরন্তু অকপট বিনয়েরও পরিচায়ক। আচার্য-পরম্পরার মতের সুবিন্যাসহেতুও গ্রন্থকার আমাদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য। গ্রন্থখানি কেবলমাত্র দার্শনিকবিচারবহুল নহে, ইহার পরিশিষ্ট-প্রদত্ত 'প্রপঞ্চসার-প্রণেতা কে?'—এই ঐতিহাসিক প্রশ্নের সদুত্তরও জিজ্ঞাসু পাঠককে আনন্দ দান করিবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

Maharaja Cossimbazar Polytechnic Institute Magazine—Vol. 1, No. 1. Session 1949, Page 65.

এই সচিত্র পত্রিকাখানি মহারাজা কাসিমবাজার পলিটেকনিক্ ইনষ্টিটিউসন-এর ছাত্রগণ কর্তৃক পরিচালিত। ইহাতে তাহাদের লিখিত ইংরেজী ও বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা আছে। পত্রিকা-পরিচালনে তরুণ বিদ্যার্থীদের এই প্রথম প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বিদ্যুৎ (মাসিক পত্র)—সম্পাদক শ্রীসুনীলচন্দ্র সাহা। ১ম বর্ষ, ফাল্গুন সংখ্যা। সম্পাদক কর্তৃক ৫৩নং তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

বিদ্যুৎ সাহিত্যসংঘের মুখপত্ররূপে এই মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত। ইহাতে কয়েকটি সুলিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধ ও কবিতা আছে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উত্তর-ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটি—গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী সোসাইটি-হলে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) "যে সকল হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকার জন্য জীবন দান করিয়াছেন," (২) "মন, আত্মা ও শক্তি", (৩) "নিজকে বশীভূত রাখিবার উপায়", (৪) "স্বামী বিবেকানন্দ কখন স্যানফ্র্যানসিসকোতে ছিলেন?" (৫) "জন্ম ও মৃত্যুর পরপারের জীবন", (৬) "খৃষ্ট ও রামকৃষ্ণ"। উক্ত স্বামীজীর সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী "ঈশ্বর-ধারণা কি?" এবং "প্রেমে ঈশ্বরের সহিত মিলন" শীর্ষক বক্তৃতা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি শুক্রবার অধ্যক্ষ স্বামীজী বেদান্তের ক্লাস করিয়াছেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে বেদান্তের তত্ত্ব, উহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় ও ধ্যানাদি শিক্ষা দিয়াছেন।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে:—

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কাঁথি (মেদিনীপুর)—গত ১৮ই চৈত্র শুক্রবার হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, পাঠ, ছাত্রছাত্রীগণের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। আশ্রম এবং বিভিন্ন স্থানে নয়টি জনসভায় বক্তৃতা ও আলোচনা হইয়াছে।

বেলুড় মঠের স্বামী অসঙ্গানন্দজী, হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী অজয়ানন্দজীর সুললিত বক্তৃতা সর্বত্র বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। কাঁথির উপকণ্ঠস্থিত লাউদা, মির্জ্জাপুর ও দীঘা বিদ্যাভবনে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সমাগত বক্তাগণ, মেদিনীপুর আশ্রমের স্বামী বিশ্বদেবানন্দজী, কাঁথি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দজী এবং কাঁথি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনবিহারী ভট্টাচার্য বক্তৃতা দেন। নবাগত মহকুমা-শাসক মিঃ বি আর গুপ্ত দীঘার জনসভায় পৌরোহিত্য করেন। সুগায়ক শ্রীসুজনকুমার চক্রবর্ত্তীর সুমধুর সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল—এই আশ্রমে গত ৪ঠা বৈশাখ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব যথারীতি আড়ম্বরের সহিত প্রতিপালিত হয়। প্রাতে পূজা ও ভজন এবং অপরাহ্ণে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে পৌরোহিত্য করেন। রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুলের পুরস্কারবিতরণও এতৎসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু ছাত্র পাঠ, খেলাধুলা প্রভৃতিতে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। প্রারম্ভিক সঙ্গীত ও ছাত্রগণের কবিতা-আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের বহুল প্রচারের উপর জোর দেন এবং মিশনের বহুমুখী কার্যের প্রশংসা করেন। সভান্তে স্কুলের ছাত্রগণ সাফল্যের সহিত 'প্রতাপসিংহ' নামক নাটকের অভিনয় করে।

রামকৃষ্ণ মিশন, বরিশাল—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই চৈত্র শুক্রবার হইতে ১০ই চৈত্র রবিবার দিবসত্রয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস প্রাতে পূজা ও পাঠ এবং অপরাহ্নে স্বামী সুধানন্দজীর উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। উহাতে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী দেবানন্দজীর স্বাগত সম্ভাষণান্তে শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্-এ, বি-এল্, মৌলবী এম্, ইব্রাহিম, এম্-এ, বি-এল্ (ডিষ্ট্রিক্ট জজ) এবং বি এম্ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনবেদ, বিশেষ ভাবে সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিশেষে বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজীর ভাবোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ এবং সভাপতির নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতান্তে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় দিবস একটি মহিলাসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে পৌরোহিত্য করেন স্বামী বোধাত্মানন্দজী। সভার প্রারম্ভে স্বামী সুধানন্দজীর ভজনগান এবং কুমারীদের আবৃত্তি ও রামনাম সংকীর্তন সকলের আনন্দবর্ধন করে। কুমারী হেনা দাশগুপ্তা, বি-এ-র প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীযুক্তা মনোরমা গুহ, এম্-এ-র বক্তৃতার পরে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী এবং সভাপতি পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রীমার আধ্যাত্মিক দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিবস সমবেত নরনারীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে এক বিরাট জন-সমাবেশে স্বামী দেবানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। "নৌকাবিলাস" পালাকীর্তনান্তে অধিকরাত্রে উৎসব শেষ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চণ্ডীপুর (মেদিনীপুর)—এই আশ্রমে গত ১৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ইত্যাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী আলোচিত হয়।

গত ২৮শে চৈত্র সোমবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও তাঁহার বিভিন্ন ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কলিকাতা, বেলুড় মঠ, মেদিনীপুর, তমলুক ও কাঁথি আশ্রম হইতে সাধু-ভক্তমণ্ডলী শুভাগমন করেন। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে রাত্রি পর্যন্ত পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রাসহ নগর-কীর্তন বিদ্যার্থীদের ক্রীড়াকৌতুক-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আলোচনা, পারিতোষিক-বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হয়।

অপরাহ্নে আলোচনা-সভায় স্বামী অমেয়ানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী বিশ্বদেবানন্দজী ও হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। ২৯শে চৈত্র স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় গায়েন ও হাঁসচরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় বিদ্যার্থীদের জন্য প্রাতে এবং জনসাধারণের জন্য অপরাহ্নে সভার

আয়োজন করেন। দুইটি সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন এবং বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। ৩০শে চৈত্র আশ্রমে স্বামী মৈথিল্যানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি (মুর্শিদাবাদ)—গত ২৩শে চৈত্র এই আশ্রমে পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভজনাদি হয় এবং অপরাহ্নে এক জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অপূর্ব জীবন-কাহিনী ও সেবাব্রত-বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। বহু ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন। শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের স্বামী অটলানন্দজীর ভজন খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্যামলাতাল (হিমালয়) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ১৯৪৮ সালের কার্যবিবরণী—এই সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী কর্তৃক ১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। ইহা হিমালয়ের উচ্চ শিখরে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শান্ত গম্ভীর পরিবেশে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল যাবৎ এই অঞ্চলের দুঃস্থ ও রুগ্ন পাহাড়িদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আসিতেছে। আশ্রমের ৩০ মাইলের মধ্যে আর কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় এই সেবাশ্রমেই সকলে ছুটিয়া আসে। অনেকে ২।১ দিনের পথ হাঁটিয়াও উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিব্বত হইতে সমতল ভূমিতে ব্যবসা করিতে আসিবার সময় অরণ্য-পথে ও টনকপুরে যে সব ভুটিয়া এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোক অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহারাও এইখানে আসিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৭২৬৩ জন পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং শিশুকে চিকিৎসা ও সেবা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বহির্বিভাগে (Outdoor) ৭০৫৭ এবং অন্তর্বিভাগে (Indoor) ২০৬ জন ছিল। সেবাশ্রম স্থাপিত হওয়া অবধি এপর্যন্ত মোট ১,১৬,৮২৯ জন রোগীকে চিকিৎসা ও সেবা করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের পশু-চিকিৎসা বিভাগে আলোচ্য-মান বর্ষে ২৮০৫টি গরু, বাছুর, ষাঁড়, ঘোড়া, মেষ, মহিষ, ছাগল, কুকুর প্রভৃতির চিকিৎসা করা হয়। ইহার মধ্যে বহির্বিভাগে ছিল ২৭৯১টি এবং অন্তর্বিভাগে ১৪টি পশু। ১৯৩৯ সালে এই বিভাগ খোলা হওয়া অবধি এপর্যন্ত মোট ২৬,৫২০টি পশুকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে আশ্রমের আয় মোট ৪৫,৭৬৪৷৶১০ পাই এবং ব্যয় ৪১,৭৯৭৲ পাই। এ পর্যন্ত ৮৯৩৭।০ মূল্যের ঔষধ-পত্রাদি দান হিসাবে বিনামূল্যে পাওয়া গিয়াছে।

আশ্রমের অনেক অভাব অসুবিধা রহিয়াছে। অন্তর্বিভাগে আরোও অন্ততঃ ৪টি বেড, বাড়ী-ঘর বাড়ানো, অস্ত্রোপচার-গৃহের সংস্কার সাধন, নানা প্রকার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, সমস্ত প্রকার খরচপত্রাদি মিটাইবার জন্য সাধারণ এবং পশুচিকিৎসা-বিভাগের জন্য দুইটি স্থায়ী তহবিলের (Permanent Funds) একান্ত প্রয়োজন। আশ্রমের সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন গুলির প্রতি আমরা সহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা নাগরিকগণ কর্তৃক স্বামী নিখিলানন্দজীর অভ্যর্থনা—নিউইয়র্কস্থিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য গত ২রা বৈশাখ ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক বিরাট সভা হয়। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে মানপত্র দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। বহু মহিলা সম্বর্ধনায় যোগদান করেন।

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ভারত-আমেরিকা এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে ডাঃ আর আমেদ, বালিগঞ্জ মহিলা সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা প্রীতিময়ী কর এবং আর ডব্লু এ সি র পক্ষ হইতে ডাঃ সুবোধ মিত্র স্বামী নিখিলানন্দজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও মানপত্র প্রদান করেন।

সভার সাফল্য কামনা করিয়া বেলজিয়ামের কন্সাল জেনারেল এবং কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি চিঠি প্রেরণ করেন।

স্বামী নিখিলানন্দজী সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন, "প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি এবং পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম পরিণতি ঘটিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনসূত্র স্থাপন করিতে স্বামী বিবেকানন্দ চেষ্টা করেন এবং সেইজন্য আমেরিকা তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন। আজ ঘটনা-পরম্পরায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন অনিবার্য হইয়াছে। মানুষ যে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের ভিতর দিয়া সেই স্বর্গরাজ্য সম্ভব হইবে। আজ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান একান্ত প্রয়োজন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া আমাদের সনাতন ধর্মকে গতিশীল ও প্রসার-প্রবণ হইতে হইবে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে পৃথিবী আজ ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। একমাত্র হিন্দুধর্মই সেই অভাব পূর্ণ করিতে পারে। নৈতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রনৈতিক অনিশ্চয়—এগুলি রোগের বহির্লক্ষণ মাত্র। জগতে অধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মকে প্রবল করিয়া উহা প্রতিরোধ করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের উপর গুরু দায়িত্বভার পড়িয়াছে। স্থিতিশীলতা মৃত্যু আনয়ন করিবে। সমৃদ্ধির দিনে ভারত বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইত, আজ আবার তাহাই করিতে হইবে।

"অনেক চিন্তাশীল পাশ্চত্য মনীষী বলেন, হিন্দুরা তাহাদের ধর্মের মহত্ত্ব বুঝে না। আমরা যদি সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হই, তাহা হইলে অন্যের শ্রদ্ধা আমরা আকর্ষণ করিতে পারিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের অন্তরাত্মার বিরোধিতা করিতেছেন। সেইজন্য নানা বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয় দেখা দিয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে—আধ্যাত্মিকতার প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক অর্জুনের যখন মিলন ঘটে, তখনই সমৃদ্ধি, বিজয় ও গৌরব আসে। শাসন-শক্তির সঙ্গে ধর্মের যদি যোগ না থাকে, তাহা হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের বিগত হাজার বৎসরের ইতিহাস হইতে আমরা সেই শিক্ষা পাই।

"হিন্দুধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সংশ্রব নাই। খৃষ্টান, মুসলমান বা ইহুদী ধর্মের মত হিন্দুধর্ম বলে না—মুক্তির একটিমাত্র উপায় আছে, দ্বিতীয় উপায় নাই। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যে ভাবেই আমাকে ভজনা করা হয় তাহাই আমি গ্রহণ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মে গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। সেই বিশ্বাসের বলে সকল ধর্মের মধ্যে তিনি ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। সকল ধর্মের লোক তাঁহার কাছে আসিত। গভীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। হিন্দু যদি ১৬ আনা হিন্দু হয়, মুসলমান যদি ১৬ আনা মুসলমান হয় এবং খৃষ্টান যদি ১৬ আনা খৃষ্টান হয়, তবেই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে। ধর্মবিষয়ে ভাসা ভাসা উদারতা অথবা নৈষ্ঠিক মানবতার দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হইবে না। সেজন্য চাই গভীর ধর্ম বিশ্বাস।

"হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট—এই ধারণা হইতে না কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এদেশে গঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ। ইহা মোটেই সত্য নহে। ঋষিদের প্রচারিত সনাতন ধর্মের ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে এবং মূল সনাতনধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুরা অন্য ধর্ম হইতে সার সংগ্রহ করিয়াছে। হিন্দুধর্মে গলদ ঢুকিয়াছে, তাহা অবশ্যই দূর করিতে হইবে কিন্তু সেইজন্য হিন্দু-ধর্মই ত্যাগ করিতে হইবে—ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। শিক্ষার দ্বারা কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। স্কুলকলেজে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সনাতন ধর্মশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল তাহাদের ধর্ম ও কৃষ্টির জন্য জীবন বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকা বহিঃশত্রুর হাত হইতে নিজেদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিতে আত্মবলিদান করিতে কুণ্ঠিত নহে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার জন্য যদি আমরা গৌরব বোধ করি, তবেই আমরা সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারিব। মিঃ চার্চিলের একটি মূল্যবান কথা আমাদের নেতাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য—তিনি বলিয়াছেন, জাতির সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইলে উহার সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।"

কলিকাতাস্থ আমেরিকান কন্সাল মিঃ গিলমোর বলেন যে, ধর্মের ভিত্তির উপরই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল। অবস্থাচক্রে এখন কতকটা অবনতি হইলেও ধর্মের ভিত্তি আমেরিকায় মূলতঃ অক্ষুণ্ণ আছে। বক্তা আমেরিকায় স্বামীজী ও তাঁহার সহকর্মিগণের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন।

সভাপতি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, জাতির মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ না রাখিলে কোন দেশ বা জাতি বড় হইতে পারে না। আজ বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ায় পৃথিবী ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। ভারত চিরদিন জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনাইয়াছে। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার সহকর্মীরা আমেরিকায় সেই বাণীই প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে যে বীজ বপন করিয়াছেন, আজ তাহা চারাগাছে পরিণত হইয়াছে। এক দিন উহাই মহামহীরুহে পরিণত হইবে।

রায় বাহাদুর এন সি ঘোষ সভাপতি ও স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রোষ নার্শারীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

কোচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—গত ১১, ১২ ও ১৩ই চৈত্র মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন এক মহতী সভায় কোচবিহার ভূপবাহাদুরের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সাধনানন্দজী বক্তৃতা করেন। আসামের মহামান্য গবর্নর শ্রীপ্রকাশজী প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের লোকসেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাদের ত্যাগ ও কর্মদ্বারা জগতের সম্মুখে যে মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা বলেন। দ্বিতীয় দিন মহারাজ ভূপবাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় উক্ত স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তৃতীয় দিন মহোৎসব ও শ্রীভগবানের নামকীর্তন হয়। প্রায় দশ সহস্র নরনারী প্রসাদ-লাভে তৃপ্ত হন। স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্রবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়া উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করে। শ্রীমতী সুজাতা বক্সী এবং জয়ন্তী বক্সীর উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত শ্রুতিমধুর হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, লালমণিরহাট, (রংপুর)—গত ২রা বৈশাখ শুক্রবার এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও নামকীর্তন হয় এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে আনুমানিক ৩০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভবন, নূতনপুকুর (২৪ পরগনা)—গত ২৭শে চৈত্র এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ, আরাত্রিক, ভজন ও কীর্তন এবং মধ্যাহ্নে ভক্ত নরনারীগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দ-জীর সভাপতিত্বে একটী মহতী সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, স্বামী আপ্তকামানন্দজী ও সভাপতি মহারাজ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় বজবজ বিবেকানন্দ সংঘের সম্পাদক শ্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বেলাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৮ই বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৪তম জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক ও ভজনাদি উৎসবাঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্নে আহূত এক বিরাট ধর্মসভায় সহস্রাধিক নরনারী সমবেত হন। ব্রহ্মচারী গোষ্ঠবিহারী কর্তৃক আশ্রম-কার্য-বিবরণী পাঠিত হইলে বহির্গাছী বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের জনৈক অধ্যাপক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ-পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শিক্ষাধারা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর বেলুড় মঠের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্মী শ্রীযুক্ত ফকির বাবু ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু দূর গ্রাম হইতে অনেকেই এই উৎসবে যোগ দেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ফাল্গুন, চৈত্র

ও বৈশাখ মাসে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-সমূহ সম্পন্ন হইয়াছে :—

সোসাইটি-ভবনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব দুই দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিবস বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার বাণী" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন এবং চোরবাগান সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্প্রদায় শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন গান করেন। দ্বিতীয় দিবস শোভাবাজার বেনেটোলা নবগৌর কীর্তন সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুমধুর পালাকীর্তন গাহিয়া সকলকে আনন্দ দেন। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত দোলযাত্রা উপলক্ষে "শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমধর্ম" সম্বন্ধে আলোচনা এবং সাপ্তাহিক অধিবেশনে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" এবং "শিবানন্দ-বাণী" (২য় ভাগ) ধারাবাহিক ভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব কর্তৃক নিয়মিতরূপে 'গীতা' ব্যাখ্যাত হয়। বেঙ্গল থিওসফিক্যাল হলে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার "স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক সমাজ", রায় বাহাদুর শ্রীবিজয় বিহারী মুখোপাধ্যায় "বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান", ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্ত "বিবেকানন্দ ও ছাত্রসমাজ" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। দর্জিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দত্তের বাসভবনে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের স্মৃতি-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হয়। পশ্চিম-বঙ্গের শ্রমসচিব শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে আহূত এক সভায় নিউইয়র্ক বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী, বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সান্যাল এবং সভাপতি মহাশয় শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অবদান সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের রচিত "বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতি" শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি এবং শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভার শেষে সুমধুর 'লবকুশ' পালাকীর্তন হয়।

পরলোকে শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার— গত ২৫শে ফাল্গুন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার সেনদিয়া গ্রামে এক শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেন যে দিন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা টাউন হলে বক্তৃতা দেন। তদবধি শশধর বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের দিব্য সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হন।

তাঁহার বিদ্যা ও তেজস্বিতা শিক্ষাবিভাগের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়েলস্ মিশনের (Wales Mission) কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার উপর উক্ত মিশনারী ও গভর্নমেণ্ট শিক্ষায়তন পরিচালনার ভার দেন। তিনি নিরহঙ্কার ও অমায়িক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্বাধীন আয়ার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত— গত ১৮ই এপ্রিল আয়ারল্যাণ্ড একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডোনেল হইতে কর্ক ও ডাবলিন হইতে

গলওয়ে পর্যন্ত সমগ্র আইরিশ জাতি বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও অপরিমিত আড়ম্বরের সহিত তাহাদের ইতিহাসের এই নবযুগকে স্বাগত করিয়াছে। মধ্য রাত্রি ১২টার ১ মিনিট পর (রবি-সোমবার) অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ সময় ঐতিহাসিক ও'কোনেল সেতু হইতে ২১ বার তোপধ্বনির পর সামরিক বিউগল-বাদকরা তূর্যনাদ করিয়া নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। মধ্য রাত্রি ১২টা বাজিবার ১৫ মিনিট পূর্ব হইতে ১২-২০ মিনিট পর্যন্ত ডাবলিনের চতুর্দিক হইতে লিফি নদীর উপর ও'কোনেল সেতুতে সার্চলাইট রশ্মি কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ভবনসমূহ আলোকমালায় সজ্জিত হয় এবং শহরের প্রধান প্রধান রাজপথে উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের সহিত সহস্র সহস্র কণ্ঠের উল্লাসধ্বনি সমগ্র নগরীকে মুখরিত করিয়া তোলে।

ত্রিবর্ণ রঞ্জিত আইরিশ জাতীয় পতাকা (সবুজ, সাদা ও কমলা রং—ভারতীয় পতাকার সহিত ইহার একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়) গুড ফ্রাইডে হইতেই ডাবলিন এবং অন্যান্য নগরী ও গ্রামসমূহে উড্ডীন হইতে থাকে। ডাবলিনের নানা আকারের প্রায় সমস্ত ভবনে জাতীয় পতাকা বিশেষভাবে উড্ডীন হয়।

বিভাগজনিত ক্ষত মুছিয়া না গেলেও বৃটিশ জাতির প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা লইয়া আয়ারল্যাণ্ড আজ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিল—ভারত যাহা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিয়াছে। ডাবলিন আজ সত্যই ইউরোপের সর্বাপেক্ষা মনোহর রাজধানীরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই নগরীর সহিত যে সকল করুণ ও গৌরবময় কাহিনী জড়িত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই মন স্পর্শ করিবে; ইহার খ্যাতিমান রাজনৈতিক, স্বদেশপ্রেমিক, শিল্পী ও পণ্ডিত-গণের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। ভাস্কর্যের দিক হইতে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প-নীতির সমন্বয় দর্শককে মুগ্ধ না করিয়া পারে না।

এই উপলক্ষে আয়ারল্যাণ্ডে উহার ১৯১৬ সালের বিপ্লবের ত্রয়স্ত্রিংশৎ বার্ষিক উৎসবও উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ সময়ে সাতজন বিপ্লবী নেতা একটি অস্থায়ী গবর্নমেণ্ট গঠন করেন এবং আইরিশ জাতির ধর্মীয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সমান সুযোগ ও অধিকার স্বীকার করিয়া আয়ারল্যাণ্ডকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করেন। এই সাতজনের সকলকেই এবং অন্যান্য নেতা-দিগকে বৃটিশ ফাঁসি দেয়। বর্তমান আইরিশ জাতির জনক মিঃ ইমন ডি-ভ্যালেরা এই শহীদগণের সমাধিতে একটি পুষ্পমাল্য স্থাপন করেন এবং ১৯১৬ সালের বিপ্লবের বীরবৃন্দ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের একটি দল বন্দুকের গুলি ছুঁড়িয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সামরিক সম্মান প্রদর্শন করেন। ডাবলিনের আর্চ বিশপের পৌরোহিত্যে একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আয়ারল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ও'কেলী, প্রধান মন্ত্রী কষ্টেলো, মাদাম গোন ম্যাকব্রীজ, বিরোধী দলের নেতা ডি ভ্যালেরা, ডাবলিনের লর্ড মেয়র, মন্ত্রিগণ, বিচারপতিগণ ও বৈদেশিক কূটনীতিকগণ ইহাতে যোগদান করেন।

আধুনিক প্রণালীতে মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে ভারত গবর্নমেণ্টের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—ইউরোপ ও জাপানে অনুসৃত আধুনিক প্রণালীতে ভারতে মৎস্যচাষের উন্নতিসাধনের জন্য বর্তমানে একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে। ইহাতে প্রত্যহ দশ হাজার টন মাছ সরবরাহের

পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহার ফলে খাদ্যসমস্যার কতকাংশে লাঘব হইবে এবং দেশের জনগণের অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসাবে মৎস্য ব্যবহৃত হইবে। বর্তমানে ভারতীয় উপকূলে প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার টন মাছ ধরা হয় বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

মৎস্যচাষ উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারতের তিন হাজার দুই শত মাইল দীর্ঘ উপকূলের ব্যাপক জরীপ, প্রধান প্রধান মাছ ধরার কেন্দ্র স্থাপন এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্যশিকারে উৎসাহ দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরিকল্পনার এই অংশ দুই বৎসরের মধ্যে কার্যে পরিণত করা হইবে এবং ইহাতে দুই কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

ঠাণ্ডায় মৎস্য-সংরক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং রেফ্রিজারেটর, রেলওয়ে ভ্যান ও মোটর ট্রাকের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহে মাছ চালান দেওয়ার ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। শিল্পটি যখন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইবে, তখন বিশেষ বিমানযোগে উপকূল অঞ্চল হইতে দেশাভ্যন্তরে মাছ পাঠাইবার আশাও গবর্নমেণ্ট করেন। ভারতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য-শিকারের উপযুক্ত জলযান ক্রয়ের জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষ ও ভারত গবর্নমেণ্টের মধ্যে বর্তমানে আলোচনা চলিতেছে।

কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট সৌরাষ্ট্র বন্দর, বোম্বাই, কোচিন, মান্দাপম্ (মাদ্রাজ), ভিজাগাপটম্, চাঁদবালী ও কলিকাতায় প্রধান মৎস্য শিকার কেন্দ্রগুলি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে চার হাজার টনের অধিক মাছ ঠাণ্ডায় মজুত রাখিবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি থাকিবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক কেন্দ্রে আধুনিক মাছ ধরা জাহাজ ও নৌকা থাকিবে। মাছ জমাট রাখিবার কারখানার জন্য সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌছিয়াছে।

পরিকল্পনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, মাছ জিয়াইয়া রাখার ব্যবস্থা। ভারত গবর্নমেণ্ট দিল্লী প্রদেশের গ্রামসমূহে প্রায় ৩৪০টি পুকুরে মাছ জিয়াইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমে ভারতের সর্বত্র পুকুরগুলিতে এইভাবে মাছ জিয়াইবার বন্দোবস্ত করা হইবে।

গবর্নমেণ্ট বোম্বাইতে একটি মৎস্য চাষ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৯৫১ সালের মধ্যে ভারত বিদেশী খাদ্যের প্রয়োজনমুক্ত হইবে—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা বিভাগের ছাত্রদের ডিপ্লোমা প্রদান উপলক্ষে দ্বিতীয় বাৎসরিক সমাবর্তনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত গবর্নমেণ্টের খাদ্য ও কৃষিসচিব শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম বলেন, স্বাধীন ভারত গবর্নমেণ্ট এক বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভারতকে বিদেশী খাদ্যের প্রয়োজনভার মুক্ত করিতে হইবে।

এই ব্যাপারে সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞদের বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে ; কারণ, প্রকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া যথোপযুক্ত পরিকল্পনা দ্বারাই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব এবং এই ভাবেই প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীদৌলতরাম বলেন, ভারতীয় কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী যে সেবার মনোভাব ও আন্তরিকতা লইয়া ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই মনোভাব লইয়াই তিনি সকলকে জাতির সেবায় যোগ দিতে বলেন।

ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রী এস এম শ্রীবাস্তব ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই কেন্দ্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসন্ন কৃষি তথ্যানুসন্ধান সম্পর্কে এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিনিধিদের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

পরিষদের সংখ্যাতত্ত্ব গবেষণা কর্মচারী এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ পি ভি সুখাত্মে তাঁহার বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে বলেন, তাত্ত্বিক শিক্ষা ব্যতীত বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
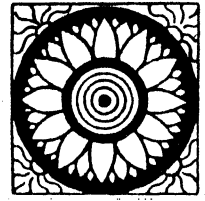
পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মনীতি

সম্পাদক

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খান তথাকার গণপরিষদে সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহাতে অমুসলমানদের স্ব স্ব ধর্ম সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন, "We, as Pakistanis, are not ashamed of the fact that we are overwhelmingly Muslims and we believe that it is by adhering to our faith and ideals that we can make a genuine contribution to the welfare of the world." 'পাকিস্তানী হিসাবে এ সত্য স্বীকার করিতে লজ্জিত নই যে, পাকিস্তানে আমরা মুসলমান সংখ্যাবহুল এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শে অনুরক্তি থাকিলেই আমরা পৃথিবীর মানবজাতির উপকারার্থে যথার্থ দান করিতে পারিব।' তিনি আরও বলিয়াছেন 'মুসলমান ধর্মের অনুশাসনমতে মুসলমান অধিবাসীদের জীবন গঠন এবং পরিচালন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এই উপায়ে মুসলমানগণ প্রমাণ করিতে চান যে, ইসলামধর্ম মানবজাতির সকল সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ।' মিঃ লিয়াকৎ আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই আদর্শ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের গণতন্ত্র, সামাজিক সাম্য ও পরধর্মসহিষ্ণুতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "In our desire to build up an Islamic society, we have not ignored the rights of the non-Muslims." 'আমাদের ইসলামিক সমাজগঠনের আগ্রহ সত্ত্বেও আমরা অমুসলমানদের স্বাধিকার উপেক্ষা করি নাই।' তাঁহার মতে অমুসলমানদের স্বাধিকার নষ্ট করা ইসলামধর্মবিরুদ্ধ (un-Islamic)।

ইসলাম ধর্মকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া ঘোষণা করায় অনেকে ইহাকে মধ্যযুগীয় 'ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ-শাসিত রাষ্ট্র' (Theocratic State) বলিয়া মনে করিবেন, এই আশংকা নিবারণের জন্য মিঃ লিয়াকৎ আলি বলিয়াছেন, "I just now said that the people are the real recipients of power. This naturally eliminates any danger of the establishment of theocracy." 'এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে (পাকিস্তানে)

জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ইহা স্বাভাবিক ভাবে ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের শাসন-প্রতিষ্ঠার আশংকা দূর করে।' তিনি পাকিস্তানে 'ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষের শাসন-প্রতিষ্ঠা'কে 'আশংকাজনক' বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছেন। "It is patent that the entire universe is a theocracy." 'ইহা পরিষ্কার যে সমগ্র পৃথিবীই ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ-শাসিত।' এই ভাবে ধর্মসম্প্রদায়বিশেষের শাসনের কতকটা অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াও তিনি বলিয়াছেন যে, যে হেতু ইসলাম ধর্ম ঈশ্বর হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুরোহিতদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং যে হেতু জনসাধারণেরই সম্মতিক্রমে গণতান্ত্রিক নীতিমূলে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে, সেইজন্য এই রাষ্ট্রকে ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ-শাসিত রাষ্ট্র (Theocratic) বলা যায় না।

এ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে—"Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enumerated by Islam shall be fully observed." 'এই রাষ্ট্রে ইসলামধর্মপ্রচারিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক সাম্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে।' পাকিস্তান কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এই প্রস্তাব হইতে "as enumerated by Islam" 'ইসলামধর্মপ্রচারিত' এই কথা কয়টি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান গণপরিষদের বিরোধিদলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের মতে রাজনীতির সহিত ধর্মকে মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে। কায়েদে আজম জিন্নাও এই পরিষদে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূপেন্দ্র বাবু এবং শ্রীশ বাবু উভয়ের উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

এই প্রস্তাবে গণতন্ত্র স্বাধীনতা সমতা সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক সাম্য বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা না বুঝাইয়া ইহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ করা হইয়াছে ; এই শব্দগুলির ইসলাম-ধর্মব্যাখ্যাত স্বতন্ত্র অর্থ যে কি তাহাও কেহ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। তবে এই শব্দসমূহ যে ব্যবহার-ক্ষেত্রে সর্বসমর্থিত সাধারণ অর্থে ব্যাখ্যাত না হইয়া একমাত্র ইসলামধর্ম-সমর্থিত সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যাখ্যাত হইবে ইহা সুস্পষ্ট। এই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মনীতিকে অমুসলমানগণ তাঁহাদের অনুকূল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। এই কারণে তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়াছেন ইহাও ভূপেন্দ্র বাবু গণপরিষদে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পাকিস্তান গণপরিষদ পাকিস্তানকে মুসলমান রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করায় তথাকার মুসলমান ও মুসলমান-ধর্মাবলম্বিগণকে স্পষ্টতঃ অত্যন্ত প্রাধান্য দিয়া অমুসলমান ধর্মসমূহ ও অমুসলমান ধর্মাবলম্বি-গণকে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের অনুগত করা হইয়াছে। এই রাষ্ট্র ধর্মযাজকগণ অর্থাৎ মোল্লা মৌলবীগণ কর্তৃক শাসিত না হইলেও মুসলমান ধর্মের একমাত্র শাস্ত্র কোরানের বা সরিয়ৎ অনুশাসনমতে যে শাসিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, মুসলমান রাষ্ট্রের অর্থই কোরান অর্থাৎ মুসলমান ধর্মশাসিত রাষ্ট্র। ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান বলিয়া ইহাকে মুসলমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তথাকার অমুসলমান-গণ কার্যতঃ উপেক্ষিত ও নিম্নস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কারণে ইহাকে যথার্থ

গণতান্ত্রিক বলা যায় না। ধর্ম-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে অধিকাংশ নরনারীর সম্মতিক্রমে গঠিত এবং সকলের সকল বিষয়ে সমানাধিকার নীতিমূলে পরিচালিত রাষ্ট্রই যথার্থ গণতান্ত্রিক। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক অমুসলমান থাকা সত্ত্বেও ইহাকে মুসলমান রাষ্ট্র এবং মুসলমান সমাজ-গঠনই ইহার আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করায়, গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে এই রাষ্ট্রকে কি গণতান্ত্রিক বলা যায়?

তথাপি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পাকিস্তান গণপরিষদে মিঃ লিয়াকৎ আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুসলমান রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াও তথাকার সংখ্যালঘু অমুসলমানদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষার প্রতিশ্রুতি বেশ জোরের সহিতই দিয়াছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের বড় লাট মিঃ নাজিমুদ্দীনও ইহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "The building up of the State on Islamic principles did not mean that the rights of non-Muslims would be ignored. Interference in the freedom of the minorities would itself be an un-Islamic act." 'ইসলাম নীতি অনুসারে রাষ্ট্র গঠনের অর্থ ইহা নহে যে, অমুসলমানদের অধিকারসমূহ উপেক্ষিত হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ইসলামবিরোধী কার্য।' এই ভাবে পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্না হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার সকল রাষ্ট্রনায়কই পাকিস্তানের অমুসলমানদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি বারংবার দিয়াছেন এবং এখনও অনেকে মাঝে মাঝে দিতেছেন। এই প্রতিশ্রুতি কার্যতঃ কতটা প্রতিপালিত হইবে তৎসম্বন্ধে এখন সঠিক ভাবে কোন অভিমত প্রকাশ করা যায় না। ইহার পরিণতি কার্যতঃ কিরূপ দাঁড়ায় তাহা না দেখিয়া এসম্বন্ধে চূড়ান্ত মত প্রকাশ করা সমীচীনও নহে। তবে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ পাকিস্তানে মুসলমানদের প্রাধান্য যে অবশ্যম্ভাবী ইহা অবশ্য স্বীকার্য। উত্তর ভারতে মুসলমানশাসনের পূর্ণ প্লাবনের সময়ও সকল বিষয়ে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। তখনও কোন কোন বিষয়ে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার রক্ষিত না হইলেও তাঁহারা উৎসন্ন যান নাই। তবে হিন্দুদের তখনকার বিপদের তুলনায় এখনকার বিপদের আশংকা বেশী ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তথাপি বর্তমান অবস্থাধীনে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমান-দের পক্ষে তথাকার নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে বরণ করিয়া সমবেত ভাবে তাঁহাদের সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আপাততঃ দেখা যায় না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণও যখন সমস্বরে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন, তখন যথোপযুক্ত চেষ্টা করিলে তথাকার অমুসলমানদের ন্যায্য অধিকার-সমূহ রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইবে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অমুসলমানগণও অত্যন্ত সংখ্যা-লঘিষ্ঠ নহেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি, তাঁহারা শিক্ষা এবং আর্থিক অবস্থা প্রভৃতিতেও তথাকার মুসলমানদের অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এত অধিকসংখ্যক নরনারীকে স্থান দান করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। এজন্য ভারত এবং পাকিস্তানের দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই পাকিস্তানের অমুসলমান-গণকে তাঁহাদের বাস্তুত্যাগ না করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে অল্পসংখ্যক হিন্দু ইতোমধ্যে

নানা কারণে পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও দুঃখদুর্দশার সীমা নাই। এরূপ অবস্থায় আমরা পাকিস্তানের অমুসলমানগণকে দ্বিধাহীন ভাবে পাকিস্তান স্বীকার করিয়া তথাকার মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করিতে এবং আপনাদের স্বগৃহে সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ সাম্য স্থাপন ও সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার সংঘবদ্ধভাবে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে বিশেষ জোরের সহিত অনুরোধ করিতেছি। পূর্বপাকিস্তানের এত অধিক-সংখ্যক হিন্দু আপনাদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য যদি সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মিথ্যা হবে?

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়

মোদের ঘেরিয়া নিত্য বুভুক্ষার সমারোহ চলে
বঞ্চনায় কালো হয় আমাদের স্নায়ু ;
বাঁচিয়া আছি কি মোরা, মোদের এ গৃহদ্বার-তলে,
আছে কি মোদের স্বাস্থ্য শক্তি পরমায়ু ?
পৃথিবীর এক প্রান্তে কেঁদে ফিরি লাখো ভুখাদল
বুকভাঙা সে ক্রন্দন কে শুনিবে আজ ?
কে বুঝিবে বুক দিয়া অগ্নি-গিরি কি যে সে প্রবল
উগারিছে অগ্নি, লাভা অন্তরের মাঝ ?
দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন—জীবনের বাঁচার সঞ্চয়ে
মোদের সকল সত্তা দিয়াছি বিথারি ;
দিয়াছি সর্বস্ব কিছু আধো রাঙা আশার অপয়ে,
অহরহঃ বিড়ম্বনা তবু ওঠে ভরি'।
করিতেছি দেবালয়ে দেবতার নিত্য আরাধনা,
গলবাসে মাথা কুটি লক্ষ অসহায় ;
বাঁচিবার অধিকার—এইমাত্র মোদের প্রার্থনা,
কি আশ্চর্য্য, তবু তাহা ব্যর্থ সমুদায় !
দেবতা এমন র'বে স্তব্ধ মৌন রাজাসন-তল ?
অযুতের আর্তবাণী শুনিবে না তবে ?
প্রাণের প্রার্থনা-পূজা, অশ্রু, শ্বাস তবে কি বিফল ?
মোদের জীবন মিথ্যা, রক্ত মিথ্যা হবে ?

স্বামী শুদ্ধানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের অন্যতম। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বামী প্রকাশানন্দও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং আমেরিকায় প্রায় বিশ বৎসর বেদান্তপ্রচারান্তে তথায় দেহরক্ষা করেন। শ্রীগুরুর গ্রন্থাবলীর বঙ্গানুবাদকরূপে স্বামী শুদ্ধানন্দ বাংলা সাহিত্যে অমর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের পরে তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ সংঘের সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগণের জীবনকাহিনী স্বামী বিবেকানন্দের বৃহত্তর জীবনীর এক একটী অচ্ছেদ্য অধ্যায়। সেইজন্য রামকৃষ্ণ সংঘে এবং বাংলা দেশে তিনি চিরস্মরণীয়।

পূর্বাশ্রমে স্বামী শুদ্ধানন্দের নাম ছিল সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁহার পিতা আশুতোষ চক্রবর্তী এক নিষ্ঠাবান্, ধর্মপ্রাণ ও উদারচেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুধীরচন্দ্র কলিকাতার এক অভিজাত বংশে ১৮৭২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তাঁহার জীবনে প্রবল ধর্মানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বালক সুধীর ধর্মগ্রন্থ পড়িতে ভালবাসিতেন এবং সাধু-সন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়াইতেন। পাঠাবস্থাতেই তিনি দুই বার গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক বার পদব্রজে দেওঘর পর্যন্ত গমন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং সিটি কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই তিনি গৃহত্যাগপূর্বক রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ১৮৯০ সনে ১৮ বৎসর বয়স হইতে বরাহনগর ও কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ মঠে যাইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সঙ্গলাভ করিতে থাকেন।

১৮৯৩ সনে আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার সুপ্ত ভারতকে জাগ্রত করিল। বাঙ্গালী যুবকগণের দৃষ্টি স্বামীজীর যুগান্তকারী কর্ম এবং বজ্রবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীরচন্দ্র অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার কার্যালয় ছিল ধর্মতলায়। উহার বহির্দেশস্থ বোর্ডে ঐ পত্রিকার নূতন সংখ্যা সংলগ্ন থাকিত। সুধীরচন্দ্র তথায় যাইয়া স্বামীজীর সংবাদ বা বক্তৃতাদি সাগ্রহে পড়িতেন। স্বামীজী স্বদেশে পদার্পণ করার পর সিংহলে বা দক্ষিণ-ভারতে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেগুলিও তিনি সযত্নে পড়িয়াছিলেন। যে দিন স্বামীজী শিয়ালদহ ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেনে আসিলেন, সে দিনও সুধীরচন্দ্র প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী যে কাম্‌রাতে ছিলেন, সেটি যেখানে আসিয়া থামিল, সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন। গাড়ী থামিতেই দর্শকমণ্ডলী স্বামীজীর কাম্‌রার সম্মুখে সমবেত হইলেন। তখন স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত দর্শকবৃন্দকে করযোড়ে নমস্কার করাতে সুধীরচন্দ্রের হৃদয় তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। স্বামীজী ঘোড়ার গাড়ীতে ষ্টেশন হইতে রিপন কলেজের দিকে যাইতেছিলেন। কয়েক জন যুবক তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই

তাহা টানিতে লাগিলেন। সুধীর তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য পারিলেন না। রিপন কলেজে স্বামীজী সমবেত জনমণ্ডলীকে দুই চার কথা বলিলেন। তখন সুধীর স্বামীজীকে ভাল ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি দেখিলেন, স্বামীজীর মুখখানি দিব্যজ্ঞানোদ্দীপ্ত ও তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। তবে ভ্রমণের ক্লান্তি-হেতু তাঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন।

স্বামীজী বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাটীতে উঠিলেন। সুধীর তাঁহার বন্ধু খগেন দে-র টমটমে চড়িয়া সেদিন বৈকালে স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাঁহাদিগকে স্বামীজীর নিকট লইয়া গেলেন এবং পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এরা আপনার খুব admirer." কিন্তু স্বামীজী তখন তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকায় সুধীর সেদিন তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইলেন না। কয়েক দিন পরে স্বামীজী কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে ছিলেন। সেখানেই স্বামীজীর সহিত সুধীরের প্রথম কথোপকথন হয়। স্বামীজী উজ্জ্বল গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া উপবিষ্ট, সুধীর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। হঠাৎ স্বামীজী সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি তামাক খাস্?" সুধীর বলিলেন, "আজ্ঞে না।" তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, "হাঁ, অনেকে বলে, তামাকটা খাওয়া ভাল নয়। আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।"

আর একদিন সুধীর তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু খগেনের * সহিত সন্ধ্যার পর স্বামীজীর নিকট গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হরমোহন মিত্র তাঁহাদিগকে স্বামীজীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, স্বামীজী, এরা আপনার খুব admirer এবং বেদান্ত আলোচনা করে।" ইহা শুনিয়াই স্বামীজী সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?" সুধীর বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।" স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?" সুধীর বলিলেন, "কঠ উপনিষৎ পড়েছি।" তখন স্বামীজী সুধীরকে উক্ত উপনিষদ্ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন, কিন্তু উপনিষৎ তাঁহার মুখস্থ ছিল না। ইহার কয়েক বর্ষ পূর্ব হইতেই তিনি নিত্য গীতা পাঠ করিতেন। তাহার ফলে গীতার অধিকাংশই তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। তাই সুধীর বলিলেন, "কঠটা মুখস্থ নেই। গীতা থেকে খানিকটা বলি।" স্বামীজী বলিলেন, "আচ্ছা, তাই বল।" তখন সুধীর গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষ-ভাগস্থ অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহ দিবার জন্য বলিলেন, "বেশ, বেশ।"

পরদিন তিনি বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে লইয়া স্বামীজীর দর্শনে গিয়াছিলেন। পাছে স্বামীজী উপনিষৎ আবৃত্তি করিতে বলেন, এজন্য একখানা উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী পকেটে লইয়া যান। সেদিনও কঠোপনিষদের প্রসঙ্গ উঠিল। অমনি সুধীর তাড়াতাড়ি পকেট হইতে বইখানি বাহির করিয়া কঠোপনিষদের গোড়া হইতে পড়িতে লাগিলেন। এই দুই দিনের উপনিষৎ-প্রসঙ্গের ফলে উহার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সুধীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। উপনিষদের প্রতি এই প্রগাঢ় প্রীতি সুধীরের আমরণ ছিল। স্বামীজী কিন্নরকণ্ঠে সুমিষ্ট ছন্দে উপনিষদের

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী বিমলানন্দ।

যে সকল শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, সুধীরচন্দ্র দীর্ঘ ষোল বৎসরের পরও তাহা যেন দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইতেন। যে দিন গুজরাটী পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সহিত সংস্কৃত ভাষায় ধর্মবিচার করেন, সে দিনও সুধীর উপস্থিত ছিলেন। বিচারান্তে পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন, "স্বামীজী তাদৃশ পণ্ডিত নন্, তবে ইঁহার চক্ষুতে এক মোহিনী শক্তি আছে; সেই শক্তি-বলেই তিনি নানা স্থানে দিগ্বিজয় লাভ করিয়াছেন।"

স্বামীজীর এক সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী নিত্যানন্দের পরামর্শে স্বামীজী মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন। নিয়মগুলি স্বামীজী বলিয়া যাইতেন এবং সুধীরচন্দ্র লিখিতেন। স্বামীজী তামাক খাইতেন। সেইজন্য তামাক খাওয়াটি মঠে নিষিদ্ধ হইল না। মঠের একটি নিয়ম হইল যে, মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ব্যতীত আর কিছু খাওয়া চলিবে না। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী সুধীরচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "এমন সময় আসবে যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।" স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের প্রায় দুই মাস পরে ১৮৯৭ সনে এপ্রিলের শেষে সুধীরচন্দ্র সংসার ছাড়িয়া আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। ইহার পূর্ব হইতেই তিনি আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিতেন। স্বামীজী সুধীরকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং খোকা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি এই শিষ্যকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ নাম দেন। ঐ বৎসরের মধ্যে তিনি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক স্বামী শুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামীজী তাঁহার এই নবীন সন্ন্যাসী শিষ্যের দ্বারা মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখাইতেন এবং অন্যান্য কাজও করাইতেন। শ্রীগুরুর সহিত স্বামী শুদ্ধানন্দ উত্তর-ভারত এবং রাজপুতানাদি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মানস-সরোবর তীর্থেও গমন করেন। এই তীর্থ-ভ্রমণে শ্রীগুরুর সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিবার সুযোগ হয়। স্বামী শুদ্ধানন্দ পরবর্তী কালে বলিতেন, "যতই দিন যাচ্ছে ততই স্বামীজীকে আরও বড় মনে হচ্ছে। যখন স্বামীজীর সঙ্গে থাকতাম এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতাম, তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে, স্বামীজী এত বড়!"

একদিন অপরাহ্নে মঠের বড় ঘরে বহু লোক সমাগত। তন্মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বিরাজিত। নানা প্রসঙ্গ চলিতেছিল। এমন সময় আলীপুর আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল বিজয়কৃষ্ণ বসু আসিলেন। বিজয় বাবু ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ছিলেন। স্বামীজীর নিকট কেহ তাঁহার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করায় স্বামীজী তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বামীজীর সম্মুখে বক্তৃতা করিতে সাহস করিলেন না। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখনও কখনও ধর্মসম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁহাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল। তাহাতে তিনি ইংরেজীতে বলিবার অভ্যাস করিতেন। স্বামীজীর নির্দেশে সে দিন স্বামী শুদ্ধানন্দ দাঁড়াইলেন এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদোক্ত আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া স্বামীজী স্বীয় শিষ্যকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তথায় সে দিন স্বামীজীর নূতন সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দ প্রায় দশ মিনিট কাল একই বিষয়ে বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন। ঠাকুরের বৃদ্ধ শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল

ইংরেজী জানিতেন না। কিন্তু স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলির সারাংশ শুনিবার খুব আগ্রহ তাঁহার ছিল। তাঁহার অনুরোধে নবীন সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাগুলি পড়িয়া অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শোনাইতেন। স্বামী প্রেমানন্দের পরামর্শে নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্বামীজীর বক্তৃতাবলীর বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন। এক দিন সকলে স্ব স্ব অনুবাদ আনিয়া কিছু কিছু পড়িয়া স্বামীজীকে শোনাইলেন। স্বামীজী শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ অনেকের অনুবাদের প্রশংসা করিলেন। একদিন স্বামী শুদ্ধানন্দ একা স্বামীজীর কাছে আছেন। স্বামীজী হঠাৎ তাঁহাকে বলিলেন, "রাজযোগটা তর্জমা কর্ না।" শিষ্য গুরুর আদেশে উহার অনুবাদে অবিলম্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই রূপে তিনি স্বামীজীর রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। শিষ্য গুরুর ভাবে এমন প্রভাবিত ছিলেন যে, শিষ্যের লেখনীমুখে গুরুর ভাষাই বাহির হইয়াছে। শিষ্যের অনুবাদ এত প্রাঞ্জল ও মৌলিক যে, ঐগুলি গুরুর মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাংলাদেশে স্বামীজীর ভাব-প্রচারে এবং রামকৃষ্ণ-সংঘের বিস্তারে এই অনুবাদগুলি বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই অনুবাদই স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি।

এক দিন অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের বড় ঘরে বহু লোক বসিয়া আছেন। সে দিন স্বামীজী গীতা ব্যাখ্যা করেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি শ্লোকটি সাধারণের উপযোগী করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করেন। ওজস্বিনী ভাষায় যখন স্বামীজী এই শ্লোকের ভাবার্থ বিবৃত করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভিতর হইতে দিব্য তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতেন, "এই একটী শ্লোকের মধ্যে সমগ্র গীতার সার নিহিত। এই একটী মাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।" সেদিন স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দুই চার দিন পরেই স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা 'গীতাতত্ত্ব' নামে উদ্বোধন পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত ও পরে 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।

একদিন স্বামীজী শিষ্যকে ব্রহ্মসূত্র পড়াইতেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পঠিত ও আলোচিত হইল। ভাষ্যাদি না পড়িয়া স্বাধীন ভাবে সূত্রগুলির অর্থ বুঝিবার জন্য গুরু শিষ্যকে উৎসাহিত করিলেন। উক্ত নির্দেশ অনুসারে শিষ্য পরে স্বামীজীর ভাবাবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের মতে রামানুজ ও শঙ্করের মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহার প্রধান কারণ মূল শ্লোকের পাঠান্তর। স্বামী শুদ্ধানন্দ রচিত ভাষ্যটি এখনও অপ্রকাশিত। স্বামীজী তাঁহার শিষ্যকে সংস্কৃত ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণও শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বামীজী বলিতেন, 'আমরা আত্মা শব্দকে 'আত্‌মা' না বলে 'আঁত্তা' বলে উচ্চারণ করি। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন, শব্দের অপ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ। পতঞ্জলির মতে আমরা সকলে ম্লেচ্ছ।"

যেদিন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেদিন স্বামী শুদ্ধানন্দেরও দীক্ষা হয়। স্বামী নির্মলানন্দ আসিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' ইতঃপূর্বে তিনি কুলগুরু বা অপর কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। জনৈক হঠযোগীর নিকট প্রাণায়ামাদি কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়া শিখিয়া প্রায় তিন

বৎসর অভ্যাস করিয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দজী দীক্ষার্থ গুরুর নিকট যাইয়া বসিলেন। প্রথমেই স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার?" শিষ্য বলিলেন, "কখন সাকার ভাল লাগে, কখন বা নিরাকার।" একটু পরে গুরু শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া অল্পক্ষণ ধ্যান করিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুই কখনো ঘট স্থাপন করে পূজা করেছিস?" শিষ্য বলিলেন, "আমি বাড়ী ছাড়বার পূর্বে ঘট স্থাপনপূর্বক কোন পূজা অনেক ক্ষণ ধরে করেছিলাম।" গুরু তখন একটি দেবতার মন্ত্র শিষ্যকে বলিয়া উহার অর্থ ভাল রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে শিষ্যের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া সম্মুখে যে কয়টি লিচু পড়িয়াছিল সেগুলি লইয়া শিষ্যকে গুরুদক্ষিণা দিতে বলিলেন। স্বামীজী একদিন শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ শিষ্যদের ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া ধ্যানপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের নেতৃত্বে এই ভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।

স্বামীজী যে দিন বেলুড় মঠ হইতে আলমোড়া যাত্রার জন্য কলিকাতা যান, সেদিন মঠের সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতি আগ্রহের সহিত নূতন ব্রহ্মচারিগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, বাবা ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছুই হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই একমাত্র সহায়।" এক দিন অপরাহ্নে স্বামীজী বেলুড় মঠের বারান্দায় স্বামী শুদ্ধানন্দ-প্রমুখ শিষ্যদের লইয়া বেদান্ত পড়াইতেছিলেন। তখন স্বামী প্রেমানন্দ মঠে ঠাকুরের পূজা করিতেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে আরাত্রিকের জন্য ঠাকুরঘরে যাইতে ডাকিলেন। স্বামীজীর তখন বেদান্ত-অধ্যাপনার নেশা কাটে নাই। তিনি উক্ত গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "এ যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, একি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একটা ছবির সামনে সল্‌তে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁঝ পিট্‌লেই বুঝি মনে করছিস্, ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?"

স্বামীজীর মুখে স্বামী শুদ্ধানন্দ অনেক বার শুনিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বেশী প্রিয়পাত্র। এক দিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে গুরু শিষ্যকে বলিলেন, "দেখ, মঠের একটা ডায়েরী রাখ্‌বি।" স্বামীজীর এই আদেশ শিষ্য যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন। সেই ডায়েরী এখনও মঠে পরিরক্ষিত আছে। ইহা হইতে মঠের আদি ইতিবৃত্ত অনেকটা জানা যায়। স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিতেন, "সামান্য ইংরেজী পড়ে আমরা সব বিষয়ে সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর বাক্যে আমার কখনও অবিশ্বাস হয় নি। কারণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র ধ্রুব সত্য বলে দৃঢ় ধারণা হত।" গুরুবাক্যে এই রূপ গভীর বিশ্বাসের বলেই স্বামী শুদ্ধানন্দ এত বড় কর্মী ও জ্ঞানী হইতে পারিয়াছিলেন। এক দিন এক অপরিচিত দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি সন্ন্যাসী হলেন ও গেরুয়া পরলেন কেন?" তদুত্তরে স্বামী শুদ্ধানন্দ যে সরল উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার এখনও স্পষ্ট স্মরণ আছে। তিনি বলিলেন, "সকলকেই ত এই জগৎ ছেড়ে যেতে হবে। গৃহে থাক্‌লে ওপারের ডাক শুনে যেতে বড় কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য।" তিনি স্বামীজীর যে অস্ফুট স্মৃতি*

* উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামীজীর কথা' নামক পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত।

লিখিয়া গিয়াছেন ইহা পাঠে দেখা যায়, গুরু-বাক্যগুলি কত যত্নে সারা জীবন তিনি স্মরণ-মনন করিয়াছেন।

১৮৯৯ সনে স্বামীজীর প্রেরণায় বেলুড় মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয় এবং স্বামী ত্রিগুণাতীত উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 'উদ্বোধন'-পরিচালনায় স্বামী শুদ্ধানন্দ ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। স্বামী ত্রিগুণাতীত পাশ্চাত্যে গমন করিলে স্বামী শুদ্ধানন্দ 'উদ্বোধন'-এর দ্বিতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসর পর্যন্ত উহার সম্পাদনাকার্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯০৩ সনে তিনি বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রাষ্টি এবং পরে রামকৃষ্ণ মঠের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে ১৯২৬ সনে এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রথম সম্মেলন হয়। স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগের পর তিনি ১৯২৭ সনে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৪ সন পর্যন্ত সাত বৎসর এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ সনে মার্চ মাসে তিনি বেলুড় মঠের সহকারী অধ্যক্ষ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯৩৮ সনের মে মাসে প্রধান অধ্যক্ষ পদে (প্রেসিডেণ্ট) আরূঢ় হন। তিনি বেলুড় মঠের পঞ্চম অধ্যক্ষ। উক্ত পদে ছয় মাস মাত্র অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১৯৩৮ সনে ২৩শে অক্টোবর ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত করা হয়।

শেষ জীবনে তিনি উচ্চ রক্তচাপে (Blood-pressure) ভুগিতেছিলেন। ১৮ই অক্টোবর হইতে তাঁহার খুব জ্বর হয় এবং পরে হিক্কা ও মূত্রকৃচ্ছ্র দেখা দেয়। শেষ রাত্রিতে চিকিৎসকগণকে বলেন, "আর ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন নেই। এখন শুধু ভগবানের নাম শোনান।" শেষ কয়েক মাস যাবৎ তিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক আলোচনা এবং 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ-শ্রবণে রত থাকিতেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া চণ্ডীপাঠ করাইয়া শ্রবণ করেন। বেদান্ত এবং উপনিষদাদি শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। সেরূপ পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান রামকৃষ্ণ-সংঘে বিরল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে লইয়া তিনি শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। উপনিষৎপাঠে বেলুড় মঠের সাধুদিগের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য উপাখ্যানটি সংস্কৃত নাট্যাকারে পরিণত করিয়া সাধুদিগের দ্বারা ইহার অভিনয় করান। তিনি নিজেও কয়েক বার উক্ত অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে সাধুগণের শাস্ত্রশিক্ষার জন্য যে চতুষ্পাঠী আছে, স্বামী প্রেমানন্দ উহার প্রতিষ্ঠাতা হইলেও স্বামী শুদ্ধানন্দের ঐকান্তিক আগ্রহ চতুষ্পাঠী-প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ।

রামকৃষ্ণ-সংঘের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ইতিহাস স্বামী শুদ্ধানন্দ বিস্তৃত ভাবে জানিতেন। সংঘের প্রত্যেক শাখা ও সন্ন্যাসীর সবিশেষ সংবাদ তিনি রাখিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে রামকৃষ্ণ-সংঘের জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঢাকা শাখায় অস্পৃশ্য জাতির জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনাদি দ্বারা তিনি উক্ত আশ্রমের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ সোসাইটি লাইব্রেরী স্থাপন ও উহার জন্য গ্রন্থসংগ্রহ ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, সদস্যনির্বাচন

প্রভৃতি সকল কার্যেই তিনি অনলস ভাবে যোগদান করিতেন। রামকৃষ্ণ-সংঘ পরিচালন এবং সাধুগণের জীবন-গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন, সেগুলি স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের এবং পরবর্তী যুগের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের সহিত মিশিবার সমান সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ-সংঘের অতীত ও বর্তমান যুগের সংযোগসূত্র-স্বরূপ।

স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবন ছিল ত্যাগোদ্দীপ্ত অনাড়ম্বর ও প্রেমপূর্ণ। বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যাহা কিছু দিতেন তাহা তিনি দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তাঁহার নিকট সংঘের প্রাচীন ও নবীন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণের অবাধ গতি ছিল। সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে এক অন্ধ নারী তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় দীক্ষা-প্রার্থিনীকে বিমুখ হইতে হয়। পর দিন শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি অন্ধ নারীর সংবাদ লইয়াছিলেন। দুঃখীর প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। বেলুড় মঠের নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের নিকট তিনি স্নেহময় পিতার তুল্য ছিলেন। গুরুর হৃদয়বত্তা শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। গুরুগতপ্রাণতাই স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনের বিশেষত্ব। গুরুর বহু বাক্য শিষ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ ছিলেন স্বামীজীর এক একটী প্রতিবিম্ব। এই সন্ন্যাসী শিষ্যগণের জীবনকাহিনী অধ্যয়ন করিলে স্বামী বিবেকানন্দের বৃহত্তর জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে আছে, "যেমন তৃণাগ্নি সমুদ্রকে উত্তপ্ত করিতে অক্ষম, তদ্রূপ ক্রোধ সাধুর মনে বিকার সৃষ্টি করিতে পারে না।" সাধু শুদ্ধানন্দের রাগ জলের দাগের মত ক্ষণস্থায়ী ছিল। কোন কারণে আমাদের প্রতি বিরক্ত হইলে তিনি খুব বকিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদিগকে কাছে বসাইয়া সস্নেহে সান্ত্বনা দিতেন। কয় জন পিতা পুত্রের সহিত এমন মধুর ব্যবহার করেন? সন্ত তুলসীদাস বলেছেন—

"জড়চেতন দোষগুণময় বিশ্ব কিন্‌হ করতার।
সন্ত হংস গুণ গহহিঁ পয় পরিহরি বারি বিকার॥"

অর্থাৎ বিধাতা এই জড়চেতন বিশ্বকে দোষগুণময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সাধুরূপ হংস দোষরূপ জলকে ছাড়িয়া গুণরূপ দুগ্ধ গ্রহণ করেন। এই সন্তবাক্য স্বামী শুদ্ধানন্দের জীবনে রূপায়িত দেখিয়াছি। আমাদের অসংখ্য দোষত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকর গুণটী তিনি দেখিতেন এবং তাহা শতগুণে বাড়াইবার নানা চেষ্টা করিতেন। আমরা একটু ভাল লিখিতে বা বলিতে বা পড়িতে পারিলে তিনি কি খুসী হইতেন! কি উৎসাহ দিতেন! আমাদের উন্নতিতে তিনি পিতার ন্যায় আনন্দিত হইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "তোমরা আমার চেয়ে বড় হও।" স্বামী শুদ্ধানন্দের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমরা যেন তাঁহা অপেক্ষা বড় হইতে পারি। তাঁহার পাণ্ডিত্য, সাধুত্ব, কর্মকুশলতা ও সরলতা অসাধারণ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব প্রদর্শনী *

শ্রী—

৬ই মার্চ্চ রবিবার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব উপলক্ষে অখণ্ড জনস্রোত বেলুড় মঠের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বেলা প্রায় ৪টার সময় মঠের নিকটে মিশনের আবাসিক কলেজ বিদ্যামন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দেখি—বিরাট ব্যাপার! বিচিত্র তোরণ, বিপুল জনসমাগম, মাইক্রোফোনে গান ও বক্তৃতা—যেন এখানেই মঠের উৎসবের এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ লাগিয়া গিয়াছে! শুনিলাম কলেজভবনে এক প্রদর্শনী হইতেছে। দেখিতে পয়সা লাগে না শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভাবিলাম, দেখাই যাক ব্যাপারটা কি?

কিন্তু প্রথম বাধা পাইলাম বাহিরের গেটের সম্মুখেই। স্বেচ্ছাসেবকদল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—দ্বারের বাহিরে শত শত প্রবেশার্থী উন্মুখ প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ। জনৈক স্বেচ্ছাসেবক করযোড়ে যাহা নিবেদন করিল তাহার সারমর্ম্ম এই—পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল মহামান্য ডাঃ কাটজু এখন প্রদর্শনী দেখিতেছেন, সুতরাং এখন বাহিরের কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। মনটা একটু দমিয়া গেল, কিন্তু অদৃষ্টের উপর রাগ করিয়া লাভ কি? আমার ভাগ্যে আছে দারুণ রৌদ্রে বিরাট জনতার মধ্যে ঘর্ম্মসিক্ত দেহে অর্দ্ধঘণ্টা-কাল সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া অপেক্ষা করা। তাহা কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা হউক সানুচর প্রদেশপাল বাহির হইয়া যাইবার পরই গেট খুলিয়া দেওয়া হইল। বিপুল জনস্রোত প্রবল বেগে ঢুকিয়া কলেজপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করিল। আমিও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলাম।

দ্বিতীয় বাধা আসিল কলেজভবনের প্রবেশ-দ্বারে। সেখানেও স্বেচ্ছাসেবকদল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপার কি? তাহারা বলিল বহু লোক উপরতলায় উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিছু নামিয়া না আসিলে এখান হইতে লোক ছাড়া হইবে না; নতুবা উপরের ঘরগুলিতে লোক ঠাসাঠাসি হইয়া যাইবে। অসম্ভব নয়। যে ভাবে জন-প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে এইরূপ মাঝে মাঝে barrage দিয়া স্রোত নিয়ন্ত্রণ না করিলে সব কিছুই ভাসিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

কিছুক্ষণ পরেই ছাড়া পাইলাম। আমাদের স্রোত পাছে বিপথে যাইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তাহার জন্য দেখিলাম বেঞ্চ ও লম্বা টেবিল সাজাইয়া সঙ্কীর্ণ খাতে আমাদের গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক বাঁকের মুখেই একাধিক স্বেচ্ছাসেবক কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু একটা জিনিষ আমার আপত্তিকর বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম, এমন ভাবে জনতার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে প্রত্যেক দর্শককে বাধ্য হইয়া সমস্ত প্রদর্শনীটি ঘুরিয়া আসিতে হইবে; অর্দ্ধেক দেখিয়া ফিরিবার ইচ্ছা থাকিলেও ফিরিতে পারিবে না। প্রদর্শনীটি অল্প পরিসরের মধ্যে খুবই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে সন্দেহ

* ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত।

নাই। কিন্তু তবুও এ যেন নিমন্ত্রিতকে জোর করিয়া মিষ্টান্নের পাত্রটি শেষ করিতে বাধ্য করা! তবে ইহাতে কাহারও আপত্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। সকলেই সবটুকু ভালো করিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র।

প্রথমেই আমরা প্রবেশ করিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবিভাগের বিপণিতে। এটি নীচের তলার একটি ঘরে অবস্থিত। ইহাতে সরকারী শিল্পবিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নানা প্রকার কাপড়, চামড়ার দ্রব্য, খেলানা, ধাতু-দ্রব্য, চীনা-মাটির চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। জিনিষগুলি সুন্দর এবং তদনুপাতে দামের স্বল্পতা উল্লেখযোগ্য।

বাহির হইয়া দেখিলাম একপাশে লেখা আছে—"অনুসন্ধানবিভাগ ও প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্র"। কৌতূহল হইল, এক বার দেখিয়া আসি। কিন্তু তখন আমরা বাঁধা পথের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। ফিরিবার উপায় নাই। ফলে নিয়ন্ত্রিত স্রোত অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপর তলায় উঠিলাম। স্রোতের মুখ প্রথমেই কলেজের বড় হলের দিকে চালিত হইল। হলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাহিরে একটি চমৎকার দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। হলের ঠিক সম্মুখেই চিত্রপট, মূর্ত্তি ও ছোট ছোট গাছপালা দিয়া দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর একটি চমৎকার প্রতিরূপ রচনা করা হইয়াছে। পঞ্চবটীমূলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসি-ভক্ত-পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। অদূরে বেলতলা ও বাগানের অন্যান্য অংশ দেখা যাইতেছে। স্থানটি স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। সব কিছু মিশিয়া সেখানে এমন একটি শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে যে, দর্শকের মস্তক আপনা হইতেই ভক্তিতে নত হইয়া আসে।

বড় হলটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উহাতে ধারাবাহিক ভাবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বিরাট হল ঘরটি অসংখ্য ফটো ও চিত্রে সমাবৃত। প্রস্তর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আদিম মানুষের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিপূজা ও ভূতোপাসনার মধ্য দিয়া উচ্চতর ধর্ম্মপ্রণালীর বিকাশ হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার ভাবে চিত্রের ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। বৈদিক যুগ ও তাহার পর হইতে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্মমতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও প্রতীকচিত্র এবং তৎসহ বিভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যগণের চিত্র এই কক্ষের বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম্মমত ব্যতীত খৃষ্ট, ইসলাম, তাও, শিণ্টো প্রভৃতি জগতের অন্যান্য ধর্ম্মমতেরও এখানে স্থান হইয়াছে। তাহারই মধ্যে এক দিকে সকল ধর্ম্মমতের সমন্বয়-সাধক ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি। হলের কেন্দ্রস্থলে ভারতীয় বৈদিক সভ্যতার প্রতীক হিসাবে একটি তপোবনের আদর্শ রচনা করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাতে দেখানো হইয়াছে তিন জন ঋষি শান্ত তরুচ্ছায়ে হোমানলে আহুতি দিতেছেন। অদূরে তাঁহাদের পর্ণ কুটিরগুলি দেখা যাইতেছে।

এই কক্ষ হইতে বাহির হইলে দর্শককে শিক্ষা-বিভাগে যাইতে হয়। এই বিভাগে দুইটি কক্ষ আছে। একটির বাহিরে লেখা আছে "বিদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা"। তাহার উপরে মহাত্মা গান্ধীর একটি এবং নীচে স্বামী বিবেকানন্দের দুইটি উক্তি। এই উক্তিগুলির তাৎপর্য্য এই যে, আমরা বিদেশের নিকট হইতে সব সময় যাহা কিছু ভাল তাহা লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিব, কিন্তু তাহা আমাদের জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের মতো করিয়া গড়িয়া লইতে

হইবে। উক্তিগুলি ভাল লাগিল। কিরূপ মনোভাব লইয়া এই বিদেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, ইহাতে যেন দর্শককে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া দেখি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষা-প্রণালীর প্রচুর সুন্দর সুন্দর চিত্র চারিদিকের দেওয়ালে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্যামন্দিরের যে তিন জন ছাত্র ঐগুলি দর্শকদের বুঝাইয়া দিতেছে, তাহাদের বক্তৃতাশক্তি সত্যই প্রশংসনীয়।

দর্শক-জন-স্রোত সমস্ত কক্ষটি ঘুরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শিক্ষা-বিভাগের দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষটি বেশ প্রশস্ত। ইহার প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে লেখা আছে "এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা" এবং তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত বাণী—"যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" ভিতরে দেখিলাম বিরাট ব্যাপার! ঘরের তিন দিকে বিষয়ানুক্রমে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, ভূগোল, ইতিহাস, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র, নক্সা, মানচিত্র, তথ্য ও নমুনাসমূহ সুসজ্জিত। ইহা ব্যতীত একাংশে শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা ও শিক্ষাসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সমাবেশ। তাহার নিকটে মণ্টেসরি যন্ত্রাদি ও বুদ্ধিমাপক উপকরণসমূহ দর্শকের কৌতূহল উদ্রেক করিতেছে। এক কোণে "পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষা"-বিভাগে ছেলেদের আঁকা ছবি, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজ দেখিয়া আনন্দ পাইলাম। তবে মনে হইল এই বিভাগটির জন্য আরও বেশী স্থান দেওয়া উচিত ছিল। কারণ এইরূপ নানাবিধ সুনির্ব্বাচিত পাঠ্য-বহির্ভূত শিক্ষার ভিতর দিয়াই ছাত্রের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তির বিকাশ হয়। কেবলমাত্র পাঠ্য-তালিকা অনুসরণ করিয়া এই প্রকার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। আশা করি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ পরবর্ত্তী কালে এই বিষয়টির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিবেন এবং পাঠ্য-বহির্ভূত শিক্ষার বিভিন্ন দিক্‌গুলি প্রদর্শনীতে দেখাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

এই কক্ষের একটি দেওয়ালের উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদর্শ"। তাহার নীচে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি শিক্ষা-বিষয়ক উক্তি এবং তাহার পরে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষানীতি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার জন্য বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত আছে। স্বামীজীর শিক্ষা-বিষয়ক উক্তিগুলিকে নিম্নলিখিত কয় ভাগে ভাগ করিয়া সাজানো হইয়াছে, যথা—"বর্ত্তমান শিক্ষার অপূর্ণতা", "শিক্ষার প্রণালী", "স্ত্রী-শিক্ষা" ও "জনশিক্ষা"। তাহা ছাড়া স্বামীজীর "মানুষ-গড়া" শিক্ষার একটি সুন্দর ছক্ দেখিলাম। তাহাতে স্বামীজীর উক্তি-সহযোগে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ হয়, তাহাই প্রকৃত মানুষ-গড়া শিক্ষা। উহার সঙ্গে একটি প্রাচীরপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিক্ষামূলক কার্য্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া আছে। স্বামীজীর শিক্ষা-বিষয়ক উক্তিগুলি পড়িয়া মনে হইল, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের যে সকল মতবাদ পড়িয়া আমরা চমৎকৃত হই স্বামী বিবেকানন্দ তাহা অপেক্ষাও কত উচ্চতর এবং বিজ্ঞান-সম্মত মত বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা নিজেদের ঘরের দিকে তাকাই না। সেখানে রত্ন পড়িয়া থাকিলেও তাহা লক্ষ্য না করিয়া আমরা বিদেশের কাচখণ্ড সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত।

এই সম্পর্কে আমার আর একটি কথা

মনে হইল। স্বামীজীর শিক্ষা-নীতি-বিষয়ক উক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যায়তনগুলিতে সেই নীতি অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা চিত্রের সাহায্যে দেখাইতে পারিলে ভাল হইত। ইহাতে বুঝা যাইত এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রদর্শিত নীতি কতদূর সুফলপ্রসূ হইয়াছে এবং রামকৃষ্ণ মিশনও কতদূর ঐ নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কক্ষের মধ্যস্থলেও একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু দেখিলাম। সেটি সরিষা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের ছাত্রদের সংগৃহীত শিক্ষামূলক সংগ্রহশালা। ইহাতে নানা প্রকার ছোট ছোট জীব জন্তু পোকা মাকড় প্রভৃতি কাচের পাত্রে সুরক্ষিত অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগ করিয়া সাজানো আছে। ইহাতে কৃষি ও ভূতত্ত্ববিষয়ক বহু দ্রব্যেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। ছেলেরা যে সকল বিভিন্ন দেশের মুদ্রা, দেশলাইয়ের লেবেল ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে, সেগুলিও এখানে রক্ষিত আছে। ইহা ব্যতীত ছেলেরা কয়েকটি পল্লীগ্রামের জীবিকার সুন্দর মডেল তৈরী করিয়াছে, যথা: ধানি, চিড়াকোটা, গুড় তৈয়ার করা, মাছ ধরা ইত্যাদি। এই সংগ্রহশালাটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

ইতিহাস বিভাগে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের একটি মডেল এবং বাঙ্গালীর ৫৮০টি পদবীর এক তালিকা আমার খুব ভাল লাগিল। বিজ্ঞান-বিভাগে কলেজের জীব-বিজ্ঞানের সংরক্ষিত প্রাণিগুলি অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভূগোলবিভাগে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূগোলবিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ দর্শকদের বুঝাইবার ভার নিয়াছিলেন। অপর সকলদিকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ খুব যত্ন করিয়া দর্শকদের সকল বিষয় বুঝাইয়া দিতেছিল। তাহাদের এইরূপ অক্লান্ত ব্যাখ্যার ফলে অনেকের অনেক নূতন বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই দেখিলাম সত্যই জানিবার ও বুঝিবার জন্য উৎসুক। দুই এক জন দেখিলাম নোট বই বাহির করিয়া নানা বিষয় লিখিয়া লইতেছেন। এটি আমার খুব ভাল লাগিল। প্রদর্শনী যদি লোকের জ্ঞান-পিপাসা জাগাইতে এবং মিটাইতে সাহায্য করে, তবেই তাহার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

এই কক্ষের সঙ্কীর্ণ পথে চারি দিক প্রদক্ষিণ করিয়া মন্থর গতিতে ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে অনেকটা সময় লাগিল। বাহির হইয়া বারান্দার নিয়ন্ত্রিত পথ ধরিয়া চলিলাম প্রদর্শনীর শেষ কক্ষটি দেখিতে। বারান্দার চারিদিকেই বিভিন্ন ধর্ম্মের, বহু মন্দিরের ও তীর্থস্থানের সুবৃহৎ তৈলচিত্রসমূহ সাজানো রহিয়াছে। শুনিলাম, ঐগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবের সময় মহাধর্ম্মসম্মেলন উপলক্ষে অঙ্কিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর এই শেষ কক্ষটি ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-বিভাগেরই একাংশ। তদনুসারে প্রথম আমরা যে হলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার ঠিক পরেই এই কক্ষটি দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত। এই কক্ষটিতে প্রধানতঃ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনীটি চিত্রের ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য চিত্রও আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তগণের যে সকল চিত্র দেখিলাম, তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভারতীয় ও বৈদেশিক সকল কেন্দ্রের ছবি দেওয়া হইয়াছে। এক দিকে দুইটি মানচিত্র। তাহার একটিতে স্বামী

বিবেকানন্দ পৃথিবীর যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন সেই স্থানগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আছে। অপরটিতে স্বামীজীর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত পরিভ্রমণের গতিপথ চিহ্নিত হইয়াছে। এক পার্শ্বে জনৈক নবীন চিত্রকরের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচিত্র দেখিলাম। ঐগুলি ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে পল্লী গ্রামের পটুয়া শিল্পের রীতিতে অঙ্কিত। ইহা ব্যতীত কয়েকটি পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব চিত্রের এবং কয়েকটি চমৎকার রাজপুত চিত্রের নমুনাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই বার বাহিরে যাইবার পালা। উপর-তলা হইতে নামিবার জন্য একটি সিঁড়ি নির্দ্দিষ্ট ছিল। নীচে নামিয়া দেখি "প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্রে"র সম্মুখেই আসিয়া গিয়াছি। তখন পিপাসায় আমার নিজেরই প্রাথমিক সাহায্য লইবার অবস্থা! উঁকি দিয়া দেখি, ঘরের মধ্যে কিছু ঔষধ পত্র লইয়া এক জন ডাক্তার বসিয়া আছেন এবং এক জন স্বেচ্ছাসেবক খাটে শায়িতা এক জন বৃদ্ধাকে বাতাস করিতেছে। শুনিলাম মহিলাটি নাকি ভীড়ে ও গরমে সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি অপর এক জন স্বেচ্ছাসেবককে জানাইলাম যে এক গ্লাস জল না দিলে আমারও ঐ দশা হইবার সম্ভাবনা আছে। সে হাসিয়া এক গ্লাস জল দিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি কলেজপ্রাঙ্গণে তখন জনারণ্য। সেই জনতা প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলাম উহার কারণ কি। ঐ দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দিরের এক বিরাট বিপণী তৈয়ার করা হইয়াছে। এই দীর্ঘ বিপণীটিকেই একটি ছোট খাট প্রদর্শনী বলা চলে। উহাতে শিল্পমন্দিরের শ্রম-শিল্প ও যন্ত্র-শিল্প বিভাগে প্রস্তুত সকল প্রকার দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ। তাঁতের কাজ, কাঠের আসবাব, নানাপ্রকার খেলানা, সুদৃশ্য ধাতু দ্রব্য, ধূপ, ধূপাধার, নানাপ্রকার জামা ও পোষাকের সঙ্গে এই শিল্পমন্দিরের উদ্ভাবিত নূতন রকমের লোহার তাঁত ও তাঁতের আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এখানে রাখা হইয়াছে। শিল্পমন্দিরে প্রস্তুত একটি টাওয়ার ক্লক্ মাঠের পূর্ব্বদিকে উচ্চ মঞ্চের উপর স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎকর্ষ দেখিয়া সত্যই আনন্দ হইল।

তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে। চারি দিকে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোক ভীড় করিয়া আছে। একটু পরেই এখানে সিনেমা হইবে, পশ্চিম বঙ্গের প্রচারবিভাগের গাড়ী আসিয়াছে। শুনিলাম গত ১লা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহই সন্ধ্যার পর এখানে হয় সিনেমা নয় ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা, নয় ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন—নয় কোন না কোন একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে। ভাবিয়া আনন্দ পাইলাম যে প্রদর্শনীটিকে শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দপ্রদ করিতে ইহার উদ্যোক্তাগণ কোন চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। এই রূপ ছোট ছোট শিক্ষামূলক প্রদর্শনী দেশের নানা স্থানে যত বেশী হইবে, দেশের জনশিক্ষার কাজ ততই বেশী অগ্রসর হইবে। এই দিকে দেশের বিভিন্ন সেবা ও গঠন-মূলক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে দেশের প্রকৃতই মঙ্গল হইবে।

শাংকর ভাষ্যস্থ বৌদ্ধাচার্যগণ

(সর্বাস্তিত্ববাদ)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

স্থবির-প্রধান কাত্যায়নী পুত্র, শ্রীবুদ্ধের তিরোভাবের (৬৪০ খৃঃ পূর্বের) তিন শত বর্ষ (৩৪০ খৃঃ পূঃ) পরে, "অভিধর্মজ্ঞান-প্রস্থানশাস্ত্র" বলে একখানি সর্বাস্তিত্ববাদ (অর্থাৎ যাতে সর্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়) সম্বন্ধে ১৫০৭২টা সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থ লেখেন। এই মূল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না, ৩৮২ খৃঃ অব্দে হুয়াং সাং কৃত এর একটা চৈনিক অনুবাদ মাত্র বর্তমানে পাওয়া যায়, এবং এর উপর "অভিধর্ম-বিভাষশাস্ত্র" নামে একটা বিরাট টীকারও হুয়াং সাং কৃত চৈনিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ মতবাদ কালে কুড়িটা বিদ্যালয়ে বিভক্ত হয়, তার মধ্যে প্রধানতঃ আচার্যপাদ কর্তৃক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতই খণ্ডিত হয়। বর্তমানে পরীক্ষার দ্বারা বুঝা-যায় যে ঐ মতদ্বয় যা আচার্যপাদ প্রাপ্ত হন তা চৈনিকানুবাদের কোন কোন স্থলের সম্পূর্ণ অনুরূপ নয়। মহাযানী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কালে এগারটা শাখা উদ্গত হয়, কিন্তু আচার্যপাদ তার মধ্যে প্রধানতঃ যথাপ্রাপ্ত যোগাচার ও মাধ্যমিক মতই খণ্ডন করেছেন। এসম্বন্ধে বৈদিক ও জৈন দর্শনে একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক দেখা যায়—

অর্থজ্ঞানসমন্বিতো মতিমতা বৈভাষিকেণোচ্যতে
প্রত্যক্ষো ন হি বাহ্যবস্তুবিস্তরঃ সৌত্রান্তিকৈরাশ্রিতঃ।
যোগাচারমতানুগৈরভিমতা সাকারবুদ্ধিপরা
মন্যন্তে বত মধ্যমাঃ কৃতধিয়ঃ স্বস্থাং পরাং সংবিদম্॥

অর্থাৎ মতিমান বৈভাষিকেরা বলে থাকেন, বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণগ্রাহ্য (direct perception of external, objects) কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা, বাহ্যবস্তুসমূহ পরোক্ষহেতু মনোবৃত্তি মাত্র (indirect perception of external objects as internal mental images) অর্থাৎ অনুমিত, প্রত্যক্ষ নয়,—এইরূপ মতাশ্রয় করেন। যোগাচার-মতানুগেরা বলেন, সাকার আলয়বিজ্ঞানাত্মায় জগৎ অবাহ্যবৎবৎ (external world is nothing but internal mental images appearing as external) পরন্তু কৃতধী মাধ্যমিকেরা মনে করেন, বাহ্য ও আন্তর যা কিছু উৎপত্তিক্ষণমাত্র স্বস্থা পরা সম্বিৎ (external and internal both are momentary succession of fluxes appearing as permanent)।

এই মতবাদগুলি ইতিহাসের কোন কালিক ক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু দার্শনিক তত্ত্ববিকাশের পুরুষতান্ত্রিক ক্রম। আর্যদেব, বসুমিত্র, শান্তরক্ষিত, মাধবাচার্য প্রভৃতি হিন্দু-স্থামী দর্শনৈতিহাসিকেরা দেখা যায়, কালিক ক্রমটা সাধারণতঃ উপেক্ষা করে দার্শনিক তত্ত্ববিকাশের ক্রমটার উপরেই সবিশেষ জোর দিয়াছেন।

সৌত্রান্তিকেরা মাত্র প্রাথমিক সূত্রপিটকই মানতেন, পরন্তু বিনয়পিটক এবং অভিধর্ম-পিটক মানতেন না। আর বৈভাষিকেরা মাত্র অভিধর্মপিটক মানতেন অপর দুটী মানতেন

না। তবে যাবতীয় বৌদ্ধ দর্শনের সাধারণ ভিত্তি হলো শ্রীভগবান কথিত—"সর্ব্বং ক্ষণিকং, সর্ব্বং দুঃখং, সর্ব্বং শূন্যং এবং সর্ব্বং নৈরাত্ম্যং।" বৈভাষিক মত ভগবানের অন্তর্ধানের তিন শতাব্দীর পর, সৌত্রান্তিক মত চার শতাব্দীর পর, নাগার্জুনের মাধ্যমিক মত বুদ্ধ-তিরোধানের পাঁচ শতাব্দীর পর এবং মৈত্রনাথের যোগাচার মত আট শতাব্দীর পর ভারতীয় দার্শনিক গগনে উদিত হয়ে প্রভা বিস্তার করে। এ সকলের মূল উদ্দেশ্য **একই**, ঠিক যেমন শাংকর দর্শনের বিভিন্ন ধারার মূল তত্ত্ব একই। এটা মধুসূদন সরস্বতী তাঁর "সিদ্ধান্ত-বিন্দু"তে (১-১১৭—২০) প্রমাণ করেছেন। এ সম্বন্ধে মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে (১৯পৃঃ) নাগার্জুনের একটা বচন উদ্ধৃত করেছেন—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ কিল॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণাঃ।
ভিন্না হি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা॥"

—বুদ্ধগণের বাণীর ভাববৈচিত্র্য, শ্রোতার বুদ্ধির অনুপাতে ঘটে থাকে। আর সত্যই অধিকারীর ভেদবাহুল্যে বুদ্ধেরা বহুবিধ উপায়ের দ্বারা তত্ত্বোপদেশ করেছেন। সেই উপদেশ কখন অতি গম্ভীর, কখন অতি সহজ সরল এবং কখন বা গম্ভীর ও স্বল্পমিশ্রিত, পরন্তু সেই সব উপদেশের শূন্যতা তত্ত্বটি অদ্বয়-লক্ষণ।

সর্বাস্তিত্ববাদের বস্তুবিভাগ দ্বিবিধ—(ক) পুরুষতান্ত্রিক (subjective) এবং (খ) বস্তুতান্ত্রিক (objective)। প্রথমটা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) পঞ্চস্কন্ধ (constituents of being), (২) দ্বাদশায়তন (location) এবং (৩) অষ্টাদশ ধাতু (substance)। দ্বিতীয়টা দুভাগে বিভক্ত (১) অসংস্কৃত ধর্ম (things incomposite) এবং (২) সংস্কৃত ধর্ম (things composite)। অসংস্কৃত ধর্মটা আবার ত্রিধা বিভক্ত—(অ) প্রতিসংখ্যানিরোধ (cessation of kleshas due to transcendental knowledge) এবং (অ) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (non-perception ie. বিসংযোগ of dharma for want of condition and knowledge)। এই শব্দ দুটা কিন্তু শংকর ভিন্নার্থে গ্রহণ করেছেন। তার পর (ই) আকাশ (space), এটা নৈয়ায়িক মতের সদৃশ। সংস্কৃত ধর্মও চার ভাগে বিভক্ত—(অ) রূপ (matter), (আ) চিত্ত (mind), (ই) চৈত্ত (mental) এবং (ঈ) চিত্ত-বিপ্রযুক্ত (non-mental)। জড়-জগৎ সব রূপ দিয়ে তৈরী। মহাবিভাষা-শাস্ত্রে পরমাণুকেই রূপের অবিনাশী অবিভাজ্য সূক্ষ্মাবস্থা বলা হয়েছে। এই পরমাণু ক্ষিত্যাদি চতুর্বিধ—গন্ধ-ধাতু ক্ষিতির ধর্ম স্থৈর্য ও ধৃতি, রসধাতু জলের ধর্ম সংপিণ্ডিত (moisture) এবং সংগ্রহ (cohesion), রূপ ধাতু তেজের ধর্ম উষ্ণ ও পক্তি (ripening), আর স্পর্শ-ধাতু বায়ুর ধর্ম চলন ও বৃংহন (growing)। এঁদের মত একটা পরমাণুকে কেন্দ্র করে ছটা পরমাণু, উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম, ঊর্ধ্ব ও অধঃ ভাগে থাকে; এই সাতটা পরমাণুসংযোগে একটা অণু গঠিত। পরমাণু সর্বদাই অণ্বাকারে থাকে, একটা পরমাণু কখন স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না, এই জন্য এদের সংস্কৃত ধর্মের মধ্যে ফেলা হয়েছে। পরমাণুর সূক্ষ্মতা দেখাবার জন্য এঁরা এক অঙ্গুলিপর্বকে বিবিধ পরিমাপক ক্রমের মধ্য দিয়ে ১৯৭২২৬৭৪৩ (একশো সাতানব্বই কোটা, বায়ান্ন লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার, সাতশো তেতাল্লিশ) পরমাণুতে বিভক্ত করেন। যাবতীয় অণ্বাদি জড় জগতে এই চতুর্বিধ পরমাণুর কর্মের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি ঘটে থাকে। দৃশ্য প্রতীয়মান সত্তা (সংস্কৃতধর্ম) হচ্ছে ক্ষণিক,

কিন্তু মূল পদার্থগুলি সত্য। পদার্থজ্ঞান হলে ক্ষণিক প্রতীয়মান দৃশ্যগুলিতে অনিত্যত্ব হেতু আর আসক্তি থাকবে না, তখন বুদ্ধপরিভাষিত শীলাদি আচরণ দ্বারা নির্বাণ লাভ হবে। এঁদের মতে পদার্থ মানে স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতুর তথা অসংস্কৃত এবং সংস্কৃত ধর্মবিশিষ্ট পদার্থের যথার্থ জ্ঞান।

এক্ষণে সর্বাস্তিত্ববাদীরা, লক্ষণবিশেষ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হলেও যে জগতের পুরুষতান্ত্রিক (subjective) এবং বস্তু-তান্ত্রিক (objective) বিভাগ করেছেন, যার জ্ঞানে মোহ বা অবিদ্যার নাশ-হেতু প্রতিসংখ্যানিরোধ (deliverance from the bondage due to transcendental perception) উপস্থিত হবে, প্রকৃতপক্ষে যার ইতর-বিশেষের উপর সমগ্র বৌদ্ধ-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত, তার একটু বিশেষ বিবরণ আমরা এখানে উপস্থাপিত করছি।

পুরুষ তান্ত্রিক বিভাগ—(১) পঞ্চ স্কন্ধ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। রূপ হলো বাহ্য মহাভূত (external)। আর বাকি চারটী হলো নাম বা আন্তর বস্তু (internal)। বেদনা (feeling), সংজ্ঞা (notion), সংস্কার (disposition, mental propensities) এবং বিজ্ঞান (egoistic discrimination)। (২) দ্বাদশায়তন—অক্ষীন্দ্রিয়ায়তন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ায়তন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ায়তন, জিহ্বেন্দ্রিয়ায়তন, কায়েন্দ্রিয়ায়তন,, মনেন্দ্রিয়ায়তন, রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন স্পর্শায়তন এবং ধর্মায়তন (৩) অষ্টাদশ ধাতু —অক্ষীন্দ্রিয় ধাতু, শ্রোত্রেন্দ্রিয় ধাতু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ধাতু, জিহ্বেন্দ্রিয় ধাতু, কায়েন্দ্রিয় ধাতু [শেষোক্ত ধাতু পরিণাম—চতুর্ভূতস্পর্শত্ব, কর্কশত্ব, শ্লক্ষত্ব (কোমলত্ব), লঘুত্ব, গুরুত্ব, শীতম্, জিঘৎসা (ক্ষুধা) এবং পিপাসা = কায়বিশ্ব], মন ইন্দ্রিয় ধাতু, রূপ ধাতু [বর্ণ (colour) এবং সংস্থান (form and figure)-রূপ বিশ্ব], শব্দ ধাতু, [এ পরমাণু কিনা বোঝা যায় না, তবে কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় পদার্থ। এ দুভাগে বিভক্ত—উপাত্তমহাভূত অর্থাৎ চেতন-ভূত-প্রসূত এবং অনুপাত্ত মহাভূত অর্থাৎ অচেতন-ভূতপ্রসূত। এ দুটীই আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত—সত্ত্ব-সংখ্যাত (articulate) এবং অসত্ত্বসংখ্যাত (inarticulate)। চেতন-প্রসূত অসত্ত্বসংখ্যাত শব্দ কিরূপ?—যেমন বীণাদি ধ্বনি। আর অচেতন-প্রসূত শব্দের সত্ত্বসংখ্যাত কী?—যেমন কোন মানুষ যখন ঝরণার শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, নূপুর-ধ্বনি বা বজ্রধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ করে, অথবা আকাশ-বাণী। এরা আবার সুখ ও দুঃখ ভেদে দ্বিবিধ।—এই হলো বৌদ্ধ শব্দবিশ্ব।] গন্ধধাতু, রসধাতু, স্পর্শধাতু, ধর্মধাতু, চক্ষুবিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্র-বিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায় (ত্বক্) বিজ্ঞানধাতু এবং মনোবিজ্ঞানধাতু।

বস্তুতান্ত্রিক বিভাগ—(১) অসংস্কৃত ধর্ম যা পূর্বে বলা হয়েছে—উহারা স্বতঃসিদ্ধ, অপরিণামী, অপ্রসবধর্মী, ধ্বংসাভাববান্ এবং নিত্য। (২) সংস্কৃত ধর্ম—যা দিয়ে প্রাতীতিক জগৎ নির্মিত। এর একটু বিশেষ বিবরণ বলা যাচ্ছে। সংস্কৃতধর্ম চার ভাগে বিভক্ত—রূপ, চিত্ত, চৈত্ত এবং চিত্ত বিপ্রযুক্ত-সংস্কার।

রূপধর্ম—এগারটী—প্রথম করণ (sense-organ)—অক্ষীন্দ্রিয়ায়তন, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ায়তন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ায়তন, জিহ্বেন্দ্রিয়ায়তন, কায়েন্দ্রিয়ায়তন; দ্বিতীয় বিষয় (sense objects)—রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, স্পর্শায়তন এবং অবিজ্ঞপ্তি ধর্মায়তন (অনুভূত রূপধর্ম)।

চিত্তধর্ম (mind)—একটী—বিজ্ঞান (discri-

mination), এর আয়তন—মন ইন্দ্রিয় আয়তন। এর ধাতু (base)—মন ইন্দ্রিয়ধাতু এবং চক্ষু-বিজ্ঞানধাতু, শ্রোত্রবিজ্ঞানধাতু, ঘ্রাণবিজ্ঞানধাতু, জিহ্বাবিজ্ঞানধাতু, কায়বিজ্ঞানধাতু এবং মনোবিজ্ঞানধাতু। এই ষড়্‌বিধ বিজ্ঞানধাতু বলে, বিজ্ঞানকে ষড়্‌বিজ্ঞান বলে।

চৈত্তধর্ম (mental) ছেচল্লিশটী—প্রথম মহাভূমিক (মানবের সাধারণ চৈত্তধর্ম) দশটী বেদনা (sensation), সংজ্ঞা (conception), চেতনা (motive), স্পর্শ (contact), ছন্দ (conation), মতি (intellect), স্মৃতি (memory), মনস্কার (attention), অধিমোক্ষ (determination) এবং সমাধি (concentration) ; দ্বিতীয়, কুশলমহাভূমিকধর্ম (শুভ সাধারণ চৈত্তধর্ম)দশটী—শ্রদ্ধা (faith), বীর্য (diligence), উপেক্ষা (indifference), হ্রী (shame for oneself), অপত্রপা (shame for another), অলোভ (uncovetousness), অদ্বেষ (non-hatred), অহিংসা (non-injury), প্রশ্রবধি (চিত্তশান্তি) এবং অপ্রমাদ (carefulness) ; তৃতীয়, ক্লেশমহাভূমিকচৈত্তধর্ম (ক্লেশ জন্য সাধারণ চৈত্তধর্ম ছয়টী—মোহ (Ignorance), প্রমাদ (carelessness), কৌশিদ্য (Indolence) ; অশ্রদ্ধা (faithlessness), স্ত্যান (inactivity) এবং ঔদ্ধত্য (roughness) ; চতুর্থ, অকুশলমহাভূমিকচৈত্তধর্ম (বিকর্মজাত চৈত্তধর্ম) দুটী—অহ্রীকতা (shamelessness for oneself) এবং অনপত্রপা (shamelessness towards others) ; পঞ্চম, উপক্লেশভূমিক চৈত্তধর্ম (মানাদি সহযোগোৎপন্ন) দশটী —ক্রোধ (wrath), ম্রক্ষ (Hypocrisy), মাৎসর্য (envy), ঈর্ষা (Jealousy), পরিতাপ (anguish), বিহিংসা (injury), উপনাহ ((enmity), মায়া (flattery), শাঠ্য (trickery) এবং মদ (arrogance) ; ষষ্ঠ, অনিয়তভূমিকচৈত্তধর্ম (irregular) আটটী —কৌকৃত্য (repentance), মিদ্ধ (torpor), বিতর্ক (discussion) বিচার (Judgment), রাগ (attachment), প্রতিঘ (anger), মান (pride) এবং বিচিকিৎসা (doubt)।

চিত্তবিপ্রযুক্ত সংস্কার ধর্ম (nonmental—চিত্ত ও চৈত্তধর্মসহযোগেও) চৌদ্দটী—প্রাপ্তি (attainment), অপ্রাপ্তি (non-attainment), সভাগত (common characteristics), অসংজ্ঞিকা (absence of perception), অসংজ্ঞিসমাপত্তি (cessation of perception due to meditation), নিরোধসমাপত্তি (cessation of mental activity due to meditation), জীবিত (life), জাতি (origination), স্থিতি (continuance), জরা (decay), অনিত্যতা (transitoriness), নামকায় (words), পদকায় (sentence) এবং ব্যঞ্জনকায় (letters)।

সর্বাস্তিত্ববাদের সর্বপ্রধান সাধনপদ্ধতি অষ্টাঙ্গ—(১) সম্মাদিট্‌ঠি বা সম্যগ্‌দৃষ্টি অর্থাৎ দুক্‌খ, দুক্‌খ সমুদায়, দুক্‌খ নিরোধ, দুক্‌খনিরোধ মার্গ এই "চত্বারি আর্যসত্যানি"-র সম্যগ্‌জ্ঞান ; (২) সম্মাসংকপ্প বা সম্যক্‌ সংকল্প অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চর্যা, ঈর্ষা, হিংসাদি ত্যাগ সংকল্প ; (৩) সম্মাবাচা বা সম্যগ্‌বাক্‌—মিথ্যাভাষণ, অন্তরালে নিন্দা, রূঢ়বাক্য এবং বৃথা বাক্য ত্যাগ ; (৪) সম্মাকম্মান্ত বা সম্যক্‌ কর্মান্ত—অহিংসা, অচৌর্য ও অব্যভিচার ; (৫) সম্মাআজীব বা সম্যগাজীব—সদুপায়ে উপার্জন এবং অসদুপায় বর্জন ; (৬) সম্মাবায়াম্‌ বা সম্যগ্‌ ব্যায়াম—অসদ্‌ভাব যেন চিত্তে না উঠে তার চেষ্টা, আর যদি উঠে থাকে তার বর্জন, সদ্‌গুণলাভের চেষ্টা এবং তার রক্ষা, ধারণা, বৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা সাধন ; (৭) সম্মাসতি বা সম্যক্‌ স্মৃতি—নিকায় (দেহ), বেদনা (sensation), চেতঃ (mind)

এবং অজ্ঞান সংস্কার (elements of being) সম্বন্ধে অনুধ্যান; (৮) সম্মাসমাধি বা সম্যক্ সমাধি—একান্তে সম্যক্ ঝান বা ধ্যানের দ্বারা বিতক্ক (বিতর্ক) নাশের দ্বারা, বিচার পূর্বক প্রথম সুখানন্দ, পূর্ণ প্রমুদিত সমাধি, দ্বিতীয় আন্তর শান্তিময় বিমল সমাধি, তৃতীয় জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন, সদাতত্ত্বচিন্তাশীল নিশ্চিন্ত প্রভাকর সমাধি এবং সর্বশেষ আনন্দ-নিরানন্দ রহিত অচিন্ত্যান্ সমাধিতে প্রবেশ করতে হবে।

অষ্টশীল খুব উচ্চস্তরের সাধনা, কিন্তু সাধারণের জন্য শ্রীবুদ্ধ ভগবান পঞ্চশীলের ব্যবস্থা করেছেন—(১) পাণাতিপাতা বেরমনী (প্রাণিহত্যা বিরতি), (২) অদিন্না দানা বেরমনী (অদত্ত গ্রহণ বিরতি অর্থাৎ চুরি না করা), (৩) কামেসু মিচ্ছাচার বেরমণী (কামহেতু অনাচার বিরতি), (৪) সুরা-মৈরেয়-মজ্জ পমাদট্ঠান বেরমণী (সুরা, মৈরেয়, মাদক পান বিরতি) এবং (৫) মুসাবাদা বেরমনী (মিথ্যাবাক্য বিরতি) শিক্খাপদং সমাদিয়ামি (শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম)।

অতঃপর পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা মহাযানিক দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সমুদ্র দেখেছি আমি

শ্রীপ্রণব ঘোষ

সমুদ্র দেখেছি আমি,
হিমালয় দেখিনি কখনো।
জানি এই তরঙ্গিত জীবনজিজ্ঞাসা,
আনন্দের ফেনরাশি,
সংশয়ের নিত্য আন্দোলন।
বহুদূর চক্রবালে
নিরর্থক চেয়ে চেয়ে
বহুদিন তটরেখা খুঁজেছি অন্তরে।
প্রীতির প্রবাল দিয়ে
তিলে তিলে গড়ে-ওঠা
বহু প্রাণদ্বীপ
আশ্রয় আশ্বাস দিয়ে ভরেছে হৃদয়।
নোঙর ফেলেছি যেই,
দেখেছি অমনি
সেই সব দ্বীপ ঘিরে
তরঙ্গ ফেনিল,
ক্রন্দন কল্লোল গীতে
ঘুরে ঘুরে মরে।

তীরপ্রান্ত হ'তে চাই দিক্‌প্রান্ত পানে-
হে অসীম!
মেলে নি উত্তর।
তাই আজ চাই হিমালয়!
চাই আজ,
প্রত্যহের সমতল হ'তে
বিপুল বিস্ময়ভরা মহা-আবির্ভাব।
অনন্ত প্রশ্নের লাগি' উত্তুঙ্গ উত্তর!
হে হিমাদ্রি!
মন্ত্র দাও,
মৌন তব সঙ্গোপন বাণী,
এ জীবন ধ্যান হোক্,
হোক্ ওঁ-কার।

গাছের সবুজ-কণা

অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন রায়চৌধুরী

উদ্ভিদের যে অঙ্গ সবুজ-বর্ণবিশিষ্ট হয় তাহার অভ্যন্তর ভাগ অনুবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সেখানে প্রত্যেকটী কোষ সবুজ-বর্ণ কণায় পরিপূর্ণ থাকে। কোষমধ্যস্থ জৈবনিক পদার্থের (Protoplasm) গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈল-বিন্দুর মধ্যে সূর্য্যের আলোকের সাহায্য লইয়া সবুজ রঙের আবির্ভাব হয়। একমাত্র এই সবুজকণার উপস্থিতির জন্যই অধিকাংশ উদ্ভিদ হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হয়। গাছের পাতাগুলিই ঘন সবুজবর্ণের হইয়া থাকে এবং পাতাগুলিই সবুজকণার বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র। ছত্রক জাতীয় নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদগুলি এবং স্বর্ণলতা, বেনে বৌ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় দুই একটী উদ্ভিদেই কেবল সবুজকণাগুলিকে জন্মাইতে দেখা যায় না। সেজন্য তাহারা কখন সবুজবর্ণ ধারণ করে না। সূর্য্যের আলোক না পাইলে সবুজকণার সৃষ্টি হইতে পারে না, কিন্তু উত্তাপাধিক্যে কণাগুলির শীঘ্র বিগলিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বিধায় উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গের উপরিস্থিত স্তরে সাধারণতঃ তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গাছের সবুজকণাগুলি প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহার অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তির বিষয়ে পরিচিত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হয়। চোখের দৃষ্টির অগোচরে বর্ণকণাগুলি কোষের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকিলেও ইহার অসীম ক্ষমতার নিকট বিশ্ববাসী সকলকে মাথা নত করিয়া থাকিতে হয়। গাছের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহার মূল কারণ এই কণাগুলি। একমাত্র এই কণাগুলি সূর্য্যকিরণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া গাছের মধ্যে শ্বেতসার, শর্করা, স্নেহময় যাবতীয় খাদ্য সর্ব্বদা উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ যে সমস্ত খাদ্য নিজের প্রয়োজনে তৈরী করে, সেগুলি সমস্তই আমাদের এবং জগতের ক্ষুদ্রবৃহৎনির্বিশেষে সকল প্রাণীর পুষ্টিসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ জগতের কোন প্রকার প্রাণীর এই খাদ্য নিজে তৈরী করিয়া লইবার কোন প্রকার ক্ষমতা নাই। সেজন্য তাহাদিগকে উদ্ভিদের উৎপন্ন খাদ্য-সামগ্রীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া জীবনধারণ করিতে হয়। বিশ্বের মধ্যে যত-প্রকার জীবজন্তু বাস করে, তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ দ্বারা উৎপন্ন যাবতীয় খাদ্যগ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। প্রত্যেক জীবজন্তু এতদূর অসহায় এবং পর-নির্ভরশীল যে যদি কয়েক দিন ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ একযোগে তাহাদের খাদ্যপ্রস্তুতি কার্য্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসে, তাহা হইলে জগতের সমস্ত জীবজন্তু খাদ্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং জগৎ শ্মশানে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এই ভাবে বিচার করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত জীবজন্তুর পক্ষে সবুজ-কণাগুলি যেন জীবনকাঠি, মরণকাঠি। তাহারা সকলেই সবুজকণার কৃপাপ্রার্থী ও গলগ্রহ হইয়া জগতে বাস করিতে পারিতেছে। সবুজকণাগুলির অদ্ভুত কর্ম্মোদ্যমের উপর এবং এই অক্লান্ত কর্ম্মী-গুলির অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি প্রয়োগের ফলস্বরূপ নিয়ত উৎপন্ন খাদ্যের যদৃচ্ছদানের উপর সারা-

বিশ্বব্যাপী প্রাণি-সমুদয় ভিখারীর মত চাহিয়া আছে। উদ্ভিদকে আমরা অতি হেয় ও দুর্ব্বল বলিয়া চিরকাল তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকি, কিন্তু সে যে কিরূপ অকাতরে এবং নিঃস্বার্থভাবে আমাদের মুখের অন্ন, পরিধানের বসনভূষণ, বাসের আসবাব-পত্রাদি, ব্যবসায়ের উপকরণ, শিক্ষার সরঞ্জাম এবং এমন কি রন্ধনোপযোগী কাঠকয়লা প্রভৃতি যোগাইয়া আমাদিগকে সতত সেবা করিয়া নিজেকে সর্ব্ব প্রকারে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ত্যাগের এ প্রকার জ্বলন্ত মূর্ত্তি জগতে অতি বিরল। তাহার ক্ষুদ্রমহৎ-নির্ব্বিশেষে নিঃস্বার্থ প্রাণিসেবা এবং বিশ্বহিতৈষণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে জগতের চক্ষে সর্ব্বত্যাগীর উচ্চ আসনে উন্নীত করা কি বিজ্ঞোচিত কার্য্য নয়? আমাদের যাহা কিছু তথাকথিত দৈহিক ক্ষমতা, দম্ভ, বিশ্ব-শাসন তাহার মূলীভূত কারণ যদি একবার আমরা ধীর ভাবে অনুধাবন করি তাহা হইলে আমরা যে কতদূর নিঃসহায় এবং নিরবলম্বন ও সতত উপকারেচ্ছুর প্রতি কৃতঘ্ন তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারি।

মেঘমুক্ত দিনে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে শ্বেতবর্ণের রৌদ্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাহা বিভিন্ন মৌলিক বর্ণে রঞ্জিত সাতটী সূর্য্যরশ্মির সমাবেশে সৃষ্ট হয়। গাছের উপর যখন সূর্য্যালোক পতিত হয়, তখন পাতার অসংখ্য সবুজকণাগুলি এই সাতটী রঙের মধ্যে তিনটী, প্রধানতঃ লোহিত রঙের, রশ্মি শোষণ করিয়া লয় এবং তাহাতে তাহারা অদ্ভুত ভাবে অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। সবুজকণা দ্বারা সঞ্চিত এই অপূর্ব্ব শক্তি প্রায় ১৪০০ ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড) উত্তাপের সমান। গাছগুলি যখন দিনের আলোকে খাদ্য প্রস্তুতির জন্য বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারযান গ্যাস্ (Co_2) আহরণ করে, তখন সেই গ্যাস্ পাতার কোষমধ্যস্থিত সবুজ-কণার সংস্পর্শে আসে। এই সময় শক্তিসমন্বিত সবুজকণাগুলি তাহার কার্য্যকরী শক্তি গ্যাসের উপর প্রয়োগ করে। ফলে, গ্যাস্‌টী তখন তাহার পূর্ব্বের দুইটী মৌলিক উপাদানে বিভক্ত হইয়া বিগলিত হইয়া পড়ে। $Co_2 = C + o_2$ মুক্ত অম্লজান (O) এই সময় গাছ হইতে বিদূরিত হয় এবং পরিত্যক্ত মুক্ত কার্ব্বন তখন কোষমধ্যস্থিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় খাদ্যে পরিণত হয়। তাহা হইলে দেখা গেল, গাছগুলি যতই খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য যবক্ষারযান সংগ্রহ করুক না এবং সূর্য্যালোকের যতই প্রাচুর্য্য থাকুক না কেন, একমাত্র সবুজকণা কোষের মধ্যে উপস্থিত না থাকিলে এবং তাহার কর্ম্মকুশলতার সাহায্য না পাইলে গাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কণাগুলি কেবলমাত্র সূর্য্যের আলোকেই কার্য্যক্ষম হয়। আদৌ আলোক না পাইলে কণাগুলি যেমন শক্তিহীন হইয়া পড়ে সেইরূপ প্রখর আলোকের প্রভাবে সেগুলি পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। তবে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে দুপুরের অত্যধিক উত্তাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মত কৌশল তাহারা বেশ জানে, কারণ সে সময় লম্বা কোষের মধ্যে তাহারা এমন স্থান অধিকার করিয়া লয়, যাহাতে তাহাদিগকে অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না।

রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটী মৌলিক উপাদান যথা, Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen এবং Magnesium সবুজকণার দেহ গঠন করিয়া থাকে। লৌহ-জাতীয় কোন পদার্থ ইহার দেহে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোষের মধ্যে

লৌহ-সমন্বিত খাদ্যের অভাব হইলে সবুজবর্ণের আবির্ভাব হয় না। গাছের মধ্যে যে মালমশলা লইয়া খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাতে যদি অন্ততঃ লৌহ উপাদানের অভাব ঘটে, তাহা হইলে গাছকে এক প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করে এবং তাহার ফলে গাছের বর্ণ ম্লান হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এই প্রকার রোগ প্রতীকারের জন্য গাছের উপর লৌহমিশ্রিত জল ছিটাইয়া দিলে ব্যাধিগ্রস্ত গাছটী ধীরে ধীরে সবুজকণা উৎপন্ন করিয়া আরোগ্যলাভ করে। আবার, কয়েকদিন ধরিয়া সূর্য্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইলে গাছে আর এক প্রকার পীড়া দেখা দেয় এবং তাহার জন্য তাহার সবুজকণাগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে গাছটী ফ্যাকাসে হইয়া যায়। এই সময় তাহাকে সূর্য্যালোকের প্রভাবাধীনে আনিলে গাছটী পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। অন্ধকার গৃহমধ্যে গোল আলু হইতে যে অঙ্কুরোদ্গম হয় বা সবুজতৃণাচ্ছাদিত একখণ্ড জমিকে কয়েকদিন ধরিয়া আলোক-বর্জ্জিত অবস্থায় রাখিলে এই প্রকার ব্যাধির প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরোক্ত দুই প্রকার ব্যাধি দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য্যালোক এবং লৌহযুক্ত খাদ্য হইতে কোন প্রকারে বঞ্চিত হইলেই সবুজকণাগুলি সহ্য করিতে পারে না এবং তাহার ফলে অনতিবিলম্বে গাছ পীড়াগ্রস্ত হয়। গাছকে সতেজ রাখিতে হইলে এই দুইটার প্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা দরকার।

কণাগুলি বিশুদ্ধ সবুজবর্ণের নহে, কারণ বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্যে চারি প্রকার বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। জলে বা কোন প্রকার তৈলে তাহাদিগকে গলান যায় না। সুরাসার, Chloroform, Benzol প্রভৃতি দুই একটী মাত্র পদার্থের মধ্যে তাহাদের দ্রবণীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকার দ্রবণ আলোকিত ঘরের মধ্যে কাচের শিশিতে রাখিলে রক্ত বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু দেওয়ালের সামনে রাখিলে সবুজবর্ণ পুনরায় ফিরিয়া পায়। এই প্রকার অবস্থা-বিশেষে বহুরূপ ধারণ ইহাদের অন্যতম বিশিষ্ট গুণ।

শিকড়ের মধ্যে কাণ্ডের নিভৃততম অংশে অথবা গাছের যে সমস্ত প্রদেশে সূর্য্যালোক আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, সে সমস্ত স্থানের কোষমধ্যস্থ কণাগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্ণহীন হইয়া থাকে। এই প্রকার বর্ণশূন্য কণাগুলি গাছের অন্ধকারময় প্রদেশে অবস্থিত থাকিয়া গাছের বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ার্থ যে প্রকার শ্বেতসার খাদ্যের প্রয়োজন হয়, কেবলমাত্র সেগুলি প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদা রত থাকে। গাছের আলোকিত অংশে স্থানান্তরিত হইলে ইহারা তখন সূর্য্যালোকের প্রভাবে সবুজকণায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। বর্ণহীন কণা ভিন্ন গাছের আলোক-প্রাপ্ত অংশে আবার সবুজেতর বর্ণকণাও দেখা যায়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীয় কণাগুলি ফুলের পাপড়িতে প্রকাশিত হয় এবং তাহার ফলে ফুলগুলি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়। ফুলের বর্ণচ্ছটায় মোহিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগুলি যখন ফুলের উপর বসিয়া মধু আহরণে ব্যস্ত হয়, গাছগুলি তখন সেই সুযোগে কীট-পতঙ্গাদির অজ্ঞাতসারে পরাগ-নিষেক কার্য্য তাহাদের দ্বারা সিদ্ধ করাইয়া লয়। কখনও কখনও সবুজকণাগুলি এই প্রকার বর্ণের যে কোনটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। বর্ণভেদে যদিও এই তিন শ্রেণীর কণা দেখা যায়, তাহা হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক নহে; তাহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অবস্থাবিশেষে এবং প্রয়োজনানুরূপ একশ্রেণীর কণা অন্য শ্রেণীতে রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিলাতী বেগুনটীকে ধরা যাইতে

পারে। উৎপত্তিকালে ফলটীর গায়ের কণাগুলি সবই বর্ণহীন থাকে; ফলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কণাগুলি সবুজবর্ণ ধারণ করে, ক্রমে ফলটী যখন পক্বতা প্রাপ্ত হয় তখন সবুজ-কণাগুলি সম্পূর্ণরূপে গাঢ় লোহিত বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

সুধীসমাজে সবুজকণার তথ্য যতই আলোচিত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকদের আসরে তাহার গুণের আদর ততই দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভীম ভৈরব জাগো

শ্রীনকুলেশ্বর পাল, বি-এল্

দশ ভুজে তোর দশ প্রহরণ ধরি ;
বাংলা শ্মশানে আয় মাগো আলো করি।
শুধু হাহাকার—অশ্রুর নদী বয় ;
শাণিত ছুরিকা আর কত বুকে সয় ?
জননীর ব্যথা ভগিনীর আঁখিজল,
বল্ না পাষাণী—কে মুছাবে আজি বল্ ?
এই দেশের দেখে যা পাষাণী রূপ ;
কেমন করিয়া জ্বালি বেদনার ধূপ—
সন্তান তোরে আজি আবাহন করে
বুকের রক্তে বোধন মন্ত্রে বরে।
সর্ব্বহারার আছে শুধু আঁখিজল;
তাই দিয়ে রাঙ্গা ধোয়াবে চরণ-তল।
আগমনীর থামাও করুণ বাঁশী ;
অধরে ফুটাও অট্ট অট্ট হাসি।
রক্ত-লোলুপ রাঙ্গা খর্পর পরে—
যত পিশাচের মুণ্ড পড়ুক ঝরে।
উমা বেশে নয়—প্রলয়ঙ্করী বেশে,
জেগে উঠ্ শ্যামা অট্ট-অট্ট হেসে।

কোটী সন্তান চিতার আগুন জ্বলে
লাঞ্ছিত মাতা পশুশক্তির বলে—
গৃহহারা কত অনাথের বেশে আজ
সকল হারায়ে পরিছে ভিখারী সাজ।
ভাই বলে ভাই বুকে টেনে নাহি লয় ;
অশ্রু মুছায়ে হেসে কথা নাহি কয়।
মা তোর করুণা হারায়ে কেমনে বাঁচি
দেখে যা পাষাণী কত সুখে মোরা আছি
কেন রাক্ষসী—এলি তুই মাগো আজ
ভাল লাগে বুঝি মুণ্ড-মালিনী সাজ ?
নিজ সন্তান রুধির করিতে পান
এত সাধ যদি কর মা রক্তস্নান।
কোটি সন্তান বক্ষ-রুধির ঢালি
ছিন্নমস্তা ! কোটি শির দেয় ডালি।
এই দেশের রুধির-যজ্ঞে মাগো
অয়ি শবাসনা ভীম ভৈরবী জাগো।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

(যেমনটি দেখিয়াছি)

শ্রীগোকুল

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তপরিবার সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী অবস্থিত। মানবশরীরে তাঁহার আগমনের শত-বৎসর মধ্যেই ধর্ম্মের দরবারে এই মহান ঋষির পদতলে সর্ব্বদেশের মানব তাঁহার দান—সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব—লাভ করিয়া আপনাদের ধন্য জ্ঞান করিতেছেন এবং সেই 'দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে আবরিতকায়' ক্ষুদ্র বঙ্গপল্লীর নিরক্ষর নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তিটির পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন ইনি কে? সকলেই ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহার নব জীবনালোকে জীবনের সমস্যা পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ভক্ত তাঁহার ভিতর শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, কর্ম্মী তাঁহার অশ্রান্ত কর্ম্মে অনন্ত করুণা ও মুক্তির সন্ধান পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে ও নূতন প্রাণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জ্ঞানী তাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া প্রতি জীবে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন ও নিজেকে শ্রীভগবানের অংশ জ্ঞান করিতেছেন এবং যোগী তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানে আত্মহারা হইয়াছেন। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়গানে ভুবন মুখরিত, নব চেতনায় জাগরিত, ভাবের উন্মাদনায় বিভোর। কিন্তু শ্রীশ্রীমা কোথায়? এ কথা কেহই বলিতেছেন না, কারণ পিপীলিকার ক্ষুধা একটি মাত্র দানায় শান্ত হইয়াছে, চিনির পাহাড়ের সংবাদ কে লইবে?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জগদ্ব্যাপী পূজাপ্রাঙ্গণে ভক্তদিগের জননী শ্রীশ্রীমার আসন কোথায় এই কথা তাঁহার সন্তানগণের স্বতঃই মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ গত হইলেও যিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে শুধু নশ্বর চক্ষুর অনধিগম্য বিরাট চৈতন্যময় পুরুষরূপে নহে, তদ্বৎ দেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপেই নিত্য বিরাজমান দর্শন করিয়া বৈধব্যচিহ্ন ধারণ অযুক্তিকর বিবেচনা করিয়াছিলেন, অনন্যসাধারণ সেই মাতৃদেবীর পূজার নৈবেদ্য কোন আরাধনায় উৎসর্গীকৃত হইবে ইহাই প্রণিধানের বিষয়।

যদি ইহা সত্য হয় যে, যে শক্তি অনন্ত করুণায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী৺কালীমন্দিরে আবির্ভূত থাকিয়া মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, এবং সেই শক্তিরই আর একটি দিক্ শ্রীশ্রীসারদা দেবী,—শুধু করুণাময়ীর আকারে নহে, প্রাণময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণহীন জগতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং দুর্ব্বল মানবমনে চিরকালের জন্য অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা চলে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু রাগরাগিণীঝঙ্কৃত বেদময় জীবনে শুধু পোঁ না ধরিয়া নূতন রাগিণীসংযুক্ত করিয়া তিনি বিশিষ্ট পূজার যোগ্যা হইয়াছেন এবং তাঁহার আরাধনায় জগৎ ভক্তি মুক্তি ও শক্তির পথে সহজেই অগ্রসর হইবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপী মহাশক্তির সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর করুণাবিজড়িত কর্ম্মজীবনের কিঞ্চিৎ আভাসের বিশেষ প্রয়োজন

আছে। দুর্ব্বল নরনারীকে তিনি যে ভাবে অকাতরে দিব্যভাব, ঈশ্বরানুরাগ, দৈহিক ও মানসিক বল, আনন্দ প্রভৃতি বিতরণ করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। উহা দুঃস্থকে চিরকালের জন্য সুস্থ করিয়া, তাহাকে আশান্বিত, উদার ও ভক্তিপূর্ণ করিবে। ইহা খুবই সত্য যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কোন অবতারের সহিত এইরূপ মহিমময়ী দৈবশক্তি-সম্পন্না মহামানবীর শুভাগমন হয় নাই, অন্তত: ইতিহাস তাহার সাক্ষ্যদান করে না। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব যে যুগাবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার সহিত এই মহাদেবীর পূর্ণাবির্ভাব জগতে সম্ভব হইয়াছিল।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এবং 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' নামীয় পুস্তকে জনসাধারণ এই মহাদেবীর করুণা-বিতরণের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার অহৈতুকী করুণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমার পক্ষে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। মহা-মহারথিকুল—শ্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দজী, শ্রীশ্রীসারদানন্দজী, পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতির নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীশ্রীমার কথায় তাঁহারা ব্যাকুল নেত্রে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক হইয়াছেন। সেই স্থানে মাদৃশ অর্ব্বাচীনের মন্তব্য অশোভনীয়। তথাপি দু চারটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি, কেন না "Fools rush in where angels fear to tread." যেখানে দেবতারা আসিতে সাহস করেন না মূর্খেরা সেখানে ছুটিয়া যায়।

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"ভাব কি ভেবে পরাণ গেল ;
যার নামে হরে কাল পদে মহাকাল
তার কেন কাল রূপ হল ?"

শ্রীশ্রীমায়ের গার্হস্থ্য জীবন অনুধাবন করিলে আমাদের এই কথাটিই প্রথমে মনে উদিত হয়। কালকে সংহার করিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব, মহাকাল যাঁহার পদে বিলুণ্ঠিত, তাঁহার রূপ কাল না হওয়াই তো ভাল ছিল। কিন্তু আবার শেষে ভক্ত কবি নিজেকে সংশোধন করিয়া বলিতেছেন যে, এ কালো আমাদের দেখবার দোষে, আসলে কালো নয়, আলোরই রূপান্তরমাত্র।

"কালরূপ ত অনেক আছে
এ বড় আশ্চর্য্য কালো,
যারে হৃদয়মাঝে রাখলে পরে
হৃদিপদ্ম করে আলো।"

শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে আমরা তপস্যার জলন্ত মূর্ত্তিরূপে দেখিয়াছি। যাঁহার কাছে সংসার-চিন্তা বা বাসনা নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইত, তাঁহার আবার গৃহস্থের মত আকার বা সংসার কেন? সংসারে তাঁহার পরিজনবর্গকে লইয়া পাকা গৃহস্থের ন্যায় বসবাস বাস্তবিকই সাধারণের চক্ষে নিতান্ত বিস্ময়কর বোধ হইত। শ্রীশ্রীঠাকুর বরং সন্ন্যাসীর অনেক আচরণ প্রতিপালন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমা সেরূপ কিছু দেখান নাই। 'ঠাকুর অধিকাংশ সময় আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে অতিবাহিত করিয়াছেন, আর শ্রীশ্রীমা আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া পিত্রালয়ে বা স্থান-বিশেষে বাস করিয়াছেন। মুদ্রাস্পর্শে ঠাকুরের হাত বাঁকিয়া যাইত ও তিনি শরীরে যন্ত্রণা বোধ করিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমা টাকা বাক্সে রাখিবার সময় মাথায় স্পর্শ করিতেন এবং বাক্স হইতে বাহির করিবার সময়ও তদ্রূপ করিতেন।' তবে কি তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন? আপাত দৃষ্টিতে ঐরূপ আশঙ্কা হইলেও আমাদের আরও একটু

তলাইয়া দেখিতে হইবে।

আমরা তাঁহাকে আদর্শ নারী করিতে গিয়াই বিপদ্ করিয়াছি। আমাদিগের নানারূপ আদর্শের কোন একটির মাপকাঠিতে তাঁহাকে বিচার করিতে গিয়াই এই বিপদ ঘটিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে স্থির ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে আমরা দেখিব যে তিনি ছিলেন পরস্পর-বিরুদ্ধ মতবাদের সংমিলনক্ষেত্র—বিভিন্ন আদর্শগুলির সংমিশ্রনকেন্দ্র! 'The point where all contradictions meet!' এই জন্য তাঁহাকে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় আচারব্যবহার করিতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর পক্ষে ভুল বুঝা যেমন অস্বাভাবিক নয়, তাঁহার মুখে সন্ন্যাস বা ত্যাগের উপদেশ শুনিয়া সে সব ভণ্ডামি মনে করাও অনেক গৃহীর পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের বুঝিতে হইবে যে তিনি পূর্ণ, জীব তাঁহার অংশ; তিনি সিন্ধু, জীব বিন্দুমাত্র। বিন্দুর আদর্শ সিন্ধু কোন কালেই হইতে পারে না, বড় জোর একটি তরঙ্গ হইতে পারে। সিন্ধু হইলেই তাহার মৃত্যু, কেন না যাহা হইতে উদ্ভব তাহাতেই লয় হইবে।

তিনি সর্ব্বদা আত্মীয়-পরিজনগণের মধ্যে থাকিলেও সত্যই কি তিনি গৃহী ছিলেন বা তাঁহার আচরণ গৃহীর মতনই ছিল?

গৃহরক্ষা করিতে হইলে গৃহস্থের আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদজ্ঞান সর্ব্বদা প্রয়োজন হয়। নতুবা গৃহটি ধর্ম্মশালায় পরিণত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীমার এই আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদদৃষ্টি ছিল কি? তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী শ্রীমতী রাধারাণী বা তাঁহার স্বামী মন্মথনাথ এবং পরিচয়হীন অব্রাহ্মণ এই লেখককে তিনি সমান চক্ষেই দেখিতেন। আত্মীয়স্বজন অপেক্ষা যে কোন ভক্তকেই তিনি সর্ব্বদা উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন। আন্তরিক টান বা ভালবাসাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, এবং যে কোন ভক্তের ভিতর উহা দেখিলে তাঁহাকে তিনি আপনার করিয়া লইতেন—ইহাতে জাতিভেদ ছিল না। গৃহীর কখন এইরূপ দৃষ্টি আসে না এবং এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ভালবাসা কোন গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাকে অচিরে গৃহহীন করিবে একথা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। শ্রীশ্রীমা গৃহস্থের ন্যায় থাকিলেও কার্য্যে ও অন্তরে অন্তরে ছিলেন সন্ন্যাসিনী। আর তাঁহার গৃহ কোথা? 'উদ্বোধন'কে সকলে 'মার বাড়ী' বলিতেন। আমরাও ভাবিতাম তাই হইবে বুঝি। এখন দেখিতেছি উহা তাঁহার বাসাবাটী ছিল মাত্র। আবার লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁহাকে সন্ন্যাসিনী বলাও চলে না। কারণ তাঁহার গেরুয়া ছিল না, তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নাই এবং মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নীর সম্পর্ক মুছিয়াও ফেলেন নাই। তাঁহাকে কাহার আদর্শ বলিব? নারীর? নারীর সম্পদ স্বামী। তিনি স্বামীর সহিত কোন ঐহিক সম্পর্ক রাখেন নাই। স্বামীর সোহাগ, আদর-যত্ন, বিলাস-বৈভব প্রভৃতির তিনি কোন কালেই তোয়াক্কা রাখিতেন না, অথচ তিনি স্বামীর পার্শ্বেই থাকিতেন এবং তাঁহার শ্রদ্ধা সর্ব্বদাই লাভ করিতেন। ঠাকুর এবং মা এক বলিয়াই আমরা শিখিয়াছি, কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী এক নহে, দুইটি স্বতন্ত্র, দুইটিকে লইয়া এক। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয় এবং যে পরিমাণে পরস্পরের ভাবের বিনিময়ে পরস্পরের অভাব পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণেই তাহাদের মিলন সার্থক হয়। ঠাকুর এবং মা চিরকালই পূর্ণ, তাই তাঁহাদের মিলনের প্রয়োজন হয় নাই। এই জন্য শ্রীশ্রীমা আদর্শ নারী হইতে পারেন নাই। তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত মহিমামণ্ডিত আদেশ-

বাক্য যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন যে তিনি পুরুষেরও উপর পুরুষ।

এইরূপ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহা অনমুকরণীয়। অন্তর্যামিনীরূপে অবস্থান করিয়া তিনি যে ভাবে প্রত্যেক ভক্তের সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা কাহার অনুকরণীয় হইবে? তাঁহার তুলনা তিনি। কি এক অত্যুচ্চ মহিমান্বিত ভাবের আবেশে তিনি কাজ করিয়া যাইতেন তাহা আমাদের কোন কালে বুঝিবার সামর্থ্য হইবে কি না সন্দেহ। তাঁহার নিজের কথা—"এ রকম কোথায় পাবে? আমার মত একটি বের কর দেখি? কি জান, যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে তাদের মন খুব সূক্ষ্মশুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে কি না, তাই আসক্তির মত মনে হয়।" তিনি গৃহ-হীন গৃহী, ব্যক্তিত্ববিহীন ব্যক্তি এবং ঐহিক আত্মীয়পরিবৃতা হইয়াও জগদাত্মীয়-স্বরূপা ছিলেন।

ব্যক্তিত্বের দিক দিয়া কেহ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে যাইলেই তিনি সঙ্কুচিতা হইয়াছেন, কিন্তু ভক্ত যখনই তাঁহার আবরণে সেই মহামায়া বা আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়াছেন, তখনই হাস্যবদনে তিনি সেই পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের উপর জোর দেন নাই বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবেও না। তিনি তাঁহার আত্মীয়া কাহাকে কাহাকে বলিয়াছেন, "আমাকে তোমার পিসিমা মনে করো না। আমি মনে করলে এক্ষুণি এ দেহ ছেড়ে দিতে পারি!" তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অহংটিকে অর্থাৎ আমি অমুকের কন্যা অমুকের পত্নী—(তিনি ঠাকুরকে আমাদের মতই ঠাকুর বলিতেন)—অমুক দেশে আমার বাড়ী এইরূপ ভাবগুলিকে চিরকালের জন্য তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে রাধুর পিসিমা জ্ঞানে যাঁহারা পূজা করিতে যাইতেন, তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন এবং সে পূজা কখনও গ্রহণ করিতেন না। এক বিরাট ভাবজগতে সদা সর্ব্বদা নিমগ্না থাকিয়া তিনি আমাদের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, যথা—সন্ন্যাস গার্হস্থ্য প্রব্রজ্যাগুলিকে তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ বলিয়া দেখিতেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন এসবেরই এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রনকেন্দ্র ছিল।

সেই ভাবরাশির স্রোতে কেহই স্থির থাকিতে পারেন নাই। কেহ তাঁহাকে দেখিয়া—মা তুমি আমার ভার নাও বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বা দীক্ষার পর সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। কাহারও দীক্ষার পর নেশার মত অবস্থা হইয়াছে। বহু ভক্তকে দেখিয়াছি কম্পমান দেহে অজস্র অশ্রুবর্ষণে মায়ের নিকট মনের বেদনা জানাইতেছেন। ভক্তবীর মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পদতলে মস্তক রক্ষা করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিতেন এবং তাঁহার সেই বালকের মত নয়নাশ্রু দেখিয়া অনেকে কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী কোন গৃহস্থ ভক্তকে বলিতেছেন "তুমি যাঁর কৃপা পেয়েছ আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক শক্তির বহু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেবত্বের পরিচায়ক নহে। উহা অসুরদিগেরও থাকিতে পারে। রাক্ষসরাজ রাবণ অনেক রকম মূর্ত্তি ধরিতে বা অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে পারিত, কিন্তু তাই বলিয়া ভগবান জ্ঞানে তাহাকে কেহ পূজা করিবে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে 'মার' বা পাপ পুরুষের বহু অলৌকিক ক্রিয়াদির উল্লেখ আছে, কিন্তু সে বুদ্ধদেবের ঠিক বিপরীতই ছিল। প্রাচীন ভারতে এক প্রকার নাগ ছিল তাহারা নাকি মনুষ্যরূপ ধরিতে পারিত। কিন্তু তাহারা নাগ বা ভীষণ সর্প ছাড়া আর কিছু নহে।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ধ্বংসে নহে—গঠনে, মৃত্যুতে নহে—অমরত্বে। এই অমরত্বের বিকাশ ভালবাসায়। যে ভালবাসায়, যে প্রেমে যমুনা উজান বহিত, গোপবালা আত্মহারা হইয়া শ্রীভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতেন। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। ভালবাসার কার্য্য দেখিয়া কে না বলিবে তাহার শক্তি অনন্ত? শ্রীশ্রীমা আসিয়াছিলেন এই ভালবাসার অফুরন্ত শক্তি লইয়া। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক শক্তি ছিল দূর হইতে আগত ব্যাকুল ভক্তকে সমস্ত প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত করিয়া তাঁহার চরণতলে আনয়ন। দেখা গিয়াছে ভক্তটি অবাধে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, প্রহরী ও রক্ষীর দল তখন কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। আর একটী অদ্ভুত ব্যাপার হইত যে প্রত্যেক ভক্তই মনে করিতেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকেই ভালবাসেন। বাঙ্গলার নগণ্য দীনতম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব পল্লী গ্রামের আত্মীয় অনাত্মীয় সর্ব্বভূতের প্রতি অদ্ভুত সহানুভূতিসম্পন্না এ ব্রাহ্মণতনয়া কোথা হইতে আসিলেন?

শ্রীশ্রীমাকে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কার্য্যকরী শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকের মতি-গতি ফিরাইবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনেক কিছু কথাচ্ছলে বলিয়া জ্ঞান বা আলো দান করিতে হইয়াছে কিন্তু শ্রীশ্রীমা বেশী কথার ধার দিয়া যান নাই। ভক্তকে তিনি বলিতেছেন "মার কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যান জপের কি দরকার? আমিই যে তোমাদের জন্য সব করছি। এখন খাও দাও নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ কর।" কিম্বা "তোমরা ঠাকুরকে ডাক, তিনি সব করবেন।" এই ছিল তাঁর মোটামুটি উপদেশ। যিনি তাঁহার কখনও ভক্ত হন নাই তাঁহাকেও তিনি টানিয়া আপন করিয়া লইতেছেন। একদিন শীতের সন্ধ্যার পর 'উদ্বোধনে'র পাচক উড়িয়া ব্রাহ্মণ বলিল, "মা, কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান্ করে আসি।" মা বলিলেন "এত রাত্রে স্নান করো না।" সে উত্তর দিলে "তাতে কি কোরে হবে?" মা বলিলেন "তবে গঙ্গাজল নাও।" ইহাতেও তার মন উঠিল না, তখন মা বলিলেন "তবে আমাকে স্পর্শ কর।" তখন তাহার চৈতন্য হইল। মায়ের চৈতন্যময়ী তড়িৎস্পর্শে তাহার মনের কালিমা দূরীভূত হইল। শুনিয়াছি শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও নিদ্রাগত হইতেন না, যোগনিদ্রায় মগ্ন হইতেন মাত্র। আমরা যত দূর দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমাও কখন নিদ্রাগত হন নাই, যোগনিদ্রায় থাকিতেন মাত্র এবং ঐ সময় ভক্তদের জন্য যাহা কিছু করিবার করিতেন।

যে কারণ জীবের উৎপত্তির মূল, জীব সেই কারণের সমীপবর্ত্তী হইলেই তাহার মূল বিনষ্ট হইবে। আত্মাশক্তির দর্শনমাত্রেই ভববন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। তাঁহার সমীপে আসিয়া কাচ-কাঞ্চন হইয়াছে, লৌহ সুবর্ণে পরিণত এবং জীবের সর্ব্ববন্ধন ও উৎপত্তির মূল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই আজ শ্রীশ্রীমা জগৎ-পূজিতা জগজ্জননী এবং ভক্তদের ধ্যানের বস্তু হইয়াছেন।

মনে হয় তিনি প্রকৃতির পরিপূর্ণ শক্তি, চির-অবগুণ্ঠনবতী চির রহস্যময়ী। সৃষ্টিপ্রাক্কাল হইতেই আপনাকে অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন,

তাই বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে সকলেরই সমক্ষে অবগুণ্ঠনাবৃতা থাকিতেন। গৃহস্থেরা ত তাঁহার সৃষ্টিছাড়া নহেন, এজন্য তাঁহাদের প্রতি অসীম দয়া ও ভালবাসায় তিনি গৃহস্থেরই আবরণ লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী সন্তান। তিনি তাঁহাকে মানিলেন কি না মানিলেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দুর্ব্বল গৃহস্থকে বল দিবার জন্যই তিনি তাহাদেরই মতন একজন হইয়াছিলেন। গৃহস্থের সর্ব্ববিধ দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়াছিলেন তিনি স্বেচ্ছায়, আর তাহাকে পাপ না বলিয়া বলিতেন তপস্যা। এই আশ্বাসবাণী সংসারীকে কেহ কখন শুনান নাই।

তিনি কে তাহা জানি আর নাই জানি তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তিনি চির অবগুণ্ঠনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখুন, তাঁহার প্রকৃত পরিচয়েরও প্রয়োজন নাই। কেবল জানিলেই হইল তিনি অতি আপনার লোক, আমাদের অতি নিকট আত্মীয়। তাঁহার অপরিমেয় শক্তির পরিমাপ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া শুধু তাহার কণামাত্রই যে আমাদের দুঃখ দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট, সেই জ্ঞান থাকিলেই চলিবে। বোধ হয় জগজ্জননী এমন করুণাময়ীর আকারে আর কখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অবয়বের পূজা তিনি কখনও চান নাই। তিনি সেই নিত্য লীলাময়ী জগন্মাতা রূপেই পূজা গ্রহণ করিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। অবশ্য ভক্ত তাঁহার অবয়বের পূজা ত্যাগ করিবেন না, যিনি যেখানে যে ভাবে যে রূপেই হউক বিশ্বজননীর পূজা করিবেন, তিনি তাঁহারই পূজা করিয়া তাঁহার অসীম স্নেহভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অভিনব জীবনালোক শুধু যে পথপ্রদর্শক আলোকরশ্মির ন্যায় সংসার-সমুদ্রে জীবনতরণীকে পথ প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে তাহা নহে, তাহার স্মরণমননের তড়িৎ-স্পর্শে তাহাকে দুর্গতি হইতে সুগতিতে পরিচালিত করিবে। তাঁহার করুণায় আধ্যাত্মিকতা এক দিন বিজ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠতম দাম বলিয়া গণ্য হইবে।

হে মানব, ভক্তি-অবনত চিত্তে চিন্তা কর, প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে তিনি কে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের মত মানুষের মন তিনিও যে কাদার তালের মত নিত্য নূতন ছাঁচে গড়িতেন ইহা ভক্তেরা নিজ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, অথচ তিনি নিজেকে কখনও প্রচার করেন নাই। তাঁহার অমোঘ বাণী কখনও নিষ্ফল হয় নাই। তিনি যখনই যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ 'ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনি সমস্ত করিয়া দিবেন।' আর মনে হইত যে শক্তির বলে সেই নির্ভর আসে তাহা তিনি স্বয়ং প্রদান করিবেন। তাঁহার পরিচায়ক তিনি। একটী বাক্য 'মা' 'জননী'—'ত্বং দেবী জননী পরা'। তিনি সর্ব্বভাব-ময়ী। যিনি যে ভাবে দেখিবেন তিনি তাহাই এবং আরও কত কি! তাঁহার প্রসন্নতা লাভই জগতে শান্তি এবং সুখ লাভের হেতু এবং উহা লাভ করিবার মূল মন্ত্র অব্যভিচারী নিষ্ঠা, সরলতা এবং ব্যাকুলতা। তিনি নিত্যা। সাধন ভজন পূজন তাঁহার প্রয়োজন মত তিনি ভক্তকে করাইয়া লইতেন ও লইবেন। পাপ ও পুণ্য তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর ছিল। দেহধারণ ও দেহত্যাগ দুইই ছিল তাঁহার পক্ষে এক বস্তু। হে মানব, এই বার যুগোপযোগী ব্যবস্থা হইয়াছে। তৃষ্ণার্ত্তকে আর যাইতে হইবে না, জলই তাহার নিকটে আসিবে। আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়া বরাভয়-হস্তে মহাকরুণাময়ী তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান। হে অমৃতের সন্তান, মা যে অমৃতকলস লইয়া তোমার যুগযুগান্তরের দুঃখরাশি দূর করিবার জন্য ও তোমার মনের আবিলতা মুছাইবার জন্য সমাগতা, এইবার তোমার প্রাপ্য বুঝিয়া লও।

পথিক

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ওগো পথিক,
তাকাও বারেক মোর পানে।
শুধু একটি কথা
শুধাবো তোমায়।
চলেছো কোথায়
উদাস নয়নে চেয়ে?
যে পথ ধরিয়া
এসেছো হেথায়
কেহ নাহি যায়
সেই পথ দিয়ে।
সঙ্গী তব নাহি আছে কেহ,
ছাড়ি নিজ গেহ
চলেছো কোথায়?
বল গো পথিক,
কেবা তোমা দেখাইল
নিরজন পথ?
কোন আশে গৃহ ছাড়ি
আসিলে এখানে?
কোন প্রাণে
একাকী চলেছো আজ
এই পথ ধরি?
* * *
পূর্বাকাশ আলো করি
নিত্য ওঠে রবি
সে রঙীন ছবি
রোজ হেরি চোখে।
ওগো পথিক,
তুমি বুঝি আরো কিছু হের
সে ছবির অলখে?
হিমগিরি কোল হ'তে
লভিয়া জনম
স্রোতস্বিনী ছুটে চলে—
সাগরের পানে।
বুকে ল'য়ে ধরিত্রীর
যত আবর্জ্জনা—

ওগো পথিক, তুমি কি জানো না
কী আবেগে ধায় নদী
সাগরের দিকে?
তবে কেন তুমি
চেয়ে রহ দূরে
আরো দূরে—
সাগর যেথায় মেশে
অজানার দেশে?
পাখী গায় গান,
মধু ঢালে কানে।
ওগো পথিক, তুমি বুঝি
সে সুর ধরিয়া—
যাও গো উড়িয়া
সেই দেশে?
যেথা হ'তে ভেসে আসে
সে মধুর সুর
পাখীর ঐ কণ্ঠস্বরে?
সব রূপ এক হ'য়ে
মিশেছে যেথায়,
তুমি বুঝি চলেছো সেথায়?
তাই গোলাপের রূপ হেরি
ফিরে না তাকাও?
তুমি বুঝি কথা কও
ঘুমন্ত শিশুর সাথে
নীরব ভাষায়?
* * *
ওগো পথিক যাও চলে
দাঁড়ায়ো না আর—
শুধু মিনতি আমার
রেখে যেও পদরেখা তব
আমার লাগিয়া।
সে রেখা ধরিয়া—
যাব চলে অজানার দেশে
ডাক তুমি দিবে যবে
দিবসের শেষে।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং। মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া ১০।৭।১৭

কল্যাণীয় সুধীরকুমার,

তোমার পত্র যথা-সময়ে পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি। এখন পাঠ্যজীবন—খুব মনোযোগের সহিত লেখাপড়াই বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। জীবনে ধর্ম্মোপলব্ধি করিবার জন্য তোমার বিশেষ প্রয়াস করিতে হইবে না। যুগাবতার পরমকারুণিক কলি-কলুষনাশক শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ ভক্তদের কৃপা ও ভালবাসা পাইয়াছ। তোমার ধর্ম্মলাভের পথ সহজ হইয়া আছে। এখন বিদ্যাভ্যাস কর। পরে সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। স্বামীজির বিদ্যাভ্যাসের উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তিনি মূর্খতার প্রশ্রয় কখনই দেন নাই এবং আমরাও পারতপক্ষে উহা কখনই দিব না। শ্রীভগবানের কৃপালাভ তাঁর ইচ্ছা না হইলে হয় না, কিন্তু তুমি যখন ভাগ্যক্রমে আমাদের সংশ্রবে আসিয়াছ, তোমার কল্যাণই হইবে।

প্রেমানন্দ স্বামীর ব্যারাম গত ২৬।২৭।২৮ জুন তিন দিন ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়াছিল; এমন কি জীবনের আশা ছিল না। মেডিকেল কলেজের বড় চিকিৎসক Dr. Calvert তিন দিন দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁর চিকিৎসায় সেই ভয়ানক বৃদ্ধিটা কমিয়া যায় এবং পুনরায় জীবনের আশা হয়। এখন প্রভুর কৃপায় তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে আসিতেছেন। দুর্ব্বলতা এখনও খুব, পাশ ফিরিয়ে দিতে হয় এবং শুয়ে শুয়েই সমস্ত কাজ চলিতেছে। কথাবার্ত্তা বলিতে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন, এখন অল্প অল্প কহিতেছেন অতি কষ্টে। যা হোক, প্রভু দয়া করিয়া তাঁকে এ যাত্রা রক্ষা করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই এই ভয়ানক poison তিনি এনেছিলেন। অবশ্য সবই প্রভুর ইচ্ছা, কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় তাঁর ও অঞ্চলে যাওয়া আর হইবে কি না তাহা প্রভুই জানেন।

তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া ৫।১০।১৭

প্রিয় সুধীর,

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আশা করি এত দিনে আরোগ্য লাভ করিয়াছ। পেটটা যাতে গরম না হয় এরূপ আহার করিবে, পেট গরম হওয়া ইন্দ্রিয়প্রাবল্যের প্রধান কারণ; তার পর কুচিন্তা অর্থাৎ sexual thoughts—ইহা দ্বিতীয় কারণ। চিন্তা পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য, তার উপায় কেবল প্রার্থনা এবং পাঠে মনকে নিবিষ্ট রাখা। এখন পাঠ্যজীবন—পাঠে মনোনিবেশ রাখিলে কুচিন্তার অবসর পাবে না। তার পর প্রভুর স্মরণ মনন ও প্রার্থনা এবং সৎসঙ্গ। বাবুরাম মহারাজ

কলিকাতায় রহিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁর দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া যাইবে।

মনের ভাব তাঁর কাছে সব ব্যক্ত করিবে, তাহা হইলে কুচিন্তা কুভাব সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

মঠে প্রতিমা আনা সম্বন্ধে এখনও স্থির হয় নাই। মহারাজ লিখিয়াছেন, "তোমরা যে রূপ ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিবে।" শ্রীশ্রীমার পত্র এখনও পাওয়া যায় নাই। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় প্রতিমা হইবে না, এখন প্রভুর ইচ্ছা। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও স্নেহপ্রীতি জানিবে।

প্রভু তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

কোরানে শয়তানের রূপ ও সদসদ্-বিচার

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ

কোরানে শয়তান্ ও ইব্লীস্ অনেকটা একার্থবোধক। ইহারা অসৎ প্রবৃত্তির স্রষ্টা জিন্ন্ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ব্যাখ্যাত। জিন্ন্ এর শব্দগত অর্থ—যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মানুষকে অসৎপথে চালিত করে। জিন্ন্ অর্থে সাধারণতঃ ভূত-প্রেত ইত্যাদি সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট জীব অনুমিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোরানে ইহা কেবল এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই—অসৎ পথে প্ররোচক মানুষের উদ্দেশেও (৭২,১) ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এক কথায় ইহাকে অসৎপ্রবৃত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শয়তানের শব্দগত অর্থ শত্রু বা বিদ্রোহী; অর্থাৎ যে শুদ্ধাত্মাকে বিপথে চালিত করিতে যত্নবান হয়, এবং সেইজন্য তাঁহার শত্রু বা বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হয়। ইব্লীস্ 'বলস' শব্দ হইতে উদ্ভূত, এবং ইহার শব্দগত অর্থ 'নৈরাশ্যপোষণকারী'।

মানবজন্মের রহস্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে কোরানে বর্ণিত হইয়াছে—যখন ভগবান্ আদমকে সৃষ্টি করিলেন, তখন ভগদিচ্ছানুযায়ী সকল দেবদূতই তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন; কিন্তু ইব্লীস্ ইহা হইতে বিরত রহিল। ইহাতে সে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইল এবং তাহার প্রতি অবস্থান্তরপ্রাপ্তির আদেশ দেওয়ার মুহূর্ত্তে সে সময়ভিক্ষা চাহিলে, ভগবান শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে সময় দিলেন। তারপর সে তাহার শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইবে (৭, ১৩)। কোরানের মতে মানুষ মৃত্তিকা হইতে ও ইব্লীস্ অগ্নি হইতে সৃষ্ট। কোরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৩৪-৩৬) ইব্লীস্ ও শয়তানের পার্থক্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যখন কোন অসদাচার তাহার নিজের প্রতিই সীমাবদ্ধ তখন সে ইব্লীস্ এবং তাহার অসদাচার অন্যকে বিপথগামী করিলে সে শয়তান। ইব্লীস্ অনেকটা উদ্ধত ও অহঙ্কৃত প্রকৃতির রূপক। সেইজন্য সে অগ্নি হইতে সৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত। শয়তান

শব্দ প্রতারক ও অসৎপথে প্ররোচক অর্থে ব্যবহৃত। কোরানের শেষ অধ্যায়ে শয়তানকে খন্নাস্ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। কোরানের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার অল্-বৈজাবী খন্নাস্ শব্দের অর্থ—যে মানুষকে সৎ চিন্তা হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কোরানের মতে আদমের পৃথিবীতে পতন মানবসৃষ্টির সূচনা। মানবসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ভগবৎপ্রকাশ। কিন্তু সত্তের প্রতীক দেবদূতগণ তাঁহার এই প্রকাশে কোন সাহায্য করিতে পারিলেন না। তৎপর ভগবান্ আদমকে সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট করিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে সস্ত্রীক স্বর্গীয় উদ্যানে বাসের অনুমতি দান করিলেন। আদমকে ভগবান কামনা-বাসনার প্রতীক নির্দ্দিষ্ট একটি বৃক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু শয়তান্ তাঁহাদের উভয়কে তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়া কামনাবাসনার দিকে আকৃষ্ট করিল। ইহার পরিণামে আদমের পার্থিব জীবনপ্রাপ্তি। আদম তখন তাঁহার অবস্থান্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান তাঁহাকে আদেশ করিলেন "এই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে তোমাদের সকলের পতন হইল। আবার আমাকর্ত্তৃক তোমাদের নিকট সৎপথপ্রদর্শনকারী প্রেরিত হইবে। তখন যাহারা আমার আদেশানুযায়ী চালিত হইবে, তাহাদের ভয়ের বা দুঃখের কোন কারণ থাকিবে না; কিন্তু যাহারা আমার আদেশসমূহ অবিশ্বাস করিবে, তাহারা নরকগামী হইয়া দুঃখভোগ করিতে থাকিবে" (২, ৩৮-৩৯)।

ভগবান্ যখন ইব্লীস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার আদেশ সত্ত্বেও তুমি কি কারণে আদমের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন হইতে বিরত রহিলে?" উত্তরে সে বলিল, "আমি তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি অগ্নি হইতে সৃষ্ট, আদম মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত।" কিন্তু এই উদ্ধত প্রকৃতির কোন ক্ষমা নাই। ভগবৎসৃষ্ট জীবের স্রষ্টার আদেশ অমান্য করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। তদ্ভিন্ন যদিও আদম মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত তথাপি তাঁহাকে ভগবানের নিজস্ব শক্তি দ্বারা দৈবসত্তায় উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে এবং দেবদূতগণ হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। এই কারণে শয়তান্ ভগবদ্-ভক্তের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইল। ভগবৎশাস্তির প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "যখন তুমি আমাকে নৈরাশ্য দান করিয়াছ, আমি তোমার সরল পথে ধাবিত সকল লোককে বাধা দান করিব। আমি তাঁহাদিগকে সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম, সকল দিক হইতে বাধা দান করিতে যত্নবান্ হইব। তুমি তাহাদের অনেককেই তোমার প্রতি অনাকৃষ্ট দেখিতে পাইবে।" ভগবান্ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "এখান হইতে পশ্চাদপসরণ কর। যে কেহ তোমার অনুসরণ করিবে, আমি তাহাদের সকলকে নরকগামী করিব" (৭,১৭-১৮)।

বস্তুতঃ মানবের প্রকৃষ্ট সত্তা ভগবৎ-সত্তা হইতেই উদ্ভূত। যখনই কোন জীব কামনা-বাসনায় জড়িত হইয়া পড়ে, তখনই তাহার মানবজন্ম লাভ হয়। মানব-জন্মের পর যদি আবার সে পয়গম্বর বা ভগবদ্-বাণী বহনকারীদের আদেশানুযায়ী চালিত হইতে পারে, তাহা হইলে সে আবার অন্তিমে তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। যখনই কেহ শয়তান্ বা অসৎ প্রবৃত্তির প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, তখনই শেষ বিচারের দিন তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ হইবে, তখনই সেই শুদ্ধাত্মা তাহার সহিত মিলিত হইবেন। শয়তান্ আর তাহার কোন অনিষ্ট-

সাধন করিতে পারিবে না। মানবের ভগবৎসত্তা প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসৎ-প্রবৃত্তি-সমূহ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

মানবজীবন ভালমন্দের সমাবেশ। দেবদূত সতের প্রতীক ও শয়তান্ অসতের প্রতীক। এই দুই বিরুদ্ধ ভাব বা গুণের একত্র সমাবেশ না হইলে কোন কিছুরই প্রকাশ হইতে পারে না। ভগবান্ আদিতে পরমগুণসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরম সত্তা প্রকাশ করিবার কোন সুযোগই পাইলেন না। তাই আদমকে পরম-গুণসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মধ্যে কামনা-বাসনার বীজও আরোপিত করিয়া দিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানব তাহার কামনা-বাসনা দমন করিয়া প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে ভগবৎ-সত্তা প্রত্যক্ষ বিরাজ করিবে, কিন্তু কামনা-বাসনা অন্তরে প্রাধান্য লাভ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় আনন্দ হইতে দূরে চলিয়া যাইবে।

মানসম্মান, প্রভুত্ব, ধনসম্পত্তি ও কামনা-বাসনা মানবকে ভগবৎ-পথ হইতে দূরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য শুদ্ধাত্মাদের নিকট এই সকল কোন বাধাই নহে বরং এই সকল তাঁহাদিগকে সৎপথে চালিত হইবার সুযোগ দান করে। বস্তুতঃ "ভগবান তোমাদের ভালর জন্যই পৃথিবীর সকল জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন" (২,২৯)। কিন্তু মানব ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কোন দুঃখে পতিত হইলেই একেবারে অস্থির হইয়া পড়ে এবং ভগবদ্-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। বস্তুতঃ যাহারা বিপদে পতিত হইলেই অধৈর্য্য হইয়া যায়, তাহাদের ভগবানে কোন দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

ভালমন্দ আপেক্ষিক; যাহা আমার নিকট ভাল, তাহা অন্যের নিকট মন্দ হইতে পারে। আবার যাহা আর এক জনের নিকট ভাল, তাহা আমার নিকট মন্দ হইতে পারে। কিন্তু ভগবান সকল বস্তুই আমাদের ভালর জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "হইতে পারে যাহা তোমার পক্ষে প্রকৃতই ভাল, তাহা তুমি পছন্দ করিতেছ না; আবার যাহা তোমার পক্ষে খারাপ, তাহাই তুমি ভাল মনে করিতেছ। বস্তুতঃ তুমি যাহা জান না তাহাই ভগবান অবগত আছেন" (২,২১৬)। আপাতদৃষ্টিতে কোরানে বর্ণিত নিমরূদ কর্তৃক ইব্রাহিম্‌কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা দুঃখজনক হইতে পারে; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় এই অগ্নিই ইব্রাহিমের নিকট পরম তৃপ্তিদায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা সকলেই ভগবদিচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইতেছি, সকল সময় তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছি। কিন্তু আমরা ইহা প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কোন কাজে বিরক্তি অনুভব করিতেছি, আবার কোন কাজে আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কোরানে বর্ণিত হইয়াছে, "ইচ্ছা বা অনিচ্ছা-সত্ত্বে আমরা সকলে তাঁহারই সেবা করিতেছি" (৩, ২)। যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহারাই ভাগ্যবান্; আর যাহারা কোন কর্ম্মে আনন্দ পায় না, নিজকে দুঃখ-কষ্টে জড়িত মনে করে, তাহারাও অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাঁহারই সেবা করিতেছে। পরম-সত্যের প্রতীক এক ভগবানই কেবল বিরাজ-মান। যখন আমরা পরম-পুরুষের সত্তা প্রকৃষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহার দিকেই ধাবিত হইতে থাকিব, তখন আমাদের নিকট আপাত-প্রতীয়মান ভাল ও মন্দ, ভালও মন্দরূপে অনুভূত হইবে না—সকলই আমাদের ভালর জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে অনুভূত হইবে—কারণ তিনি পরম-সৎ ও তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও মানুষ

ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্‌-এস্‌সি, পিএইচ্‌-ডি

মানুষের মত কীট-পতঙ্গের ফুস্‌ফুস্‌ নাই—তাহারা নল দিয়া বাতাস গ্রহণ করে। কীট যখন বাড়িতে থাকে, তাহাদের দেহের অনুপাতে এই নলগুলি বড় হয় না। তাহার জন্যই কয়েক ইঞ্চির বেশী বড় পোকামাকড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের বড় পাখাও দেখা যায় না। তাহাদের শরীরের গঠন ও বাতাস গ্রহণ করিবার প্রণালীর জন্যই পোকামাকড় কখনও বড় হয় না। অবয়ব বৃদ্ধির এই নিয়ন্ত্রণের ফলে কীট-পতঙ্গের বিস্তার ক্ষান্ত হইয়া আছে, পৃথিবীব্যাপী প্রসারের সম্ভাবনাও নাই। এই ভাবে কীট-পতঙ্গের বিস্তার যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হইত, মানুষের পৃথিবীতে অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকিত অল্প। কোন দিন সিংহের মত বোলতার সম্মুখীন হইলে মানুষের নিস্তার ছিল না।

বট হইতে লক্ষ লক্ষ বীজ প্রতি বৎসর মাটিতে পড়ে, কিন্তু সারা পৃথিবীময় বটবৃক্ষ ছড়াইয়া পড়ে নাই—লক্ষ লক্ষ বীজ হইতে জন্মায় হয়ত দুই একটি চারা। ফণিমনসায় একদিন সারা অষ্ট্রেলিয়া ভরিয়া গিয়াছিল, আজ তাহারা সেখানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। বহু জলজ উদ্ভিদের জীবনী শক্তি প্রচুর—পদ্মের বীজ দুই শত বৎসর পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও পদ্মগাছের জন্ম দিতে পারে, তবুও পদ্মে পৃথিবীর সমস্ত জলভাগ ভরিয়া যায় নাই। জীবাণুদের বংশ বিস্তারের সহিত পৃথিবীর কোন গতির তুলনা করা যায় না। অনুকূল অবস্থায়, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারা বংশ বিস্তার করিয়া চলে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় এই গতিও ক্ষান্ত হইয়া যায়।

মৎস্যেরা ও কীট-পতঙ্গেরা বাঁচিয়া থাকে প্রাকৃতিক সুযোগের অনুসরণ করিয়া। তাহারা হাজার হাজার ডিম পাড়ে, তাহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি মৃত্যু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। মৃত্যু যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র অরক্ষিত ও অসতর্কদের জন্য লুকাইয়া আছে। এই সর্ব্বব্যাপী মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া মানুষ বাঁচিয়া আছে, সামুদ্রিক শামুকও বাঁচিয়া আছে—কিন্তু মানুষের আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বহু আয়োজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। কে যেন অলক্ষ্যে এইগুলি বরাবর যোগাইয়া চলিয়াছে।

বহুরোগবাহী মাছি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে, শীতপ্রধান দেশে জন্মে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাড়িতে বাড়িতে ম্যালেরিয়ার মশা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মারিয়া ফেলে নাই। মশারা মেরুপ্রদেশেও বহুল। কিছু দিন আগেও প্লেগ ও অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধি হইতে মানুষের নিস্তার ছিল না। জন্তু হিসাবে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় সাধারণ পশুপক্ষীর মধ্যেও দেখা যায়, মানুষের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। কি করিয়া মানুষ বাঁচিয়া আছে তাহাই আশ্চর্য্য!

পৃথিবীর সুদূর অতীত হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রাণীই আধিপত্য করিতে পায় নাই, তা সে যতই হিংস্র, যতই ক্ষিপ্র, যতই বৃহৎ

হউক না কেন। মানুষই কেবল এই নির্ম্মম নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত আপনার চারিদিকের অবস্থার সামঞ্জস্য রাখিয়া। কোন মতবাদ অনুযায়ী মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে চল্লিশ কোটি বৎসর আগে। এই চল্লিশ কোটি বৎসরের মধ্যে বহু যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে ঘটিয়াছে। কে যেন সযত্নে মানুষকে এই বিরাট পরিবর্ত্তনগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে অলক্ষ্যে শিখাইয়া দিয়াছে। বহু প্রাণী চিরদিনের মত পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া, কিন্তু অজ্ঞ মানুষ প্রতিকূল নানা ঘটনার মধ্যে আজও বিজয়ী হইয়া বাঁচিয়া আছে।

বহু দৈহিক কার্য্যপ্রণালীর উপর মানুষ ও অপরাপর জীবজন্তু ও উদ্ভিদ নির্ভরশীল। জীবন-ধারণ ও অস্তিত্বের জন্য ইহাদের একান্ত প্রয়োজন। ভাইটামিনদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ কাহারও সন্দেহ নাই। ইহাদের অভাবে বহু রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। মানুষ বোধ হয় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবনধারণের এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির সহিত পরিচিত ছিল না। লেবুর রস ও নাবিকের স্বাস্থ্য-সম্পর্ক বুঝিতে মানুষের এক শত বৎসর লাগিয়াছে। মানব-শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাসায়নিক কেন্দ্র ইণ্ডোক্রিন গ্রন্থিগুলির কার্য্য বুঝিবার আগে মানুষ লক্ষ লক্ষ বৎসর জীবনযাপন করিয়াছিল। এই গ্রন্থিগুলি মানব-শরীরের বহু প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করে, দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালীকে তাহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির কার্য্যশক্তি প্রচণ্ড, এক লক্ষ কোটি ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ থাকিয়াও তাহারা পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত ও ক্ষান্ত করে—পরস্পরের সহিত সমতা রক্ষা করে। এখন জানা গিয়াছে—যখন এই জটিল রাসায়নিক রস-গুলি সমতা হারায় তখন তাহারা মানবদেহে অতি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি আনে। যদি এই দুর্ঘটনা সাধারণ হইয়া উঠে, সভ্যতার গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে—যদি মানুষ কোন ক্রমে বাঁচিয়া থাকে তবে, সে বাঁচিয়া থাকিবে ঠিক পশুর মতই। এই সকল নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও সমতা-রক্ষণের কথা ভাবিতে গেলে সন্দেহ থাকে না, যে কোন এক অজ্ঞাত শক্তি মানুষকে অগ্রসর করাইয়া লইয়া চলিয়াছে। নির্ম্মম প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ কোন্‌দিন মানুষকে ক্ষান্ত করাইয়া রাখিত, রাখিত তাহাকে সুদূর অতীতের ভ্রমণশীল বনচারী পশু করিয়া। কিংবা হয়ত আকস্মিক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে তাহাকে পৃথিবী হইতে লইতে হইত চিরবিদায়। মানুষের বর্ত্তমান অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলে কোন অদৃশ্য করুণাময় শক্তির কথা মনে আসে না কি ?

"কে এই সৃষ্টি করিতেছেন ? ঈশ্বর। ইংরেজীতে সাধারণতঃ God শব্দে যাহা বুঝায়, আমার অভিপ্রায় তাহা নহে। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের সাধারণ কারণ স্বরূপ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি ? ব্রহ্ম নিত্য, ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ, নিত্য-জাগ্রত, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময়, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, অখণ্ড। তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করেন।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি

উইক্‌হ্যাম ষ্টীড

বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর সমগ্র পৃথিবী পুনর্গঠনের পথে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে? এই বৃহৎ প্রশ্নটির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিহিত আছে। 'ধনতান্ত্রিক' পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্র-শাসন-ব্যবস্থাধীন দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মান কি একনায়ক-শাসিত পূর্ব ইউরোপ-বাসীদের তুলনায় উন্নত রাখা সম্ভব হবে?

আমার নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হলে আমি অর্থ-নৈতিক দিক ছাড়াও এর নৈতিক দিকও বিবেচনা করে দেখব। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠন-কার্য শুরু হয়ে গেছে এবং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জাগরিত হয়েছে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক বিভাগ সম্প্রতি ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর প্রধান অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনগুলি সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করেছেন। বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, গত বৎসরের, শুধু গত বৎসর কেন যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা হল খাদ্য-সরবরাহ বৃদ্ধি। শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে এই কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত এই ছ'বৎসরের গড় বাৎসরিক উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৮ সালের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সলের উৎপাদম শতকরা ৪ ভাগ কম ছিল।

চাউল ও অন্যান্য শস্য পৃথিবীর এক সুবৃহৎ অংশের জনসাধারণের প্রধান খাদ্য। সুতরাং ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা ১৪ ভাগ উৎপাদনবৃদ্ধি বিশেষ আশাপ্রদ এবং নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া গেলে দেখা যেত যে আলু ও অন্যান্য সব্‌জি জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের হারও এর চেয়ে বেশী ত কম হয় নি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সমস্যাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। সমস্যা হল এই যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। স্যার জন বয়েড অর্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতে এইরূপই হচ্ছে। আমার বিশ্বাস এই যে পৃথিবীতে যদি দীর্ঘকালের জন্য শান্তি বিরাজ করে, তাহলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হবে না।

কিন্তু খাদ্য উৎপাদনবৃদ্ধি পেলেই হবে না, তার উপযুক্ত বণ্টন হওয়া চাই। বণ্টনের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্যপ্রসারের জন্য, খাদ্যের মূল্য যোগানর জন্য শ্রমশিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি করতে হবে এবং তার জন্য স্থল, জল ও বিমান-পথে মাল চলাচলের সুবিধা থাকা চাই।

রাষ্ট্র-সংঘের অর্থনৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রমশিল্পের উৎপাদনসংক্রান্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৪৮ সালের উৎপাদন ১৯৩৭ সালের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ এবং ১৯৪৭ সালের তুলনায় শতকরা অন্ততঃ ৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে,

যদিও এই বৃদ্ধির অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৪৭ সালে কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল. তা সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে দূর হয়েছে। কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর থেকে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-উৎপাদনও আরো বৃদ্ধি পাবে।

মার্শাল-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত ইউ-রোপীয় পুনর্গঠন কার্য্যসূচী অনুসরণ করার ফলে পশ্চিম ইউরোপের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে গঠনমূলক কার্যের এরূপ দৃষ্টান্ত অল্পই দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে যে সাহায্য করেছে, তা খুবই মূল্যবান কিন্তু এই সাহায্যের ফলে জনগণের মনে যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে, তার মূল্যও কম নয়। এই সাহায্যের ফলেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের আশংকা দূরীভূত হয়েছে এবং জনসাধারণ অদূর ভবিষ্যতে সুখ ও সমৃদ্ধির আশা করতে পারছে। রাশিয়া ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিও যদি এই সুযোগ গ্রহণ করত তাহলে পৃথিবীর পুনর্গঠন-কার্য আরো দ্রুত অগ্রসর হত।

ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পথে দু একটি ঘটনা বিশেষ বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম জার্মানী থেকে 'লৌহ পর্দার' পূর্বস্থিত দেশগুলিতে রপ্তানির পরিমাণ ১৯৩৮ সালের রপ্তানি-পরিমাণের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পূর্ব থেকে যে সকল দ্রব্য আমদানি করতে চায়, তার মূল্য উপার্জন করতে এবং দিতে হলে এই ফাঁক পূরণ করতেই হবে।

১৯৫২ সালে মার্শাল সাহায্য বন্ধ হলে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল হতে হবে। তা যদি হতে হয়, তাহলে তারা যুদ্ধের পূর্বে অর্থ বা পণ্যের বিনিময়ে পূর্ব থেকে যত দ্রব্য-সামগ্রী খরিদ করত তখনও প্রায় ততই করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, এমন কি রাশিয়া পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আগ্রহান্বিত। অর্থনৈতিক কারণে যে বাণিজ্যের প্রসার হওয়া উচিত রাজনৈতিক কারণে হয়ত তাতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। এই রাজনৈতিক কারণের মূলে একটি বিশেষ 'ধারণা' আছে, পশ্চিম ইউরোপবাসী এবং কয়েকজন রাশিয়ানের মতে যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ধারণাটি হল এই যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অন্তর্নিহিত পাপ সেই দেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস সাধন করবে অথবা সেই নিশ্চিত ধ্বংস এড়াবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই রাশিয়ার কার্য্যনীতি না হোক কম্যুনিষ্ট কার্য্যনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ অর্থনীতিক প্রফেসর ভার্গা বলেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোন অজ্ঞাত কারণে এখনও তাঁর কণ্ঠরোধ করা হয় নি।

যদি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপ আপন কার্যের দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রনিয়ামকদের এই ধারণার অসত্যতা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশেরও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হবে। *

* নিউদিল্লী ব্রিটীশ ইনফরমেশন সার্ভিস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। —উঃ সঃ

মায়ারহস্য

শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী

শ্রুতি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থসমূহকে মায়াকল্পিত, অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়াছেন। মায়ার জন্যই মিথ্যা জ্ঞান হয় বলিয়া মায়া কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি প্রভৃতি নামে অভিহিত।

শ্রুতি "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" বাক্যে মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়াছেন; সুতরাং "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" বলিয়া মায়ার ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাও নাই।

যদিও ব্রহ্ম ও মায়া অনন্য, তথাপি ব্রহ্মে কিন্তু মায়া নাই—ব্রহ্ম মায়াতীত। কারণ, শ্রুতি মায়াকল্পিত পদার্থসমূহকে "বাচারম্ভণং"—বাক্যের আড়ম্বর অর্থাৎ কেবল কথা বা নামমাত্র বলিয়াছেন; সুতরাং কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতি নামরূপ যেমন সুবর্ণে থাকিয়াও সুবর্ণের সুবর্ণত্বের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না, মায়াও তদ্রূপ নিত্যকাল ব্রহ্মে থাকিয়াও ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না—ব্রহ্মের কূটস্থ অবস্থার অল্প মাত্রও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। তাই শ্রুতি "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" বলিয়াছেন।

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি যখন মায়াশক্তির কার্য্যকেই "কেবল কথা বা নামমাত্র" বলিয়াছেন, তখন আর কুণ্ডল, বলয় প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এস্থলে সাধু নহে; কারণ, মায়া ত আছেই। সুতরাং তদুত্তর এই যে, শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়; কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বা পরে শক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় না; যেমন তরঙ্গরহিত হইলে সাগরে তরঙ্গসৃষ্টির শক্তিকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কার্য্যকালেই হউক আর তৎপূর্ব্বে বা পরেই হউক, মায়া কোনও কালে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই শ্রুতি ব্রহ্মকে অজ্ঞান তিমিরের অতীত বলিয়াছেন।

যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকে না, কেবল মধ্যেই জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই ত মিথ্যা, এবং তাহাকেই ত কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, মায়া প্রভৃতি বলে। অতএব মায়ার জন্যই মিথ্যাবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বলিয়া মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। তাই ভগবান বলিয়াছেন, "যাহার আদি ও অন্ত অব্যক্ত, তাহার মধ্যও অব্যক্ত। তবে যে মধ্যাবস্থা ব্যক্ত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক; অতএব হে ভারত, মিথ্যা-বিষয়ের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া শোক কর কেন?"

মায়ার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, "ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা"—যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় তাহাই মায়া। বাস্তবিক যাহা অজ্ঞানাবস্থায় বস্তুর ন্যায় সাবয়ব ও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানাবস্থায় আর থাকে না, তাহাকে কি প্রকারে নির্ব্বচন করা যাইবে? অতএব বেদান্তসার বলিয়াছেন, "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি"—অজ্ঞান সদসৎ হইতে ভিন্ন, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানের বিরোধী এবং যৎকিঞ্চিৎ ভাবরূপী অনির্ব্বচনীয় কোন কিছু। অজ্ঞান অর্থে কিন্তু "জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান" অর্থাৎ জ্ঞানাভাব নহে। কারণ,

জ্ঞানাভাবের সম্ভাবনা কোন কালেই নাই। সুষুপ্তিতেও জ্ঞানাভাব হয় না—তাই সুষুপ্তির অজ্ঞান আমরা দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিতে পারি। পূর্ব্বে যে মিথ্যা জ্ঞানকে মায়া বলা হইয়াছে, উহা সেই মিথ্যা জ্ঞান। জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান মিথ্যাবিষয়ক। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে। একটী ব্রহ্মের একাংশ আবৃত করে; অপরটী সেই স্থানে জাগতিক পদার্থসমূহের নামরূপ কল্পনা করিয়া জ্ঞানকে তদাকারাকারিত করে।

শ্রুতির "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—ব্রহ্ম স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন, এবং "অহমবিক্রিয়ঃ"—ব্রহ্ম বিকাররহিত এই দুই বাক্যে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বিবর্ত্তবাদই শ্রুতির অনুমোদিত। কারণ, কার্য্য দুই প্রকার—বিকার্য্য ও বিবর্ত্ত। কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া যে কার্য্য জন্মায়, সেই কার্য্যের নাম বিকার্য্য এবং স্বরূপচ্যুত না হইয়া যে কার্য্য উৎপন্ন করে, সেই কার্য্যের নাম বিবর্ত্ত—"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, এবং সমুদ্র তরঙ্গ হয়, তাহা বিবর্ত্ত। অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম যখন স্বয়ং এই জগৎ হইয়াও বিকারগ্রস্ত হন না—তাঁহার কূটস্থ অবস্থার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না, তখন অবশ্য শ্রুতিমতে ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। শ্রুতিতে আছে, এই জগতের নামরূপ আমি প্রপঞ্চিত করি, সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত যে ঈশ্বরশক্তি, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশিত হইয়া নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়। শ্রুতিমতে সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে বিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। তরঙ্গ সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তবে যে উহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ নামরূপ। নামরূপই ঐ পার্থক্য রচনা করিয়াছে। অতএব যাহাতে "কেবল নামরূপ" ছাড়া পদার্থতঃ আর কিছুই সৃষ্ট হয় না, সেইরূপ বিবর্ত্ত কার্য্যই শ্রুতিসম্মত, কিন্তু নামরূপের ভ্রম হওয়া রূপ বিবর্ত্ত কার্য্য নহে। সেইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "তন্নাম-রূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত"—তাহা (জগৎ) কেবল নামরূপের দ্বারাই ব্যক্ত করিলেন। অতএব, নামরূপই মায়া। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার জ্ঞানযোগে বলিয়াছেন—"এই নামরূপকেই মায়া বলে", "এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য।" তবে উহাকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যকালে সুস্পষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইলেও তৎপূর্ব্বে বা পরে উহা যখন আর থাকে না, অথবা উপাদান হইতে উহার যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই, তখন উহা কার্য্যকালে জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় আত্যন্তিক মিথ্যা না হইলেও ব্রহ্মপদের ন্যায় তাত্ত্বিক অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে; সুতরাং উক্ত নামরূপ মিথ্যা বলিয়া, নামরূপ বা মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা যায়। মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান বলিবার আরও বিশেষ সার্থকতা এই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইলেও জীবগণ সে জ্ঞান মিথ্যা-বিষয়ক জানিয়া তৎসম্বন্ধে প্রামাণ্য বুদ্ধি-রহিত হওয়ায় আর উহার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ 'জ্ঞানযোগে' বলিয়াছেন, "আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না।

এই নামরূপকেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া এক জনকে আর এক জন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। রূপের অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে।" অতএব মিথ্যাজ্ঞান অর্থে "যাহা নাই তাহারই জ্ঞান হইতেছে" নহে; পরন্তু যাহার জ্ঞান হইতেছে তাহা মিথ্যা। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় 'দেববাণী'তে বলিয়াছেন, "মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।" এস্থলে আরও একটী বক্তব্য এই যে, যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করকে বিজ্ঞানবাদী স্থির করিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেন তাঁহাদের আচার্য্যকৃত বেদান্তের "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই সূত্রের ভাষ্যমর্ম্ম বিশেষ প্রণিধান-সহকারে অবগত হইতে অনুরোধ করি। কারণ, আচার্য্য শঙ্কর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে 'ন খল্বভাবো বাহ্যস্যার্থস্যাধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি"—বাহ্যবস্তুর অভাব অবধারণ করিতে পারা যায় না, কারণ, তাহার উপলব্ধি হয়—বাহিরে স্তম্ভ দেখিয়া তবে স্তম্ভের জ্ঞান হয়। ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি অগ্রে বাহিরে দেখিলে তবে তাহাদের জ্ঞান হয়, এই বাক্যে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। তিনি আরও ঐ সূত্রের ভাষ্যেই বিজ্ঞানবাদীর "নন্ব নাহমেবং ব্রবীমি ন কঞ্চিদর্থমুপলভ ইতি, কিন্তূপলব্ধিব্যতিরিক্তং নোপলভ ইতি ব্রবীমি" কিছু অনুভব করি না এরূপ কথা আমরা বলি না; কিছু অনুভব করি সত্য, কিন্তু অনুভূতিব্যতিরিক্ত অন্য বাহ্যার্থ কিছুই অনুভব করি না, এই বাক্যের প্রতি-শাসন বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন, "বাঢ়মেবং ব্রবীষি নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি"—তোমাদের মুখের অঙ্কুশ নাই, তাই তোমরা ঐরূপ বল। যদি উপযুক্ত অঙ্কুশ থাকিত, তাহা হইলে আর ঐরূপ বলিতে না। এতদ্ভিন্ন তিনি বেদান্তের "মায়ামাত্রন্তু" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে "মায়াময্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থ-গন্ধোঽপ্যস্তি"—স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী, তাহাতে সত্যের নামগন্ধও নাই, এইরূপ বলিয়া সর্ব্বশেষ "তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্"—অতএব স্বপ্নদর্শন মায়ামাত্র, বলিয়াছেন। সুতরাং মায়াসম্বন্ধে কথিত মতই আচার্য্য শঙ্করের অনুমোদিত। তবে যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য-ভূমিকায় "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ" এই বাক্যে মায়াকে মিথ্যাজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য—মায়া পরমার্থতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় জ্ঞানের বিষয় হইতেছে বলিয়া উহার মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য।

বাস্তবিক নামরূপের ব্যাকরণ অর্থাৎ বিকাশই সৃষ্টি। কিন্তু নামরূপের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই; উহা কোন সদধিষ্ঠানে আশ্রিত না হইলে স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে কখনও প্রকাশ করিতে পারে না। তাই জগতের যে সত্তা, প্রকাশ-মানতা ও প্রিয়তার জ্ঞান হয়, তাহা ব্রহ্মের রূপ এবং নামরূপ মায়ার কার্য্য—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শ্রুতিও এই জন্যই ব্রহ্মকে "সত্যস্য সত্যম্" বলিয়া "নামরূপে সত্যম্" বাক্যে আপেক্ষিক ভাবে জগৎকে সত্য বলিয়াছেন—ব্রহ্মের সহিত তুলনায় অলীকমাত্র।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের কার্য্যকে মায়া ও অবিদ্যা বলে। মায়া শব্দের অর্থ—

যাহা দ্বারা মাপ হয়; এবং অবিদ্যা শব্দের অর্থ—বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞান। নামরূপের দ্বারাই সকল বস্তুর মাপ হয়; যাহার কোন নামরূপ নাই, তাহার মাপও হয় না—তাহা অমেয়। তাই নামরূপকেই মায়া বলে। মায়া অনাদি এবং অনন্ত; কারণ, জীবভাব অনাদি এবং জীবও অনন্ত। মায়া সমষ্টির অর্থাৎ ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী থাকিয়া জীবের ভোগ ও মোক্ষার্থ নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টি করে। আবার নামরূপের স্বতন্ত্র সত্তাও নাই এবং নামরূপ অন্তর্হিত হইলে নামরূপ সৃষ্টির কোন শক্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব মায়াকে সৎ ও অসৎরূপে নিরূপণ করিতে পারা যায় না বলিয়া মায়া অনির্ব্বাচ্য হইলেও, পারমার্থিক সত্যের তুলনায় মিথ্যাই। অবিদ্যাও অনাদি; তবে ইহার অন্ত আছে—বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হইলে অবিদ্যা আর থাকে না। ব্যষ্টিজীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী থাকিয়া, জগৎ মিথ্যা হইলেও ইহাকেই সত্য জ্ঞান করে; এবং স্বয়ং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ব্রহ্ম হইয়াও নিজেকে তদ্বিপরীত জ্ঞান করিয়া শোকভাক্ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মায়া অনাদি ও অনন্ত। তথাপি জগতের যখন নিরপেক্ষ সত্তা নাই, তখন অবশ্য প্রকৃত সত্যের বিবেকদৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যাই। সুতরাং যে অবিদ্যা কর্ত্তৃক উক্ত বিবেকদৃষ্টি আবৃত রহিয়াছে, সেই অবিদ্যারই অভাব হয় এবং তাহাই পরমপুরুষার্থ; কিন্তু উহাতে জগতের অভাব হয় না; যে হেতু, জগৎ সমষ্টিগত।

তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

"নিবৃত্ত এব যস্মাৎ তে তৎ সত্যত্বমতিগতা।
ঈদৃঙ্ নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্॥"

তোমার তাহাতে (ঘটে) যে সত্যত্বজ্ঞান নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি বলা যায়; এইরূপ নিবৃত্তিই জ্ঞানজন্য হইয়া থাকে, ঘট-জ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি মৃত্তিকা-জ্ঞানজন্য নহে। আচার্য্য শঙ্করও জীবগত অবিদ্যার কার্য্যকেই "অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ"—যে যাহা নহে, তাহাকে সেইরূপ জ্ঞান করা বলিয়াছেন; নতুবা সমষ্টিগত মায়ার কার্য্যকে তিনি—"সত এব দ্বৈতভেদেন অন্যথা গৃহ্যমাণত্বাৎ নাসত্ত্বং কস্যচিৎ ক্বচিদিতি"—সৎপদার্থ ব্রহ্মই বিবিধ দ্বৈতাকারে অন্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে, সুতরাং কখনও কোন পদার্থ অসৎ নহে" বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও "আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী" এই বাক্যে নিজেকে মায়াবাদী বলিয়াছেন; এবং তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও কথিত বিবর্ত্তবাদরূপ মায়াবাদেরই সমর্থক ছিলেন। যথা—

"মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্‌রূপ হন কৃষ্ণ তবু অবিকার॥
"জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয়॥"

আর এই মর্ম্মেই "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই অর্দ্ধ শ্লোকে কোটি গ্রন্থের সার বলা হইয়াছে। অতএব, প্রস্তাবিত বিবর্ত্তবাদরূপ মায়াবাদ বা অনির্ব্বাচ্যবাদই অদ্বয়শ্রুতির মায়াবাদ-রহস্য।

বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানবমনীষার উদ্যম *

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

মানুষের অনুভূতিতে যাহা কিছু ধরা দেয় সেই সংবাদকে সম্বল করে মানুষ পেতে চায় এই লীলাময় বিশ্বজগতের পরিচয়। বাহিরের বিচিত্র প্রকাশকে বিজ্ঞানী তন্ন তন্ন করে জানতে চায় এবং সেই সূত্রে তন্ময় হয়ে অন্বেষণ করে জগতের মৌলিক রূপকে।

এই সত্যসন্ধানে মানব-মনীষার উদ্যম আজ কোথায় পৌঁছেছে তারি সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমার ভাবপ্রকাশের এবং ভাষার দৈন্য আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

প্রকৃতি নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে জিজ্ঞাসু মনের কাছে দ্বৈতরূপে—শক্তি ও পদার্থ—জৈব ও অজৈবরূপে পদার্থ ছড়িয়ে আছে অজস্র প্রকারে আমাদের সামনে—কোথাও এই বস্তুরাশিতে আছে প্রাণস্পন্দন, আবার কোথাও তার প্রকাশ হয়েছে নিষ্প্রাণ নগ্ন কঠিন তরল বা বায়বীয় রূপে। পদার্থের এই বিভিন্ন রূপ ছাড়া, প্রকৃতির আর যে পরিচয় মানুষ লাভ করে তা হল শক্তির খেলা। এই শক্তির পরিচয় পাই আমরা ধ্বনিতে, জলে বা আলো বা বিদ্যুতের প্রবাহে। আলো বা উত্তাপ বিদ্যুৎ বা ধ্বনির অভাবে বস্তুরাশির বৈচিত্র্য সম্ভব হ'ত না, নিত্য নব রূপান্তরে বস্তুজগৎ লীলাময় হয়ে উঠত না। যা বস্তু নয় অথচ যার সহায়তা না পেলে বস্তুরাশির রূপান্তর সম্ভব নয়, প্রকৃতির সেই প্রকাশাংশের নামকরণ হয়েছে শক্তি বা এনার্জি। পদার্থের সহিত শক্তির সমন্বয় না হলে বস্তু-জগতের প্রকাশ হ'ত নিশ্চল নিষ্পন্দ নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডের সমষ্টিরূপে।

পদার্থের আছে ভর (মাস) এবং এই ভরের উপর মহাকর্ষের প্রভাবে পদার্থে হয় ওজনের সৃষ্টি। প্রকৃতির যে রূপক প্রকাশে এই গুণ নাই তাই হ'ল শক্তি। আলো, উত্তাপ, ধ্বনি, বিদ্যুৎ এদের কারোও ওজন নাই। এরা কতকগুলি তরঙ্গস্পন্দন মাত্র, এরা হল শক্তির প্রতীক।

এই বস্তুজগতের মৌলিক উপাদানের সন্ধানে বিজ্ঞানী নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিরানব্বই প্রকার পরমাণু দ্বারা সকল প্রকার বস্তুরাশি সংগঠিত। সর্বাপেক্ষা কম ওজনের পরমাণু হচ্ছে হাইড্রোজেন, আর সবচেয়ে ভারী হল ইউরেনিয়ামের পরমাণু। এই বিরানব্বই রকম পরমাণুদের সংযোগ-বিয়োগের ফলেই পদার্থরাশির রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুদের মিলনে জল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড উত্তাপে বিকিরণ হয়। আবার এই জলের অণুকে আমরা ভাঙ্গতে পারি বৈদ্যুতিক প্রবাহ দিয়ে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুতে। এই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে পরমাণুর কোন ধ্বংস বা উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে

* প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণ। আনন্দ বাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত।

কয়েকটি পরমাণুর এক প্রকার বিচিত্র স্বভাবের সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম পদার্থ থেকে নিরন্তর এক প্রকার তেজ-রশ্মি নির্গত হচ্ছে। বাইরের উসকানি বা প্রতিবন্ধকতায় এই তেজবিকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই তেজবিচ্ছুরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। তেজবিচ্ছুরণের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইহা ইউরেনিয়াম পরমাণুর স্বতঃস্বভাব। শুধু ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি আরো কয়েকটি মৌলিক পদার্থ স্বতঃ তেজবিচ্ছুরণ করে নিজেদের পরমাণু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অন্য পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই সকল তেজস্ক্রিয় পরমাণু ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়ে এবং ওজনে কমে কমে যখন সীসার পরমাণুতে পরিণত হয় তখন তেজবিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে যায়।

মৌলিক পদার্থের স্বরূপ

এই আবিষ্কারে মৌলিক পদার্থের স্বরূপসম্বন্ধে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। যাকে ভাঙ্গা যায় না, গড়া যায় না, এমন যে অপরিবর্তনশীল পদার্থকণা তাকেই তো নাম দেওয়া হয়েছিল মৌলিক পদার্থের পরমাণু। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া এই মৌলিক পরমাণুদের ভাঙ্গন-গড়নের সহিত জড়িত নয়। কিন্তু এই ভাঙ্গন-গড়ন নূতন এক প্রচণ্ড শক্তিখেলার পরিচয় দিয়েছে।

এই পরমাণুদের ভাঙ্গন থেকে যে তেজ বিকিরণ হয় তার বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, তিন রকম রশ্মি দ্বারা এই তেজরাশি সংগঠিত। একটিতে পাওয়া গেল পজিটিভ বিদ্যুৎসংযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু, দ্বিতীয়টিতে পাওয়া গেল ইলেকট্রন বা নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা, তৃতীয়টিতে বিদ্যুৎহীন আলোকতরঙ্গ রঞ্জন-রশ্মি। যাঁরা রেডিয়ো ভালব্ দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, ভালবের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহ ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির উপর নির্ভর করে। আর অনেকেই হয়তো রঞ্জন-রশ্মির দ্বারা জীবন্ত দেহের ভিতর কঙ্কালের ছবি দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। নানা পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, বিরানব্বইটি মৌলিক পরমাণু আমরা জড়-জগতের উপাদান বলে স্থির করেছিলাম আসলে তারা মৌলিক নয়। এই তথাকথিত মৌলিক পরমাণুগণ যখন ভাঙ্গে তখন নূতন রকম কণার সন্ধান পাওয়া যায়—পজিটিভ বিদ্যুৎকণা, নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা, ইলেকট্রন যাদের ওজন হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের দুই হাজার ভাগের একভাগ। আর পাওয়া যায় সন্ধান নিউট্রন কণার যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন, যাহাকে আমরা নিউট্রন এবং পজিট্রনের সমষ্টি বলে ধরতে পারি, এই পজিটিভ বিদ্যুদ্‌গুণবিশিষ্ট কেন্দ্রকে আচ্ছাদন করে আছে একটি নিগেটিভ বিদ্যুৎকণা বা ইলেকট্রন। ইহা ছাড়া আরও একটি কণার সন্ধান পাওয়া গেছে যাহা ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু'শ গুণ ভারী। কিন্তু প্রোটনের তুলনায় অনেক হালকা। ইহার নাম হচ্ছে মেসন, ইহা পজিটিভ বা নিগেটিভ বিদ্যুদ্‌গুণবিশিষ্ট হতে পারে এবং বৈদ্যুতিক গুণহীন হতে পারে। আজ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নিরানব্বইটি পরমাণুর অপরিবর্তনশীল মৌলিকত্ব অস্বীকার করছি এবং মেনে নিয়েছি যে, এই বিচিত্র ও অজস্র বস্তুরাশির মূলে আছে মাত্র কয়েকটি অতিমৌলিক কণা—ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, নিউট্রন, প্রোটন। যাদিকে আমরা

মৌলিক পরমাণু বলতাম তাদের সংগঠনের নমুনাটি হচ্ছে এই রকম। এই তথাকথিত পরমাণুদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন ও মেসন ও নিউট্রন কণার সমষ্টি। এই কেন্দ্রেই পরমাণুর সমস্ত ওজন নিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই কেন্দ্রের বিস্তার পরমাণুর বিস্তারের দশ-হাজার ভাগের এক ভাগ। এই কেন্দ্রকে আচ্ছাদন করে আছে ইলেকট্রন কণা, ইলেকট্রন কণার সংখ্যা কেন্দ্রীয় প্রোটন কণার সমান, সেজন্য পরমাণু বিদ্যুদ্‌গুণহীন। কিন্তু অনেক রকম উস্‌কানির দ্বারা ইলেকট্রন কণাদিগকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, এবং এই ইলেকট্রন-মুক্ত পরমাণু পজিটিভ বিদ্যুদ্‌গুণসম্পন্ন হয়। শুধু কেন্দ্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরমাণুর তুলনায় লক্ষ গুণেরও বেশী। বিজ্ঞানী অনেক নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আভ্যন্তরিক উত্তাপের মাত্রা এখন জানতে পেরেছেন—এবং এই চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান নিয়েছেন যে কোন কোন নক্ষত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর লক্ষগুণ ও তাপের মাত্রা প্রায় এক কোটি ডিগ্রী। এই অত্যুগ্র উত্তাপের উস্‌কানিতে সব নক্ষত্রে পরমাণু কেন্দ্রদল ইলেকট্রনবিচ্ছিন্ন হয়ে অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে আছে। সাধারণতঃ সর্ব-লঘু হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন কণাকে আবেষ্টন করে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন কণা। আবার ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে বিরানব্বইটি প্রোটন কণা। তথাকথিত মৌলিক পরমাণুর রাসায়নিক গুণ নির্দ্ধারণ করছে কেন্দ্রবহির্ভূত এই ইলেকট্রন কণার সংখ্যা এবং সন্নিবেশভঙ্গী। কেন্দ্রে প্রোটনের সহিত সংশ্লিষ্ট নিউট্রনের সংখ্যা কম বেশী হলে পরমাণুর ওজন বদলে যায়, কিন্তু বাহিরের ইলেকট্রনের সংখ্যা ও সন্নিবেশ না বদলালে তার রাসায়নিক গুণের কোন পার্থক্য হয় না। তাই বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সমগুণান্বিত হতে পারে এবং সম ওজনের পরমাণুর বিভিন্ন গুণ হতে পারে।

আলোকতরঙ্গের চলার পথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানলোকে শক্তি ও পদার্থের স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় আলোক-রশ্মির চাপ দেবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু এই চাপ এত কম যে, এক বর্গ মাইল জুড়ে সূর্যের আলো মাত্র চাপ দিতে পারে দেড় সের, পক্ষান্তরে একবর্গ ইঞ্চিতে বায়ুমণ্ডল চাপ দেয় প্রায় সাড়ে সাত সের। বিজ্ঞানী কম্পটন আবার নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আলোক-রশ্মির ভরও আছে, ভরবেগও আছে—ইংরাজীতে আমরা যাকে বলি মাস এবং মোমেনটাম্‌। আলোক-রশ্মির যদি ভর থাকে, তবে মহাকর্ষের প্রভাবে আলোকতরঙ্গের চলার পথও বদলে যাবে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় সূর্যদেহের পাশ দিয়ে যে আলোক-রশ্মি পৃথিবীর দিকে আসে, তাহা সূর্যের আকর্ষণে কতকটা বেঁকে যায়। তাই যদি হল, তবে পদার্থ থেকে শক্তির স্বাতন্ত্র্য রইল কোথায়। তাই নূতন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানতে হচ্ছে, শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে, অর্থাৎ বিশ্বজগতের মৌলিক উপাদান বহু নয়, এক এবং শক্তি ও পদার্থ—এই অদ্বিতীয় উপাদানের দ্বৈধী প্রকাশ মাত্র।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আবার প্রমাণ করলেন যে শুধু যে তেজ-রশ্মির ভর বা ওজন আছে তা নয়—যখন কোন পদার্থপিণ্ডে গতিসঞ্চার হয়, তখনই তার ভর বা ওজনও বেড়ে যায়। সাধারণ গতিবেগে চলন-শক্তির পরিমাণ এত স্বল্প যে, পদার্থের দেহপিণ্ডে ভরবৃদ্ধির লক্ষণ

প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন এই গতি আলোকের গতির কাছাকাছি যায়, তখন ভর-বৃদ্ধির লক্ষণ ধরা পড়ে। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পরমাণু যে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ করে, সেই ইলেকট্রনের গতিবেগের সঙ্গে তার ভরের মাত্রা বদলে যায়। আর আজ আমরা স্বীকার করি যে, কোন অতিমৌলিক কণা যদি আলোক-রশ্মির গতিবেগ পায়, তবে তাহার দেহে অন্তত ভর-বৃদ্ধি হবে। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, কোনও কণাই আলোকের গতিবেগের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

শক্তিতে পদার্থের গুণ আছে, এই সিদ্ধান্ত করে আইনষ্টাইন ক্ষান্ত হন্‌নি—শক্তি ও পদার্থের পারস্পরিক অদলবদলের একটি সহজ সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন—শক্তির সৃষ্টি বা লোপের সঙ্গে পদার্থের লোপ বা সৃষ্টি সর্বদাই জড়িত। কোন পদার্থ লোপ পেলে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ পাওয়া যাবে ঐ পদার্থের ভরকে আলোকের গতিবেগের বর্গ গুণ নিয়ে পূরণ করে। হিসাব করে দেখা যায়, বার লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তির উদ্ভব হয়, কোন এক সের পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তর করলে সেই পরিমাণ শক্তির জন্ম হয়।

প্রশ্ন উঠে এই বিশ্বজগতে পদার্থ কি কোথাও স্বতঃই শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। চারিটি সর্বলঘু হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনে যদি একটি হিলিয়াম পরমাণুর জন্ম হয়, তবে প্রায় শতকরা আধ ভাগ পদার্থের লোপ হবে এবং এই লুপ্ত পদার্থের প্রকাশ হবে শক্তিরূপে। হাইড্রোজেন থেকে যদি এক সের হিলিয়ামের জন্ম হয়, তাতে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা এক সের কয়লা পোড়ালে যে উত্তাপ হয়, তার দুই কোটি গুণ। সূর্যদেহে ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চলছে—হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তন হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণুতে। সূর্যের অভ্যন্তরে তাপের মাত্রা হচ্ছে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি। আমাদের এই পৃথিবী সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুইশত কোটি বৎসর ধরে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এই সুদীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী সূর্য থেকে যে তাপ পাচ্ছে তার কোন উল্লেখযোগ্য তারতম্য হয় নাই। সৌরদেহের বিপুল উত্তাপে হাইড্রোজেন, কার্বন নাইট্রোজেন পরমাণুরা ইলেক্ট্রনবিমুক্ত হয়ে পরমাণু কেন্দ্ররূপে পরস্পরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত করে এবং ইহার ফলে চারিটি হাইড্রোজেন-কেন্দ্র একটি হিলিয়াম কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম সৃষ্টির ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, সেই তেজশক্তির পরিমাণ বৈজ্ঞানিক বেথে স্থির করছেন এবং কোটী কোটী বৎসর ধরে মহাদ্যুতি সূর্যদেবের এই তেজ-বিকিরণের সমস্যা সমাধান করেছেন।

পদার্থ ধ্বংস হলে যে শক্তির প্রকাশ হয় সে শক্তিকে যন্ত্রপরিচালনার কাজে লাগাতে পারলে শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবসাধন সম্ভব হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানব-সমাজের গঠনমূলক কাজে প্রয়োগ না করে পরমাণুভাঙ্গা শক্তিতে চরমবিধ্বংসকারী বোমা-প্রস্তুতির কাজে প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্বেই বলেছি ৯২টি প্রোটনযুক্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্র স্বতঃই ভেঙ্গে হিলিয়াম পরমাণু ও ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ করে এবং পরিশেষে সীসার পরমাণুতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানী হান দেখালেন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র যদি নিউট্রনের আঘাতে ভাঙ্গবার চেষ্টা করা হয় তবে অনেক সময় ঐ কেন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায় এবং একটুকরা পরিণত হয় বেরিয়ামের পরমাণুতে, আর এক টুকরা ক্রিপ্টন বা করিডিয়ামের

পরমাণু সৃষ্টি করে, ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউট্রনের আঘাতে শুধু আধাআধি ভেঙ্গেই থামে না—ভাঙ্গার সময় এই পরমাণুর কিছুটা অংশ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুই লক্ষ মণ কয়লা পুড়ে যে শক্তির সৃষ্টি করে, এক সের ইউরেনিয়াম ভাঙ্গনের ফলে সেই পরিমাণ শক্তির জন্ম হওয়া সম্ভব। এই পরমাণুর ভাঙ্গনশক্তির প্রয়োগ হয়েছে নূতন বোমায়, ভাঙ্গনের সময় এই বোমার ভিতরে কোটী কোটী ডিগ্রি উত্তাপ সৃষ্ট হয় এবং এই বিপুল উত্তাপের ফলে জাপানে যুদ্ধের শেষভাগে এক একটি বোমাতে এক একটি শহর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে। ভবিষ্যতে পরমাণুভাঙ্গা এই শক্তি গঠনমূলক কাজে প্রযুক্ত হয়ে মানবসমাজের কল্যাণসাধন করবে না পরমাণু বোমারূপে পৃথিবীতে চরম ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করবে, আজ মানবসমাজের সামনে এই সংকটাকীর্ণ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে।

এই বিশ্বজগতের অন্তিম স্বরূপ সন্ধানে বৈজ্ঞানিক আজ উপলব্ধি করেছেন যে শক্তি ও পদার্থ অভিন্ন—বিশ্বজগতের এই একক অন্তিম পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান আরো জানিয়ে দিয়েছে যে বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের অন্তিম রূপ হলো বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রন, পজিট্রন, মেসন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি পদার্থের মৌলিক, উপাদানের প্রকৃতি ও পরিচয় পেলেই বিশ্বজগতে অন্তিম রহস্য জানা সম্ভব।

এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যেয়ে বিজ্ঞানী আরো একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছে। শক্তি ও পদার্থ যে অভিন্ন তা আমরা বুঝতে পেরেছি—এখন দেখা যাচ্ছে যে, ইলেকট্রন কখনও তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায় আবার কখনও কণারূপে প্রকাশ পায়। যে সমস্ত বিশিষ্ট গুণের জন্য আলোকরশ্মিকে তরঙ্গ বলা যায়—বেগবান ইলেকট্রনের সে সমস্ত গুণ আছে। অন্তিমরূপ সন্ধানে যে পরীক্ষায় ইলেকট্রনের কণারূপের পরিচয় পাওয়া গেছে সে পরীক্ষাও যেমন নির্ভুল সত্য, আবার যে পরীক্ষায় ইলেকট্রন তরঙ্গরূপে প্রকাশ পেয়েছে সে পরীক্ষাও সত্য। অর্থাৎ ইলেকট্রনের কণারূপও সত্য, তরঙ্গরূপও সত্য। শক্তি ও পদার্থ অন্তিম পরিচয়ে অভিন্ন নয়, আবার অন্তিম রূপায়ণে শক্তি ও পদার্থকণাও বটে, তরঙ্গও বটে। একই আদি উপাদানের এই দ্বৈত প্রকাশভঙ্গী উপলব্ধি করে বিজ্ঞানীর মন আজ বিস্ময়াপ্লুত ও স্তম্ভিত হয়েছে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—ভারতীয় চিন্তাধারার এই আদিম সূত্রের আমরা আজ নূতন ব্যাখ্যা পেয়েছি।

…"জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ।…যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম—আরোও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং। …তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন।"…

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটি—গত এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী সোসাইটি হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) "শক্তির সন্ধান" (২) "অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব ও অনুশীলন", (৩) "আজ খৃষ্ট যদি এখানে থাকিতেন", (৪) "পুনরভ্যুত্থান,—শাশ্বত ও সাময়িক", (৫) "মানুষ ও তাহার রহস্যাবৃত মন", (৬) "প্রেমের ঈশ্বর ও যুক্তির ঈশ্বর"। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী "ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ কর", এবং "জীবন ও জগৎ-সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রতি রবিবার স্বামী অশোকানন্দজী সমবেত জিজ্ঞাসুগণের নিকট বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করেন এবং ধ্যান শিক্ষা দেন। সোসাইটি-পরিচালিত রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে বালকবালিকা-গণও বেদান্তের উদার সার্বজনীন শিক্ষা লাভ করে। বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাচার্য মহাপুরুষদের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করাই এই অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

জয়রামবাটী (বাঁকুড়া) শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির—গত ১৮ই বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ-জননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পবিত্র জন্মভূমিতে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গল আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কেন্দ্র হইতে কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নর-নারী এই উৎসবে যোগদান করেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। শ্রীমন্দির পুষ্প, পত্র, পতাকা ও আলোকদ্বারা সুসজ্জিত ছিল। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ, ভজন ও কীর্তনের পর রাত্রিতে পুনরায় প্রসাদ-বিতরণান্তে বিপুল আনন্দের মধ্যে উৎসব সমাপ্ত হয়।

পাটনা (বিহার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—গত ১০ই বৈশাখ বাঁকিপুর বি এন কলেজে পাটনার Philosophical Societyর আনুকূল্যে রায় বাহাদুর ব্রজনন্দন সিংএর সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কসভার এক সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। Philosophical Societyর সভাপতি ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গিন হালদার, এম এ, Societyর পক্ষ হইতে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজীকে উক্ত প্রতি-যোগিতায় অন্যতম বিচারক নিযুক্ত করেন। "Life and Philosophy'—(জীবন ও দর্শন) উক্ত দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল।

গত ২০শে বৈশাখ আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি উপলক্ষে পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। সায়াহ্নে আশ্রমস্কুল-গৃহে আচার্য শঙ্করের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা সুশোভিত করা হইলে বিভিন্ন বক্তা তাঁহার জীবনী ও মতবাদ আলোচনা করেন। সভার প্রারম্ভে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দজী আচার্যদেবের জীবনী হইতে সময়োপযোগী কিয়দংশ পাঠ করেন এবং আচার্যরচিত "মনীষা-পঞ্চক" ও

"নির্ব্বাণ ষট্‌কের" প্রকৃত তাৎপর্য বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর বাঁকিপুর বি এন কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এম-এ আচার্য শঙ্করের প্রতিভা, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ তথা তৎপ্রদর্শিত সাধন-পন্থা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচনা করেন। অতঃপর কাশী সাধু-সঙ্ঘের সম্পাদক স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। সভান্তে সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ মিত্র আচার্য শঙ্কর রচিত "মোহমুদ্গর" গান করেন।

পুরী (উড়িষ্যা) রামকৃষ্ণ মঠ—এই প্রতিষ্ঠানে ১৮ই বৈশাখ রবিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৪ তম জন্ম মহোৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুরমন্দির পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উৎসবের গাম্ভীর্য ও শোভাবর্ধন করিয়াছিল। প্রাতে মঙ্গল আরতি ও ভজন, কথামৃত ও চণ্ডীপাঠ এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদির ব্যবস্থা হয়। অপরাহ্ণে কালীকীর্তন ও রামনাম-সংকীর্তন হয়। ৫ ঘটিকায় দেওঘরের স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভায় বেলুড় মঠের স্বামী জগন্নাথানন্দজী ও রায় বাহাদুর উমাচরণ দাস উড়িয়া ভাষায়, অধ্যাপক ধর্মারাও ইংরেজীতে, অধ্যক্ষ গিরিজাশঙ্কর রায়, স্বামী সেবানন্দজী গিরি, অধ্যাপক শ্রীশ্যামকুমার চক্রবর্তী এবং উকিল শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলায় ঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শেষে সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন সত্য প্রেম ও পবিত্রতার জমাটবাঁধা মূর্তি। তিনি শাস্ত্রের উপদেশাবলী নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বুঝাইয়াছিলেন যে শাস্ত্রবাক্যসমূহ সঠিক পালিত হইলে ভগবদনুভূতি কষ্টসাধ্য নয়। সভাপতি স্বাধীন ভারতবাসীদের আবেদন জানান যে রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যা আরাত্রিক ও ভজনের পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

সোনার গাঁ (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে ১৮ই বৈশাখ রবিবার হইতে ২৫শে বৈশাখ রবিবার পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের প্রথম পাঁচ দিন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী হরিহরানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবের ৬ষ্ঠ দিবস স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী-আলোচনাসভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে স্বামী সুপর্ণানন্দজী ও স্বামী সত্যকামানন্দজী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

উৎসবের ৭ম দিবসে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ বসু, এম-এ, পি-আর-এস্-এর সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ও স্বামী সত্যকামানন্দজী সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী ভাষণও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

উৎসবের শেষ দিবসে উক্ত আশ্রমের ৩৪তম বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীগণেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এল্-এ এবং বক্তৃতা দেন শ্রীঅরবিন্দ বসু, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী। সভান্তে উপস্থিত কয়েক সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি অন্তে প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারী পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন অপরাহ্ণে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন সাহা, এম-এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আহূত এক জনসভায় আশ্রম-পরিচালিত অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণের পর আশ্রম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বি-এ মহাশয় কর্তৃক আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণী পঠিত হইলে অধ্যক্ষ স্বামী ধর্মানন্দজী ও বেলুড় মঠাগত স্বামী সুন্দরানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পরে আরও দুই দিন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুইটি জনসভার অধিবেশনে উক্ত স্বামীজীদ্বয় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামী সুন্দরানন্দজী ঢাকা জেলার অন্তর্গত আমতা গ্রামে একটি, সিংজুরি গ্রামে দুইটি এবং সাভার গ্রামে দুইটি জনসভায় সর্বধর্মসমন্বয়ের বিভিন্ন দিক ও হিন্দুদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই সভা কয়টিতে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল।

করিমগঞ্জ (কাছাড়) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতি,—এই প্রতিষ্ঠানে ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার হইতে ১৯শে বৈশাখ সোমবার পর্যন্ত ৪ দিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৬ই বৈশাখ আশ্রমপ্রাঙ্গণে এক জনসভায় বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। ১৭ই বৈশাখ আশ্রমপ্রাঙ্গণে এক মহতী জনসভার অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কাছাড় জেলার ডেপুটী কমিশনার মিঃ ভাগাইওয়ালা। সভায় স্বামী পুরুষাত্মানন্দজী, অধ্যাপক শ্রীকুশীমোহন দাস, অধ্যাপক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ও শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটি সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৮ই বৈশাখ রবিবার সমস্ত দিবসব্যাপী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। প্রাতে ভজন ও উপনিষৎপাঠান্তে নবনির্মিত মন্দিরে ঠাকুরের বিশেষপূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। ন্যূনাধিক ছয় হাজার নর-নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণের উৎসবাঙ্গ ছিল পদকীর্তন ও আরাত্রিক। ১৯শে বৈশাখ স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী ছায়াচিত্র সহযোগে 'বর্তমান ভারত ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা করেন।

বিবিধ সংবাদ

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি—এই সেবাসমিতির ৩৬ তম বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, এবং বোম্বে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী উৎসবের সর্ববিধ অনুষ্ঠানে যোগদান করায় এতদঞ্চলবাসী নরনারীর প্রাণে উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হয়।

গত ২৯শে বৈশাখ বৈশাখী পুর্ণিমার দিন

হইতে ৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে উপস্থিত সন্ন্যাসী মহারাজগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৯শে বৈশাখ হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে যথাক্রমে বুদ্ধদেব, হজরত মোহাম্মদ, যিশুখৃষ্ট এবং চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত তুষ্টিপ্রিয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠশালার পারিতোষিক বিতরণ ও সংস্কৃত আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হয়। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় আরিয়ল হাই স্কুলের দুই জন এবং কলমা হাই স্কুলের দুই জন ছাত্র পুরস্কার লাভ করে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি মহিলাসম্মেলন হয়। তাহাতে গ্রামের বালিকারা যে সব আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়াদি করে তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, ব্রহ্মচারিণী গীতা (আনন্দ আশ্রম), শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন, কুমারী গীতা দাশগুপ্তা ও সভাপতি মহারাজ, এইরূপ সম্মেলনের সার্থকতা ও নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় হাই স্কুলের হলঘরে একটি জনসভায় "ধর্মের মূলতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব" বিষয়ে স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী এবং সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ মহারাজ বক্তৃতা দেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। প্রাতঃকাল হইতেই বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী উৎসবায়তনে সমবেত হন। পূজা, পাঠ, ভজনসঙ্গীত, কীর্তন, সদালোচনা প্রভৃতির ফলে সর্বত্র একটি বিমল আনন্দের পরিবেশ সৃষ্ট হয়। দুই হাজারের উপর নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে সেবাসমিতির বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি, জনাব গোলাম রসুল খন্দকার, ডাক্তার প্রশান্ত কুমার সেন প্রভৃতি সভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহারাজ উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট সমিতিটি যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য একটি স্থায়ী তহবিল-গঠনে উদ্যোগী হইতে বিশেষ ভাবে আবেদন জানান। তাঁহার আবেদনের ফলে তখনই একটি স্থায়ী তহবিল গঠনের সূচনা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে ছায়াচিত্রে আলোচনা করেন।

৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে বিবেকানন্দ কিশোর সমিতির উদ্যোগে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয়। সমিতির সদস্যবৃন্দ আবৃত্তি, সঙ্গীত ও অভিনয়াদি দ্বারা উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেন।

বার্ণপুর (বর্ধমান) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ, পদাবলী কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে আহূত একটি বিরাট জনসভায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আসানসোলের সব জজ শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৌরোহিত্য করেন। মার্টিন-বার্ণ কোম্পানীর গ্রুপ এজেণ্ট মিঃ আই এস্ পুরী সভার উদ্বোধনপ্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সোসাইটির কার্যবিবরণী পঠিত হইলে স্বামী ভবেশানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা ও আদর্শের আলোচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সুচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

ছোট সরসা (হুগলী) প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ—গত ১১ই বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চতুর্দশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে প্রাতে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা এবং হোমের পর প্রায় ৮০০এর অধিক দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী বেদানন্দজীর সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলোচিত হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক শেখর বাগচী ও মহকুমা হাকিম শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দে ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তিরোল (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা বৈশাখ হইতে চারদিন ব্যাপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উষাকীর্তন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, আরাত্রিক, ভজন ও প্রসাদবিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরাত্রিক, ভজন, রামনাম-সংকীর্তন, বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির শ্রীযুক্ত ফকির চন্দ্র জানা ছায়াচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২রা বৈশাখ বেলুড় মঠের স্বামী মনীষানন্দজীর সভাপতিত্বে আহূত একটি জনসভায় সম্পাদক শ্রীঅসিধারী দত্ত কর্তৃক সমিতির কার্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীঅনন্ত কুমার নিয়োগী, শ্রীসুধেন্দু কুমার রায়, শ্রীসুবল চন্দ্র দাঁ, শ্রীকান্তি চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরথ কুমার রায় চৌধুরী, স্বামী নির্বাণানন্দজী ও অন্যান্য বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী আলোচনা করেন। সর্বশেষে সভাপতি মহারাজ একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। ৩রা বৈশাখ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতান্তে পুরস্কার বিতরণী সভায় স্বামী মনীষানন্দজী পুরস্কার বিতরণ করেন। ঐ দিবস সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর পূত জীবনী আলোচিত হইলে "পল্লীসংস্কারের পথে" ও "বাংলার ব্যথা" নামক দুইখানি নাটক অভিনীত হয়। ৪ঠা বৈশাখ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর আলোচনার পর একটি বালিকা বন্দনা নৃত্য প্রদর্শন করে ও সুভাষ সংঘের সভ্যগণ "বঙ্গে বর্গী" নাটক অভিনয় করেন। ৫ই বৈশাখ স্বামী মনীষানন্দজী স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে উক্ত স্বামীজী "শ্রীরামকৃষ্ণপ্রদর্শিত গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য" সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী উৎসবের শেষ দিবস হইতে সপ্তাহকাল ব্যাপী স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে ও শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার বাণী" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যার্ণব "গীতা", শ্রীযুক্ত রমণী কুমার দত্তগুপ্ত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ" এবং "শিবানন্দবাণী (২য় ভাগ)" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে "বৌদ্ধ সংঘ" "বৌদ্ধ সংঘের বৈশিষ্ট্য" ও "ভগবান বুদ্ধের শিষ্যবর্গ" সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন।

রাড়ীখাল (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস পূর্বাহ্নে ষোড়শোপচারে পূজা, আরাত্রিক ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তন, ভজন এবং "নৌকাবিলাস" পালা কীর্তনের পর জাতিবর্ণনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান প্রায় ১৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সোমবার দিবস ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে উক্ত স্বামীজীর পৌরোহিত্যে আহূত এক জনসভায় আশ্রমসম্পাদক-পঠিত কার্যবিবরণী গৃহীত হয়। তৎপর শ্রীবিষ্ণুপদ সেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাপ্তিসংগীতের পর অধিক রাত্রে সভার কার্য শেষ হয়।

কাটোয়া (বর্ধমান) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৪তম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভাযাত্রাসহ নগর-পরিভ্রমণ, পূজা, হোম, আরাত্রিক, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রাতে প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার এবং অপরাহ্নে ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আহূত সভায় বেলুড় মঠের স্বামী মৈথিল্যানন্দজী অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় "শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার বাণী" সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। মধ্যাহ্নে ছাত্রদের আবৃত্তি, প্রবন্ধপ্রতিযোগিতা, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশিবহরি গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও নাম-সংকীর্তন করেন।

ধুবড়ী (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমিতি—এই প্রতিষ্ঠানে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিবস শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দাসের সভাপতিত্বে, দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত পালিতের পৌরোহিত্যে এবং তৃতীয় দিবস গৌরীপুরের রাজকুমারী শ্রীযুক্তা নীহারবালা বড়ুয়ার সভানেত্রীত্বে জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাত্রয়ে স্বামী বিমলানন্দজী, স্বামী গদাধরানন্দজী, স্বামী শিবরামানন্দজী এবং স্থানীয় কলেজের কয়েক জন অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেন। শ্রীযুক্তা সুকুমারী রায়-চৌধুরাণী, বি-এ, বি-টি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৃতীয় দিবস পূজা, হোম, কীর্তন, শোভাযাত্রা, আরাত্রিক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হন।

হাফলং (আসাম) সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২৪শে ও ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজা, হোম, ভজন, পদাবলী-কীর্তন, শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ, আলোকচিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। প্রায় এক সহস্র নরনারী প্রসাদ পান। স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী, স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দজী, স্বামী পুরুষাত্মানন্দজী, স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী প্রমুখ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে উৎসব সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। প্রথম দিবস অপরাহ্নে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী, স্বামী পুরুষাত্মানন্দজী, স্বামী গোপেশ্বরানন্দজী ও শ্রীভূপেন্দ্রমোহন দেব শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী অবলম্বনে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্তে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র

সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিবসে পূজা, হোম, ভজন, পদাবলী-কীর্তন, শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতিতে জনসাধারণের অপরিসীম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সন্ধ্যান্তে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী আলোকচিত্র সহযোগে পূর্বদিনের মত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অলোকসামান্য জীবন-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত স্বামীজী পার্বত্য অঞ্চলে ও স্থানীয় রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে আলোকচিত্রসহযোগে বক্তৃতা দেন। স্থানীয় হাইস্কুলে প্রদত্ত উক্ত স্বামীজীগণের বক্তৃতা অত্যন্ত সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের উদ্যোগে আণবিক শক্তির গবেষণা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন শাখায় গবেষণাকার্য সুচারুরূপে চলিতেছে। আণবিক শক্তি ও আয়নমণ্ডল (তড়িৎকণাসমন্বিত মণ্ডল) সম্পর্কে গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় আত্মনিয়োগ করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সমতালে অগ্রসর হইতেছে—ইহা দেশের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়।

এক বৎসর পূর্বে বিজ্ঞান কলেজে পরমাণবিক বিজ্ঞান গবেষণা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছিল, এখন উহা সম্পূর্ণপ্রায়। বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে ইহা আণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণার উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ বীক্ষণাগারে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জানা গিয়াছে যে, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের রেডিও রিসার্চ কমিটির উদ্যোগে আয়নমণ্ডল (উর্ধ্বাকাশে রেডিও) তরঙ্গ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কলিকাতার বাহিরে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার ৮৪০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এযাবৎ এই অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত হইতেছিল, কিন্তু কলিকাতায় বৈদ্যুতিক নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং গোলমাল হয় বলিয়া উক্ত অনুসন্ধানে অসুবিধা হওয়ায় নগরীর বাহিরে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়।

আয়নিত উচ্চ বায়ুমণ্ডলকে এখন আয়নমণ্ডল (ionosphere) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে তাড়িততরঙ্গ-প্রবাহের গুরুত্ব অনেকখানি। অধ্যাপক এস কে মিত্রের পরিচালনায় বিজ্ঞান-কলেজে এতদ্বিষয়ে গবেষণাকার্য পরিচালিত হইতেছে। এতৎসম্পর্কে যে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়, তাহা জগতের সর্বত্র বিশেষতঃ ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রচার করা হয়।

ভারতে রেডিও-শিল্পের উন্নতি ও রেডিও-দ্রব্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কমিটি অনুসন্ধান চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা বিজ্ঞানকলেজে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে কার্বন মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার প্রভৃতি নির্মাণের পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে নির্ণীত হইয়াছে। ব্যবসার জন্য বিশেষ ধরনের রেডিও ভালভ-নির্মাণের পদ্ধতি স্থির হইয়াছে এবং অন্যান্য ধরনের রেডিও-ভালভ নির্মাণের কার্য অগ্রসর হইবে।

ভ্রম-সংশোধন—উদ্বোধনের এই সংখ্যার ২৮২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে 'ঘোষণা করিয়াছেন' বাক্যের পর দাঁড়ি না হইয়া কমা, ঐ কলমের শেষ লাইনে 'কায়দে' স্থলে 'কায়েদে' এবং ঐ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের বিংশতি লাইনে 'মুসলমান ও মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ' স্থলে 'মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ' হইবে।

স্বাধীন ভারতের বর্তমান সমস্যা

সম্পাদক

ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার মর্মন্তুদ দৈন্য-দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিয়া এক অচিন্তনীয় উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহারা আশা করিয়াছিল যে স্বাধীনতা-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অনর্থগুলির অবসান হইবে এবং তাহাদের মধ্যে প্রাচুর্য সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এখন সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতেছে যে—উহা তাহাদের নিছক কল্পনা-বিলাসমাত্র। পরাধীন অবস্থায় গত মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে খাদ্য বস্ত্র ও ঔষধাদি যেমন দুর্মূল্য এবং স্থানে স্থানে দুষ্প্রাপ্য ছিল, স্বাধীনতা-অর্জনের পর উহা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং কোন কোন জিনিষের মূল্য পূর্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন জীবনধারণের উপযোগী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেশের অতি মুষ্টিমেয় ধনবান ভিন্ন সকলেরই ক্রয়শক্তির সম্পূর্ণ বাহিরে। ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তাঁতি জোলা কর্মকার মালী তিলি প্রমুখ বৃত্তিজীবীদের বৃত্তি প্রায় বিলুপ্ত এবং কুটির-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদি প্রায় বিধ্বস্ত। বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, জমিদার ও মহাজনদের কর্মচারী, ছোট ছোট ফার্ম ও অফিসের কেরাণী, পর্যাপ্তজমিহীন কৃষক এবং বেকার মজুর প্রভৃতির পক্ষে পরিজনবর্গ পোষণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক জীবিকার সন্ধানে দেশময় বিচরণ করিতেছেন; কাজের তেমন ক্ষেত্র নাই, কাজ দিবারও লোক নাই। দেশের অধিকাংশ নরনারীর পক্ষেই দুই বেলা অন্নের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দু ও শিখ অতি নির্মমভাবে বিতাড়িত হইয়া সর্বহারা অবস্থায় ভারতে আগমন করিয়াছে এবং পূর্ব পাকিস্থান হইতেও আনুমানিক ১০।১২০ লক্ষ হিন্দু নানাবিধ অসুবিধা—বিশেষ করিয়া অন্ন-বস্ত্রের অভাবের তাড়নায় পশ্চিম বঙ্গ বিহার ও আসামে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতে জনসাধারণের অন্নবস্ত্রাদির সমস্যা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হৃতসর্বস্ব বাস্তু-ত্যাগীদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা নাই। পাকিস্তানে খাদ্য ও বস্ত্রাদি ভারতবর্ষ অপেক্ষাও স্থানে স্থানে

অধিকতর দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। সেখানে লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাজকর্ম পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। এইজন্য তথাকার জনসাধারণ—বিশেষ করিয়া ভূমিহীন গৃহস্থের অবস্থা অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে ইহার সমাধান সম্ভব হইতেছে না। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট খাদ্য ও বস্ত্রাদির উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য বহুবিধ পরিকল্পনা প্রকাশ করিতেছেন বটে কিন্তু এই গুলির কোনটিই এই পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণ পরিকল্পনা বুঝে না; তাহারা চায় স্বাধীন দেশে তাহাদের অন্নবস্ত্র ও বেকারসমস্যার আশু সমাধান। ইহা কার্যতঃ সম্ভব হইতেছে না দেখিয়া রাষ্ট্রের পরিচালকগণের তথা কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহাদের অসন্তোষ ক্রমেই অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। তাহাদের এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ—বিশেষ করিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্র-সমস্যা অতিশীঘ্র অন্ততঃ কতকটা প্রশমিত করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে যে দেশময় গণবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ইহার সকল লক্ষণ সুপ্রকট।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিচালনে জনসাধারণের অধিকাংশের সমর্থন না থাকিলে কোন রাজনীতিক সংঘের পক্ষে দীর্ঘকাল কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ইহা বর্তমান কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট ভাল করিয়াই জানেন। তথাপি তাঁহারা জনসাধারণের ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে পারিতেছেন না। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আমরা কংগ্রেস বা অন্য কোন রাজনীতিক দলভুক্ত নহি, আমাদের দৃষ্টিতে বর্তমান রাজনীতি গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে একটি অপরিহার্য নোংরা বিষয়! ইহাকে নোংরামি হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ভারতের রাজনীতিক গণজীবন যে অত্যন্ত কলুষিত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের অন্নবস্ত্রাদির অভাব-দূরীকরণ এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আমাদের একান্ত কাম্য। যে গভর্নমেণ্ট এবং যে রাজনীতিক সংঘ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবেন তাহার প্রতিই আমরা আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন। জনকল্যাণের দিক হইতে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া আমাদের ধারণা যে, নবস্থাপিত স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে জনগণের অন্নবস্ত্র সমস্যার আশু সম্যক্ সমাধানের অসমর্থতার সঙ্গত কারণও আছে। স্বাধীনতা লাভের পর যে সকল উপাদান কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে, ঐগুলি দ্বারা অত্যল্প কালের মধ্যে ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের জটিল সমস্যার সম্যক্ সমাধান অসম্ভব। ইহাও জানা আবশ্যক যে, কোন দেশের কোন গভর্নমেণ্টের পক্ষেই জনগণের সকল দাবী পূরণ করাও সম্ভব নয়, কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণ ইহা বুঝিতে অসমর্থ। তাহারা অভাব অনটনের তাড়নায় তাহাদের অন্নবস্ত্র-সমস্যার আশু সমাধানের দাবী অবশ্যই করিতে থাকিবে। ইহা গণমনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। পক্ষান্তরে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে স্বাধীনতা-লাভের পর কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট ইতোমধ্যে ভারতের বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিতাড়িত প্রায় ৬০ লক্ষ সর্বহারা বাস্তুত্যাগী হিন্দু ও শিখের সমস্যার বহুলাংশে সমাধান, প্রায় ৫৫০টি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন তাহারা সমগ্র দেশের কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের

উন্নতি, খাদ্যে স্বাবলম্বন, বিবিধ ধরনের শিক্ষা-বিস্তার এবং জনসাধারণের অন্নবস্ত্রাদি সমস্যা-সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সংবাদ-পত্রের পাঠকমাত্রই এই সকল বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এত স্বল্পকালের মধ্যে এই সকল বিষয় কার্যে পরিণত করাও নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, যে শাসকবর্গের উপর এইগুলি কার্যে পরিণত করিবার ভার অর্পিত, তাঁহাদের অধিকাংশের উপর জনসাধারণের আস্থা দেখা যাইতেছে না। এজন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ঐ সকল সমস্যাসমাধানের চেষ্টায় যতই বিলম্ব হইতেছে, শাসকশ্রেণীর প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্তমান কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের উপর জন-সাধারণের অনাস্থা ও অসন্তোষের সংগত কারণ আছে বলিয়াও অনেকে মনে করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে কংগ্রেস-কর্মিগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য এককালে প্রভূত ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা একদিন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্য ধর্ম ন্যায় নীতি ও অহিংসাকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া সশস্ত্র ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রাম পরিচালন করিয়াছিলেন, যাঁহারা স্বদেশপ্রেমে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া এক-দিন প্রাণপণে দেশবাসীর সেবা এবং সংগঠন-মূলক কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় এক অভূতপূর্ব উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হইয়াছে, ইদানীং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ এবং প্রভুত্ব লইয়া নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রমত্ত হইয়াছেন। এখন সত্য ধর্ম ন্যায় নীতি অহিংসা প্রভৃতিকে তাঁহারা জীবন হইতে নির্বাসিত করিয়া অসত্য অধর্ম অন্যায় দুর্নীতি ও হিংসার আশ্রয়ে দেশবাসীর মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছেন! তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম, জনসেবার ভাব এবং সংগঠনমূলক কার্য ও সংঘ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে যে কংগ্রেস-কর্মিগণ একদিন সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের অধিকাংশই অশ্রদ্ধাভাজন ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছেন। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর এই শোচনীয় অধঃপতন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কংগ্রেস কর্তৃক স্বাধীন ভারতের শাসনভার গ্রহণের পর হইতেই অধিকাংশ কংগ্রেসীর এই অধঃপতন দেখা যাইতেছে। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে স্বার্থপরতা প্রভুত্ব পদমর্যাদা এবং ধর্ম-ন্যায়-নীতিহীনতাই তাঁহাদের অধঃপতন ঘটাইয়াছে। কংগ্রেসকর্মীদের এই সর্বনাশকর ভাব শাসনবিভাগ ও জাতীয় জীবনের প্রায় সকল বিভাগেই কমবেশী সংক্রমিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখনও ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট এই ভাবগুলি দ্বারা বেশী আক্রান্ত হন নাই, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহই অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। জনসাধারণের মধ্যে সুবিধাবাদিগণ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে দেশের গণজীবনও অনেকটা দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস-দলভুক্ত শাসক ও কর্মিগণের অধিকাংশের স্বার্থপরতা প্রভুত্ব এবং ধর্মনীতিবিগর্হিত কার্যাবলী এরূপ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে যে সত্য ধর্ম ও নীতি রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা দেশের সাধারণ নরনারীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের উপর মধ্যবিত্ত

ও দরিদ্র জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমে অধিকতর প্রবল হইতেছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কোন কোন প্রদেশে শাসকবর্গের প্রতি জনগণের এই অসন্তোষ ইদানীং তথাকার মুষ্টিমেয় বিপ্লবপন্থী কমিউনিষ্ট সুকৌশলে তাহাদের আইন ও শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যে প্রয়োগ করিতেছে। স্বাধীন দেশে সকল মতবাদিগণেরই আইনসঙ্গত মতবাদ প্রচারে স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু কোন মতবাদীরই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইন ও শৃঙ্খলাবিরোধী ধ্বংসকর কার্য একেবারেই সমর্থনীয় নহে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—অতি অল্পসংখ্যক কমিউনিষ্ট ধনসাম্যের লোভনীয় অবাস্তব পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে স্থানেই গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি বা আইন-ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে গভর্নমেণ্টের প্রতি বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মধ্যে অনেকে প্রলুব্ধ হইয়া উহাতে যোগ দেয়। অনেকে বলেন যে আধুনিক কংগ্রেসকর্মীদের দুর্নীতি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রভাববিস্তারে সাহায্য করিতেছে। এই অভিমত মিথ্যা নয়। জনসাধারণ কমিউনিজম্ বুঝে না—বুঝিবার প্রয়োজনও অনুভব করে না, বর্তমান গভর্নমেণ্টের প্রতি অসন্তোষজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই যে তাহারা উহাতে যোগ দেয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শাসকের স্বার্থপরতা, ধর্মনীতিহীনতা এবং জনগণের অসন্তোষ দূর করিবার অসামর্থ্যই ইহার একমাত্র কারণ। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও সম্ভবতঃ কংগ্রেস দলরক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন—নীরবে এই অসত্য ও অন্যায় সহ্য করিতেছেন! সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার না হইলে শাসকবর্গের প্রতি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ অদূর ভবিষ্যতে বিপ্লবে পরিণত—অন্ততঃ কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের ক্ষমতাচ্যুত হইবার যথেষ্ট আশংকা আছে। এইজন্য আমরা অতিশীঘ্র এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতে রাষ্ট্রের পরিচালক এবং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

এই জটিল পরিস্থিতির সম্যক সমাধান করিতে হইলে সর্বাগ্রে বর্তমান শাসকবর্গ তথা কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের অসন্তোষ বহুলাংশে প্রশমিত করিতেই হইবে। এজন্য যে সকল কর্মচারী অত্যন্ত স্বার্থপর ও দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজ-নীতিকগণকে অনেক ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে আপস করিয়া চলিতে হয় বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আপস করিলে তাঁহাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হইবে। আমাদের বিশ্বাস—শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য যদি যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী জনকল্যাণকামী স্বার্থহীন সত্য ধর্ম-ন্যায়-নীতিপরায়ণ যোগ্য ব্যক্তিগণকে বাছিয়া বাছিয়া নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থা হইতে সর্ববিধ দুর্নীতি নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে এবং জনসাধারণের গভর্নমেণ্টের প্রতি আস্থাও ফিরিয়া আসিবে। এতদ্ভিন্ন জনগণের অন্নবস্ত্র ও বেকারসমস্যার সম্যক্ সমাধান আশু সম্ভব না হইলেও যাহাতে অতিশীঘ্র সম্ভব হয় তাহা করিতেই হইবে। ইহা সত্য যে যত দিন এই গুরুতর সমস্যাগুলির সম্যক্ সমাধান না হইবে, তত দিন অভাবের অঙ্কুশতাড়নায় জনগণের মধ্যেও ধর্ম-ন্যায়-নীতিহীনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কেবল ধর্ম ও নীতির মাহাত্ম্যপ্রচারে ইহাদের গতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। এজন্য জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারীর সমান অধিকার ও সমান

সুযোগমূলক খাদ্য ও বস্ত্রাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলির সমতাভিত্তির উপর উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা জনসাধারণের সমক্ষে তাহাদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণ দ্বারা অতিশীঘ্র উপস্থিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা-বিস্তার, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিষয়ক পরিকল্পনাও সকলের সমক্ষে উপস্থিত করা প্রয়োজন। ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে একটি সুগঠিত প্রচার-বিভাগ হইতে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে ব্যাপক ভাবে প্রচারকার্য পরিচালন করা দরকার। দেশের জনসাধারণ যদি বুঝিতে পারে যে তাহাদের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সর্বপ্রযত্নে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের অসন্তোষ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। স্বাধীন ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়।

যুগে যুগে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে ঘনশ্যামল! আজো কি সজল ধারায় আসো না নেমে
আমাদের এই ঊষর হৃদয়ে বহাতে নিঝর প্রেমে?
তারি কলবাণী আনে সুরধুনী,
তাই তো ধরণী আজিও তরুণী,
তুমি আজো গান গাও ব'লে গুণী,
কোলাহল যায় থেমে।
"নাই" বলি তবু কেন—যবে প্রভু, যুগে যুগে আসো নেমে?

তোমারে নয়নে যে দেখেছে—হয় সে স্বপনলোকবাসী,
তোমার বাঁশি যে শুনেছে—তাহার প্রাণ হয় তব বাঁশি।
বেসেছে তোমারে ভালো যে—সে হয়
প্রেমের প্রতিভূ—আলো চিন্ময়,
ছুঁয়েছে তোমারে যে—সে তব জয়
বাণীবাহ হয় প্রেমে।
"নাই" বলি তবু কেন—যবে প্রভু যুগে যুগে আসো নেমে?

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রচার *

স্বামী নিখিলানন্দ

(অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্)

গত ইং ১৯৩৮ সনে আমি এক বার আমেরিকা হইতে ভারতে আসি, তারপর এবার আবার আসিলাম। এই কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—তন্মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা-অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-লাভের জন্য যে সকল বীর সন্তান সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে আমার নমস্কার জানাইতেছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিনায়ক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমার সবিশেষ সশ্রদ্ধ অভিবাদন—তিনি তাঁহার জীবন ও মৃত্যু দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বাধীনতা দ্বারা জাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আমাদের মনে এক নূতন আশা ও প্রত্যয় জাগিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির দরবারে ভারতের মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, স্বাধীনতা বড়ই ঈর্ষ্যাপরায়ণা দেবী—তিনি শুধু অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জন, নিরন্তর সতর্কতা ও অসীম বীর্যবত্তা দ্বারাই প্রসন্না হন। কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা ও নৈতিক মর্যাদাজ্ঞান ব্যতীত স্বাধীনতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা উদ্দেশ্যলাভের উপায়-মাত্র। ইহা একটা জাতিকে আত্মপ্রকাশে সমর্থ করে। পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির ভিতর দিয়া স্বাধীন ইংলণ্ডের এবং সাম্য ও গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া আমেরিকার আত্মা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের বাস্তবতা, আত্মার অমরত্ব, জীবনের ঐক্য ও ধর্মসমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করিয়া ভারত আধ্যাত্মিক পথে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতবাসী তাহার প্রবল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের দিনেও অন্যান্য জাতির রক্তে নিজ হস্ত কখনও কলুষিত করে নাই। ভারতবর্ষ কখনও পর-রাজ্য গ্রাস করে নাই। স্নিগ্ধ কোমল শিশির-বিন্দুর সংস্পর্শে কলিগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া যেমন পুষ্পে পরিণত হয়, তেমন ভারত যেখানেই তাহার সাংস্কৃতিক বার্তাবহ প্রেরণ করিয়াছে সেখানেই জাতিসকলের অন্তর্জীবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আজ সমগ্র জগতের আকাশ অমঙ্গলসূচক কৃষ্ণমেঘে সমাচ্ছন্ন; আবার মৃত্যুর বিভীষিকা চতুর্দিকে করাল মুখ ব্যাদান করিতেছে। ভারত জীবন ও শান্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মানবজাতির বর্তমান চরম বিপর্যয়ে উহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মহিমময় আসন গ্রহণ করুক।

আমেরিকাবাসিগণের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আপনারা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বহু বিষয়ে বাহ্যিক বৈষম্য থাকিলেও, আমেরিকা ও ভারত পরস্পরের প্রতি অত্যাশ্চর্য-

* গত ২রা বৈশাখ (১৩৫৬), ১৫ই এপ্রিল (১৯৪৯) ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ হলে কলিকাতা নাগরিকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজীর বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

রূপে আকৃষ্ট। অতুল পার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়াও আমেরিকা ভারতের আধ্যাত্মিক কৃষ্টির প্রতি অতি উচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ জীবন-ব্রতে প্রভূতপরিমাণে বিশ্বাসবান। পক্ষান্তরে, ভারতও আধুনিক জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য প্রতিভাশালী যুবক-যুবতীদিগকে আমেরিকায় প্রেরণ করিতেছে। ভারত ও আমেরিকা কখনও পরস্পরের অপরিচিত নয়। আপনারা সকলেই বিদিত আছেন, ক্রিষ্টো-ফার কলম্বস ভারতে যাইবার পথ ও উহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঐশ্বর্যভাণ্ডার আবিষ্কার করিবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়া তৎপরিবর্তে আমেরিকায় অপ্রত্যাশিতভাবে উপনীত হইয়া-ছিলেন। বোষ্টন চা-মজলিসে যে চা-এর পেটিকা ছুঁড়িয়া ফেলার দরুন আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই চা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এখনও মার্কিনের দক্ষিণ অঞ্চল ফ্লোরিডা ও টেক্‌সাসে ভারত হইতে আনীত গাভীগুলিই মাত্র হৃষ্ট-পুষ্ট এবং ইহারা 'ব্রাহ্মিণী' গাভী নামে পরিচিত।

আমেরিকাবাসিগণের চিন্তাধারার সহিত ভারতের পরিচয়-লাভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। উক্ত ধর্মমহাসভায় (১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার) সমবেত সাত হাজার নর-নারীকে 'আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলিয়া সম্বোধন করিবার সময় কিরূপে স্বামীজীর মহিমময় ব্যক্তিত্ব, প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডল, সুমধুর কণ্ঠস্বর ও শোভ-মান গৈরিকবসন তাঁহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—সেই কাহিনী এখন ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ইয়াঙ্কিজাতি-সুলভ সাধারণবুদ্ধি-সম্পন্ন ঐ সকল বিজ্ঞ নর-নারী খুব ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরই সুদৃঢ় বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ ঐ ঐতি-হাসিক ধর্মমহাসম্মেলনে দাঁড়াইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইটি মহতী ভাবধারার সংযোগ-সাধন করিয়া উভয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সম্পূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে স্বামিজীর চিন্তা-ধারা ও সমসাময়িক আমেরিকার সাংস্কৃতিক পটভূমিকার সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

গুরু পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিতদের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন, পর্বতগুহায় ও বনে সাধন-ভজন ও ধ্যান, রাজ-রাজড়া ও ভিক্ষুকদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই মাতৃভূমির বিভিন্ন সমস্যার উপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের মেরুদণ্ড এবং বহির্জগতে উহার প্রচারই ভারতের জীবনব্রত। কিন্তু ভারতের ধ্বংসকর দারিদ্র্য, মূক জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অধোগতি এবং সমাজজীবনের অনগ্রসর স্থবিরতা তাঁহাকে সবচেয়ে বেশী ব্যথিত করিয়াছিল। কিরূপে হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, কিরূপে উহাকে আবার এক মহান আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাহক করা যায়—ইহাই স্বামিজীর দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইল। স্বদেশবাসিগণের নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া, তিনি বিজ্ঞানসেবী শক্তিধর পাশ্চাত্য জাতিসকলের নিকট অতি প্রয়োজনীয়

বেদান্তপ্রচার এবং তৎপ্রতিদানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দ্বারা ভারতীয়গণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন, প্রথমতঃ স্বদেশবাসিগণের দারিদ্র্য ও ক্লেশ দূরীকরণের চেষ্টা না করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা নিরর্থক। তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা অধিগত করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইলে আবার জগতের ধর্মগুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিলেন যে, ভগবানের অব্যর্থ নির্দেশেই তিনি নূতন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন।

আমেরিকাও প্রাচ্যদেশীয় তরুণ যোগীকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিক ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই ধর্ম উহার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে 'মেফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে অরোহণ করিয়া যে সকল তীর্থযাত্রী নূতন মহাদেশে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উপাসনার স্বাধীনতার জন্যই প্রথমে ইংলণ্ড ও তৎপর হল্যাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন শাসকবর্গ কর্তৃক ধর্মোপাসনার উপর যে সকল বাধা-নিষেধ আরোপিত হইয়াছিল, ঐগুলি পরবর্তী ঔপনিবেশিকগণ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিবাদ-স্বরূপ আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। দুই শতাব্দী পরে যে সকল ধর্মপরায়ণ বীর্যবান নবাগত ইংরেজ (New Englanders) অমেরিকার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন এই ঔপনিবেশিকগণ।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র ও অধিকার-বিধির মধ্যে কেবল লকের লেখার নহে, পবিত্র বাইবেলেরও প্রভাব সুস্পষ্ট। স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মানুষের সাম্যভাব এবং জীবন, স্বাতন্ত্র্য ও সুখানুসন্ধানের ঈশ্বরদত্ত নির্ব্যূঢ় সত্ত্বের মধ্যে আমরা খৃষ্টীয় আদর্শ—ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের ছাপ দেখিতে পাই। আমেরিকার বিপ্লবের প্রধান তেজস্বী হোতা টমাস্ পেইন্ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'সাধারণ জ্ঞান' ('Common Sense') নামক বিখ্যাত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, "ওহে মানবপ্রেমিক, ওহে উৎপীড়ন ও উৎপীড়কের প্রতিরোধকারী, উঠ, জাগ! জগতের প্রত্যেক স্থানই নির্যাতনে প্রপীড়িত। বিশ্বের সর্বত্রই স্বাধীনতা বিপন্ন; এসিয়া ও আফ্রিকা হইতে বহুকাল পূর্বেই স্বাধীনতা বিতাড়িত হইয়াছে। ইউরোপ স্বাধীনতাকে অপরিচিত কিছু বলিয়া মনে করে; ইংলণ্ডও উহাকে চলিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছে। শরণার্থীকে গ্রহণ কর এবং মানবজাতির জন্য যথাসময় একটি আশ্রয় স্থাপন কর।" এব্রাহাম্ লিঙ্কন্ তাঁহার বিখ্যাত গেটিস্বার্গের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকা স্বাধীনতার উপাসক এবং সকল মানুষের সমানাধিকারবাদে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা-লাভের প্রথম একশত বৎসরের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ন্যায়পরতা ও ঐক্যের জন্য উদগ্র আগ্রহ আমেরিকার চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই পাইয়া বসিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের দৃষ্টিকোণ হইতে এই সকল আদর্শের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতকের আমেরিকার সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচিত্রঘটনাবহুল। এই সকল ঘটনা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল কলম্বিয়ার প্রদর্শনী ও শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনীতে। প্রথমে যে তেরটি উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল ঐগুলিই

পরবর্তী-কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রূপায়িত হয়। অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের আধার এই যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ যে কেবল এক প্রাচীনতর সভ্যতার আদর্শই আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু অজানা দেশ আবিষ্কারের দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা, শিল্প-কৌশল ও অদম্য সাহসও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এই সময়ে আমেরিকায় বহুসংখ্যক বিখ্যাত রাজনীতিক, আবিষ্কারক, আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ্, আদর্শবাদী, কর্মিৎকর্মা, সমরনীতিতে বিশেষজ্ঞ, চিন্তাশীল কবি ও লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীদের নব নব আবিষ্কারসমূহ আমেরিকার কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। ছোট ছোট শহর বড় বড় নগরে উন্নীত হইল। দেশের পার্থিব সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন ও বিবেকবুদ্ধিতে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোয়েকার-সম্প্রদায়ের সমর্থনে ফিলাডেলফিয়া নগরীতে একটী দাসত্ব-প্রথা-বিরোধী সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল আমেরিকান সাহিত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশের কাল। কল্পনাজগতে এই সময়ে যেরূপ সজীবতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এরূপ আর অন্য কোন সময়ে দৃষ্ট হয় নাই। এই যুগে 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ ম্যান্', 'দি স্কার্লেট্ লেটার', 'দি হাউস্ অব্ সেভেন্ গ্যাবল্স্', 'মবি ডিক্,' 'পাইরি' ও 'লিভ্স্ অব্ গ্রাস্' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকে হথর্ন, পো, হুইটিয়ার, লংফেলো, থোরো, হুইটম্যান্, এমারসন্, লোওয়েল্ ও হোম্স্ প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষিগণ আবির্ভূত হন। এই সময়েই ঐতিহাসিক ব্যান্ক্রফ্ট, বিচারক ষ্টরি, শিল্পী ও প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ জন জেম্স্ ওড়ুবন্ ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ আসাগ্রে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। অলৌকিক প্রতীতিবাদ আন্দোলনের (Transcendental Movement) নেতা র‍্যাল্ফ্ ওয়াল্‌ডো এমারসন্ এবং উহার একনিষ্ঠ অনুরাগী থোরো ও আল্‌কট্‌কে একভাবে স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত-আন্দোলনের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। এমারসন্ গ্রীকদর্শন, চৈনিক নীতিবাদ, সুফীদের কাব্য ও ভারতের নিগূঢ় ব্রহ্মবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ভগবদ্গীতার পরম অনুরাগী এবং উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সম্যক্ পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল এমারসনের প্রতিবেশিরূপে হেনরি থোরো হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন। থোরো এসিয়ার ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া একখানা যুক্ত বাইবেল লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল—"প্রাচ্যদেশের আলো"। কংকর্ডে স্থাপিত অলৌকিক প্রতীতিবাদ সমিতি (Transcendental Club) ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে কার্য করিতেছিল। কংকর্ড দার্শনিকগণের সমসাময়িক হুইটম্যান্‌ও বৈদান্তিক আদর্শের প্রায় সমীপবর্তী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'লিভ্স্ অব্ গ্রাস্' নামক গ্রন্থে সর্বজীবের সহিত একাত্মভাব ব্যক্ত হইয়াছে; 'সঙ্ অব দি ওপেন্ রোড্' গ্রন্থ বেদান্তের ভাবে পরিপূর্ণ। গণতন্ত্রের উপাসক হুইট্‌ম্যান্ গির্জার সাম্প্রদায়িক নিয়ম-নীতি ও মতবাদ হইতে মুক্ত একজন স্বতন্ত্রব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ ভিতরের জ্যোতি—'নিভৃত, নীরব ভাবাবেশ'। যে দেশে হুইট্‌ম্যান, এমারসন্, থোরো জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের পক্ষে হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে ও তাঁহার সার্বভৌম বেদান্তের—সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য ও মুক্তির বাণী

উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় নাই।

এমারসন্ ও থোরো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন উহা সেই সময়ে ফলপ্রসূ হয় নাই। হঠাৎ আমেরিকার জীবন-প্রবাহ এক নূতন পথে প্রবাহিত হইল। বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর বস্তুসকল লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমেরিকার অধিকাংশ লোকের মনকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করিল। অর্থনৈতিক উপযোগিতা-লাভের সহায়ক সমিতিসকল স্থাপিত হইতে লাগিল; প্রথম যুগের আধ্যাত্মিক ও বিচিত্র-ভাবোদ্দীপক উন্মাদনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া নিছক প্রতিযোগিতামূলক বস্তুতান্ত্রিক জীবনে পর্যবসিত হইল। কংকর্ডিয়ান্‌দের (Concordians) স্বপ্ন ভাঙ্গিবার জন্য যে সকল ঘটনা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তন্মধ্যে এই কয়টী উল্লেখযোগ্য—(১) ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের 'গোল্ড রাশ' (Gold Rush)—ইহা আমেরিকাবাসিগণের দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; (২) গৃহযুদ্ধ (Civil War)—ইহা আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম বিষাদময় ভীষণ ঘটনা; (৩) বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষিপ্র উন্নতি—ইহা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করিয়া ঐহিক উন্নতির জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়াছিল। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, অর্থগৃধ্নু ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ঔপনিবেশিকগণ দলে দলে ইউরোপের দারিদ্র্যক্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করিতে লাগিল; তাহারা প্রথম ঔপনিবেশিকগণের আধ্যাত্মিক উদ্দীপনাকে প্রভূতপরিমাণে মন্দীভূত করিয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডারউনের 'প্রাণিগণের উৎপত্তি' (Origin of Species) নামক গ্রন্থের প্রকাশম প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মানুষের চিন্তারাজ্যে এক বিপ্লব আনয়ম করিল। ক্রমবিকাশবাদ আইন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, কলা প্রভৃতি প্রত্যেক চিন্তাক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করিয়াছিল।

কিন্তু জনসাধারণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সমাজের এরূপ বাহ্যিক চাক্‌-চিক্য ও ইহসর্বস্বতা দেখিয়া নিরাশ হইলেন; যে মুক্তি ও আনন্দ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ও পার্থিব সম্পদে পাওয়া যায় না, সেই মুক্তি ও আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইল। শিক্ষিত আমেরিকানগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ আদর্শবাদ ও ধর্মভাবের প্রেরণায় এমন একটি দর্শনের (Philosophy) প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যাহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিপন্থী না হইয়া উচ্চতর জীবনাদর্শের পথ নির্দেশ করিবে, মানুষের চিন্তা, ভাব ও কর্মের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করিবে, এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন দাবী ও মানবের বিবিধ আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে। থোরোর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অপূর্ব সমন্বয়-সাধনের নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। নবভাবে ও চেতনায় সঞ্জীবিত, যে কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত সত্যগ্রহণের জন্য সদা উন্মুখ, শ্রেণী-জাতি-বর্ণের সংস্কার হইতে প্রভূতপরিমাণে মুক্ত আমেরিকা ভারতের এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি, প্রাচীন অথচ পৌরুষযুক্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যার বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দকে সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল। আমেরিকাবাসিগণ ধর্মমহাসভায় স্বামীজীকে যে স্বতঃপ্রণোদিত বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তদবধি তৎপ্রবর্তিত বেদান্ত-প্রচার-আন্দোলনে যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন উহার প্রধান কারণ আমার মনে হয় ইহাই।

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ

হিন্দুধর্মের সার্বভৌম দিক শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন; অন্যান্য ধর্মমতসমূহের প্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা ও সহনশীল মনোভাবের উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন; মানবাত্মার ঐশী প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক অনুভূতির যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি এবং ধর্মের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রতিপাদন করেন। এই সমস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রই গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; হিন্দুধর্মের তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহ্বান আসিতে লাগিল। বৈঠকখানা, ক্লাব, সমিতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আবাসগৃহ স্বামিজীর নিকট উন্মুক্ত হইল। সর্বত্রই তিনি পরমসমাদরে সম্বর্ধিত হইতে লাগিলেন। অনলস কার্যাবলীর জন্য যদিও তিনি 'ঝড়ো' (Cyclonic) হিন্দু বলিয়া অভিহিত হইতেন, তথাপি তাঁহার আত্মা নির্জনতা ও ধ্যানের জন্য সদা ব্যাকুল ছিল। তিনি স্বভাবতঃই একজন তত্ত্বজ্ঞ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। দুই বৎসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর শান্তি, বিশ্রাম ও নির্জনবাসের জন্য তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। সেণ্ট লরেন্স নদীর বক্ষে 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' তিনি সাত সপ্তাহ গভীর ধ্যান ও অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। তথায় তিনি ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্যের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালেই অধিক-সংখ্যক সন্ন্যাসিপ্রচারক-প্রেরণ ও বেদান্ত-কেন্দ্রস্থাপনের তাগিদ আমেরিকা হইতে আসিতে থাকে। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের বার জন সন্ন্যাসী তাঁহাদের মহান্ নেতা স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। কর্তব্য-সম্পাদন করিতে করিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চারিজন সন্ন্যাসী সুদূর আমেরিকায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেদান্ত-কেন্দ্রগুলিতে যে সকল ধর্মপিপাসু সমবেত হন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টান—সামান্য-সংখ্যক ইহুদীও আছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা উত্তরোত্তর ধর্মের প্রতি সমধিক আগ্রহশীল হইতেছেন এবং মনঃসংযোগ, ধ্যান প্রভৃতি কার্যকর ধর্মানুশীলনের জন্য প্রস্তুত আছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহারা আচার্যের সাহায্য ও নির্দেশ চান। তাঁহারা চান এমন এক যুক্তিমূলক সার্বজনীন ধর্ম যাহা অন্যান্য সার্বভৌম সত্যসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবে। এই শ্রেণীর নরনারীগণ বেদান্তকেন্দ্রগুলির নিয়মিত শিক্ষার্থী। বহু-সংখ্যক আমেরিকান নরনারী ধর্মানুশীলনের জন্য তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া বেদান্ত-কেন্দ্রগুলিতে সন্ন্যাসি-প্রচারকগণের সহিত বাস করিতেছেন। আশ্রমগুলির বাহিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ধর্মপ্রচারক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ী-দের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসিগণের বন্ধু এবং তাঁহাদের কার্যাবলী ও চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য সন্ন্যাসিগণ গির্জা, শিক্ষালয়, কৃষ্টি সংসদ্ ও অন্যান্য সংঘ কর্তৃক আহূত হইয়া থাকেন। সর্বত্রই তাঁহারা পরম শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য অর্জন করিতেছেন। বেদান্তপ্রচারের কার্য যথারীতি অনাড়ম্বর পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। স্বভাবতঃ, যে নাটকীয় উপাদান বেদান্ত-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল উহা এখন আর নাই। প্রচারকার্য এখন দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলনের সুদূর-প্রসারী ফল নির্ধারণ করিবার সময় এখনও আসে নাই। ধর্মালোচনার জন্য জন-সমাবেশ অথবা আশ্রমগৃহের আকার দেখিয়া বিচার করিলে ফল

খুবই সামান্য বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু ইহার ফল অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে—এখানে সেখানে কতিপয় লোকের জীবনধারার নীরব পরিবর্তন ও যুক্তরাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক চিন্তা উদারভাবাপন্ন হওয়ার মধ্যে দেখিতে হইবে। নূতন সম্প্রীতির ভাব দ্বারা বিচ্ছিন্নতার পুরাতন মনোবৃত্তিকে অপসারিত করিবার একটা অকৃত্রিম চেষ্টা আমেরিকায় দেখা যায়। খৃষ্টান প্রচারকগণ অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে এবং ধ্যান ও আন্তর জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও অন্যান্য ধর্মাচার্যগণের অবতারত্বে বিশ্বাসী হইয়াছেন। যে সকল কারণ যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাজগতে এরূপ বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে তন্মধ্যে বেদান্তপ্রচার মুখ্য। বেদান্ত ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে আমেরিকার আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করিতেছে।

যে আধ্যাত্মিক সেতু ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রকে সংযুক্ত করিয়াছে, উহার নির্মাতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দু ও পাশ্চাত্য বলিষ্ঠ আদর্শের আদান-প্রদান দ্বারা একটা নূতন বিশ্বসংস্কৃতি-গঠনের যে স্বপ্ন স্বামীজি দেখিয়াছিলেন, উহা সফল হইতে বেশী বিলম্ব নাই। বিজ্ঞান ও শিল্প-বিদ্যা শিখিবার জন্য হিন্দু ছাত্রগণ দলে দলে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করিতেছে। পূর্বে সামান্য শিক্ষা অধিগত থাকিলে এই বিদ্যার্থিগণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ফলোপধায়ক বাহক হইতে পারে—ইহাতে ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এদেশের ঐহিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থার জন্য আমেরিকার ব্যবসায়ী ও শিল্প-বিশেষজ্ঞগণ আহূত হইতেছেন। সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের বহুসংখ্যক ছাত্র আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা শিক্ষা করিবার জন্য ভারতে আসিবে।

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে প্রকৃত সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য দুইটি জিনিষ দরকার—প্রথমতঃ আমেরিকাকে শিখিতে হইবে যে ঐহিক অভ্যুদয় অপেক্ষা নৈতিক ও পারমার্থিক উন্নতি অধিকতর মূল্যবান—সুখের বিষয়, আমেরিকা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে ইহা দিন দিন শিক্ষা করিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সভ্যতার সংস্থাপকগণ অত্যধিক নীতিপরায়ণ ও ধর্মশীল ছিলেন। সমগ্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যাহা কিছু স্থায়ী উহা এক অতি উচ্চস্তরের নীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত—এ বিষয়ে যেন আমাদের কোন সন্দেহ ও ভুল ধারণা না থাকে। র‍্যাফেল ও লিওনার্ডো দা ভিন্‌সির চিত্র, মাইকেল এঞ্জেলোর স্থাপত্য, প্যালেষ্ট্রিনা ও বাকের সঙ্গীত এবং মিল্টন, ব্লেইক্, ব্রাউনিং ও টেনিসনের কবিতার উপর ধর্মের ছাপ বর্তমান। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুধর্মের কালোপযোগী নবরূপ-পরিগ্রহ এ সকলের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সনাতন ধর্মের পক্ষে ইহার স্বাতন্ত্র্য হইতে বাহির হইয়া গতিশীল ও আক্রমণাত্মক হওয়া উচিত। পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে সমগ্র জগৎ আজ ধ্বংসোন্মুখ। আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুধর্মের প্রধান দান। পৃথিবী আজকাল আধ্যাত্মিকব্যাধিগ্রস্ত। আর্থিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা এই কঠিন ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। আজিকার বিশ্বব্যাপী আক্রমণাত্মক অনর্থের অভিযানকে গতিশীল পরমার্থ ও সদাচার দ্বারা ব্যাহত করিতে হইবে। অর্থগৃধ্নুতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি যে সকল কু-প্রবৃত্তি ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সমাজ-গঠনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে—এগুলিকে প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়

আত্মিক শক্তি। শুধু নৈতিক মানবতা অথবা শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সংশোধন হইতে পারে না। হিন্দুধর্মের উপর এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। সংকোচনই মৃত্যু। ভারতের চরম সৌভাগ্যের দিনে ধর্মপ্রচারকগণ স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। আজও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দরকার। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্ব-স্থাপনের প্রধান অন্তরায় এই—অনেক ভারতীয় ও আমেরিকান মনে করেন যে ভারতবর্ষই পাশ্চাত্য দেশ হইতে সকল বিষয় শিক্ষা করিবে এবং পাশ্চাত্যের ভারত হইতে শিখিবার কিছুই নাই। সৌহার্দ্য সর্বদাই দ্বিমুখী রাস্তা।

আমি বহু পাশ্চাত্য মনীষীর নিকট শুনিয়াছি যে, হিন্দুদের প্রধান দোষ হইতেছে নিজেদের ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা। নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টির প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রতিও কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না। ম্যাকলে সাহেব ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া হিন্দুজাতিকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন; ইহাতে তিনি প্রায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন। আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবান্বিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের আত্মার সহিতই সংগ্রাম করিতেছেন। আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার জন্য ইহাই বহুলপরিমাণে দায়ী। ভগবদ্গীতার সর্বশেষ শ্লোকে ভারতের উন্নতি ও মহত্ত্বের উপায় সম্বন্ধে এই নির্দেশ আছে :

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

অর্থাৎ যেখানেই যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ক্ষাত্র-শক্তিধর অর্জুনের মধ্যে সহযোগিতা বিদ্যমান, সেখানেই রাজ্যসম্পদ, বিজয়, মহিমা, অব্যভিচারিণী রাজনীতি ও শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত। ইহার অর্থ এই—ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি এবং শাসক-শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকিলেই ভারতের অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। শাসকের সহায়তা না থাকিলে আধ্যাত্মিক শক্তির অবনতি হয়। বিগত সহস্র সহস্র বৎসরের ভারতের ইতিহাসে এই সত্য জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে।

শিক্ষিত হিন্দুগণও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। অনেকেই বলেন, হিন্দুধর্ম নাকি অবৈজ্ঞানিক, পরলোক-সর্বস্ব ও সাম্প্রদায়িক। কথাটি সম্পূর্ণ অসত্য। হিন্দুধর্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিরোধী নয়। হিন্দু ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত উপলব্ধি, যুক্তিবিচার ও অন্যের সাক্ষ্যের উপর পারমার্থিক তত্ত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্গীতা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম কখনও কোনও মতবাদকে চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করে না। বেদ আমাদিগকে পরা ও অপরা, লৌকিক ও অতিলৌকিক উভয়বিধ বিদ্যাই অনুশীলন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, যখন মানুষ অতীন্দ্রিয় সত্তা ও ইহার দেশ-কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বহিঃপ্রকাশ জানিতে পারে তখনই তাহার অজ্ঞান ও সংশয় বিনষ্ট হয়। ঈশোপনিষৎ ঘোষণা করিয়াছেন—যে কেবল জড়-বিজ্ঞানের (অবিদ্যাখ্যা প্রকৃতির) উপাসনা করে সে অন্ধতমে প্রবেশ করে। আর যে কেবল উৎপত্তিশীল ব্যাকৃত কার্যব্রহ্মের উপাসনা করে সে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয় বিদ্যাই অর্জন করেন। জড়বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি আধি-ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দৈহিক বন্ধন হইতে মুক্ত হন,

আর পরা বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। কেবল বিগত তিন শত বৎসর যাবৎ ভারত জড়বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। লর্ড ম্যাকটন্ বলিয়াছেন, তিন শত বৎসরের সংস্কৃতির ব্যর্থতার নিন্দা এবং তিন হাজার বৎসরের সংস্কৃতির কৃতিত্বের উপেক্ষা দ্বারা ইতিহাসের একটা ভুল ধারণাই পোষণ করা হয়।

হিন্দুধর্ম জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয় না, অথবা জাগতিক অভ্যুদয়কে কম মূল্য প্রদান করে না। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের সর্বোচ্চ অনুভূতি যাহাই হউক না কেন, তাঁহারাও সাধারণ ভূমিতে অবস্থানকালে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতকে উপেক্ষা করিতে সাহস করেন নাই; সাধারণ লোককে তাঁহারা ধর্ম ও অর্থ অর্জন এবং সম্ভোগ শক্তি বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা করিলেই কেবল তাহারা মোক্ষ লাভে সমর্থ হইবে। মুক্তির অন্য আর কোন সহজ উপায় বা সংক্ষিপ্ত পথ নাই। হিন্দু ঋষিগণ ব্যতীত আর কেহই কখনও জীবনের অধিকতর পূর্ণাঙ্গ আদর্শ কল্পনা করিতে পারে নাই। ঋষিগণ বলিয়াছেন, বাল্যে বিদ্যার্জন করিবে, যৌবনে পার্থিব সুখসম্ভোগ করিবে, বার্ধক্যে ভগবচ্চিন্তায় কাটাইবে এবং তনু-ত্যাগের সময় ঈশ্বরদর্শনে নিমগ্ন থাকিবে। হিন্দুধর্ম জগৎকে অস্বীকার করে নাই, পরন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে উহার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে।

হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে। খৃষ্টান, ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের মত ইহা বিশ্বাস করে না যে, মুক্তির কেবল একটি মাত্র উপায় আছে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে আমাকে যে ভাবেই ভজনা করুক না কেন, আমি সেভাবেই তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। হিন্দু ধর্মের মূলনীতি—বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকল তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের বাণী হইতেছে স্বধর্মনিষ্ঠা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা। খাঁটি হিন্দুমাত্রই সহজে সার্বজনীন ধর্ম অনুশীলন করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য-জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্বতোভাবে একজন খাঁটি স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু হইয়াও অন্যান্য ধর্মসমূহ আচরণ করিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং সকল ধর্মাবলম্বীই তাঁহার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা ও ধর্মানুভূতি পাশ্চাত্য জগতের বহুসংখ্যক প্রোটেষ্টান্ট, ক্যাথলিক ও ইহুদীর আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতেছে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি,' 'যত মত তত পথ'—ভগবান এক কিন্তু তাঁহাকে জানিবার পথ বিভিন্ন—এই গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই যথার্থ ধর্মসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু, মুসলমানকে খাঁটি মুসলমান, খৃষ্টানকে খাঁটি খৃষ্টান হইতে শিক্ষা দাও—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে ধর্মে ধর্মে সম্প্রীতি, সমন্বয় ও মিলন সাধিত হইয়াছে। ধর্মসমীকরণ, সস্তা উদারতা, নৈতিক মানবিকতা অথবা মার্কিনদেশীয় 'পলিয়ান্না' (Pollyanna) প্রভৃতি মনোবৃত্তিদ্বারা গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্মবিদ্বেষ, মতুয়ার বুদ্ধি দূর হইবে না, অধিকন্তু ধর্মের ভিত্তিই শিথিল হইয়া যাইবে।

শুনিতে পাই, হিন্দুধর্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম এবং ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ—এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই নাকি ভারতে অধুনা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের (secular state) পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই ধারণা ও অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ নহে। আর্য ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত সনাতন ধর্মের সার্বভৌম আদর্শের উপরই ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

প্রতিষ্ঠিত। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সনাতন ধর্ম বহু শাখাপ্রশাখায় সম্প্রসারিত হইয়াছে, অন্যান্য ধর্মের হিতকর অঙ্গসকলকে নিজ কুক্ষিগত করিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই উহার মূল আদর্শের প্রতি অবিচলিতভাবে একনিষ্ঠ রহিয়াছে। যে পর্যন্ত না ইহা স্বীকৃত হয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি উহার প্রত্যেক স্তরেই সনাতন ধর্ম দ্বারা গঠিত, সেই পর্যন্ত আমাদের মাতৃভূমিতে শান্তি, সুখ অথবা শক্তি লাভ হইবে না।

সকলেই জানে যে, অন্য প্রত্যেক বস্তুর ন্যায় হিন্দুধর্মও কিছু বিকৃত হইয়াছে। ইহার জ্যোতির্ময় অন্তস্তল বর্তমানে বহু আবর্জনা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই আবর্জনাগুলিকে সর্বতোভাবে দূর কর, কিন্তু জঞ্জাল দূর করিতে গিয়া হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করিও না। শিক্ষা দ্বারাই কুসংস্কার দূর করা যায়। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেওয়া হউক। যাহা অচল ও জীর্ণ উহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা চিরন্তন সত্য তাহাই উজ্জ্বলতর ও শুদ্ধতর হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। হিন্দুধর্ম প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া যে একটা অপবাদ আছে উহা এইরূপেই আমরা দূর করিতে সমর্থ হইব এবং হিন্দুধর্মকে গণতন্ত্র, সামাজিক সাম্য ও জনকল্যাণ-সাধনের প্রকৃত উপযোগী বাহন করিতে পারিব।

আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির জন্য আমরা অবশ্যই গৌরব বোধ করিব। পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা এই জীবনাদর্শই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। পৃথিবীর মহান্ জাতিসমূহ তাঁহাদের জাতীয় আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য ধন-সম্পত্তি, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন। অধুনা ইংলণ্ড ও আমেরিকা বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য যথাশক্তি সচেষ্ট। কিন্তু আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির শত্রু বাহির অপেক্ষা ভিতরেই বেশী রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদের জন্য আমরা যতই অধিক গৌরব বোধ করিব, প্রাদেশিক বিদ্বেষ, অথবা নাম, যশ ও প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জিনিসকে বিসর্জন দেওয়া ততই আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় নেতৃবর্গের মিঃ চার্চিলের এই গভীরার্থপূর্ণ কথাগুলি স্মরণ করা উচিত—'যাহারা জাতির সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে চায়, তাহারা উহার সুদূর অতীত গৌরবের প্রতিও অবশ্যই দৃষ্টি রাখিবে'।

আধুনিক চিন্তাজগতে ধীরে ধীরে এক বিরাট বিপ্লব গুমরাইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞানের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দেওয়ার দরুন মানুষের শরীর মন ও আত্মার ভারসাম্য সম্যকরূপে বিচলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সমধিক শক্তিশালী হইয়াছে—এই শক্তি যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে যে কেবল তাহারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা নহে, পরন্তু মানব-সভ্যতাও বিপর্যস্ত হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য এই শক্তি পরিত্যাগ করিবে না। কিরূপে নিজেদের ও সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য এই শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে—ইহাই প্রধান সমস্যা। ধর্মই এই সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে। কারণ জীবন ও জগতের নিছক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যের মনকে আর পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। কিরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, জড়ত্ব, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করা যায়—ইহাই ভারতের প্রধান সমস্যা। বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা ইহার সমাধান হইতে পারে। অন্যথা মানুষের দেবত্ব এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি আমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক

আদর্শসকল কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও দার্শনিক তত্ত্বেই পর্যবসিত থাকিবে।

এই যুগের প্রধান অনর্থ হইতেছে ধর্ম হইতে বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়া। বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর-সাপেক্ষ। মানবজাতির কল্যাণের জন্য ধর্ম হইবে বিজ্ঞানসম্মত, আর বিজ্ঞান হইবে ধর্মানুশাসিত। ইহার অর্থ এই—ধর্ম যুক্তিবিরোধী হইবে না, আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রয়োগ ধর্মনীতি-বিগর্হিত হইবে না। বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের মধ্যেই মানবজাতির ভাবী আশা-আকাঙ্ক্ষা নিহিত। কয়েকমাস পূর্বে রোমে অধ্যাপক শাস্তায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র বেদান্তই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ব্যবধান দূর করিতে পারে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্নতিতে পাশ্চাত্য অগ্রণী; আর প্রাচ্য আধ্যাত্মিক সত্যের রক্ষক। বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর আমেরিকা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অভিভাবক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আধ্যাত্মিক এসিয়ার হৃদয় ভারতবর্ষ। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাকেই পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়াছিলেন। থোরোর ন্যায় স্বামীজি এক নব বিশ্বসংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

অতীতে যখনই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সংঘটিত হয়, তখনই তৎসঙ্গে মানবীয় চিন্তারাজ্যে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইত। বিজ্ঞান ও শিল্পবিস্তার প্রসারহেতু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুনঃ সম্মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় প্রাচ্যদেশীয় সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য বিদেশী বলিয়া পরিবর্জন করিয়াছিল। মিলনের দ্বিতীয় স্তরেও অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বিদেশী বলিয়া মনে করিত বটে কিন্তু উহাকে জানিবার জন্যও আগ্রহশীল হইয়াছিল। এক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। এখনও বহু বিষয়ে বিদেশী বলিয়া বিবেচনা করিলেও পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বুঝিতে এবং উহার সংস্কৃতি আয়ত্ত করিতে চায়।

যে অপরিবর্তনীয় ঘটনাস্রোতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সংঘটিত হইতেছে, সেই মিলন যেন পৃথিবীতে যথার্থ শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে—শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

"যাও, যাও—সেই প্রাচীন কালের ভাব লইয়া এস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। আর ইহা ব্যতীত ভারতে বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

মহাযানিক দর্শনের উৎপত্তি ও প্রগতি

(সত্যসিদ্ধি, মাধ্যমিক ও যোগাচার)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

সত্যসিদ্ধিবাদ ॥—দক্ষিণদেশে হীনযানীদের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মত। বুদ্ধ ভগবানের আবির্ভাব কাল প্রায় ৬৪০ খৃঃ পূঃ। ঐ মতের প্রতিষ্ঠাতা হরিবর্মা শ্রীবুদ্ধ-জন্মের প্রায় ৮৯০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ২৫০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তাঁর গ্রন্থের নাম "সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র"। এঁর মতবাদই ভাষ্যাদিতে "সর্বশূন্যবাদ"রূপে মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদিও হরিবর্মা হীনযান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তথাপি এ মত হলো "সর্বাস্তিত্ববাদের" ঠিক বিপরীত এবং মাধ্যমিক নাগার্জুনের "আত্যন্তিক শূন্যতা-বাদ" হতেও ভিন্ন; প্রকৃতপক্ষে সর্বশূন্যবাদ হীনযান এবং মহাযানের মধ্যবর্তীকালীন দর্শন (philosophy of transition period)। শংকর যখন ভাষ্য লেখেন ভারতবর্ষ তখন হরিবর্মাকে ভুলে গেছে, কেবল "সর্বশূন্যবাদ" কথাটা দার্শনিক-চিন্তাকাশে একটা ছায়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছে এবং বিদ্বানদের পর্যবেক্ষণে নাগার্জুনের মতের সহিত একটা ভ্রান্তিগ্রহ সৃষ্টি করছে। কিন্তু এখনও চীন দেশে তাঁর গ্রন্থের কুমারজীব কর্তৃক অনুবাদ বর্তমান।

সর্বাস্তিত্ববাদীরা পঞ্চস্কন্ধের নিত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু হরিবর্মা পঞ্চস্কন্ধের মূল ধাতুরও শূন্যতা প্রমাণ করেন; অর্থাৎ সর্বাস্তিত্ববাদীরা, মূল পঞ্চ-স্কন্ধ-সমবায়ে যে বিভিন্ন সাংবৃতিক ব্যক্তিগত "নৈরাত্ম্য" বা "অনাত্মা"র (non-ego appearing as personal ego) প্রতীতি হয়, তারও নিত্যত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু হরিবর্মা সাংবৃতিক পঞ্চস্কন্ধের সহিত অসাংবৃতিক মূল পঞ্চস্কন্ধেরও শূন্যতা প্রমাণ করে মহাযান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করে দেন।

হরিবর্মা প্রথমে নব্যকারিকা-সাংখ্যসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, পরে তিনি সর্বাস্তিত্ব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁদের সঙ্গেও তাঁর মতভেদ হয়। তাঁর সময়ে কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, সিংহলে বুদ্ধঘোষ এবং মধ্যদেশে বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগ প্রভাবান্বিত। হরিবর্মা বৌদ্ধ জগতে প্রথম প্রচার করলেন যে জীব এবং জীবেতর সব কিছুই সাংবৃতিক—বৈদান্তিক ব্যবহারিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা চলে, কিন্তু তাদের পারমার্থিক স্বরূপ শূন্যতা। কারণ শ্রীবুদ্ধের নৈরাত্ম্যর (non-ego of persons and things) নিত্যত্ব-স্বীকার মানে, নব্য-কারিকা-সাংখ্যের আত্মবাদই স্বীকার করা হয়ে পড়ে। তা ছাড়া তিনি কাত্যায়নী-পুত্রের পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, অষ্টাদশ ধাতু, দ্বাদশ প্রতীত্যসমুৎপাদ, ত্রিলোক (কাম, রূপ ও অরূপ ধাতু), চতুর্বিধ জন্ম (অণ্ডজ, সংস্বেদজ, জরায়ুজ এবং উপপাদুক), চতুর্বিধ কল্প (অন্তর, মহা, সার এবং শূন্য) এবং বুদ্ধ ভগবানের ধর্মকায়ের পাঁচটী অঙ্গ (শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি এবং বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন) প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ই আলোচনা করেছেন। হরিবর্মা মনটীকে তিনটী দৃষ্টিভঙ্গীতে (in three perspectives)

দেখেছেন—(১) সাংবৃতিক নামরূপায়ত (provisional and nominal), (২) অসাংবৃতিক ধাতুরূপ (পারমাণবিক) এবং (৩) পারমার্থিক শূন্যতারূপ (all nothingness) এবং তদনুপাতী ধর্মও তিনি ত্রিবিধরূপে বর্ণনা করেছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়॥—এ দর্শনের আবিষ্কারক ব্রাহ্মণ নাগার্জুন অন্ধ্রদেশ-নিবাসী (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হতে তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত)। এঁর প্রধান শিষ্য কানদেব বোধিসত্ব এবং আর্যদেব। আর্যদেব নাগার্জুনের প্রধান গ্রন্থ "মাধ্যমিক শাস্ত্রে"র টীকাকার এবং লঙ্কাবতার-সূত্রকার। বৌদ্ধমহলে নাগার্জুন "অত্যন্ত শূন্যবাদী" বা "ধর্মতথাত্ববাদী" বলে খ্যাত। হরিবর্মার "শূন্যতা"কে emptiness, nothingness বা Nihilism বলা চলে, পরন্তু নাগার্জুনের "অত্যন্ত শূন্যতা" এমন একটী পদার্থ, সেখানে সর্বাস্তিত্ববাদীদের সাংবৃতিক এবং পারমার্থিক উভয়েরই অভাব, কারণ ও দুটী পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ (relative terms)। নাগার্জুন সাংবৃতিক ও পারমার্থিক তত্ত্বদ্বয়কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) ক্ষণিক দৃশ্যতা সাংবৃতিক, যার তুলনায় শূন্যতা পারমার্থিক; (২) ক্ষণিক দৃশ্যতা ও শূন্যতা সাংবৃতিক, যাদের তুলনায় দৃশ্যতাভাব এবং শূন্যতাভাব পারমার্থিক; (৩) ক্ষণিক দৃশ্যতা ও শূন্যতা এবং দৃশ্যতাভাব ও শূন্যতাভাব সাংবৃতিক, যাদের তুলনায় উক্ত ভাবদ্বয়াভাব পারমার্থিক; (৪) ক্ষণিক দৃশ্যতা ও শূন্যতা এবং এতদভাবদ্বয়াভাব সাংবৃতিক যাদের তুলনায় দৃশ্যতাভাব ও শূন্যতাভাব এবং এতদভাবদ্বয়াভাব অর্থাৎ দৃশ্যতাভাবাভাব এবং শূন্যতাভাবাভাব এবং শেষোক্তাভাবদ্বয়াভাব পারমার্থিক। [এ গুলি বৃহদারণ্যকস্থ নেতি মার্গের সহিত (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬।৪।২।৪।৪। ২।২২) তুলনা করুন]। কিন্তু এরূপ বিভাগে অদ্বৈত বেদান্তীরা অনবস্থ দোষ দেখান। নির্বাণে শূন্যতা বলেও কিছু থাকে না, সেইজন্য তাঁর মতবাদ "অত্যন্ত-শূন্যতা"। "বুদ্ধ কখন বলছেন আত্মা আছে, কখন বলছেন আত্মা নেই, আবার কখন বলছেন আত্মা বা অনাত্মা কিছুই নেই"—(মাধ্যমিক শাস্ত্র ১৮।৬)। নাগার্জুনের সংস্কৃত (composite) জগৎ হচ্ছে উৎপত্তিক্ষণবিশিষ্ট সাংবৃতিক কার্যকারণসমন্বিত পরিবর্তনধারা (a constant flux of becoming)। এই উৎপত্তিক্ষণবিশিষ্ট প্রতীয়মান কার্যকারণসম্বন্ধবিশিষ্ট ক্ষণিক খ-পুষ্পবৎ দৃশ্যগুলি মিথ্যাদৃষ্টিজন্য। ঠিক গৌড়পাদের "অলাতশান্তি"—কারিকার মতই তিনি বহু পূর্বেই বলেছেন, "যদি তুমি মনে কর যে এই ক্ষণিকদৃশ্যগুলির নিজেদের কোন স্বাভাবিক সত্তা আছে, তাহলে তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে তারা অকারণ"—(মাধ্যমিক শাস্ত্র ২৪।১৬)। [আর্যদেব এর টীকায় বলছেন, "যদি সংস্কৃত-ধর্মের (phenomena) কোন স্বাভাবিক সত্তা থাকত, তা হলে তা তার কার্যকারণসম্বন্ধ হতে স্বতন্ত্র হতো এবং তাদের উৎপত্তি বিনাশও সম্ভব হতো না।"] "অতএব কার্যকারণ, ক্রিয়া, উৎপাদ এবং নিরোধ সবই মিথ্যাদৃষ্টিজন্য শূন্যই"—(মাঃ শাঃ ২৪।১৭)। আবার শ্রীশংকর যেমন ব্রহ্মসূত্রের উপোদ্ঘাত-ভাষ্যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শাস্ত্র সবই মায়িক বলছেন, নাগার্জুন বহুপূর্বেই সে কথা তাঁর "মাধ্যমিক শাস্ত্রে" প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলেন, "বুদ্ধেরা জীবের মিথ্যাদৃষ্টি-অপসারণের জন্য "শূন্যতা" সম্বন্ধে উপদেশ করেছেন; কিন্তু যারা বিচারপূর্বক এই জগৎ-কারণ "শূন্যতা"কে আশ্রয় করে, তাদের মিথ্যাদৃষ্টি হতে উদ্ধার করা চলে না।"—মাঃ শাঃ ১৩।৮)। [আর্যদেব এর টীকায় বলেছেন,

"যেমন বিষম-ঔষধ ব্যাধি সারিয়ে অন্য ব্যাধির সৃষ্টি করে মাত্র।"]

নাগার্জুন শংকরের ন্যায় ব্যবহারিক সত্তাও স্বীকার করেছেন—

"ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগচ্ছতে॥"—

(মাঃ শাঃ ২৪।১০)

পারমার্থিক সত্য ব্যবহারিক জগৎকে আশ্রয় না করে উপদেশ করা চলে না, আবার পারমার্থিক সত্য না জানলে নির্বাণ লাভ হবে না।" এখানেই নাগার্জুনের প্রধান নিগ্রহস্থান। উৎপত্তিক্ষণবিশিষ্ট খ-পুষ্পবৎ জগৎ স্বীকার করলে ব্যবহারও সিদ্ধ হয় না। কারণ উৎপত্তিক্ষণমাত্র যার সীমা তার ইদমাখ্য প্রত্যক্ষতা বা স্থিতিও সিদ্ধ হয় না; পরন্তু রজ্জুসর্পবৎ দৃষ্টান্তে ব্যবহার সিদ্ধ হয়, কারণ অবিদ্যানাশ পর্যন্ত রজ্জু-সর্পের উৎপত্তিস্থিতি নাশ ক্ষণাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তির পৌনঃপুনিকতার স্থায়িত্ব স্বীকার করা চলে, কাজে কাজেই ব্যবহারিক স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, পরলোক ও উপদেশ সিদ্ধ হয়।

অপবাদ ন্যায়ে নাগার্জুন সংসারকেও স্বরূপতঃ নির্বাণস্বরূপই বলেছেন (মাঃ শাঃ ২৫।৩৯)। ছান্দোগ্যের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মের" (৩।১৪।১) প্রতিধ্বনি নাগার্জুনেও দেখতে পাই—

"তথাগতো সৎস্বভাবস্তৎ স্বভাবমিদং জগৎ।
তথাগতো নিঃস্বভাবো নিঃস্বভাবমিদং জগৎ॥"—

(মাঃ শা ২২।১৬)

এবং "সংস্কৃত অসংস্কৃত যাবতীয় ধর্মের স্বরূপ অনির্বাচ্য, অনির্দেশ্য, অনুৎপন্ন, অনিরুদ্ধ নির্বাণ-স্বরূপ"—(মাঃ শাঃ ১৮।৭)। বেদান্তী বলেন, সবই দেশকালাত্মক, অতএব অপূর্ণ ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ, অনির্দেশ্য হলেও "সচ্চিদানন্দ" শব্দের দ্বারা তিনি উপদেশ্য। মাধ্যমিকেরা বলেন, সবই ক্ষণিক, মিথ্যাদৃষ্টিহেতু সত্য বলে বোধ হচ্ছে, সত্যদৃষ্টিতে সর্বব্যবহারই নির্বাণে শূন্যতা লাভ করেছে। কেবল শংকর জিজ্ঞাসা করেন, সবই ক্ষণিক বটে, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন ক্ষণিকত্বও বুঝা যায় না, এবং আত্যন্তিক শূন্যতাটাও কি বিশুদ্ধ জ্ঞানের একটা শেষ উপাধি নয়?

যোগাচার-সম্প্রদায় বা বিজ্ঞানাত্মবাদ॥—এ মতের প্রথম দ্রষ্টা অযোধ্যানিবাসী ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়নাথ (খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক ২৭০—৩৫০) এঁর প্রধান শিষ্য গান্ধারনিবাসী ব্রাহ্মণভ্রাতৃদ্বয় অসঙ্গ ও বসুবন্ধু। অসঙ্গ প্রথম সর্বাস্তিত্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, পরে বসুবন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন। তা ছাড়া নন্দ, দিঙ্নাগ, ধর্মপাল এবং শিলভদ্র প্রভৃতিও এ মতের প্রধান প্রচারক। শিলভদ্র হুয়াংসাংএর গুরু ছিলেন। মৈত্রনাথের "পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্র" এবং অসঙ্গের "মহাযান সূত্রালঙ্কারশাস্ত্র" হলো এ দর্শনের প্রধান গ্রন্থ।

সর্বাস্তিত্ববাদ হচ্ছে বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদের (Objective and Material) দিক থেকে নির্বাণের ব্যাখ্যা, আর বিজ্ঞানাত্মবাদ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের (Subjective and Psychologicial) নির্বাণের ব্যাখ্যা। প্রথমোক্তেরা কার্যকারণাত্মক সংসারকে দুভাগে বিভক্ত করছেন—(১) সমুদয় সত্য অর্থাৎ যা হলো সংসারের হেতু এবং (২) দুঃখ সত্য অর্থাৎ যা হলো সংসাররূপ ফল। সংসারের বিপরীত যে নির্বাণ তারও দুটো দিক—(১) মার্গসত্য অর্থাৎ নির্বাণলাভের হেতু এবং (২) নিরোধ-সত্য অর্থাৎ নির্বাণরূপ ফল। সর্বাস্তিত্ববাদীরা প্রতীয়মান বাহ্যজগতের যেরূপ সুনিপুণ বিশ্লেষণ করে তার অনিত্যতা দেখিয়ে লোককে শ্রীবুদ্ধ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতে বলেছেন, সেরূপ বিশ্লেষণ তাঁরা আন্তর জগতের করেন নি, তাঁদের

মনোবিজ্ঞান খুব প্রাথমিক না হলেও এঁদের তুলনায় অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ। যোগাচারীরা বিজ্ঞানাত্মা বা আলয়বিজ্ঞানবাদের দ্বারা দেখালেন যে জগৎটা আর কিছু নয়, কেবল বিজ্ঞানের বিচিত্র ধারা,—অসংস্কৃত ও সংস্কৃত ধর্ম উভয়ই বিজ্ঞানময়। এ মত বেদান্তীদের দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদের অনুকূল। সর্বাস্তিত্ববাদীরা মনস্তত্বের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি বলে, তাঁরা "কর্মবাদে" পৌঁছলেও "কর্ম্মবীজের" সন্ধান পান নি। মৈত্রনাথ "আলয়বিজ্ঞান" বিশ্লেষণ দ্বারা তার সমাধান করেছেন, আলয়বিজ্ঞানেই বুদ্ধত্ব ও নৈরাত্মত্বের (জীবত্বের) বীজ নিহিত। ধর্মাধর্ম, সুখদুঃখ, সদসৎ প্রভৃতি সকলেরই বীজ এই "আলয়-বিজ্ঞান" বা যাবতীয় বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। এই বীজগুলিকে তাঁরা দুভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) সাশ্রব (ক্লেশমূল) এবং (২) অনাশ্রব (অক্লেশমূল)। প্রথমটী হলো "চত্বারি আর্যসত্যানি"এর প্রথম দুটী—দুক্‌খ ও দুক্‌খ-সমুদায় (দুঃখহেতু) এবং দ্বিতীয়টী হলো ঐ আর্যসত্যের শেষ দুটী—দুক্‌খনিরোধ এবং দুক্‌খনিরোধ-মাগ্‌গ। অথবা প্রথমটী হলো সর্বাস্তিত্ববাদের সমুদয় সত্য ও দুঃখ সত্য এবং দ্বিতীয়টী হলো মার্গ সত্য ও নিরোধ সত্য।

[অতঃপর পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা আলয়-বিজ্ঞানের আর একটু বিশ্লেষণ করে, আলয়-বিজ্ঞানের দুটী বিশিষ্ট শাখা "ভূততথাত্ববাদ" ও "অবতংশক বিদ্যালয়" সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব। এই প্রবন্ধচতুষ্টয়ের দ্বারা মহামহিম শাংকরদর্শন-প্রবাহের একটী বিশিষ্টমূল উৎসের সন্ধান আমরা প্রাপ্ত হই।]

বহুরূপী

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কহিল পথিক কোন ফিরি' আসি ঘরে
"দেখিনু অদ্ভুত এক জীব বৃক্ষোপরে,"—
বালারুণ মত রঙ টকটকে লাল,"
বন্ধু বলে, "নীল রঙ দেখেছি যে কাল।"
এক জন বলে লাল, অন্যে কহে নীল,
বিবাদ বাধিল ঘোর ক্রমে তিল তিল ;
শুনি' তাহা বহু লোক হ'ল সমবেত,
সাদা, কাল, হল্‌দে, ভিন্ন, তা'রা কহে সেত।
মহা কোলাহলে সবে গেল সেথা শেষে,
বৃক্ষতল-গৃহবাসী শুনি' কহে হেসে,
"ক্ষণে ভিন্ন রঙ তা'র, কভু কিছু নাই,
বহুরূপ দেখি নিত্য বসি' হেথা ভাই ;
তর্ক কেন ? সকলেই দেখিয়াছ ঠিক্,
বস্তু একই, মিছে কেন ছোট চতুর্দ্দিক ?"

শাক্ত ও বৈষ্ণবের দুর্গা

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ

সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বদেবময়ো মনুঃ॥

গীতা সকল শাস্ত্রের সার, পাপতাপহরণকারী হরি সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান, গঙ্গা সকল তীর্থের ফল-স্বরূপ এবং মনু ও মনুলিখিত শাস্ত্র নিখিল দেবতার অনুমোদিত। এই উত্তম শ্লোকটি বলা হয়েছে—ভগবদ্‌গীতা শেষ হওয়া মাত্র বৈশম্পায়ন কর্তৃক রাজা জনমেজয়ের নিকট। মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় অতিশয় ভক্তির সহিত মহাভারত শুনছেন, ঋষি বৈশম্পায়ন মহাভারত বলছেন। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী শুনতে কার না ইচ্ছা হয়? জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ,—তাঁর পিতা অভিমন্যু, তাঁর পিতা অর্জ্জুন, তাঁর পিতা পাণ্ডু। অতএব পাণ্ডুবংশের প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনবার জন্যে রাজা জনমেজয়ের আকুল আগ্রহ। পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি কিরূপে ধর্ম্মযুদ্ধ করলেন, ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হলেন, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট হল, এই সমস্ত কাহিনী শুনতে শুনতে পুলকিততনু, গলদশ্রুলোচন জনমেজয় কখনো হৃষ্ট, কখনো উদ্বুদ্ধ, কখনো বা রোমাঞ্চিতকলেবর!

মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্বে ১২২ অধ্যায়। তন্মধ্যে ২৫ অধ্যায় হ'তে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবদ্‌গীতা। মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৮। এই আঠারো সংখ্যাটি সকলের পক্ষে স্মরণীয়, কেন না কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে সেনার সংখ্যা ছিল ১৮ অক্ষৌহিণী, কুরু ১১+পাণ্ডব ৭ =১৮। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়েছিল ১৮ দিন। মহাভারতের পর্ব্বসংখ্যা ১৮। অর্থাৎ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত। তার মধ্যে গীতাশাস্ত্র; এতেও ১৮ অধ্যায়। মহাপুরাণ ১৮, উপপুরাণ ১৮। হিন্দুদের বিদ্যা ১৮।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ম্।
অর্থনীত্যা সহৈতানি বিদ্যা হ্যষ্টাদশ স্মৃতাঃ॥

পৃথিবীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রসায়ন, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি যত শাস্ত্র বিদ্যমান, সমস্ত অন্তর্ভুক্ত আছে ঐ আঠারো রকমের শাস্ত্রে।

গীতার অধ্যায় আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব-অধ্যায়ে একটি চমৎকার শ্লোক বলা হয়েছে—

যত্র ধর্ম্মো দ্যুতিঃ কান্তির্যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথা মতিঃ।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥

এই শ্লোকের সঙ্গে অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রয়েছে গীতার শেষ শ্লোকটিতে—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥
যেই পক্ষে বিরাজেন কৃষ্ণ যোগেশ্বর।
বিরাজিত যেই পক্ষে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সেই পক্ষে শ্রী বিজয় উন্নতি ও নীতি।
ইহাই নিশ্চয় মোর মত হে নৃপতি॥

তাৎপর্য্য এই, যে পক্ষে ধর্ম্ম আছেন সেই পক্ষে আছে দ্যুতি, দীপ্তি, কান্তি, কমনীয়তা, হ্রীঃ, লজ্জা,শালীনতা, শ্রী, শোভা, রাজ্যলক্ষ্মী, ধন,সম্পদ, তথা—মতি-সুবুদ্ধি। শেষ বলা হ'লো, যে পক্ষে ধর্ম্ম সেই পক্ষে থাকেন ভগবান, এর উল্টা কথা হ'লো, যে পক্ষে ভগবান্ সেই পক্ষে ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম ভগবান্ ভিন্ন থাকেন না, ভগবান্‌ও ধর্ম্ম

ভিন্ন থাকেন না। ধর্ম্মই সত্য। সত্যই ধর্ম্ম, কাজেই সত্য ভগবান্, সত্য ধর্ম্ম, সত্য শ্রীকৃষ্ণ।

অপর এক বিষয় বৈষ্ণবদের পক্ষে অদ্ভুত—সমস্ত বৈষ্ণব না হলেও কতক বৈষ্ণবের। গীতা-অধ্যায়ের আরম্ভকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আদেশ করছেন দুর্গাস্তোত্র পাঠ করবার জন্য। তারপর অর্জ্জুন রথ হ'তে নেমে পবিত্র মনে ভক্তিপূর্ণচিত্তে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করেন। এতে তাঁর শক্তিবৃদ্ধি হয়। তারপর আবার উঠেন রথে, তখন থেকেই আরম্ভ হয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে কথোপকথন—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব তত্ত্ব।

গীতাশাস্ত্রের যাঁরা প্রকৃত শ্রোতা কিংবা পাঠক তাঁরা ভাবেন, যিনি দুর্গা, তিনি শুধু শাক্ত বা শৈবের উপাস্যাই নন, তিনি বৈষ্ণবদেরও উপাস্যা। কেন না দুর্গাকে বলা হয়েছে—বৈষ্ণবী শক্তি, নারায়ণী শক্তি। "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা" তুমি যে বিষ্ণুর শক্তি, শক্তিময়ী মাতা—তোমাকে নমস্কার।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আমরা সেই অংশটুকুর আলোচনা করলে জানতে পারি যেখানে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী শক্তির সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে, শিব ও দুর্গা, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, ব্রহ্ম ও মায়া, চৈতন্য ও স্থূল পদার্থ—সব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত; নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ এক; নাম তার ভিন্ন। নবম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হ'য়েছে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥

ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে, আর সেইজন্যই জগতের পরিণাম ঘটে।

হে কৌন্তেয়, অধিষ্ঠান বশতঃ আমার।
প্রকৃতি সচরাচর প্রসবে সংসার॥
আমার সান্নিধ্যমাত্র কারণে ধীমান্।
এ জগৎ পুনঃ পুনঃ হয় জায়মান॥

আরও বলছেন—প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

নিজ প্রকৃতিতে আমি অধিষ্ঠিত হয়ে।
বারং বার সৃষ্টি করি সংসার নিলয়ে॥

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন, এই কাত্যায়নী বা দুর্গা বৈষ্ণবী শক্তি ভিন্ন আর কেউ নন। ইনি মহামায়া, বরদা, ভক্তিবৎসলা। অতএব অর্জ্জুনকেও তিনি বরদান করছেন—স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।

অতি অল্পকালে তুমি হে পাণ্ডুনন্দন।
অগণ্য শত্রুর সৈন্য করিবে নিধন॥

একদিকে ভগবতীর আশীর্ব্বাদ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ; অতএব ধর্ম্মের জয় নিশ্চিত—ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধর্ম্মকে রক্ষা করে চললে সেই ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে। শক্তিমানের ধর্ম্ম শক্তি, ইহাকে কেউ বলেন শিবা, কেউ বলেন সর্ব্বমঙ্গলা। বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী; বিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে বিদ্যমানা, তাঁর নাম দেওয়া যায় সর্ব্বব্যাপিনী; 'আধারভূতা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা, বিশ্বেশ্বরী'। মূলতঃ উভয় শক্তি এক, উভয় শক্তিমানও এক। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও পণ্ডিত জওহরলাল

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, সাহিত্যবিনোদ

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার Discovery of India গ্রন্থখানি না লিখিলে এই প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর বলিয়াই মনে হইত। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার ইতিহাসে বিবেকানন্দের কথা অপরিহার্য্য, শুধু সংস্কারক হিসাবে নহে, নব ভারতের এক আশ্চর্য্য অভ্যুত্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হিসাবে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়। স্বামীজীর অভ্যুদয়কালে সমাজে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রে এক প্রবল বিপ্লব চলিতেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচ্ছন্ন আক্রমণ ও তাহা হইতে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা,—এই আঘাত ও প্রত্যাঘাতের ফলে সমাজে ও ধর্ম্মে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার নবীন আদর্শের সংঘর্ষে ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপ্লব সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই যুগান্তব্যাপী সংগ্রাম ও সংস্কার-আন্দোলনই উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের ইতিহাস। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সহিত সনাতনীদের বিরোধ উনবিংশ শতাব্দীর আর একটি অধ্যায়। তারপর সমন্বয়াচার্য্য যুগাবতার রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব। ঘাত-প্রতিঘাত ও চাঞ্চল্যের মধ্যে এক মহাসমন্বয়ের অভিব্যক্তি ও স্বভাবধর্ম্মের এক অতি আশ্চর্য্য বিকাশ ও পরিণতি। স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন যে রামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সঙ্গে নব ভারতের সূত্রপাত হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল এই উনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকায় স্বামীজীকে বিচার করিয়াছেন। উত্তর ভারতে সেই সময়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হইয়া আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর্য্যসমাজের মূলনীতি বৈদিকধর্ম্ম প্রচার, বেদবিহিত জীবনযাপন। এমন কি বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ও পরবর্ত্তী কালের অন্যান্য মতবাদ সবই আর্য্য সমাজের কাছে অগ্রাহ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। এই মতবাদের একদেশদর্শিতা ইসলাম ধর্ম্মের একদেশদর্শিতার সঙ্গে তুলনীয়। ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ারূপেই দয়ানন্দ সরস্বতীর বৈদিক আন্দোলনের সূত্রপাত। সুতরাং ইহাকে খাঁটি সংস্কার-আন্দোলন বলিতে বাধা নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে এই হিসাবে প্রচারক বা সংস্কারক বলা ঠিক হইবে না। তাঁহারা সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারের জন্য বিশিষ্ট কোন মতবাদ প্রচার করিতে উদ্যত হন নাই। এক কথায় সেই সময়কার আদর্শভ্রষ্ট ও ভ্রান্তগতি যুগ-প্রবাহের মধ্যে অটল মহীরুহের মত দাঁড়াইয়া যাহা শাশ্বত অথচ পুনর্নব, তাহারই প্রতি দেশের ও জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনে নব প্রাণ-সঞ্চারই ইহার লক্ষ্য, সত্যধর্ম্মকে ভ্রান্ত-সংস্কার-স্তূপ হইতে উজ্জ্বল আলোকে লোক-সমাজের গোচর করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন নাই। ইহার মধ্যে নিছক প্রচারবাদের গন্ধ নাই, ইহার মধ্যে একদেশদর্শিতার কোন প্রশ্রয়ও নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে,

উপনিষদের আলোকে দেদীপ্যমান মানব-ধর্ম্মের উজ্জীবনই স্বামীজীর জীবনব্রত। এই মানবধর্ম্মই তাঁহার জীবনে নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানব-প্রেমে, মানব-সেবায় ও আন্তর্জ্জাতিক চিন্তাধারায়। উপনিষদের সাধনা দুর্ব্বলের বা জড়ের সাধনা নহে,—ইহা বীর্য্যের সাধনা, ত্যাগের সাধনা, নিষ্কাম কর্ম্মব্রতের সাধনা; এক কথায় শাশ্বত মানব-ধর্ম্মের সাধনা। জওহরলাল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, স্বামীজীর আন্তর্জ্জাতিক ভাবধারা তাঁহার বেদান্ত-সাধনার ফল।

স্বল্প পরিসরের মধ্যে জওহরলাল স্বামীজীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ত্যাগদীপ্ত মহিমময় পুরুষকারের মুর্ত্তিই বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়াছে: "A fine figure of man, imposing, full of poise and dignity, sure of himself and his mission, and at the same time full of dynamic and fiery energy and a passion to push India forward."

জওহরলাল নিজেও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অপরাজেয় সৈনিক,—তাঁহার জীবনেও ত্যাগ ও বীর্য্যের সাধনা; জাতীয়তাবাদী হইয়াও তাঁহার ভাবধারা আন্তর্জ্জাতিক। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও কখনও কোথাও অন্ধভাবাবেগে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার Discovery of India গ্রন্থখানিতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও চিন্তার গভীরতা আমাদের আশ্চর্য্য ও চমকিত করিয়া তোলে। ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে তিনি অতল চিন্তা-বারিধির গর্ভে অকুতোভয়ে অবতরণ করিয়াছেন। কোথাও তিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন নাই। চিন্তা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির কৌস্তভমণি তিনি আহরণ করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য বিষয়; তবে তিনি একটি তথ্য আমাদের উপহার দিয়াছেন যে, যে-শক্তি হিন্দুজাতিকে আজিও জগতের বুকে টিকিয়া থাকিতে সাহায্য করিয়াছে সে-শক্তি কখনও অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু সেই শক্তি সত্ত্বেও জীবন-সংগ্রামে কেন আজ আমরা পশ্চাৎপদ? কেন আজ আমরা জড়তা ও তামসিকতার অন্ধ গহনে নিমজ্জিত? এই প্রশ্নের উত্তর জওহরলাল দিয়াছেন। যে সনাতন অতীত একদিন আমাদের শক্তির উৎস ছিল, সেই অতীতের সনাতন ভাবধারা কালান্তরে প্রকৃত শক্তি হারাইয়া সংস্কারের বোঝা হইয়া আমাদের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। স্বামীজী এ সত্য অনেক আগেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি অনেক পূর্ব্বেই সাবধান বাণী আমাদের শুনাইয়াছেন:—"There cannot be any progress without the whole world following in the wake, and it is becoming everyday clearer that the solution of any problem can never be attained on racial or national or narrow grounds."

ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে ভারতবর্ষ যখনই আত্মকেন্দ্রিকতার সংকীর্ণ গহ্বরে আপনাকে সংকুচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই তাহার উদার সম্প্রসারণ-শক্তি হারাইয়া বিশ্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে; তখন হইতেই তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। জাগতিক বিবর্ত্তনবাদ ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া শুধু অতীতের গৌরবের মধ্যে আত্মতৃপ্তির অনুসন্ধান করা নিতান্ত গোঁড়ামির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বামীজী কিরূপ প্রগতিশীল চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা তাঁহার

নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি হইতেই ধারণা করা যায়—'I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread. The other systems have been tried and found wanting. Let this one be tried if for nothing else, for the novelty of the thing.' স্বামীজী বৈপ্লবিক চিন্তানায়ক ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। আধুনিক মার্ক্সপন্থীরা স্বামীজীর চিন্তাধারার মধ্যে ফ্যাসিজমের সূত্র টানিয়া বাহির করিয়াছেন। বলিতে বাধা নাই,—মস্কো-অভিমুখী তথাকথিত কম্যুনিষ্ট-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতীয় আত্মার কোন যোগ নাই। স্বামীজীর রচনা তাঁহারা মনোযোগ দিয়া পড়েন না বলিয়াই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। স্বামীজীর কোন উক্তির ভগ্নাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বলিয়া আখ্যা দিতে তাঁহাদের আটকায় না। বৈদান্তিক সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করিয়া স্বামীজী যে সমাজ-জীবনের ভাবধারা পোষণ করিতেন, তাহার মধ্যে সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির কোন স্থান নাই। উদার মানবধর্ম্মের উপরই সেই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। সেই জন্যই আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইতেছে নিজেকে ভালো করিয়া জানা, ভারতের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় লাভ করা। এই আত্ম-পরিচয়ের আলোকেই আমাদের যাত্রাপথ আলোকিত হইবে। পণ্ডিত জওহরলালও এই আত্ম-পরিচয়ের আশায় ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস অনুসন্ধান করিয়াছেন। সেইজন্যই তাঁহার Discovery of India গ্রন্থের অবতারণা। সেইজন্যই তিনি পাশ্চাত্যের যন্ত্রশক্তি ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেন নাই। গান্ধীজীর শিষ্য হইয়াও এইখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহার ভাবগত বিরোধ। বিশ্বের দরবারে ভারতকে আবার স্বকীয় স্থান বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করিতে হইলে ভারতকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সাধনায় অগ্রগামী হইতে হইবে, কিন্তু তাহাকে স্বকীয়তা হারাইলে চলিবে না। পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের সাধনায় দানবীয়তাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, যন্ত্রের নিকট মানুষকে বলি দিয়াছে। স্বামীজী অনেক পূর্ব্বেই এইজন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—'Make a European society with India's spiritual background.' শাশ্বত ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই স্বামীজী বেদান্ত-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যেই মানবাত্মার প্রকৃত গৌরব উপলব্ধি সম্ভব। সেইজন্যই আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানকে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেও স্বামীজী বলিতেন,—"বেদান্তের মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্ব্বত্র এই তত্ত্ব আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা, যে যে-কার্য্যই করুক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্ব্বত্রই বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।" এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্যই অন্যান্য ধর্ম্মনেতার সহিত তাঁহার পার্থক্য। গোঁড়া ধর্ম্মনেতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মাত্রেই বলিয়া থাকেন, 'আমার ধর্ম্ম বা দেশের সব কিছুই ভালো'—এইরূপ উক্তির মধ্যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের গর্ব্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সত্যের বিরোধী। স্বামীজী উগ্র জাতীয়তাবোধের গর্ব্বে কখনও

সংকীর্ণ দেশপ্রেম বা ভ্রান্ত মতবাদের প্রশ্রয় দেন নাই।

স্বামীজী তাঁহার ইউরোপ ও আমেরিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য সমাজ চলমান। সেই চলমান প্রবাহবেগে যাহা কিছু পঙ্কিলতা আবর্জ্জনা, সবই ভাসিয়া যায়, অবরুদ্ধ পল্বলে জীবন-ধারা পঙ্কিল হইয়া উঠিবার অবসর পায় না। পাশ্চাত্য সমাজ-জীবন আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে তুলনীয় নহে। তবে সেই প্রবহমাণতা, সেই গতিবেগ, যাহা আমাদের জীবনকে নিত্য নবরূপে বিকশিত করে;—সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা সব কিছু সংকোচ-সংকীর্ণতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হয়; সেই আদর্শই আমাদের যুগান্তের সংস্কার-জীর্ণ সমাজকে নব-প্রাণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। সেইজন্যই পাশ্চাত্যের শিল্পদীক্ষা আমাদের প্রয়োজন। শুধু সনাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া নবনব উন্মেষের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকিলেই আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে না। জওহরলাল স্বামীজীর এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি একথা অসংকোচে বলিতে পারিয়াছেন যে, সনাতনের মোহই আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্যই তিনি যন্ত্রশিল্পের পথ অবলম্বন করিবার জন্য জাতিকে অকুণ্ঠিত উপদেশ দান করিয়াছেন।

স্বামীজী ছিলেন পরম বিপ্লবী—স্বাধীন চিন্তাধারার উপাসক। তিনি যুবকদের মধ্যে অন্ধ কুসংস্কার দেখিলে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেন: "And beware of superstition. I would rather see everyone of you rank atheists than superstitious fools, for the atheist is alive, and you can make something of him. But if superstition enters, the brain is gone, the brain is softening, degradation has seized upon the life."—যে যুগে ভারতবর্ষ স্বাধীন চিন্তাধারার আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছিল, সেই যুগের দিব্যালোকপ্রাপ্ত বলপ্রদ দর্শনশাস্ত্র উপনিষদকে আশ্রয় করিবার জন্য স্বামীজী সব সময় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। উপনিষদই স্বামীজীর বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সহায়ক হইয়াছিল। কী ব্যক্তিগত জীবনে, কী সমাজজীবনে সর্ব্বপ্রকার আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি বজ্রগম্ভীর সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন: "I am thoroughly convinced that no individual or no nation can live by holding itself apart from the community of others, and whenever such an attempt has been made under false idea of greatness, policy or holiness, the result has always been disastrous to the secluded one." আজ জওহরলালের কণ্ঠেও কি এই কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না?

গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য হইয়াও পণ্ডিতজী গান্ধীজীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর উপবাস-ব্রত ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতিতে তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা নাই, তাহা তাঁহার অনেক কাজেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি যাহা অন্যায় ও অকল্যাণকর তাহার সহিত নির্বিরোধ আপস করিতে প্রস্তুত নহেন। 'No gentleness with the evil." গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় এ কথা তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন—যাহার জন্য গান্ধীজী পর্য্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ অভিযান কি প্রমাণ করে না যে দুষ্টের দমনে শক্তির প্রকাশ অসঙ্গত নহে? পণ্ডিতজী ক্লৈব্যকে পরিহার করিয়া বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। স্বামীজীপ্রসঙ্গে এই নির্ভীকতা ও বীর্য্যবত্তার কথা তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: "Vivekananda spoke of many things, but one constant refrain of his speech and writing was *Abhay*—be fearless and strong. For him man was no miserable sinner, but a part of divinity; why should he be afraid of anything?....'If there is a sin in the world it is weakness,... weakness is sin, weakness is death, ... what our country now wants are muscles of iron, and nerves of steel, gigantic wills which nothing can resist' ..." এই দুর্দ্দমনীয় পুরুষকারের সাধক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার সেই সাধনাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া সেই সাধনাকে ফলবতী করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। আজ ভারতবর্ষে স্বামীজী-প্রচারিত পুরুষকারের বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল আমাদের রাষ্ট্র-কর্ণধার। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তিনি যদি এই বীর্য্যবত্তা ও পুরুষকারের পরিচয় দিতে থাকেন, তবেই ভারতের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে।

অমর বারতা

শ্রীমলিনা দেবী

ঊর্দ্ধ জগৎ নীরব-নিথর
　　ধ্যানে নিমগন অযুত তারা,
সূর্য্য-চন্দ্র ঝরায় কিরণ
　　সপ্ত-সাগর আত্মহারা।

ধরণীর তৃণে লেগেছে কাঁপন
　　রূপান্তরের পূর্ণ আশা,
টুটে গেছে সব তিমিরাবরণ
　　জলদের জাল সর্ব্বনাশা।

আলোর তটিনী নামিছে মর্ত্ত্যে
　　মন্দাকিনীর সলিল লয়ে,
ধরার মাটি স্নিগ্ধ করিয়া
　　দিকে দিকে তাই যাইবে বয়ে।

দুই ধারে তার পারিজাত-রাশি
　　ফুটিবে আপন গন্ধে ভরে,
তারই সৌরভ ছড়াবে ভুবনে
　　দিগ্-দিগন্ত আকুল করে।

আসিয়াছে তাই কত করুণায়
　　ধূলার মাঝে মানবদেবতা,
কত বেদনায় এনেছে বহিয়া
　　মর্ত্ত্যের পরে অমর-বারতা।

পৃথিবীর একমাত্র সংবাদপত্রের লাইব্রেরী

ওয়ালটার উওরিং

লণ্ডনে এসে ভ্রমণকারীরা সাধারণতঃ অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গে নগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ব্লুমস্‌বারীর সুবিখ্যাত বৃটিশ ম্যুজিয়ামটি দেখে থাকেন। এখানে বৃটেনের বহু মূল্যবান জাতীয় সম্পদ রক্ষিত আছে। কিন্তু এইসব ভ্রমণকারীদের মধ্যে অল্প লোকেই শহরের উত্তরে কলিন্‌ডেল-এ অবস্থিত 'বৃটিশ ম্যুজিয়াম নিউজপেপার লাইব্রেরীর' নাম শুনেছেন। এখানে কেবল মাত্র সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহ রক্ষিত আছে। সমগ্র পৃথিবীতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আর কোথাও নেই।

সংগ্রহের মধ্যে আদি থেকে আজ পর্যন্ত বৃটেনে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের ক্রমিক পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানকার প্রকাশ স্বত্ব আইন অনুযায়ী প্রকাশকদের পত্রিকার প্রত্যেক সংস্করণের একটি করে সংখ্যা বৃটিশ ম্যুজিয়ামে পাঠাতে হয়, এই সব সংখ্যাগুলি কলিন্‌ডেল লাইব্রেরীর সম্পত্তি। ১৯৩২ সালে প্রথম লাইব্রেরী গৃহ সম্প্রসারের চিন্তা করা হয় কারণ পত্রিকাসংরক্ষণ-ব্যবস্থা, পঠন ও বাঁধাই কাজের জন্য ক্রমশঃ স্থানের অভাব দেখা দেয়।

পত্রিকা-সংখ্যা

কলিনডেলের নিউজপেপার লাইব্রেরীতে পড়ুয়াদের সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, সে জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। লাইব্রেরীতে বর্তমানে সর্বশুদ্ধ ৩৮০,০০০ খণ্ড সংবাদপত্র আছে, প্রতি বৎসর সেই সংখ্যা ১১,০০০ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা হল ২৫,০০০। ১৯৪১ সালে জার্মান-বোমায় লাইব্রেরী-গৃহের এক অংশ বিধ্বস্ত হয়, তাতে ৩০,০০০ বাঁধানো খণ্ড বিনষ্ট হয়। বর্তমানে গৃহে স্থানাভাব হওয়ায় লাইব্রেরীর নূতন গৃহনির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়েছে।

বৃটিশ ম্যুজিয়ামের এই অংশ ঐতিহাসিকদের বাঞ্ছিত স্বর্গ, গত ৩০০ বছরের সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত এখান থেকে সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে আজ সহজ হয়েছে। প্রথম দিনের প্রথম সংবাদপত্রটি পর্যন্ত এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। বৃটেনে বহু পূর্ব থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে আসছে, সংবাদ পুস্তিকা বা নিউজ বুক্‌স্‌ প্রকাশিত হয় ১৬২২ সালে। 'অক্‌স্‌ফোর্ড গেজেট' যা পরে সরকারী-মুখপত্র 'লণ্ডন গেজেটে' রূপান্তরিত হয় তা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৬৬৫ সালে।

'অক্‌স্‌ফোর্ড গেজেট' লণ্ডনের প্লেগ মহামারী মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, এই সময় দ্বিতীয় চার্লস সপারিষদ অক্‌সফোর্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। সংবাদপত্রের চেয়ে পুরাতন যা, তা হল পুরাতন পেটেণ্টের বিশেষ নিদর্শন, ১৬২৩ সাল থেকে তা পুরাপুরি রক্ষিত আছে। এগুলি বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণারত ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অবশ্য আধুনিক পেটেণ্টগুলি এখানে এখন আর রক্ষিত হয় না।

সর্বদেশের সংবাদপত্র

যদিও 'টাইম্‌স্‌' বৃটেনের সর্বপুরাতন পত্রিকা নয় তবু পৃথিবীর কোথাও তার সমস্ত সংস্করণগুলি

পুরাপুরি রক্ষিত হয় নি। প্রকাশকের নিজের সংগ্রহ ছাড়া একমাত্র কলিন্‌ডেলেই তার সম্পূর্ণ সংগ্রহ আছে। ১৮ শতকে প্রকাশিত আইরিশ পত্রিকাগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে আছে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সুবিখ্যাত 'ডাবলিন জার্নাল'।

সংবাদপত্রের প্রথম যুগে বৃটেনে পত্রিকা-সংখ্যা এত বেশী ছিল না যার জন্য লাইব্রেরীতে খুব বেশী জায়গার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু বর্তমান যুগে পত্রিকা-সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, বিশেষতঃ ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তা সর্বোচ্চ সংখ্যা হয়। তার ফলে লাইব্রেরী-সম্প্রসারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব সংগ্রহের মধ্যে যে পরিমাণ জ্ঞানের উপাদান আছে তা সত্যই বিস্ময়কর। অতি সাধারণ স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে রবিবাসরীয় পত্রিকাগুলি যাদের কাটতি সংখ্যা হল ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ—সবই এখানে আছে, তা ছাড়া আইসক্রীম শিল্পের মুখপত্র থেকে সাপ্তাহিক 'মাদার এ্যাণ্ড চাইল্‌ড' পর্যন্ত অখ্যাত বিখ্যাত সব রকম পত্রিকাই লাইব্রেরীর গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

বৃটেনে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি ছাড়াও বিদেশী পত্রিকার সংগ্রহ এখানকার বৈশিষ্ট্য। কমনওয়েলথের অন্তর্গত সমস্ত দেশেরই কোন না কোন পত্রিকা এখানে স্থান পেয়েছে। ফরাসীপত্রিকা-সংগ্রহে ১৬৩২ সালের পুরানো পত্রিকাও আছে। জার্মান পত্রিকার মধ্যে ১৮৪৮ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সময় কালীন 'নাশানাল ৎসিটুং' (National Zeitung) এবং ১৮১৬ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সময়ের 'ভোশিশ ৎসিটুং' (Vossiche Zeitung) এবং 'ডয়েৎস্ য়্যালগেমেইন ৎসিটুং' (Deutsche Allgemeine Zeitung) প্রভৃতি পত্রিকা উল্লেখযোগ্য, ভিয়েনার 'নিউ ফ্রেই প্রেস্' (Neue Freie Presse) এবং বেলগ্রেডের 'পলিটিকা' ছাড়াও আরও অন্যান্য বিখ্যাত পোলিশ, চেকোশ্লোভাকিয়ান এবং হাঙ্গরীয় সংবাদপত্র আছে। এর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, ইতালী এবং বল্‌কান রাষ্ট্রগুলিও বাদ যায় নি।

ছাত্ররা এখানে বহু পূর্বের ফরাসী গেজেট দেখতে পাবেন। যাঁরা স্টকহোলমের ইতিহাসে আগ্রহশীল তাঁরা ১৮১৩ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত সময় কালীন 'জার্নালেন' সংবাদপত্রে জ্ঞাতব্য অনেক কিছু পাবেন। মানবজাতিতত্ত্ববিদ এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির ছাত্রদের মধ্যে রুশীয় সংবাদ পত্র 'বুস্‌কি ইন্‌ভ্যালিড'-এর কয়েকটি খণ্ড বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করবে, এই পত্রিকাটি নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় ১৮১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সর্বাধিক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা

কলিন্‌ডেলের লাইব্রেরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকার সংগ্রহও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪১ সালে প্রকাশিত 'নিউইয়র্ক ট্রিবুন'-এর (এক্ষণে হেরাল্‌ড ট্রিবুন) খণ্ডটি প্রায় সম্পূর্ণ, তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীক, লিথুওনিয়ান এবং ইতালীয় ভাষায় যে সব সংবাদপত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে তারও অনেকগুলি সংখ্যা লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু বোধ হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হল সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ 'চেরোকি ফিনিক্‌স্'। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল ১৮২৮ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত। চেরোকি (Cherokee) হরফে লেখা এইটেই একমাত্র পত্রিকা এবং তার বেশীর ভাগই ইংরাজী থেকে অনূদিত।

কলিন্‌ডেল লাইব্রেরীতে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে লণ্ডনস্থ কূটনৈতিক মিশনগুলির সদস্যগণও

নিয়মিত এসে থাকেন। আর যাঁরা আসেন তাঁরা হলেন সর্বদেশের ছাত্র এবং অধ্যাপক-দল—বই, প্রবন্ধ এবং থিসিস্ রচনা কিংবা বক্তৃতার উপকরণ সন্ধানই তাঁদের লক্ষ্য। আবার কেউ বা এসে থাকে তাদের মৃত আত্মীয়ের সম্পত্তি দাবী করার উদ্দেশ্যে পুরানো সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত মৃত্যুসংবাদ বের করার আশা নিয়ে।

বৃটিশ .ম্যুজিয়ামের ট্রাষ্টিগণ এই সব মহামূল্য সংবাদপত্রগুলির সংরক্ষণব্যবস্থা সুসংগঠিত করার জন্ত তৎপর হয়েছেন, এর ফলে যে কেবল স্থান অসংকুলানের সমস্যা দুর হবে তা নয় পক্ষান্তরে ক্রমবিনাশের মুখ থেকে তাদের বাঁচানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়। দেখা গিয়েছে যে অতি পুরাতন সংবাদপত্রগুলির তুলনায় রাসায়নিক সাহায্যে প্রস্তুত কাগজ যা রোটারি প্রেসে ব্যবহৃত হয়, তা অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নষ্ট হচ্ছে। সেই জন্য বৃটিশ ম্যুজিয়ামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পত্রিকাগুলি রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত পাতলা চাদরের মত এক ধরনের আচ্ছাদন (extremely thin protective layer) ব্যবহার করছেন, তাতে পড়ার কাজে কোন ব্যাঘাত হয় না অথচ কাগজের উপরিভাগ বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু কাজটি সহজ নয়, তা যেমনই সময়-সাপেক্ষ তেমনই ব্যয়বহুল। সেইজন্য সংগৃহীত সংবাদপত্রের প্রত্যেকটি পাতার আলোকচিত্র গ্রহণের কথা উঠেছে, এই কাজে মাইক্রো-ফিল্ম ব্যবহার করা হবে।

তা যদি সম্ভব হয় তা হলে ভবিষ্যতে পাঠকদের আর বড় বড় ভারি ভারি পত্রিকার বোঝা নিয়ে বিব্রত হতে হবে না। এই সব ফিল্ম সংরক্ষণের জন্য খুব বেশী জায়গারও দরকার হবে না, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফিল্ম নষ্ট হবার আশংকাও কম। আলোকচিত্র গ্রহণের প্রস্তাবিত কাজটি সহজসাধ্য নয়। সেইজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন, এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় গৃহের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং এই বছরের মধ্যেই সেখানে অতি আধুনিক মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বসানো সম্ভব হবে। এই ভাবে কলিন্‌ডেলের 'বৃটিশ ম্যুজিয়াম নিউজপেপার লাইব্রেরী' আজ সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে গবেষণায় অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর বিদগ্ধ জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছে।*

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইনফরমেশন সারভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত।—উঃ সঃ

"তোরা এই Mass এর (সাধারণ শ্রেণীর) ভিতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে—'তোমরা আমাদের ভাই—শরীরের একাঙ্গ—আমরা তোমাদের ভালবাসি—ঘৃণা করি না।' তোদের এই সহানুভূতি পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য্যতৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞানোন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বগুলি এদের শেখা।..."

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাঙ্গালা ভাষা এবং ইহার রূপের উদ্ভবকাল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ-মজুমদার

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষা বাঙ্গালা। এই ভাষায় মোটামুটী ছয় কোটী লোক কথা বলে। ভাষা-ভাষীর সংখ্যা-বিচারে সমগ্র পৃথিবীতে বাঙ্গালীদের স্থান সপ্তম। নদীর মূল জলধারা যেমন একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান হইতে নির্গত হইয়া নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্বক বহুধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হয়, ভাষা-প্রবাহও ঠিক সেভাবে মানবমনের অন্তর্নিহিত বিচিত্র ভাবরসে সমৃদ্ধ হইয়া প্রতিহত হইতে হইতে যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বিভিন্ন স্রোতে বহিয়া চলে। নদীর মূল উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করা যেমন দুঃসাধ্য নহে, তেমনি ভাষা-প্রবাহেরও মূল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার মূল অনুসন্ধান করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইবে যে ভারতীয় আর্য-জাতির মাতৃভাষা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম। সংস্কৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের পরেও যে দীর্ঘকাল ভারতে সংস্কৃতভাষার বিশেষ প্রভাব ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কালক্রমে সাধারণ জন-সমাজ কঠিন সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিকৃত উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাষার এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকেই কথ্য ভাষা বলে। উচ্চারণের এই বিকৃতি ও পরিবর্তন যদি না ঘটিত, তাহা হইলে ভারতীয় আর্যজাতি-সমূহ চিরকাল একই ভাবে একই ভাষায় কথা বলিত। ইহার যে পরিবর্তন ঘটিল, তাহাই কালক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ভাষার সৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষা ইহাদের অন্যতম। অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা ইহারই একটি বিশেষ শাখা বা রূপান্তর। সংস্কৃত ভাষা হইতে পৃথিবীর আর্যজাতির বিভিন্ন ভাষার জন্ম হইয়াছে কি না, তাহাও বিচার্য বিষয়।

মোটামুটী দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপটির জন্ম হইয়াছিল। ইহা পরে আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিব। সংস্কৃত ভাষার বিকৃত রূপকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিতে হইবে। এখনও দেখা যায় এমন কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ আছে, যে-গুলি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যথা—বৃক্ষ, লতা, ফল, জল, ভোজন, শয়ন, ধর্ম, কর্ম, চর্ম, শক্তি, মুক্তি, ক্ষতি, বর্ম, ভক্তি ইত্যাদি। কেবল যে সংস্কৃত শব্দ আজও অবিকৃত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে শুধু তাহাই নহে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অনেক বিদেশীয় শব্দ আজও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ প্রাচীন কালে বাঙ্গালাদেশের সহিত বিদেশীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই পরিচয় বর্তমানে আরও গভীর ও ব্যাপক হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক বিদেশীয় জাতি নানাবিধ কার্যব্যপদেশে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত বাঙ্গালীদের ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে নানা প্রকার আদান-প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশীয় ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষাতে প্রবেশ

করিয়াছে। এগুলির অনেকগুলিকে এখনও বিদেশীয় শব্দ বলিয়া ধরা কঠিন নহে। কিন্তু এমন কতকগুলি বিদেশীয় শব্দ বহুকাল লোক-মুখে প্রচলিত থাকায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃতির সঙ্গে এগুলি এমন ভাবে মিশিয়াছে যে, তাদের বিদেশীয় ভাষার শব্দ বলিয়া পরিচয় করা দুঃসাধ্য। যথা—প্রাচীন পারসিক ভাষার শব্দ—মোজা, পুঁথি, মুচি। ফারসী ভাষার শব্দ—কাগজ, কলম, দোকান, আয়না, বন্দুক, চশমা, রুমাল, মোকদ্দমা, কামান, আইন, নরম, জমি, জমা, শিকার ইত্যাদি। আরবী ভাষার শব্দ—নমাজ, মৌলবী, কোরান ইত্যাদি। ফরাসী ভাষার শব্দ—বুরুশ, কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্তুজ ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষার শব্দ—মাষ্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, রেল, ষ্টীমার, শ্লেট, কলেরা, পকেট, কলেজ, স্কুল, অর্ডার, ইত্যাদি। চীনা ভাষার শব্দ—চিনি, চা ইত্যাদি। জাপানী ভাষার শব্দ—রিকৃসা ইত্যাদি। মালয়দেশীয় ভাষার শব্দ—সাগু, গুদাম ইত্যাদি। ওলন্দাজী ভাষার শব্দ—ইস্কাপন, টেক্কা, হরতন, রুইতন ইত্যাদি। শুধু তাহাই নহে, অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে যে, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার বহু-সংখ্যক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। চরখা, বাচ্চা, আচ্ছা, চানাচুর, কুত্তা প্রভৃতি হিন্দী ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত। খোকা, খুকি, ঢেঁকি, কুলা প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রচলিত দেখা যায়। এগুলি যে অনার্যদের ভাষার শব্দ তাহার খবর আমরা বড় রাখি না। বাঙ্গালা দেশে আর্যগণের উপনিবেশ-স্থাপনের পূর্বে অনেক অনার্য জাতি এদেশে বাস করিত। আর্যদের প্রভাবে অনার্য জাতিরা পলায়ন করিয়া নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিল। আর্য-সভ্যতার প্রভাবে অনার্য জাতিদের ভাষাও ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি দেখা যায় আজও বাঙ্গালা ভাষার সহিত ঐসব অনার্য জাতির ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হইতেছে।

এ সব আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালার যে মূল প্রবাহ বহিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধও করিয়াছে। সুখের বিষয় এগুলি বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। সংস্কৃত ভাষা নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে স্বীয় প্রভাব লোপ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে মোটামুটী দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করাই যুক্তি ও প্রমাণ-সম্মত হইবে। বাঙ্গালা ভাষার আয়ু আড়াই হাজার বৎসরের অধিক হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

"বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব-কাল-বিচার" শীর্ষক আমার একটি প্রবন্ধ গত চৈত্রসংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাহা হইতে নিঃসন্দেহে দেখা যাইবে যে ৫ম খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা রূপের জন্ম হইয়াছিল।

"বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখকদের কথা আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথম মনে হয়, ইহার উৎপত্তি এবং রূপের আবির্ভাব হইল কবে? এ সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন—"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের আগে বাঙ্গালা রূপের

আবির্ভাব হয় নাই, একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির সময় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যতদূর দলিলপ্রমাণ আমরা পেয়েছি তাতে আমাদের বলতে হয় যে, মীননাথই বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক। তাঁর লেখা চার লাইনের একটি শ্লোক বৌদ্ধ গানের টীকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে শ্লোকটি এই—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম কুরঙ্গ সমধিক পাট।
কমল বিকশিল কহিহণ ভমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা।"

এই শ্লোকে 'পরমার্থের' 'বিকশিল' আধুনিক বাঙ্গালা রূপের সমান। শব্দ ও ব্যাকরণ-বিচারে আমরা একে প্রাচীন বাঙ্গালা বলব। ...নাথপন্থার আদি গুরু এই মীননাথ। এটা বাঙ্গালীর একটা গৌরবের বিষয় যে, এক জন বাঙ্গালী গোটা ভারতবর্ষকে একটা ধর্মমত দিয়েছিলেন" (শনিবারের চিঠি—আশ্বিন, ১৩৫১, ৩৮০-৩৮৬ পৃঃ)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উক্ত শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—"শৈব যোগীদের দু'একটি বোল পুঁথিতে তোলা আছে। একটি নাথদের আদি গুরু মীননাথের লেখা, খৃষ্টের ৮০০ বছরের লেখা, খাস বাঙ্গালা, এখনও বুঝিতে কষ্ট হয় না" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ)। মীননাথ বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক এসম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলিতেছেন—৭ম খৃষ্টাব্দের আগে বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব হয় নাই এবং শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—উক্ত শ্লোকটী ৮ম খ্রীষ্টাব্দের লেখা। এসব উক্তির মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"নাথসিদ্ধাগণের সময় নির্ণয় করা বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের এবং ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক" (গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—৫৯-৬০ পৃঃ)। এখন বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব-কাল স্থির করিতে হইলে মীননাথের সময় নির্ণয় করা আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় এবং ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে মীননাথের সময় নির্ণয় না করিয়া ঐ উক্তি করিয়াছেন।

শ্রীগুণানন্দ ও শ্রীশিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে আছে যে, নিজ দেশের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নেপালরাজ ৫২২ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করিয়া সিদ্ধা মীননাথকে নেপালের ললিতপত্তনে লইয়া গিয়াছিলেন। নেপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম-গ্রন্থ 'করণ্ডব্যূহে' মীননাথের জীবনী আলোচিত ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। হড্‌সন সাহেব বলেন—আসামের পুলতক পর্বত হইতে মীননাথ নেপালে নীত হইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন ৫ম খ্রীষ্টাব্দে মীননাথ নেপাল যান এবং তথাকার অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেন (R. A. S. J. Series. VII. Part I, Page 137 and Language Literature and Religion of Nepal and Tibet)। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ বলেন, কপিলের শিষ্য অর্থাৎ সাংখ্য-মতাবলম্বী ভববিবেক ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মীননাথের সহিত দেখা করেন (রেভারেণ্ড বিল সাহেব-অনূদিত সিয়ুকী গ্রন্থ)। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভী তাঁহার Le Nepal

গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্র-দেবের রাজত্বকালে মীননাথ নেপালে ছিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ, এবং গোরক্ষ-নাথের শিষ্য পদ্মবজ্র সরোরুহ বা পদ্মসম্ভব। প্রসিদ্ধ জার্মাণ পণ্ডিত Schlaginlweit প্রমাণ করিয়াছেন এই পদ্মসম্ভব ৭২১।২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এসব উক্তি বিচার বিবেচনা করিয়া প্রথমোক্ত মতকে নিঃসন্দেহে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে মীননাথের সময় নিঃসন্দেহে—৫২২ খ্রীষ্টাব্দ। মীননাথই যখন বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক, তখন বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব ৭ম খ্রীষ্টাব্দের পরে হইয়াছে ডক্টর শহীদুল্লাহের এই উক্তি যথার্থ বোধ হয় না। নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব ৫ম খ্রীষ্টাব্দেই হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশে কেহ কেহ মনে করেন যে, কৃত্তিবাসই বাঙ্গালার আদি কবি।...কবি কৃত্তিবাসের সময় আনুমানিক ১৪শ খ্রীষ্টাব্দ। .... উপরে উদ্ধৃত মীননাথের লেখাটি কবিতা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কবি কৃত্তিবাসের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কবিতার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং বলা যায়, মীননাথই বাঙ্গালার আদি কবি" (প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৫৫, ৫৭১-৫৭২ পৃঃ)।

সাথী

শ্রীরবি গুপ্ত

তুমি না জ্বালিলে আঁধার দেউলে কেমনে বিভাসি বলো,
কেমনে তরি এ-নিশীথে আমার চলায় যদি না চলো?
তুমি রহ প্রাণে কুসুম-গন্ধে
গাঁথ প্রতিপলে বিকাশ-ছন্দে;
অমরা-দীপনে সাজায়ে দীপালি জীবনে তুমিই জ্বলো,
তুমি না জ্বালিলে আঁধার দেউলে কেমনে বিভাসি বলো?

তুমি যে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আখর রাখো,
অমল প্রেমের সৌর-কিরণে ধরামালিন্য ঢাকো।
তব প্রোজ্জ্বল জীবন-মন্ত্রে
জাগে নিষুপ্ত জাগর-তন্ত্রে;
ঘনতম-পারে বাঞ্ছিত কোন সুচির স্বপ্নে আঁকো,
তুমি যে অবনী-ললাট-লিখনে করুণা-আখর রাখো।

মর্ত্য জীবনে নিখিল-জননী তোমারি দিশায় সাধি,
সন্ধ্যা-বেদনা-বিহীন বেলায় সাথে তুমি চির সাথী।
তব বাণী লভি মম নিকুঞ্জ
সাজায় অর্ঘ্যে প্রসূনপুঞ্জ;
অন্তরমাঝে বিরাজ তুমি যে বিভাসি' কালের রাতি
সব সীমাধারে সব অসীমের সাধনা চলেছ সাধি।

জন্মাষ্টমী

পরাগ

ধরিত্রী যখন অধর্মের নির্লজ্জ অত্যাচারে প্রপীড়িতা, দানবীয় শক্তির পাশবিকতায় লোক-সমাজ উপদ্রুত, দুষ্কৃতের দুর্বার লাম্পট্যে শিক্ষা, সমৃদ্ধি, সভ্যতা, ন্যায়, নীতি বিলুপ্তপ্রায়, বলদৃপ্তের বিমর্দনে বলহীন বিচলিত—দুর্দিনের সেই দুরন্ত প্রহরে কংসকারায় বেদনার্তা মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে হে বাসুদেব, তুমি অপরূপ হ'য়ে দেখা দিয়েছিলে।

সেদিন তুমি এসেছিলে অন্ধ অহমিকায় স্ফীত, শতধা বিচ্ছিন্ন আর্যজাতির সাধনা সিদ্ধি সংরক্ষণের নিমিত্ত। তোমার সে ছিল অপূর্ব নরলীলা! সে অনুপম লীলাবৈচিত্র্য অদ্যাপি আর্যজাতিকে সহস্র ঘাত-প্রতিঘাতে জাগরূক রেখেছে। মহামুখে তুমি গীতামৃত বণ্টন করেছিলে, তা' আজও ফলপ্রদ, প্রাণপ্রদ, অব্যাহত রেখেছে। আজ যদিও সে মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল নেই—ম্লেচ্ছলাঞ্ছিত ক্ষতমাত্রে পর্যবসিত; যদিও যমুনা-ধারায় আজ আনন্দোচ্ছল ঊর্মি-হিল্লোল নিঃশেষে অন্তর্হিত; ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আজ যদিও শুষ্ক মরুভূমির শূন্যতার মত হাহাকার—তবু আমি জানি আমার হিন্দু আছে, হিন্দুর গীতা-মহাভারত আছে, হিন্দুর অন্তরাত্মায় চির-কিশোর চির-সুন্দর শ্রীগোপাল আছেন।

আজ এই দুঃসময়ে আর্ত আর্য-তনয় তোমায় স্মরণ ক'রে ব্যভিচার অনাচারের স্রোতাবর্তে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র আধুনিক সভ্যতাকে এবং অসত্যের আরণ্যক পীড়নের বিভীষিকাকে উৎখাত করতে গিয়ে যদি তা'র চিত্ত বিমুখ হয়, অবসাদে মন ভেঙ্গে পড়ে, নৈরাশ্যে বাহু বলহীন হয়, মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়—তখনই যেন সে নিত্য-কালের পথে হে পার্থসারথি, তোমার রথ-চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে শোনে—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"। নির্বীর্যতা তোমার সাজে না—হে বীর, তুমি উত্থিত হও।

আজ যেন সে বোঝে তা'র দীর্ঘ দিবসের অধীর প্রতীক্ষা, তা'র নবতম জীবনোন্মেষ কবি-কল্পনা নয়, কাহিনী নয়। সে যেন আজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করে আসিন্ধু হিমাচল-ব্যাপী ছায়াঘন বনবীথীতলে গংগা-সিন্ধু-রেবা-কাবেরীর তীরে তীরে তুমি মুরলী মোহন। শ্যামল চির-কিশোরের আজিকার এই চিরন্তন মহোৎসবে অনাগতের বিজয়-রথে নবীন তারুণ্য-দীপ্ত কোমল কিশোর মূর্তি নিরীক্ষণ কর্‌ছি—বহুশত বর্ষ পরে আমি কবি ধরাতলবাসী। কোনো যক্ষ-রক্ষ-দানবের কূট ষড়যন্ত্রেও এ কিশোরের পরাজয় নেই—বিনাশ নেই। এযে মহামৃত্যুঞ্জয়ী পরম পুরুষ! এসো—আবাল-বৃদ্ধবনিতা মানুষের সমাজ, এসো—আমার জাতি, আমার হিন্দু, অমৃতের সন্তান—আজ পার্থ-সারথির নবজন্মের এই মহাবির্ভাব দিনে জীবন সার্থক ক'রে তোল্‌বার—জন্যে সমবেত হই—এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে এবং সমস্বরে প্রার্থনা জানাই—

"এহি এহি পুনরেহি সর্বেণ মনসা সহ।"

উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-শোষণ

অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন রায় চৌধুরী, এম-এস্‌সি

রাসায়নিক গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, যে আকারেই হউক না কেন, প্রায় প্রত্যেক উদ্ভিদের দেহ-গঠনে নিম্নলিখিত দশটী অত্যাবশ্যক মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন হয়। যথা—Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Sulphur, Phosphorus, Calcium, Magnesium Potassium এবং Iron; ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত চারিটী ধাতব পদার্থ। কোন কোন উদ্ভিদ আবার তাহার দেহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য উপরোক্ত দশটী অত্যাবশ্যক উপাদান ভিন্ন আরও দুই একটী মৌলিক পদার্থের আবশ্যকতা বোধ করে। এগুলির মধ্যে সাধারণতঃ Sodium, Chlorine, Manganese, Zinc, Copper, Silicon, Boron প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ দশটী অত্যাবশ্যক মৌলিক উপাদান ভিন্ন গম, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতি গাছগুলির অতিরিক্ত Silicon, বার্লি, ওট বা জই প্রভৃতির অতিরিক্ত Chlorine, নারিকেল গাছের Sodium, Chlorine প্রভৃতিরও প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

অত্যাবশ্যক দশটী উপাদানের মধ্যে একমাত্র Carbon উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান বাষ্পরূপে (Co_2) সবুজ পাতার মধ্য দিয়া সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে গ্রহণ করে। অবশিষ্ট নয়টীর সব কয়টী উদ্ভিদ জমি হইতে সর্ব্বদা সংগ্রহ করে। তবে জমি হইতে সংগ্রহ করিবার কালে উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি জমির মধ্যে মৌলিক আকারে পায় না। এই কারণে মৌলিক পদার্থ আহরণের জন্য উদ্ভিদকে জমির মধ্য হইতে এমন কতকগুলি মৌলিক পদার্থ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়, যাহার সংগ্রহের ফলে আবশ্যক মৌলিক পদার্থগুলি সে দেহগঠনের কাজে লাগাইতে পারে।

দেহগঠনে যে সমস্ত মৌলিক উপাদানের আবশ্যক হয় দেহের পুষ্টিসাধনোপযোগী খাদ্যের মধ্যেও সেই সেই উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, কাজেই দেহের পুষ্টির জন্য যে সমস্ত খাদ্য উদ্ভিদ তৈরী করে তাহার উপাদানগুলি জানিলে দেহের নির্ম্মাণের পক্ষে কোন্ কোন্‌গুলি উদ্ভিদকে গ্রহণ করিতে হয় তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারি।

Nitrogen উদ্ভিদের একান্ত দরকার। উদ্ভিদের দেহের প্রায় ৯৫ ভাগ Carbon এবং জল। Nitrogenএর অংশ প্রায় ৫ হইলেও Nitrogen না পাইলে উদ্ভিদ কোন মতেই বাঁচিতে পারে না। গাছের সবুজকণা, প্রোটিড জাতীয় খাদ্য, জৈবনিক পদার্থ (Protoplasm) প্রভৃতি Nitrogenএর অভাবে তৈরী হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। গাছের মধ্যে সবুজকণার সৃষ্টি না হইলে সে তাহার প্রধান খাদ্যসামগ্রীগুলি আদৌ প্রস্তুত করিতে পারে না। Nitrogenএর অভাব যখন ঘটে, তখন গাছের পাতাগুলি বিকৃত বর্ণ ধারণ করে এবং গাছটী খুব শীঘ্র ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া শুকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে

Nitrogenএর প্রাচুর্য্যে গাছের শারীরিক বৃদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; সে সময় তাহার পাতাগুলির চাকচিক্য লক্ষ্য করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাতাসের মধ্যে Nitrogen প্রচুর পরিমাণে (শতকরা ৭৮ ভাগ) মুক্ত অবস্থায় থাকিলেও উদ্ভিদ তাহার খাদ্যের জন্য বাতাস হইতে আদৌ Nitrogen আহরণ করে না। সে তাহার Nitrogenএর অভাব সর্ব্বদা মাটির মধ্য হইতে পূরণ করিয়া লয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মত Nitrogenও মাটির মধ্যে কখনও মৌলিক আকারে থাকে না। মাটির মধ্যে Nitrogen যৌগিক পদার্থে Nitrate রূপে থাকে। সকল প্রকার Nitrate জলে অতিসহজে দ্রবণীয় হয় বলিয়া উদ্ভিদ মাটি হইতে Nitrogenএর তরল সার শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে।

ক্রমান্বয়ে বছরের পর বছর ধরিয়া অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ মাটির উপর জন্মায় বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে Nitrogenএর ভাগ মাটিতে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে বা অতিশীঘ্র নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে এই প্রকার মনে হয়। কিন্তু উদ্ভিদগুলি মাটির উপর জন্মিবার ফলে যে Nitrogen তাহারা দিবারাত্র মাটি হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাদ্য প্রস্তুত করে, সেই Nitrogen আবার অন্য আকারে তাহারা তাহাদের মৃত্যুর পর মাটিতে ফেরত দিয়া থাকে। এই কারণে জমির মধ্যে Nitrogenএর ভাণ্ডার চিরকালই একপ্রকার অফুরন্ত থাকে। উদ্ভিদের মৃত্যুর পর পচনশীল অবস্থায় আসিলে তাহার দেহের Nitrogen খাদ্য (Proteids প্রভৃতি) মাটির উপর পড়াতে কয়েকপ্রকার জীবাণুর (Azobacter Clostridium) সহায়তায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেগুলি পুনরায় Nitrateএ পরিণত হইয়া যায়। কাজেই উদ্ভিদের বংশবিস্তারের ফলে মাটি হইতে উদ্ভিদ অহোরাত্র Nitrogen শোষণ করিলেও মাটি কখনও Nitrogenএর অভাব বিশেষভাবে অনুভব করে না। মাটির মধ্যে উদ্ভিদের কয়েক প্রকার বিশেষ উপকারী জীবাণু বন্ধুরূপে বাস করে। ইহারা মাটির উপরিস্থিত জীবজন্তুদেহ-মধ্যস্থিত প্রাপ্ত Nitrogen খাদ্যগুলি পাইয়া বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ার ফলে সর্ব্বদা Nitrateএ রূপান্তরকরণে রত থাকে। এই বন্ধুগুলির সাহচর্য্যে মাটির মধ্য হইতে Nitrogen পাইতে উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

জমি আবার কখন কখন বাতাসের মুক্ত Nitrogen ধরিয়া লইয়া নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঝড়-ঝঞ্ঝার দিনে বজ্রপাতের ফলে বাতাসের নিষ্ক্রিয় মুক্ত Nitrogen মুক্ত Oxygen (অম্লজান) এর সহিত মিশ্রিত হইয়া Nitrogen Peroxideএ পরিণত হয়। $N_2+O_2=2\ No$; $2\ No+O_2=2\ No_2$. পরে এই Nitrogen Peroxide (No_2) বৃষ্টির জলে গলিয়া নানা অবস্থার মধ্যে মাটিতে Nitrate আকারে রূপান্তরিত হয়। মোটামুটি হিসাবের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বৎসরে এক একর জমি প্রায় ৪ পাউণ্ড Nitrogen এইরূপ ভাবে বৃষ্টির জল হইতে পাইয়া থাকে।

সবুজবর্ণ-বিশিষ্ট সমস্ত গাছই উপরোক্ত উপায়ে জমি হইতে Nitrogen সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাদ্য উৎপন্ন করে। কিন্তু মটর, অড়হর, কলাই, ধঞ্চে বা কালকাসিন্দা জাতীয় গাছগুলি সবুজবর্ণবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের Nitrogen-শোষণপ্রণালী একটু ভিন্ন এবং অদ্ভুত। এ জাতীয় গাছের শিকড়গুলি পরীক্ষা

করিলে দেখা যায় যে শিকড়গুলির গায়ে স্থানে স্থানে কতকগুলি স্ফোটক উৎপন্ন হইয়াছে। স্ফোটকের অভ্যন্তর ভাগের কোন পাতলা অংশ লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে এই স্ফোটকগুলির মধ্যে এক প্রকার জীবাণু (Pseudomonus radicicola) বাস করে। মাটি হইতে গাছের সূক্ষ্ম লোম শিকড়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া জীবাণু শিকড়ের গায়ে আসিয়া বাসা বাঁধে এবং সেই অবস্থায় এক অদ্ভুত উপায়ে শিকড়ের চতুষ্পার্শ্বস্থিত বাতাসের মধ্য হইতে তাহার মুক্ত Nitrogen বন্দী করিয়া ফেলে। জীবাণুটী যে গাছে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া এইভাবে বাস করে, তাহার Nitrogenএর অভাব পূরণার্থে এই বন্দী Nitrogen দান করে এবং এই দানের বিনিময়ে আশ্রয়কারী গাছ হইতে জীবাণুর আবশ্যক Carbon-সমন্বিত আহার সংগ্রহ করে। এইভাবে আশ্রয়দাতা এবং আশ্রয়গ্রহীতা দুই জাতীয় উদ্ভিদই তাহাদের জীবনধারণোপযোগী পদার্থ-সংগ্রহের পক্ষে পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া বাস করে। বায়ু হইতে জীবাণুটীর কৌশলে Nitrogen বন্দী করিয়া লইবার বিশেষ ক্ষমতা আছে বুঝিয়া এবং পরে Nitrogen-পূর্ণ স্ফোটকগুলি শুষ্ক অবস্থায় জমিতে পরিত্যক্ত হইলে ক্রমে জমির Nitrogenএর সার আপনা আপনি বাড়িয়া যায় দেখিয়া কৃষকেরা ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে না। এই কারণেই আমাদের দেশের চাষীরা তাহাদের ফসলের জমির, বিশেষতঃ ধানের ক্ষেতের, চারিদিকে অড়হর জাতীয় গাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহার ফলে এক সঙ্গে দুই প্রকার ফসল পাওয়া ভিন্ন তাহারা জমিতে Nitrogenএর সার বেশী না দিয়াও অল্প পরিশ্রমে এবং সল্পব্যয়ে জমির Nitrogenএর ভাগ পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বাড়াইয়া লইতে পারে।

রস্না (Orchid) জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ অন্য বড় বৃক্ষের (সাধারণতঃ আম গাছ) আশ্রয় অবলম্বন করিয়া জন্মে। ইহারা মাটির অনেক উপরে থাকে এবং মাটির সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করে না। এই কারণে ইহাদের আবশ্যক Nitrogen খাদ্য অন্যান্য খাদ্যের সহিত ইহারা একমাত্র বায়ুমণ্ডল হইতে ইহাদের লম্বমান শিকড় দ্বারা আহরণ করে। স্বর্ণলতা, বেনেবৌ প্রভৃতি পরভোজী উদ্ভিদগুলি Nitrogen খাদ্যের জন্য তাহাদের আশ্রয়কারী গাছের উপর নির্ভর করে। আশ্রয়দাতার তৈরী খাবার যে পথে দেহের মধ্যে চলাচল করে, ইহারা সেই পথে ইহাদের ছোট শক্ত শিকড় চালাইয়া দিয়া উক্ত খাদ্য প্রয়োজনানুযায়ী শোষণ করিয়া লয়। প্রাণিভুক উদ্ভিদগুলি, যথা, কলসী গাছ, মালাক্কা ঝাঁঝি, পানের পিক্ প্রভৃতি, যে জমিতে জন্মে সেখানে Nitrogenএর ভাগ উদ্ভিদের প্রয়োজনানুরূপ থাকে না। এজন্য তাহারা তাহাদের দেহের জন্য Nitrogenএর অভাব পূরণ করিতে নানা উপায়ে কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া মারিয়া ফেলে এবং পরে এই জীবগুলির দেহে যে Nitrogen পাওয়া যায় তাহা অনায়াসে শোষণ করিয়া লয়।

আমি—আমি—আমি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সৃষ্টির আদিক্ষণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সেই যে একটি কৌশল চালিয়া দিয়াছিলেন মানুষ আর কিছুতেই তাহার হাত হইতে রেহাই পাইল না। ব্রহ্মা কিছুই যখন সৃষ্টি করেন নাই—একা ছিলেন—নিজে তিনি কে তাহাও তখন ভাবিবার বা বলিবার কোন বালাই ছিল না। সৃষ্টি যখন করিতে উদ্যত হইলেন তখন প্রথমেই হুঁস হইল তিনি কে। বলিয়া উঠিলেন—অহং—আমি*। নিজেকে ভাবিবার, ডাকিবার এই কৌশলটিই সৃষ্টিকর্তার প্রথম সৃষ্টি। "ততোঽহংনামাভবৎ"—সেই হইতে তাঁহার নাম হইল—অহং। প্রজাপতির সেই প্রথম নাম তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জীবের সত্তাতে প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত জীব বলিয়া উঠিল আমি—আমি—আমি। "তস্মাদপ্যেতর্হ্যাম-ন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি।" অতএব অদ্যাবধি এই রীতি চলিতেছে—কেহ যদি ডাকে তো আগে বলিয়া উঠি—অহং—আমি; পরে আমার নামটি বলি রাম বা যদু বা মালতী।

'আমি'র ধাপে পা দিয়া তবে প্রজাপতি অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন—"আ পিপী-লিকাভ্যঃ তৎ সর্বম্"—বড় বড় জীবজন্তু হইতে ক্ষুদ্র পিঁপড়েটি পর্যন্ত প্রজাপতির প্রজা আমরাও যখন এই বহুবিচিত্র সংসারের সঙ্গে লেন দেন করিতে যাই তখন প্রথম পা ফেলিতে হয় এই 'আমি'র পইঠায়। আমি না থাকিলে আমার কাছে জগৎও থাকে না। আমার জগতে আমিই সর্বপ্রধান। আগে আমি, তাহার পর আমার দেহ, আমার গেহ, আমার স্বজন বান্ধব, আমার সুখ সম্পদ, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, ইহকাল পরকাল, বন্ধন মুক্তি। আমি—আমি—আমি—প্রতি-চিন্তায়, প্রতিকর্মে, প্রতি আবেগে, অনুভূতিতে —প্রত্যেক মুহূর্তে আমার অব্যভিচারী সহচর দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—হয়তো বা জন্মজন্মান্তরে।

প্রজাপতি ব্রহ্মার সহিত আমাদের কিন্তু একটি বৃহৎ পার্থক্য আছে। তিনি অখিল সংসার সৃষ্টি করিয়া অবসর মত অনুভব করিতে পারিলেন—"অহং বাব সৃষ্টিরস্মি, অহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি"—আমাতেই সৃষ্টি দাঁড়াইয়া আছে, আমি সৃষ্টির সম্রাট, সৃষ্টি আমার অধীন। আমরা কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে এই ধরনের একটা বৃহৎ ধারণা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারি না। আমরা জানি এই অনন্ত বিশাল সৃষ্টিসমুদ্রের সামান্য বুদ্‌বুদ আমরা—সাড়ে তিন হাত দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ। জন্মিয়াছি, মরিতে হইবে—দেহ পাইয়াছি, দেহের ক্ষুধা, পিপাসা, ব্যাধি, ক্ষয় ভোগ করিতে হইবে। সৃষ্টির একান্তই অধীন আমরা। সৃষ্টি আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পালাইবার কোন পথই নাই। সৃষ্টির সহিত আমরা একেবারে মিশিয়া

* আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ ... নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ, সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১।৪।১
পরবর্তী উদ্ধৃত বাক্যগুলিও বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায়ের।

গিয়াছি—নিজেদের আলাদা আর কোন সত্তাই যেন নাই।

প্রজাপতির আদিম আশীর্বাদ 'অহং'টি বিচিত্র খেলায় প্রতিনিয়ত আমাদিগকে হয়রান করিয়া মারিতেছে। এই 'অহং'এর রহস্য কিছুই বুঝি না—অথচ সর্বদা ইহার সহিত ঘর করিতে হয়। সাধারণতঃ 'আমি' বলিতে বুঝি এই শরীরটা। শরীরের অসুখ হইলে বলি 'আমি' অসুস্থ—শরীর ভাল বোধ করিলে বলি—'আমি' ভাল আছি। শরীর মরিতে বসিলে ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি—'আমি' মরিলাম বুঝি। শরীরের অন্য বিকারগুলিও —যেমন বৃদ্ধি, ক্ষয় প্রভৃতি—আমারই নিজের বিকার বলিয়া মানি। কিন্তু এমনও আবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয় যখন আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না—আমি শরীর। যেমন আমার একটা হাত কাটিয়া আলাদা হইয়া গেল—আমি বলি, 'আমার' হাতটা হারাইলাম। এই বাক্যের ভাষ্য করিলে দাঁড়ায় এই—হাতটাই হারাইয়াছি, আমি হারাই নাই; অর্থাৎ দেহ ছাড়া আমি যেন আলাদা এক জন কেহ আছি যাহার হাত, যাহার পা, যাহার এই সব বিভিন্ন অবয়ব। কে সেই আমি তাহা অবশ্য আমি তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করি না। শরীরের উপর 'আমি' যখন ভর করে তখন এমনই আলো-আঁধার ঘেরা কত বিচিত্র রূপই না দেখিতে পাই। আবার 'আমি' কখনও ভর করে মনে। মনে সুখের উদয় হইল, বলি—আমি সুখী। দুঃখ আসিল, বলি আমি দুঃখী। এইরূপ কাম, ক্রোধ, মোহ, ভয়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, করুণা, বিস্ময়—মনে কত প্রকারেরই না বৃত্তি উঠে। উহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে আমি নিজেকে মিশাইয়া ফেলি। মনের বৃত্তিসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে আমার 'আমি'টাও যেন বদলাইয়া যায়। এ কী বহুরূপী আমি! প্রজাপতি কি কৌশলই না চালিয়া দিয়াছেন! তাঁহার আসল চাতুরীটি কিন্তু আমাদের কাছে গোপনই রহিয়া গিয়াছে। যে চাতুরী দ্বারা তিনি অহং অহং করিয়াও এই বৈচিত্র্যময় সংসার রচনা করিয়াও অহংএর অজস্র অভিব্যক্তির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারাইলেন না, অসংখ্য সৃষ্টি হইতে নিজকে আলাদা করিয়া ভাবিতে পারিলেন —সেই চাতুরীটিও যদি আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেন তো বেশ হইত।

*   *   *

যেমন করিয়াই হউক সেই চাতুরীটি শিখিতে হইবে। শুধু আমি আমি করিয়া—একটু হাসিয়া, একটু কাঁদিয়া জীবনের খেলা শেষ করা—অন্তর যেন ইহাতে বিদ্রোহ করিয়া উঠে। অন্তর যেন বলে, প্রজাপতির মত আমারও আমি-আমি-আমির গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্মগত অধিকার আছে। প্রজাপতি যখন "অহংনামা" হন নাই তখন তাঁহার যে অনভিব্যক্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন, অবাধ, অখণ্ডিত, সমরস অস্তিত্ব—যে অস্তিত্ব তিনি বিশ্বসৃষ্টির পরেও হারান নাই—সেই অস্তিত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও পাইয়াছি। আমি স্থূল, আমি কৃশ—আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ—আমি পুরুষ, আমি নারী—আমি পুত্র, আমি পিতা—আমি সুখী, আমি দুঃখী—আমি মূর্খ, আমি বিদ্বান —আমি বদ্ধ, আমি মুক্ত—ইত্যাকার অজস্র আমি-আমি-আমির পশ্চাতে এক অপরিবর্তনীয়, সনাতন, অচঞ্চল সত্তা আমার আছে—যাহাকে আর 'আমি' বলা যায় না। যদি একান্তই না বলিয়া না পারি তো যেন বলি—স্বয়ং। অর্থাৎ "আমি"-ছাড়া আমি নিজে যাহা।

হেঁয়ালির মত তো লাগিবেই। তুমি, আমি, পেলা, পঞ্চা তো দূরের কথা ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ীরই লাগিয়াছিল। সাতকাণ্ড রামায়ণ শ্রবণের পর সীতা কার ভার্য্যা ধরনে, সমগ্র ব্রহ্মবেদান্ত শুনিয়া পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়া বসিলেন—"অত্রৈব মা

ভগবানমূমুহৎ"*—হে ভগবন্, এই জায়গাতেই আপনি আমার বুদ্ধি-স্থদ্ধি সব গুলাইয়া দিলেন। 'আমি-আমি' থাকিবে না—অথচ আত্ম-জ্ঞান—এ কী প্রহেলিকা? এই সেদিনও ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের দিব্য স্পর্শে 'আমি'র স্মৃতি অকস্মাৎ অবলীয়মান হইতে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের ন্যায় অধিকারীও চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন—"ওগো তুমি একি করলে—আমার যে বাবা আছে, মা আছে।"

শ্রুতি-স্মৃতি—তত্ত্বদ্রষ্টাগণ কিন্তু তাই বলিয়া সুর বদলাইতে নারাজ।

তাঁহারা বলেন—যাক্ না ঘুচিয়া আমি-আমি-আমি। উহার দাম তো মাত্র এক পয়সা! একান্ত খেলাছলেই প্রজাপতি এই কৌশলটি চালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এবং আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্তা ও সার্থকতা ইহার উপর মোটেই নির্ভর করে না। অহং যাক্—স্বয়ং থাকিবে। স্বয়ংই শাশ্বত, স্বয়ংই অপরিবর্তনীয়, স্বয়ংই ধন্য। স্বয়ং আমাতে, স্বয়ং তোমাতে, স্বয়ং তাহাতে, স্বয়ং সর্বভূতে। স্বয়ং এখানে, স্বয়ং সেখানে, স্বয়ং সর্বত্র—আবার স্বয়ং এখন, তখন—সর্বকালে। স্বয়ংএর আবির্ভাব নাই, তিরোভাবও নাই। স্বয়ংই সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—"বিশ্বপ্রকৃতিই সমস্ত কাজ করিয়া যাইতেছেন, মানুষ শুধু মোহ-বশে বলিয়া মরে—আমি কর্তা, আমার কাজ।"[১] "হে সব্যসাচিন্, যাহা করিবার সব আমিই করিয়া রাখিয়াছি, তুমি শুধু আমার যন্ত্র হইয়া কাজ করিয়া যাও।"[২] "ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে"[৩]। তুমি না থাকিলেও—যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অতএব বল নাহং, নাহং—তুঁহু তুঁহু।

শ্রীবুদ্ধের ভাষা ছিল অন্য—কিন্তু তাৎপর্য একই। অহং-অহং-অহং এই আলয়-বিজ্ঞান-ধারার বিলোপ সাধন করিলে তবে শাশ্বত নির্বাণ। শ্রীশঙ্করও বলিতেছেন—চন্দ্র যেমন রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া নিজের বিমল জ্যোতিতে প্রকাশ পায় তেমনি অহংকারের প্রভাব কাটাইতে পারিলে জীব পূর্ণ, সদানন্দ চিরভাস্বর আত্মস্বরূপ লাভ করে।[৪]

অষ্টাবক্র জনককে শুনাইতেছেন—'আমি কর্তা'—এই অহংকার ভীষণ কালসর্প। এই সর্পবিষের প্রভাব কাটিতে পারে শুধু 'নাহং কর্তা' এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া।[৫] ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও একই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

আমি-আমি-আমি শুধুই যে একটা শরতের নিঃসার মেঘগর্জন তাহা আখ্যায়িকাচ্ছলে কেনোপ-নিষৎ কী সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন!

"তুমি কে?"

"আমি? আমি জাতবেদা—অগ্নি।"

"ভাল, তোমার ক্ষমতা কি?"

"আমি যাহা কিছু সব নিমেষে ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারি।"

"বটে? আচ্ছা এই তৃণগাছি জ্বালাও তো।"

অগ্নি সমগ্র শক্তি দিয়া কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই সামান্য তৃণটী দহন করিতে পারিলেন না। অহংকার চূর্ণ হইল। আসিলেন বায়ু। ছদ্মবেশী পরমপুরুষ তাঁহারও হাঁক-ডাক শান্ত করিলেন।

"বটে, তুমি মাতরিশ্বা বায়ু? যাহা কিছু সব তোমার কব্জায়? আচ্ছা, এই তুচ্ছ তৃণগাছিকে পাকড়াও তো।" অনেক কলাকৌশল প্রয়োগ করিয়াও বায়ু তাহাতে সমর্থ হইলেন না। অতঃপর আসিলেন দেবতার নেতা ইন্দ্র। তাঁহার 'অহং'কে

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।৪।১৩　১ গীতা, ৩।২৭; ৫।১৪　২ গীতা, ১১।৩৩　৩ গীতা, ১১।৩২

৪ বিবেকচূড়ামণি, ৩০০ শ্লোঃ　৫ অষ্টাবক্রসংহিতা, ১।৮

ছদ্মবেশী ঘা দিলেন অন্যভাবে। "তিরোদধে" —দেখাটী পর্য্যন্ত না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্রের বিবেক, বুদ্ধি, ধারণা অপর দেবতাদের অপেক্ষা অধিক। তাই তিনি বুঝিলেন, কিছু একটা গোলযোগ হইয়াছে। অহংকারকে দাবাইয়া বিনয়ভরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন কল্যাণময়ী উমা মা আকাশে আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন,—"বাবা, আমি আমির দৌড়তো • দেখিলে? আমি-আমির আসল শক্তিটা পরমাত্মা হইতেই আসিতেছে। তাঁহারই অনন্ত বিভূতির এক একটী কণা লইয়া অগ্নির অগ্নিত্ব, বায়ুর। বায়ুত্ব, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব।"

জীবনের অধ্যাত্মদৃষ্টি যদি মানিতে হয়, মানিয়া সেই দৃষ্টিতে যদি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমি-আমি-আমিকে বর্জন করা ছাড়া উপায় নাই। আলো ও আঁধার যেমন একসঙ্গে থাকে না, পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই যুগপৎ যেমন যাওয়া যায় না তেমনি আমি-আমিও করিব, আবার তত্ত্বজ্ঞান এবং পরাশান্তি লাভ করিব, ইহা সম্ভবপর নয়। আমি-আমি না করিলে ক্ষতিই বা এমন কি? এই জগৎ যেমন চলিতেছে চলিবে, এই দেহ-প্রাণ মন দিয়া যাহা হইবার তাহাও হইতে থাকিবে, এই জীবনে যাহা কিছু করিতে চাই, তাহাও করিতে কোন বাধা হইবে না—বরং সুষ্ঠুতর ভাবেই করিতে পারিব। 'আমি'তো চালায় না—চালাইবার ভান করে মাত্র; কাজ তো করে না—বৃথা কর্তৃত্ব করে মাত্র। আমি-আমি না করিলে লাভ কিন্তু বিপুল। যাহা মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, ক্ষয়িষ্ণু, দুঃখ-শোকমোহ-ভয়-অজ্ঞান-বাহী—উহাকে অতিক্রম করিয়া এমন এক বস্তুতে আমরা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারি যাহা চিরন্তন এবং অবিনাশী, ভাস্বর জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ, নির্ভয়—নির্মোহ —অখণ্ড জীবন-স্বরূপ।

কে বলে তুমি নাই?

অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

কে বলে তুমি নাই?
অন্তরে, বাহিরে
চরাচরে
তোমারে দেখিতে পাই।

ফুলে-ফলে হেরি মহিমা তব
বল্লরী-তরু-তৃণে গো,
ভূচর-খেচর-নদী-সরোবর
মরুৎ মহিমা গাহে গো।

মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যা
ভগিনী-ভ্রাতা-রূপ ধরি'
সরস, শান্ত কর গো হৃদয়
বরষি' স্নেহ-সুধা বারি,-

কত অজানা জনে করগো আপন
তাহার অন্ত নাই,
বিশ্ব জোড়া রয়েছ তুমি,—
কে বলে তুমি নাই?

অসমীয়া রঙালী উৎসব ও বিহু সঙ্গীত

নিরুপমা বসু, বি-এ

অসমীয়ার সমাজ-জীবনের উচ্ছল প্রাণধারার জীবন্ত প্রমাণ তাহার বিহু। বিহু অসমীয়ার জাতীয় উৎসব। বিহু শব্দের উৎপত্তি বিষুব শব্দ হইতে। বৎসরের আশ্বিন ও চৈত্র মাসে সূর্য্য বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী হওয়ার ফলে দিন-রাত্রি সমান হয়, এই কারণে এই দুইটি মাসান্তে বিহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবার পৌষের শেষে পবিত্র উত্তরায়ণ পড়ে, এইজন্য ইহাও একটি বিহু। তিনটী বিহুরই বিভিন্ন নাম—কঙালী, ভোগালী ও রঙালী।

বাঙালীর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মত বিহু অসমীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। এই বিহু উৎসবের মূল উৎসে রহিয়াছে সামাজিক স্নিগ্ধমধুর একপ্রাণতা, পরস্পরের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ ও অনাবিল আনন্দোপভোগের প্রতি প্রচুর আকর্ষণ। বিহু উৎসবের মধ্যে অসমীয়ার জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। এই উৎসবের বার্ত্তা সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের দ্বারে যথাসময়ে যাইয়া পৌছায়—ইহার ব্যাপকতা ও উপলব্ধি সার্ব্বজনীন। বিহুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দের বিপুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়।

বিহু তিনটি হইলেও ইহার ভিতর রঙালী বিহু উৎসবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রঙালী বিহুকে বহাগবিহু ও বলে। চৈত্রসংক্রান্তির দিন বালকেরা দীঘলতি, মাখিলতি নামে এক প্রকার বন্য বৃক্ষের পাতা সংগ্রহ করে। বিহুর প্রথম দিনকে বলে গরু-বিহু; ঐদিন লোকে গরুর শিংএ তেল মাখায় এবং লাউ, বেগুন, কুমড়া প্রভৃতি কাটিয়া গরুর গায়ে মালিশ করিয়া স্নান করায়। পরে পূর্ব্বোক্ত পাতা সর্ব্বদেহে বুলাইয়া দেয়। পর দিন হইতে ৭ই বৈশাখ পর্য্যন্ত মানুষ বিহু। এই সময় বয়ঃকনিষ্ঠগণ গুরুজনদিগকে সামান্তে সেবাপ্রণামাদি করে এবং চিড়া, দৈ, পিঠা প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাবার প্রস্তুত করিয়া গৃহকর্ত্রী আত্মীয়-বান্ধব ও অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন করেন। গৃহস্থ-বধূগণ সারা চৈত্রমাস প্রাত্যহিক ব্যস্ততার ফাঁকে তাঁত বুনিয়া রঙালী উৎসব উপলক্ষে প্রিয়জনকে চাদর, তোয়ালে, গামছা প্রভৃতি উপহার দেন। বহুবিধ ক্রিয়া-কৌতুক-রঙ্গ তামাসা সপ্তাহব্যাপী চলিতে থাকে। গৃহস্থের আর অন্যদিকে মন থাকে না; এই কয়টি দিন প্রতি গৃহের কাজের সংসারে যেন কপাট পড়ে। এই রঙালী বিহুর সময়ই বয়স-নির্ব্বিচারে আমোদপ্রিয় পুরুষেরা তাল ঢোল প্রভৃতি বাদ্য-সহযোগে ঘরে ঘরে 'হুচরি' গায় এবং চাঁদা তুলিয়া ভোজের আয়োজন করে। এই 'হুচরি' বিহুসঙ্গীতেরই অংশ মাত্র। 'হুচরির' কয়েকটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল—

রঙালী ঐ টঙালী ঐ
বহাগর বিহুরে ধেমালি ঐ।
হুরাই ল' স্বরগর তরা;
চাই থাক, চাই যাক নিলগর পরা।
বহাগর বিহুকে জনাবলৈ আহিছোঁ;
চাই থাক চাই যাক নিলগর পরা।

বিহু উপলক্ষে গাঁয়ের কীর্ত্তন-ঘরে নাম-

প্রসঙ্গ, কথকতা, ভাওনা (যাত্রা) প্রভৃতির মধ্য দিয়া অসমীয়া জাতীয় প্রাণের সজীব আনন্দধারার সহিত নিবিড় ভক্তিপ্রবণতা উৎসারিত হইয়া উঠে। দ্বিপ্রহরে আহার-সমাপ্তির পর বিশ্রামান্তে পাড়াগাঁয়ের তরুণ-তরুণীগণ বাঁশী, তাল প্রভৃতি লইয়া মাঠে যায় এবং প্রাচীন বসন্তোৎসবের ন্যায় নৃত্য-সহযোগে পল্লীগীত গাহিয়া উন্মুক্ত ক্ষেত্রকে মদির করিয়া তোলে।

এই পল্লীগীতগুলি অসমীয়া অক্ষরজ্ঞান-হীন প্রেমিক কবির তাঁহার প্রণয়াস্পদের প্রতি অবারিত হৃদয়ের অকপট ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। লোকমুখ-পরম্পরায় গীতগুলি বহুদিন যাবৎ চলিত হইয়া আসিতেছে। এই সব পল্লী-সঙ্গীতগুলিতে বিস্তার আড়ম্বর নাই, ব্যাকরণের অনুশাসন নাই, ভাষার ঔজ্জ্বল্য নাই এবং দার্শনিক তত্ত্বের জটিলতা নাই; কিন্তু প্রায় সব সঙ্গীতই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছ দর্পণ এবং মানবের নিগূঢ় হৃদয়াবেগের অপূর্ব্ব রূপায়ণ। যেমন—

জোনর সারথি তরা;
আমার সারথি চেনেহি লগরী
চিনিছোঁ মিলগর পরা।
দিনরে চিকুণ দিনরে সবিতা
রাতিরে চিকুণ জোন;
তাতোকৈ চিকুর মোর ঐ মইনা
যেন পূর্ণিমার জোন।

অপরূপ মন্দার-বৃক্ষের গুণহীনত্ব বিচার করিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য কবি কেমন সুন্দরভাবে একটি নীতি-উপদেশের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

কেলেই ফলিলি রূপহীমদার ঐ
কেলেই পেলালি কলি;
গুরুতো নেলাগ ভকততো নেলাগ
থাক্ তলে ভরিসরি।

কোন কোন পদে অশ্লীলতাবর্জ্জিত সরল হাস্য-রসের সুন্দর অবতারণা দেখা যায়—

প্রথমে ঈশ্বরে পৃথিবী সৃজিলে
লগতে সৃজিলে জীব;
সেই জন ঈশ্বরে পিরীতি করিলে
আমি বা নকরিম কিয়?

আবার কোথাও পাওয়া যায় বিরহী কবির বেদনাক্ত প্রাণের নিভৃত পুরের বিষাদঘন স্নিগ্ধ-মধুর মূর্চ্ছনা—

চতেকৈ মহীয়া নাহরফুল ফুলিলে
বহাগত পেলালে কলি;
আমার তুথর দিন আহিলে লাহরি
চকুরে নোচোয়া হ'লি।
পিরীতি নেভাগে পিরীতি নিছিগে
পিরীতি নপরে সরি;
যত মেরিয়াবি তত মেরে থাব
পিরীতি মরমর জরি।

ভাষার দীনতা থাকিলেও আবার একটি পদে প্রেম-পাগল আত্মহারা পল্লীকবির বিরহ-বেদনার রূপটি এমন অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে বিরহিণীর প্রতি কালিদাসের বিরহী যক্ষের মর্ম্মভেদী বিলাপকেও মনে হয় হার মানায়—

চরাই হৈ পরিমগৈ তোমারে বিলত ঐ
মাছ হৈ পরিমগৈ জালত;
ঘাম হৈ পরিমগৈ তোমারে শরীরত
মাখি হৈ পরিমগৈ গালত।

বিরহী কবি বিচ্ছেদের নিবিড়তার মধ্যেও তাহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্য-মিলনের সুখোজ্জ্বল দিনগুলির সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি-তেছে; কিন্তু এই উপলব্ধির পশ্চাতে আছে বিধাতার উপর ঐকান্তিক নির্ভর—

বিধি হৈ স্রজোতা তেঁয়ে পালোতা
তেঁওরে ওপরত ভর;

তোমারে মোরে যদি যোরা আছে
তেঁয়ে পাতি দিব ঘর।

পশ্চিমী সভ্যতায় প্রভাবান্বিত আধুনিক অসমীয়া সমাজের নিকট বিহু উৎসব এবং লোকসঙ্গীতগুলি আজকাল তেমন আদৃত না হইলেও উনবিংশ শতকের শেষাংশ পর্য্যন্তও এই বিহু উৎসব ও আনুষঙ্গিক নৃত্যগীত আসামে সামগ্রিক ভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল।

আজকাল নিম্ন আসামে বিহু-গীতের রেওয়াজ নাই বলিলেই চলে; তবে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে নওগাঁ এবং এপারে দরং জেলায় ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইলেও এখনও গৃহে গৃহে এই উৎসবের অনুষ্ঠান পল্লীবাসীর অন্তরে প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগায়।

জীবে প্রেম

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

জীবে দয়া কি করিবে তুমি
কতটুকু ঘুচাইবে ব্যথা ?
'জীবে প্রেম' এই তত্ত্ব সার,
এই সত্য বিবেক-বারতা।

জীব মাঝে আছে শিবরূপে,
ঘটে ঘটে আছে সেই রাম,
দরিদ্র ভিক্ষুকে তাই, প্রেমিক যে জন
সেবে করি 'নারায়ণ' জ্ঞান।

পীড়িতের পাশে রহে বসি,
পাপীকেও লয় বুকে টানি,
বহুরূপে আসে নারায়ণ,
প্রেমিক তা' লয় সত্য মানি।

আগে প্রেম, তাহারি উচ্ছ্বাসে
ভেসে আসে সেবার প্রয়াস,
প্রেমিক যে, সেই সত্য পায়,
ঈশ্বরের সেবার উল্লাস।

সমালোচনা

প্যাগোডার দেশে—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; পাকিস্তান-প্রাপ্তিস্থান—বীণা লাইব্রেরী এজেন্সী, বাঙ্গালা বাজার, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ; পৃষ্ঠা—১৯৭; মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

পুস্তকখানি সমগ্র ব্রহ্মদেশের একটি নির্ভর-যোগ্য মনোরম ভ্রমণ-কাহিনী। গ্রন্থকার বিশ্ব-বিশ্রুত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন ত্যাগ ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসী। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণ-সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি বহু বৎসর এদেশে ও সুদূর ব্রহ্মদেশে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন ব্রহ্মদেশে বাস করিয়া বিভিন্ন সময়ে সেবাকার্যব্যপদেশে ঐদেশের নানা শহরে, নগরে, পল্লীতে, মঠে, মন্দিরে, পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরিয়া ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, গৃহস্থ-ভিক্ষু সকলের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় পরিচয়ের ফলে তিনি ব্রহ্মদেশবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-ধারা—তাহাদের আহার-বিহার, রীতি-নীতি, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-কৃষ্টি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন এবং উহাই এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া সকলের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রন্থকার শুধু একজন সাধারণ পর্যটকের মত ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করেন নাই; তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন প্রকৃত নিঃস্বার্থ দরদী সেবকরূপে ব্রহ্মবাসিগণের সহিত মিশিয়া তাহাদের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ষোলটি অধ্যায়ে সহজ সরল কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে স্বর্ণভূমি ব্রহ্মদেশ বৃহত্তর ভারতের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সুদূর প্রাচ্যের ব্রহ্ম, শ্যাম, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে প্রচারিত হইয়া ঐ সকল দেশের সমাজ-জীবনকে প্রভূতপরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এখনও এই অঞ্চলগুলির মন্দিরাদিতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান। স্বাধীন ভারতের প্রতিবেশী স্বাধীন ব্রহ্মের সহিত সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সৌহার্দ্য-স্থাপনের অন্যতম উপায় তদ্দেশবাসিগণের জীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিতি লাভ করা। এই পুস্তকখানি এবিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

পুস্তকখানির ভাষা সহজ, সাবলীল ও প্রসাদগুণ-যুক্ত; প্রকাশভঙ্গী খুবই চমৎকার। পড়িতে বসিলে পাঠক-পাঠিকা শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না। পুস্তকের প্রচ্ছদপট, কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। সতরখানা মনোরম ছবি ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়-চৌধুরী, ১১৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কলিকাতা—২৫। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬। পৃষ্ঠা—৫২+৷৷৴; মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানি স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বক্তৃতা, কথোপকথন ও পত্রাবলী হইতে সংকলিত শিক্ষা সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বাণীসমূহের বঙ্গানুবাদ। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন দিব্য-দৃষ্টিসম্পন্ন মৌলিকচিন্তাশীল স্বদেশ-হিতৈষী মানব-প্রেমিক ঋষির শিক্ষা ও উহার পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানুষগঠনোপযোগী শিক্ষা, শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি, শিক্ষক ও ছাত্র, চরিত্রগঠনের শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা—এই কয়টি বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজি বলিয়াছেন—"মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব সুপ্ত রহিয়াছে তাহার বিকাশ-সাধনই শিক্ষা। আমরা সেই শিক্ষা চাই যাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের জোর বাড়ে, বুদ্ধি বিকশিত হয় এবং মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। বিদেশীয় শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় সংস্কৃতির সকল শাখা আমরা আয়ত্ত করিতে চাই, এবং তৎসঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষাও আবশ্যক।... ধর্মই শিক্ষার অন্তরতম মর্মস্থল। লোকসমক্ষে যথার্থ সনাতন ধর্মনীতি-সূত্রসমূহ উপস্থাপিত করা আবশ্যক।" স্বাধীন ভারতে নূতনভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রাষ্ট্রনায়ক, শাসক, শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক ও বিদ্যার্থী—সকলেরই শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজির এই মৌলিক চিন্তাগুলি গভীরভাবে অনুধ্যান ও অনুসরণ করা উচিত।

পুস্তকখানির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট মন্দ হয় নাই। কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি চোখে পড়িয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে যাহাতে অশুদ্ধি না থাকে তৎপ্রতি প্রকাশক দৃষ্টি রাখিবেন, আশা করি। পুস্তকখানির বহুল প্রচার দ্বারা দেশের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

—শ্রীরমণীকুমার দত্ত গুপ্ত, বি-এল্

GIRISH GHOSH AND HIS DRAMAS—By Swami Jagadiswarananda; Published by The Book House, 15, College Square, Calcutta; Pages 162; Price: Rupees Three only.

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের কবিপ্রতিভা বঙ্গ-ভারতীকে বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। রসসৃষ্টিই সাহিত্যের প্রধানতম কর্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু 'শিবেতরক্ষতয়ে' যে রসপরিবেশন তাহাই প্রমাতৃগণের অনুভূতিকে মধুময় করিয়া তোলে। Oscar Wilde-এর মত গিরিশচন্দ্রের Art for Art's sake নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব ছিল না, নিছক বস্তুতান্ত্রিকতাও তাঁহার সাহিত্যের সর্বস্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য-জীবন-প্রভাবে যে আদর্শনিষ্ঠা গিরিশচন্দ্রে অনুস্যূত হইয়াছিল, তাহারই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি দেখিতে পাই তৎকৃত অসংখ্য নাটক ও গানে। আলোচ্যমান পুস্তকখানি গিরিশ-প্রতিভার একটি চমৎকার পরিচিতি। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় যে সকল প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনায় অপরিহার্য। গিরিশ-সাহিত্যের দিগ্-দর্শনকারী এই পূর্বসূরিগণ বর্তমান লেখকের প্রধান উপজীব্য হইলেও তিনি আপন বৈশিষ্ট্য হারান নাই। সহজ চিত্তাকর্ষক ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় লেখক গিরিশ-জীবনের সব কিছুই বলিয়াছেন। মহাকবির নাট্য-প্রতিভার বিশ্লেষণে তিনি তুলনা-মূলক সাহিত্য-জ্ঞান ও গভীর রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। লেখক প্রসঙ্গতঃ Shakespeare, Ibsen, Bernard Shaw প্রভৃতি পাশ্চাত্য নাট্যকারদের রচনার

যে মূল্যনির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা রস-বিচার-ক্ষেত্রে একটি নূতন সূত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বলিয়া মনে করি। বিভিন্ন সময়ে লিখিত গ্রন্থকারের রচনার সমষ্টি এই পুস্তকখানি। সেইজন্য স্থানে স্থানে পুনরুক্তি-দোষ লক্ষ্য করিলাম। মোটের উপর সংস্কৃতিমান্ পাঠক-সমাজে এই সুলিখিত গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ছাত্রজীবনে শক্তিসঞ্চয়—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্-এ; প্রাপ্তিস্থান—ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা; ২৩ পৃষ্ঠা; মূল্য ।• মাত্র।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চিত না হইলে মনুষ্য-জীবন মহিমময় হইতে পারে না। লেখক তাঁহার প্রভূত ব্যবহারিক ও শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা শক্তি-সঞ্চয়ের সহজ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ছাত্র-সমাজ জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাঁহারা যদি বাল্যকাল হইতেই জীবনকে কল্যাণমুখী করিতে যত্নবান্ হন, তাহা হইলেই শক্তিহীনতার মহতী বিনষ্টি হইতে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা পাইতে পারেন।

—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ

মহাচীন—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ (অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, মান্দালয়, ব্রহ্মদেশ) কর্তৃক লিখিত এবং শ্রীদিগেন্দ্র লাল সরকার, এম্-এ, বি-এল্ কর্তৃক বীণা লাইব্রেরী, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন সাইজ, ২৪• পৃষ্ঠা, দাম চারি টাকা।

মহাচীন দেশ আমাদেরই প্রতিবেশী, তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগও রয়েছে অনেক। কিন্তু আমরা ক'জনই বা তার খবর রাখি, সেই দেশ সম্বন্ধে জানি? এত বড় একটা দেশ, এত বড় একটা জাত, আমাদেরই প্রতিবেশী অথচ তাদের সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই কোনও জ্ঞান, কোনও ধারণাই নেই! কলকাতা শহরে জুতো কিনতে গিয়ে যে ক'জন চীনার সাথে সাক্ষাৎ হয় আমরা তাদের সাথে দর কসাকসি করি, আর মনে করি এই বুঝি সমস্ত চীন, সব চীনাই এই রকম। লেখক এই মহাচীন বইখানি লিখে আমাদের যে কি কল্যাণ করেছেন তা'বলে শেষ করা যায় না। বইখানি এত সব তথ্যে পূর্ণ যা পড়ে মনে বিস্ময় উৎপাদিত হয়, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেয়। লেখক মহাচীনের 'ভৌগোলিক সংস্থান' থেকে শুরু করে "মহাচীনের এক শতাব্দী" পর্যন্ত ২১টি বিষয়ে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা' ইতিহাসের রসে যেমন পুষ্ট—ভারতের প্রতি সাবধান বাণীও তাতে তেমনই স্পষ্ট। মানচিত্র এবং অপর কয়েকটি চিত্রও বইখানির শোভা বর্ধন করেছে। বইখানি আমাদের দেশের প্রত্যেকেই পড়ুন এবং চিন্তা করুন এই ইচ্ছা করি।

—জ্যোতিরূপ

ইণ্ডিয়ান না হিন্দু—ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু কর্তৃক হিন্দুস্থান সাহিত্য সঙ্ঘ, ৪নং সুবল চন্দ্র লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵•।

লেখক 'হিন্দুর বাংলা', 'Image-worship' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া পাঠক-সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন ইংরাজীতে যে ইণ্ডিয়ান শব্দ আমরা জাতি অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা 'হিন্দু' শব্দেরই

বিকৃতরূপ মাত্র। তাঁহার যুক্তির সপক্ষে তিনি বেদাদি শাস্ত্রও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপরের প্রদত্ত সংজ্ঞায় পরিচিত হইতে নিজেদের গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পায় না—কাজেই জাতি হিসাবে আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। এই পুস্তিকাপাঠে সেই প্রয়োজন অনেকাংশে সিদ্ধ হইবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

স্মৃতিকথা—স্বর্গীয় মন্মথ কুমার বসু রচিত ও শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বসু, এম-এ (অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস) কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্ ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৪৲ টাকা।

এই পুস্তকখানিতে যদিও লেখকের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইহা পাঠ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলা দেশের অনেক খবর পাওয়া যাইবে। তখনকার সামাজিক রীতিনীতি পারিবারিক অবস্থা এবং সাধারণের মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের রচনাভঙ্গী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। মোটের উপর পুস্তকখানি বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। দেশের পুরাতন রীতিনীতির সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন বইখানি তাঁহাদের নিকট আদৃত হইবে।

—স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্যজীর দেহত্যাগ—গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৭-১০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারী মাতৃকাচৈতন্যজী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বাগবাজার বলরাম মন্দিরে ৬০ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দিন প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের ষট্‌সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি বেলুড় মঠে সমস্ত দিন থাকিয়া সন্ধ্যায় বলরাম মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়াই ঐ রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া কাশীমিত্র শ্মশানঘাটে সমাহিত করা হয়।

গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত গৌরীমোহন মিত্র। তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা-নিবাসী স্বর্গীয় মনোমোহন মিত্রের পুত্র ছিলেন। পিতার ধর্মভাব পুত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই গৌরী বাবু শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বি-এ পাশ করিয়া কৌমার্যব্রত অবলম্বনে দেশের ও দশের সেবায় জীবনোৎসর্গ করেন। বাংলার অগ্নিযুগের আন্দোলনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলের সর্ববিধ জনহিতকর কার্যে গৌরী বাবু অগ্রণী ছিলেন এতদ্ভিন্ন কাঁকুড়গাছি

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান, পাণিবাগাম রামকৃষ্ণ সমিতি এবং কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির সকল কার্যে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন। গত বৎসর গৌরী বাবু বেলুড় মঠ হইতে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন। তিনি বলরাম মন্দিরে থাকিয়া বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বাগবাজারস্থ ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকরূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উঁহার কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন। মাতৃকাচৈতন্যজীর ধর্মানুরাগ, স্বদেশপ্রেম, সেবাপরায়ণতা এবং অমায়িক ব্যবহার আদর্শ-স্থানীয় ছিল। তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি (উত্তর ক্যালিফর্নিয়া)—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত মে মাসে এই কয়টি বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল :—(১) বেদান্ত, ইহার আচার্যগণ ও নীতিসমূহ, (২) দুঃখ ও পাপ কেন? (৩) জীবন-সংগ্রামে বিজয়, (৪) হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত, (৫) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ-সমূহ, (৬) আধ্যাত্মিক জীবনের কৌশল, (৭) সমষ্টি চৈতন্য ও সমষ্টি অচৈতন্য, (৮) আধ্যাত্মিক দীক্ষার শক্তি, (৯) আত্মা ও উহার পরিত্রাতা। বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী। ৮ নং বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ফিলাডেলফিয়া বেদান্তকেন্দ্রের স্থাপয়িতা স্বামী যতীশ্বরানন্দজী। এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটির বক্তৃতাভবনে স্বামী অশোকানন্দজী সদস্য ও শিক্ষার্থিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদের নিকট 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্' বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে 'বেদান্তের সার্বভৌম তত্ত্ব,' 'জগতের মহত্তম আচার্যগণের জীবনী ও শিক্ষা' এবং 'সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা' সম্বন্ধে বালক-বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সোসাইটির গ্রন্থাগার ও পাঠভবন সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী)—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে এই আশ্রমটি ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবৎ দুঃস্থ এবং রুগ্ন নারায়ণদিগের সেবা করিতেছেন। অতি সামান্য ভাবে যে সেবাশ্রমের পত্তন করা হইয়াছিল, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যে এক্ষণে তাহা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। যেখানে প্রথমে মাত্র কয়েকটি 'বেড' ছিল, এখন সেখানে আধুনিক সাজসরঞ্জামযুক্ত ৫৫টি 'বেড' হইয়াছে।

এক্ষণে চক্ষুচিকিৎসা-বিভাগ সেবাশ্রমের একটি বিশেষ অঙ্গ। এখানে সহস্র সহস্র নরনারী, বালক-বালিকার চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার করা হয়। শুধু স্থানীয় এবং আশে পাশের গ্রামের লোক নহে—ভারতের একটি মহাতীর্থস্থান বলিয়া যে অগণিত তীর্থযাত্রী নিত্য আসা যাওয়া করেন, তাঁহারাও এই আশ্রমের সেবা ও সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। এসব দেশে চোখের রোগ খুব বেশী হয়, সুতরাং এই বিভাগটি খোলায় বহু লোকের উপকার হইতেছে।

আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের Indoor General Hospital-এ মোট ১,৩৬৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। এঁদের মধ্যে চোখের রোগীও ছিলেন। মোট সংখ্যার মধ্যে ১,২৫০ জন আরোগ্যলাভ করেন, ২১ জনের মৃত্যু এবং ৬৪ জনকে ব্যবস্থাপত্র দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাকি ২৯ জন বৎসরের

শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চোখের রোগী সমেত মোট ২,১৪৬ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। এই বিভাগে ৪৯ জন আশ্রয়প্রার্থী রোগীকে ভর্তি করা হয়।

Outdoor Dispensaryতেও এই বৎসর ২৮,৯৬৬ জন নূতন ও ৬৩,৮৯২ জন পুরাতন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে এবং চক্ষু-বিভাগের রোগী সমেত মোট ১৩৩৩ জনকে অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৯৪৭ সন অপেক্ষা এই বৎসরের রোগীদের সংখ্যাধিক্যের একটি বিশেষ কারণ বহু আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম। মোট আশ্রয়প্রার্থী রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫,০১০।

১৯৪৭ সনে বোম্বাইএর শেঠ শ্রীরতনসে চাম্প্‌সি ও শেঠ শ্রীনটবরলাল এম্‌ চিনাই-এর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় যে X-Ray Plant খরিদ করা হয়, আলোচ্যমান বর্ষে X-Ray বিভাগে তাহার কাজ শুরু করিয়া ৭৪ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই বিভাগটি প্রবর্তিত হওয়ায় বৃন্দাবন এবং আশে পাশের লোকদের বহু কালের একটি বিশেষ অভাব দূর হইয়াছে।

আশ্রমের Clinical Laboratory ও Inductothermy বিভাগে আলোচ্যমান বর্ষে ৭৫৪ জনের মল, মূত্র, রক্ত, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষা করা এবং Inductotherm-therapy দ্বারা ৩৪ জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছে।

এসব ছাড়াও সেবাশ্রম স্থানীয় ২৩ জন দুঃস্থ ভদ্রলোক ও বিধবা মহিলাকে মাসিক ও সাময়িক ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের আয় ৬৬,৯২৮/০ আনা এবং ব্যয় ৬৭,৬৪৪।৶ ৩ পাই। সমস্ত জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধিই এই অতিরিক্ত ব্যয়ের একমাত্র কারণ। আনন্দের বিষয় যুক্তপ্রদেশের গভর্নমেণ্ট এই সেবাশ্রমকে যে বাৎসরিক ২০০০৲ টাকা দিতেন, এক্ষণে তাহা বাড়াইয়া ৬০০০৲ টাকা করিয়াছেন।

সেবাশ্রমটি যমুনার কূলে অবস্থিত হওয়ায় প্রতি বৎসরই বন্যার উপদ্রবের ভয় থাকে। ১৯৪৭ সালে আশ্রমটি ৪ দিন বন্যাপ্লাবিত অবস্থায় থাকায় কিছু কালের জন্য সমস্ত বিভাগের কাজই বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য এবং লোকালয় হইতে বহুদূরে অবস্থিতির দরুন রোগীদের আসা যাওয়া করিতে অত্যন্ত কষ্টকর বিধায় কর্তৃপক্ষ আশ্রমটিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে—মথুরা বৃন্দাবনের রাস্তার উপরে সরাইয়া লওয়া স্থির করিয়াছেন। এই সরানো ব্যাপারে এবং সেখানে হাসপাতালগৃহ, ডাক্তার এবং নার্স-দিগের 'কোয়ার্টার', ঠাকুর ঘর প্রভৃতি নির্মাণে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। সমস্ত খরচপত্র চালাইবার জন্য সেবাশ্রমের একটি স্থায়ী তহবিলেরও একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করি সকলেই সাধ্যানুসারে এই আশ্রমটিকে সাহায্য করিবেন।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্যমান বর্ষে সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টা (১) ধর্মালোচনা ও প্রচার (২) শিক্ষাবিস্তার এবং (৩) জনসেবা —এই তিনটি ধারায় পরিচালিত হইয়াছে। সাপ্তাহিক আলোচনা-সভাগুলিতে পণ্ডিত শ্রীহরিপদ পুরাণরত্ন ধারাবাহিক ভাবে গীতাব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত এবং তদুপলক্ষে তাঁহাদের দিব্য জীবনী আলোচিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে নয় দিন শহরের

বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দূরবর্তী ও নিকটবর্তী কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি হয়। বেলুড় মঠের স্বামী জপানন্দজী ও স্বামী আত্মানন্দজী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়। সর্বশ্রেণীর নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করে। হলুদপুকুর, মানপুর, গোলমুরী, চেনাবরোড প্রভৃতি স্থানের উৎসব বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সমারোহে সম্পন্ন হয়।

আলোচ্যমান বর্ষে সোসাইটি কর্তৃক ১টি উচ্চ ইংরেজী, ২টি মধ্য ইংরেজী, ২টি নিম্ন প্রাথমিক হিন্দী, ১টি নিম্ন প্রাথমিক বাংলা ও ১টি হিন্দী নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে সর্বসাকল্যে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০০এর অধিক। সাকৃচি হাই স্কুলটি বিহার মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অনুমোদিত। এ বৎসর এই বিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে। চলিত বর্ষ হইতে বিষ্ণুপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণী খোলা হইবে। মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক। ৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৪ জন পাশ করিয়াছে। ১৯৪৯ সন হইতে বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চতর শ্রেণী খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যালয়সমূহ বাবত মোট ৪৫,৭৪০।০ ব্যয়িত হয়। বিদ্যালয়গুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী ও মহাত্মাজীর জন্মোৎসব, স্বাধীনতা-দিবস এবং সরস্বতী পূজা প্রতিপালিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তার-সহায়ে দরিদ্র ও অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির সেবা করা হয়। আদিবাসী ও হরিজন বালকবালিকাদের জন্য বিশেষ সাহায্যের বন্দোবস্তও আছে।

সোসাইটির উদ্যোগে দুইটি বিদ্যার্থি-ভবন পরিচালিত হয়—একটি সোসাইটি-প্রাঙ্গণে, অপরটি (বিবেকানন্দ আশ্রম) সুবর্ণরেখার তীরে। আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর বালকগণকেও বিদ্যার্থি-ভবনে ভর্তি করা এবং উহাদের সবিশেষ যত্ন করা হয়। আলোচ্যমান বর্ষে ছাত্রভবন বাবত ব্যয়িত হইয়াছে ৫,৩০৫।৴০।

সোসাইটির গ্রন্থাগার ও পাঠভবনে ১,৬৭৭ খানা পুস্তক, ১৩ খানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক এবং ১০ খানা মাসিক পত্রিকা রাখা হইয়াছিল।

দুঃস্থ ও দরিদ্রগণের আর্থিক সাহায্য, রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা, মৃতদেহের সৎকার প্রভৃতি সোসাইটির জনসেবা-কার্যের অঙ্গীভূত। সুখের বিষয়, সোসাইটির কর্মিবৃন্দের নিঃস্বার্থ জনসেবার আদর্শে জামসেদপুরের সমাজ-জীবন দিন দিন অনুপ্রাণিত হইতেছে। জামসেদপুর মহিলা-সমিতিও তাঁহাদের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক আলোচনা-সভার কার্যাদি সমিতি-ভবনে পরিচালনা করিয়াছেন।

আলোচ্যমান বর্ষে সোসাইটির সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫৩৫ এবং সদস্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ২,৭০৯।০; পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত সহ এই বৎসরের আয় মোট ৬৭,৮৫০।৵৫ পাই এবং ব্যয় ৫৩,২২৯৸৵৬ পাই।

সোসাইটির পরিচালকগণ স্থায়ী তহবিল, বিদ্যালয়গুলির সম্প্রসারণ-কার্য, বিদ্যার্থি-ভবনের ব্যয়-নির্বাহ এবং গ্রন্থাগারের পুস্তক-ক্রয়ের জন্য গবর্নমেণ্ট ও সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট অর্থ-সাহায্যপ্রার্থী।

অগ্নিদাহ-সেবাকার্যে সাহায্যের জন্য কনখল (যুক্ত-প্রদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আবেদন—গত ১৬ই মে কনখলের নিকটবর্তী কুমহার ও পল্লদর মহল্লায়

অনেকগুলি গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় ৩০টি দরিদ্র পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। স্থানীয় সেবাশ্রম বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রভিডেণ্ট রিলিফ্ ফাণ্ডের সহায়তায় দুঃস্থগণের গৃহনির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই কার্যে উক্ত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সাহায্য পর্যাপ্ত নহে। এজন্য সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট তাঁহারা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।—স্বামী রঘুবরানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, পোঃ কনখল, জেলা সাহারানপুর (যুক্তপ্রদেশ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা)—কিছুদিন হয় এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৪তম শুভ জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষপূজা, হোমাদি এবং শোভাযাত্রা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। এই উপলক্ষে আহূত একটী জনসভায় বেলুড়মঠাগত স্বামী বোধাত্মানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্তে সায়াহ্নে প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত স্বামীজী এই দ্বীপের অন্তর্গত কমলপুর গ্রামে একটী এবং ২য়খণ্ড গ্রামে একটী জনসভায় ভাগবতধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উভয় সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ২৮শে ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বর্ধমানের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত অভয়চাঁদ মহ্‌তবের পৌরোহিত্যে একটি সভার অধিবেশন হয়। আশ্রম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বসু আশ্রমের কার্যবিবরণী পাঠ করিলে বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "সর্বধর্মসমন্বয়" সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন বর্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় স্বামী সুন্দরানন্দজী "বর্তমানে ভারতবাসীর কর্তব্য" সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিভাষণটীও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ৫ই আষাঢ় আশ্রমে ভজন-সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান ও সমবেত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ হয়।

আমতা (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির—গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রতিষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় যুবকবৃন্দের উদ্যোগে উৎসবে ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বেলুড় মঠের স্বামী সুন্দরানন্দজী "শ্রীরামকৃষ্ণদেব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান

করেন। সভাপতি স্বামী ধর্ম্মানন্দজীর বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ভারতীয় বিমানবহর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা—গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ন্যায় বিমানবহরও দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে। পূর্বে বিমানবাহিনীতে শুধু বৃটিশ অফিসার ছিলেন, এক্ষণে ইহা সমগ্রভাবে ভারতীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত। বিমানশক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার বিমান-ক্রয়, অফিসারট্রেণিং-ব্যবস্থা ব্যাপক করিয়া বিমানবহরকে শক্তিশালী করিবার জন্য সচেষ্ট। এই বিষয়ে জনসাধারণের অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক কেন্দ্রে বিমান মহড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজকীয় ভারতীয় বিমান বহরে অগৌণে ১০ স্কোয়াড্রন বিমান সংগ্রহই গভর্নমেণ্টের লক্ষ্য। দেশরক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্ত তুচ্ছ। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতাই ভারতীয় বিমানবহরের শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। বিমানের জন্য ভারত সর্বতোভাবে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। এমন কি ১৯৫২ সালের পূর্বে ট্রেণিংদানের উপযোগী বিমানও ভারতে প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে না। ষোল বৎসর পূর্বে গঠিত রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহর বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সর্বপ্রথম এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতি-বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় বিমানবহরকে উপজাতি-অধ্যুষিত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে হানা চালাইতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমর আরম্ভ হইবার সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীতে এক স্কোয়াড্রন বিমান ছিল। কিন্তু যুদ্ধ এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিবার ফলে ভারতীয় বিমানবহর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ১৯৪০ সালের মধ্যে উপকূলরক্ষী বিমানবহর হিসাবে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন ও করাচীতে উহা সংগঠন করা হয়। মুখ্যতঃ ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনীর অফিসারদের উপর ভারতের প্রায় ৩ হাজার মাইল দীর্ঘ উপকূল রক্ষার ভার অর্পিত হয়। জাপ অভিযান-প্রতিরোধের জন্য ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিমানবহরের ১নং স্কোয়াড্রনকে ব্রহ্মে প্রেরণ করা হয়। ইহারা ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে আরও কয়েকটি স্কোয়াড্রন গঠিত ও ব্রহ্ম রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়। ১৯৪৪ সালের মধ্যে পুরাতন বিমানগুলি বাতিল করিয়া আধুনিক উন্নত শ্রেণীর বিমান ভারতীয় বিমানবহরে সংগৃহীত হয়। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ইম্ফলে ও কোহিমা রণাঙ্গনে সংগ্রাম চলিবার কালে ফটো গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ কার্য পরিচালনের দায়িত্ব ভারতীয় বিমানবহরের উপর অর্পিত হয়। ১৪শ আর্মি ইম্ফল হইতে মান্দালয় ও রেঙ্গুন অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে ভারতীয় বিমানবহর বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ১২ই মার্চ ভারতীয় বিমানবহর এই নামের পূর্বে 'রাজকীয়' শব্দ যোগ করার প্রস্তাব রাজা অনুমোদন করেন। ১৯৪৬ সালে দখলকার ভারতীয় বাহিনীর সহিত ভারতীয় বিমানবহরের কয়েক স্কোয়াড্রন জাপানে প্রেরিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় ভারত সাত স্কোয়াড্রন জঙ্গী ও এক স্কোয়াড্রন ট্রান্সপোর্ট বিমান প্রাপ্ত হয়। পুনর্গঠন-কার্য সুরু হইবার প্রারম্ভেই ভারতীয় বিমানবহরকে কাশ্মীর রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হয়। ১৯৪৭

সালের ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ১টার সময় শ্রীনগরে সৈন্যপ্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৭শে অক্টোবর প্রত্যূষে ভারতীয় বিমানবহর পালাম বিমানঘাঁটি হইতে শ্রীনগর যাত্রা করে। অথচ শ্রীনগর সেই সময় শত্রু-কবলিত কি না তাহাও জানা ছিল না। বৈমানিকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, শ্রীনগর শত্রু-কবলিত হইলে তাঁহাদের জম্মুতে অবতরণ করিতে হইবে। বিমানবহর এইরূপ নাটকীয় সাফল্য অর্জন করিবার ফলে কাশ্মীরের রাজধানী ও সমগ্র উপত্যকা রক্ষা পায়। জম্মু ও কাশ্মীর রণাঙ্গনের প্রতিটি বড় রকমের সংঘর্ষে বিমানবহর বিশেষ অংশ গ্রহণ করে এবং প্রায় ২৩ হাজার ফুট উচ্চ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সুদূর লাডক অঞ্চলের লে দুর্গে নূতন সৈন্য-দল লইয়া যায়। পুঞ্চ অঞ্চল প্রায় এক বৎসর অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং বিমানবাহিনী সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত না রাখিলে উক্ত অঞ্চল রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বিমান-বাহিনী শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণ তুচ্ছ করিয়া প্রায় ২৩ হাজার আশ্রয়প্রার্থীকে স্থানান্তরিত করে। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী যুদ্ধ-বিরতি নির্দেশ প্রদত্ত হইলেও বিমানবহরকে অদ্যাবধি সরবরাহ কার্য সমান ভাবে চালাইয়া যাইতে হইতেছে।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবসের স্মৃতি-সভা—গত ২১শে আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে বেলগাছিয়ার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস এবং পুরস্কারবিতরণ-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ সি চ্যাটার্জি। তিনি তাঁহার ভাষণপ্রসঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের সর্ব-প্রকার সহায়তার আশ্বাস দেন।

তিনি গ্র্যাজুয়েটগণকে সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান এবং তাহাদিগকে কলিকাতা শহরে অত্যধিক ভীড় না জমাইয়া পল্লী অঞ্চলে তাহাদের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিতে অনুরোধ করেন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, শুধু চিকিৎসা-জগতেই নহে, পরন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও বর্তমানে সেবার আদর্শের অভাব দেখা যায়। সকল স্তরেই লোকজন আজ সমস্ত ব্যাপারই যেন উহার অর্থকরী শক্তির দিক হইতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি নিজেদের এই দেশকে প্রকৃত গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে বর্তমানে এই মনোভাব পরিবর্তন করিয়া অধিক মাত্রায় সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাতি যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই সব কার্যে ব্রতী হইতে হইবে।

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ এম এন বসু অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে গবর্নমেণ্ট কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের সম্মিলনে গঠিত নূতন মেডিক্যাল কলেজটিকে আর্থিক সাহায্যও দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সব মেডিক্যাল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার কার্য প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রদেশের সমস্ত মেডিক্যাল স্কুলকেই তুলিয়া দিবার জন্য গবর্নমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পরিতাপের বিষয়।

মেডিক্যাল স্কুলগুলি তুলিয়া দেওয়ার পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে ২টি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৬টি

মেডিক্যাল স্কুল ছিল এবং ঐগুলিতে প্রতি বৎসর মোট প্রায় ৮৫০ জন করিয়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইত। কতকগুলি মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের দু'দফায় ক্লাশ লইবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর এই সংখ্যা বাড়িয়া ১১০০ হয়; কিন্তু কলিকাতা ও মফঃস্বলে মেডিক্যাল স্কুলগুলির উচ্ছেদ হইয়া যাওয়ায় মেডিক্যাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রভর্তির মোট সংখ্যা এক্ষণে ৫০০-৬০০ মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমানে কলিকাতার ৪টি মেডিক্যাল কলেজের প্রত্যেকটিতে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রী বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি করিয়া নির্বাচনী বোর্ড আছে। ইহার ফলে ছাত্রদের অযথা উদ্বেগ ও ক্লেশ পোয়াইতে হয় এবং অভিভাবকদেরও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। এই ব্যাপারে একটা সংযুক্ত নির্বাচনী বোর্ড গঠন করিলেই চলিতে পারে বলিয়া ডাঃ বসু মনে করেন। তিনি আরও বলেন যে, মেডিক্যাল কলেজগুলির মধ্যে ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবৃন্দের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির ও ভবন

আবেদন

ভারতের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নব্য ভারতের জনক যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি-রক্ষাকল্পে তদীয় জন্মস্থান ও প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতা নগরীতে একটি স্মৃতিমন্দির ও ভবন নির্ম্মাণ করা সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। সহৃদয় দেশবাসিগণের মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য, অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আন্তরিক সহযোগিতার উপর এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। অদ্যাবধি সহৃদয় জনগণের নিকট হইতে ৫৮,৭২৬৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির জন্য দুই লক্ষ টাকার আবশ্যক। বীরপূজায় শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি (২১নং বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা) কর্তৃক সাদরে ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে। ইতি—

স্বামী আত্মবোধানন্দ
সভাপতি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি
৩০।৬।৪৯

দার্শনিক হেগেল ও মার্ক্সের 'ডায়ালেকটিক্ নীতি'

সম্পাদক

দার্শনিক হেগেল বলেন, জাগতিক সকল বিষয়ে চৈতন্যশক্তিই একমাত্র নিয়ামক নীতি (Spirit is the only motive principle)। তাঁহার মতে জীবের মধ্যে এই শক্তি মনের ক্রিয়ায় অভিব্যক্ত এবং জড় পদার্থে ইহা অদৃশ্যরূপে বিদ্যমান। এই জন্য মনের গতি (movement of mind) সর্ববিধ জৈবিক পরিবর্তনের মূল কারণ। তিনি বলেন, মনের পশ্চাতে ভাব (idea) আছে। কোন ভাব ভিন্ন মন যে দাঁড়াইতেই পারে না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। হেগেলের মতে এই ভাব স্বাধীন এবং জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন।

ডারউইন প্রমুখ বিবর্তনবাদিগণ বলেন, এক এক শ্রেণীর সমধর্মী সকল জীব ও উদ্ভিদ (all the genera of one order) এক এক আদিম জীব ও উদ্ভিদ হইতে উদ্ভূত। জীব ও উদ্ভিদ উভয়ই ক্রমপরিবর্তন নীতির অধীন। প্রকৃতির অন্তর্গত সকলই ক্রমবিকাশ-নীতি মান্য করিয়া চলিতেছে। হেগেল ইহা স্বীকার করিয়া চৈতন্যশক্তিকে সকল পরিবর্তনের আশ্রয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি ভূত-মাত্রেরই ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচের অবলম্বন-রূপে উহার সত্তার অবিচ্ছিন্নত্বও (continuity) স্বীকার করেন। হেগেল বিবর্তনবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলেন, "Nature makes no sudden jump"—প্রকৃতি সহসা লম্ফ প্রদান করে না। তাঁহার মতে প্রকৃতির অন্তর্গত সকল জীব ও পদার্থের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচাদি পরিবর্তন উহাদের সত্তার অবিচ্ছিন্নত্ব-নীতি মান্য করিয়া চলিতেছে।

হেগেল পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের নিম্নলিখিত তিনটি নীতিও স্বীকার করিয়াছেন: (১) অভিন্নত্ব বা একত্ব নীতি (law of identity), (২) বৈপরীত্য নীতি (law of contradiction) এবং (৩) মধ্যপন্থাবর্জিত নীতি (law of excluded middle)। প্রথম মতে—রাম = রাম, দ্বিতীয় মতে—রাম অ-রাম হইতে পারে না এবং তৃতীয় মতে—এই দুইটির মধ্যে অন্য কোন সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ হয় রাম রাম, নয় তো রাম রামই নয়। সংক্ষেপতঃ ইহাই চৈতন্য-শক্তিবাদী হেগেলের আধ্যাত্মিক ভাবমূলক 'ডায়ালেকটিক্' নীতি। তাঁহার মতে জড়দেহ আত্মার অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র।

সাম্যবাদী মার্ক্সের নিছক জড়বাদমূলক

'ডায়ালেক্‌টিক্‌' নীতি হেগেলের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তৎপ্রণীত 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থে তিনি ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। তাঁহার মতে "Matter is not created by Spirit but Spirit itself is merely the highest product of matter"—পদার্থ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট নহে, পরন্তু শক্তি স্বয়ং পদার্থের সর্বোচ্চ সৃষ্টি। তিনি বলেন, "All that exists, all that lives on land and in water, exists, lives only by some movement."—যাহা কিছু বিদ্যমান, স্থলে ও জলে যাহা কিছু আছে, সকলই কেবল কোন গতি দ্বারা বাঁচিয়া আছে। এইরূপে মার্ক্স্‌ জড় পদার্থের গতি ও পরিণতিকে (movement of matter) সকল জীব ও পদার্থের সকল প্রকার পরিবর্তনের মূল কারণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে চৈতন্য-শক্তি ও মন জড়পদার্থের সমবেত গতির ফলে সৃষ্ট। মানবমস্তিষ্কের ক্রিয়ারূপ ভাব স্বাধীন নহে, ইহা জড়পদার্থের গতি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত।

মার্ক্স্‌ বলেন, পদার্থমাত্রেরই গতির ফলে উহার ভিতরে ও বাহিরে অবিরাম যে সংঘর্ষ চলিতেছে তাহাই সকল পরিবর্তনের মূল। তাঁহার মতে প্রকৃতিতে যে সাম্য দেখা যায় ইহা প্রবাহ-আকারে সাম্য (equilibrium in flux); ইহা সাম্যের মত দেখাইলেও প্রকৃত সাম্য নহে। তিনি লিখিয়াছেন, পদার্থের পরিবর্তন বা রূপান্তর কেবল এক গুণ হইতে অপর গুণের পরিবর্তন নয়, অধিকন্তু পরিমাণ-গত (quantitative) হইতে গুণগত (qualitative) পরিবর্তন এবং তদ্বিপর্যয়ে গুণগত হইতে পরিমাণগত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আকস্মিক ভাবে সংসাধিত হইতেছে। পদার্থের নিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্নত্বও (continuity) সর্বদা ভঙ্গ হইতেছে; ইহা এক মুহূর্তে যাহা পর মুহূর্তে তাহা থাকে না। মার্ক্সের শিষ্য এঙ্গেল্‌স্‌ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'ক্রমপরিবর্তন' শব্দটি একটি অনাবশ্যক পুনরুক্তি (tautology) মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এক শক্তি সতত অকস্মাৎ সম্পূর্ণ পৃথক অন্য আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে।

মার্ক্স্‌ পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রোক্ত অভিন্নত্ব বা একত্ব এবং বৈপরীত্য উভয় নীতিই একেবারে অস্বীকার করেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে রাম রামই নয়—রাম অ-রাম। তিনি লিখিয়াছেন, কোন বিশেষ গতির জন্য পদার্থ সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত উহার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও সাধারণ দৃষ্টিতে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া রামকে রামই বলা হয় বটে, কিন্তু যথার্থ দৃষ্টিতে যে রাম নিয়ত আকস্মিক পরিবর্তিত হইতেছে, সে রামকে কোন সময়ই পূর্বদৃষ্ট রাম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, যে মুহূর্তে যে রাম বিদ্যমান বলিয়া মনে করা হয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল সলিল-প্রবাহের ন্যায় সেই মুহূর্তেই সেই রাম থাকিতে পারে না। গ্রীক্‌ দার্শনিক হেরাক্লিটাস্‌ বলিয়াছেন যে, স্রোত-স্বিনীর জল সতত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া উহাতে একবারও স্নান করা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মার্ক্স্‌ লিখিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়গুলির নিছক ভ্রমের জন্যই মানুষ রামকে রাম বলে, প্রকৃতপক্ষে সতত আকস্মিক পরিবর্তন-শীল রামকে রাম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সংক্ষেপতঃ ইহাই মার্ক্সের জড়বাদমূলক 'ডায়ালেক্‌টিক্‌' নীতি।

এই নীতিকে যুক্তি-বিচারসম্মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ চৈতন্যশক্তি জড়ের ক্রিয়া হইলে কোন প্রাণীর জ্ঞান ইচ্ছা বুদ্ধি স্মৃতি বিচার নিদ্রা জাগরণ গমনাগমন প্রভৃতি

সম্ভব হইতে পারে না। কেন না, কোন জড় পদার্থের ক্রিয়ায় এ সকলের অভিব্যক্তি দেখা যায় না। জড় পরমাণুসমূহের সমবায় বা গতি হইতে জীবনীশক্তির উৎপত্তিও প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বিরুদ্ধ। বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জড় আর জড় নাই, উহার উপাদান পরমাণু শক্তিতে পর্যবসিত। পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) কৃপায় জড়-জগৎ শক্তির তরঙ্গে পরিণত। এই মতে আবদ্ধ শক্তিতরঙ্গের (bottled up waves) নাম পদার্থ এবং অনাবদ্ধ বা মুক্ত শক্তিতরঙ্গের (unbottled waves) নাম কিরণ (radiation)। এইরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়ায় পরমাণুর জড়ত্ব একেবারে নষ্ট হইয়াছে। মার্ক্সের পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণ জড়-পদার্থ চৈতন্যশক্তির সৃষ্ট বলিয়া সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে মার্ক্সের অভিমত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

মার্ক্স যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ নীতি অস্বীকার করিয়া আকস্মিক পরিবর্তন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও যুক্তি-সম্মত নহে। ডারউইন ক্রমবিকাশ স্বীকার করিয়াও ক্রমসংকোচ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) সৃষ্টির কারণ। কিন্তু তিনিও এই নির্বাচনকে আকস্মিক বলেন নাই। মার্ক্সের মতানুসারে ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ অস্বীকার করিলে জগৎসৃষ্টির যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল জীব ও পদার্থ সূক্ষ্ম হইতে ক্রমবিকাশ-নীতি মূলে স্থূলাৎ স্থূলতর রূপে পরিণত হইয়া ক্রমসংকোচ-নীতিমূলে পুনরায় সূক্ষ্মাকার বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বেদান্তদর্শন বলেন, "নাশঃ কারণলয়ঃ"—বস্তুর নাশ উহার কারণে বিলয় বা চরম সংকোচিত অবস্থা মাত্র। কারণ ভিন্ন কোন কার্য হইতে পারে না। এই কার্য-কারণবাদ স্বীকার না করিলে অসৎ (কিছু না) হইতে সতের (কোন কিছুর) উদ্ভব স্বীকার করা অপরিহার্য, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণ-বিরুদ্ধ। অভাব-পদার্থ হইতে ভাব-পদার্থের উদ্ভব হইতে পারে না। বৃক্ষ বীজের এবং বৃদ্ধ শিশুর কার্য-কারণ সম্বন্ধাশ্রিত ক্রমপরিণতি, কোনটিই আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন নহে। মার্ক্স্ স্রোতস্বিনীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া পূর্বক্ষণের জলকে পরক্ষণের জল হইতে একেবারে কার্য-কারণ-সম্বন্ধশূন্য বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক প্রবাহই অন্য প্রবাহ জন্মায়। প্রবাহের বিচ্ছেদ হইলে প্রবাহ থাকিতে পারে না। সমগ্র বিশ্বে প্রবাহাকারে নিত্য জন্ম-বিনাশের স্রোত বহিতেছে। ইহার মূলে এক শাশ্বত অবিচ্ছিন্ন উৎস বিদ্যমান। এই অবিচ্ছিন্ন উৎস ভিন্ন অবিচ্ছিন্ন স্রোত সম্ভব নয়। সুতরাং মার্ক্স্ যে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের বৈপরীত্য নীতির বিপক্ষ গ্রহণ করিয়া এই স্রোতকে আকস্মিক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে সকলই কার্য-কারণ-সম্বন্ধহীন আকস্মিক হইলে ইহার অনুভবকারী অর্থাৎ মার্ক্স্ স্বয়ংও আকস্মিক হইয়া পড়েন। যিনি পূর্বে ছিলেন, তিনি যদি পরক্ষণে না থাকেন, তাহা হইলে কি প্রকারে তিনি বলেন—'আমি পূর্বে ইহা দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি'? পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ এক অবিচ্ছিন্ন দ্রষ্টা বা স্মরণকারীর পক্ষেই সম্ভব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন 'আমি'-রূপে সকল জীবই আপনাকে অনুভব করে। মার্ক্সও নিশ্চয়ই সমগ্র জীবন আপনাকে এক অবিচ্ছিন্ন 'আমি' রূপেই অনুভব করিতেন। তৎপ্রচারিত ক্ষণভঙ্গবাদ বা ক্ষণিকবাদ সত্য হইলে তাঁহার পক্ষে এক অবিচ্ছিন্ন 'আমি'র অনুভব সম্ভব হইত না। জীবের বিষয়ানুভূতিও

একটি অবিচ্ছিন্ন অপরিণামী সত্তার আশ্রয়সাপেক্ষ। কারণ, শরীর নামক নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়স্রোত এবং মন নামক নিয়ত পরিণামশীল চিন্তা-প্রবাহ এক অবিচ্ছিন্ন অপরিণামী সত্তার আশ্রয় ভিন্ন সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে না। বেদান্তমতে ব্যষ্টি মন দ্বারা বাহিত হইয়া যে অপরিণামী সত্তার আশ্রয়ে বিভিন্ন বিষয়ানুভূতি শ্রেণীবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়—তিনিই জীব-চৈতন্য বা জীবাত্মা। এই ভাবে সমষ্টি মনের পশ্চাতে যিনি অধিষ্ঠিত তিনিই পরমাত্মা বা ঈশ্বর। আকস্মিক বা ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে এইরূপে আরও বহু যুক্তি দেখান যাইতে পারে। মার্ক্স্ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, হেগেলের 'ডায়ালেকটিক্' ইহার মাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু উভয়ের তুলনামূলক এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীত যে, হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টিক্' নীতিই যুক্তিযুক্ত এবং ইহা পায়ের উপরই দাঁড়াইয়া আছে, পক্ষান্তরে মার্ক্সের বহুবিজ্ঞাপিত 'ডায়ালেক্‌টিক্' নীতি একেবারেই যুক্তি-বিচারসহ নহে; কাজেই বলা যায় যে, ইহাই ইহার নিজের মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছে!

মৃত্যুর উদ্দেশে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

তুমি মৃত্যু অনিবার্য্য পরিণাম মানবসত্তার
দীর্ঘ বাহু প্রসারিয়া দৃঢ়মুষ্টি ধরি আছ কেশ,
দেহমাঝে তব দূত মাঝে মাঝে ছাড়িছে হুঙ্কার,
করিছ সম্মুখে নিত্য সহস্রের ভবলীলা শেষ।

অবাক হইয়া ভাবি এর চেয়ে কি আছে শাসন?
চলিতেছে তবু নিত্য ছলে বলে কৌশলে সঞ্চয়,
চলিতেছে হিংসা লোভ প্রবঞ্চনা দম্ভ আস্ফালন,
কে না জানে বুদ্বুদ সে, পরক্ষণে পাইবে বিলয়।

কালি যে মরিবে সেও আজ দেখি দিব্য নিরুদ্বেগে,
শতেরে মরণ হানি' হইতে চাহিছে লাভবান্,
আজি যে মরিছে, কা'ল মহোৎসাহে সারা রাত্রি জেগে
করিল সে বহুবর্ষ-ব্যাপী পরিকল্পনা নির্ম্মাণ।

কে আছে তোমার চেয়ে গুরু, শাস্তা, আচার্য্য, শাসক,
তুমিও পারনি জরা-শলাকায় খুলিতে নয়ন,
কি করিবে শত মোহমুদ্গর বা বৈরাগ্যশতক?
কি করিবে কৃষ্ণ বুদ্ধ শ্রীচৈতন্য খৃষ্টের বচন?

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা

(১৯৪৮ ডিসেম্বর-সংখ্যা 'বেদান্ত কেশরী'র ইংরেজী নিবন্ধ হ'তে)

অনুবাদক—শ্রীনীরদ কুমার রায়

সকলেই হাসতে লাগ্‌ল। তা, হাস্‌বে না-ই বা কেন? দৃশ্যটি যে বড় মজার! সাত বছরের ছোট্ট মেয়েটি। তার বর গদাধর শ্বশুরবাড়ী এসেছে এই দ্বিতীয় বার। কি ভাবে স্বামীর সেবা করতে হয়, অত ছোট মেয়েকে কেউ সে উপদেশ দেয়নি। তবু সে এল—বোধ হয় নিজের চেয়েও ভারী একটা ঘটে করে জল নিয়ে; এসে সেই ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে সে তার তরুণ স্বামীর পা ধুইয়ে দিল, তার পরেই তাকে পাখার বাতাস করতে লাগল,—পাখাটা বোধ হয় ছিল গোলাপী ঝালর দেওয়া—বাসন্তী মেলায় কেনা। মেয়েটির এই অভিনব কাণ্ড দেখে বোধ হয় তার আদরের মেনী বেড়ালটা কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত চেয়ে ছিল!

দেখতে সাধারণ হলেও, মনে হত এ মেয়ে ত যে সে মেয়ে নয়! তার পিতা তাকে একটা সম্ভ্রমের চোখেই দেখতেন—তাঁর ধারণা হয়েছিল, সত্যাই জগদম্বা এই মেয়ের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে লীলা করতে এসেছেন। ঐ অঞ্চলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। অনাহারক্লিষ্ট নরনারী দলে দলে তাঁর বাড়ীতে আস্‌ত। বাড়ীতে পূর্ব পূর্ব বৎসরের জমানো চাল ছিল। মেয়ের পিতা রামচন্দ্র হাঁড়ি হাঁড়ি চাল ও কাল কলাইয়ের দালের খিচুড়ী রাঁধিয়ে রেখে দিতেন। তাঁর আদেশ ছিল, সেই খিচুড়ী যত লোক আসবে তাদের দেওয়া হবে এবং বাড়ীর লোক সকলেই খাবে। কেবল ঐ মেয়ে সারদার জন্যে ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা। ঐ মোটা চাল দালের খিচুড়ী তিনি তাঁর সারদাকে খেতে দিতে পারতেন না। সারদার মা শ্যামাসুন্দরী সময়ে সময়ে মেয়ের মুখের পানে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকতেন; কখনও বা জিজ্ঞাসা করতেন, 'কে মা তুই? আমার কে হ'স্‌? তোকে চিনতে পেরেছি কি?' তারপর বলতেন, 'ঈশ্বর করুন, পরজন্মেও যেন তুই আমার মেয়ে হয়ে আসিস্‌।' 'আবার আমাকে টানাটানি কেন?', মেয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌ত। তবু মা বলতেন, 'তোকেই যেন আবার পাই।' মেয়ে তখন মাত্র পাঁচ বছরের।

এ সব কি শুধু কন্যার প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ? কন্যা যে বড় ভাল, ও খুব কাজের। অনেক সময় একগলা জলে নেমে গরুর জন্যে দল-ঘাস কেটে আন্‌ত; ক্ষেতে যারা কাজ করত তাদের জন্যে মুড়ী নিয়ে যেত; পঙ্গপালে ধান কেটে ফেললে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে ধান কুড়িয়ে আন্‌ত। এমন কাজের মেয়ের ওপর কোন্‌ বাপ-মায়ের গাঢ় অনুরাগ না হয়? এই স্নেহ-অনুরাগ স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু ঐযে সম্ভ্রম—একটা সমীহের ভাব, ওটা এল কোথা থেকে?

এ যেমন ঠিক বোঝা যায় না, এর পরে যে ব্যাপারটি ঘট্‌ল, তারও রহস্যটুকুর ঠিক উদ্ভেদ করা যায় না। সারদার বিবাহের মধ্যে যে অভি-নবত্ব ছিল, সেটা মেয়ের কম বয়সের দরুন নয়; কম বয়সে বিবাহ তখনকার সাধারণ ঘটনা ছিল। যে ভাবে এই মেয়েকে বিবাহের পাত্রী নির্বাচিত করা হ'ল, তারই মধ্যে ছিল অভিনবত্ব। কামার-পুকুরের গদাধরকে তখন সকলেই জান্‌ত অপ্র-

কৃতিস্থ বলে। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দিব্যোন্মাদকে লোকে একটা ব্যাধি বলে ধরে নিয়েছিল, এবং তাঁর বিবাহ দেওয়াটা তারই প্রতিকার বা ওষুধের বিধান বলে ধরা হয়েছিল। গদাধরের বিধবা মাতা চন্দ্রমণি দেবী ও বড় ভাই রামেশ্বর উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে করতে হয়রান হয়ে গেলেন ;—শুধু ত কন্যা হলেই হবে না, শ্রেণী বংশ গোত্র বর্ণ রাশি গণ ও আরও কত কি দেখে নিতে হবে। এঁরা গদাধরকে না জানিয়েই এই সব অভিযান চালাচ্ছিলেন। অনেক জায়গায় বিফল হয়ে তাঁরা যখন বিষন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন গদাধর এক দিন ভাবাবেশে তাঁদের বললেন, 'অন্য জায়গায় খোঁজ ক'রে কিছু হবে না, জয়রামবাটী গাঁয়ে রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়ীতে বিয়ের কনে কুটো-বাঁধা হ'য়ে রাখা আছে।' সেখানে তখন অনুসন্ধান করা হ'লো ; সেখানেই ঠিকঠাক হ'তে আর কোনও দিকে আপত্তি রইল না।

এর বছর তিনেক পূর্বে একটি মজার ঘটনা হয়েছিল। গদাধরের ভাগনে হৃদয়ের বাড়ীতে একটি ভজনের আসরে অনেক নরনারী সমবেত হয়েছিলেন। গদাধরও ছিলেন। ভজন শেষ হয়ে যাবার পর হাসি-তামাসা হতে লাগ্‌ল। একজন মহিলা তাঁর কোলে অবস্থিত শিশু কন্যা-টিকে প্রশ্ন করলেন, 'বলত ঠাকুমণি, এখানে ঐ যারা ব'সে রয়েছে ওর মধ্যে কা'কে তোমার পছন্দ হয় বর বলে?' এর উত্তরে শিশু দুখানি হাত বাড়িয়ে গদাধরকে দেখিয়ে দিল। ঐ শিশু সারদার বয়স তখন সবে দুই বৎসর।

বিবাহের পর সারদা যখন প্রথম স্বামীর ঘরে এল তখন খেজুরগাছে খেজুর পেকেছে। সেই পাঁচ বছরের বিয়ের কনে মহা আনন্দে গ্রামের আরও সব ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেজুর কুড়োতে লাগ্‌ল। তার মনে তখন খুব স্ফূর্তি, বুঝি বা একটু গর্বও ছিল। গর্বটা ছিল গয়নার,—তার শাশুড়ী তার সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব ধার করা গয়না, ধনী প্রতিবেশী লাহা বাবুদের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা হয়েছিল। পর দিন গয়নাগুলো ফেরত দিতে হবে ; কেমন করে ঐ সাধের কচি বৌটির গা থেকে গয়না খুলে নেবেন, এই ভেবে শাশুড়ীর চোখে জল এল। গদাধর তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, এবং রাত্রে নিদ্রিতা বধূর গা থেকে কৌশলে গয়নাগুলি খুলে নিলেন। পর দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, গায়ে গয়না নেই দেখে বধূ ত কান্না জুড়ে দিল। সারদার কাকা এই গয়নার ব্যাপার জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী চ'লে গেলেন। গদাধর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না মা ; এখন ওরা যা'ই করুক বা বলুক, বিয়ে ত' আর ফিরবে না।'

দিব্যোন্মাদের একটা তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের ফলে গদাধরের দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে আগমন ও তাঁর বিবাহ-ঘটনা। তাঁর জীবনের আর একটা প্রবলতর তরঙ্গের আকর্ষণে শ্রীসারদামণি জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে নীত হলেন। দু'টি চিত্ত, দুজনের অন্তরাত্মা হ'ল মুখোমুখী। তখনও পরস্পরের ঠিক পরিচয় হয় নি ; এক জন ঈশ্বরের জন্যে উন্মাদ, আর একজন পতি দেবতার জন্যে উদ্বেগে অধীরা। পরস্পরের চোখে চোখে চেয়ে উভয়ে কী দেখলেন, কী চাইলেন?

সেই সুদূর গ্রামে থাকতে থাকতে সারদা-দেবী তাঁর স্বামীর মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা, অনেক ছাঁদের গল্প শুন্‌তে পেলেন। মনে তিনি বড়ই ক্লেশ পেতে লাগলেন ; কাউকে কিছু বলাও যায় না এ সম্বন্ধে। তাঁর স্বামী যে লোকের সমালোচনার বিষয় হবেন, এটা তাঁর সহ্য হয় না। ঐ যে মেয়েরা কুয়োর

ধারে বলাবলি করছিল—তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন—ও কথা তাঁর বিশ্বাস হয় না। তিনি ভাবলেন, 'অমন মানুষ কি পাগল হতে পারে? দেখেছি ত, কী চমৎকার মানুষ—অমন সোৎসুক যত্ন, অমন সুসঙ্গত ব্যবহার, অমন উচ্চ মধুর হৃদয়। অমন মানুষ পাগল হয়েছে?—এ নির্বোধের কথা! তবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা দুর্জ্ঞেয়। যদি তাই হয়, তবে আমি কি করতে আছি? আমার এখন কর্তব্য কি?' এই রকম চিন্তায়, অশান্তিতে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাতে কাটাতে শেষে তিনি সাহস সঞ্চয় ক'রে এক বড় রকম সংকল্প—একটা চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আঠারো বছরের সেই তরুণী—বেশী দূর হাঁটা যাঁর অভ্যাস ছিল না—মনে মনে স্থির করলেন, জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বর সেই আশী মাইল রাস্তা—সবল সক্ষম লোকের পক্ষে তিন দিনের কষ্টসাধ্য পথ—তীর্থযাত্রীর মত তিনি হেঁটে অতিক্রম ক'রে তাঁর পাগল স্বামীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তিনি জানতেন রাস্তা নিরাপদ নয়, ডাকাতের উপদ্রবও আছে। কিন্তু তাতে তিনি কিছুমাত্র ভয় পেলেন না। পথে যেতে যেতে শ্রান্তিতে তাঁর জ্বর এল। জ্বরের মধ্যে তিনি এক অদ্ভুত দর্শন পেলেন;—অপরূপ সুশ্রী একটি কালো মেয়ে এসে তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল এবং বল্ল, সে তাঁর বোন, দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছে। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে যখন তিনি কালীবাড়ীর বাগানে প্রবেশ করলেন তাঁর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে, তখন তাঁর বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে নি কি? কি আছে কপালে, কে জানে? অন্যান্য সঙ্গী সঙ্গিনীদের সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ীঠাকুরাণীর ঘরের দিকে প্রথমে গেলেই হয়ত শোভন হ'ত, কিন্তু তিনি তা পারলেন না; তাঁর উদ্বেগের মাত্রা তখন চরমে উঠেছে। তিনি সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দিকে গেলেন। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। অসময়ে এলেন কি? হঠাৎ এই রাত্রে এই অপ্রত্যাশিত মূর্তি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ত ছোট খাটটি থেকে নেমে এসে বিস্মিত হ'য়ে দাঁড়ালেন, আগন্তুককে চিন্‌তে তাঁর সময় লাগ্‌ল না—যদিও এই চার বছরের অদর্শনের মধ্যে সারদাদেবীর শরীরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সহধর্মিণী গৃহিণীর উপযুক্ত পুরোপুরি আদর ও সম্মানের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গ্রহণ করলেন। মেজেয় একটি মাদুর পেতে দিয়ে তাঁকে বসতে বলেই দেখলেন, এঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে তিনি তখনই ডাক্তার ডাকালেন এবং পীড়িতার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। একটু দুঃখ ক'রে বললেন, 'তুমি এত দিনে এলে; আর কি আমার সেজ বাবু (মথুরবাবু) আছেন যে তোমার যত্ন হবে?'

সারদাদেবীর অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়ে গেল। তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, তাঁর হৃদয়ের মাধুর্য তেমনিই আছে। আর কী চাই তাঁর?

এই মিলনের মধ্যে যেমন ছিল প্রগাঢ় মাধুর্য, তেমনি এর আর একটি দিক ছিল। এ যেন ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে চলা—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'; কিন্তু সেই 'দুর্গম পথ'টি এঁরা কী সহজ ভাবেই অতিক্রম ক'রে গেলেন! এক দিন অতি নিভৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বললেন, 'দেখ, তোমার অন্তরের কথা কি, আমায় খুলে বল; তুমি কি আমায় সংসারের পথে টেনে নামাতে এসেছ?' তৎক্ষণাৎ এর যে উত্তর সারদাদেবী দিলেন, তা

নারীর ইতিহাসে অপূর্ব ; তিনি বললেন, 'না, আমি তোমায় সংসারের পথে টেনে নামাতে চাইব কেন? আমি এখানে এসেছি তোমার সেবা করতে, তুমি যে-পথ বেছে নিয়েছ সেই পথে তোমার সহায় হ'তে।' এই ত সারদা-দেবীর প্রকৃত স্বরূপ—চকিতের মত চোখের সামনে দেখা দিল। এ একটা প্রোজ্জ্বল আলোক। এ ধার করা আলোক নয়। এ আসল আলোক। বাইবেলে কথিত আদি নারী ঈভের সেই প্রাক্তন পাপের ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্ত যেন এই ভাবে এত যুগ পরে করলেন তাঁরই মত এক জন নারী। এই পরম ত্যাগের অবদানের দ্বারা যে মর্যাদা সারদাদেবী অর্পণ করলেন সমগ্র নারীজাতির ওপর, সেই উচ্চ মর্যাদা আজ অনুভব ও গ্রহণ করার মধ্যেই জগতের নারীকুলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটা শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর জীবনেরই একটা বড় ঘটনা নয়। ঠিক ঠিক বুঝে দেখলে, সারা জগতের মানবের মনুষ্যত্বের ইতিহাসের এ একটা শ্রেষ্ঠ ঘটনা। বলতে গেলে, এ যেন কোটী কোটী মানবের মুক্তির দ্বার খুলে দিল। সারদাদেবী যদি স্বামীর কাছ থেকে সংসার-ধর্মের সব রকম অধিকার দাবী করতেন, তা'হলে কোন রকম নৈতিক শাসনই তাতে বাধা দিতে পারত না। কিন্তু সারদাদেবী কত সহজেই অল্প কয়েকটি সন্তানের জননী হবার নির্বন্ধ অতিক্রম ক'রে হ'লেন সকলের মা। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও পত্নীর এই ঋণ স্বীকার ক'রে বলেছিলেন, 'ও যদি অমন শুদ্ধ না হ'ত তাহ'লে কে জানে আমার দেহবুদ্ধি আসত কি না?' আট মাস ধরে উভয়ে একই শয্যা ব্যবহার করেছিলেন, এবং সেই সময়ের মধ্যে উভয়ে উভয়ের স্বরূপ জানতে পেরেছিলেন—দেখেছিলেন পরস্পরের অখণ্ড পবিত্রতা ও দেবভাব। এক দিন স্বামীর পদসেবা করতে করতে সারদাদেবী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?' এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে রয়েছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যিই, সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপে তোমায় সর্বদা দেখি।' এই রূপে দীর্ঘ পরীক্ষায় উভয়ে উত্তীর্ণ হবার পরে, শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এক অভিলাষের উদয় হ'ল, এবং জগদম্বার ইচ্ছায় তিনি তা কাজে পরিণত করলেন। ষোড়শী পূজার অনুষ্ঠান ক'রে তিনি জগদম্বাজ্ঞানে সারদাদেবীকে পূজা করেছিলেন। জগৎ প্রমাণ পেল শ্রীরামকৃষ্ণ কি চোখে সারদা-দেবীকে দেখেন। এই ষোড়শী পূজায় শ্রীরাম-কৃষ্ণ সারদাদেবীকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তান্ত্রিকমতে পূজা করেছিলেন। পূজায় দেবীকে এই বলে আবাহন করা হয়েছিল, 'হে বালে! হে সর্ব-শক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি! সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, এর (শ্রীশ্রীমার) শরীর মনকে পবিত্র ক'রে এতে আবির্ভূতা হ'য়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।' পূজাশেষে পূজক আপনার সঙ্গে নিজ সাধনার ফল জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব দেবীর চরণে অর্পণ ক'রে প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, 'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, সর্বকর্মসাধিকে, শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি, গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি।'

পূজক ও পূজিতা উভয়েই দিব্যভাবে আবিষ্ট!

এই অপূর্ব পূজার মধ্যে উভয়েরই জীবনের গভীর তাৎপর্য ছিল। স্বয়ং শক্তিময়ী না হ'লে সারদাদেবী কি এই দেব-মানবের তপস্যা ও সাধনার ফল ধারণ করতে সক্ষম হতেন? বাইরে তাঁর যে সহজাত নম্রতা ও লজ্জাশীলতার আবরণ ছিল, সেই আবরণ তাঁকে এমন ক'রে ঢেকে

রাখ্‌ত যে তাঁর এই শক্তি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হ'ত না। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের অনেক দিন পরে তাঁর এই শক্তি অল্পে অল্পে প্রকাশ পেয়েছিল যখন তিনি তাঁর স্বামীর জীবনের কাজকে ক্রমে ক্রমে পাকা ক'রে তুলেছিলেন এবং পথের নির্দেশ দিয়ে কত বিভ্রান্ত আত্মাকে মুক্তির পথে চালিত করেছিলেন।

কিন্তু এই ভাবে পূজা পেয়েও তাঁর চাল কিছুমাত্র বদলায় নি; তিনি তখনও স্বামীর সেই লজ্জাশীলা সরলা পত্নী, জীবন-পথের আলোকের জন্যে সর্বদাই স্বামীর মুখ চেয়ে থাকেন এবং প্রাণ ঢেলে নিখুঁত ভাবে স্বামীর সেবা করেন। 'ঠাকুরের' সেবাই তাঁর জীবনের একমাত্র সাধ। সেই সব দিনে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় উপদেশ শুনতে দলে দলে লোকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে এসে ভিড় জমা'ত, আর তিনি মানুষের মুক্তির জন্যে বেদনাব্যাকুল হ'য়ে সময় ও স্বাস্থ্যের কথা ভুলে যেতেন, তখন ঐ নহবতের বন্দিনী সারদাদেবীর বুদ্ধি বিবেচনা ও নিষ্ঠার সহিত সেই সেবা-যত্ন না পেলে তাঁর সেই ভঙ্গুর দেহ কয়দিন টিক্‌ত? ওদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও সর্বদাই সারদাদেবীকে এক মহা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন; কখনও তাঁকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে উৎসুক, কখনও বা শিশুর মত তাঁর ওপর নির্ভরের ভাব; কিন্তু সকল সময়ে পত্নীর সহজাত দেবভাব সম্বন্ধে সচেতন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে এমন সব কথা লোকসমক্ষে ব্যক্ত করতেন যাতে লোকে তাঁকে ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে উপকৃত হ'তে পারে। এক বার তিনি গোলাপ-মাকে বলেছিলেন, 'ওর সরস্বতীর অংশে জন্ম; নিজের আসল রূপ লুকিয়েছে পাছে লোকে অপবিত্র চোখে দেখে পাপে লিপ্ত হয়।' এক দিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, কী চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে দেখতেন। এক দিন সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিছানায় চোখ বুজে শুয়েছিলেন, সেই সময়ে শ্রীশ্রীমা তাঁর খাবার নিয়ে সেই ঘরে ঢুকলেন। চোখ না খুলেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস্।' শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, এই যে আমি দরজা বন্ধ করছি।' তাঁর গলার স্বর শোনামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ শশব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসলেন, বললেন, 'ও, তুমি? আমি মনে করেছিলাম লক্ষ্মী; তা কিছু মনে কোরো না।' পর দিন সকাল বেলা নহবতে গিয়ে অনুতাপের স্বরে শ্রীশ্রীমাকে বললেন, 'দেখ কালকে রাত্রে তোমায় ও রকম তুই মুই ক'রে কথা ব'লে ফেলা'তে আমার ঘুমই হ'ল না।'

শ্রীশ্রীমার দৈহিক কামনা-জয়ের গৌরব পূর্বেই কীর্তিত হয়েছে। তাঁর কাঞ্চন-ত্যাগও তেমনি ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তার সাক্ষী। তিনি বলেছিলেন, "মাড়ওয়ারী ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ যখন আমায় দশ হাজার টাকা দিতে চাইল, তখন মাথায় যেন করাত-চালানোর মত একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। মাকে বললুম 'মা, এত দিন পরে তুই আমায় লোভ দেখাতে এলি?' ওর (শ্রীশ্রীমার) মনের ভাব বোঝবার জন্যে আমি ওকে বললুম, 'দেখ, এ আমায় এই টাকা দিতে চাইচে। আমি নিতে অস্বীকার করেছি, ও এখন তোমায় দিতে চায়; তোমার ইচ্ছে হ'লে নিতে পার।' ও তখুনি বললে, 'সে হয় না, আমার নেওয়াতে তোমারই নেওয়া হবে। তোমার জন্যই ও টাকা খরচ করা হবে; আসলে ও তোমারই নেওয়া হবে। তোমার ত্যাগের জন্যেই লোকে তোমায় শ্রদ্ধা করে; কাজেই ও টাকা আমরা কিছুতেই নিতে পারি না।' ওর এই কথা শুনে আমি স্বস্তি পেলুম।"

এই ত্যাগের শিখা সকল সময়ে সমভাবে

শ্রীশ্রীমার মধ্যে প্রদীপ্ত ছিল। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। ত্যাগ-সম্বন্ধে তাঁর ঝোঁক ছিল তাঁর স্বামীরই মত। রাণী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্য শ্রীশ্রীমার খরচের জন্যে সাত টাকা ক'রে দিত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ত্রৈলোক্যের জমিদারী শেরেস্তার আমলারা দল পাকিয়ে সে টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়। সে টাকা দেওয়ার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন বৃন্দাবনে; কারও চিঠিতে তিনি এই কথা জেনে বলেছিলেন, 'বন্ধ করুক গে' টাকা; অমন ঠাকুরই চ'লে গেলেন, টাকা নিয়ে আমার আর কি হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে এমন এক সময় এসেছিল যখন শ্রীশ্রীমার অর্থাভাব এমন চরমে উঠেছিল যে বর্ধমান থেকে কামারপুকুর পর্যন্ত অতটা রাস্তা হেঁটেই যেতে হয়েছিল, গরুর গাড়ী ভাড়া করবার মতও অর্থ ছিল না। সেই সময়ে কামারপুকুরে এমন দিন গিয়েছে যে শ্রীশ্রীমার ভাতে লবণটুকুও জোটে নি, শুধু ভাত খেতে হয়েছে তাঁকে। একথা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা অনেক দিন পরে জেনেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও শ্রীশ্রীমা কারও সাহায্য চান নি। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী; ঠাকুর যে শিখিয়েছিলেন, কখনও কারও কাছে হাত পেত না।—এমনিই ধাতুতে গড়া ছিলেন শ্রীশ্রীমা।

অন্যের চরিত্রের দোষগুলোকে সমবেদনার চোখে দেখাই ছিল শ্রীশ্রীমার স্বভাবের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যের খুঁত দেখতে না পাওয়াটাই তিনি রীতিমত অভ্যাস করতে করতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যেখানে শুধু ভালটা দেখারই দিব্য কৌশল তাঁর আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল। জগতে কেউ তাঁর পর নয়, সকলেই আপনার জন। এইটিই ছিল তাঁর স্নেহ-পারাবারের—সকলের প্রতি সমবেদনার—উৎসমুখ। পরিণত বয়সে তিনি হয়েছিলেন সকলের ধ্রুব আশ্রয়। তিনি বলতেন, 'আমি সকলের মা; আমি ভালদেরও মা, মন্দদেরও মা।' তাঁর এই কথার মধ্যে ছিল অখণ্ড সত্যের তেজ ও দৃঢ়তা। কারও চরিত্রের কোন গুরুতর ত্রুটি কেউ দেখিয়ে দিলে তিনি শান্তমধুর স্বরে বলতেন, 'আমার ছেলেরা যদি ধুলোকাদা মাখে, আমি মা, সেই সব ধুলোকাদা ধুয়ে মুছে দিয়ে আমায় তাদের কোলে নিতে হবে।'

সকল জীবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। দুটো কাক দৈনিক তাঁর ঘরের কাছে এসে ব'সে কা-কা ক'রে তাঁর দুপুরের বিশ্রাম ভঙ্গ করত। এক দিন তারা না আসাতে তিনি আপন মনে কোমল স্বরে বললেন, 'আহা, বাছারা আজ এল না কেন?'

কিন্তু তাঁর জীবনের, তাঁর অস্তিত্বের আসল আধার ছিল তাঁর স্বামি-প্রেম—তাঁর সেই প্রেমের ঠাকুর—তাঁর গুরু—তাঁর দেবতা-স্বামীর প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসাই শক্তিধারণ ক'রে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে গ'ড়ে তুলেছিল। স্বভাবতঃ তিনি শান্ত, অল্পভাষী, ধীর ও আত্মসংযত ছিলেন, তাই তাঁর ভালবাসার প্রকাশ অতি বিরল ছিল। তবু যদি কেউ কোন সময়ে অতর্কিতে তাঁর এই তন্ত্রীটি রূঢ়ভাবে স্পর্শ করত, তাহ'লে তিনি অত্যন্ত যাতনা পেতেন, কেন না তাঁর স্বামি-প্রেম, আর তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ভালবাসাই ছিল তাঁর কাছে জগতের সকল কিছুরই ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ঘা হওয়াতে যখন ভক্তেরা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন,—শ্রীশ্রীমা তখনও দক্ষিণেশ্বরে আছেন,—সেই সময় এক দিন তিনি শুনতে

পেলেন, গোলাপ-মা যোগিন-মাকে বলছেন, 'দেখ্ যোগিন্, ঠাকুর নিশ্চয় মায়ের উপর রাগ ক'রে কলকাতায় চ'লে গিয়েছেন।' শুনে শ্রীশ্রীমা চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। তাঁর আর দেরি সইল না। তিনি ছুটে কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে করুণস্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বলত, তুমি কি আমার ওপর রাগ ক'রে চলে এসেছ?' মহা বিস্মিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'না, না! কে তোমায় এমন কথা বলেছে?' 'গোলাপ বলেছে।' 'বটে! এই সব যা' তা' ব'লে সে তোমায় কাঁদিয়েছে! সে জানে না তুমি কে! আচ্ছা, আসুক সে, আমি দেখব।' শ্রীশ্রীমা শান্ত মনে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন। পরে গোলাপ-মা এলে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ধম্‌কে বললেন, 'গোলাপ, এসব কী কথা? কেন তুই এই সব যা' তা' বলে ওকে কাঁদালি? ও কে, তুই কি জানিস্ না? যা, এক্ষুণি গিয়ে তাঁর ক্ষমা চেয়ে নিগে।' গোলাপ-মা যখন ক্ষমা চাইতে এলেন, তখন শ্রীশ্রীমা হেসে তাঁর পিঠ চাপ্‌ড়ে দিলেন।

তাঁর এই স্বামিপ্রেমই ছিল—এক দিকে তাঁর বৈরাগ্য ও কামনা-কাঞ্চনের কঠোর ত্যাগ, এবং অন্য দিকে তাঁর সুবুদ্ধি-পরিচালিত সেবার আকুল আগ্রহ—এই দুইটিরই ভিত্তি। স্বামীর জন্যে প্রাণ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সহজই ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় যখন সকল চিকিৎসা বিফল হ'ল, তখন শ্রীশ্রীমা তারকেশ্বরে গিয়ে শিব-মন্দিরে 'হত্যা' দিলেন। অবশ্য সে 'হত্যা' দেওয়ার ফলে মহাদেব তাঁর বৈরাগ্যই বাড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও দেখলেন, সারদাদেবী সেই মহামিলনের জন্যে—অর্থাৎ বৈধব্যের জন্যে এক রকম প্রস্তুতই আছেন। কথায় কথায় এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সকল কাজের ভার শ্রীশ্রীমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। সোজাসুজি বললেন 'আমিই কি সব করব?' নম্রমধুর ভাবে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'আমি মেয়ে মানুষ, 'আমি কি করতে পারি?' শ্রীরামকৃষ্ণ পরিষ্কার বললেন, 'এ শুধু আমারই বোঝা নয়; তোমারও এতে দায়িত্ব আছে। এই কলকাতার লোকেরা অন্ধকারে পথহারা হয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি তাদের দেখবে। আমি একটুখানি করেছি; তোমায় আরও করতে হবে।'

তবু শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই যখন 'এঘর থেকে ওঘরে' গেলেন, তখন 'এ ঘরটা' যে বড়ই অন্ধকার হয়ে গেল। যেন সব আলো নিবে গিয়েছে। বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মনে হয়। এই রকম ঘোর বিষাদের আঁধারের মধ্যে শ্রীশ্রীমা নির্দেশ পেলেন, আলোক পেলেন, সান্ত্বনা পেলেন: এখানে থাকতে হবে; অনেক কিছু করবার আছে; এই সব পুত্র-রত্নগুলি রয়েছে, আরও অগণ্য কত ছেলে আসবে, 'মা' 'মা' ব'লে পাগল ক'রে দেবে।—ঠাকুরই তাঁকে এই সব কথা বলে গিয়েছেন।

এই চিন্তা করতে করতে তিনি নিজের দায়িত্ব-বিষয়ে সজাগ হলেন এবং নীরবে, অনাড়ম্বরে অথচ দৃঢ় ভাবে তিনি তাঁর কাজ তুলে নিলেন সেইখান থেকে যেখানে ঠাকুর তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে সকল কাজ তিনি চালাতে লাগলেন। তিনি 'হাঁ' না বললে কোন কিছু হবার জো নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানের কাছে ঠাকুরের অন্তর্ধান মানে শ্রীশ্রীমার মধ্যে তাঁর পুনরাবির্ভাব। তিনি যে ঠাকুর ও মা দুই-ই। তিনিই এই মহা সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ঠাকুর ও মা যে অনন্তরূপে এক।—

মনে প'ড়ে গেল সেই অদ্ভুত খেয়ালের কথা: সেই যে, কি এক মজার খেয়ালের ভাবে

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন শ্রীশ্রীমাকে, 'আমাকে আবার আস্‌তে হবে, কাজেই তোমাকেও আস্‌তে হবে।' কিন্তু সে বড় বিচিত্র আসা! শ্রীশ্রীমার হাতে নাকি থাকবে একটা হুঁকো, আর শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে একটা ভাঙ্গা ডিজেল—তাইতে বোধ হয় রান্না করা হবে। এবার এঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ কারা কি-ভাবে আসবে, ভগবান জানেন। ঐ যে যারা গৃহহারা, শহরের বাইরে তালিমারা তাঁবুর-তলায় মাথা গুঁজে রয়েছে, তারাই কি? কে জানে? আর, এই রত্নযুগল চলতেই থাকবেন—চলতেই থাকবেন, তাঁদের পায়ের তলায় পথ আর ফুরোবে না—ঐ যে-পথটা দূরে, বহু দূরে অনন্তের কোলে মিলে গিয়েছে।

যদি কখনও দৈবযোগে কোনও মন-উদাস-করা মৌন সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনও বিজন প্রান্তরের ধূলিময় পথের পরে অনন্তের এই অপরূপ পান্থ-যুগলের সাম্‌নে আমরা এসে পড়ি, তবে হে ভগবান্! এই কোরো, যেন আমরা অচেনা মনে ক'রে মূঢ়ের মত তাঁদের পাশ কাটিয়ে চ'লে না যাই!

ভারতের রাজস্বব্যবস্থা ও তাহার সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম-এ

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কল্যাণে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তারলাভ করছে এবং সেই সঙ্গে রাজস্বের প্রয়োজনও স্বভাবতই বৃদ্ধিলাভ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর সেই দেশের রাজস্বব্যবস্থা যে প্রভাব বিস্তার করে, রাজস্বের চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার গুরুত্বও যথেষ্ট বেড়ে গেছে এবং সুষ্ঠু রাজস্ব-প্রথা গড়ে তোলার দিকে অর্থশাস্ত্রীরা দৃষ্টি দিয়েছেন সব দেশেই।

রাজস্বের জন্য সরকারকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয় করের ওপর। করসংগ্রহ করার ব্যবস্থা বিচার করতে হবে উৎপাদন এবং ধনবণ্টনের ওপর তার ফলাফল দিয়ে, যদিও সাধারণতঃ কেবলমাত্র দ্বিতীয়টীর প্রতিই আমরা দৃষ্টি দিই। করের পরিমাণ করদাতার ক্ষমতানুযায়ী হওয়া উচিত একথা প্রথম থেকেই অর্থনীতিবিদেরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এও বুঝতে বেশী দেরী হয় নি যে টাকার মূল্য যখন সকলের কাছে সমান নয় তখন ঠিক আয়ের অনুপাতে করনির্ধারণ না করে ক্রমবর্দ্ধমান হারে নির্ধারণ করলে তবেই করের বণ্টন ন্যায়সঙ্গত হবে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা করসংগ্রহের দ্বারা ধনবৈষম্য হ্রাস করতে চান, যোগ্যতানুযায়ী করবণ্টন তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন না। আর্থিক অবস্থা অনুসারে করের হার বাড়ালেই হবে না, বৃদ্ধির পরিমাণ বৈষম্য-নিরাকরণের অনুকূল হতে হবে। এক কথায় যে করব্যবস্থায় যত বৈষম্য হ্রাস হয় সেটা তত

ভাল। এই দিক থেকে, আয়কর, উত্তরাধিকার কর (Succession Duty), ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করকে, ব্যবহার্য জিনিষপত্রের ওপর নির্ধারিত পরোক্ষ করের চেয়ে শ্রেয় বলা যেতে পারে। কারণ পরোক্ষ করের বেলায় দেয় করের পরিমাণ নির্ভর করে যে সব জিনিষের ওপর কর ধার্য করা হয়েছে তাদের ক্রয়ের ওপর, এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিষ গরীব ও বড়লোককে কিনতে হয় প্রায় সমান ভাবেই, ফলে গরীব করদাতার বোঝা আয়ের অনুপাতে অনেক বেশী হয়। তাই করব্যবস্থায় পরোক্ষ করের প্রাধান্য নিন্দনীয় মনে করা হয়।

গত মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বে—১৯৩৮-৩৯ সালে, ভারত সরকারের করের শতকরা ৭৮·৪ ভাগ পরোক্ষ কর থেকে এবং মাত্র ২১·৬ ভাগ প্রত্যক্ষ কর থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, এবং এর জন্য ভারতীয় রাজস্বব্যবস্থাকে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তু হতে হয়েছিল। মহাযুদ্ধের দৌলতে আমাদের করব্যবস্থার এ ত্রুটি অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে আয়কর এবং যৌথ-কারবারের ওপর কর (Corporation Tax) থেকে ভারত সরকার তাঁদের করের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ সংগ্রহ করেছিলেন, সুতরাং এই বছর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের অনুপাত প্রায় সমান সমান হয়েছিল। পরের বৎসর লিয়াকৎ আলী সাহেবের বাজেটে প্রবর্তিত ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান করের অনুপাত বেড়ে শতকরা ৫৪·৫এ দাঁড়ায়। এতে শিল্পপতিদের ওপর করের চাপ এতই বেড়ে যায় যে তাঁদের উৎপাদনের উৎসাহ ব্যাহত হয় এবং পরবর্তী বাজেটেই বাধ্য হয়ে তাঁদের করের বোঝা কমাতে হয়, তবুও প্রত্যক্ষ করের যে প্রাধান্য করব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটা নষ্ট হয় নি। অনেকে অবশ্য এই সব পরিবর্তন সম্বন্ধে সে রকম সচেতন নন। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের রাজস্বে পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর বড় বেশী এই ধারণা এখনও তাঁরা আঁকড়ে রয়েছেন এবং পরোক্ষ করের সামান্য বৃদ্ধিকেও তাঁরা উন্নতির পরিপন্থী এবং গর্হিত মনে করেন। এ ধারণা যে কত অমূলক তা অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর দেশগুলোর রাজস্বব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের অনুপাত তুলনা করলেই বোঝা যাবে। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রত্যক্ষ করের (আয়কর, সম্পত্তি কর ও ভূমিরাজস্ব) অনুপাত শতকরা ২০ ভাগ মাত্র, কানাডায় কিছু দিন আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের করের শতকরা মাত্র দশ ভাগ আয়কর থেকে সংগৃহীত হোত এবং এখনও পরোক্ষ করের প্রাধান্য যথেষ্ট। সাউথ আফ্রিকায় সোনার খনির ওপর চড়া হারে কর ধার্য করার সুযোগ থাকায় পরোক্ষ করের অনুপাত কম, তবুও শতকরা ৪৭ ভাগ। ব্রিটেনে ১৯৪৭-৪৮ সালে শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ আয়কর থেকে সংগৃহীত হয় এবং মদ, তামাক, মোটর, এবং পেট্রলের ওপর করের পরিমাণ ও গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। অথচ ব্রিটেনের রাজস্বব্যবস্থায় ন্যায়ের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের প্রাধান্যের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রাদেশিক সরকারকে অবশ্য প্রধানতঃ পরোক্ষ করের ওপর নির্ভর করতে হয়, তবুও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব এক সঙ্গে নিলেও প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ১৯৪৭-৪৮ সালে দাঁড়ায় ৪৫%—মোট ৪৩২ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার রাজস্বের ১৯৩ কোটী ৬৮ লক্ষ সংগৃহীত হয় প্রত্যক্ষ কর থেকে, এবং অন্য দেশের তুলনায় একে খুব খারাপ বলা যায় না।

সম্প্রতি উন্নত দেশমাত্রেই প্রত্যক্ষ করের

অনুপাত না বাড়িয়ে পরোক্ষ করের অনুপাত বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, অবশ্য পরোক্ষ কর এমন ভাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে যাতে বড়লোকেরা যে সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করেন তার ওপরই কর ধার্য করা হয়। পরোক্ষ কর হলেই করের চাপ আয়ের অনুপাতে ধনীদের কম হয়ে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাবে এর কোন মানে নেই, এটা নির্ভর করবে কোন জিনিষের ওপর কর ধার্য করা হয়েছে তার ওপর।

সুতরাং ন্যায়নীতি লঙ্ঘন না করেও পরোক্ষ-কর প্রবর্তন করা যায়, আমরা আগেই বলেছি শুধু ধনবণ্টনের ওপর করের প্রভাব দেখলেই চলবে না, উৎপাদনের ওপরও তার ফলাফল বিচার করতে হবে। প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা হল যে সেটা 'প্রত্যক্ষ', সোজাসুজি ভাবে আমাদের আয়ে ভাগ বসাতে গিয়ে প্রত্যক্ষ কর আমাদের উৎপাদনের উৎসাহ কমিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি একটা সীমা ছাড়ালেই উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে। বিচক্ষণ অর্থ-নীতিবিদ কীন্‌স্‌ ঠিকই বুঝেছিলেন যে শিল্প-পতিদের 'লাভ' বেশী কাটছাঁট করা বুদ্ধি-মানের কাজ নয়। "To squeeze the capitalist in the act of earning profit is to squeeze him in the wrong place." আয়ের ওপর বেশী হাত না দিয়ে ধনীদের বিলাসসামগ্রীর ওপর চড়া হারে কর ধার্য করলে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙ্গবে না।

অবশ্য এর মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে ক্রমবর্ধ-মান হারে আয়কর বসান হবে না, কিন্তু করবৃদ্ধির হার স্থির করতে হবে উৎপাদনের কথা স্মরণ রেখে। লিয়াকৎ আলি সাহেব একটা আয়ের অতিরিক্ত অংশের ওপর টাকায় সাড়ে পনেরো আনা আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে শুধু উৎপাদনই ব্যাহত হয়নি, কর ফাঁকি দেওয়ার উৎসাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ ১৲ আয় করার চেয়ে ।৹ ট্যাক্স ফাঁকি দিতে পারলেই বেশী লাভ। আয়করের সর্বোচ্চ হার এই বছর কমিয়ে টাকায় ৸৶৹ করা হয়েছে। আয়করকে ক্রমবর্ধমান করার জন্য করদাতার মোট আয়কে কয়েকটা অংশে ভাগ করে বিভিন্ন অংশের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করার আধুনিক ব্যবস্থা—রাজস্ববিজ্ঞানে এর নাম Slab System, ১৯৩৯ সালে আয়-কর সংস্কারের সময় এদেশে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই সংস্কার সত্ত্বেও ভারতীয় আয়করের দুটো ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। বৃটেন প্রভৃতি উন্নত দেশে যেমন করদাতার দেয় করের পরিমাণ নির্ধারণের সময় পোষ্যপরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ হিসাবে আয়ের একটা অংশ রেহাই দেওয়া হয়, এদেশে সে রকম কোন ব্যবস্থা হয়নি। বলা বাহুল্য কেবল আয়ের পরিমাণ দিয়ে এক জনের কর দেওয়ার ক্ষমতা যথাযথভাবে নির্ধারিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, করের হার নির্ধারণের জন্য আয়ের যে বিভাগ করা হয়েছে, তাতে বিভিন্ন অংশের ওপর হারের তারতম্য বড় বেশী। এর চেয়ে অংশ-গুলিকে আরও ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে করের হার বাড়িয়ে গেলে রাজস্বের দিক দিয়েও ক্ষতি হোতো না অথচ উৎপাদন বাড়িয়ে আয় বাড়ানর ইচ্ছাও অপেক্ষাকৃত কম বাধা পেত।

এইবার প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বসংক্রান্ত দুই একটী সমস্যার কথা বলে আমাদের আলোচনা শেষ করব। প্রাদেশিক রাজস্বের সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। প্রথমতঃ প্রাদেশিক কর প্রায় সবই পরোক্ষ কর। উত্তরাধিকার কর এবং কৃষি-আয়কর এ দুটী নতুন প্রত্যক্ষ কর ধার্য করার অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছে বটে,

কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে এই দুটী কর বসিয়েও পরোক্ষ করের বোঝা তাঁরা বিশেষ কমাতে পারবেন বলে মনে হয় না, কারণ মাদকদ্রব্য-বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আবগারী করের মোটা আয় তাদের বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই দুটী নতুন কর সেই গহ্বর পোরাতেই লেগে যাবে, অন্য পরোক্ষ কর কমানর বিশেষ অবকাশ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রাদেশিক সরকারের জাতিগঠন-মূলক কাজের জন্য রাজস্বের প্রয়োজন যথেষ্ট। অথচ যে সব পরোক্ষ করের ওপর তাঁদের নির্ভর করতে হয়, সে সব বাড়াতে গেলেই পড়ে গরীবের গায়ে হাত, যেমন পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারকে টাকার প্রয়োজনে নিত্যব্যবহার্য যে সব জিনিষের ওপর বিক্রয়কর ছিল না সেগুলিকে বিক্রয়করের আওতায় সম্প্রতি আনতে হয়েছে। এর একমাত্র সমাধান হোল রাজস্বের জন্য শুধু করের ওপর নির্ভর না করে সরকারী শিল্প প্রভৃতি গড়ে তুলে আয়ের পথ সুগম করা। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে সুইডেন সরকারের এত আয় হয় যে ব্যয়-সঙ্কোচ না করেও অন্য দেশের তুলনায় সেখানে করের হার যথেষ্ট কম রেখে উৎপাদনের সহায়তা করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাদেশিক রাজস্বের সব চেয়ে বড় সমস্যা হ'ল বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে করের হারের তারতম্য। সমস্ত প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বা রাজস্বের প্রয়োজন অবশ্য সমান নয়, তবুও করের চাপ বিভিন্ন প্রদেশে মোটামুটি এক রকম না হলে স্বভাবতই ব্যবসায়ীরা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তাদের মূলধন স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করবে এবং তাতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। বিভিন্ন হারে বিক্রয়কর ধার্য করার ফলে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। অবশ্য করের তারতম্য দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করুন এ আমরা চাই না, কারণ তাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষুণ্ণ হবে। এ তারতম্য দূর করতে হবে পারস্পরিক আলোচনা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টার দ্বারা। এবিষয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনের মত সম্মেলনের নিয়মিত অনুষ্ঠান বিশেষ সহায়ক হবে বলা বাহুল্য।

আলো ছায়া

শ্রীমতি উমারাণী দেবী

আলো বলে,—"ছায়া তোর
রূপ শুধু কালো।"
ছায়া বলে,—"ছিনু' আমি
তাই তুমি আলো।"

জগতের দুখ সুখ
এমনি তো হয়,
এক বিনা অপরের
নাহি পরিচয়।

আলয়-বিজ্ঞান—শাখাদ্বয়

(ভূততথাত্ববাদ ও অবতংশক বিদ্যালয়)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বিজ্ঞানাত্মবাদীরা "আলয়বিজ্ঞান" তিনটি অর্থে ব্যবহার করেন—(১) যে বিজ্ঞানালয় সংসারের যাবতীয় সংস্কার সংরক্ষা করে; (২) সংসারের যাবতীয় সংস্কার সপ্তবিধ বিজ্ঞানের দ্বারা যে আলয়ে সংরক্ষিত আছে; এবং (৩) সপ্তম মনোবিজ্ঞানেরও (unconscious stream) সাক্ষী, যেটী মিথ্যাদৃষ্টিহেতু আ-নির্বাণ "অহং" রূপে পরিচিত। সর্বাস্তিত্ববাদীদের মতে সংস্কৃত চিত্তধর্ম একটী বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান আবার চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় (ত্বক্) এবং মনঃ এই ছয় ভাগে বিভক্ত। কিন্তু বিজ্ঞানাত্মবাদীরা এই শেষোক্ত মনোবিজ্ঞানকে আবার দুভাগে বিভক্ত করলেন—ষষ্ঠ ব্যক্ত মনোবিজ্ঞান (normal state of conscious mind অর্থাৎ জ্ঞানভূমিক চিত্তব্যাপার) এবং সপ্তম অব্যক্ত মনোবিজ্ঞান (unconscious stream which is behind both conscious and subconscious অর্থাৎ যে অব্যক্ত অজ্ঞান-ক্রিয়া স্মৃতি ও অনুভূতিরূপ জ্ঞানভূমিক চিত্তব্যাপারের এবং অবচেতন স্বারসিক চৈত্তিক ব্যাপারেরও অর্থাৎ বেদান্তীরা যাদের মুখ্য ও গৌণ প্রাণক্রিয়া বলেন তাদেরও মূল উৎস)।

অতঃপর তাঁরা অষ্টম আলয়-বিজ্ঞান অতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা আবিষ্কার করলেন। এই আলয়বিজ্ঞান হচ্ছে সপ্তবিধ বিজ্ঞান-ব্যাপারের সাক্ষী (অর্থাৎ স্বসাক্ষী) এবং সেই সাক্ষীরও সাক্ষী (স্বসাক্ষি-সাক্ষী)। এ আটটী বিজ্ঞানব্যাপারকে এঁরা অন্যরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(১) লক্ষণত্ব অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বিষয়সংসর্গ-ব্যাপার (passive objectiveness)—ন্যায় মতে ব্যবসায়জ্ঞান, (২) দৃষ্টত্বম্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যাপার (active and passive —ন্যায়মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান), (৩) স্বসাক্ষিত্বম্ অর্থাৎ সংশয়কোটিস্মরণ সাক্ষিত্ব অর্থাৎ ন্যায়মতে—'এটী প্রমা না অপ্রমা' এই ব্যাপারের সাক্ষিত্ব) এবং (৪) সাক্ষিসাক্ষিত্বম্ অর্থাৎ প্রামাণ্যনির্ণয় (ন্যায়মতে 'এটী প্রমা' এই ব্যাপারের সাক্ষিত্ব)।

এই অলাতিচক্রবৎ আলয়বিজ্ঞানে এই দুটী সাক্ষিত্বকেই 'অহমাত্মা' বলে ভ্রান্তি হয়; এই আলয়বিজ্ঞানে চক্ষুরাদি অব্যক্ত মনোবিজ্ঞান পর্য্যন্ত সপ্তবিজ্ঞানের প্রবাহ চলেছে এবং তাতে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ নামে দুটো আন্তর ও বাহ্য জগৎ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তত্ত্বজ্ঞানে এই খ-পুষ্পবৎ বাহ্যজগৎ ও অলাতচক্রবৎ এই আলয় বিজ্ঞানের যাথার্থ্য উপরম প্রাপ্ত হয়। এই চরম উপরতিই নির্বাণ। এই চতুর্বিধ বিজ্ঞান ব্যাপারে ত্রিবিধ প্রমাণ উৎপন্ন হয়—(১) প্রত্যক্ষে—দৃষ্টিত্ব এবং অষ্টম আলয় বিজ্ঞান ও চক্ষুরাদি পাঁচটী প্রাথমিক বিজ্ঞান সহকারী; (২) অনুমানে—দৃষ্টিত্ব এবং ষষ্ঠ ব্যক্ত মনোবিজ্ঞান সহকারী এবং (৩) আভাস বা মিথ্যা প্রমাণে—দৃষ্টিত্ব এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম মনোবিজ্ঞান সহকারী।

কিন্তু এইরূপ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ সম্বন্ধে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদীদের আপত্তি এইরূপ—নাগার্জুন, মৈত্রনাথ, গৌড়পাদ, মণ্ডনমিশ্রাদির মতে বাহ্য ও আন্তর জগৎ খ-পুষ্পবৎ, স্বপ্নবৎ, বন্ধ্যাপুত্রবৎ তুচ্ছ সত্তা হওয়ায় তাঁদের প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহারও (Epistemology) তুচ্ছ-সত্তা হওয়ায় তদীয় সিদ্ধান্তগুলি তুচ্ছ সত্তা হয়ে পড়ে। কাজে-কাজেই পারমার্থিক এবং আর এক দিকে প্রাতিভাসিক ও তুচ্ছ সত্তার মধ্যবর্তী ব্যবহারিক সত্তা অস্বীকারে প্রমাণপ্রমেয়াদি ব্যবহার সম্ভব নয়, যেমন স্বপ্নে। (এ সম্বন্ধে "প্রাক্‌শংকর বেদাচার্যগণ" প্রবন্ধে গৌড়পাদের 'অজাতিবাদ' আলোচনাকালে বিশেষরূপে বিবৃত করার ইচ্ছা রহিল।) অথবা মতান্তরে গৌড়পাদাদির সিদ্ধান্ত স্বীকার করে কারিকাগ্রন্থাদিকে সিদ্ধান্ত শাস্ত্র (Authoritative Assertion) বলা চলে, পরন্তু প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহারযুক্ত দর্শনশাস্ত্র (Rationalistic Philosophy) বলা চলে না। তথাপি নাগার্জ্জুন ব্যষ্টিমূলক দৃষ্টি-সৃষ্টি স্বীকার করেও এ কথা বলতে ভুলেন নি— .

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ॥
যেঽনয়োর্ন বিজানন্তি বিভাগং সত্যয়োর্দ্বয়োঃ।
তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীরং বুদ্ধশাসনে॥

—মাধ্যমিক শাস্ত্র, ২৪।৮-৯

গৌড়পাদও এই বন্ধ্যাপুত্রবৎ জগতেও সাধনের উপদেশ করেছেন—

লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥

—মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।৪৪

"আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥"—

মাণ্ডূক্যকারিকা, ৩।১৬

ভূততথাত্ববাদ॥—অশ্বঘোষ দ্বিতীয় (খৃঃ পঞ্চম শতক)—গ্রন্থের নাম "মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র" এবং "ভূততথাত্বপ্রতীত্যসমুৎপাদ"—আলয়-বিজ্ঞানেরই একটী শাখা। অধ্যাপক সুজুকির প্রথম গ্রন্থখানির (Awakening of Faith) অনুবাদ হতে আমরা যে তত্ত্বগুলি পাই, তা বৌদ্ধ লোকোত্তরবাদ ও অদ্বৈতবেদান্ত হতে পৃথক করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। ভূত-তথাত্বরূপনির্বাণ একরূপ আত্মবাদেই পর্য-বসিত হয়েছে—(১) আত্মা পরমার্থ সত্য এবং (২) আত্মা সাংবৃতিক সত্য। প্রথমটীতে আত্মার অবিনাশিত্ব ও অপরিণামিত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টীতে ঐ আত্মাই সাংবৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপাদান, গুণ ও ক্রিয়াসম্পন্ন এবং তদ্ধেতু জন্ম, মৃত্যু ও জন্মান্তরের অধীন বলে স্বীকৃত হয়েছে। [Plato-র নশ্বর ও অবিনশ্বর আত্মার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমটী হচ্ছে Empirical Ego যা নশ্বর পরিবর্তনশীল জগতের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধিত এবং দ্বিতীয়টী মানুষ ও বিশ্বের মধ্যে সাধারণ Divine Spark—(Timaeus and Phaedo) দ্রষ্টব্য। Aristotle এর intellectus agens ও দ্রষ্টব্য।] দ্বিতীয় অশ্বঘোষের মতে ভূততথাত্ব নানা নামে কীর্ত্তিত হন—(১) নির্বাণরূপে ইহা জীবের স্বরূপ এবং চরম শান্তি, (২) বোধিরূপে ইহা পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মকায় যা প্রেম ও জ্ঞানের খনি, (৩) কুশলমূলরূপে শীলের চরম উৎকর্ষ, (৪) বোধিচিত্তরূপে ধর্মজ্ঞানের উদ্বোধক, (৫) পরমার্থ সত্যরূপে ইহা প্রমাণের চরম সত্য, (৬) মধ্যমার্গরূপে ইহা ঐকদেশিক এবং সসীম সত্তার ঊর্ধ্বে বর্ত্তমান, (৭) ভূত-কোটিরূপে ইহা যাবতীয় সত্তার সার, (৮) তথাগতগর্ভরূপে ইহা যাবতীয় পদার্থের গর্ভস্বরূপ, (৯) মহাযানিক তত্ত্বরূপে ইহা যাবতীয় জীবের আত্মস্বরূপ এবং (১০) পরমার্থতঃ

ভূততথাত্ব অদ্বৈত "ধর্মধাতু", সকল পদার্থের অধিষ্ঠান এবং সকল পদার্থ স্বরূপতঃ এই অনাদি অনন্ত আত্মতত্ব।

খণ্ড সত্তা মাত্র প্রাতীতিক অর্থাৎ মোহ বা মিথ্যাদৃষ্টিজন্য। এই মিথ্যাদৃষ্টি যদি আমরা জয় করতে পারি, তা'হলে এই বহুত্ব বা খণ্ড সত্তা বাধিত হবে। সর্ববস্তুর পারমার্থিক রূপের আখ্যা বা ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না; বিশিষ্ট কোন্ লক্ষণ না থাকায় উহা প্রত্যক্ষ নয়; তাদের স্বরূপ একরস; যা পরিণাম ও ধ্বংসাভাব, তারা এক আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ভূততথাত্বের ধারণা কালে বক্তা বা শ্রোতা, ধ্যাতা বা ধ্যেয় থাকেনা—এ বাক্যাতীত (suchness beyond language)। [বৃহদারণ্যকের এই ব্রাহ্মণটী এখানে দ্রষ্টব্য—"যত্র তু অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত" ইত্যাদি (৪।৫।১৫)]। অশ্বঘোষ বলেন, যখন এই ভূততথাত্ব বাক্য গ্রাহ্য হয়, তখন তার দুটী দিক্ —(১) শূন্যতা বা নির্গুণ সত্য এবং (২) অশূন্যতা বা সর্বগুণাধার সিদ্ধ বস্তু। [বৃহদারণ্যকের এই ব্রাহ্মণটী এখানে দ্রষ্টব্য—"এষত আত্মান্তর্যামী অমৃতঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" ইত্যাদি (৩।৮।২৩)]। ইনি নাগার্জুনের নেতিমূলক নির্বাণ বা ধর্মতথাত্বের ইতিমূলক দিকটা পরিস্ফুট করে, মৈত্রনাথের আলয়বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বস্তুতান্ত্রিক ভূততথাত্বের সমন্বয়সাধনের দ্বারা শ্রীগৌড়পাদ ও আচার্যপাদ শ্রীশংকরের শুভাগমনের পথ প্রশস্ত করেন।

মৈত্রনাথের বাহ্যশূন্য অলাতচক্রবৎ সপ্তবিজ্ঞানের অধিষ্ঠান আলয়বিজ্ঞান, আলয়বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান "আত্যন্তিক শূন্যতা." পরন্তু গৌড়পাদের বাহ্যশূন্য অলাতচক্রবৎ চিত্তকালিক এবং দ্বয়কালিক স্বাপ্নজগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম—"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্" (মাঃ কাঃ ৪।৯৯)। উভয়েই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী এবং উভয়েরই ভ্রান্তি বন্ধ্যাপুত্রবৎ আত্মখ্যাতি। কিন্তু মূল অধিষ্ঠান শব্দদ্বয় "আত্যন্তিক শূন্যতা" ও "ব্রহ্ম," নিয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ দেখা যায়; কিন্তু ভূত তথাত্ববাদীরা আত্মার পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করায় শাংকর বেদান্ত হতে পৃথক করা খুব কঠিন। উভয়েই সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী। উভয়েই পরমার্থতত্ব আবরণের হেতু অবিদ্যাকে স্বীকার করেন, উভয় মতেই চরমসত্য অপরিণামী এবং সেখানে দ্বৈতজগৎ বাধিত হয়; উভয় মতেই বিজ্ঞানাত্মার মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয় মতেই বিজ্ঞানাত্মাই ক্লেশ ও অক্লেশের মূল। কেবল দুই স্থলে মতদ্বয়ের ইতর বিশেষ আছে—(১) অশ্বঘোষ অবিদ্যাকালীন বাহ্য ও অন্তর প্রক্রিয়াগুলি পরিস্ফুট করতে পারেননি, কিন্তু অবিদ্যার ফলগুলি তিনি ও অপরাপর বৌদ্ধাচার্যেরা সম্যকরূপে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন। পরন্তু শাংকর দার্শনিকেরা অবিদ্যাকালীন বাহ্য ও আন্তর প্রক্রিয়াগুলি অনির্বচনীয়া খ্যাতির দ্বারা প্রায় সম্যগ্রূপে যুক্তিগ্রাহ্য করেছেন, পরন্তু অবিদ্যা ফলগুলির বিশ্লেষণ খুব সাধারণ ভাবে সর্বত্র দেখা যায়। (২) অশ্বঘোষ পূর্বপূর্ব বৌদ্ধাচার্যদের অনুসারে ত্রিপিটকপ্রমাণবাদী, পরন্তু শংকর পূর্বপূর্ব বেদাচার্যদের অনুসারে বেদপ্রমাণবাদী।

অবতংশক বিদ্যালয়॥—কবে কি ভাবে এই মত ভারতবর্ষ হতে চীন দেশে প্রস্থান করে জানা যায় না। এই আলয়বিজ্ঞানের শাখাটী এখনও উত্তর চীনে বর্তমান। এঁদের প্রধান গ্রন্থ "বুদ্ধ অবতংশক মহাবৈপুল্য সূত্ত" এবং "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্ত"। এই গ্রন্থদ্বয়কে তাঁরা

"মূল-ধর্ম-চক্র" বলেন এবং অপরাপর বুদ্ধোপদেশগুলিকে "শাখাচক্র" বলেন। এ'দের প্রধান বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক জীবেই তথাগতের জ্ঞান ও শীল বর্তমান, কেবল অবিদ্যা জন্য ঢাকা রয়েছে। সাংবৃতিক ধর্মালোকে এ'রা বস্তুর ভিন্নতা স্বীকার করেন, কিন্তু পারমার্থিক ধর্মালোকে সব একরস। ভেদগুলি অবিদ্যাজনিত প্রাতীতিক মাত্র (apparently diverse)। চরম সত্তা (Ultimate Being) সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও প্রেমস্বরূপ। এ'রা বলেন, একই বহু এবং বহুই এক। সংবৃতি পরমার্থ ভিন্ন থাকতে পারে না এবং পরমার্থও কখন সংবৃতি ছাড়া থাকতে পারে না। এ'রা 'সমত্ব' ও 'নানাত্বে'র সম্বন্ধের যাথার্থ্য স্বীকার করায় এ'দের সঙ্গে বেদান্তের বিভিন্ন ভেদাভেদবাদীদের বা স্পিনোজার (Spinoza) Pantheism এর তুলনা করা চলে। কারণ এ'রা বলেন, 'অস্মৎ' এবং 'যুষ্মদে' ভেদ আছে, কিন্তু তারা মূলতঃ অভেদ। এই সগুণ পারমার্থিক তত্ত্ব হতে পরবর্তী কালে—মন্ত্রব্যূহ (জপই প্রধান সাধন), ধ্যানব্যূহ (ধ্যানই প্রধান সাধন) এবং সুখবতী ব্যূহ (ভক্তিই প্রধান সাধন) ইত্যাদি শাখাত্রয় উদ্গত হয়।

সন্ধ্যা

পরাগ

অস্তাচলে চল্‌লো রবি
　　হাস্য ল'য়ে আস্যভরা ;
দিনান্তের আগুন্-তলে
　　সাজ্‌লো নটী শ্যামল ধরা।

মেদুর মৃদু বইলো বায়ু,
শিহর দিলো সকল স্নায়ু,
গাইলো গীতি ভ্রমর-কবি
　　চটুল পায়ে নৃত্যপরা।

হঠাৎ ধীরে সন্ধ্যা নামে
　　আঁধার ল'য়ে দুর্নিবার ;
কোন্ নিমেষে ডুব্‌লো কোথা'
　　ধরার রূপ চমৎকার।

হঠাৎ কবে এম্‌নি ক'রে,
জীবন-সন্ধ্যা নাম্‌বে, ওরে !
পাথেয় তো'র নাইতো কিছু
　　জোগাড় তবে কররে ত্বরা।

ভক্তি-বৃত্তি

শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী

শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রেম, অনুরাগ প্রভৃতির ন্যায় ভক্তিও মানব-হৃদয়ের অন্যতমা বৃত্তি বা মনোনিষ্ঠ ধর্ম্ম। বৃত্তি লইয়াই মানব জন্মগ্রহণ করে। মনই বৃত্তির ধারক। বৃত্তির সহিত মনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সমবায়ে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অন্তঃকরণ। পঞ্চভূতের পরস্পর মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণের জন্ম হইয়াছে। এই অন্তঃকরণই বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত নামে পরিচিত।

মন ও ইন্দ্রিয় যেমন পরমপুরুষ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রিয়াদির করণরূপ বৃত্তি-সমূহও তেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

চিত্ত যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পরিব্যাপ্ত, দেহ যেরূপ ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, পরব্রহ্মও সেইরূপ চৈতন্যস্ফুরণযুক্ত অখণ্ডাকার চিত্ত-বৃত্তির আশ্রয়।

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম।

বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৭

বৃত্তি কি বা কাহাকে বলে? চিত্তমধ্যস্থ চিন্তাপ্রবাহই বৃত্তিনামে পরিচিত। যদি চিত্তমধ্যে কোন বস্তুর চিন্তা ভাসমান হয়, ঐ বস্তুর আকার বা স্বরূপ বিষয়ে যে চিন্তাপ্রবাহ বা বৃত্তি তৎক্ষণাৎ চিত্তমধ্যে ভাসিয়া উঠে। চিত্তসাগরে অসংখ্য বৃত্তি বা চিন্তাপ্রবাহ ভাসিতেছে, নিমজ্জিত হইতেছে। এই বৃত্তিগুলিই মনের চাঞ্চল্যকারক।

মানব-চিত্তে বৃত্তির আবির্ভাব হয় কেন? সংস্কার এবং বাসনার প্রভাবেই উহার আবির্ভাব বা জন্ম হইয়া থাকে। চিত্ত বাসনাশূন্য হইলেই বৃত্তিগুলিও তৎক্ষণাৎ চিত্তসাগরে নিমজ্জিত হয়। বৃত্তি ক্রমশঃ অধোমুখী হইলেই মগ্নচৈতন্যাত্মক মনের উপর যে সুস্পষ্ট ছাপ পরিস্ফুট হয় তাহার নাম সংস্কার।

বাসনা কি? চিত্তরাগ বা চিত্ত-বৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থার নাম বাসনা। বাসনার প্রকৃতি স্থূল। শুভ-অশুভ ভেদে বাসনা দ্বিবিধ। শুভ বাসনাই সাত্ত্বিকী—পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ক্ষয়কারিণী মোক্ষদায়িনী। অশুভ বাসনা—লোকবাসনা, শাস্ত্র-বাসনা, এবং দেহবাসনা ভেদে ত্রিবিধ। উহা বন্ধনকারিণী—পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর জনয়িত্রী। মন, সংস্কার এবং বাসনা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শ্রুতি বলিতেছেন, কর্ম্ম-নিবৃত্তিদ্বারা বাসনার নিবৃত্তি হয়। বাসনার নিবৃত্তি হইতে মানব সংস্কার-মুক্ত হয়। এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইলেই মানবের মোক্ষলাভ হয়।

ক্রিয়ানাশাদ্ভবেৎ চিন্তানাশোঽস্মাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ স জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥

অধ্যাত্মোপনিষদ্

শ্রীভগবান কপিল, শ্রীভগবান পতঞ্জলি অন্তঃকরণের পঞ্চবিধ বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথাক্রমে উহাদের নাম—প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। এই পঞ্চবিধ বৃত্তি ক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশদায়িনী, অক্লিষ্টা অর্থাৎ ক্লেশক্ষয়কারিণী-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ

সাংখ্যদর্শন, ২।৩৩;

পাতঞ্জলদর্শন, ১।৫

এই বৃত্তিগুলির পরিচয় সংক্ষেপে এইরূপ—

ভ্রমশূন্য নিশ্চয় জ্ঞানোৎপাদক হেতুই প্রমাণ

বৃত্তি নামে পরিচিত। উহা চতুর্ব্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে পরিচিত। ইহা ষড়বিধ। যথাক্রমে উহাদের নাম :—ঘ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন এবং মানস।

হেতু বা তর্কদ্বারা কোন বস্তুর অনুভবকে অনুমান কহে। সাদৃশ্য জ্ঞান হেতু যে জ্ঞান তাহাই উপমান। শব্দদ্বারা যাহা প্রমাণীকৃত হয়, তাহাই শাব্দ। ভ্রমাত্মক জ্ঞানই বিপর্য্যয়বৃত্তি নামে পরিচিত। যেমন রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজতভ্রমজ্ঞান। বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন শব্দদ্বারা বস্তু পরিচিত হয়, তাহাই বিকল্প বৃত্তি। যেমন আকাশকুসুম, অশ্বডিম্ব প্রভৃতি। জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে চিত্ত যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহাই নিদ্রাবৃত্তি। পূর্ব্বানুভূত বিষয়বস্তুর পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে স্মৃতিবৃত্তি বলে।

মনই ইহাদের মূল কারণ। মনই সদসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ ভেদে মন দ্বিবিধ। বিষয়াভিলাষ এবং সঙ্কল্পযুক্ত মনই অশুদ্ধ। তাহার বৃত্তিগুলিও ক্লেশদায়িনী। কামনা ও বিষয়সম্পর্কশূন্য মনই বিশুদ্ধ। সুতরাং তাহার বৃত্তিগুলিও সাত্ত্বিকী। অতএব ক্লেশক্ষয়কারিণী—মোক্ষদায়িনী।

মন ত্রিগুণের আধার। মনের বৃত্তিগুলিও ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির উপধর্ম্মযুক্ত। যে মানব যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তদনুসারে তাহার সত্ত্ব রজঃ কিংবা তমোগুণের বিকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণবেশী জড়ভরত সৌবিররাজকে বলিয়াছেন, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ও কর্ম্মাধীন—কর্ম্মবশ্যাগুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ। (বিষ্ণুপুরাণ, ২।১৩)

সুতরাং শ্রদ্ধাপ্রীতি ভক্তির মত গুণ ভেদে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহও সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন, সত্ত্বকর্ম্মদ্বারা ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের ক্রিয়াদ্বারা মানুষ ও অসুর এবং তমোগুণের ক্রিয়াদ্বারা জড়পদার্থ বা তির্য্যক জন্ম প্রাপ্তি হয়।

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যকৃত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ॥

ভাগবত, ১১।২২।৫১

সত্ত্বগুণসম্পন্ন শান্তবৃত্তিযুক্ত মানবই সমাহিতমনা ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হন। তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহও সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্ত্তী হয়। সেই মানবের মনই প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্বসংযমন রজ্জু স্বরূপ। সেই মানবই সংসারপথের পারস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠোপনিষদ্, ৩।৬

কারণ শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধু ব্যক্তিগণের চিত্ত-বৃত্তি সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর পরম পদকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

সাধূনাঞ্চ স্থিতির্যত্র মানসী সর্ব্বদা—

শিবোপনিষদ্, ৯।১৪

শান্তবৃত্তিযুক্ত মানবই শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বৃত্তির অনুশীলনের নাম ধর্ম্ম। শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিলে চিত্তবৃত্তি ভক্তিনম্র হইয়া সুখ শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করে।

পরমশিব শ্রীভগবান শঙ্কর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, যে সকল পুরুষ ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্ম্মশীল হইয়া সৎপথানুগত বৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন করে, তাহারা নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ করিয়া সুখী হয়। তাহারাই পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান অর্থাৎ পবিত্রাত্মা।

ঈশ্বরাভিমুখো ভূত্বা ধর্ম্মাভিমুখ এব তু।
সৎপথানুগতাং বৃত্তিং সেবন্ স সুখম্ ইতে॥
শিবোপনিষদ্, ৩০।১৩

বৃত্ত্যা বিশুদ্ধয়া কলঙ্কপরিশূন্যয়া।
শীললাঞ্ছিতয়া যে বৈ ভবতি পূর্ণশশী তথা॥
ঐ ৫২।১১

সেই হেতু পরমকল্যাণময় শ্রীভগবান শঙ্কর স্বয়ং কর্ম্ম মন ও বাক্যদ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিয়া নিখিল জীব-প্রবাহকে শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীভগবান বাসুদেবের চরণে শরণ লইবার জন্য উপদেশ দিয়া বলিতেছেন, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই বসুদেব শব্দে প্রকটিত। কারণ সেই বিমল পুরুষ সত্ত্বগুণ দ্বারাই প্রকাশিত হন। এই কারণেই আমি মনোবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি দ্বারাই সেই অধোক্ষজের (ইন্দ্রিয়াতীত পুরুষ) শ্রীভগবান বাসুদেবের সেবা করিয়া থাকি।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥
ভাগবত, ৪।৩।২৩

সেই একমাত্র বিমল পুরুষ শ্রীভগবান বাসুদেব শুদ্ধসত্ত্বগুণ হেতুই যে মনোবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তিদ্বারা ভজনীয় এবং নিখিল জীব-প্রবাহের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তাহা শ্রীভগবান ব্যাসদেব এবং তাঁহার শিষ্য গোস্বামিপ্রবর রোমহর্ষণসুতের বাক্যেও পরিস্ফুট। শ্রীভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন, তিনি (বাসুদেব), শুদ্ধসত্ত্বগুণসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ এবং নির্ম্মল।

শুদ্ধং পরং নির্ম্মলং
ব্রহ্মপুরাণ, ২৩৪।৭৫

নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত ঋষি-সভায় রোমহর্ষণ-সুত সমবেত ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন শ্রীভগবান বাসুদেবই এক মাত্র শুদ্ধসত্ত্বতনু-বিশিষ্ট। তিনিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।
ভাগবত, ১।২।২৩

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, সত্ত্বগুণই ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া প্রভৃতি। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৯ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ পৃঃ ১২৪) অর্থাৎ এই বৃত্তিগুলিই সাত্ত্বিক। উহারাই জীবের জন্মমৃত্যুক্লেশ-ক্ষয়-কারিণী মোক্ষদায়িনী, যেহেতু উহারা শ্রীভগ-বানেরই সত্ত্বগুণাশ্রিত। অতএব শুদ্ধসত্ত্ব বৃত্তির নামান্তরই ভক্তিবৃত্তি।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মসংহিতা, ৫।১

পঞ্চমবর্ষীয় বালক ভক্ত রাজকুমার ধ্রুব বলিয়াছেন, বিশ্বাধার শ্রীভগবান হ্লাদিনী সন্দিনী, ও সংবিৎ—ত্রিশক্তিতে অবস্থিত—

হ্লাদিনী সন্দিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্বসংস্থিতৌ।
বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

শ্রীভগবান এই ত্রিশক্তির আধার। সন্দিনী যোগে তিনি সৎ, সংবিৎ যোগে চিৎ এবং হ্লাদিনী যোগে আনন্দস্বরূপ হন। সন্দিনীর কার্য্য সৎ, সংবিতের কার্য্য জ্ঞান এবং হ্লাদিনীর কার্য্য আনন্দ। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং এই ত্রিশক্তির আস্বাদ গ্রহণ করেন, এবং তাঁর ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিয়া আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ কি? ইহাও এক প্রকার বৃত্তি। স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ হইয়াও যে শক্তিদ্বারা শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন তাহারই নাম হ্লাদিনী অর্থাৎ আহ্লাদদায়িনী শক্তি বা বৃত্তি।

হ্লাদকরূপো যাপি ভগবান্ যয়া হ্লাদয়তে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী।

পরমভাগবত কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা,

পরমভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগোস্বামী বলিয়াছেন শ্রীভগবান অনন্তস্বরূপ হইয়াও যেমন পরমানন্দ বিগ্রহ, তেমন তাঁহার হ্লাদিনীনাম্নী যে স্বরূপ শক্তি বা বৃত্তি আছে, সেই শক্তি বা বৃত্তি তাঁহাকে যেমন আনন্দ আস্বাদন করায়, তেমনি তাহা ভক্তজনকেও আস্বাদন করাইয়া থাকে। এই হ্লাদিনী শক্তিই পরমা বৃত্তি। তাহাই শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি। জ্ঞানী ও ভক্তগণ এই শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি—ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন।

শ্রীভগবানের প্রথমসৃষ্ট এবং প্রথম ভক্তি-প্রাপ্ত পুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, মনোবৃত্তি দ্বারা ভগবদ্‌বিষয়ে যে চিন্তা তাহাই ভক্তির স্বরূপ। অর্থাৎ যে চিন্তাপ্রবাহ বা যে চিত্ত বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহাই ভক্তি-বৃত্তি।

মনসা ভাবনা ভক্তিরিষ্টা। —ব্রহ্মপুরাণ, ১।১৮

ভক্ত ও ভজনীয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু ভক্তের হৃদয়ে ভজনীয়ের যে চিন্তা তাহাই ভক্তি এবং ভক্তহৃদয়ে যে মনোবৃত্তি উপস্থিত হইয়া এই মনন বা চিন্তা কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাই ভক্তিবৃত্তি। মন শুদ্ধসত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইলেই এই বৃত্তির উদয় হয়। অতএব ভক্তিবৃত্তি শুদ্ধসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন মানবেরই মনোবৃত্তি যাহা শ্রীভগবানকেই কেন্দ্র বা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, ভক্তের ভক্তি-বৃত্তিই সমস্ত জীবপ্রবাহের মাতৃ-স্বরূপ। প্রাণিগণ যেরূপ মাতাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করে, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিও সেইরূপ ভক্তি-বৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। অর্থাৎ ভক্তিবৃত্তিই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু-ক্লেশক্ষয়-কারিণী। এই সাত্ত্বিকী বৃত্তিই ভগবদ্‌জ্ঞানোপ-লব্ধি—ভগবৎপ্রাপ্তির প্রসূতি।

তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে।
জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরি আশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ধার্ম্মিকাঃ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ, ৪।২৯।৩০

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বাসনা ও ফলকামনাশূন্য হইয়া অনন্যমনা হইয়া শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের নামই ভক্তি। যে শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তির আবির্ভাবে এইরূপ মনোবৃত্তির উদয় ও বিকাশ হয়, সেই নির্ম্মল ভক্তি-বৃত্তিই ইহলোক ও পরলোকেও মানবের মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

ভক্তিরস্য ভজনং।
তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্
মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্।

গোপালতাপনী উপনিষদ, ১৫

এই ভক্তিবৃত্তির অধিকারী কে? শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, জীব যখন ব্রহ্ম হয়, সেই সময় তাহার আত্মা প্রসন্নভাব ধারণ করিয়া থাকে; এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া সে কোন প্রিয় বস্তুর জন্য শোক করে না, বাসনাও তাহার মনে স্থান পায় না, সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়। তখনই সে আমার পরম ভক্তিলাভ করে। জীব এই ভক্তির প্রভাবেই আমার স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

গীতা, ১৮।৫৪-৫৫

শ্রীভগবান কপিল এই শুদ্ধসত্ত্ব বৃত্তি ভক্তি-বৃত্তিকে অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী বলিয়াছেন। কপিলোক্তির মর্ম্মার্থ এইরূপ—যে সকল পুরুষের মন শ্রীভগবানের অখণ্ড রূপ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় না, সেই সকল পুরুষের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি জ্ঞানের উদ্বোধক মনোবৃত্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফল কামনাশূন্যা—এবং স্বাভাবিকী বৃত্তি-রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি ভক্তি-বৃত্তিকে যত্নপূর্ব্বক আহরণ করিতে হয় না। উহা নিজ স্বাভাবিক গতি অনুসারেই ভক্তহৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। মনের এই ক্রিয়া বা চিন্তা-প্রবাহই ভাগবতী ভক্তি বা ভক্তি-বৃত্তি। উহা শ্রীভগবানকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। মনোবৃত্তি যখন ঈশ্বরমুখী হয়, তখনই উহা নিষ্কাম ও স্বীয় স্বাভাবিক গতিতেই ভগবদাকারতা প্রাপ্ত হয়।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥

ভাগবত, ৩।২৫।৩২

ভগবদাকারা মনোবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান কপিল কর্ত্তৃক অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী বৃত্তি, পঞ্চরাত্রে দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক মনোগতি এবং ভক্তিরসায়নসূত্রে পরমহংস শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী কর্ত্তৃক সবিকল্পক বৃত্তিরূপে পরিচিত হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদ বলেন, শ্রীহরিতে নিষ্কাম প্রেমরস-সিক্ত নিরবচ্ছিন্ন মনোগতিই ভক্তি বা ভক্তি-বৃত্তি। এই বৃত্তিই শ্রীহরিকে বশ করিতে সমর্থা।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশংকরী॥

(নারদপঞ্চরাত্র)

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, দ্রবীভূত মনের ভগবদাকারে যে সবিকল্পক বৃত্তি উহাই ভাবের স্বরূপ বা ভক্তি-বৃত্তি।

দ্রবীভাবপূর্ব্বিকা হি মনসো ভগবদাকারা সবিকল্পকবৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ।

ভক্তের সর্ব্বক্রিয়াতে ভক্তি-বৃত্তির প্রভাব-লীলা প্রকটিত। সেইজন্য দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবান বাসুদেবকে বলিয়াছেন, হে বাসুদেব! ভাগবত-ধর্ম্মকথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তাহা পাঠ করিলে, ধ্যান করিলে, আদর করিলে, অথবা যিনি ভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলন করেন, তাঁহাকে অনুমোদন করিলেও বিদ্রোহী মন তৎক্ষণাৎ দেহাত্মিকা বুদ্ধিপরিশূন্যা হইয়া শ্রীভগবানের অনুগামী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তি-বৃত্তি যথাযথভাবে অনুশীলিত হইলে মানব ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করে।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সত্তঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

ভাগবত ১১।২।১২

ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন দ্বারাই যে শ্রীভগবানের স্বরূপ উপলব্ধ হয়, উহা তাঁহারি ভক্তিতেই স্বপ্রকাশ। শ্রীভগবান বাসুদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, আদিমধ্যান্তহীন স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ অব্যয় এবং অদ্বয় আমার যে রূপ আছে, তাহা ভক্তি-বৃত্তি দ্বারাই অনুভব্য এবং লভ্য।

মদ্রূপং অদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চ অব্যয়ম্॥

বাসুদেবোপনিষদ্, ৫

শ্রীভগবান কপিল বলিয়াছেন, অনিমিত্তা ও স্বাভাবিকী ভক্তি-বৃত্তি যথাযথ ভাবে অনুশীলিত হইলে উহা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়। সে কিরূপ? জঠরানল যেরূপ উদরস্থ ভুক্তান্নকে জীর্ণ করিয়া থাকে, ভক্তি-বৃত্তিও সেইরূপ মানবের অন্নময়াদি কোশসমূহকে সত্বর ক্ষয় করিয়া থাকে। অর্থাৎ মানবের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ও বাসনাময় সূক্ষ্ম শরীরকে আশু ক্ষয় করিয়া থাকে।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিসিদ্ধে গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

ভাগবত, ৩।২৫।৩০

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদাকারা মনোবৃত্তি বা ভক্তি-বৃত্তির কথা প্রাণপ্রিয় সখা ভক্ত ও শিষ্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসীকে বলিয়াছেন, হে কুন্তিনন্দন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমুদায় এরূপভাবে সম্পন্ন করিবে যেন উহা আমাতেই সমর্পিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতেই সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা, ৯।২৭

এই ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধি জাগ্রত হয় কখন? ভগবদাকারা মনোবৃত্তি বা ভক্তি-বৃত্তি শ্রীভগবানের দিকে যখন ধাবিত হয়, তখনই এই বুদ্ধির উদয় ও বিকাশ হইয়া থাকে। তিনিই অনুগ্রহ করিয়া মানবকে এই বুদ্ধি দান করিয়া থাকেন। কাহারা এই বুদ্ধিযোগের অধিকারী? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহাদিগকেই আমি বুদ্ধিযোগ দান করি। উহা দ্বারাই তাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

গীতা, ১০।১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, হে ভগবন! যখন ভক্তের হৃদয়-পদ্ম ভক্তিরসে সিক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ও পরিস্ফুট হয়, সেই সময় তাহারা তোমার নামগুণমহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া তোমাকেই লাভ করিবার পথ দেখিতে পায়। সেই সময় তুমিও ভক্তের হৃৎকমলে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকা। হে অনন্তগুণ-সম্পন্ন! দেবদেব! ভক্তগণ তোমার অনুগ্রহ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া মনোবৃত্তি দ্বারা তোমার যে মূর্ত্তি চিন্তা করে, তুমিই অনুগ্রহ করিয়া তোমার ভক্তকে সেই সেই রূপেই দর্শন দিয়া থাক।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

ভাগবত, ৩।৯।১১

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল! বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রাম রূপ ধরিয়াছিলেন।

বুদ্ধিযোগপ্রাপ্তি-বিষয়ে বৈদিক ঋষিবাক্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা কৃপা করিয়া বুদ্ধিযোগ দান না করিলে কোন যজ্ঞকর্ম্মই সাধিত হয় না। তাঁহার কৃপা-প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়াই ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হয়। পরমাত্মচরণে নিবেদিতপ্রাণ বৈদিক ঋষির মত সেও ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, হে পরমাত্মন্! আমরা প্রত্যহ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি-উপহারসহ তোমার নিকট আগমন করিতেছি। অর্থাৎ পরমাত্মার অনুগ্রহ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন দ্বারা আমরা তোমাকে লাভ করিব।

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ন্।
নমো ভরন্ত এমসি। —ঋগ্বেদ, ১।১।৭

ভক্তের ভক্তিরসে দ্রবীভূত মনের এই প্রকার অবস্থাই ভক্তির অবস্থা। এই অবস্থাতেই ভক্তের মনোবৃত্তি শ্রীভগবানের সহিত মিশিয়া তদাকারতা প্রাপ্ত হয়। অতএব দ্রবীভূত চিত্তের ভগবদাকারা মনোবৃত্তিই ভক্তিবৃত্তি। উহাই শ্রদ্ধা প্রীতি প্রেম প্রভৃতির ন্যায় সাত্ত্বিক মনেরই ক্রিয়াধর্ম্ম।

সন্ধান

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ওগো হারান মাণিক,
করিয়াছি পণ
আজীবন
খুঁজিব তোমায়।
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়।

ধরাযদি দাও
হয়তো বা
দরশন পাইব তোমার।
নাহি যদি দাও
খুঁজিব তোমায়।
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়।

খুলি এই বিশ্বের দুয়ার
কত খেলা খেলিতেছ
খেয়ালে তোমার।
কত সাজে নিজেরে সাজায়ে
করিতেছ কত অভিনয়।
আত্মপরিচয়
নাহি দাও কভু।
তবু
খুঁজিব তোমায়।
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়।

কণিকা তোমার
হয়গো প্রচার
ফুলের সুরভি দিয়ে
সেইটুকু নিয়ে
অনন্ত বাতাস
করে খেলা দিনরাত।
আসি যবে ধরিতে তোমায়
উড়ে যাও কোন অজানায়।
তবু খুঁজিব তোমায়।
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়

কোকিলের কণ্ঠস্বর
বলে দেয়
কত না মধুর
তোমার মুখের ভাষা।
লয়ে কত আশা
আসি যবে
শুনিতে সে গান
উড়ে যাও কোন অজানায়।
তবু খুঁজিব তোমায়।
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়।

নদীর ঐ ঢেউগুলি
কুলু কুলু রবে
তোমার চলার ছন্দ
বলে দেয় মোরে।
সেই অভিসারে
চলি যবে সাগরের পানে
হারাইয়া ফেলি সব
কোন অজানায়।
তবু খুঁজিব তোমায়—
খোঁজার আনন্দ তাতে
পাইব নিশ্চয়।

বৈষ্ণব সংগীত বা পদাবলী

শ্রীবেলা দে

কথিত আছে যে জাতীয় জীবনে কোন গৌরবময় বৈচিত্র্য না ঘটলে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। এ কথাটি যে খুবই সত্য তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালীর নিজ হাতে গড়া। বাংলার জাতীয় জীবনে এ এক গৌরবময় বৈচিত্র্য। বাঙ্গালীর গৌরব দেশ-জয়ে নয়, সাম্রাজ্য-বিস্তারে নয়, বাঙ্গালীর গৌরব প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাংলা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে উঠলো। বৈষ্ণবধর্মের প্রথম ও শেষ কথা রাধাকৃষ্ণ। প্রেমময় কৃষ্ণ ও প্রেমময়ী রাধিকাকে বাংলা নিজস্ব রূপদান করিয়াছে। রাধিকা নামে সত্য কেহ কোন সময় ছিলেন কি না, উহা 'আরাধিকা' শব্দের একটী রূপ মাত্র কি না—এ নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে যে বিরাট পদাবলী-সাহিত্য গড়ে উঠলো—তা বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নিজস্ব সম্পদ। বৈষ্ণবগীতি-কাব্যের প্রধান উপবীজ্য বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। জীবনে যত রসানুভূতি আছে, তার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব-পদাবলী এই প্রেমের লীলাচিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে গঠেছে। বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেমগীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিকে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান,
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে!
..........................এত প্রেম-কথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।"

এই প্রেমময় কাব্যের অগ্রদূত কবি জয়দেব। গীতি-কাব্য-প্রবণতা বাংলা-সাহিত্যের চিরন্তন ধর্ম। তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যও গীতি-কবিতায় পূর্ণ। বৈষ্ণব-গীতিকার প্রথম যুগ প্রবর্তন করলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কবি বিদ্যাপতি অবশ্য বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নি, বাংলা-ভাষায় গানও রচনা করেন নি, তথাপি বিদ্যাপতি বাঙ্গালীর কবি। বাঙ্গালীই বিদ্যাপতির কবিতার প্রকৃত রস গ্রহণ করতে পেরেছে। বিদ্যাপতির পদাবলী তাই বাঙ্গালীর সম্পত্তি। বিদ্যাপতির পদাবলী মধুচক্রের মত—রস-মাধুর্যে পূর্ণ। বিদ্যাপতি-রচিত—

"তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া—"

প্রভৃতি আজ আমাদের জীবনব্যাপী বিরহের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই চিরদিন-রাত্রির হরিই সব, তাঁকে চাই, না হলে দিনরাত সবই শূন্য। সেই চরম প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কবি বিদ্যাপতির মিলনেও তৃপ্তি নেই, তাই—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল—"

কবি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক।

চণ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় প্রেম-উন্মাদনা প্রকাশ করে পদাবলী-সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রতিস্থলে উচ্চতম প্রেমজগতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত! চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণনামেই পাগলিনী—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

এরূপ নাম শুনে প্রেমাসক্তির কথা বিশ্বসাহিত্যে কোথাও নেই!

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আগে গো
বদন ছাড়িতে নারি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব তারে॥"

চণ্ডীদাসের কাব্যে সর্বোচ্চ প্রেমের কথাই কীর্তিত হয়েছে, এই প্রেম কামগন্ধহীন। এ প্রেম পৃথিবীর ধূলিমলিন রাজপথ ত্যাগ করে স্বর্গের সুগন্ধ কুসুমাস্তীর্ণ পথের উদ্দেশে ছুটে চলে! চণ্ডীদাসের রাধা যখন বলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।"

তখন মনে হয় এ শুধু চণ্ডীদাসের রাধার কথা নয়, সকল যুগের সকল প্রেমাস্পদের উদ্দেশে দরদী বাঙ্গালীর চিরন্তন আবেদন! জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এঁরা সকলেই শ্রীশ্রীচৈতন্য-পূর্বযুগের বৈষ্ণবগীতিকার! শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে ও বহু বৈষ্ণব কবি এই পদাবলী-সাহিত্যকে ভাবের গভীরতায়, রসের মাধুর্যে, ছন্দের অপূর্ব লালিত্যে মহান করে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের বহু বৈষ্ণব কবির মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও বলরামদাস সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এঁরা তিন জনেই প্রায় সমসাময়িক। গোবিন্দদাসের রচনায় কবি বিদ্যাপতির প্রভাব যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাস পরমভক্ত কবি ছিলেন—তাঁর প্রার্থনাসঙ্গীত ও গৌরচন্দ্রিকায় তাঁর ভক্তির গভীরতা পরিস্ফুট। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। কবি জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত করছি—শ্রীরাধিকা স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেন মিলিত হয়েছেন—

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা শুন
শুন পরানের সই
স্বপনে দেখিনু সে শ্যামল বরণ দেহ তাহা বিনু
আর কারো নই।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দে'য়া গরজন রিমি ঝিমি
শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিদ যাই
মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল কোকিল
কুহরে কুতূহলে
ঝিঁ ঝিঁ ঝিনি কিনি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে।"

জ্ঞানদাসের এই পদটী সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন—"আজকের অন্ধকার বাদলা রাতে মনে পড়ছে ঐ পদটী 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন।' সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখে কোন একটী মেয়ে ছিল। ভালবাসা কুঁড়িধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজলপরা ঘাট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নাই! আছে সেই শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন, আজো সমানেই।" আর জায়গায় কবি জ্ঞানদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষার কথা বর্ণনা করছেন—

মাধব কৈছন বচন তোহার
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে

জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন আঁধাওল
দিবস লিখিতে নখ গেল
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল।
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীউ
ধরই না পার।
জীবন মরণ চেতন অচেতন নিতি নিতি
ভেল তনু ভার।
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে
আর কতই করব বিশোয়াস!
ঐ ছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব
তব কি করব জ্ঞানদাস।"

এই সুন্দর পদটীতে যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে তা শুধু রাধার নয়, এ ব্যাকুলতা নিখিল মানবের। কত যুগ-যুগান্তরের সাধনা নিয়ে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি সাধক, ভক্ত কবির সুললিত গীতি-কাব্যে রসিক ভক্তজনের প্রাণে আনন্দ-লোকের ধ্যান-ধারণা জাগিয়ে তুলেছে! বৈষ্ণব গীতি-কবিতার প্রেম ও ভক্তি-ধারা আধুনিক কালে ভগবদ্-ভক্ত রবীন্দ্রনাথে এসে থেমেছে। কবি-গুরুর হাতে বৈষ্ণব কবিতা আবার নব জন্ম লাভ করেছে! রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবরসের চরম উৎকর্ষে বাংলা সাহিত্যকে অভিষিঞ্চিত করে লিখেছেন—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি কবে কত দূর বৃন্দাবনে।"

অথবা—

"কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ-পর গোঁয়
কো তুঁহু বোলবি মোয়।"

প্রভৃতি অনবদ্য রচনা। প্রেম সর্বপ্রকার ভোগলালসার বহু উর্ধ্বে না উঠলে এরূপ কল্পনা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব সাহিত্য বিশাল—পদাবলীর পরিমাণও সমুদ্র! এর কণামাত্র পরশে মন-প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে! বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারীর মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়!
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা॥"

"প্রেম কাকে বলে? যখন হরি বল্‌তে বল্‌তে জগৎও ভুল হয়ে যাইবে, এমন যে নিজের দেহ এত প্রিয় জিনিষ, তার ওপর পর্যন্ত সংজ্ঞা থাকে না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রভাব

স্বামী নিখিলানন্দ

ভারতবর্ষে আর আমেরিকায় অনেক বিষয়ে একেবারে মিল নেই। তবুও ভগবানের ইঙ্গিতে এই দুটী দেশ পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে। ভারতের বিপুল ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনে পথের সন্ধান করতে গিয়ে Christopher Columbus আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যাত্রা করেছিলেন যে Boston Tea party তাদের চা আমদানী হ'ত ভারত থেকে। New Englandএর অতীন্দ্রিয়বাদ যা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Concordএ সুরু হয়—তার নেতা ছিলেন Emerson আর তার সহযোগী ছিলেন Thoreau, Alcott, Whittier—এঁদের চিন্তাধারা ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ভগবদ্গীতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন এমার্সন, আর উপনিষদের জ্ঞানালোকে Thoreau-র চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। Light of Asiaর মার্কিন সংস্করণ প্রকাশ করবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন Alcott. এই অতীন্দ্রিয়বাদের আদর্শই ভারত ও মার্কিনের পরস্পরের মিলনসূত্র। "পূবের আলো" (Light of the East) ছিল তাঁদের মুলমন্ত্র। ইউরোপীয় প্রাচ্য সমিতির আদর্শ নিয়ে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় Oriental Society স্থাপিত হয়। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত ধীরে ধীরে এইরূপ একটী মিলনের স্রোত মৃদুভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল।

Chicago Art Instituteএ এক বিরাটধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হয়—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবারে। এই দিনটী জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নব মহাদেশের আবিষ্কারের চারশো বছরের বার্ষিকী উৎসবোপলক্ষে মার্কিনের ভাববিস্তারের উদ্দেশ্যে এই মহাসভার আয়োজন হয়েছিল। পৃথিবীর নানাস্থান থেকে সাত হাজার প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যখন অভিভাষণ দেবার জন্য দাঁড়ালেন তখন তাঁর কণ্ঠ থেকে সর্বাগ্রে নিঃসৃত হল "আমেরিকার ভাই বোনেরা"। এই প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়কে এতদূর স্পর্শ করেছিল যে তাদের স্বতঃউচ্ছ্বসিত আনন্দ কলরোলে ও করতালি ধ্বনিতে সেই সুবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপ কিছু ক্ষণ মুখরিত হয়েছিল। সেই মুহূর্তেই প্রাচীনতম ও নবীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক মিলন-সেতু নির্মিত হলো। লোকে অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে লাগলো—স্বামিজীর প্রতিভাদীপ্ত দিব্য জ্যোতি, অপরিমেয় জ্ঞান, হৃদয়াবেগের উষ্ণতা, তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিত্ব, আর সুন্দর সুগঠিত অবয়ব—যেন ঠিক যুগোপযোগী পুরুষ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটী চিন্তাধারার সংযোগস্থলে এই মহাপুরুষ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর উভয় ধারাতেই তাঁর প্রভাব বিস্তার করছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সেই ধর্মমহাসভায় হিন্দু ধর্মের যে উদার বিশ্বজনীন ভাবের বাণী শুনিয়েছিলেন—তা শ্রীরামকৃষ্ণের নবযুগের বাণী—"যত মত তত পথ"। তাঁর অভি-

ভাষণ শুনে শ্রোতাদের মনে হয়েছিল যে তিনি শুধু হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি ছিলেন না—তিনি সকল ধর্মের প্রতিনিধি—তিনি যেন ধর্মের প্রতীক বা মূর্তিমান বিগ্রহ! সকল ধর্ম-মতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতে শেখাতেন। তিনি বলেছিলেন "আমরা হিন্দু শুধু পরমতসহিষ্ণু নই, মুসলমানদের মসজিদের নমাজে, পার্শীদের অগ্নি-উপাসনায়, খৃষ্টানদের ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে আমরা আমাদের মিলিয়ে নিই। আমরা জানি সকল ধর্মসম্প্রদায় এক নিম্নতম গাছ পাথরের পূজো থেকে উচ্চতম নিগুর্ণ ব্রহ্মোপাসনা এক অনন্তকে অনুভব করবার জন্য মানবাত্মার প্রয়াস। আমরা তাই এই ভাবকুসুম একসঙ্গে সংগ্রহ করে প্রেমের সূতোয় বেঁধে বিরাটের অর্চনার জন্য সুন্দর তোড়া সাজাই।"

স্বামিজী-প্রচারিত মহান ভাবের কাছে সকল বাদ-প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে যায়—বিপরীত বিরোধী ভাবের সমন্বয় হয়। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বের পেছনে রয়েছেন পরমেশ্বর অচল, স্থির-অবিকারী। তিনিই প্রকৃতির অধিপতি। তিনি আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, নামরূপহীন, অতীন্দ্রিয়, অতিমানসবান্, দেশ-কাল-পাত্রের অতীত। তিনি সচ্চিদানন্দ এই মাত্র বলা যায়। তাঁর নিজের অচিন্তনীয় শক্তিতে তিনি ব্যক্তি বা সাকাররূপে প্রকাশিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মে স্বর্গস্থ পিতা, জিহোবা, আল্লা, কৃষ্ণ, শিব ও কালী নামে পূজিত হচ্চেন। মানবাত্মার অদ্বৈত ভাগবত সত্তা তিনি বুঝিয়ে গিয়েছেন। "পাপ" কথাটা শুনলেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলতেন মানুষ আনন্দঘন অমৃতের সন্তান। "প্রত্যেক আত্মাই স্বরূপতঃ ভগবান" তিনি সর্বদা এটা স্মরণ করিয়ে দিতেন। আত্মার ভাগবত সত্তাই গণতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতার মূল আধ্যাত্মিক ভিত্তি। এখানে বর্ণবৈষম্য বা সামাজিক উচ্চনীচ ভেদ নেই—কারণ প্রত্যেক মানুষের ভিতর রয়েছেন ভগবান। এই ভাগবত সত্তার প্রকাশের তারতম্যে জীব বা মানুষের উচ্চ-নীচ ভেদ ভাব। একদিন না একদিন সবারই পূর্ণ বিকাশ হবে।—স্বামিজী বলতেন জগৎটা ব্রহ্ম থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেই সর্বভূতাত্মা সর্বভূতে সর্ববস্তুতে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন। এটা যখন মানুষ অনুভূতি করবে তখন এই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে—মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরে সমন্বয় বিরাজ করবে।

স্বামী বিবেকানন্দ নির্ভীক ভাবে প্রচার করেছেন কোন অনুষ্ঠান বা মতবাদে ধর্ম হয় না—ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যেও নয় বা শুধু বিশ্বাস করলেও নয়—ধর্ম হয় ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম-স্বরূপের অনুভূতিতে। আত্মা ও পরমেশ্বরের নিত্য সম্বন্ধের উপলব্ধিই প্রকৃত ধর্ম। আত্মা পূর্ণ ও আনন্দস্বরূপ।

বিজ্ঞান ও ধর্মের পার্থক্য রাখাটা বর্তমান যুগে একটা বড় রকমের দুর্ভাগ্য বলে স্বামিজী মনে করতেন। ধর্মকে বৈজ্ঞানিক আর বিজ্ঞানকে ধর্মভাবিত করে তুলতে পারলেই মানুষের প্রকৃত উন্নতির আশা। অর্থাৎ ধর্মপ্রচারিত সত্য যুক্তিবিরোধী হবে না, আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বিধির বিরোধী হবে না। স্বামিজী আমেরিকাবাসীদের শিখিয়েছেন বেদান্তের ধর্ম—মনুষ্যত্ব-গঠনকারী ধর্ম—যাতে মানুষের অন্তরের ভাগবত সত্তা প্রকাশ পায়। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে থাকতে মানুষ পূর্ণত্ব উপলব্ধি করতে পারে, অপরের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা ও উদার দৃষ্টিতে দেখতে শেখে, নীচ বৃত্তিকে সংযত করে মানবজাতির সেবায় দেহমন উৎসর্গ করতে পারে, পরে বিশ্ব ও ঈশ্বরের ঐক্য অনুভব করে ধন্য হয়।

আমেরিকার সর্বত্র সভায়, গির্জায়, ক্লাবে, ভোজনালয়ে স্বামিজী হিন্দুধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। যে সব নরনারী আধ্যাত্মিক সাধনায় আগ্রহশীল ছিলেন—তাঁদের ছিলেন স্বামিজী আচার্য ও শিক্ষক। ভারত কখনও বাইরে বিবেকানন্দের মত বিরাট প্রতিভাশালী পুরুষকে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠায় নি। তাঁর বাণী শোনবার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত ছিল—তাই তাদের কৃষ্টি ও সামাজিক জীবনগঠনে তাঁর বাণীর প্রয়োজন ছিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে 'May flower'এ যে সকল তীর্থযাত্রী আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন—তাঁরা আন্তরিক ভাবেই উপাসনায় স্বাধীনতা চাইতেন। পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ আর Locksএর রচনাবলী—আমেরিকার শাসনতন্ত্র গঠনে এবং Bill of Rights বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। Lincolnএর Gettysburg অভিভাষণে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রবল আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সেই আদর্শগুলিই আমেরিকা-সংস্কৃতির মূলস্তম্ভ। স্বামী বিবেকানন্দ সেইগুলিকে আধ্যাত্মিক ভাবে অনুরঞ্জিত করেছেন। তাঁর বাণীতে মার্কিনের নরনারীর চিত্তকে আন্দোলিত করে তোলে—তারাও সাড়া দেয়।

মার্কিনে স্বামিজীর প্রচারকালেই বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়, আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসীদের শিক্ষাধীন থেকে মার্কিনের নরনারী শিক্ষালাভ করতে আগ্রহান্বিত হয়। এর চাহিদাও বেশ ছিল। বর্তমান কালে Boston, Providence, New York, Chicago, St. Louis, Hollywood, San Francisco, Portland, এবং Seattleএর ন্যায় প্রধান প্রধান শহরে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চারজন সন্ন্যাসী প্রচার করতে করতে তথায় দেহত্যাগ করেছেন। এই সব বেদান্ত-কেন্দ্রে সমবেত হন অধিকাংশ আমেরিকান খৃষ্টান আর কতিপয় ইহুদি। জাতিবর্ণ সম্প্রদায় ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে এই সব সভায় যোগ দিতে পারেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে অনেক লোক (দিন দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে) একাগ্রতা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনার জন্য প্রকৃত-ভাবে ধর্মকে অবলম্বন করেছে। অন্তর্মুখী সাধনের জন্য তারা আচার্যের পরিচালনা চায়। তারা যুক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক উক্তি শুনতে চায়—আনুষ্ঠানিক মতবাদ চায় না। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব-বাদে তাদের অন্তর সায় দেয় না। তারা চায় সার্বভৌমিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। তাঁরা চান এমন আচার্য বা শিক্ষক যার মন মুখ কাজ এক। এঁদের ভিতর অনেকেই মনে করেন বেদান্তকেন্দ্রগুলি ও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করছে। আমেরিকার বেদান্ত-প্রচারে এরাই নিয়মিত ছাত্র এবং অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মমণ্ডলীর সরলতা, আগ্রহ, ধীশক্তি একজন বাইরের দর্শকের কাছেও ধরা পড়ে। প্রত্যেক রবিবারে উপাসনা এবং অন্যান্য দিনে হিন্দুশাস্ত্র পাঠের ক্লাস হয়। কতকগুলি আশ্রম প্রতিষ্টিত হয়েছে যেখানে আগ্রহশীল সদস্য নরনারী নির্জনবাস করে সাধনা করবার সুযোগ পায়।

তথাকার বহু স্ত্রী পুরুষ ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা স্বামিজী-দের সঙ্গে একত্র বাস করে সাধন-ভজন করছেন। গীর্জায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সংস্কৃতিমূলক সমিতিতে স্বামিজীরা হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রিত হন—সর্বত্র তাঁরা শ্রদ্ধা আর বন্ধুর মত ব্যবহার পান। আমেরিকায় বেদান্তকেন্দ্রের গ্রন্থ-

প্রচারে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবের বিস্তার হয়েছে। এটা বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীই এই বিষয়ে সর্বপ্রধান। রামকৃষ্ণের উপদেশ, ভগবদ্‌গীতা ও উপনিষদ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। এই জাতীয় সাহিত্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমেরিকার বিশাল মহাদেশের নানাস্থানে এই গ্রন্থপ্রচারের দ্বারা আমেরিকাবাসীরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের ভাবসংস্পর্শ লাভ করছে।—অন্য উপায়ে এই সংস্পর্শে আশা অসম্ভব। এই সব সাধু যদিও হিন্দুধর্মের প্রচারক, তবুও তাঁরা কাউকে ধর্মান্তরিত করেন না। যার যা ধর্মবিশ্বাস—তাকে সুদৃঢ় করাই তাঁদের কাজ। তাই আশ্রমের বা কেন্দ্রের অনেকে স্বীকার করেছেন বেদান্তের আলোকে তাঁরা খৃষ্ট ও তাঁর বাণী স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারছেন।

বড় বড় অট্টালিকা বা বিশাল জনতার দিক দিয়ে যদি কার্যফলের যাচাই করা যায়, তবে সে হিসাবে মার্কিনে বেদান্ত-আন্দোলন নগণ্য বলে বোধ হবে। প্রভাবের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে আমেরিকায় নানাস্থানে কয়েকটি নরনারীর জীবন কেমন ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে দিন দিন আধ্যাত্মিক সূত্রে কেমন দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হচ্ছে, খৃষ্টানদের গির্জায় আজ অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সাধক-জীবনে ধ্যান ও একাগ্রতার প্রয়োজনবোধ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, অনেক খৃষ্টান নরনারী পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের যৌক্তিকতা দেখতে সুরু করেছেন—আবার কেউ কেউ—খৃষ্টের মত বুদ্ধ ও কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব দেখতে পাচ্ছেন—স্বাতন্ত্র্য ছেড়ে ধীরে ধীরে কেমন তাঁরা মৈত্রী ভাবাপন্ন হচ্চেন। আমেরিকার চিন্তাজগতে এই নীরব আলোড়ন বা বিদ্রোহে অন্য শক্তিও কাজ করেছে—কিন্তু এখানে বেদান্তের প্রভাব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে।

শত শত ভারতীয় ছাত্র আমেরিকায় অধ্যয়ন করতে উপস্থিত হওয়াতে আমেরিকা ও ভারতের সংস্পর্শ ঘনিষ্ঠ ও নিকটতর হচ্ছে। দুইটি দেশের এই মিলনস্রোত সুপ্রণালীবদ্ধ হয়ে পরিচালিত হলে বিশেষ ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক হবে।

অতীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে মানবজাতির চিন্তাধারা প্রবল ভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমান সংস্পর্শে যদিও প্রথমাবস্থায় পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে বিদেশী মনে করে তার সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে—কিন্তু এখন দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লেছে—পূর্ব ও পশ্চিম একই মানবজাতির অংশ বলে ভাবতে শিখেছে, ভারতের আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্য পাশ্চাত্যেরও আগ্রহ হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই মিলন—বর্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ঘটনা।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে জগতে এক নূতন সভ্যতার আবির্ভাব হোক যাতে মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ—পৃথিবীতে শান্তি আর মানুষের প্রতি মানুষের মঙ্গলকর শুভ ইচ্ছা—নেমে আসুক এই প্রার্থনা। *

* অল ইণ্ডিয়া রেডিও-কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত। — উঃ সঃ

স্বামী আত্মানন্দ

(১)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ত্যাগী তপস্বী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের একজন প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বশিষ্য স্বামী করুণানন্দকে * পুরীধামে বলিয়াছিলেন, 'আত্মানন্দের মত মহাপুরুষের সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহাসৌভাগ্য।' ঢাকা মঠে গমনোন্মুখ এক ব্রহ্মচারীকে স্বামী শিবানন্দ বিদায়কালীন আশীর্বাদ-দানান্তে বলিলেন, 'যাও, সেখানে সুকুল আছে; শিবতুল্য পুরুষ, তাঁর কাছে থাকবে।' স্বামী আত্মানন্দের নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, ঐকান্তিক ধ্যাননিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয়, গুরুভক্তি ও ইষ্টনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ছিল না; কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তপস্যার আলোকে উহা সদা সমুজ্জ্বল থাকিত। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, তাঁহার মন ধ্যাননিষ্ঠ ও অন্তর্মুখী। ধর্মজীবন যতই গভীর হয়, ততই উহার বহিঃপ্রকাশ কমিয়া যায়।

পূর্বাশ্রমে স্বামী আত্মানন্দের নাম ছিল গোবিন্দচন্দ্র সুকুল। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে সম্ভবতঃ ১৮৬৮ সনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমে। তিনি কলিকাতায় রিপন কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ছাত্রজীবনে খগেন মহারাজের (স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী শিষ্য বিমলানন্দের) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ে একই কলেজে পড়িতেন এবং বোধ হয়, সহপাঠী ছিলেন। খগেনের দ্বারাই রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। কলিকাতায় প্রথমে তিনি জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিতেন, পরে খগেনের বাড়ীতেই অবস্থান করেন। এই সময় স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

বাল্যকাল হইতেই গোবিন্দচন্দ্র শান্তস্বভাব ছিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দ, শুদ্ধানন্দ, বিমলানন্দ ও আত্মানন্দ যৌবনে পরস্পর পরিচিত হন এবং একই পল্লীতে থাকিতেন। রবিবার চারি বন্ধুতে মিলিয়া প্রথমে বরাহনগরে, পরে আলমবাজারে রামকৃষ্ণ মঠে যাইতেন। মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া তাঁহারা ধর্মপ্রসঙ্গ ও দার্শনিক বিচারাদি করিতেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র ঐ সকল যুক্তিতর্কে বিশেষ যোগ দিতেন না। তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল। তখন সন্ন্যাসজীবন-যাপনের জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ লক্ষিত হইত। স্বামিজীর আমেরিকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কিছু পূর্বে ১৮৯৬ সনে গোবিন্দচন্দ্র সংসার ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন। তৎকালে প্রচলিত বাল্যবিবাহপ্রথা অনুসারে অল্প বয়সেই গোবিন্দচন্দ্র বিবাহিত হন। পতির সন্ন্যাস গ্রহণের পর পত্নী বহু বৎসর জীবিতা ছিলেন। গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীপ্রসাদ সুকুল

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধে উল্লিখিত।

দীর্ঘজীবী ছিলেন। গোবিন্দ সন্ন্যাসী হইবার পূর্বে মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচলের জমিদারী ষ্টেটে উচ্চপদস্থ, বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্মচারী ছিলেন। পত্নী সংসারত্যাগী পতিকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার মানসে উক্ত জমিদারের শরণাপন্ন হন। জমিদার তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করুন। আমি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি।' জমিদার এই মর্মে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মঠের ঠিকানায় পত্র দিলেন, 'জমিদারীর কোন জরুরী কর্মে আপনার পরামর্শ আবশ্যক। আপনি অনুগ্রহপূর্বক একবার শীঘ্র আসিবেন।' পত্র পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র অবিলম্বে চাঁচলে জমিদারের বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু জমিদার বিষয়সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের কথাই উল্লেখ করিলেন না। তিনি কর্তব্যের দোহাই দিয়া বিবাহিতা পত্নীকে না ছাড়িতে বলেন এবং জবরদস্তির ভয় দেখান। তিনি যে ঘরে গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন সেই ঘরে ব্রাহ্মণী আসিয়া পতিকে দর্শন ও প্রণাম করিবামাত্র তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলেন, আর জমিদার-বাড়ী ফিরিলেন না। সন্ন্যাসীর নিকট পত্নি ও সংসার অন্ধকার অতল কূপতুল্য। বুদ্ধিমান জমিদার নির্বুদ্ধিতার পথে আর অগ্রসর হইলেন না। ১৯৩০ সনে মিশনের সেবাকার্য উপলক্ষে একবার স্বামী মঙ্গলানন্দ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে গিয়াছিলেন স্বামী আত্মানন্দের দেহত্যাগের প্রায় সাত বৎসর পরে। তখন গোবিন্দের পত্নী বৃদ্ধা। মঙ্গলানন্দজীকে বৃদ্ধা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পতি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তাঁহাকে শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ান।

ধ্যানাভ্যাসে গোবিন্দ পরমানন্দ পাইতেন বাল্যকাল হইতেই। গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের উপর শাঙ্কর ভাষ্য পাঠে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে তিনি ঐ সকল বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করিতেন। তিনি বেলুড় মঠে স্বামীজীর নিকট ১৮৯৮-৯৯ সনে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক আত্মানন্দ নামে অভিহিত হন। ইতঃপূর্বেই তিনি জয়রামবাটী যাইয়া শ্রীমার নিকট মন্ত্রদীক্ষালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে মঠে সুকুল মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করা হইত। তৎপরে ঐ নামেই তিনি পরিচিত হন। তাঁহার গুরুভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি গুরুর আদেশে জন্মগত অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিরামিষাশী ছিলেন। এক দিন গুরু শিষ্যের নিরামিষ আহারে দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পাতে একটু মাছের তরকারী তুলিয়া দেন। গুরুভক্তির প্রগাঢ়তা-হেতু শিষ্য গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় শিষ্যবৎসল গুরু তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। স্বামী আত্মানন্দ নিপুণ তবলা-বাদক ছিলেন। শ্রীগুরুর নিকট তিনি উক্ত বাদ্যশিক্ষার প্রেরণা লাভ করেন। এক দিন স্বামীজী মঠে গান করিতে করিতে শিষ্যকে বলিলেন, 'সুকুল, তবলা বাজাও ত।' শিষ্য বলিলেন, 'জানি না।' গুরু ধমক্ দিয়া বলিলেন, 'জানিস্ না কিরে? শিখেনে।' তখন হইতে স্বামী আত্মানন্দের তবলা শেখার আগ্রহ হইল এবং তিনি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত বাদ্য আয়ত্ত করেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার তবলা বাদ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালোর হইতে এক জোড়া ভাল তবলা উপহার-স্বরূপ পাঠান।

১৮৯৮ সনে কলিকাতায় প্লেগ মহামারীর

প্রাদুর্ভাব হয়। রামকৃষ্ণ মিশন শহরের আক্রান্ত পল্লীসমূহে সেবাকার্য আরম্ভ করেন। স্বামিজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দের উপর এই কার্যের গুরুভার অর্পিত হয়। স্বামী আত্মানন্দ উক্ত সেবাকার্য্যের অন্যতম প্রধান সেবক ও কর্মী ছিলেন।

তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান থাকায় স্বামীজী তাঁহার দ্বারা বেলুড় মঠে শাস্ত্রাধ্যাপনা করাইতেন। এই ক্লাসে আত্মানন্দজীর গুরুভ্রাতাগণ উপস্থিত থাকিতেন। তিনি কিছুকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকা পরিচালনে স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহকারী ছিলেন। শ্রীগুরুর মহাসমাধির পর সংঘের অপর এক সন্ন্যাসীর সহিত তিনি গায়ে ছাই মাখিয়া দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় ধ্যান জপ ও শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন। বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ মন্দির যে স্থানে অবস্থিত, উহার অদূরে একটী পর্ণকুটীর বাঁধিয়া তথায় উভয়ে থাকিতেন। তিনি তথায় রাত্রিবাসও করিতেন এবং মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য মঠে আসিতেন। রাত্রিতে তাঁহার জন্য কয়েকখানি রুটি উক্ত কুটীরে প্রেরিত হইত। স্বামী সারদানন্দ তখন মঠে বেদান্তগ্রন্থ অধ্যাপনা করিতেন। স্বামী আত্মানন্দ নিয়মিত ভাবে উক্ত ক্লাসে যাইতেন। ১৯০৪ সনে স্বামী আত্মানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আহ্বানে মাদ্রাজ মঠে গমন করেন। তথায় কিছুকাল কার্য করিবার পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে বাঙ্গালোরে নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের কার্যভার অর্পণ করেন। বাঙ্গালোর শহরের চাম্‌রাজপেট পল্লীতে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তখন আশ্রম অবস্থিত ছিল। তিনি তথায় ভক্তদের শাস্ত্রাদি পড়াইতেন এবং ধ্যান-ধারণা শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রায় ছয় বৎসর বাঙ্গালোর মঠে থাকিয়া ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার করেন এবং নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আশ্রমটীকে স্থায়ী করেন। আশ্রমের বর্তমান নিজস্ব জমি ও বাড়ী তাঁহারই সময়ে পাওয়া যায়। আশ্রমগৃহ নির্মাণের জন্য তাঁহাকে অর্থসংগ্রহও করিতে হইয়াছিল। তথায় স্বামী বিমলানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ কিছুকাল তাঁহার সহকর্মী ছিলেন। তিনি বক্তৃতাদি বেশী দিতেন না, কিন্তু একনিষ্ঠ ধর্মজীবন-যাপনের দ্বারা ভক্তমণ্ডলীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেন। তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী বক্তৃতা 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার শিশু-সুলভ সারল্য, আন্তরিক সহানুভূতি, কঠোর বৈরাগ্য এবং ধনি-নির্ধনের প্রতি সমান প্রীতির জন্য তাঁহাকে এখনও তথাকার অনেকে স্মরণ করেন। তিনি যখন বাঙ্গালোরে ছিলেন তখন আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারার্থ যাইবার জন্য সংঘের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের তার পাইলেন, এবং তাঁহার আদেশে বেলুড় মঠে আসিলেন; কিন্তু তিনি আমেরিকা যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, যদিও উক্ত কার্যের যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁহার ছিল। স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৯০৯ সনে তাঁহাকে বাঙ্গালোর ত্যাগ করিতে হয়।

১৯১১ সনে স্বামী আত্মানন্দ শ্রীসারদা-দেবীর সহিত রামেশ্বর তীর্থে গমন করেন। তীর্থদর্শনান্তে শ্রীমার সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বায়ুপরিবর্তনার্থ সম্বলপুরে যান। তথায় কোন বন্ধুর কাছে প্রায় আড়াই বৎসর থাকিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা শিক্ষার বিষয়। ঠাকুরের শিষ্যগণের কথা তিনি বেদবাক্য তুল্য অভ্রান্ত জ্ঞান

করিতেন। কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের রচনার সমালোচনা করিলে তিনি কটূক্তি দ্বারা তাঁহার মুখ বন্ধ করেন। যে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী মঠে ঠাকুরের পূজার কাজ করিতেন তাঁহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, 'তোমরা কত সৌভাগ্যবান্ যে, ঠাকুরসেবার অধিকার পেয়েছ। যে হাতে তোমরা ঠাকুরের সেবা করছ সে হাত কি আমাদের পায়ে লাগাতে আছে? ইহা কখনো হ'তে পারে না।'

এক বার ভুবনেশ্বরে তিনি চাতুর্মাস্য করিয়াছিলেন। স্বামী করুণানন্দ তখন তাঁহার সেবক। তখনও সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভক্ত প্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে বাহিরের একটি ঘরে উভয়ে বাস করিতেন। সেই সময়ে তিনি সর্বদাই ধ্যান-জপ, সাধন-ভজন ও শাস্ত্র-পাঠাদিতে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তখন তিনি প্রত্যহ দীর্ঘকাল গভীর ধ্যানে নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেন। ধ্যানকালে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। এক দিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন, এমন সময়ে একটী বৃহদাকার সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্বামী করুণানন্দের দৃষ্টি সর্পের উপর পড়িলে তিনি অতি মৃদু স্বরে ধ্যানস্থ স্বামীজীকে বলিলেন, সাপ এসেছে! এই বাক্যে ধ্যানীর মন বহির্জগতে আসিল না। পুনরায় সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইলে তিনি মাত্র নেত্রোন্মীলন করিলেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিলেন না। সাপটী এদিক ওদিক ফিরিয়া জানালার মধ্য দিয়া পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেল। যোগীর ধ্যান-প্রভাবে ঘরের মধ্যে নির্বৈর ভাব এমন জমাট বাঁধিয়াছিল যে, হিংস্র জন্তুটীর স্বাভাবিক হিংসা-কার্যে প্রবৃত্তি হইল না। যোগী আবার ধ্যানস্থ হইলেন। ঐ সময় তাঁহার মনে অহর্নিশ ধ্যান-প্রবাহ চলিত এবং তিনি এমন একটী আনন্দ-রাজ্যে সদা বিচরণ করিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি সর্বপ্রকার এষণাবর্জিত হইয়া পরমানন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার চোখে, মুখে ও কথায় ব্রহ্মানন্দের বিকাশ লক্ষিত হইত। মহাষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাকে পায়েস নিবেদন করিতে করিতে বালকের ন্যায় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, 'মা, করেছ সন্ন্যাসী! আর কি দিয়ে তোমার পূজা করি?'

কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ একটু জ্বর হইতে লাগিল। এইজন্য তাঁহাকে ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইল।

স্বামী আত্মানন্দ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র', 'বিল্বমঙ্গল', 'কালাপাহাড়', 'নসীরাম', 'রূপসনাতন', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'পাণ্ডব গৌরব', 'শঙ্করাচার্য', 'চৈতন্যলীলা' প্রভৃতি নাটকসমূহ অন্যকে পড়িতে বলিতেন এবং নিজেও পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার মতে ধর্মজীবনের এরূপ উচ্চ আদর্শ খুব কম পুস্তকেই পাওয়া যায়। মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি ঐ সকল নাটকের ক্লাস করিতেন। শেষ বয়সে কাশীধামে অবস্থানকালেও দুই একটি যুবক তাঁহাকে ঐ সকল নাটক পড়িয়া শুনাইতেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহাদের সদুপদেশ দিতেন। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের নিম্নোক্ত গানটী তিনি নিভৃতে বিভোর হইয়া গাহিতেন—

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতনশীলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

চেতন যমুনা চেতন রেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।
খেলা খেলা খেলা মেলা, নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।

ঈশ্বরদর্শনার্থ ব্যাকুলতাধিক্যে গভীর নিশীথে স্বীয় শয্যায় তিনি ক্রন্দন করিতেন। স্বামী মহাদেবানন্দ ঢাকা মঠে একাধিকবার তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়াছেন। স্বামী আত্মানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে তদ্‌দৃষ্ট এই স্বপ্নটী বলিয়াছিলেন—সারদাদেবীর ক্রোড়ে বসিয়া তিনি অতল অপার সাগরে ভাসিতেছেন। শেষে তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিলেন; যেন আনন্দের উৎস সর্বত্র প্রবহমাণ। তিনি বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে হারাইলেন। অনেক ক্ষণ পরে যখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন তখন দেখিলেন, তিনি মহানন্দে মাতৃক্রোড়ে নৃত্যরত শিশু। তিনি বলিতেন, 'সমাধি যদি ঐরূপ আনন্দের অবস্থা হয় তবে স্বপ্নে মাত্র ইহা অনুভব করেছি, জাগ্রত কখনো করি নি।' * উক্ত স্বপ্নদর্শনের পর তিনি বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিশ্চয়ই সমাধিবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যে ও ব্যবহারে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীত হইত। স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৯১৯ হইতে ১৯২১ সন পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর। তিনি ঢাকা মঠের কাজ কর্ম বিশেষ কিছু করিতেন না, ধ্যানভজন ও শাস্ত্রাধ্যাপনা লইয়া থাকিতেন। জনৈক সাধু ঢাকা মঠ হইতে বেলুড়মঠে আসিলে তাঁহাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, সুকুল কেমন আছে ও কি করে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তিনি ভাল আছেন, তবে কিছু করেন না।' তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'ও বসে থাক্‌লেই কাজ হবে।' উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সাধু কোন সেবাদি কর্ম না করিলেও তিনি যে ভাগবত জীবন যাপন করেন তাহাতেই আশ্রমের ও সমাজের পরম কল্যাণ হয়।

সাধুর জামা-কাপড় ও জিনিষপত্র বেশী থাকা অনুচিত। এই বিষয়ে স্বামী আত্মানন্দ আদর্শস্থল ছিলেন। তিনি স্বীয় বিছানাদি বাঁধিয়া লাঠিতে ঝুলাইয়া কখনো কখনো দেখিতেন, আবশ্যক হইলে একা তাহা বহন করিতে পারেন কি না। তিনি যখন যে আশ্রমে বাস করিতেন তথায় খুব অনাসক্ত ভাবে থাকিতেন এবং সংঘাধ্যক্ষের আদেশ মাত্র কোথাও যাইবার জন্য সদা প্রস্তুত দেখা যাইত। সংঘাধ্যক্ষের আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিতেন। তিনি যখন রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন তখন মঠস্থ প্রায় সকল সাধুই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাকে সকলের আদেশ পালন করিতে হইত। এমন বিশেষ কেহ কনিষ্ঠ ছিলেন না যাঁহাকে তিনি কোন কার্যের জন্য আদেশ করিতে পারেন। সেইজন্য নিজে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিলেন, নিজের সব কাজ নিজেই করিতেন। সমগ্র জীবনে, এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও, স্বাবলম্বন তাঁহার স্বভাবগত ছিল। কোন যুবক সাধু জড়সড় হইয়া বসিলে বা অলসভাবে চলিলে তিনি বিরক্তির সুরে বলিতেন, 'এ কিরে? বীর সৈনিকের মত চল্‌বি, কথা বল্‌বি ও কাজ করবি। রজোগুণের আশ্রয় না করলে তমোগুণে ডুবে যাবি।'

ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দকে সমগ্র গীতা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে রোজ পাঁচটী করিয়া শ্লোক

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ১৯২৩ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ঘটনাটী উল্লিখিত।

মুখস্থ করিতে হইত। এইরূপে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ হয়। তিনি ব্রহ্মেশ্বরানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, 'আমি অন্যত্র চলে গেলে তুমি যথাসময়ে এসে ঠাকুরের ছবির সম্মুখে পড়া দিয়ে যাবে। তা হলেই হবে।' বাকী সাত অধ্যায় ব্রহ্মেশ্বরানন্দজী এইরূপে কণ্ঠস্থ করেন। তাঁহার মতে গীতা এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্থ করা উচিত। স্বামী আত্মানন্দ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী চব্বিশবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। শুধু পাঠমাত্র নহে, স্বামীজীর সারগর্ভ বাক্যগুলির উপর ধ্যান করিতেন। মঠের নবীন সন্ন্যাসীদের তিনি বলিতেন, 'পূর্বাশ্রমের জীবন একেবারে ভুলে যাও। মনে কর, নতুন জন্ম হয়েছে। সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি বার বার পড়বে এবং মন্ত্রার্থ মনে জাগিয়ে রাখবে। সন্ন্যাসী স্বগৃহে যাবে কেন? বার বৎসর পরে স্বগৃহে এক বার যাওয়ার প্রথা থাকলেও ইহা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। হরি মহারাজকে দেখ। সংযত সাধুর শরীর ভাঙ্গে, কিন্তু মুখ ভাঙ্গে না। সংযমের অভাব হলে চোখ বসে যায়, মুখ ভেঙ্গে যায়।" স্বামীজী আত্মানন্দপ্রমুখ শিষ্যদের এক দিন বলিয়াছিলেন, "ভক্তের বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীভক্তের হাতের রান্না খেও না। এরূপ করলে শরীর নষ্ট ও মন নিম্নমুখী হয়। আমি খেলেও তাই হবে। তবে আমার মনের কিছু করতে পারবে না। কারণ, আমার মন সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্ত। কিন্তু আমার শরীরে ব্যাধি আসবে।" এক বার স্বামীজী কোন গৃহী গুরুভ্রাতাদ্বয়ের বাড়ীতে আহারের আমন্ত্রণ পান। কার্যব্যপদেশে তাঁহার যাইতে একটু বিলম্ব হয়। তিনি যাইয়া দেখেন বয়স্থ গুরুভ্রাতাদ্বয় ইতঃপূর্বেই আহার শেষ করিয়াছেন। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে আহার-সমাপনান্তে মঠে ফিরিয়া আত্মানন্দপ্রমুখ শিষ্যদের এই শ্লোকটী বলিলেন—

সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ মেরুসর্ষপয়োরিব।
সূর্যখদ্যোতয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

সাগর ও নদী, মেরু ও সরিষা, সূর্য ও জোনাকীর মধ্যে যে অলঙ্ঘনীয় পার্থক্য সন্ন্যাসী ও গৃহীর মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক্য বিদ্যমান। স্বামী আত্মানন্দ সংঘের সাধুগণকে ত্যাগভাবে উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেন, 'বাড়ীতে চিঠি লিখবে না। বাড়ীর চিঠি এলে, না পড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। তবে যদি মা থাকেন তাঁকে চিঠি লিখবে এবং তাঁর চিঠি পড়বে।'

একবার ঢাকার স্থানীয় ইডেন বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষয়িত্রীগণসহ স্থানীয় রামকৃষ্ণ মঠে আসেন। স্বামী আত্মানন্দ ব্রহ্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, 'এদের প্রসাদ দাও।' এত ছাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় তিনি অতিশয় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি ব্রহ্মচারীদের বলিলেন, 'অনূঢ়া মেয়েদের হাওয়ায় বেশীক্ষণ থাকবে না।' সাধুদিগকে সাবধান করিবার জন্য তিনি বলিতেন, "সন্ধ্যার পর শহরে থেকো না। রাত্রিকালে শহরের মনোহর চাকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখলে সংসারে মন আট্‌কে থাক্‌বে। সন্ধ্যার পূর্বেই কাজকর্ম সেরে নিয়ে আশ্রমে ফিরবে। আসন সাধুকে বাঁচায়। রাস্তায় চলবার সময় ডাঁয়ে-বাঁয়ে তাকাবে না। তাকালে সুদৃশ্য কুদৃশ্য দুইই চোখে পড়তে পারে। কুদৃশ্য দেখা সাধুর পক্ষে মহাপাপ। পায়ের সামনে দৃষ্টি রেখে চলবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যত্র যেতে ready (প্রস্তুত) হতে পার? যমের ডাক এলেও যেন যেতে পার। সাধু সর্বদা এইরূপ প্রস্তুত থাকবে। বীরের মত চলাফেরা করবে।

সাহেবদের দেখ না? মনে বীরভাব জাগ্রত থাকলে অসদ্ভাব আসতে পারে না। কীর্তনে কাঁদা ও ভূত দেখা প্রভৃতি মেয়েলী ভাবের লক্ষণ। অবতার অবতার করিস্! অবতার কি জানিস্? যাঁর ইঙ্গিতে সৌর-জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় হচ্ছে তিনি এই সাড়ে তিন হাত রক্তমাংসের শরীর ধরে এসেছেন!"

স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সম্বন্ধে স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "অত বড় আচার্য, অত বড় কবি আর আসে নি। গিরিশ বাবুর অধিকাংশ নাটক 'ভাবমুখে' লেখা। ভাবের তোড় এলে তিনি বলে যেতেন, আর দুই তিনটী লেখক তা লিখতেন। তিনি নিজে লিখতে পারতেন না। সেক্ষপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকে একটু দার্শনিক ভাব দেখা যায়, আর গিরিশ বাবুর নাটকের ছত্রে ছত্রে গভীর দার্শনিক ভাব।" সংঘের সাধুদের জীবনে অন্ততঃ কি কি পড়া উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী আত্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "খুব কম-পক্ষে মঠের নিয়মাবলী, আরাত্রিকস্তোত্রদ্বয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং গীতা।"

স্বামী আত্মানন্দের বিছানা সামান্য হইলেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তিনি সব সময় বিছানাটী পাতিয়া রাখিতেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বেলুড় মঠে দুপুর-বেলা স্বামীজী মাঝে মাঝে এসে আমার বিছানায় গড়াগড়ি দিতেন।" গুরু-বেদান্তবাক্যে স্বামী আত্মানন্দের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বলিতেন, 'গুরুবাক্যে ও বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস সাধু-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই উভয়ের মধ্যে গুরুবাক্যে বিশ্বাস অধিক চাই।' স্বামীজী এক বার তাঁহার তরুণ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম ও যোগের কোনটায় কে অনার্স নেবে?' কেহ বলিলেন ভক্তিতে, কেহ বলিলেন ভক্তি ও জ্ঞানে ডবল অনার্স, কেহ বলিলেন, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মে ট্রিপল্ অনার্স। সুকুল মহারাজ চিরকালই গম্ভীর ও অল্পভাষী ছিলেন। তিনি নীরব রহিলেন। অন্য এক গুরুভ্রাতা বলিলেন, 'সুকুল মহারাজ, কিসে অনার্স নেবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ও সবটাতেই আছে।' তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন; কারণ স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগী—গুরুর প্রতিবিম্ব।*

স্বামী আত্মানন্দ একটী পয়সাও সম্বল রাখিতেন না। এমন নিঃসম্বল সাধু বিরল দেখা যায়। একটী জামা, দুখানি কাপড়, একটী গেঞ্জী—এই ভাবে পরিধেয় বস্ত্র রাখিতেন। তাঁহার মতে সাধুর আসবাবপত্র যত কম হয় ততই ভাল। ঢাকা হইতে কাশী যাইবার সময় সামান্য চেষ্টায় তাঁহার পাথেয় সংগৃহীত হয়। দুর্গম বদ্রীনারায়ণ তীর্থযাত্রাও তিনি অল্প সম্বলে সারিয়া আসেন। তিনি বলিতেন, 'ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস থাকিলে সাধুর অর্থাভাবাদি অল্পায়াসে বিদূরিত হয়।' এক বার একজন হিন্দুস্থানী ঢাকা মঠে তাঁহার পায়ের কাছে একটী টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। সুকুল মহারাজ জনৈক সাধুকে বলিলেন, 'টাকাটা ঠাকুর-ঘরে দাও।' উক্ত সাধু তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ, টাকাটী ত আপনাকেই দিয়েছে, ঠাকুরকে নয়। এটী আপনি রাখুন। এক সময় কাজে লাগবে।' স্বামী আত্মানন্দ টাকাটী কোথায় রাখিবেন এবং কি ভাবে খরচ করিবেন এই ভাবিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

শঙ্করভাষ্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বলিতেন,

* উপরোক্ত ঘটনা স্বামী যোগীশ্বরানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ কর্তৃক কথিত।

অধিকাংশ সাধু শাস্ত্রজ্ঞানে…'অলকটপ্পা' অর্থাৎ পল্লবগ্রাহী। তিনি এক সাধুর কথা বলিতেন, যিনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভিক্ষাটন ও নিদ্রাদিতে যে সময় ব্যয়িত হইত তদ্ব্যতিরিক্ত সব সময় উক্ত সাধু শাস্ত্রপাঠে কাটাইতেন।

সাধুজীবনের প্রথমভাগে স্বামী আত্মানন্দ যখন বেলুড় মঠে ছিলেন তখন তাঁহাকে মঠের নানা কাজ করিতে হইত। কখনো শাস্ত্রাধ্যাপনা, কখনো ঠাকুরপূজা, কখনো বা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম। কিছু কাল রাত্রে তিনি কয়েক সের আটা মাখিতেন, ডলিতেন এবং রুটী বেলিতেন। আটার মাত্রা অধিক হওয়ায় পরে ভৃত্য নিযুক্ত হয়। স্নানান্তে তিনি রোজ এক অধ্যায় চণ্ডীপাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'শুদ্ধাচারে পৃথগাসনে একাগ্রমনে শাস্ত্রপাঠ করলে মনে অধিক ছাপ পড়ে। স্নান না করে, মলমূত্রত্যাগান্তে কাপড় না ছেড়ে, বা বিছানায় বসে অশুদ্ধ ভাবে শাস্ত্র পড়লে পূর্ণ ফল হয় না।' তিনি স্বীয় ব্যবহৃত বস্ত্রাদির গেরুয়া রঙটী নিজেই করিতেন। ভক্তদের সহিত সাধুদের অবাধ মেলামেশা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, 'ওতে সাধুভাব কমে যায়। ভক্তরাই সাধুদের দফা রফা করে দেয়।' ঢাকায় ঝুলনের সময় স্থানীয় ব্যবসায়িগণ কলিকাতা হইতে ঢপালী বায়না করিয়া লইয়া যাইতেন এবং নিজ নিজ বাড়ীতে গান করাইতেন। ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব। সুতরাং ঢপালীদের কৃষ্ণ-কীর্তন শুনিতে ভালবাসেন। ঢাকা মঠের কোন কোন সাধু মঠে ভক্তদের জন্য ঢপালীদের গান করাইতে চাহিলেন, কিন্তু স্বামী আত্মানন্দ মঠে তাহা হইতে দিলেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ কার্যোপলক্ষে অন্যত্র যাওয়ায় বেলুড় মঠের ভার কিছু দিন সুকুল মহারাজের উপর পড়ে। এক বার কোন সাধু মঠের একটী ঘরে (যেখানে সাধুরা থাকেন) স্ত্রীভক্তদের লইয়া বসান ও আলাপ করেন। সুকুল মহারাজ তাহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান এবং সাধুটীকে বলেন, 'তুমি আজ একটী গর্হিত কাজ করলে, মঠের একটী নিয়ম ভাঙ্গলে।' গুরুভ্রাতাদের কোন অন্যায় দেখিলে তিনি সত্যের অনুরোধে বলিয়া ফেলিতেন। পরোপকার সম্পর্কে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, 'কারো ভাল করতে পার আর নাই পার, কারো মন্দ করো না। অপরের ভাল করবার শক্তি বা সুযোগ সকলের থাকে না। কিন্তু অনিষ্ট করার শক্তি বা সুযোগ অনেকেই পায়।' তিনি সাধুদের মেয়েলী ভাব আদৌ পছন্দ করিতেন না, manly (পুরুষ) ভাব খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন পুরুষভাবের, বীরভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তিনি যখন স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতাবলী পড়িতেন বা পড়াইতেন তাহা শ্রবণযোগ্য ছিল। তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ খুব বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি মঠের কোন কোন সাধুকে স্বামীজীর ইংরেজী বইগুলি ভাল করিয়া পড়িতে শিখাইতেন। তিনি নানা পূজায় অভিজ্ঞ ছিলেন। মঠে ঠাকুরের জন্মোৎসবে বা বিশেষ পূজা উপলক্ষে তিনি পূজক ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তন্ত্রধারক হইতেন। বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল তিনি ঠাকুরের নিত্য পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে পূজাকার্যে নিযুক্ত করেন। তাই তিনি বলিতেন, 'আমি কি আর ঠাকুরের পূজা করতে পারি ? ঠাকুরের এক পার্ষদ আমার হাত ধরে পূজায় বসিয়ে দেন। তাই করছি। ঠাকুরের পূজা খুব শক্ত।' ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তিনি মহাপাপ জ্ঞান করিতেন। তিনি সংঘের সাধুদের বলিতেন, "তাঁরা ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, তাঁদের নিন্দা করলে ঠাকুরকেই নিন্দা করা হয়।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের আদর্শিক রূপ *

শ্রীনারায়ণচন্দ্র রায়

অতীত ও বর্তমানকে না জানলে কোন কিছুর ভবিষ্যৎকে ঠিক জানা যায় না। বিশেষ করে কোনও একটা জাতি বা সমাজের মূল ভাব-ধারাটি কি সেটা ঠিক্ ঠিক্ ধরতে না পারলে তার লক্ষ্য বা আদর্শ কি তা বোঝা যায় না। জাতি-বিশেষের মূল ভাবধারাকে জানতে হ'লে তার ইতিহাস ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখতে হয়। কিন্তু এ কেবল অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। মহাকবি বা মহাপুরুষরাই সেরূপ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ এঁদেরই অন্যতম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে দেখতে পেয়েছিলেন,—অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় সমাজ এক বিরাট ও মহান্ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি দেখেছিলেন ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের সংস্কৃতি তাকে বিধাতার এক বিশেষ অভিপ্রায়-সাধনের পথে নিয়ে চলেছে এবং সৃষ্টিকর্তার ঐ মঙ্গল অভিপ্রায়সাধনই তার লক্ষ্য, তার আদর্শ। বিভিন্ন কবিতা এবং একাধিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা সেই কথাই কবির কাছ থেকে শুনেছি। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তিনি বলেছেন—

"বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরমসভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই; ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্ত স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়; ইহাদিগকে একটা মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক না কেন, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের।"

'স্বদেশী সমাজে' তিনি বলেছেন—

"বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন, ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।" এইখানে আমরা দেখ্‌তে পাই ভারতীয় সভ্যতার মূলে যে ভাবটি রয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথের কাছে সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার ফলে তিনি তাঁর সুদূর-প্রসারী দূরদর্শিতা-সহায়ে ভাবী ভারতের সুমহান কর্তব্যটি কি তা দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, নিখিল বিশ্বে ভারতের দায়িত্বই যে সবচেয়ে বড় তা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। তিনি 'সমস্যাতে' সেই কথাই বলেছেন—

"ভারতবর্ষে যে কেহ আছে, যে কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব। ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায়, স্বভাবে, আচরণে, ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট। সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের

* গত ২০শে বৈশাখ, বর্ধমান সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে। কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধির দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা, উচ্চনীচ আত্মপর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা করিয়া।"

রাজ্যবিস্তারের জন্য, ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য অথবা বাণিজ্যের জন্য এই ভারতবর্ষে যুগে যুগে দলে দলে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে। এখানে আর্য এসেছে, অনার্য এসেছে; গ্রীক এসেছে, শক এসেছে, হূন এসেছে; আবার পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে। এমনি করে কত যে জাত এসেছে তার ঠিক্ নেই। কিন্তু সকলেই আসমুদ্র-হিমাচলবিস্তৃত এই ভারতের মহাসভ্যতার মধ্যে মিশে গিয়েছে। তাদের আর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কবি তাদের এই আসার মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পেয়েছেন। তিনি দেখছেন তারা যেন বিধি-নির্দিষ্ট হয়েই ভারতীয় সভ্যতার পুষ্টি-বিধানের জন্য ভারতে এসেছে। 'ভারততীর্থ' কবিতায় সেই কথাই তিনি বলেছেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক, হূনদল, পাঠান, মোগল
একদেহে হ'ল লীন।"

কবি দেখছেন ভারতবর্ষের উপর যেন বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ রয়েছে। কেন না ভারতবর্ষ তার শ্রেষ্ঠ কাজের দায়িত্ব-ভার আপন স্কন্ধে গ্রহণ করেছে। 'বিশ্বদেব' তাই পূর্বগগনে আবির্ভূত হয়েছেন। ভারতে তিনি পদার্পণ করবেন। 'বিশ্বদেব' কবিতায় সেই কথাই কবির কাছে শুনতে পাই। কবি যেন বিশ্বদেবকে আবির্ভূত হ'তে দেখেছেন। তাই বল্‌ছেন—

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
* * *
নয়ন মুদিয়া ভাবী কাল পানে
চাহিনু শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।"

একদিন ভারত ইংরেজের পদানত হয়ে পরাধীনতার যে অসহ গ্লানি ভোগ করেছিল, সহস্র প্রকারে যে নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করেছিল, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিধাতার কল্যাণ হস্তের ইঙ্গিত দেখ্‌তে পেয়েছেন। ভারতের ঐ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই মহা-মানব পরিপূর্ণতার পথে মহাভারতের অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। ইংরেজ না এলে ভারতের কর্তব্য অসমাপ্ত রয়ে যেত; বিশ্বদেবের পূজা সারা হ'ত না। 'পূর্ব পশ্চিমে' সেই কথাই যেন শুন্‌তে পাই—

"সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত।"

ভারতে ইংরেজের আগমন বিধাতার অভি-প্রায়ক্রমে হয়েছিল বলেই ভারত মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিকের আঘাত সহ্য করতে পারে নি। তাই 'শর্বরী পোহাতে' 'বণিকের মানদণ্ড' অতিসহজে 'রাজদণ্ড রূপে' দেখা দিয়েছিল।

আমাদের ইচ্ছা না থাক্‌লেও বিধাতার ইচ্ছাকে বাধা দেবার ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন,—

"যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে তাড়াইয়া দিব আমাদের এমন কি অধিকার আছে? বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে?..............ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে আজ এই ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে।"

ইংরেজের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগ সাধিত হবে; পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ঐক্য সংঘটিত হবে। কবি তা দেখতে পেয়েছেন। তাই 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছেন—

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।"

বিধাতার এই শুভ অভিলাষকে কিন্তু ভারতবাসী বুঝতে পার্‌লে না। তারা বুঝতে পারলে না তাদের কর্তব্য কী, তাদের আদান-প্রদানের বস্তুটা কী। ফলে সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ইংরেজকে অনুকরণ করতে গিয়ে তারা নিজেকে হারিয়ে ফেললো। পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রবল সংঘাতে তারা নিজের ভালমন্দ কর্তব্যাকর্তব্য ভুলে গিয়ে নিজের উপর শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেললো। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে নিজের দেশ জাতি বা ধর্মের আদর্শ ভুলে গেল। ফলে বিলিতী পণ্ডিতের কাছে বিলিতী কায়দায় বিলিতী ধর্ম শিখ্‌তে লাগ্‌ল; বিলিতী 'পলিটিক্‌স' শিখলে; শিখলে 'পলিটিক্যাল ফ্রীডম্‌ই' জাতির চরম লক্ষ্য; শিখলে দেশের স্বার্থের খাতিরে মিথ্যা কথা বলা, অন্যায় করা, অধর্ম করা দেশপ্রেমের পরিচায়ক। কবি আত্মঘাতী সভ্যতার এই অন্ধ অনুকরণ থেকে বাঁচাবার জন্য পাশ্চাত্যের মেকী স্বদেশ-প্রেম ও রাজনীতির ভ্রূকুটি-কুটিল আবর্ত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাতে এক জায়গায় নিখিলেশের মুখে বলছেন—

...."একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলিভরা মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেষ্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান,—এই সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে, এ ভার কি কম? আর এ কী প্রতিদিন ওদের বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপর যারা ধর্মকে মান্‌ছে না আমি বলি তারা দেশকেও মানছে না।"

ইংরেজী-শিক্ষিত তরুণ ভারতবাসী পাশ্চাত্য গুরুর কথা শুনে "জিগীষার অভাব এবং সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ" বলে ভাবলো; 'পলিটিক্যাল ফ্রাডম্‌'কেই জাতির চরমাদর্শ ভেবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে মুক্তির উপায় বলে মনে করলো। রবীন্দ্রনাথ তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদনের জন্য তাই বলেছিলেন—

"ইউরোপ বলে জিগীষার অভাব এবং সন্তোষই জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা ইউরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইতে পারে বটে; কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি।

যে লোক জাহাজে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহার পক্ষে সেই বিধান নহে।”

‘নববর্ষে’ আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন,—

“এই যে কর্মের বাসনা, জন-সংঘের আঘাত ও উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রহ্মের পথে, ভয়হীন, শোকহীন মৃত্যুহীন, পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। ইউরোপ যাহাকে ফ্রীডম্ বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ।”

পাশ্চাত্যের চরমাদর্শ স্বাধীনতা বা ‘ফ্রীডমের’ কথায় বলেছেন,—

“এই দানবীয় ‘ফ্রীডম্’ কোন কালে ভারতবর্ষের তপস্যার বিষয় ছিল না এখনও আধুনিক কালের ধিক্‌কার সত্ত্বেও এই ফ্রীডম্ আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর, বিশালতর যে মহত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্ন চরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।”

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে আবার ভাবী কালের ভারতে ফিরে আসবে, কবি তা বিশ্বাস করেন। তিনি ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়’ বলেছেন—

“হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; সেজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি হিন্দু সভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এই আশা ত্যাগ করিবার নহে।”

প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ আবার ভারতের বুকে ফিরে আসবে, আর সেই সঙ্গে বিলাস-নিমগ্ন অনাচারী, অবিশ্বাসী বর্তমান ভারতের জীবনাদর্শ মহাকালের অতল-গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যাবে; কেন না মহামানবের পূজা করবার অধিকার, বিশ্বদেবের অর্চনা করবার ক্ষমতা একমাত্র প্রাচীন ভারতেরই আছে। সেই কথাই ‘নববর্ষে’ কবি বলেছেন,—

“জয় হইবে! ভারতবর্ষের জয় হইবে! যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্বাক তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, তাহারা বর্ষে বর্ষে “মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা”। তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনও সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—“পিতামহ আমাদিগকে মন্ত্র দাও।”

তিনি কহিবেন—“ওঁ ইতি ব্রহ্ম।”

তিনি কহিবেন—“ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।”

তিনি কহিবেন—“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন
বিভেতি কদাচন।”

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের plain living and high thinking-এর আদর্শকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি চান ভারতবাসী যেন পাশ্চাত্যের অনুকরণ ক’রে এ আদর্শ নষ্ট না করে। তাই সমগ্র ভারতবাসীকে বলেছেন,—

“কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তি মদ-মত্ত ঐ বণিক্ বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ-সম্মুখে

শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্য মুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তারা ; তব শ্রেষ্ঠধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক তাহা ঘরে
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়।
তারি কাছে অভিভূত হ'য়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়, স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ কর চিত।"

প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ সেটা যাতে আমরা ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারি আমাদের জাতীয় জীবনে যাতে সেটা কার্যকর করতে পারি তার জন্য সুস্পষ্ট ভাবে তিনি আমাদের চোখের সামনে সেই আদর্শকে ধরে দিয়েছেন। 'শিক্ষা' কবিতার মধ্যে ভারতের শিক্ষার কথা ও আদর্শের কথা দুইই জানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তাতে বলেছেন—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহে করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।"

এই কবিতায় আমরা ভারতের আদর্শ রাজা, আদর্শ বীর, আদর্শ কর্মী ও আদর্শ গৃহীর পরিচয় পেলাম। আমাদের মধ্যে কর্মী, গৃহী, বীর যে যাই হোক্ না কেন, এ আদর্শ অনুসরণ করলে এ মর্তভূমি দুদিনেই স্বর্গে পরিণত হবে। আমাদের দেশে দৈন্যকে কেমন ক'রে বড় করা হ'য়েছে, সম্পদকে কেমন ক'রে লক্ষ্মী-শ্রী দেওয়া হ'য়েছে সে কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই কবিতায়।

"ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছো মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব সুখে দুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা নিজত্ব হারিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে গিয়েছিলাম। তার ফলে আমরা আমাদের ঐক্যের সেই মহামন্ত্র, মহাসাম্যবাদের ভিত্তিস্বরূপ সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র ভুলে গিয়েছিলাম। ভারতবর্ষে বিধাতা ঐ মন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা ক'রে আসছেন সেই কোন্ সুদূর অতীত হ'তে। আমাদের দোষে সে মন্ত্র হারিয়ে আমরা বিধাতার অভিশাপ কুড়িয়েছিলাম। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলনের ফলে অভিশাপের সে গ্লানি ধুয়ে যাবে। কিন্তু অনুকরণের দ্বারা সে মিলন হ'বে না ; আদান-প্রদানের দ্বারাই সে মিলন ঘটা সম্ভব। এই আদান-প্রদানের বস্তুটি কি অর্থাৎ পাশ্চাত্যকে কি দিতে হবে আর পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কি নিতে হবে আমরা ভারতবাসীরা তা বুঝিনি। তাই মহাভারতবর্ষ গঠনের একটা অংশ বাকি রয়ে গেছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি 'শিক্ষার মিলনে' বলেছেন—

"পশ্চিম মহাদেশ বাহ্যবিশ্বে মুক্তির সাধনা করছে ; সেই সাধনা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম রোগ-দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা। এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর পূর্ব মহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই

হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব পূর্ব-পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তাহ'লে উভয়েই ব্যর্থ হবে। তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষদ দিয়ে গেছেন,—

"বিদ্যাং চাবিদ্যাং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥"

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—এইখানে বিজ্ঞানকে চাই, ঈশাবাস্যমিদং সর্বং—এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা ঋষি বলেছেন। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত ও নির্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।"

আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের অভাব ঘটেছে অবিদ্যার। আমরা অবিদ্যাকে অগ্রাহ্য করেছি। তার ফলে কারও কারও বিদ্যালাভ হলেও অধিকাংশই ব্যর্থতাকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। ছাদে উঠ্‌তে হ'লে সিঁড়ির দরকার। সিঁড়িকে অগ্রাহ্য করে ছাদে উঠ্‌তে চাইলে ওঠা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হ'য়ে ওঠে না। যাদের ভাগ্যে বা ও-জিনিষটি হ'য়ে ওঠে তাদের অনেকটা মনুষ্যনীতি-বিরুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশ আজ ছাদের কথা ভুলে গিয়ে সিঁড়িকেই বড় ক'রে তুলেছে। তাদের শক্তিকে ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি করে সেইখানেই অপচয় করছে। তাই ছাদে ওঠা আর তাদের হচ্ছে না। ছাদে ওঠাই যে চরম লক্ষ্য বা চরম উদ্দেশ্য তা আমরা জানি কিন্তু তার জন্য যে সিঁড়ির দরকার তা আমরা ভুলে গিয়েছি। তাই পাশ্চাত্যের কাছে সিঁড়িতে ওঠা আমাদের শিখতে হবে, আর সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যকে শেখাতে হবে সিঁড়িটা চরম বা পরম লক্ষ্য নয়; ওটা উপলক্ষ্য মাত্র। অবিদ্যা বড় নয়, পরন্তু বিদ্যালাভের উপায় মাত্র। বিদ্যালাভ করে অমৃতের অধিকারী হওয়াই সকলের চরম লক্ষ্য। এইটিই আজকের দিনে পাশ্চাত্যের প্রতি ভারতের বাণী। রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন—

"আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ব ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করুক। তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। ভারতবর্ষ সেই অতিথিশালায় আজকের দিনে তার যা বাণী তা পরিবেশন করবে। সেই বাণীই হচ্ছে মহামানবের পূজার মন্ত্র, আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষা-মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলনে' সে বাণীটি কি তা বলেছেন,

"আমাদের শিক্ষালয়ের শিক্ষামন্ত্রটি এই :—
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

একদিন কোন্ সুদূর অতীতে সামগান-মুখরিত শান্ত তপোবন-তরুতলে অজিনাসনে বসে প্রাচীন ভারত যে মন্ত্রে মহামানবের বন্দনা-গান করতেন, যে মন্ত্রে বিশ্বদেবকে যজ্ঞবেদীমূলে আহ্বান ক'রে আনতেন সেই মন্ত্রেই আবার ভাবী কালের ভারত নরদেবতার পূজা করবে, সেই মন্ত্রেই প্রেম-পুলকিত আবেগাকুল হৃদয়ে গদগদকণ্ঠে সে বল্‌বে,

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

সে বল্‌বে,

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে নবারুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃশ্যই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। পূর্ব সাগরতীরে মহামানবের পূজার আয়োজন চলছে, যজ্ঞবেদী হ'তে ধূমোদ্গিরণ হচ্ছে। এ মহাযজ্ঞের প্রথম ঋত্বিক হচ্ছেন আমাদের আচার্য রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা ভারতের যে আদর্শ রূপ দেখলাম সেই মহাভারতের মৃত্তিকা মহামানবের পূত চরণরেণুস্পর্শে পবিত্র, তার আকাশ-বাতাস বিশ্বদেবের মঙ্গলবিজয়শঙ্খের নির্ঘোষে নিনাদিত। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও

"হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে
উদারছন্দে পরমানন্দে
বন্দনা করি তাঁরে।"

নিবেদন

শ্রীরাসমোহন ভট্টাচার্য

ওগো আমার সাথি!
ওগো আমার প্রিয়!
বিশ্ব যদি নিঃস্ব চোখে চায়,
চরণে ঠাঁই দিয়ো।

হের্‌ব যবে প্রলোভনের মুখ
রিক্তহাতে ফিরিয়ে দেওয়া চাই
স্বার্থ এসে বস্‌লে জুড়ে বুক
তাহার মুখে ছিটিয়ে দিয়ো ছাই।

দুঃখ যদি রুক্ষবেশে আসে
বুঝ্‌তে দিয়ো তোমার কৃপার দান।
কলুষ যদি পুণ্যহাসি হাসে
পদ্ম-হাতে অভয় করো দান।

জ্ঞানের প্রদীপ যদিই নিভে যায়
জ্ঞানের স্বরূপ! হয়ো স্বপ্রকাশ।
বিশ্বজয়ী রূপের জোছনায়
আমার হিয়ার তিমির করো নাশ

হিংসা নিন্দা প্রবঞ্চনার পাশ
ছিন্ন করো হেনে নয়ন-বাণ।
কামের গলে লাগিয়ে দিয়ো ফাঁস
ওগো আমার সর্বশক্তিমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্যানফ্রান্সিস্‌কো (উত্তর ক্যালিফর্নিয়া) বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত জুন মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতা কয়টি প্রদত্ত হইয়াছে: (১) ঈশ্বর-প্রেমের অনুশীলন, (২) চিন্তার শক্তি, (৩) হিন্দু মনোবিজ্ঞান, (৪) বিজ্ঞান, দর্শন ও রাহস্যিক তত্ত্ব, (৫) আত্মার শক্তি, (৬) শ্রীবুদ্ধের পুণ্য-জীবন, (৭) তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করিতে চাও? (৮) অলৌকিক বিজ্ঞান।

বক্তৃতাগুলি প্রদান করেন অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী। ৪নং এবং ৬নং বক্তৃতা দুইটি প্রদান করেন বোষ্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দজী। এতদ্ব্যতীত সোসাইটির বক্তৃতাভবনে স্বামী অশোকানন্দজী প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সদস্য ও শিক্ষার্থিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন এবং বেদান্ত-দর্শন বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা—কিছু দিন পূর্বে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী পূর্ববঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া ষোলটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মহেশ প্রাঙ্গণে "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ ও শিক্ষা," "যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ", "এ যুগের নারীগণের কর্তব্য" এবং "এ যুগের ছাত্রগণের কর্তব্য", সোনারগাঁ (ঢাকা) রামকৃষ্ণ আশ্রমে "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ", "ছাত্রসমাজের আদর্শ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ", "ত্যাগ ও সেবা", এবং "ভগবান বুদ্ধ", নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে "পুনর্জন্মবাদ", কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, মহিলা সম্মেলন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও কলমা কালীবাড়ীতে যথাক্রমে "সেবাধর্ম", "ভারতীয় নারীর আদর্শ", "শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মের মূলনীতি-সমূহ", এবং "ভারতের যুবসম্প্রদায়ের বর্তমান কর্তব্য", ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠে "বর্তমান জগতে ধর্মের স্থান", স্থানীয় আনন্দ আশ্রমে "বর্তমান-যুগোপযোগী নারী-শিক্ষা কি?" এতদ্ভিন্ন কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কালচার ভবনে "বর্তমান সময়ে আমাদের কর্তব্য"—সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতাগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং সর্বত্রই শ্রোতৃবর্গ দলে দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

রহড়া (খড়দহ) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম—বিগত ২৭শে আষাঢ় এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম-এ মহাশয় 'ছাত্রধর্ম'সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তা একটি সুন্দর ভাষণে বলেন—ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। দেহ ও মনে শক্তিসঞ্চয় পূর্বক দেশ ও জাতিরক্ষা প্রত্যেকের জীবনাদর্শ হইবে—ইহাই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহান অভিপ্রায়।

সিঙ্গাপুর (মালয়) রামকৃষ্ণ মিশন—(১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী)—আলোচ্যমান বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্যাবলী

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উত্তরোত্তর প্রসার হইতেই মিশনের জনপ্রিয়তা সুস্পষ্ট। মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ বালক বিদ্যালয়ে ১৩৪ জন বালক শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে ৫৩ জন বালক অবৈতনিক। মিশন বালিকাদের শিক্ষার দিকেও বিশেষ অবহিত। মিশনপরিচালিত সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ে ১৩৮ জন বালিকা শিক্ষালাভ করে। ইহাদের মধ্যে ২১ জন অবৈতনিক। সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও ছাত্রী-দিগকে সঙ্গীত ও সূচীশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭৯ জন ছাত্র আছে। মিশনপরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে ১২৫ জন ছাত্র পাঠাভ্যাস করে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাপ্তবয়স্ক। শিল্পশিক্ষাদানেও মিশন সবিশেষ যত্নপর। মিশনপরিচালিত শিল্প-বিদ্যালয়ে দর্জির কাজ এবং কাঠের কাজ শেখান হয়। ৪০ জন বালক প্রথমোক্ত এবং ৬ জন বালক শেষোক্ত শিক্ষালাভ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে ধর্মশিক্ষা-দানেরও সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্মালোচনাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদেশ্বরী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য ধর্মগুরুগণের জীবন আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বালক ও বালিকাগণ পৃথক্‌ভাবে সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান করে। তাহাতে তাহারা বিভিন্ন বিষয়ে রচনাপাঠ ও আলোচনা করিয়া থাকে। নিয়মিত শরীর-চর্চা ও ক্রীড়া-কৌতুকেও বালক-বালিকাদের উৎসাহ লক্ষিত হয়।

মিশনপরিচালিত অনাথালয়ে ৭৭ জন অনাথ বালককে আশ্রয় দান করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের বালকগণ মিশনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বালক মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই অনাথ বালকগণ শিল্প-শিক্ষাও লাভ করে। ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী মিশনের অনাথালয়ের জন্য ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেও ১০০০৲ দিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদেশ্বরী দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মগুরুর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, দীপাবলী প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বামদেবানন্দজী সিঙ্গাপুর ও তদ্‌বহির্ভূত বিভিন্ন স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও অন্যান্য উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের লাইব্রেরী ও পাঠাগারে ২৩টি সাময়িক পত্র ছিল। মিশনের উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারকল্পে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। শিল্পবিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করিতেও অর্থের বিশেষ আবশ্যক। বর্তমান অনাথা-লয়ের ডর্মিটরী নির্ম্মাণও বিশেষ দরকার। আশা করা যায় সহৃদয় জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের বহুধাবিস্তৃত জনকল্যাণকর কার্যাবলীর প্রসার ও উন্নতিকল্পে অর্থানুকূল্য করিবেন। আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের আয় ৩০,৩৯০·৫৩ ডলার এবং ব্যয় ২৪,৩২০·৫৩ ডলার।

মায়লাপুর (মাদ্রাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দাতব্য ঔষধালয়—(**১৯৪৮ সনের কার্য-বিবরণী**)—দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহরের মায়লাপুরে ১৮৯৭ সনে পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দজী কর্তৃক এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বহুবিধ কর্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোগী নারায়ণদের সেবার জন্য ২৩ বৎসর পূর্বে ১৯২৫ সনে মঠ কর্তৃক এই দাতব্য ঔষধালয় খোলা হয়। প্রথম বর্ষে মাত্র ৯১০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা লাভ করেন, কিন্তু স্থানীয় বিশিষ্ট

ব্যক্তিগণের উৎসাহ-পূর্ণ সাহায্যে এবং মঠের সাধুদের অক্লান্ত চেষ্টায় এক্ষণে ইহা স্থানীয় শহরবাসীদের চিকিৎসালাভের একটি বড় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে মোট ৭১,০২৭ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়; তন্মধ্যে য়্যালোপ্যাথিক বিভাগে ছিলেন ৫৪,৯১৯ জন এবং হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ১৬,১০৮ জন। ইহাদের মধ্যে ৬১২ জন অস্ত্রোপচারের রোগী সহ মোট ২০,১৫৫ জন নূতন রোগী।

যুদ্ধোত্তর কালে দেশের সাধারণ আর্থিক দৈন্যের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজের প্রসার অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইতেছে। বর্তমানে এই বিভাগটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মাসে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা আয় হয় এমন একটি স্থায়ী ফণ্ড এবং সার্জিক্যাল, প্যাথোলজিক্যাল, মেডিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল ও E. N. T. বিভাগের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামের জন্য নগদ টাকা কিংবা ঐ সমস্ত দ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (বিদ্যার্থিভবন)—১৮নং যদুলাল মল্লিক রোডে—অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৮ সনের ষষ্ঠবার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইলেও আশ্রমটি ইতোমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনাব্যয়ে আহার, বাসস্থান ইত্যাদি দিয়া কলেজের শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়। কয়েক জন ছাত্রের নিজব্যয়ে থাকিবার বন্দোবস্তও আছে। কলেজের শিক্ষার অপূর্ণত্ব দূর করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির যথার্থ বিকাশে সহায়তা করাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, শারীরিক প্রভৃতি বিষয়ে যাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয় সেই দিকে কর্তৃপক্ষ বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

আলোচ্যমান বর্ষে মোট ৪৭ জন ছাত্র আশ্রমে স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ৩৪ জনকে সম্পূর্ণ বিনাব্যয়ে এবং ৫ জনকে আংশিক ব্যয়ে রাখা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফলও আশাতীত সন্তোষজনক; ৫ জন ছাত্র ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং এক জন বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীর সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১২ জন ছাত্র ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১১ জন পাশ করিয়াছে এবং এক জন সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী। স্থানাভাবে বহু ছাত্রকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে। অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আশ্রম কর্তৃপক্ষ আশ্রম-গৃহটিকে তিনতলা হইতে পাঁচতলায় পরিণত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিলিফ এবং শিক্ষাবিভাগ হইতে মোট ২২,১৩০৲ এককালীন দান করিয়াছেন। উক্ত নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৩২০০০৲ টাকার প্রয়োজন। বিদ্যার্থিভবনের গত বৎসরের উদ্বৃত্ত সমেত বর্তমান বৎসরের মোট আয় ২১,৬৪৮/৯ এবং ব্যয় ২১,২১৬৻৬।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

For Thinkers on Education—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। মায়লাপুর (মাদ্রাজ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে অধ্যক্ষ কর্তৃক উক্ত মঠের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন সাইজ, ২৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী কর্তৃক ১৮৯৭ হইতে ১৯১১ সন পর্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং 'ব্রহ্মবাদিন্', 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'মেসেজ্ অব্ দি ইষ্ট,' 'বেদান্ত-কেশরী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত শ্রাবণ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোসাইটি-ভবনে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী এবং স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং পরে রামরসায়ন কীর্তন সম্প্রদায়ের সুমধুর 'তাড়কা-বধ' পালাকীর্তন শ্রোতৃবর্গকে আনন্দ দান করে। শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-সংকলয়িতা ভক্ত মহেন্দ্র গুপ্তের (শ্রীম) জীবনী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা' এবং শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'শিবানন্দ-বাণী' (২য় ভাগ) ধারাবাহিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা-পুনর্গঠন—"শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং সামাজিক ও নাগরিক বোধ জাগ্রত করিয়া তাহাকে সর্বাত্মক শিক্ষাদান করাই প্রাথমিক (নিম্ন বনিয়াদী) শিক্ষাদানের আদর্শ হওয়া উচিত।" প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা-পুনর্গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা ও তৎসম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত স্কুলশিক্ষা কমিটি সরকারের নিকট যে সুপারিশ পেশ করিয়াছেন, তাহাতে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রাথমিক

শিক্ষায়তনে প্রবেশের সর্বনিম্ন বয়স স্বাভাবিক অবস্থায় ৬ বৎসর হইবে এবং বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ৫ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কমিটি সহশিক্ষা-প্রবর্তনের এবং পাঠ্যতালিকা-হ্রাসের সুপারিশ করিয়াছেন। অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষা, খেলাধুলা, সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধ, শিল্পসৃষ্টি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকবোধ সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্রে নিষিদ্ধ না হইলে প্রাথমিক শিক্ষায়তনসমূহে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত হইলে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা-গ্রহণের সুবিধার জন্য একটি জলপানি পরীক্ষার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১১ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে প্রবেশ করিয়া ছয় বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কিশোর ছাত্রদের দক্ষতা, মনোভাব ও প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সমতা রাখিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করাই মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। আরও বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইবে না।

উচ্চ বনিয়াদী শিক্ষাগ্রহণের সময় ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা না করা ছাত্রদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু হাই স্কুলে শিক্ষা-গ্রহণের সময় বাংলা ও ইংরেজী অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে সহ-শিক্ষা অনুমোদন করেন নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা-গ্রহণ সমাপ্ত হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার সম-মর্যাদাসম্পন্ন একটি পরীক্ষার সুপারিশ করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পরিবতন—স্কুলসমূহে পুনঃ পুনঃ পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন এবং স্কুলের বালক-বালিকাদিগকে পাঠ্যপুস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক অনাবশ্যক পুস্তক ক্রয় করিতে বাধ্য করার প্রথার প্রতি গবর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের বর্তমান নীতির পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতে চাহেন যে, নিয়মানুযায়ী প্রতি পাঁচ বৎসরে এক বারের অধিক কোনও ক্লাশের পাঠ্য পুস্তক পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। অর্থ-পুস্তক ও 'মেড ইজী' পুস্তক ব্যবহারে ছাত্র-দিগকে নিরুৎসাহিত করাও গবর্নমেণ্টের অভি-প্রায়। সরকারী সাহায্য সংক্রান্ত নূতন নিয়মে সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে, ক্লাশে শিক্ষার উন্নতি-সাধনকল্পে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত মেলামেশায় উৎসাহ দিবার জন্য ক্লাশের আয়তন ক্ষুদ্র করা হইবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইবে।

সরকারী নীতি কঠোর ভাবে পালন করার জন্য এবং পাঠ্য ও র‍্যাপিড রিডিং-এর অত্যাবশ্যক পুস্তক ছাড়া আর কোনও পুস্তক ক্রয় করিতে যাহাতে বাধ্য না করা হয় তাহা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার সম্প্রতি সরকারী এবং সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের হেডমাষ্টার ও হেড-মিষ্ট্রেসগণকে নির্দেশ দিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতের নূতন ডাক-টিকিট—বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক চিত্রাদি সম্বলিত ভারতের নূতন ডাক-টিকিটসমূহ স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৯) সাধারণ্যে প্রচার করা হইবে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই ডাক-টিকিটগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন ঐগুলির মূল্যের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং ১৫ টাকা মূল্যের একটি নূতন টিকিট এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দুই পয়সার টিকিটে মহেঞ্জোদারো বৃষের স্থলে কোণারক অশ্ব স্থান পাইয়াছে এবং ছয় পয়সার টিকিট বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাঁচী স্তূপের চিত্র সম্বলিত ডাক-টিকিটের মূল্য দশ পয়সার স্থলে তিন আনা করা হইয়াছে।

১৫ টাকার ডাক টিকিটে পালিতানার শত্রুঞ্জয় মন্দিরের চিত্র আছে। ইহা পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত একটি জৈন মন্দির। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। ডাক-টিকিটগুলির মূল্য ইংরেজী ও হিন্দিতে লেখা আছে এবং বিভিন্ন স্থানে ভারত ও ডাক-টিকিট কথা দুইটিও লিখিত আছে।

নূতন ডাক-টিকিটগুলির পরিচয়

মূল্য এক পয়সা—অজন্তা-দৃশ্য, বিখ্যাত অজন্তা গুহার একটি স্তম্ভ হইতে গৃহীত চিত্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী। নীল ধূসর বর্ণ।

মূল্য দুই পয়সা—কোণারক অশ্ব, উড়িষ্যার কোণারকের সূর্য-মন্দিরের ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন। ১২৩৮-১২৬৪ খৃষ্টাব্দ। লোহিত পিঙ্গল বর্ণ।

মূল্য তিন পয়সা—ত্রিমূর্তি, বোম্বাই-এর নিকটস্থ এলিফেণ্টা গুহায় ক্ষোদিত সুবৃহৎ শিব-মূর্তি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী। উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ।

মূল্য এক আনা—বোধিসত্ত্ব, লক্ষ্ণৌ প্রাদেশিক যাদুঘরে রক্ষিত বোধিসত্ত্ব সিংহনাদ লোকেশ্বরের প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নীলাভ সবুজ বর্ণ।

মূল্য দুই আনা—নটরাজ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিরুভেলাঙ্গাড়ুতে রক্ষিত নৃত্যপরায়ণ শিবের ব্রোঞ্জ মূর্তির প্রতিচ্ছবি। ১১০০ খৃষ্টাব্দ। লোহিত বর্ণ।

মূল্য তিন আনা—সাঁচী স্তূপের পূর্বদ্বার, মধ্য ভারতের সাঁচী স্তূপের চারিটি দ্বারের একটির প্রতিচ্ছবি। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়—প্রথম শতাব্দী। কমলা বর্ণ।

মূল্য সাড়ে তিন আনা—বুদ্ধগয়া মন্দির, ভগবান তথাগতের বৌদ্ধত্বলাভের স্থানটিতে নির্মিত স্মারক-মন্দির। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী। পিঙ্গলাভ নীল বর্ণ।

মূল্য চারি আনা—ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যার মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রতিচ্ছবি। ১০০০ খৃষ্টাব্দ। রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণ।

মূল্য ছয় আনা—গোল গম্বুজ—বিজাপুর, মহম্মদ আদিল শাহের সমাধিসৌধ। ইহার গম্বুজ পৃথিবীর বৃহত্তম গম্বুজগুলির অন্যতম। ১৬২৬-১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। নীল-লোহিত বর্ণ।

মূল্য আট আনা—কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির, বুন্দেলখণ্ডের খাজুরাহোর সুবিখ্যাত মন্দির। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। ফিকা সবুজ বর্ণ।

মূল্য বারো আনা—স্বর্ণ মন্দির—অমৃতসর, আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্নির্মিত। ফিকা নীল বর্ণ।

মূল্য এক টাকা—বিজয়তোরণ—চিতোরগড়, মর্মরপ্রস্তরনির্মিত নয়তলা তোরণ। ১৪৪২-১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ। কেন্দ্রস্থল—গভীর বেগুনী, চারিধার—গাঢ় সবুজ বর্ণ।

মূল্য দুই টাকা—লাল কেল্লা—দিল্লী। সম্রাট সাজাহান কর্তৃক ১৬৩৮-১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে

নির্মিত। কেন্দ্রস্থল—গাঢ় লাল; চারিধার—বেগুনী বর্ণ।

মূল্য পাঁচ টাকা—তাজমহল—আগ্রা, সম্রাট সাজাহান কর্তৃক তদীয় পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধরূপে নির্মিত পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য সমাধি-মন্দির। ১৬৩১-১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ। কেন্দ্রস্থল—গাঢ় সবুজ; চারিধার—রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণ।

মূল্য ১০৲টাকা—কুতুব মিনার—দিল্লী। খৃষ্টীয় ১১-১২শ শতাব্দীতে নির্মিত ২৩৮ ফুট উচ্চ একটি মিনার। কেন্দ্রস্থল—রক্তাভ পিঙ্গল; চারিধার গাঢ় নীল বর্ণ।

মূল্য ১৫৲টাকা—শত্রুঞ্জয় মন্দির – পালিতানা। পশ্চিম ভারতের একটি সুবিখ্যাত জৈন মন্দির। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ। কেন্দ্রস্থল—পিঙ্গল, চারিধার—গাঢ় লাল বর্ণ।

আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা—যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ হোরেস আই পোলম্যান সম্প্রতি এক প্রবন্ধে বলেন যে যুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির চর্চায় মার্কিন জনসাধারণের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

"মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক গবেষণা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ডাঃ পোলম্যান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা কিরূপ প্রসার-লাভ করে তাহার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকায় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদির চর্চা হইত। যুদ্ধের পর ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানসমূহ সম্পর্কেও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাঃ পোলম্যান এক বার ভারতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যুদ্ধের কয় বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে মার্কিন জন-সাধারণ ভারতবর্ষ-সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জানিতে পারিয়াছেন। পূর্বে মার্কিন জনসাধারণ ভারতবর্ষের ধর্মসম্পর্কেই উৎসাহ প্রকাশ করিত। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সকল ছাত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি লইয়া গবেষণা করিতেন তাঁহাদের নিকট হইতেই মার্কিন জনসাধারণ ভারতের সাংস্কৃতিক কীর্তিকলাপের কথা শুনিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আধুনিক জাতিহিসাবে ভারতের ভবিষ্যতের আলোচনার উপরে জোর দেওয়া হইতে লাগিল। পূর্বে মার্কিন সাংবাদিকরা ভারতবর্ষ-সম্পর্কে যে সকল প্রতিকূল বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্তে স্থিরবুদ্ধি লেখকদের অভিজ্ঞতা ক্রমেই অধিকতর সমাদর লাভ করিতে লাগিল।

ডাঃ পোলম্যান আমেরিকার বিভিন্ন লাইব্রেরী ও মিউজিয়মে ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত নানা জিনিষের সংগ্রহ, বিভিন্ন মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ভারতবর্ষ-সম্পর্কে বিশেষ চর্চা, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন ইন্‌ষ্টিটিউট ও ফাউণ্ডেশনের কাজ ও ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে প্রকাশিত অসংখ্য পুস্তকাদির উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষ-সম্পর্কে মার্কিন জন-সাধারণের ক্রমবর্ধমান উৎসাহের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যেই আমেরিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কমপক্ষে ৩৫০ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত নানা বিষয়ে চর্চার প্রধান কেন্দ্র হইল ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জনস্ হপ্‌কিনস বিশ্ববিদ্যালয়, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সমাজপ্রথার গবেষণার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রাচ্যধর্ম ও দর্শন পাঠের জন্যও বিশেষ কোর্স প্রবর্তিত হইয়াছে

পরলোকে ভগিনী ললিতা—গত ২৩শে জুলাই ভগিনী ললিতা (মিসেস্ ক্যারি মিড্ ওয়াইকফ্) কিছুকাল রোগ ভোগের পর রামকৃষ্ণ মিশনের হলিউড্ (আমেরিকা) কেন্দ্রে নব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। আমেরিকায় যে অল্প কয়েক জন সর্বপ্রথম আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগিনী ললিতা ছিলেন অন্যতম্। ক্যালিফর্নিয়া পরিদর্শন কালে স্বামিজী কিছুকাল এই ভদ্র মহিলার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়েই স্বামিজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। স্বামিজীর দিব্যস্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগিনী ললিতা তাঁহার হলিউড্স্থ ভবনটি তথাকার বেদান্ত সোসাইটির প্রচার কার্যের জন্য উৎসর্গ করেন। ১৯৩৬ সনে তিনি হলিউড্ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজীর সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তঁাহার সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক—ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য

আবেদন

গত ২৭ বৎসর যাবৎ পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। আশ্রমের জনপ্রিয়তাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু ভক্ত নরনারী আগমন করিতেছেন। বহুকাল যাবৎ আশ্রমের একটি গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্য পূজাদি হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উক্ত গৃহ এত অল্পপরিসর যে তথায় সকলের একসঙ্গে মিলিত হইয়া পূজাদি-দর্শন, ভজন-কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনাদি করা সম্ভব নহে। এই অভাব দূর করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি পৃথক মন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রার্থনাগৃহ-নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে ন্যূনকল্পে ২৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। গত ১৯৪৫ সনের ৪ঠা এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অর্থাভাবে এই পুণ্যকার্য্য এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীর সাহায্যের উপরই এ কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এই মন্দিরের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। যাঁহারা এই কার্য্যে ৫০০৲ পাঁচশত কিংবা তত্তোধিক মুদ্রা প্রদান করিবেন তাঁহাদের নাম প্রস্তরফলকে খোদিত করিয়া মন্দির-গাত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে। ইতি

নিবেদক

স্বামী তেজসানন্দ

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা,
পোঃ বাঁকিপুর, (বিহার)।

শ্রীশ্রীদুর্গা

কাশ্মীরী শৈবাগম ও শাক্তাগম

স্বামী বাসুদেবানন্দ

পাঞ্জাবে প্রাগ্‌বৈদিক যুগে তদানীন্তন অধিবাসীদের নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র অনুশীলন ছিল, যার নিদর্শন আমরা ঋগ্বেদ সংহিতায় এবং মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পা অনুসন্ধানে কিছু কিছু দেখতে পাই। এটী বেদভিন্ন এবং বহুদিন হতে আগম বা তন্ত্র মত বলে পরিচিত। বৈদিকানুশীলনের বিস্তারের সহিত এর অনুশীলনও সমান্তরাল ভাবে চলেছিল। এই আগমশাস্ত্র আমরা দুভাগে বিভক্তরূপে পাই—শৈবাগম ও শাক্তাগম। শৈবাগমে শিবের মাহাত্ম্য এবং শাক্তাগমে শক্তির মাহাত্ম্য বেশী। শৈবাগম আবার দুভাগে বিভক্ত—(১) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যা দাক্ষিণাত্যে প্রসার লাভ করে এবং শ্রুতি-প্রমাণ গ্রাহ্য করায় এখনও প্রবল সম্প্রদায়-সম্পন্ন; এবং (২) প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতবাদ যা মাত্র আগম-প্রমাণকে আশ্রয় করে কাশ্মীরাদি উত্তর ভারতে শ্রীসম্পন্ন হয়। এই সম্প্রদায়ীরা অনেক দিন ধরে পরবর্তী মুসলমান কাল হতে প্রচ্ছন্ন ভাবালম্বনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে! কিন্তু মুদ্রামন্ত্রের সাহায্যে বর্ত্তমানকালে এদের গ্রন্থ ধীরে ধীরে লোকচক্ষে আবির্ভূত হচ্ছে। বর্ত্তমানে শৈবাগম "আগম" বলেই পরিচিত, পরন্তু শাক্তাগম "তন্ত্র" বলে পরিচিত। তন্ত্রের আবার আর একটা বিভাগ দেখা যায়—শিব বক্তা হলে আগম এবং শক্তি বক্তা হলে নিগম। কিন্তু বৈদিক দার্শনিকেরা আগম, নিগম, তন্ত্র সবই বেদের প্রতিশব্দ বলে গ্রহণ করেন। শাক্ত তন্ত্র আবার অনুরূপ দুভাগে বিভক্ত—(১) কালীকুলীয়—সাধারণতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপা দেবী (ব্রহ্ম) ও বিবর্ত্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পূর্বদেশে প্রসারিত হয়। (২) শ্রীকুলীয় তন্ত্র হয় প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈত, আর না হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সাধারণতঃ দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রসার লাভ করে।

(১) শৈবাগমে প্রত্যভিজ্ঞাবাদ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ আমরা পাই বসুগুপ্ত কৃত "শিবসূত্র" (ষষ্ঠ শতক?), এর ভিত্তি হলো শিবভাষিত আগমশাস্ত্র। প্রথম এর ওপর কল্লটের "স্পন্দ-কারিকাবৃত্তি" এবং পরবর্ত্তী কালে জনৈক ভাস্কর কর্ত্তৃক উহার উপর বার্ত্তিক লিখিত হয়। এঁরা যদি সপ্তম শতকের লোক হন, তা হলে এই ভাস্করের সহিত (মাধবীয়

শংকর বিজয় মতে) শ্রীশংকরের বিচার সম্ভব হয়। পরন্তু ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্য শারীরক-ভাষ্যকারের অনেক পরে। এঁদের আরও বিখ্যাত গ্রন্থ সোমানন্দের "শিবদৃষ্টি", উৎপলের "প্রত্যভিজ্ঞাসূত্র" এবং অভিনব গুপ্তের "পরমার্থসার", "প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্ষিণী," "তন্ত্রালোক" এবং ক্ষেমরাজের "শিবসূত্রবিমর্ষিণী"। এঁরা সকলেই বোধ হয় অষ্টম শতক পর্য্যন্ত দর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে অভিনব গুপ্তই প্রধান, ইনি গীতাভাষ্যও প্রণয়ন করেন। এতন্মতাবলম্বী ভাস্কর রায় এঁদেরও পরবর্ত্তী দার্শনিক।

এঁদের মতে শিব (ব্রহ্ম) অবিকারী এবং সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠান। তাঁর শক্তির অনন্ত দিক, তার মধ্যে প্রধানতঃ চিৎ (pure intelligence), আনন্দ (bliss), ইচ্ছা (will), জ্ঞান (material knowledge) এবং ক্রিয়াই (creative energy) বিচার্য্য। এঁদের মতাবলম্বনেই পরবর্ত্তী কালীন দক্ষিণ দেশীয় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ৩৬ তত্ত্ব স্বীকার করেন। [শ্রীকণ্ঠের শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং উহার মূল শংকরপরাজিত প্রাচীন নীলকণ্ঠের মত এবং উহার সহিত রামানুজ মতের সম্বন্ধ প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে]। যিনি অনাদি অব্যয় শিব তাঁকে শ্রীরামানুজের শিক্ষক যাদবপ্রকাশের সন্মাত্র বা পাশ্চাত্য দার্শনিক Eckhart এর Being মাত্র বলা চলে। এঁরা শিবে বিমর্ষিণী শক্তির অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তিরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্পন্দ স্বীকার করায়, এদের Indian Evolutionists বলা যেতে পারে। শক্তি যখন চিদাকারে (power of knowing রূপে) অভিব্যক্তা হন, তখন অব্যয়-শিব 'অহম্ (কর্ত্তা) ইদং (কর্ম) জানামি (সম্বন্ধ ক্রিয়া)'—শূন্য, অর্থাৎ জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিপুটী-হীন বিশুদ্ধ চিন্ময় হন—ইনিই প্রথম শিবতত্ত্ব। শক্তি যখন আনন্দাকারিতা হয়ে প্রাণরূপে অভিব্যক্তা হন তখন তিনি দ্বিতীয় শক্তিতত্ত্ব। * (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাধা-তত্ত্বের সহিত তুলনা করুন।) তারপর তৃতীয় হলো ইচ্ছা-তত্ত্ব অর্থাৎ অহমৃরূপ আত্মাভিব্যক্তির মূল যে ইচ্ছা। তারপর চতুর্থ হলো জ্ঞানতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব অর্থাৎ অহমাত্মানুভূতির সহিত অনাত্ম জগদাদি সৃষ্টিক্ষমা শিবসত্তা। তারপর পঞ্চম ক্রিয়াতত্ত্ব বা শুদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ দ্রষ্টা ও অজ্ঞদৃশ্যের আবির্ভাব। ষষ্ঠ মায়াতত্ত্ব অর্থাৎ শক্তি যখন জগদ্রচনায়—(১) নিয়তি (law of spatial succession), (২) কাল (law of eventual succession), (৩) রাগ (interest and attachment), (৪) বিদ্যা (material knowledge) এবং কলা (physical, mental and superfine powers) রূপে পরিণতা হন। তারপর সপ্তম জগত্তত্ত্ব। (এ মতের সহিত Hegelian Absolute এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে)।

এ মত অদ্বৈতপক্ষে প্রায় শ্রীশংকরের তুল্য। এদের শিব সন্মাত্র-স্বভাব, চিদানন্দাদি তাঁর শক্তি। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। প্রত্যভিজ্ঞামতে বিমর্ষিণী-শক্তি অভিব্যক্তান-ভিব্যক্তরূপা স্বতঃস্পন্দস্বভাবা, অদ্বৈত মতে বিবর্ত্তশক্তি অনির্বচনীয়া। প্রত্যভিজ্ঞামতে "শিবদৃষ্টি", অদ্বৈত মতে সগুণ ব্রহ্মের "ঈক্ষণ"। এঁরা কেউ পতঞ্জলির চিত্তনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি স্বীকার করেন না, পরন্তু নিঃশক্তি নির্বিকল্প স্থিতি স্বীকার করেন। চিত্তসমাধানের জন্য

* আচার্য্যপাদ-বিরচিত "সৌন্দর্য্যলহরী" স্তোত্রে এই মতেরই ছায়াপাত দেখা যায়—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

পাতঞ্জলোক্ত যমনিয়মাদি উভয়মত-সম্মত। প্রত্যভিজ্ঞা মতের প্রমাণ আগম, অদ্বৈতবাদের প্রমাণ উপনিষৎ। উভয় পক্ষই জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাবাদের নিগ্রহস্থান—(১) অব্যয় অনাদি শিবের স্বরূপ সন্মাত্র-হেতু জড়ত্ব এবং (২) তাতে দৈশিক ও কালিক শক্ত্যভিব্যক্ত্যনভিব্যক্তিরূপ স্পন্দত্বের বাস্তবতা হেতু শিবের অবিকারিত্ব, অচলত্ব এবং বিভুত্ব অসিদ্ধ হয়। (৩) চিৎ ও আনন্দ যদি শক্তি হয়, তা'হলে সন্মাত্র শিবকেও অস্তি শক্তি বলা যেতে পারে।

অভিনব গুপ্তের মতে মুক্তপুরুষ তিন শ্রেণী—(১) পরামুক্ত অর্থাৎ যাঁরা অব্যয় শিবে সাযুজ্য লাভ করেছেন; (২) অপরামুক্ত যাঁরা শক্ত্যভিব্যক্ত শিবে সাযুজ্য লাভ করেন; এবং (৩) জীবন্মুক্ত—এখন যাঁরা দেহ ধারণ করে আছেন, কিন্তু দেহান্তে সগুণ বা নির্গুণ শিবে সাযুজ্য লাভ করবেন। পরমার্থসারে অভিনব গুপ্ত বলছেন, "শিবসাযুজ্য মানে যেমন দুধে দুধ বা জলে জল মিশে যায়।" "শিবোঽহম্" "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে 'সোঽয়ম্ দেবদত্তঃ'-রূপ প্রত্যভিজ্ঞা উভয়বাদি-সম্মত, কেবল 'অহম্' (জীব) পদার্থটী প্রত্যভিজ্ঞা-মতে শিবের একটী সসীম সশক্তিক অভিব্যক্তি, আর অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের একটা অনির্বচনীয়া উপাধি। [প্রবাদে যে অভিনব গুপ্ত শংকরের ব্যাধিসঞ্চার করেন বলে শ্রুত হয়, ইনি সে অভিনব গুপ্ত নন, কারণ ইনি আচার্য্যপাদের অনেক পরে আবির্ভূত হন।]

(২) শাক্তাগমে শক্তিব্রহ্মবাদী (ক) কালীকুলীয় তান্ত্রিকেরা প্রায় সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী; অর্থাৎ তাঁরা বলেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপা দেবীই ব্রহ্ম, বিবর্তই তাঁর মায়া-শক্তি। যথা, "বিশুদ্ধা-পরা চিন্ময়ী স্বপ্রকাশামৃতানন্দরূপা জগদ্ব্যাপিকা চ", "গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ববোধৈকগম্যা, ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা", "যথা রজ্জরজ্জর্কদৃষ্টিস্বকস্মান্নৃণাং রূপাদর্বীকরাস্তুভ্রমঃ স্যাৎ। জগত্যত্র তত্তন্ময়ে ত্বৎত্তদেব ত্বমেকৈব তত্তন্নিবৃত্তৌ সমস্তম্॥" —মহাকাল সংহিতা। তবে তাঁরা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপা দেবীতে বিবর্তসৃষ্টির পূর্বে একটা (১) অদৃষ্ট-সৃষ্টি স্বীকার করেন; অর্থাৎ জীবাদৃষ্ট-হেতু ব্রহ্মে তাদাত্ম্যস্বরূপীভূতা মায়ার বিক্ষেপাবরণাত্মিকা শক্তিরূপে আবির্ভাব। তারপর (২) রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত-সৃষ্টি; অর্থাৎ দ্রষ্টাদৃশ্যসমন্বিত ঈক্ষণভাবের জ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্ব (এ সাংখ্যকারিকার মহত্তত্ত্ব হতে ভিন্ন)। তারপর (৩) পরিণাম-সৃষ্টি; অর্থাৎ আবরণাত্মিকা মায়াপরিণামে ও বিক্ষেপাত্মিকা মায়াসহকারিত্বে অপঞ্চীকৃত ভূতসৃষ্টি। তারপর (৪) আরম্ভ-সৃষ্টি বা যৌগিক সৃষ্টি; অর্থাৎ পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতাত্মক জগৎ। ব্রহ্মস্বরূপা দেবীতে তাদাত্ম্যস্বরূপীভূতা মায়াকে তাঁরা প্রধানা বা মূলা প্রকৃতি বলেন। এ কিন্তু সাংখ্যকারিকার "প্রধান" নয়, কারণ তা পুরুষ হতে ভিন্ন পদার্থ। আর এ "প্রধানা" হলেন ব্রহ্মে তাদাত্ম্যস্বরূপীভূতা ত্রিগুণাত্মিকা মূলা প্রকৃতির সাম্যভাব। অদৃষ্টসৃষ্টিক্ষণে (অর্থাৎ মহাকাল-তত্ত্বে) গুণক্ষোভ-উন্মুখতা মাত্র ঘটে এবং পরক্ষণে যুগপৎ বিবর্ত্ত-সৃষ্টিতে নিরোধাত্মিকা তমোগুণের প্রাধান্য-হেতু ব্রহ্মসত্তা আবরিতা হয়। ইহাই রুদ্রতত্ত্ব। এবং ক্রমে সত্ত্বের প্রাধান্যে জ্ঞানদ্রষ্টাদৃশ্য-ভাবের আকস্মিক আবির্ভাব, যা বিষ্ণুতত্ত্ব নামে খ্যাত। তথা রজোগুণের প্রাধান্যে দ্রষ্টা পুরুষে "বহুস্যাম্-" রূপ ঈক্ষণের (will) প্রাবল্যে বিভক্ত দ্রষ্টাদৃশ্যের স্ফুরণ ঘটে যেটী ব্রহ্মতত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ নামে খ্যাত। এই ত্রিবিধ সমষ্টি-বিবর্ত্ত-মহত্তত্ত্বাভিমানী পুরুষকে তাঁরা নাদতত্ত্ব বলেন (বেদান্তমতে ঈশ্বর)। মূলাবরণটি হলো বেদান্তীদের মূলাকাশ যার পরিণামে অপঞ্চীকৃত

ভূতসূক্ষ্মের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ বিন্দুরূপ আকাশের শব্দ বা স্পন্দই পূর্বাপর সম্বন্ধাত্মিকা বিক্ষেপ বা ক্রিয়াশক্তি এবং "অর্দ্ধযুগল" (বা অর্দ্ধনারীশ্বর) পরিণামই দ্রষ্টাদৃশ্যের ভ্রূণাবস্থা।

এঁরা বেদান্তীদেরই মত নির্বাণমুক্তি ও জীবন্মুক্তাবস্থা স্বীকার করেন।

(খ) পরন্তু শ্রীকুলীয় তান্ত্রিকেরা হয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আর না হয় প্রত্যভিজ্ঞাবাদী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা শিবের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব স্বীকার করেন। এ প্রায় শ্রীকণ্ঠের শৈববিশিষ্টাদ্বৈত বা পাশুপত মতের তুল্য, কেবল শক্তি-মাহাত্ম্যই অধিক। শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার, সেইজন্য তাঁর বিষয় আমরা উত্তরশংকর বেদান্তাচার্য্যদের আলোচনা-কালে বলব।

শাক্ত-প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতবাদ শৈব-প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতবাদ হতে কিছু বিশেষ। এঁদের মতে শিব (ব্রহ্ম) সৎ ও প্রকাশ (চিৎ) স্বরূপ এবং শক্তি-বিমর্ষিণী অর্থাৎ অনাদি অব্যয় সচ্চিদেকে শিবে স্বতঃসিদ্ধা স্পন্দশক্তি। এই বিমর্ষিণী অব্যয় বিশুদ্ধ চৈতন্যশিবে অনভিব্যক্তা বা সুপ্তভাবে থাকেন এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তা হন। সেই স্বতঃসিদ্ধা প্রাণস্পন্দরূপা বিমর্ষিণী (হ্লাদিনী) নিজ প্রীতিশক্তিদ্বারা সচ্চিন্মাত্রস্বভাব শিবকে আনন্দময়-রূপে অভিব্যক্ত করেন এবং স্বয়ং ভোগ্যরূপে আবির্ভূত হন। শিব বিশুদ্ধ চৈতন্য, শক্তিই তাঁকে জ্ঞাতা (Knower) এবং জ্ঞান (Knowing) রূপে উপাধিত করে স্বয়ং জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্তা হন। আবার তিনি স্বকীয়া রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ স্বভাবের দ্বারাই শিবকে ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপে আবির্ভূত করান এবং তাঁদেরই দ্বারা সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি কার্য্য সাধিত হয়। নির্বিকল্পে শিবশক্তি এক পরমানন্দ-স্বরূপে অবস্থান করেন। শক্তিকে এঁরা "মায়াগর্ভ" বলেন।

শৈব প্রত্যভিজ্ঞাদ্বৈতের ৩৬টী তত্ত্বকে শাক্তাদ্বৈতীরা প্রধানতঃ তিনটী ভাগে বিভক্ত করেন—(১) আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-বিশিষ্ট জৈবজগৎ, (২) বিদ্যাতত্ত্ব অর্থাৎ কারণশক্তিময় ঐশ্বরজগৎ এবং শিবতত্ত্ব অর্থাৎ সচ্চিন্মাত্রস্বভাব পরতত্ত্ব।

স্বামী বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *

ই টি ষ্টার্ডির বাড়ী
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

(১)

প্রিয় জো-জো,

তাড়াতাড়ি তোমায় পত্র না লেখায় হাজার বার ক্ষমা চাচ্ছি। আমি নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে পৌঁছেছি। এখানে আমার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁর বাড়ীতে আমি বেশ ভালই আছি। বাড়ীটী চমৎকার। তাঁর স্ত্রী তো দেবী, আর তাঁর নিজের মনপ্রাণ ভারতময়। তিনি সে দেশে বহু বৎসর বাস করে সন্ন্যাসী-দের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন এবং তাঁদের খাদ্যাদি খেয়েছেন। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ, আমি বেশ সুখে আছি। কর্ম্ম থেকে অবসর

* ইংরেজী হইতে অনূদিত।

গ্রহণ করে ভারত হতে ফিরেছেন এরূপ জন কয়েক জেনারেলের সঙ্গে ইতোমধ্যে দেখা হয়েছে; তাঁরা আমার প্রতি খুব ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার করেছেন। আমেরিকানদের সেই যে অদ্ভুত জ্ঞান, যাতে তারা সব কালা আদমীকেই নিগ্রোর সামিল করে ফেলে—এখানে তা মোটেই নেই, এমন কি রাস্তায় কেউ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে না। আমি ভারতের বাইরে যত জায়গায় গেছি, তার মধ্যে এ জায়গাটাই আমার কাছে সব চেয়ে আপনার বোধ হচ্ছে। ইংরেজরা আমাদের চেনে, আর আমরাও তাদের চিনি। শিক্ষা ও সভ্যতার মান এখানে খুবই উঁচু—এতে একটা মস্ত পার্থক্য সৃজন করেছে।

চকাচকী দুটি ফিরে এসেছে কি? তারা ও তাদের শাবকগুলি ভগবানের চির আশীর্ব্বাদ লাভ করুক। খোকাখুকীরা কেমন আছে? আর এ্যালবার্টা ও হলিষ্টার? তাদের আমার সাগরপ্রমাণ ভালবাসা জানাবে ও নিজেও জানবে।

আমার বন্ধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়ায় আমরা শঙ্করাচার্য্যাদির ভাষ্যবিষয়ক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। জো-জো! এখানে দর্শন ও ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ক্লাস করার চেষ্টা করব ভাবছি। ইতি—

চির স্নেহাশীর্ব্বাদক
তোমাদের বিবেকানন্দ

(২)

হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো-জো,

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই আনন্দ হল। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি বুঝি আমায় ভুলে গেলে।

আমি লণ্ডনে ও আশে পাশে গোটা-কয়েক বক্তৃতা দেব। সর্ব্বসাধারণের জন্য এরূপ একটি বক্তৃতা ২২শে তারিখে সাড়ে আটটার সময় প্রিন্সেস্ হলে হবে।

এদেশে চলে এসে একটা ক্লাস জমাবার চেষ্টা কর। এপর্য্যন্ত আমি এখানে কিছু করিনি বললেই চলে। তবে সব কাজেরই গোড়াপত্তনে বেজায় সময় লাগে। নিউ ইয়র্কে আমরা যেটুকু করতে পেরেছি, তার জন্য আমায় আমেরিকাতে দুবছর খাটতে হয়েছিল।

সকলে আমার ভালবাসা জেনো। ইতি—

তোমাদের—বিবেকানন্দ

(৩)

হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
২০শে অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো-জো,

লেগেট পরিবারকে স্বাগত জানাবার জন্য এই পত্র লিখছি। এক হিসাবে এটা আমার স্বদেশ; অতএব আমিই তোমাদিগকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তোমাদের অভ্যর্থনা আমি লাভ করব আগামী মঙ্গলবারে রাত্রি সাড়ে আটটায়, প্রিন্সেস্ হলে।

আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আমি এত ব্যস্ত থাকব যে, তোমাদের কাছে গিয়ে দেখা করতে পারব—এরূপ আশা পোষণ করি না। তার পরে যে কোন দিন গিয়ে হাজির হব। হয়তো মঙ্গলবারে যাব। ইতি—

চির স্নেহাশীর্ব্বাদক
তোমাদের বিবেকানন্দ

(৪)

৮০ নং ওকৃলি ষ্ট্রীট
চেলসিয়া
৩১ শে অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো-জো,

শুক্রবারে ওখানে গিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং য়্যাল্‌বারমার্লেতে মিঃ কোয়েটের সঙ্গে দেখা করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হব। মিসেস ও মিস নেটার নাম্নী দুই জন আমেরিকান মহিলা লণ্ডনে থাকেন; ইঁহারা মা ও মেয়ে দুজনই কাল রাত্রে ক্লাসে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁরা খুবই সহানুভূতি-সম্পন্ন। মিঃ চ্যামিয়ারের ওখানের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে; শনিবার রাত্রি থেকে আমার বাসস্থানেই আরম্ভ করব। আমি আশা করছি যে, আমার ঘরের তুলনায় খুব বড় রকমেরই দু একটি ক্লাস জমে উঠবে। মন্‌কিউর কন্‌ওয়ের নৈতিক সমিতি হতেও বক্তৃতার জন্য আহ্বান এসেছে—সেখানে ১০ই তারিখে বক্তৃতা দেব। আগামী মঙ্গলবারে ব্যালবোয়া সোসাইটিতে আমার একটি বক্তৃতা হবে। ঠাকুরই ভরসা! শনিবারে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব কি না, তার কিছুই ঠিক নেই। যা হোক, পাড়াগাঁয়ে তোমরা খুব আমোদ পাবে; আর মিঃ ও মিসেস ষ্টার্ডি তো খুবই চমৎকার লোক। ইতি—

স্নেহাশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ:—আমার জন্য কিছু শাকসবজির ব্যবস্থা রেখো। চালের এমন বিশেষ প্রয়োজন নেই—রুটি হলেই চলবে। আমি এখন সম্পূর্ণ নিরামিষাশী।

(৫)

গ্রে কোট গার্ডেন্স্‌
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম লণ্ডন
৩রা ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় জো-জো,

তোমার নিমন্ত্রণের জন্য অজস্র ধন্যবাদ; কিন্তু প্রেমাস্পদ প্রভুর বর্ত্তমান বিধান এই—আগামী ১৬ই তারিখে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন এর সঙ্গে আমার ভারতযাত্রার কথা ঠিক হয়ে গেছে। আমি ও সেভিয়াররা নেপল্‌সে জাহাজ ধরব। এবং রোমেও চার দিন থাকা হবে; কাজেই য়্যাল-বার্টার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে যাব।

এখানে হুজুক মেতেছে বেশ! ৩৯নং ভিক্টোরিয়াতে ক্লাসের জন্য যে হলটি আছে, তা পূর্ণ হয়ে যায়; অথচ আরো লোক আসছে।

যা হোক, পুরাণো প্রিয় ভূমির ডাক এসেছে—আমায় যেতে হবে। সুতরাং এই এপ্রিলে রুশিয়া ভ্রমণের সমস্ত কল্পনা আপাততঃ রইল। আমি ভারতের কাজ একটু চালু করে দিয়েই আবার চিরসুন্দর আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতিতে ফিরে আসছি।

ম্যাবেলের চিঠিখানি পাঠিয়ে বড় ভাল করেছ—খুব ভাল খবর! শুধু বেচারা ফক্সের জন্য আমার একটু দুঃখ হয়। যা হোক, ম্যাবেল যে তাকে এড়াতে পেরেছে এ ভালই হয়েছে।

নিউ ইয়র্কে কাজকর্ম্ম কিরূপ চলছে, তা তো তুমি কিছুই লিখ নি। আশা করি সেখানে সব ঠিক আছে। বেচারা কোলা! সে কি এখন তার জীবিকার মত যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারে?

গুড্‌উইন এসে পড়ায় বড় ভাল হয়েছে, কারণ তাতে করে এখানকার বক্তৃতাগুলি

পাকড়ানো গেছে, আর ঐগুলি এখন সাময়িক পুস্তিকাকারে ছাপান হচ্ছে। খরচ চালাবার মত যথেষ্ট গ্রাহক ইতোমধ্যেই সংগৃহীত হয়ে গেছে।

আগামী সপ্তাহে আর তিনটি বক্তৃতা হয়ে গেলেই এবারকার মত আমার লণ্ডনের কাজ শেষ হবে। সকলেই অবশ্য মনে করছে যে, কাজটা যখন জমে উঠেছে, ঠিক তখনই ছেড়ে দেওয়াটা বড় আহাম্মকি। কিন্তু প্রেমময় ভগবান বলছেন, "বুড়ো ভারতের দিকে যাত্রা কর।" আমি তাই মেনে নিচ্ছি।

ফ্র্যাঙ্ক, মা, হলিষ্টার এবং অপর সকলকে আমার চির স্নেহাশীষ জানাবে ও তুমিও জানবে।

সতত তোমাদের একনিষ্ঠ
বিবেকানন্দ

সার্ব্বজনীন পূজা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

ঘণ্টা বাজায় পুরুত ঠাকুর
কাঁসর বাজায় কানাই।
মা-লক্ষ্মীরা শঙ্খ বাজায়
মুচিরা ঢোল সানাই।

পুরুত বসে বেদীর নীচে
মুচিরা আটচালায়।
দাওয়ায় ব'সে নাপিত বেচু
গুগ্‌গুলু ধূপ জ্বালায়।

কুমোর গড়ে প্রতিমা মা'র
কামার যোগায় অস্ত্র—
চাষীরা নৈবেদ্য যোগায়
তাঁতী যোগায় বস্ত্র।

এইত হ'ল চিরকালের
সার্ব্বজনীন পূজা,
দশের পূজা দশ হাতে নেন
তাই মা দশভুজা।

মায়ের ডাকেই সকল ছেলে
সব ব্যবধান হরে।
পূজা মায়ের সারা গাঁয়ের
হোক না একের ঘরে।

হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ

সম্পাদক

এই পরিদৃশ্যমান জগতের নাম-রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত 'সত্য-শিব-সুন্দর'কে রূপায়িত করিয়া দেখানই হিন্দু-সংস্কৃতির আদর্শ। এই মহান সংস্কৃতি সন্ধান করে—

"Tongues in trees, books
in the running brooks,
Sermons in stones and
God in everything."

—'বৃক্ষের মধ্যে ভাষা, প্রবহমাণ স্রোতস্বিনীর মধ্যে গ্রন্থ, প্রস্তরের মধ্যে ধর্মোপদেশ এবং সর্বভূতে ঈশ্বর।' ঈশ্বর পৃথিবীর সকল বস্তু ও শ্রেণীর সত্তাস্বরূপে নাম-রূপের অতীত রাজ্যে অবস্থিত। এই অরূপ ঈশ্বরকে ধর্ম দর্শন সাহিত্য শিল্প স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সংগীত প্রভৃতির সাহায্যে রূপবান করিয়া সকলকে দেখাইবার প্রয়াস হইতেই হিন্দু-সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা কোন একটি বিশেষ মত পথ কলাবিদ্যা ও ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহাতে 'যত মত তত পথ'-এর মাহাত্ম্য স্বীকৃত। এই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাদি কোন ক্ষেত্রেই ভেদ-বিরোধ অনৈক্য অসামঞ্জস্য ও পার্থক্য স্বীকার করে না। ইহা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের আবশ্যকতা স্বীকার করে। বহুত্বে একত্ব এবং একত্বে বহুত্ব সন্দর্শনই ইহার বিশেষত্ব। এই সংস্কৃতি বহুকে একের অভিব্যক্তি এবং এককে বহুর অধিষ্ঠান-সত্তা রূপে প্রত্যক্ষ দর্শনের মাহাত্ম্য প্রচার করে। সংক্ষেপতঃ ইহাই এই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির বিশেষত্ব।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীরও স্পষ্ট ধারণা দেখা যায় না। তাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের তথা প্রাচ্যের সংস্কৃতি অলৌকিক; ইহার সহিত মানুষের বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত বহু নরনারীর মনে এই ধারণা একান্ত বদ্ধমূল। তাঁহারা সংস্কৃতিমাত্রকেই অলৌকিক বলিয়া মনে করেন। গিলবার্ট নামক জনৈক প্রতীচ্য লেখক তাঁহার একটি কবিতায় প্রাচ্য সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন:

"If you are anxious to shine in the
high aesthetic line as a man
of culture rare,
You must get up all the germs of
the transcendental terms, and
plant them everywhere."

'যদি উন্নত-রুচিসম্পন্ন অসাধারণ সংস্কৃতিমান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে তোমার আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সর্ববিধ অলৌকিক ভাবের বীজ সংগ্রহ করিয়া সর্বত্র বপন কর!' পাশ্চাত্যের অনেকের মতে কেবল প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি অলৌকিক নয়, অধিকন্তু প্রাচ্য জাতিও কতকটা অলৌকিক বা কিম্ভূতকিমাকার! পাশ্চাত্য জাতির দৃষ্টিতে প্রাচ্য জাতি অসভ্য বর্বর! প্রাচ্য জাতিও পাশ্চাত্য জাতিকে ভাল মানুষ মনে করে না। স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়

জাতিরই দোষ এবং গুণ দুই-ই আছে। অনেক বিষয়ে উভয় জাতির স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই প্রাচ্য জাতি অমানব এবং তাহাদের সংস্কৃতি অলৌকিক নয়। অতীন্দ্রিয় অরূপের অনুসন্ধান হিন্দু-সংস্কৃতির লক্ষ্য হইলেও ইহাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত নির্বস্তক (abstract) ভাবমাত্র বলা যায় না। বিভিন্ন প্রকার উচ্চাঙ্গ কলাবিদ্যার অভিব্যক্তির অভ্যন্তর দিয়া ইহার বস্তুতান্ত্রিক বা বাস্তব রূপ প্রকটিত।

হিন্দুসংস্কৃতি ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এই সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র বলেন :

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং স্তুত্যাঽনির্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

'অরূপকে রূপবান করিয়া আমি প্রথম অপরাধ করিয়াছি। অনির্বচনীয়কে বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিয়া আমি দ্বিতীয় অপরাধে লিপ্ত হইয়াছি। তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সর্বব্যাপিত্ব ক্ষুন্ন করায় আমার তৃতীয় অপরাধ হইয়াছে। হে মহান ঈশ্বর, এই তিনটি অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা কর।' এই অত্যুদার ভাবের মধ্যে হিন্দু-সংস্কৃতির সার্বভৌম স্বরূপ বিশেষ ভাবে প্রকটিত। এই সংস্কৃতির পরিধি এত বিস্তৃত যে, ইহাতে নিরীশ্বরবাদেরও স্থান আছে। কারণ, অরূপের অনুসন্ধান এই মতবাদেরও লক্ষ্য। এই জন্যই নিরীশ্বরবাদমূলক বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দু-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। শিখ-সংস্কৃতির সঙ্গেও হিন্দু-সংস্কৃতির কোন পার্থক্য নাই। হিন্দু-সংস্কৃতি তাও, কংফুস, বন, শিন্তো পারশিক ইহুদী খৃষ্টান ও ইস্লাম ধর্মকে আপনার অঙ্কে স্থান দান করে। কারণ, অরূপের সন্ধান এই সকল ধর্মেরও একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্য হিন্দুগণ এই সকল ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখায়। হিন্দু-সংস্কৃতি অসীম অনন্ত ভগবানকে কোন দেশ কাল পাত্র মত ও পথের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে না। অদৃশ্য অজ্ঞেয় ও অনন্তভাবময় ঈশ্বরকে যে ভাবে ও যে রূপে জানিতে ও দেখিতে চেষ্টা করা হয়, উহার প্রতিই হিন্দু-সংস্কৃতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই জন্য ইহা বিশ্ব-জনীন। ইহাতে উপনিষদের ঋষিদের জ্ঞান, শংকরের বিচার, বুদ্ধের কর্মশক্তি ও হৃদয়বত্তা, মধ্ব রামানুজ ও চৈতন্যের প্রেম-ভক্তি, খৃষ্টের ত্যাগ ও মহম্মদের সাম্যমৈত্রীর সম্মানিত স্থান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ হিন্দুর এই কল্পনাতীত সাম্যমৈত্রী-মূলক সাংস্কৃতিক জীবন হইতে তাহার সামাজিক জীবন বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে ভেদ-বিরোধ-বৈষম্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ, হিন্দু-সংস্কৃতি আদর্শের দিক দিয়া জীব-ব্রহ্ম-অভেদবাদমূলক চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী প্রচার করে, কিন্তু হিন্দুজাতি সমাজ-ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া অনৈক্য ও অসামঞ্জস্যের প্রশ্রয় দেয়। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রস্রবণ গীতা প্রচার করেন :—

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

'সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শী হইয়া স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মায় দর্শন করেন।' হিন্দু-সংস্কৃতি আত্মা হিসাবে সকল নরনারীকে এক ও অভেদ দৃষ্টিতে দেখিতে শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে এরূপ সাম্য-মৈত্রী পৃথিবীর আর কোন সংস্কৃতি প্রচার করে না। এই সাম্য-মৈত্রীর তুলনায় শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য-মৈত্রী

বিদ্যুতের নিকট খদ্যোতের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ। হিন্দুজাতি সমাজ-জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক সাম্যকে কাজে না লাগাইয়াই তাহাদের অধঃপতন ডাকিয়া আনিয়াছে।

এই গীতোক্ত সমদর্শনে সকল নরনারীকে উপনীত করাই হিন্দুধর্মের একমাত্র আদর্শ। হিন্দু-সংস্কৃতি এই মহান নির্বস্তুক আদর্শকে বিভিন্ন কলাবিদ্যার সাহায্যে বস্তুতন্ত্রমূলক ভাবে অতি উজ্জ্বলরূপে সকলের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে। হিন্দুর স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা ও সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে এই আদর্শ পরিস্ফুট। অজন্তা ইলোরা মাদুরা শ্রীরঙ্গম্ তাঞ্জোর ত্রিচিনাপলী রামেশ্বর মহাবলীপুরম্ পুরী ভুবনেশ্বর কণারক প্রভাস দ্বারকা প্রভৃতির মন্দিরে এই গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায়। এই মন্দির-সমূহের কারুকার্য ও মূর্তি-গুলির ভাবের অভিব্যক্তি মানুষের সমক্ষে এক অজ্ঞেয় জগতের জীবন্ত আলেখ্য উপস্থিত করে। এই জগতে একমাত্র সত্য-শিব-সুন্দর আপন মহিমায় আপনি বিরাজিত। হিন্দুর পূজা প্রার্থনা স্তব ব্রত পার্বণ ভক্তিযোগ কর্মযোগ রাজযোগ জ্ঞানযোগ দর্শন সন্ন্যাস এবং ভজন-সংগীত প্রভৃতি সত্য-শিব-সুন্দরকে মানুষের মনে প্রাণবন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার বিভিন্ন উপায়।

হিন্দুর দেবদেবীর খোদিত মূর্তি ও অংকিত চিত্রের দৈহিক গঠন শরীরবিজ্ঞানের (Anatomy) দিক দিয়া একেবারে ত্রুটিহীন এবং পাশ্চাত্যরুচিসম্মত (aesthetic) নয়। উহাতে প্রতীচ্যের ন্যায় প্রত্যেকটি মাংসপেশী এবং শিরা-উপশিরার প্রকাশন নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় মূর্তি ও চিত্রে যে আভ্যন্তর আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি আছে, তাহা প্রতীচ্য মূর্তি ও চিত্রে দেখা যায় না। ভারতীয় মূর্তি ও চিত্রে বাহ্যবিষয়গুলির রূপায়ণের উপর জোর না দিয়া অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাব রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইজন্য বলা যায় যে, সদৃশ ভাবাবলী দ্বারা স্বরূপনির্দেশ (assimilative symbolism) হিন্দু কলা-সমূহের বিশেষত্ব। বর্তমানে অনেক পাশ্চাত্য শিল্পী এই ভাবের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। জগতের সকল কারণের কারণস্বরূপ যে ইন্দ্রিয়াতীত অরূপকে হিন্দুশাস্ত্র নির্বস্তুক ভাবাশ্রয়ে নানা ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে মানুষের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই অরূপকেই হিন্দু-সংস্কৃতি স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা সঙ্গীত সাধনা ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি সহায়ে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ধারণ করিয়া রাখিতে আগ্রহ দেখাইয়াছে।

প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সকল বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে এক সত্য-শিব-সুন্দর অরূপকে রূপায়িত করিয়া দেখানই হিন্দু-সংস্কৃতির আদর্শ। এই সার্বভৌম আদর্শ কোন শিক্ষিত ও সভ্য মানুষই অবহেলা করিতে পারেন না। পৃথিবীর সকল নরনারীকে জীবত্ব হইতে শিবত্বে উন্নীত করিবার জন্য তাহাদের সমক্ষে সর্বদা এই মহান আদর্শ ধারণ করিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক।

ভারতীয় দর্শনের মূল কথা

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পৃথিবীতে সত্যই এক অপূর্ব সৃষ্টি এই মানব—মানবে যেন জাগতিক সকল বস্তুরই, সকল দোষগুণেরই একটি বিস্ময়কর সমাবেশ হয়েছে। প্রথমতঃ, মানব জড়ধর্মী—তাঁর দেহেন্দ্রিয় জড়বস্তু থেকেই সৃষ্ট, এবং জড়বস্তুর ন্যায়ই প্রাকৃতিক নিয়মাধীন ও ক্ষয়শীল। এরূপে, সমগ্র জগতের অধীশ্বর হয়েও একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জড়দ্রব্যের ন্যায় মানবও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অধীন—একটী ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডকে যেরূপ উচ্চস্থান থেকে নিক্ষেপ করলে, সে নিম্নে পতিত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, সেরূপ মানবের ক্ষেত্রে ঠিক একই ঘটে; অতি সাধারণ জড়দ্রব্য যেরূপ কালক্রমে ধূলিকণায়, অণুপরমাণুতে, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সমভাবে মানবদেহের পরিণামও তাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, দ্বিতীয়তঃ, মানুষ প্রাণধর্মীও বটে। জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মরণ প্রাণের লক্ষণ—প্রাণশীল মানব এইদিক থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গেরই ন্যায় ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল, রোগজরাক্লিষ্ট, হ্রাসবৃদ্ধিবান্ ও মরণশীল। কিন্তু এস্থলেও পশুপর্যায়ভুক্ত মানবের পশুভাবই তার সমগ্র সত্তা নয়; সেজন্য, তৃতীয়তঃ, মানব মনোবিশিষ্টও সমভাবে। এইদিক থেকে সে একক, কারণ সমগ্র পশু-জগতে মানবই একমাত্র পশু হয়েও মননশীল ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু এমন কি মনও মানবের সব নয়—চতুর্থতঃ, সে আত্মবিশিষ্টও। জাগতিক জ্ঞান ও ব্যাপারের সাধনস্বরূপ যে মন, তার উপরেও আছে তার সেই অমর আত্মা এবং ইহাই একমাত্র তার প্রকৃত স্বরূপ বা সত্তা। এরূপে জড়দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মার সমাবেশ এই মানবে তত্তৎসংশ্লিষ্ট দোষগুণেরও চরম উৎকর্ষাপকর্ষ দৃষ্ট হয়। কেবলই জড়ধর্মশীল মানব জড়েরই ন্যায় নিশ্চল, নিরুদ্যম, ব্যর্থ জীবন যাপন করে। সমভাবে, কেবলই প্রাণধর্মশীল মানবও পশুত্বের চরম সীমায় উপনীত হয়ে নিরন্তর স্বার্থসঙ্কুল, দৈহিক ভোগপূর্ণ জীবনেই তৃপ্ত থাকে—আমরা কথায় বলি, 'পশুর মত ব্যবহার', কিন্তু মানব-পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর, স্বার্থসর্বস্ব ব্যবহার পশুতেও করে না। সমভাবে, কেবলই মনোধর্মশীল মানবও জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই মাত্র অন্ধবৎ পরিভ্রমণ করে—শাশ্বত শান্তি বা আনন্দ থেকে সে চিরবঞ্চিত। এরূপে জড়দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মার মধ্যে একটী সুসামঞ্জস্য-বিধানেই জড়দেহ-প্রাণ-মন-আত্মশীল মানবের প্রকৃত মানবত্ব—এরই নাম "সাধনা"। কেবল একটী উপাদান দ্বারা গঠিত হ'লে সমস্যা নেই, সাধনাও নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সমস্যার সমাধানই হ'ল সাধনার লক্ষ্য। কেবল যে জড়, জড়ত্বই তার স্বভাব—তার অধিক কিছু তার পক্ষে সম্ভবই নয় বলে কাম্যও নয়। সমভাবে কেবলই প্রাণধর্মী যে জীব, জীবত্বই তার স্বভাব, অর্থাৎ, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি প্রাণধারণোপযোগী কার্যকলাপই তার সব—অন্য কিছু তার নিকট আশা করাই মূর্খতা। কিন্তু মননশীল ও আত্মবান্ মানব দেহশীল ও জীবধর্মী হ'লেও, সেটুকুও তার সব নয়—দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা, এই চারটী বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মানবজীবনেই প্রথম উদ্ভূত হয় সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্ন।

চারটী বিভিন্ন উপাদান, অথচ মানবসত্তা একটীই—সেই একটী সমগ্র মনুষ্যত্ব, সেই একটী মানবসত্তার পরিপূর্ণ, বাধাহীন বিকাশই হ'ল ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য।

'দর্শন' শাস্ত্র—এই সংস্কৃত কথাটীর তুলনা জগতের সাহিত্যে নাই—এই একটী ক্ষুদ্র শব্দই যেন আমাদের শাশ্বত ভারতীয় কৃষ্টির প্রকৃত রূপটী আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। ইংরেজীতে আমরা বলি "Philosophy", ব্যুৎপত্তিগত ভাবে এর অর্থ 'Love of knowledge' বা জ্ঞান-পিপাসা,—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ভারতীয় 'দর্শন' কথাটী তার চেয়ে সহস্র গুণ মর্মস্পর্শী —এর অর্থ কেবল জ্ঞানপিপাসা নয়, জ্ঞান-লাভ; কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়, তত্ত্বদর্শন; কেবল সত্যানুসন্ধান নয়, সত্যোপলব্ধি। প্রকৃত জ্ঞানলাভ তখনই হয়, যখন সেই জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করি, সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি, সমগ্র সত্তা দ্বারা যখন সেই সত্যের সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে যাই। এই প্রত্যক্ষ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নয়; সুখ-দুঃখ প্রভৃতির মানস প্রত্যক্ষও নয়—কিন্তু আত্মা দ্বারা উপলব্ধি, যা সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা সহস্রগুণ স্পষ্ট, স্থির, জাজ্জ্বল্যমান্। যথা, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁর দর্শনপাঠ সমাপ্ত হয় তখনই যখন তিনি ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মায় সাক্ষাৎ অনুভব করেন। যিনি এক-মাত্র আত্মায় বিশ্বাসী, তাঁরও দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান পরিসমাপ্ত হয় কেবল আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ দর্শনেই। এই তত্ত্বদর্শন, সত্যদর্শন, ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শনই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা—এরই ভিতর নিহিত আছে মানবের মানবত্ব, অমরত্ব, মুক্তির মহামন্ত্র।

এই আত্মদর্শনের স্বরূপ ও উপায় কি? ভারতীয় মতে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা কদাপি স্বীয় স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হন না, কিন্তু কেবল সাময়িক ভাবে তা' বিস্মৃত হয়ে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকেন। এই স্বরূপ উপলব্ধিই মুক্তি। মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায়, দেহমনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মারও প্রকৃত স্বরূপটী আবৃত হয়ে থাকে—এই অজ্ঞান-আবরণের অপসারণই মানবের চরম লক্ষ্য। এস্থলে ভারতীয় দর্শনের একটী লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, ইয়োরোপীয় দর্শনে কেবল তিনটী তত্ত্ব স্বীকৃত হয়—matter, life, mind—জড়, প্রাণ, মন। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতীয় মতে, মনের উপরও আরো একটী তত্ত্ব আছে—আত্মা—যেটীই হ'ল সর্বোচ্চ তত্ত্ব। ভারতীয় মতে, মনও জড় প্রকৃতির কার্যরূপে স্বয়ং জড়-স্বভাব। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য আমরা দেহকে জড় ও মনকে অজড়রূপে গ্রহণ করি—মনই দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে, মনের জন্যই দেহ-প্রাণধর্মী মানব পশুসমাজ অপেক্ষা উন্নততর জীবনযাপনে সক্ষম। কিন্তু তথাপি মনও জাগতিক বস্তুসমূহে আবদ্ধ—মনের বৃত্তিসমূহ—সুখ, দুঃখ, ভাব, জ্ঞান,—সাংসারিক বিষয়-সম্বন্ধেই ব্যাপৃত। এই সাধারণ জ্ঞান, সুখ ও ইচ্ছাদির উর্ধ্বেও যে এক সচ্চিদানন্দময় সত্তা আছে, এই সাধারণ জগতের সীমা অতিক্রম করেও যে একটী অমৃতময় লোক বিদ্যমান—যা এমন কি মনের মননেরও বাইরে, ইহাই ভারতীয় দর্শনের মূলসূত্র।

এই স্বরূপ লাভ হ'বে কি উপায়ে? দেহ, প্রাণ, মনকে নিষ্পেষিত করে নয়, সংসারকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেও নয়—কিন্তু দেহমনকে আত্মারই আলোকে আলোকিত করে, আত্মারই ভাবে ভাবিত করে, আত্মারই প্রেরণায় অনুপ্রেরিত করে। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ কেহ কেহ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে

এই অভিযোগ আনয়ন করেন যে, দেহকে পাপসঙ্কুল বোধে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং জগৎকে তুচ্ছরূপে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও বিষবৎ পরিত্যাগ করাই ভারতের মূল আদর্শ, এবং সেজন্য ভারতীয় দর্শন অতিকৃচ্ছ্রতাবাদ (Asceticism) এবং মানব-বিদ্বেষবাদ (Misanthropy) দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধ্বংস বা ঘৃণার স্থান ভারতীয় কৃষ্টিতে নেই। অতিকৃচ্ছ্রতা-সাধন দ্বারা দেহ-মনের ধ্বংস-সাধন কদাপি ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুমোদন করে না ; মায়ামিথ্যা রূপে জগৎ ও জগদ্বাসিগণের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাও উপদেশ দেয় না। উচ্চতর দ্বারা নিম্নতরের ধ্বংস নয়—সংস্কার, সঞ্জীবন ও সমুন্নতি ; উচ্চতর কর্তৃক নিম্নতরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা নয়,—বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য —এই হ'ল প্রকৃত ভারতীয় নীতির অনুশাসন। ভারতীয় মতে এই পার্থিব জগৎ, এই দেহ-মনোবদ্ধ সাংসারিক জীবনই সব নয়—কিন্তু এর ভিতর দিয়েই আমাদের লাভ করতে হ'বে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের আস্বাদ ; দেহকে, জগৎকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন করে নয়, এদের ভিতর দিয়েই করতে হ'বে সেই ক্ষুর-ধার পন্থাবলম্বন যা' মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। সেজন্য দেহকে করতে হ'বে বিজ্ঞান-বিচারশীল মনের দাস, এবং মনকে করতে হ'বে আত্মোপলব্ধির সোপান মাত্র। অন্যদিকে, মানবসেবার মাধ্যমেই হ'বে পরম তত্ত্ব লাভ, মানব-ঘৃণায় কদাপি নয়।

সেজন্য সাধারণভাবে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের মতে, "পঞ্চ মহাব্রত"-ই আত্মস্বরূপ-লাভের উপায়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ—এই পঞ্চমহাব্রত। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলেও একটি ভ্রান্তিমূলক অভিযোগ উত্থাপন করেন—তা' এই যে, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কেবল নেতিমূলক, কেবলই নিষেধাত্মক—অর্থাৎ, 'এটা করো না, ওটা করো না'—এরূপ নিষেধের প্রাবল্যই লক্ষিত হয়, কিন্তু কি যে করা উচিত, সেরূপ বিধি-বিধান অল্পই। যথা—'অহিংসা' অর্থ—হিংসা করো না, 'সত্য' অর্থ—মিথ্যা বলো না, 'অস্তেয়' অর্থ 'চুরি করো না', 'ব্রহ্মচর্য' অর্থ 'ভোগে লিপ্ত হয়ো না', 'অপরিগ্রহ' অর্থ 'পার্থিব দ্রব্য গ্রহণ করো না'—এ' সবই ত নেতিবাচক বা নিষেধাত্মক—বিধি কই ? কিন্তু এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। ভারতীয় নীতির অনুশাসন নিষেধে আরম্ভ বিধিতে সমাপ্ত—নিষেধেই তা'র চরম নির্দেশ নয়। নিষেধ-পালন বিধি-পালনের অপেক্ষা সহজতর —সেজন্য নিষেধেই আরম্ভ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। যথা, অহিংসার নিষেধাত্মক দিক্ : 'কাহাকেও হিংসা, বা কাহারও অনিষ্ট করো না' ; বিধ্যাত্মক দিক : 'তাঁদের সকলকে ভালবাস, সাধ্যমত তাঁদের ইষ্ট কর।' অর্থাৎ, সকলকে আত্মবৎ ভালবাসা মুখের কথা নয়—সে যদি না পার ত অন্ততঃ তার অনিষ্ট করো না। সেটুকুও চেষ্টা কর, পরে ক্রমশঃ অভাবাত্মক হিংসাশূন্যতা থেকে ভাবাত্মক প্রেম বা সৌহার্দের উদ্ভব নিশ্চয়ই হ'বে। সমভাবে, জীবনবিনিময়েও সত্যকথন অতি কঠিন পণ—প্রারম্ভে অন্ততঃ মিথ্যা কথন থেকে বিরত হও, তার উপরে সত্য কথনের সাহস না থাকলেও। এই নেতিমূলক মিথ্যা-কথনাভাব থেকেই হ'বে ক্রমশঃ সত্যকথনের সাহস-সঞ্চয়। এরূপ 'অস্তেয়' মহাব্রতের নিষেধবাচক দিক্ : 'পরদ্রব্যে হস্তক্ষেপ না করা,' বিধিবাচক দিক : 'নিজের দ্রব্য অকাতরে পরকে দান করা'। স্বার্থ-ত্যাগপূর্বক অপরকে নিজস্ব সম্পদ্ দানও সহজ সাধন

নয়—তজ্জন্য আরম্ভ কর পরের সম্পদে লোভ ত্যাগ করে—তা' থেকেই হ'বে উদয় মনের সেই শক্তি যা' নিজের পরের ভেদ দেয় লুপ্ত করে। এরূপে 'ব্রহ্মচর্য' এই চতুর্থ মহাব্রতের নিষেধবাচক অনুশাসন: 'নিম্নতর সত্তাকে, পশুভাবকে নিয়ন্ত্রিত কর,' বিধিবাচক অনুশাসন: উন্নততর সত্তাকে দেবভাবকে আত্মভাবকে উদ্ভাসিত কর'। পরিশেষে 'অপরিগ্রহ' এই পঞ্চম মহাব্রতেরও দুইটী দিক্ —নিষেধবাচক: 'অসার সাংসারিক বস্তু গ্রহণ করো না'; বিধিবাচক: 'আধ্যাত্মিক বস্তুকে জীবনের সার কর।' এরূপে, প্রতিক্ষেত্রেই দুষ্কর্ম বা সকাম কর্ম থেকে সাময়িক কর্মশূন্যতা, এবং তা'র থেকে সুকর্ম বা নিষ্কাম কর্মে ক্রমোন্নতি হচ্ছে। সাধারণতঃ, আমরা প্রথমে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়ে স্বার্থপরতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে থাকি। তা' থেকে প্রথম উদ্ধারের আশা তখনই হয়, যখন আমরা অন্ততঃ সেই সকল কর্ম পরিত্যাগ করি। পরে, কেবল সেই সকল সকাম কর্ম পরিত্যাগই নয়, তৎসঙ্গে অন্যান্য নিষ্কাম কর্ম সাধনও আমাদের সহজ হয়। এরূপে—ভারতীয় দর্শন যে প্রথমে নিষেধাত্মক (যম) দিকটীকে জোর দিয়ে পরে বিধ্যাত্মক (নিয়ম) দিকটীকে প্রপঞ্চিত করেছে, তা' সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং নীতিকারগণের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

ভারতীয় দর্শন ও নীতিশাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করলেও, ভারতীয় সাধনার এই মূল তত্ত্বটী প্রকটিত হয়—অর্থাৎ, জ্ঞান ও সাধনার স্তরভেদ,—নিম্ন থেকে উচ্চে, অল্প থেকে অধিকে, সহজ থেকে কঠিনে শনৈঃ শনৈঃ, স্থিরসংযত পদক্ষেপে ক্রমশঃ অগ্রসর—অকস্মাৎ আকাশে আরোহণের ব্যর্থপ্রচেষ্টা না করা। নীতির দিকের কথা পূর্বে বলেছি। জ্ঞানের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুই স্ব স্ব স্তরে স্ব স্ব পরিবেশে সাময়িক ভাবে সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়—ক্ষুধাতৃষ্ণাবান্ প্রাণীর নিকট ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরই প্রধান উদ্দেশ্য—ভোজ্য বস্তু, পানীয় জলই তার নিকট চরম লক্ষ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু উচ্চতর জীবনের আভাস যে লাভ করেছে, সেই প্রাণীর নিকট নিম্নস্তরগত ঐ সব বস্তু পূর্ববৎ চরম বা আত্যন্তিক সত্য নয়—আপেক্ষিক বা সাময়িক সত্য মাত্র। এমন কি, কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর বেদান্ত সম্প্রদায়ও তাঁদের সুবিখ্যাত "সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাদে" এই সত্য স্বীকার করেছেন —প্রত্যেক বস্তুরই আপেক্ষিক সত্তা আছে, কিন্তু উচ্চ থেকে উচ্চতর, উচ্চতম সত্তার তুলনায় তা' হয়ে যায় ক্রমান্বয়ে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর, তুচ্ছতম। এই "সত্তাত্রৈবিধ্যবাদ"কে দার্শনিক তত্ত্বরূপে স্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও, কোনো ভারতীয় দার্শনিকই এর অন্তর্নিহিত সত্যকে অস্বীকার করেন নি। বেদ উপনিষদে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। একটী উদাহরণই যথেষ্ট। তৈত্তিরীয়োপনিষদে "ব্রহ্মানন্দবল্লী" নামক তৃতীয় বল্লীতে ক্রমান্বয়ে অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম ও আনন্দ ব্রহ্ম—এই পাঁচটী স্তরভেদে মানবমনের মননশক্তি ও তৎপ্রসূত জ্ঞানের স্তর থেকে স্তরে ক্রমোন্নতি অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। অন্ন সম্বন্ধে এই বলা হয়েছে: "তিনি জানিতে পারিলেন যে অন্নই ব্রহ্ম, কারণ অন্ন হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অন্নের দ্বারাই জীবিত থাকে, পরিশেষে সেই অন্নেই লয়প্রাপ্ত হয়। * * অন্নের নিন্দা করিবে না, তাহা ব্রত। অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না, তাহা ব্রত। অন্নকে বহু বা বর্ধিত করিবে, তাহা ব্রত। বাসের জন্য আগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না, তাহা ব্রত। অতএব

যে কোনো উপায়ে হউক, বহু অন্ন সংগ্রহ করিবে।”

এই একটী দৃষ্টান্তই ভারতীয় দর্শন যে জগতের প্রতি ঘৃণা ও মানববিদ্বেষবাদ প্রচার করে না, তার যথেষ্ট প্রমাণ। এরূপে বহুর মধ্যে এক, নিম্নের মধ্যস্থতায় উচ্চ, জগতের মাধ্যমে অধ্যাত্মলোক লাভ করাই ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র—বহুকে বিনাশ করে নয়, নিম্নকে অস্বীকার করে নয়, জগৎকে তুচ্ছ করেও নয়, বহুকে একে পরিণত করে, নিম্নকে উচ্চে উন্নীত করে, পার্থিব জগৎকে পারমার্থিক লোকের দ্বাররূপে উপলব্ধি করে।

বিপদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

বিপদ রুদ্র ঢোল সমুদ্র নওকো অচেনা,
চিনি তোমার বাড়বানল নাগের বিছানা।
চিনি দারুণ তিক্ত বারি,
সই যে নাকাল দিন সাঁতারি,
চিনি তোমার ঘূর্ণীবায়ুর প্রলয় রচনা।

পারো জানি কোটাল জোয়ার ঝঞ্ঝা ছুটাতে,
ধ্বংস থাকে নিত্য তোমার ভয়াল মুঠাতে
অসীম তুমি শক্তি ধর,
ভগ্ন কর, মগ্ন কর,
পারো বিশাল সমর-তরীর গুমর টুটাতে।

জানি তোমার শক্তি বিপুল অকূল সমুদ্র,
শ্যামা মায়ের পায়ের তলে লুটাও হে ক্ষুদ্র।
হাজার ফণায় মানিক জ্বলে
দোলাও ধীরে কমল দলে,
অভয় কোলে হাসি মায়ের আদুরে পুত্র।

তবু তুমি রত্নাকর হে, জানে আমার মন,
ঢেউ খেয়েছি—তোমার জলে করেছি তর্পণ।
তোমার বিষে প্রায় মরেছি,
তোমার সুধা পান করেছি,
করেছি—জল-সিংহ তোমার কেশর আকর্ষণ।

বিশ্ব-সমস্যায় ভারতবর্ষ

মৌলবী রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

বর্ত্তমান জগতের সমস্যা অনন্ত। সমাধানের পথ সঙ্কীর্ণ। মানুষ দিশেহারা হইয়া পথের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোথায় পথ? আজ আমরা দাঁড়াইয়া আছি একটি সঙ্কটের সম্মুখে। যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারি। অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, সামরিক সমস্যা, দেশের নিরাপত্তার সমস্যা—সর্বশেষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা—সব কিছু মিলিয়া এমন একটা তাল পাকাইয়া দিয়াছে যে মানুষ মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। অতীতে এইরূপ সংকটকালে মহামানব আসিয়া মানুষকে মুক্তির পথ বলিয়া দিতেন। আজ সে মহামানব কৈ? অত বড় যে একটা বিশ্বসমর হইয়া গেল, তাহা কি মানুষের কোন কল্যাণের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হইয়াছে? এই বিশ্বসমর চারিদিকে রাখিয়াছে ধ্বংস ও বিভীষিকার ভয়াবহ নিদর্শন। কোথাও জীবনে আনন্দ নাই, সুখ-সন্তোষ নাই, সর্ব্বত্র জীবন-চাঞ্চল্যের একান্ত অভাব। কেবলই দেখিতেছি মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা! আশার ক্ষীণ রশ্মিরেখা কোথাও ত দেখি না। নিরাশার ঘনান্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আবৃত। মানুষের জীবনে যখন এইরূপ অবস্থা আসিয়া দেখা দেয় তখন সে আত্ম-হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সমগ্র জাতি ত আত্মহত্যা করিতে পারে না। রোমাঁ রলাঁর 'জন ক্রিষ্টোফারে'র একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়িল। ক্রিষ্টোফারের জীবনেও এক সংকটময় মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল। সে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। জীবনে প্রত্যেক ব্যাপারে ব্যর্থ হইয়া সে কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল জীবনকে কি দিয়া পূর্ণ করিবে,—জীবনের আর কি বাকি রহিল? এ ব্যর্থ জীবনের ভার বহন করিয়া কি লাভ হইবে? ক্রিষ্টোফার আত্মহত্যা করিবার জন্য জলের মধ্যে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু হঠাৎ দেখিল নিকটস্থ বৃক্ষে একটি ছোট পাখী প্রাণ ভরিয়া আনন্দের গান গাহিতেছে। আরও দূরে একটি বালিকা ভয়ভাবনাহীন চিত্তে বসিয়া বসিয়া আনন্দ করিতেছে। একটি গাভী শান্তভাবে দাঁড়াইয়া নম্রনয়নে সুদূরের দিকে চাহিয়া আছে। তটিনীর জল তর তর বেগে ছুটিয়া চলিতেছে আর জীবনের জয়গান গাহিতেছে। আর একটি স্থানের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। অদূরে সে দেখিল ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটি অট্টালিকা ভেদ করিয়া সবুজ ঘাস গজাইয়া উঠিতেছে। কি সুন্দর! কি তাজা তাহার প্রাণ! ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই ঘাসগুচ্ছ মৃত্যুকে অস্বীকার করিতেছে। মৃত্যুর রুদ্রলীলার মধ্যে ধ্বংসস্তূপের মৃত্যু-ব্যঞ্জক সমস্ত প্রভাব উল্টাইয়া দিয়া এই ঘাসগুলি ভিতরে ভিতরে অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে শিকড় বিস্তার করিয়া এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণবন্ত হইয়া জীবনের জয় ঘোষণা করিল। তাহারা পৃথিবীকে জানাইয়া দিল যে তাহারা মরিবে না, বাঁচাই তাহাদের কাজ। তাহাদের ব্রত এখনও শেষ হয় নাই। বিশ্ব-নিয়ন্তা তাহাদের দ্বারা যে কাজ করাইবেন

তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই বাঁচিতেই হইবে তাহাদের। তাহাদের তাজা প্রাণ মৃদু-সমীরণের সোনালি পরশে প্রকৃতির শ্যামল বুকে নূতন শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল। শত নিরাশার মধ্যে এইরূপ জীবনের আহ্বান দেখিয়া ক্রিষ্টোফারের আর আত্মহত্যা করা হইল না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মজগতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিরাশার মধ্যে এই যে আশা, বাঁচিবার এই যে আকুল প্রকাশ ইহাই প্রকৃতির চিরন্তন রীতি। বিগত মহাসমর সত্যই পৃথিবীতে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এইখানেই পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের মধ্য হইতেও সৃজনী প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা ভারতবাসীরা বিশ্বাস করি পৃথিবী এত সহজে ধ্বংস হইবে না। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীর ভারত এতটুকুতেই হতাশ হইয়া পড়িবে না। ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীকে বাঁচাইবার মত শক্তি ভারতের আছে। সেই শক্তির সাহায্যে পৃথিবী আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে। আজ তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি।

বিশ্বসমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের মনীষীদের মধ্যে যে একটা গভীর আবেগ ও আন্তরিক ইচ্ছা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে মনে আশা জাগে যে ভারতবর্ষ হইতেই প্রকৃত সমাধানের সূত্র আবিষ্কৃত হইবে। ধর্ম্ম, সাহিত্য শিল্প তো মানুষ ও জাতির জীবনমুকুর। মহাসমরের মত অমন দু'দশটা সাংঘাতিক ঘটনাও কি মানুষের মনের এ আদিম প্রবৃত্তি নষ্ট করিতে পারে? তাই দেখা যাইতেছে যে, এই যুদ্ধের পরেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মানুষ বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। শিল্প ও সাহিত্য নূতন গতিবেগ ও গতিছন্দ লাভ করিয়া পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। যাহারা জীবনকে কেবল খাওয়া-পরার সুবিধা আর কলকব্জার গোলকধাঁধার মধ্যে দেখিতে ভালবাসে, তাহারাও আজ দৃষ্টিভঙ্গিমা পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজ তাহাদের দৃষ্টি সৃষ্টিরহস্যের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাসমর মানবসমাজে নূতন পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহার জন্য নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছে। সামাজিক ব্যাপারেও পরিবর্ত্তনের হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে। রক্তের প্রলয়-সমুদ্রে স্নান করিয়া মানুষের যেন নবজন্ম লাভ হইল। যুগের প্রভাবে পুরাতন জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জীবন-সম্বন্ধে একটি নূতন সংজ্ঞা, নূতন মূল্য ও মর্যাদাবোধ জাগিতেছে, দেশ ও জাতির সীমারেখা লুপ্ত হইতেছে। জাতিগত ও দেশগত কৃত্রিম ভেদজ্ঞান মানব-সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধকে যুগে যুগে কত বাধা দিয়াছে। আজ এই বাধা ও ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়া সমগ্র মানবসমাজকে একই ভ্রাতৃত্বমণ্ডলীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবার দিন আসিয়াছে। ভারতের আদর্শ বিশ্ববোধেরই আদর্শ। এই বিশ্ববোধ এবং অখণ্ড বিশ্বের একতা ও সমতার আদর্শ আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সে কাজ ভারতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিবর্ত্তনের যুগ সমুপস্থিত। সম্মুখে ঐ যে দিকচক্রবাল দেখা যাইতেছে তাহা ত' এক লম্ফেই শেষ হইবে না। তাহা যে অসীম অনন্ত। যতই অগ্রসর হইবে ততই তাহা নাগালের বাহিরেই থাকিবে। এই ভাবে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করিয়া নিখিল বিশ্বকে এক অখণ্ড সত্তাতে পরিণত করিতে হইবে; বিশ্বময় জাতিতে জাতিতে যে প্রভেদ আছে, মানুষে মানুষে যে বৈরভাব আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। তাহার স্থলে একটা বৃহত্তর আবেদন, একটা সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করা একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের

পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুর ও প্রেমপূর্ণ না করিলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। পরস্পর-বিরোধী মতবাদ আদর্শ ও কর্মধারার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এমন এক নূতন মানব-সমাজ গঠন করিতে হইবে যাহা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ হইবে। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইলে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বিঘ্ন-বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উদ্দিষ্ট কর্ত্তব্য হইতে পিছাইয়া পড়িলেও চলিবে না। বিশ্ববোধের অভাবের জন্য জগৎকে দুইটি মহাসমরের অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই দুইটি ধ্বংসকর মহাসমর হইতে মানবজাতি কি কোন শিক্ষাই লাভ করিবে না?

আমরা ভারতবাসী, আমরা আশাবাদী—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গান্ধীর ভারতের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা জগতের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কিছুতেই নিরাশ হইতে পারি না, তাই আমরা বিশ্বাস করি সঙ্কট কাটিয়া যাইবে, সুবাতাস বহিবে। সূচীভেদ্য অন্ধকার অপসারিত হইয়া স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হইবে। ঐ তার আগমনী বাণী শুনিতে পাইতেছি! আজ আমাদের সম্মুখে যে সঙ্কট দেখা যাইতেছে, তাহা নবজন্মের প্রথম-বেদনা মাত্র। আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে মহাসমর যে বিপ্লব ঘটাইল, ব্যক্তিগত জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট অভাব-দারিদ্র্য সৃষ্টি করিল, তাহা দুঃখের ও বেদনার বিষয় হইলেও, তাহা সমাজকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারে নাই। এই সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি মানুষের আছে। তাই সে আজ দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া আছে। মানুষ মৃত্যু ও ধ্বংসকে অগ্রাহ্য করিয়া যে সাহস দেখাইয়াছে, তাহা অসাধারণ—তাহাই আনিবে নূতন জীবন ও সৃষ্টি করিবে নূতন জগৎ। মানুষের মন কখনও স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে না। মানুষের মন সর্বদাই চলমান। ফরাসী বিপ্লব যখন আসিয়াছিল, তখন তাহা একটি মাত্র দেশেই আবদ্ধ থাকে নাই। তাহার প্রভাব দেশকাল অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাসের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। ভারতের ঋষি মুনি ও সাধকদের কণ্ঠ হইতে নবযুগের বাণী ঐ শুনা যায়। আজিকার ভারতবর্ষ সে বাণীর প্রভাব থেকে দূরে সরিয়া যাইতে পারে না। মহাসমর যে ঘুমন্ত বিশ্ববোধের প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছে, তাহা ভারতের মধ্যেও কম্পন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ জড়স্থবিরের মত আর বসিয়া থাকিবে না। তাহার মধ্যেও উচ্ছল প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই সে আজ জীবন-সংগ্রামের জন্য, উন্নতির জন্য, মুক্তির জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারত তাহার সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবনের মান উন্নয়নের জন্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। এক দিন ভারতের জনগণ ছিল অসাড়, পঙ্গু ও সামর্থ্যহীন। তাহারাও আজ জীবন-চাঞ্চল্যে টলটলায়মান। বহির্জগতের কর্ম্মধারার সহিত তাহারা আজ নিবিড় ভাবে পরিচিত হইতে চাহিতেছে। যুগের দাবীর সহিত খাপ খাইবার জন্য তাহারাও আজ চেষ্টা করিতেছে। আজ বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভারতের সমস্যাও বিশ্ব-সমস্যা হইতে পৃথক নহে। বিশ্বসমস্যার সমাধান করিবে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কেহই তাহা পারিবে না। প্রেম, দয়া, সত্য, প্রীতি, অহিংসা, সততা, সদ্ভাব, শান্তি প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলি আজ এই যুদ্ধবিধ্বস্ত জগতের জন্য নিতান্ত দরকার। আজ চাই উদারতা, সহানুভূতি ও সংবেদনশীল মন, আর চাই অপরের দুঃখকে তাহারই মন

লইয়া বুঝিবার ক্ষমতা। আজ আমাদের সম্মুখে যে সকল বিসদৃশ শক্তি ও প্রভাব সক্রিয় হইয়া কাজ করিতেছে, সেগুলিকে প্রেম, ভালবাসা, সদ্ভাব, উদারতার দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত করার সময় সমুপস্থিত। এইরূপ মন লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে সমস্ত ব্যবধান, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সমস্ত বিভেদ দূর হইয়া যাইবে। তাহার স্থানে জন্ম লইবে নূতন জগৎ। এই নূতন জগৎ গড়িতে ভারতবর্ষকে যথেষ্ট দান করিতে হইবে।

যুগ যুগ ধরিয়া ভারতে বহু আদর্শের পরীক্ষা হইয়াছে। ভারতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অন্য কোথাও নাই। ভারতে বহুর মধ্যে একটা ঐক্যের সাধনা হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ কাহাকেও ধ্বংস করে না, সকলকেই আপনার উদার বক্ষে আশ্রয় দিয়াছে। আবার সকলকে আপনার করিবার জন্য, সকলের মধ্যে একটা ঐক্যের সুর এমন ভাবে সংযোজন করিয়াছে যে, ব্যক্তি তাহার নিজস্ব রূপ না হারাইয়াও সকলের সঙ্গে একাঙ্গী হইয়া গিয়াছে। এই ঐক্যের সাধনা কঠিন কাজ। ইউরোপ ইহা পারে নাই। ভারত পারিয়াছে। কারণ ভারতের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে, যে গুণ ইউরোপের নাই। উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সংযম, ক্ষমা, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য ও মহত্ত্ব—এই সব গুণের জন্যই ভারত ঐক্যের সাধনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই সব গুণ এখনও আছে বলিয়াই বর্ত্তমান জগতে ভারতই বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব করিবার অধিকারী। বর্ত্তমান জগতের যে সমস্যা তাহা ভারতই সমাধান করিতে পারিবে। ভারতে ঋষিমুনির আদর্শ ত আছেই। তদুপরি বিগত শতাব্দীতে এমন কয়েক জন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাঁহারা প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও ভাবধারারই ধারক ও বাহক রূপে এযুগের মানুষকে পথনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণ সেই আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারত যে প্রেম ও উদারতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আজিকার যুগে তাহাই বিশ্বসমস্যার সমাধান করিবে। তাহাই আজ আমাদিগকে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিবে। আমরা যে নয়া সমাজের ভিত্তি ও প্রাসাদ গড়িতে চাই, তাহা প্রেম-ভালবাসা, উদারতা, সুবিচার ও সদ্ব্যবহারের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের তরুণদের অন্তরকে এই সব মহৎ আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। জীবনের প্রত্যেক কাজে প্রতিপদক্ষেপে এই ভাবে অগ্রসর হইলে ভারতবর্ষ জগৎকে মহান আদর্শে দীক্ষা দিতে পারিবে। তাহা হইলে সমস্ত ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, প্রতিশোধ-স্পৃহা, যুদ্ধের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে। তাহারই স্থানে শান্তি প্রগতি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের যুগ ফিরিয়া আসিবে। এই ভাবে নিখিল বিশ্বের সকলের সার্ব্বজনীন কল্যাণ হইবে। জগৎকে দিবার মত বহু জিনিষ আছে। ভারতবর্ষকে তাহা দিবার জন্য সাধনা করিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষগণ যে শিক্ষা ও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন তাহা কৃপণের ধন নহে যে লুকাইয়া রাখিতে হইবে—তাহাকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া তুলাই প্রকৃত সাধনা। বিবেকানন্দ বিশ্বময় পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের বাণী প্রচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রচারের ক্ষেত্র আছে। কিন্তু "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই নীতি ব্যতীত আমরা কোন আদর্শই প্রচার করিতে পারিব না। তাই আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দেশবাসীকে আহ্বান করি, আসুন আমরা আমাদের মহামানবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এমন এক সর্ব্বব্যাপক কর্ম্মসূচী রচনা করি যাহা নবযুগের পত্তন করিবে। সেইপথেই ভারতের মঙ্গল—জগতের মঙ্গল।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি "স্বয়ংভু" ও "বে-ওয়ারিশ" ?

ক্যাপ্টেন্ রামেন্দু দত্ত

মাল মাত্রেরই মালিক থাকে। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাতে এই অসংখ্য গ্রহ-তারকা-চন্দ্র-সূর্য্য-শনি-মঙ্গলপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আদি-অন্তহীন বলিয়াই ধরা হইয়াছে। মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া সেই আদি-অন্তহীন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও নিয়ন্তাকে ধরিতে চায়। এবং কেহ কেহ বলেন—স্রষ্টা নাই, অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাঁহাকে 'ভগবান' বলা হয়, তিনি কবি-কল্পনা মাত্র! "যত মত তত পথ"। সুতরাং এ সম্বন্ধেও বহু আলোচনার অবকাশ আছে।

এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে মালিক কেহ নাই একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমার যুক্তি, প্রথমতঃ, এই প্রবন্ধের প্রথম বাক্য। আরও যাহা আছে তাহা পরে বলিতেছি। সেই মালিককে আমি যদি "ভগবান" বলি, তবে সোজা কথায় আমার প্রবন্ধের শিরোনামা হইয়া উঠে—"ভগবান কি আছেন"? শিরোনামাটা এত পুরাতন ও সাধারণ যে, মৌলিকতা মাঠে মারা যাইবার ভয়ে কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া দিয়াছি। ভগবান আছেন কি নাই সে সম্বন্ধে আমার স্বকীয় সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে। নাস্তিকতার ঐতিহ্য মস্তকে লইয়া, নাস্তিকতার আবহাওয়ায় ও আবেষ্টনীতে প্রতিপালিত হইয়া, বিজ্ঞানের নাস্তিকতার কথঞ্চিৎ ও সাংখ্যদর্শনের নাস্তিকতার কিছুটা অধ্যয়ন করিয়া, প্রাচুর্য্য-ভরা জীবনের নাস্তিকতার সুযোগ ঠেলিয়া আস্তিকতার জন্মলাভ সহজ ব্যাপার নহে! দেখিয়াছি, দশমাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর অতি স্বাভাবিক নিয়মে একটি সামান্য মানব-শিশুর জন্মলাভও সময়ে সময়ে সঙ্কট-ঘটাময়-ঘটনা হইয়া উঠে! আর এত শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করিয়া নব-চেতনার জন্মলাভ!

কিন্তু আমার অবচেতনার অবসান ঘটিলে এবং নবচেতনার উন্মেষ হইলেই ত সমগ্র মানব-সমাজে তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে না সুতরাং জীবনে বহু বার বৃহত্তর মানব-সমাজের অন্যান্য সভ্যদের কাছে এই অসভ্য (?) প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি—"ভগবান আছেন, তাহার প্রমাণ কি?" এ কথাটা, এবং "ভগবান নিশ্চয়ই আছেন" এই কথাটিও এত সাধারণ যে সাক্ষ্য, প্রমাণ, যুক্তি, তর্কের দ্বারা তাহার যে কোনটি লইয়া লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা সব সময় স্বীকার করি না। কিন্তু যখন কোনো চিন্তাশীল প্রবীণ ব্যক্তি অথবা অধ্যয়নশীল পণ্ডিত বন্ধু সুষ্ঠু যুক্তির অবতারণা করিয়া ঐ প্রশ্নদ্বয়ের কোনো একটির সমাধান করিতে চাহেন, তখন সে তর্কে যোগ দেওয়ার সার্থকতা অনুভব করি। সম্প্রতি এবম্বিধ একটি যুক্তি-বিগ্রহের (প্রায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, তবে অহিংস) মধ্যে পড়িয়া কতকগুলি দামী-দামী আলোচনা হইয়া গেল; বক্তা শ্রোতা সকলেই প্রবীণ ও স্ব স্ব সাম্রাজ্যে সুপণ্ডিত। তর্ক মধ্যে মধ্যে চূড়া স্পর্শ

করিয়াছিল; যথা—"স্রষ্টা যদি থাকেন তবে তাঁহার স্রষ্টা কে, এবং তাঁহারই বা স্রষ্টা কে ?" .... ইত্যাদি। প্রায় সেই উপকথার চড়ুই পাখীরই মত…যাহারা একটির পর একটি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করিয়া উড়িতে থাকে এবং সমস্যার শেষে পৌঁছানো অসম্ভব করিয়া তোলে! স্রষ্টৃতত্ত্বেরও ঐ ভাবে শেষ হইবে না। চমৎকার যুক্তি! চড়ুই পাখীর শেষ নাই, তর্কেরও শেষ নাই—অতএব বল "স্রষ্টা নাই!"

স্রষ্টা নাই, ভগবান নাই, এত বড় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের মালিক নাই—বে-ওয়ারিশ্! আছেন কেবল তোমাদের গভর্নমেণ্ট্, টেলিভিশান্, প্রেস্-'এট্যাশে' ও য়্যাটম্ 'বম্'!

দিনের পর রাত হয়, রাতের পর দিন; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, ও তাহার পর আসে শীত, আসে বসন্ত—উল্টা-পাল্টা হয় না; দশমাস দশদিন পূর্ণ হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কোনো গভর্নমেণ্টের ফর্মান্, কোনো ডিপ্টী[১] বা সিপ্টী[২]-সাহেবের দস্তখৎ-সম্বলিত "পার্মিট্" প্রয়োজন হয় না। এই রকম দু'-চারটা গভর্নমেণ্টাতীত লক্ষণ ভাগ্যে এখনো পরিলক্ষিত হয়, নতুবা এসব তর্ক-বিচারের কোনো প্রয়োজনই হইত না। বেচারা ভগবান বেমালুম্ কোনো "ল্যাবরেটারীর", অথবা "রিসার্চ-ইন্‌স্টিটিউট্", অথবা কোনো "মিনিষ্ট্রীর" দপ্তরের মধ্যে বিলুপ্ত হইতেন! কে জানে, হয়ত কোনো সত্যিকারের হিট্‌লার্[৩] তাহা হইলে সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে মানবের চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া অন্ততঃ এই পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতা রূপে দেখা দিতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিধাতার হেড্‌কোয়ার্টার এই ক্ষুদ্র গ্রহটি না হওয়াই সম্ভব, সুতরাং তাঁহার দেখা পাইতে হইলে এই পৃথিবীর ডেপুটি-ভগবানের পাস্-পোর্ট ও একটা কোনো মিত্রা কোম্পানীর 'চার্টার' করা এরোপ্লেন দ্বারা হয়ত উহা সম্ভব হইত। কিন্তু পৃথিবীর সে নিরঙ্কুশ অবস্থার কিছু দেরী আছে মনে হয়। কারণ ইহার আষ্টে-পৃষ্ঠে বহু অঙ্কুশ প্রত্যহ প্যাঁট্ প্যাঁট্ করিয়া ফুটিতেছে। সেগুলি হইতেই আমাদের পৃথিবীর নিরঙ্কুশ হওয়া কবে ঘটিবে ও কি রূপে, তাহাই ভাবিতেছি।

আধুনিকতম পদার্থবিদ্যার থিওরি নাকি এই যে 'matter' ও 'energy' এক। —তবে matter যে কখন energy তে পরিবর্তিত হয়, সেই মাহেন্দ্রক্ষণটুকুই নাকি পদার্থবিদ্যাবিৎ তাঁহার ল্যাবরেটারীর আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যেও ধরিতে সমর্থ হন নাই। উহা ধরিতে পারিলেই কোনো Physics এর 'ডক্টর্' হয়ত ডেপুটি-শ্রীভগবান সাজিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং এখন যিনি ভগবানরূপে গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়া থাকেন তিনি deleted হইয়া যাইবেন! এম্‌নিই ত তিনি 'অস্তি' কি 'নাস্তি' তাহারই ঠিক নাই!—'নাস্তি' বলিয়া নস্য টিপিলে 'অস্তি'-ওয়ালাদের অস্থিতে দূর্ব্বা গজাইবে কিন্তু অকাট্য প্রমাণ জোগাইবে না! বৈজ্ঞানিকের এই উপচেষ্টার পূর্ব্ববর্ত্তী কপিল মুনির অপচেষ্টারও নজির আছে! সাংখ্য-দর্শনবাদ ভগবানের এই ন ভূতো ন ভবিষ্যতি অবস্থা পূর্বাহ্ণেই ঘোষণা করিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরও নিরীশ্বরবাদ সুপ্রসিদ্ধ। একেশ্বরবাদ বা একদমবাদ কিন্তু তাঁহাকে এখনো কর্পূরের মত উড়াইতে পারে নাই। বিশ্বাসের জোরে,

[১] ডিপ্টী=Deputy Magistrate　　[২] সিপ্টী=Sub-Deputy Magistrate

[৩] যে পরাজিত নিহত বা কলঙ্কিত হয় না।

কাতরের অশ্রুলোরে, প্রেমাকুলের ভক্তি-ডোরে তাঁহাকে কাহারও কাহারও মিলিয়াছে এবং তর্কে অপরাপরের কাছ হইতে তেমনি তিনি বহুদূরেও আছেন।

সৃষ্টির আদি-তত্ত্বে আসিয়া গবেষকেরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন। একদল বস্তু-তন্ত্রবাদী বলেন—সৃষ্টির কারণ আধিভৌতিক, বস্তুতন্ত্রের নিয়মানুবর্তী, Materialistic.

দ্বিতীয় দল বলেন, সৃষ্টির কারণ, আধ্যাত্মিক, Spiritualistic. কিন্তু "লেটেষ্ট্ থিওরি" নাকি ঐ দুইটিকেও (explode) উড়াইয়া দিয়াছে। দিয়া কি পাইয়াছে তাহা কিন্তু ঐ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর কাছে পাইলাম না। "তর্কে বহুদূর" ব্যতীত তাঁহাদের কাছে আর কি আশা করা যায় ?

বৈজ্ঞানিকের 'কিছুটা' এবং দার্শনিকের 'কিছু না', এমন কয়েক জন Compartmental Scientist, যথা এডিংটন, আইনষ্টিন প্রভৃতির কষ্টবোধ্য সুখপাঠ্য "বিজ্ঞানের দার্শনিকতা" (Philosophy of Science Series) প্রবন্ধা-বলীতেও ঐ সব কথা পাওয়া যায়—পদার্থ-বিদ্যাবিদেরা নিজেদের অপদার্থতা উহাতে বেশ সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন। নিরঙ্কুশ কবির দলের এক জন বলিয়া আমার বিশেষজ্ঞতার অভাব আমাকে ততটা বিশেষ অজ্ঞ করিতে পারে না। আমি তাঁতাঁর মত মধ্যে মধ্যে 'ফার্সি' পড়িয়া ফেলিতে পারি দেখিলাম। "ঢেউ কেন হয়", বৈজ্ঞানিক্ স্যর্ আর্থার এডিংটন তাঁহার যে দ্বিবিধ ব্যাখ্যার শেষে, নিজের মন্তব্য টানিয়াছেন—উহা আমাদের ছন্দে ধরা পড়িয়া মনোজ্ঞ হইয়া উঠে এবং অন্তরে নিরন্তর ধৃত থাকিয়া বিশ্বনিয়ন্তার চরণে মনকে একান্ত নির্ভরাবেশে নিশ্চিন্ত করিয়া রাখে। মনে হয় ঐ পুস্তকে আমাদেরও (অ-বৈজ্ঞানিকের) লেখা কেন থাকে না—শ্রীভগবানের উকিল না জুটুক্ অন্ততঃ পূজারী ত' আছে!

হ্যাঁ, বলিতেছিলাম—"তর্কে বহু দূর।" বিশ্বাসে, সুধু অন্ধ বিশ্বাসে নয়—যেমন চিনি খাইলে মিষ্টতার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় এবং বিশ্বাস হয় যে চিনি তিক্ত নয়, কটু নয়, কষায় নয়, মিষ্ট—তেমনি বিশ্বাস যদি আমার জন্মিয়া থাকে যে চিনির মধ্যে মিষ্টত্বের মত আমার অস্তিত্বের মধ্যে "তিনি" আছেন, তবে কি করিয়া আমি যুক্তিতর্কের, মোটা কেতাবের, অধিকতর পাণ্ডিত্যের মোটা খেতাবের খাতিরে সমর্থনমূলক মাথা হেলাইতে পারি? তর্কসভা অবশ্য আমায় রেহাই দিলেন "মাথা হেলাইতে বলি না" এবং সময় ও সুযোগের অভাবে বাকী আলোচনা তখনকার মত মুলতুবী রহিল।

কিন্তু এ আলোচনার প্রয়োজনও দেখি না। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুনিয়ন্ত্রণ, নিয়মানুবর্তিতা, এত স্বাভাবিক রূপে আবহমান-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে বোধ হয় এই সহজতার জন্যই, মানববুদ্ধি তাহাকে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মত অবহেলার বস্তু ও আলোচনার অযোগ্য ভাবিয়াছে। যাহা রোজ ঘটে, অতি সহজে স্বাভাবিক ভাবে ঘটে; যাহাতে ধর্মঘট নাই, ব্লকেড্ নাই, clogging নাই; তাহার মধ্যে আলোচনার বা মাথা ঘামাইবার কি থাকিতে পারে?

আজ মানুষের মাথা ঘামাইয়া তুলিয়াছে Communism, Socialism; Democracy, hypocricy, Commonwealth ও uncommon wealth. তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে অস্বাভাবিক "য়্যাটম্‌বম্-প্রসূ" বিজ্ঞান; স্বাভাবিক নিয়মই তাহার কাছে নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতেছে। দুনিয়া স্বাধীন হইতে স্বাধীনতর হইয়া চলিয়াছে। পুত্র পিতা হইতে স্বাধীন

হইতেছে ; কন্যা তাহার মাতা হইতে, ছাত্র তাহার শিক্ষক হইতে স্বাধীন হইতে চায় ; চাকর তাহার মনিব হইতে, মুটে তাহার মোট হইতে ; 'সাব্-ইন্স্পেক্টার' আজ তাহার 'ইন্স্পেক্টার' হইতে স্বাধীন এবং 'ইন্স্পেক্টার' স্বাধীন তাহার 'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্' হইতে! 'কিংডাম' স্বাধীন হইয়া হইতেছে—'ডোমিনিয়ান্'। 'রিপাব্লিক' স্বাধীন হইয়া হইতেছে 'কমন্-ওয়েলথ্' এবং কমন্ওয়েল্থের কর্ণ ধরিয়াছে আন্-কমন্ওয়েলথ্ (uncommon wealth)! এই স্বাধীনতার যুগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বা সুযোগ হারায় কেন? তাহাকেও বিশ্বপিতা ও ব্রহ্মার কবল হইতে স্বাধীন হইতে হইবে। এই যদি না হয় তবে স্বাধীনতার অগ্রদূতেরা বাহাদুরী পায় কিসে? ভগবানকে "ভগবান্ রক্ষা করুন!" আমি তাঁর অধম সন্তান, যেন অধীনই থাকি। কারণ বহু পুরুষ চাকুরী-জীবী বলিয়া জনৈক বন্ধু (পেশা—ওকালতী) আমায় বলিয়াছেন যে, আমরা Slave dynastyর লোক। আধুনিক স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যখন নাই, তখন তাহা চাহিতে গিয়া মাতাপিতা ও পরমপিতাকে অস্বীকার করিতে চাহি না।

আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে স্বয়ংভূ অথবা বে-ওয়ারিশ্ বলিয়া বিশ্বাস করি না। বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত থাকুন তাঁহার atom-splitter লইয়া এবং দার্শনিক থাকুন তাঁহার কপিলমুনির গ্রন্থ লইয়া ;—তাঁহারা এবং তাঁহাদের ধাত্রী ধরণী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু বই ত' কিছুই নয়। টুলি-ষ্ট্রীটের তিনটি দর্জির মতই তাঁহাদের আর্জির গুরুত্ব—ভগবান তাঁহাদের রক্ষা করুন! আমাদের তিনি ধ্বংস করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিন ও গোলামী মনোবৃত্তিযুক্ত এই গোলামের জাতকে তাঁহার খাস-গোলামীর সুযোগ দিন। আমাদের এ পৃথিবীতে আর রক্ষা করিতে হইবে না, যদি তাঁর চরণে * স্থান পাই।

* গীতাঞ্জলি—আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ-ধূলার তলে—

কৃতজ্ঞতা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

তুমি মোরে করিলে সম্রাট
হে অলক্ষ্য গুহাচর, এই পৃথ্বী পরে—
ঐশ্বর্য সম্পদ শূন্য বিনা আড়ম্বরে
কোথা হতে আনি দিলে মহা-সিংহাসন
অনন্ত গৌরবময়—বিজন আলয়ে সুগোপন
একান্ত তোমারি ছিল যাহা, হে বিরাট
সে প্রতিষ্ঠা আজি—
আমারে করিলে দান। সেই বিত্তরাজি—
নিবিড় অন্তরে মোর অমূল্য সঞ্চয়।

পৃথিবীর যত না মর্যাদা মান-গর্বচয়—
হেলায় রহিল পড়ি দূর অতি দূর।
যে প্রাণ মরিতেছিল শঙ্কা ব্যথাতুর—
সহস্র দীনতা তার এমন নীরবে
কী কৌশলে আপনার অমৃত-বিভবে—
নিমেষে ঘুচালে তুমি রাজরাজেশ্বর
হে সত্য, নিভৃততম স্ব-প্রভ ভাস্বর।

কস্‌মিক্ রশ্মি

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

১৯৪৫ সনের ৬ই আগষ্ট তারিখে যখন হিরোসিমা শহরে প্রথম আণবিক বোমাটি একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিল সেদিন থেকে জড়ের অফুরন্ত শক্তি সম্বন্ধে সকলের একটা মোটামুটি ধারণা হ'ল। তখন শোনা গিয়েছিল যে আণবিক বোমার রহস্য একমাত্র আমেরিকার আয়ত্তাধীন। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন শক্তিশালী জাতি এই মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে চেষ্টিত হ'ল। এমন একটা সংবাদও প্রকাশ পেয়েছিলো যে রুশিয়া নাকি আণবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী বোমা আবিষ্কার করতে সক্ষম হ'য়েছে কারণ এতে কস্‌মিক্ রশ্মি ব্যবহৃত হ'য়েছে। হয়'ত ব্যাপারটা সত্যি নয় কিন্তু এর পর থেকে এই রশ্মিটির স্বরূপ কি এবং অঘটন ঘটাবার ক্ষমতাই বা এর কতটা তা জানতে লোকের আগ্রহ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষে কস্‌মিক্ রশ্মির অস্তিত্ব জানা গেছে আজ নয়, প্রায় তেইশ বছর আগে।

জড়ের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন ডাল্টন পরমাণুকে জড়ের মূল উপাদান ব'লে স্বীকার করেছিলেন। এই পরমাণুকে অতি ক্ষুদ্র এবং নিরেট ব'লে কল্পনা করা হ'য়েছিল এবং এর চাইতে ছোট আর কিছু হ'তে পারে না। দুইটি মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের জন্যই ঘটে থাকে এবং পরমাণু কখনই ধ্বংস হয় না। এর ভরও অপরিবর্তিত থাকে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে পরমাণুই শেষ কথা নয়। একে ভেঙ্গে তিন ধরনের কণিকা পাওয়া গেছে। অবশ্য পরমাণু বা পরমাণু নির্গত কণিকাসমূহকে মানুষ চোখে দেখতে পায় নি। তবু গণিতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং গবেষণাগারে সূক্ষ্ম পরীক্ষায় এরা ধরা পড়েছে। এক প্রকার কণিকা হ'চ্ছে প্রোটন—এগুলো ধনাত্মক (positive) তড়িৎগ্রস্ত কণিকা। দ্বিতীয় প্রকার নিউট্রন—এরা তড়িৎ-বিহীন কিন্তু এর ভর এবং প্রোটনের ভর সমান। তৃতীয় প্রকার হ'চ্চে ইলেক্‌ট্রন। এতে আছে ঋণাত্মক (negative) তড়িৎ এবং এর ভর প্রোটনের চাইতে প্রায় দু'হাজার গুণ কম। এজন্য বলা হয় যে ইলেক্‌ট্রনের ভর নেই। প্রতি পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন ঠিক ততগুলি ইলেক্‌ট্রন আছে যাতে মোটের উপর পরমাণুটি তড়িৎবিহীন। পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। এই প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত সংখ্যা নির্দ্দেশ করে পরমাণুর ভর। কেন্দ্রকের চার পাশে বিভিন্ন কক্ষে ইলেক্‌ট্রনগুলি আবর্ত্তিত হ'চ্চে। প্রোটন বা ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা দ্বারা মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়। পরমাণু থেকে ইলেক্‌ট্রনকে সরিয়ে দেওয়া বিশেষ শক্ত নয়। তাপ প্রয়োগ করলে বা তড়িৎক্ষেত্রে পরমাণুকে রাখলে ইলেক্‌ট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে সরে যায়। কাজেই তখন পরমাণুর ঋণাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ কমে যায়

এবং পরমাণুর ধনাত্মক বিদ্যুৎ বৃদ্ধি পায়। তখন পরমাণুটিকে বলা হয় ধনাত্মক আয়ন। আবার ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বেশী হ'লে পরমাণুটি হ'য়ে যায় ঋণাত্মক আয়ন। প্রায় সব অবস্থাতেই কেন্দ্রক অবিকৃত থাকে।

সাধারণ অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থ তড়িৎ-পরিবাহী নয়। কিন্তু যদি গ্যাসের পরমাণুগুলি 'আয়নিত' হয় তখন সেই গ্যাস পরিবাহক হ'য়ে পড়ে এবং সে ক্ষেত্রে কোন তড়িৎগ্রস্ত বস্তু গ্যাসের মধ্যে রাখলে বস্তুটির তড়িৎ-সংস্থান (electric charge) হ্রাস পায়। কারণ বস্তুটি বিপরীত তড়িৎধর্ম্মী গ্যাস-পরমাণুকে আকর্ষণ করে। কোন একটি রুদ্ধ কক্ষে একটি তড়িৎগ্রস্ত ইলেক্‌ট্রস্কোপ (এই যন্ত্রদ্বারা তড়িতের. বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং তড়িৎসংস্থান জানা যায়) রাখলে সেই কক্ষে অবস্থিত গ্যাসের পরমাণুসমূহ তড়িৎগ্রস্ত কিনা জানা যেতে পারে।

একটি অদ্ভুত ঘটনা বিজ্ঞানী গাইটেল লক্ষ্য করলেন। সম্পূর্ণ অন্তরিত (insulated) অবস্থায় একটি ইলেক্‌ট্রস্কোপকে একটি কক্ষে রাখলেও এর তড়িৎসংস্থান লুপ্ত হয়। যেন কোন কারণে কক্ষস্থিত গ্যাসের পরমাণু আয়নিত হ'চ্ছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বললেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে য়ুরেনিয়ম এবং আরও যে সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে তা থেকে বিচ্ছুরিত আল্‌ফা (দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রনের সমষ্টি), বিটা (ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি) ও গামা রশ্মি (তড়িৎবিহীন এক প্রকার শক্তিশালী রশ্মি) কক্ষস্থ গ্যাসের পরমাণুসমূহকে তড়িৎগ্রস্ত করে—ফলে ইলেক্‌ট্রস্কোপের তড়িৎ-সংস্থান হ্রাস পায়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে এই মত ভ্রান্ত। কারণ ইলেক্‌ট্রস্কোপকে বেলুনে ক'রে উর্দ্ধাকাশে প্রেরণ ক'রে দেখা গেছে যে সেখানে যন্ত্রটির তড়িৎ-সংস্থান অধিক-হারে লোপ পায়। আবার যন্ত্রটিকে এমন একটি বিশেষভাবে নির্ম্মিত কক্ষে রাখা হ'ল যার-মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। তথাপি তার তড়িৎ-বিলুপ্তি ঘটেছে। আবার কি দিন কি রাত্রি, তড়িৎ-বিলুপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। ১৯২৩ সনে বিজ্ঞানী মিলিকান ও বাউয়েন একটি বেলুনে করে ৫২০০০ ফিট উর্দ্ধে ইলেক্‌ট্রস্কোপ প্রেরণ করে পরীক্ষা করেন। এই ভাবে অনেক বিজ্ঞানী সমুদ্রপৃষ্ঠে, জলের নীচে নানা ভাবে ইলেক্‌ট্রস্কোপ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে কোন এক শক্তিশালী রশ্মির জন্যই ইলেক্‌ট্রস্কোপের এই পরিবর্ত্তন ঘটছে এবং যে গামারশ্মি এত দিন সব চাইতে শক্তিশালী ব'লে জানা গিয়েছিল এই রশ্মির কার্য্যকারিতা তার ১৮ গুণ বেশী। এই রশ্মির নাম দেয়া হয়েছে কস্‌মিক্ রশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্মি। বিজ্ঞানী মিলিকান সর্ব্বপ্রথম এই নামকরণ করেন।

রশ্মি-তরঙ্গ কতকটা পুঞ্জাকারে নির্গত হয়। এই তরঙ্গগুচ্ছকে ফোটন বলা হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হয় ফোটনের আয়তন তত সঙ্কুচিত হয়ে অবশেষে কণিকাসুলভ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (যেমন ভর, মোমেন্টাম বা সম্বেগ) আহরণ করে। কস্‌মিক্ রশ্মি পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হ'লে এর এমন কতগুলি পরিবর্ত্তন ঘটে যায় যেজন্য এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। এর গঠন অত্যন্ত জটিল। এই রশ্মির ব্যবহার কতকটা তরঙ্গ এবং কতকটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত কণিকার মত। কস্‌মিক্ রশ্মি ফোটন, ইলেক্‌ট্রন এবং আরও এমন কতগুলি কণিকা দিয়ে তৈরী যাদের অস্তিত্ব সম্প্রতি জানা গেছে। যখন বিজ্ঞানী মিলিকান সর্ব্বপ্রথম কস্‌মিক্ রশ্মি

নিয়ে গবেষণা করেন তখন তিনি এই রশ্মিকে কণিকার সমষ্টি ব'লে মনে করেছিলেন। সেই সময় অধ্যাপক জীন্‌স্ এই রশ্মিকে গামা রশ্মির চাইতে ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এক প্রকার তরঙ্গ বলে ঘোষণা করেন। মিলিকানের নিকট যখন এই দুই মতবাদের কোন্‌টি ঠিক জানতে চাওয়া হয় তখন তিনি উত্তর দেন যে জীন্‌স্ এক প্রকার বলেন আর তিনি বলেন অন্য প্রকার। আসলে তাঁরা দুজন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। ("He says one thing and I say another. In fact none of us know anything.")

কস্‌মিক্ রশ্মির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে সেটুকু হ'চ্ছে এই যে খুব সম্ভব পরমাণুর কেন্দ্রকের ভাঙ্গনের ফলেই এই রশ্মি সৃষ্ট হয়। সূর্য্য বা নক্ষত্রে পদার্থের যেরূপ অবস্থান তাতে সেখানে কস্‌মিক্ রশ্মির জন্ম হ'তে পারে না। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে কস্‌মিক্ রশ্মি সুদূর ছায়াপথের ওপারে জন্মলাভ করে। আইনষ্টাইনের মতে পরমাণুর পূর্ণ বা আংশিক রূপান্তরে কস্‌মিক্ রশ্মির উৎপত্তি। আবার কারুর মতে বোরন, এলুমিনিয়ম, কার্ব্বন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির জন্যও এই রশ্মি সৃষ্ট হ'তে পারে।

কোন কোন বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্ত করেন যে প্রাণিদেহের উপর কস্‌মিক্ রশ্মির ক্রিয়ার জন্যই পিতামাতার সঙ্গে সন্তান-সন্ততির কিছু কিছু আকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। হয়ত এই রশ্মির প্রভাবেই জীবজগতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটছে এবং জীব ক্রমেই উন্নততর অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগে ক্যান্‌সার প্রভৃতি রোগ নিরাময় করার সম্ভাবনা আছে।

যদি ধরে নেয়া যায় যে জড়ের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির (annihilation) জন্যই কস্‌মিক্ রশ্মি জন্ম নেয় তবে এর চাইতে অধিকতর অন্তর্ব্বলসম্পন্ন কোন কিছু সৃষ্ট হ'তে পারে না। য়্যাটম বোমাতে পরমাণু থেকে যে তেজ নির্গত হয় তা পরমাণুর সমগ্র অন্তর্ব্বলের সহস্রাংশের এক অংশমাত্র। কসমিক রশ্মি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হয়ত বিজ্ঞানীর আয়ত্তে আসবে না—যদি আসে তবে তেমন দিন যেন পৃথিবীতে না আসে। কল্যাণসাধনার চাইতে ধ্বংস করার দিকে মানুষের ঝোঁক যেন বেশী। গতযুদ্ধে যে মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ঘটেছে তার চাইতে অনেক সাংঘাতিক হবে এই রশ্মির প্রয়োগ। তখন কোথায় থাকবে মানুষের এই দীর্ঘদিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মানুষে মানুষে দ্বেষ-হিংসার ফলে আজ পৃথিবী কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ক্ষুদ্র দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে সমগ্র-ভাবে সকল মানুষের কল্যাণ-চিন্তায় জগতের মনীষীরা আত্মনিয়োগ করুন। তবেই বিজ্ঞানীর সাধনা সার্থকতা লাভ করবে।

কালিদাস

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

মহাকবি কালিদাস কেবল ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি নন, তিনি বিশ্বের বরেণ্যতম কবিদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষের পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের সময় মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব; এই জন্য কালিদাসের রচনায় ভারতের আদর্শ ও কৃষ্টি এবং কবিশক্তির পূর্ণতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববরেণ্য কবিরাও সাধারণতঃ সাহিত্যের বিভাগ-বিশেষেই মাত্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন; কেহ বা নাটকে, কেহ বা কাব্যে, কেহ বা মহাকাব্যে, বা অন্য কোনও বিষয়ে। কিন্তু মহাকবি কালিদাস কাব্য-সাহিত্যের বিভিন্ন দিগ্‌বিভাগে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। নাটকে অভিজ্ঞানশকুন্তল, খণ্ডকাব্যে মেঘদূত, মহাকাব্যে রঘুবংশের সঙ্গে তুলনীয় গ্রন্থ সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে সৃষ্ট হয়নি। বস্তুতঃ ঈদৃশ বিরাট বহুমুখী প্রতিভা জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

শেক্সপীয়ারের ন্যায় কালিদাসও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী অবলম্বনে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। তাঁর বাল্যজীবনের ঋতুসংহার এবং মধ্য-জীবনের মেঘদূত ব্যতীত অন্য সকল বিশিষ্ট গ্রন্থেরই মূল উপাখ্যান রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাস থেকে গৃহীত। এমন কি, মেঘদূতের মূল বস্তুর উপরেও নল-দময়ন্তী-হংস-সংবাদ, বিশেষতঃ রাম-সীতা-হনুমৎ-সংবাদের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এস্থলে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা-বিশেষ অবলম্বনে বিরচিত হলেও কালিদাস তাঁর অপূর্ব মনীষাবলে এই সকল পুরাতন কাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। যথা, অভিজ্ঞানশকুন্তলের উপাখ্যান। এই নাটকে মহাকবি দুষ্যন্ত শকুন্তলার চরিত্র এমন নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করেছেন, যাতে এঁদের চরিত্রের দুর্বলতা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। মহাভারতের শকুন্তলা স্বীয় পুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিষয়ে দুষ্যন্তকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়ে তবেই দুষ্যন্তকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হন। উত্তর-কালে দুষ্যন্ত জেনে শুনেই হস্তিনাপুরের রাজ-দরবারে শকুন্তলাকে কলঙ্কভয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের দুর্বাসার শাপ, অঙ্গুরীয়ক-বিষয় ঘটনাবলী যে অমর দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনী আমাদের ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে প্রচলিত, তা' কিন্তু মূল মহাভারতে একেবারেই নেই। তা' সম্পূর্ণ কালিদাসেরই অনবদ্য সৃষ্টি। মহাভারতের দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার চরিত্রের দোষ অতি প্রকট-ভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু কবি তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপলব্ধি করলেন যে, মানব-চরিত্রের সাধারণ দুর্বলতাগুলিকে ঈদৃশ নগ্নভাবে প্রকটিত করলে, তাতে নরনারীর প্রেমমূলক কাব্যের কাব্য-রস ব্যাহত হয়। তজ্জন্য তিনি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকাহিনীকে একটী সম্পূর্ণ নূতন পবিত্র রূপ প্রদান করলেন; ফলে আজ মহাভারতের মৌলিক কাহিনী অবলুপ্তপ্রায়;

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকাহিনী বলতে আমরা আজ কালিদাসের এই সুমধুর কাহিনীটাই বুঝি।

মানব-চরিত্রের সাধারণ দোষ ও দুর্বলতাও যে প্রেমের পবিত্র শিখায় খাঁটি সোনায় পরিণত হয়, আদর্শবাদী কালিদাসের এই ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তজ্জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যেমন, তেমনি অন্যান্য সকল নাটকেও তিনি সমভাবে মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির মূল উপাখ্যান-বর্ণিত স্থূল ব্যাপারগুলির উপরেও এমন একটী অমৃতময় প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছেন যে, তা'তে মানব-চরিত্রের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিক্‌টাই কাব্যরস-সিঞ্চিত হয়ে আমাদের সম্মুখে সহস্রদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠেছে।

সে জন্য কুমারসম্ভবেও আমরা যা' পাঠ করে বিমুগ্ধ হই, তা' পুরাণাদিতে বর্ণিত শিবদুর্গার সাধারণ বিবাহ এবং দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম-বৃত্তান্ত নয়, তা' হচ্ছে তপস্বিনী কুমারী উমার, তপঃক্লিষ্টা অপর্ণার পরম দেবতা লাভ—দৈহিক সৌন্দর্যের দ্বারা নয়, দুর্জয় তপস্যার দ্বারা, পবিত্র প্রেম দ্বারা, একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা। সেইজন্যই কালিদাস এই কাব্যে মদনভস্ম. রতিবিলাপ, প্রভৃতি বহু নূতন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা' মূল গ্রন্থে একেবারেই নেই।

কালিদাস-কাব্যের মূল সুরটীর কথা উপরে উল্লেখ করেছি। এটী আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিরই চরম আদর্শ—আত্মার উৎকর্ষের দ্বারা দেহের, সূক্ষ্মানুভূতির দ্বারা স্থূল প্রত্যক্ষের, প্রেম দ্বারা কামনার, সাধনার দ্বারা দুর্বলতার জয়। এই সম্পর্কে কালিদাস-প্রদত্ত প্রেমের সংজ্ঞাটী কাব্য-জগতে অমর হয়ে আছে। কুমারসম্ভবে পার্বতী রূপসম্ভার নিয়ে শিবের নিকট উপস্থিত হলে মদন ও বসন্তের সহায়তা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আস্‌তে হয়েছিল নিজের রূপকে ধিক্কার দিয়ে; তখন কালিদাস বল্‌ছেন—

"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।"

রূপ কি? প্রেমিকের নিকট প্রিয়ার দৈহিক রূপ কিছুই নয়—প্রকৃত প্রেম ক্ষণস্থায়ী দৈহিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না, প্রকৃত প্রেম হচ্ছে আত্মায় আত্মায় মিলন। প্রিয়ার যে আত্মার সৌন্দর্য প্রেমিক আবিষ্কার করেন, সেই চারুতাই তাকে প্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে; দৈহিক রূপ কদাপি নয়। শকুন্তলা, উমা প্রভৃতি কালিদাস-কাব্যের অমর নায়িকাবৃন্দ এই শাশ্বত সত্যই প্রকটিত করে গেছেন। এরূপে ভারতীয় আদর্শবাদী কালিদাস জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার-পূর্বক বহু জন্মের স্মৃতি-সংবলিত ভাবস্থির সৌহার্দকেই প্রকৃত প্রেমের মূলীভূত কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের সেই বহুশ্রুত "রম্যাণি বীক্ষ্য" ইত্যাদি কবিতাটীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধেরও একটি সুন্দর চিত্র পাই এই কবিতাটীতে। সাংসারিক ভোগসুখরত মানব আত্মদৃষ্টিহীন, অজ্ঞ জীবন যাপন করে। কিন্তু সত্যই কি সে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের অধিকারী? না, তা' নয়, কারণ—আনন্দ ও সুখ, প্রেম ও কামনা এক নয়। সেজন্য এরূপ ভোগ ও বিলাসাচ্ছন্ন মানবের জীবনেও এমন এক শুভদিন অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, যখন তার মনে উদয় হয়—পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যাকে বলে —Divinie Discontent—উচ্চতর জীবনের জন্য আকুল আগ্রহ এবং এই আত্মদর্শনে তার প্রথম সহায় হন প্রকৃতি দেবী। প্রকৃতির শান্ত সুপবিত্র সৌন্দর্যদর্শনে কোন্ এক

শুভ ক্ষণে তথাকথিত সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন অবোধ মানবের মনেও জাগে জন্মজন্মান্তর কাহিনী—কি এক উচ্চতর জীবনের আভাস, কোন্ এক পবিত্র প্রেমের স্মৃতি!

ত্যাগই যে ভারতের শাশ্বত আদর্শ, কিন্তু ত্যাগের অর্থ সংসারকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা নয়, মানবকে ঘৃণা করাও নয়, কিন্তু ভোগের মধ্যেও ত্যাগ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ। যে অল্পসংখ্যক চিরসন্ন্যাসী মহাপ্রাণ প্রথম থেকেই ত্যাগের ক্ষুরধার পন্থা অনুসরণ করতে সমর্থ তাঁরা অবশ্যই ধন্য। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ মানবের পক্ষে সংসারের প্রলোভন-পিচ্ছিল জীবনের বাধা-বিঘ্নের ভেতরই লুকিয়ে থাকে মুক্তির মহামন্ত্র। সেজন্য ঈশোপনিষৎ বলেছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর। এই কারণেই ভারতীয় আদর্শ কেবল অরণ্যচারী মুনি ঋষিরাই নন, পুরুষসিংহ ভীষ্মদেব, রাজর্ষি জনকও সমভাবে। ভারতীয় মতে পরিপূর্ণ সন্ন্যাস-জীবনই মানবের চরম লক্ষ্য—প্রাসাদেই হোক্ বা আশ্রমেই হোক্, প্রথম থেকেই হোক্ বা ভোগসঙ্কুল পথের ভেতর দিয়ে অবশেষেই হোক্, এই সন্ন্যাস, এই আত্মশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি, আত্ম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবকে পৌঁছাতেই হবে,—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, আর অন্য কোনও পথ নাই। ভারতীয় কৃষ্টির মূর্তিমান্ ধারক সত্যদ্রষ্টা কালিদাসও এই আদর্শের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীরাই প্রকৃত সম্পদের অধিকারী—এবং কেবল তাঁরাই করতে পারেন সেই অক্ষয় সম্পদ দান, যা ক্ষুদ্রকেও করে ভূমার অধিকারী, মরকেও করে অমর।

প্রকৃতির পূজা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গরিমা ও মহিমার নিকট মস্তক অবনত করাও ভারতীয় কৃষ্টির অন্যতম অভিব্যক্তি। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে দেখতে পাই যে, মানবসভ্যতার সেই প্রথম উষাগমে পুণ্যশ্লোক ভারতের ঋষিগণ উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন বিশ্বপ্রকৃতিরই বন্দনাগান,—যে অনন্ত সৌন্দর্য, আনন্দ ও অমৃতের নির্ঝরধারা প্রবাহিত হচ্ছে এরই অন্তরালে, তাকেই তাঁরা জানিয়েছেন যুক্তকরে প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি। সত্যসন্ধানী ঋষি কালিদাসও করে গেছেন অকুণ্ঠচিত্তে এই সৌন্দর্যেরই উপাসনা। চারিদিকে চোখ মেলে আমরা যা দেখি দু'বেলা,—সেই অতি সাধারণ আকাশ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নদ, নদী প্রভৃতি—তাঁর নিগূঢ় অনুভূতিতে উপলব্ধ হয়েছে এক নবীন রূপে এবং তাঁর সুনিপুণ তুলিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে এক অপরূপ সৌন্দর্যে আমাদের সম্মুখে।

ভারতীয় ঋষিদের মতই কালিদাস পেয়েছিলেন বিশ্বের ভেতরে বিশ্বপিতার নিদর্শন। সেই জন্য তিনি প্রকৃতির সহিত একাত্মভাবে সম্মিলিত হতেন, প্রকৃতির ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিবস্তুতে স্বীয় প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতেন; তজ্জন্য প্রকৃতির সকল বস্তুই ছিল তাঁর বড় আদরের ধন, গর্বের সম্পদ্। প্রত্যেক বস্তুই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতেন। ফলে কবি কালিদাস হয়ে উঠেছিলেন বিজ্ঞানী কালিদাস এবং তাঁর কাব্যে এমন অনেক বস্তুর বর্ণনা আমরা পাই যা' অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। যথা, রঘুবংশে (১৪-৩৮) জলের উপরে তৈলের বিস্তৃতি-ভঙ্গির বর্ণনা সত্যি অপূর্ব; পুনরায় রঘুবংশে (৪-৬৭) কুঙ্কুমকুসুমের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা অন্য কোথাও নাই। কুরুবক, কুটজ, কর্ণিকার প্রভৃতি পুষ্পবিষয়েও কালি-দাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনাও কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁর কাব্যে তিনি, যেসব

পুষ্পের বর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা' সম্পূর্ণভাবে আধুনিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর কবি-কল্পনায় বৈজ্ঞানিক সত্য স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের, কল্পনার সঙ্গে সত্যের, এরূপ অপূর্ব সম্মেলন অতি বিরল। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক-প্রবর Ryder সত্যই বলেছেন "It is delightful to imagine a meeting between Kalidas and Darwin; they would have understood each other perfectly; for in each, the same wealth of imagination worked with the same wealth of observed facts."

কালিদাস মিলনের কবিরূপে সুপ্রসিদ্ধ। প্রেম যখন বহুসাধনালব্ধ ধন, তখন সাধনার শেষ যেমন সিদ্ধিতে, তেমনি প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতিও মিলনে। সেইজন্য তিনি প্রায় সর্বত্র মিলনেরই জয়গান করেছেন; কিন্তু মিলনের পূর্বে যে বিরহ, তার মাধুর্য তো কম নয়;—মিলনেচ্ছু হৃদয়ের এই যে আকুল আকূতি, অথবা চিরবিরহের যে অন্তহীন শোকনির্ঝরধারা তা কোন্ কবিহৃদয়কে না উদ্বেলিত ও অনুপ্রাণিত করেছে? সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস বিরহবর্ণনাতেও অপূর্ব রসের সমাবেশ করেছেন, যথা অজবিলাপ, রতিবিলাপ প্রভৃতি বিরহ-কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে—মেঘদূতের কথা তো বাদই দিলাম।

হাস্যরসের অবতারণাতেও কালিদাস পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অভিজ্ঞানশকুন্তলে বিদূষক, রাজশ্যালক প্রভৃতি চরিত্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু কালিদাস ভবভূতির ন্যায় ভয়ানক, রৌদ্র ও বীভৎস রসের বর্ণনা কুত্রাপি করেন নি। যথা, গ্রীষ্মকালে গভীর বনে তাপক্লিষ্ট অজগর সাপের দেহ থেকে স্রোতের আকারে ঘর্ম বিনির্গত হচ্ছে এবং পিপাসার্ত টিকটিকি তা' আকুল আগ্রহে পান করছে—ভবভূতির অঙ্কিত এরূপ বীভৎস চিত্র কালিদাসের কাব্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কালিদাস ছিলেন প্রকৃতির পূজারী, সত্যের পিপাসু, বিজ্ঞানের অনুসন্ধানী, কিন্তু আধুনিক অর্থে বস্তুবাদী নন্। তাঁর কবিদৃষ্টির সামনে সব বস্তুই প্রতিভাত হতো এক অপরূপ সৌন্দর্যবিমণ্ডিত রূপে। সেজন্য সংসারের বীভৎসতা ও কদর্যতা সম্বন্ধে তিনি নীরব।

কালিদাসের কাব্যের ভাব-সম্পর্কে সামান্য ছু'একটি কথা সংক্ষেপে বললাম। তাঁর ভাষা-সম্বন্ধেও স্বল্প সময়ে অধিক কিছু বলা অসম্ভব। কালিদাসের রচনার একটি বিশেষ সৌন্দর্য ভাষার অপূর্ব সারল্য ও সাবলীলতা। যাঁরা সত্যকে সুস্পষ্ট ও সুগভীর ভাবে উপলব্ধি করেন, তাঁরা সাধারণতঃ তেমনি সরল অথচ জাজ্বল্যমান ভাবে সেই সত্যকে প্রকাশও করেন; সেইজন্য দৃষ্ট হয় যে উপনিষদ্, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও সুমধুর; অথচ মানবচিত্তকে অনুপ্রাণিত করতেও এরা অতুলনীয়। কালিদাসেও এই সরলতা ও সুমধুরতার অপূর্ব সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষ ভূমার পূজারী—এই ভারতের ঋষিই বলেছেন, "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"। স্বয়ং ভারতবর্ষই অন্তরে বাহিরে বিরাট, বাহ্য প্রকৃতিতে তার গগনচুম্বী হিমাচল, দেশদেশান্তর-প্রবাহিনী গঙ্গাযমুনা, অন্তবিহীন মরুভূমি, বিশাল-বনানী প্রভৃতি জগতের বিস্ময়ের বস্তু; অন্তরালোকে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সমভাবে তার বিশালত্ব ও গভীরত্বও সর্বজনবন্দ্য। ঈদৃশ বিরাট ভারতবর্ষেরই বিরাটতম কবি কালিদাস,

—তাঁর কবিপ্রতিভা ভারতের হিমাচলেরই ন্যায় উত্তুঙ্গ, গঙ্গার ন্যায় স্বচ্ছ সুমধুর, মরুভূমির ন্যায়ই অতি বিস্তীর্ণ, বনানীর ন্যায়ই শ্যামল সতেজ। ভাব ও ভাষার দিক থেকে সকল প্রকার গুণবিমণ্ডিত তাঁর কাব্য পরবর্তী সকল ভারতীয় কবিদের প্রভাবিত করেছে। সুতরাং ভারতীয় কবি-প্রতিভা যে মূলতঃ কালিদাস-কবিপ্রতিভা তা' বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।*

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিও'র সাহিত্য-বাসরে পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

'আমায় দিয়ো গো দিয়ো'

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্য-শ্রী

হৃদয়খানা ভর্‌বে যবে
যতেক গোপন রন্ধ্র তা'র,
কাজ্‌লা কূট গরল পিয়া
নাম্‌বে আমার অন্ধকার,
নিভ্‌বে বুকের প্রদীপটিয়ো—
শুক্‌তারারি শুভ্র আলো
তুমিই আমায় দিয়ো গো দিয়ো।

থাম্‌বে যবে বুকের বীণা
হারিয়ে ভাষায় ভৈরবীর-ই,
পুলক প্রীতি মধুর স্মৃতি
ঝর্‌বে কিশোর-শৈশবের ই,—
আপন হাতেই বুক ভরিয়ো;
বনের বাণী সিন্ধু-রোল
তুমিই আমায় দিয়ো গো দিয়ো।

পথ হারা'য়ে পায়ের যবে
খুঁজ্‌বো মলিন চিহ্ন-আঁকা,
পিছল-কাদা কাঁটার মাঝে
ধর্‌বো যে পথ ভিন্ন, বাঁকা,
সেই সে চলার পথ রুধিয়ো—
ছায়াপথের হদিশ্‌খানি
তুমিই আমায় দিয়ো গো দিয়ো।

ধর্ম ও জীবন

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

আমাদের দেশে ধর্মকে বড় বলা হইয়াছে; ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে। এই বাক্যে ধর্ম ও জীবনের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই। ধর্ম পরলোকের জন্য, জীবন ইহলোকের জন্য,—কাহারও এই সংস্কার থাকিলে তাহা দূর করা উচিত। আয়ুর্বেদ আমাদের জীবন ও আরোগ্যের কথাই বলে, কিন্তু আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে কোন্‌টা চিকিৎসা-পুস্তক, আর কোন্‌টা ধর্মপুস্তক—মাঝখানে সীমারেখা টানা বড় কঠিন মনে হয়। চরক-সংহিতা পড়িবার এক সময় সুযোগ হইয়াছিল। তখন দেখিয়াছিলাম যে, আরোগ্য-শাস্ত্র বা বৈদ্যশাস্ত্র ও নীতিপুস্তক বা ধর্মপুস্তক উভয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তাহার দুই চারিটি শ্লোক আজ স্মরণ করিতেছি:

হিতাশী স্যান্মিতাশী স্যাৎ কালভোজী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পশ্যন্‌ রোগান্‌ বহূন্‌ কষ্টান্‌ বুদ্ধিমান্‌ বিষমাশনাৎ॥
(নিদানস্থান, ৬।১৩)

যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর তাহা খাইবে। পরিমিত ভোজন করিবে, যথাকালে ভোজন করিবে, জিতেন্দ্রিয় হইবে, বিষম আহারের জন্য বহু কষ্টকর রোগের উৎপত্তি হয়, বুদ্ধিমান লোক তাহা বিবেচনা করিবে।

কি ভাবে রোগ নিবারণ করা যায়? সকলেই বলিবেন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই ভাল:

নরো হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্‌ আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ॥
জ্ঞানং তপস্তৎপরতা চ যোগে যস্যাস্তি তং নানুপতন্তি রোগাঃ।
মতির্বচঃ কর্ম সুখানুবন্ধি সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধিঃ॥
(শরীরস্থান, ২।২০)

যে ব্যক্তি আহারে ও বিহারে হিতকর যাহা তাহাই সেবন করেন, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কর্ম করেন, বিষয়ে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি দাতা, যাঁহার সত্যে নিষ্ঠা আছে, যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত, যিনি একান্তে থাকিতে পারেন, তাঁহার রোগ হয় না। যাঁহার জ্ঞান আছে, তপস্যা আছে, যোগে তৎপরতা আছে, রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করে না। মন, বাক্য, কর্ম তাঁহার সুখের কারণ হয়, বুদ্ধি হয় পরিষ্কার, প্রাণ হয় সংস্কৃত।

কে বলিবে, ইহা চিকিৎসাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, নীতিশাস্ত্র হইতে বা ধর্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হয় নাই? আমাদের দেশে চিকিৎসাগ্রন্থ ও নীতিশাস্ত্র, উভয়ের মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। তাই চরক সামান্য চিকিৎসক নহেন, আদি চিকিৎসক বলিলেও ঠিক বর্ণনা করা হইবে না, তিনি ঋষি, মহর্ষি।

আরোগ্য কে না চায়? ভগবান বুদ্ধের ধর্মজীবনের আরম্ভ ঐ প্রশ্ন নিয়া—মানুষের রোগ হয় কেন, জরা হয় কেন, মৃত্যু হয় কেন? দুঃখের পরম নিবৃত্তি চাই। আয়ুষ্কাল

রক্ষা কি করিয়া সম্ভব? পূর্ণ আয়ু ভোগ করিয়া সুস্থ কর্মজীবন যাপন করা কাহার না ঈপ্সিত? উপায় কি?

সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়ো দেবতার্চনম্।
সদ্‌বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমো গুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামুপসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সংকথা ধর্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ।
ইত্যেতদ্ ভেষজং প্রোক্তমায়ুষঃ পরিপালনম্॥
ইত্যাদি

(বিমানস্থান, ৩।১৫-১৮)

সত্যচর্যা, সর্বভূতে দয়া, দান, বলি উপহার, দেবতার্চন, সদাচরণের অনুবর্তন, শান্তভাব, আত্মরক্ষার ক্ষমতা, লোকহিত, মঙ্গলকর বস্তুর চর্চা, ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচারীদের সঙ্গ, জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিদের রচিত ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা ও সে সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধদের অনুমোদিত ধর্মবিষয়ক সাত্ত্বিক আলোচনা ও বিচার—আয়ুষ্কাল রক্ষা করিবার, পূর্ণজীবনলাভের ইহাই তো ঔষধ।

আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র তাই নীতি, ধর্ম, লোকাচার, দেহজ্ঞানের সঙ্গে এসকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। জগতের নিয়ন্তা কেহ আছেন কি না, না শুধু কারণসমবায়েই জগতের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধেও চরক-সংহিতা নীরব নহেন:

মৃদ্দণ্ডচক্রৈশ্চ কৃতং কুম্ভকারাদৃতে ঘটম্।
কৃতং মৃত্তৃণকাষ্ঠৈশ্চ গৃহকারাদ্বিনা গৃহম্॥
যো বদেৎ স বদেদ্দেহং সম্ভূয় করণৈঃ কৃতম্।
বিনা কর্তারমজ্ঞানাদ্ যুক্ত্যাগমবহিষ্কৃতঃ॥

(শারীর-স্থান, ১।১৬)

যে বলে যে কুম্ভকার বিনা ঘট তৈরি হয়, তৈরি করে মৃদ্দণ্ডচক্র, "কুমোরের চাক," ঘর তৈরি করে মাটি তৃণ কাঠ দিয়া, কর্তার দরকার হয় না, সেই বলিতে পারে যে দেহ হইতেছে কতকগুলি উপাদানের একত্র হওয়ার ফল, দেহের কর্তা বলিয়া কেহ নাই,—এসব কথা যে বলে সে অজ্ঞান হইতেই বলে, যুক্তি বা শাস্ত্র বর্জন করিয়াই বলে।

The body is the temple of God—এই শরীর ভগবানের মন্দির, যে কথা আমরা হয়তো অনেক সময় হেলাফেলায় বলিয়া থাকি—আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার কতখানি পোষকতা আছে, তাহা আমাদের সযত্নে দেখিবার মত। আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধীও এই কথার উপর জোর দিয়াছেন। তিনিও আরোগ্যদিগ্‌দর্শনে (মূল গুজরাটী ভাষায় 'আরোগ্য বিষে সামান্য জ্ঞান,' মূলগ্রন্থ) লিখিয়াছিলেন—

"শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে থাকা, এই পৃথিবীতে তাহাকেই সারবস্তু মনে করা, আর শরীর দৃঢ় দেখিয়া তাহার গর্ব করা ইহাই যদি স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্য হয় তো সেরূপ স্বাস্থ্য অপেক্ষা শরীর রক্তপিত্তে ভরিয়া থাকাই ভাল—ইহা অতি সত্য কথা।

"এই শরীর ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধন-মন্দির, একথা সকলেই মানে। আমরা উহা ভাড়া পাইয়াছি। সেইজন্য আমাদিগকে ভাড়ার বদলে প্রভুর স্তুতি করিতে হয়। ভাড়ায় থাকিবার অন্য সর্ত এই যে, ঘরখানি আমরা যেন অকাজে না লাগাই। ভিতরে বাহিরে তাহা যেন পবিত্র রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর, গৃহস্বামীকে ঘরখানি যে অবস্থায় পাইয়াছিলাম সেই অবস্থাতেই ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের উচিত। জীব মাত্রেরই শরীর আছে, আর সকলেরই গঠন প্রায় এক প্রকারেরই অর্থাৎ সকলেরই কাণে শোনা, চোখে দেখা, ঘ্রাণ নেওয়া এবং ভোগ করিবার দ্বার আছে;

কিন্তু মনুষ্যদেহকে চিন্তামণিরত্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চিন্তামণিরত্নের অর্থ—এই রত্ন হইতে আমরা যাহা চাই তাহাই পাইতে পারি। পশুদেহে জীব সজ্ঞানে ভক্তিস্তুতি করিতে পারে না। আর জ্ঞানপূর্বক ভক্তি না করিলে মুক্তি নাই। মুক্তি না হইলে সত্য সুখ মিলে না, দুঃখের নাশ হয় না। যদি শরীরের সদ্ব্যবহার হয়, তাহাকে ঈশ্বরীয় গৃহ মনে করিয়া কাজে লাগানো যায়, তবেই উহা হিতকর, নতুবা উহা হাড়, মাংস ও রক্তে ভরা দুর্গন্ধময় বস্তু মাত্র।" (আরোগ্যদিগ্‌দর্শন, পূর্ণাহুতি)

"রমন্তি মূঢ়া, বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ"—বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিতেরা শরীরকে ভোগমন্দির সুতরাং রোগমন্দির দেখিতে চাহেন নাই, তাই সেরূপ বুদ্ধিকে তাঁহাদের হীন বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা ও শাস্ত্রীয় শিক্ষা এদিক দিয়া একেবারে মিলিয়া গিয়াছে।

জাহাজ

শ্রীপ্রণব ঘোষ

বহুদূর হ'তে যদি আজ মোরে ডাকো,
পার হয়ে নিখিলের সমুদ্র-সীমানা,
জানি আর কিছুতেই সাড়া দেবে নাকো,
অনির্দেশে উড়ে-চলা এই দুটি ডানা।
দিন যদি শেষ হয়, রাতের কালোয়
একটি রেখায় চাঁদ একা জেগে থাকে,
এক ঝাঁক তারাফুল ঘুমের আলোয়
ফুটে থাকে আঁধারের নুয়ে পড়া শাখে,
আমিও গুটাব ডানা—জানিবে না কেউ
কোথায় ভাসায়ে নেবে দিগন্তের ঢেউ।
তার চেয়ে তুমি এসো সমুদ্রের বুকে,
অন্ধকার খণ্ড করে সুতীব্র শীৎকারে,
দু'ধারে অজস্র ফেনা ছড়ায়ে কৌতুকে,
অভ্রান্ত আশ্রয় দাও এ ক্লান্ত আত্মারে।
থেমে যাক্ অর্থহীন উড়ে-চলা-ভুল,
হে জাহাজ, জেগে থাক্ তোমার মাস্তুল।

জার্ম্মান রসায়নী উলার

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্-এস্‌সি

রসায়ন শাস্ত্রটাকে নবরূপ দান করিবার পেছনে যে সমস্ত মনীষী ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনী এত চমৎকার যে যত বেশী তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় ততই এ দেশের মঙ্গল। এই প্রবন্ধে জৈব রসায়নের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান রসায়নী উলারের জীবনী আলোচিত হইবে।

ফ্রেডারিক উলার (Wohler) ১৮০০ খৃঃ এর ৩১শে জুলাই জার্ম্মেনীর ফ্রাঙ্কফার্ট শহরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উলারের পিতা আগষ্ট এন্টন্ উলার ফ্রাঙ্কফার্টের এক জন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। পিতার উদার নীতি ও জনপ্রীতি সে সময় সর্ব্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। উলার ফাউণ্ডেসন ও উলার স্কুল নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান আজও তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে। বৈজ্ঞানিক উলার শৈশব হইতেই রাসায়নিক পরীক্ষণ ভালবাসিতেন। ছাত্রজীবনে তিনি ততটা প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার রাসায়নিক উৎকর্ষের পেছনে ছিলেন ডাক্তার বাক্ (Buch) নামে এক জন অবসর-প্রাপ্ত ভৈষজ্যবিদ্। এই ডাক্তার নিজে অবসর সময় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন এবং উলারকে উক্ত বিষয়ে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন। ডাক্তারের কথাবার্ত্তা উলারের খুব পছন্দ হইত। তিনি ক্রমশঃ তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন এবং অবসর সময় তাঁহার পরীক্ষণাগারে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাইতেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ পরীক্ষণাগারে বসিয়াই উলার তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গবেষণার ফল সেলেনিয়াম ধাতুটি উদ্ধার করেন। ডাক্তার বাক্ এই আবিষ্কার-সম্বন্ধে এনালিন নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেন। উলারের বিচক্ষণ পিতা ছেলের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। যাহাতে ছেলের মন একাগ্রতায় পূর্ণ থাকে এবং সদ্‌ভাবাপন্ন হয় সেইজন্য তিনি ছেলেকে অবাঞ্ছিত সংসর্গে মিশিতে না দিয়া চিত্রবিদ্যা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবাইরা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ছেলের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। পিতার ঐকান্তিকতার ফলে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত উলারের অটুট স্বাস্থ্য ছিল।

উলার ২০ বৎসর বয়সে মারবুর্গ (Marbarg) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ক্রমশঃ রসায়নই তাঁহাকে বরণ করিল। দেখা গেল উলার নিজ শয্যা-গৃহকে একটি গবেষণাগারে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার গৃহকর্ত্রী ইহাতে বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ বৈজ্ঞানিক প্রুসিক এসিড্ (Prussic acid) ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থপ্রস্তুতিতে নিবিষ্ট, তখন তাঁহার ভয়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ঠিক্ এই সময় উলার মার্কিউরিক্ থায়সায়নেট্ (Mercuric thiocyanate) আবিষ্কার করিয়া ইহার গুণাগুণ

পরীক্ষান্তে ইহার নাম রাখেন ফ্যারোয়ার সারপেণ্ট্ (Pharoah's serpent)। এই আবিষ্কারটিও তাঁহার বন্ধুবর ডাক্তার বাক্ 'এনালিনে' প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পরে উলার অধ্যাপক গ্যামেলিন্ (Gamelin) এর নাম শুনিয়া তাঁহার বক্তৃতা-শ্রবণমানসে হাইডেলবার্গে উপস্থিত হন্ এবং সেখানে তাঁহার কৃপায় রসায়নাগারে একটু স্থান পাইয়া গবেষণায় নিযুক্ত হন্। এই প্রারম্ভের ফলস্বরূপ ' ৪১৫ বৎসর পরে তিনি বিশ্ববিখ্যাত কৃত্রিম ইউরিয়া প্রস্তুতিপ্রণালী আবিষ্কার করেন। গ্যামেলিনের সঙ্গে কাজ করার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গ্রহণ করেন এবং বিচক্ষণ শিক্ষকের পরামর্শক্রমে ডাক্তারী ছাড়িয়া রসায়নে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এই সময় সুইডেনের বার্জিলিয়াস্ ইউরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাসায়নিক বিশ্লেষণক্ষমতা ও মতবাদগঠনের প্রতি ঐকান্তিকতা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জয়মাল্য দিয়াছিল। উলার মনে মনে বার্জিলিয়াসের অনুরাগী ছিলেন। গ্যামেলিন তাঁহাকে ষ্টকহলম যাইয়া ঐ পণ্ডিতবরের ছাত্র হইতে পরামর্শ দিলেন। উলার বার্জিলিয়াসকে তাঁহার অভিলাষ জানাইলে তিনিও সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর উলার এক শুভদিনে সুইডেন-রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। মহাত্মা বার্জিলিয়াসের ছাত্ররূপে কাজ করিয়া ইনি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি চিরদিন গুরুদেবের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। উলার তাঁহার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আমি যখন বার্জিলিয়াসের দ্বারে প্রথম দাঁড়াইলাম, তখন আমার বুক কাঁপিতেছিল। একটু পরেই একজন সুসজ্জিত, হৃষ্টপুষ্ট, প্রবীণ ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইনিই বার্জিলিয়াস্....তিনি যখন আমাকে গবেষণাগারে নিয়া গেলেন আমার মনে হইল আমি এক স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি... মনে মনে ভাবিলাম আমি কি সত্য সত্যই আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছিয়াছি?"

বার্জিলিয়াস্ সর্ব্বপ্রথমে উলারকে খনিজ পদার্থ বিশ্লেষণে নিযুক্ত করিলেন। এ সময়ে তিনি অন্যান্য কাজের সঙ্গে টাঙ্গষ্টেনের কয়েকটা যৌগিক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই সায়ানিক এসিড (Cyanic acid) নিয়াই বেশী নিবিষ্ট থাকিতেন। শিক্ষকের উৎসাহে উলার ঐ সময় রসায়নে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেন। তৎপর বার্জিলিয়াসের সঙ্গে তিনি ইউরোপের উত্তরখণ্ড ভ্রমণে বহির্গত হন। ইহারা নরওয়ে ও সুইডেন ভ্রমণ করিয়া ভূতত্ত্ববিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার পথে উলারের সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ-বৈজ্ঞানিক ডেভির দেখা হয়। পটাসিয়াম্ আবিষ্কর্ত্তা ডেভিকে উলার বৃহৎ এক খণ্ড পটাসিয়াম্ উপহার দিয়াছিলেন।

ভ্রমণ শেষ করিয়া উলার কিছু দিন পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। সময় সময় রাসায়নিক মতবাদ নিয়া ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলেও উলার গুরুদেবের প্রতি চিরদিনই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এমন কি উঁহাদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত। উলার গুরুদেবের চিঠিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বার্জিলিয়াসের মৃত্যুর পর প্রায় ১০০ খানা চিঠি সুইডিস্ একাডেমিকে উপহার দেন। বার্জিলিয়াসের একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উলার ইহার জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উলার যে বার্জিলিয়াসের দ্বারা

যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। উঁহাদের উভয়ের হৃদয় উদারতায় পূর্ণ ছিল এবং রাসায়নিক কর্ম্মধারার মধ্যে উভয়ের একই রূপ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বার্জিলিয়াসের মত উলার যেমন খনিজ পদার্থে ডুবিয়া থাকিতেন তেমনি জৈব পদার্থ নিয়াও গবেষণা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে জৈব ও খনিজ পদার্থের মধ্যে যে একটা বিশাল ব্যবধান ছিল তাহা উলারই দূর করেন।

এবার উলার দেশে ফিরিয়া গ্যামেলিন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত হইলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই বার্লিনে একটি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে গবেষণার কিছুটা বন্দোবস্ত থাকায় উলারের খুব সুবিধা হয়। ঐ সময় তিনি যে সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এলুমিনিয়াম্ উদ্ধারণ একটি। তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালীটি ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডেভিলের (Deville) দ্বারা সমর্থিত হয়। শুনা যায় ডেভিল্ তাঁহার প্রথম প্রস্তুত এলুমিনিয়ামটুকু দ্বারা একটি পদক তৈয়ার করিয়া এক পৃষ্ঠে উলার ও অপর পৃষ্ঠে তদানীন্তন ফ্রান্সের রাজা ২য় নেপোলিয়ানের মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। উলারের দীর্ঘ ৬ বৎসর ব্যাপী বার্লিনে অবস্থান ও গবেষণা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সময়ই তিনি তাঁহার বিশ্ব-আলোড়নকারী কৃত্রিম ইউরিয়া আবিষ্কারটি সুধীসমাজে পরিবেশন করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ এইজন্য পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐদিন পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস ছিল যে মানুষ কোন প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তাঁহারা মনে করিতেন যে এক অলৌকিক শক্তিদ্বারা ঐ সমস্ত পদার্থ তৈরী হয়। উলার ইউরিয়া নামক জৈব পদার্থটি গবেষণাগারে প্রস্তুত করিয়া উক্ত বদ্ধমূল ধারণায় কুঠারাঘাত করেন। ঐদিন হইতে বিশ্ববাসীর নিকট এক নূতন গবেষণার পথ পরিষ্কার হয়। উলার নিজে বলিয়াছেন, "আমার এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার, কারণ ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কৃত্রিম উপায়েও জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব।" অধ্যাপক হফ্‌ম্যান বলেন, "উলারের এই আবিষ্কার পৃথিবীতে নূতন যুগ সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইহাতে গবেষণার এক বিশাল রাজ্য উন্মুক্ত হইয়াছে।"

ঐ সময় উলার আর এক অপূর্ব্ব রত্ন আবিষ্কার করেন। এই রত্ন তাঁহার বন্ধু লিবিগ। সেই সময় দুই বন্ধুতে মিলিয়া জার্ম্মানীতে যে রাসয়নিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অভূতপূর্ব্ব ও কল্পনাতীত। আজও বৈজ্ঞানিক জগৎ ঐ বন্ধুদ্বয়কে স্মরণ করিয়া বিস্ময় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। মনে হয় যেন বিশ্ব-নিয়ন্তা এই বন্ধুত্বের সংগঠন দ্বারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। যখন উলার স্টক্‌হলমে সায়ানিক্ এসিড নিয়া গবেষণা করেন ঠিক সেই সময় লিবিগ প্যারীতে বসিয়া ফুলমিনিক্ এসিড আবিষ্কার করেন। প্রথমটি শান্ত, দ্বিতীয়টি দারুণ বিস্ফোরক পদার্থ। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও পরমাণবিক পরিবেশন এক। এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের দুইটি পদার্থের মধ্যে পরমাণু ও মৌলিক সংখ্যা এক একথা তখন কেহই বিশ্বাস করিতে রাজী ছিলেন না। এমন কি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসায়নী বিশ্ব-বিশ্রুত বার্জিলিয়াস্ পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পরবর্ত্তী কালে উলার যখন এমোনিয়াম সায়ানেট হইতে ইউরিয়া

প্রস্তুত করিলেন তখন সকলেই একবাক্যে উক্ত অবস্থা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি ধুরন্ধর বার্জিলিয়াস্ এ অবস্থাকে 'আইসোমেরিজম্' (Isomerism) আখ্যা দান করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ আই-সোমেরিজম্ এর মধ্য দিয়াই উলার ও লিবিগ্ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। উঁহারা নিজেরাই আইসোমেরিক্ (Isomeric) কিনা কে জানে? বিদেশ হইতে ফিরিয়া উভয়ে উভয়ের খবর জানিতে পারিয়া এক শুভ দিনে ফ্রাঙ্কফার্টে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে মিলিত হন। ঐ দিন পৃথিবীর পক্ষে এক স্মরণীয় দিন—কারণ ঐ বন্ধু-মিলন কি সুদূরপ্রসারী ফল প্রসব করিয়াছে তাহা প্রত্যেক রসায়নী জানেন। ইহার পরে একজন গিসেন (Gissen) শহরে, অপর জন বার্লিনে বসিয়া পত্র বিনিময় দ্বারা গবেষণার পথ উন্মুক্ত করেন। দুই বন্ধুর প্রথম যুক্ত কাজ মেলিটিক এসিড্ সম্বন্ধে।

উলার ২৭৫টি প্রবন্ধ বাহির করেন, তন্মধ্যে ১৫টির সঙ্গে বন্ধুবরের নাম যুক্ত আছে। লিবিগ্ ও উলারের একটি প্রধান আবিষ্কার সায়ানুরিক এসিড্ (Cyanuric acid) এবং সায়ানিক এসিডের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক আছে। ১৮৩০ সনের 'এনালিনে' উঁহাদের কর্ম্মধারা প্রকাশিত হয়। লিবিগ জৈব পদার্থ নিয়া আরও কাজ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেও উলারের মন কিছু দিন পরে অপর ব্যাপারে আবিষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি সামান্য ত্রুটির জন্য ভ্যানেডিয়াম্ (Vanadium) নামক বিখ্যাত মৌলিকটিকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; এ দুঃখ তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি একটি চিঠিতে বন্ধুকে লিখেন "আমি নিতান্ত বোকা? দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মৌলিকটি আমার হাতের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। ইহাকে আমি মেক্সিকান সীসক খনিজের মধ্যে পাইয়াও পাই নাই।" বার্জিলিয়াস্ উলারের দুঃখে সমবেদনা জানাইয়া একখানা চমৎকার চিঠি লিখেন। "আমি তোমাকে একটি গল্প লিখিতেছি। উত্তর সীমান্তে ভ্যানেডিস্ নামে দেবী ছিলেন। তিনি যেমন সুন্দরী তেমন উদার। এক দিন তাঁহার ঘরের দ্বারদেশে কে আসিয়া আঘাত করিল। দেবী মনে করিলেন, 'আচ্ছা, পুনরায় আঘাত করুক'; কিন্তু সেই আঘাতশব্দ আর আসিল না, কারণ যিনি আঘাত করিয়াছিলেন তিনি সরিয়া পড়িয়াছেন। দেবী মনে মনে ভাবিলেন, 'কে এই লোকটা, দ্বারে একবার মাত্র ধাক্কা দিয়াই চলিয়া গেল?' তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য জানালায় দাঁড়াইবামাত্র লোকটাকে চিনিয়া ফেলিলেন। 'ওহো, এই সেই কুঁড়ে, অপদার্থ উলার! নামটা উপযুক্তই হইয়াছে। কয়েকদিন পরে অপর একটি লোক আসিয়া পুনঃ পুনঃ সজোরে দরজায় আঘাত করিল। দেবী দরজা খুলিয়া দিলেন। এই ব্যক্তির নাম সেফ্‌ষ্ট্রম্ (Sefstrom)। ইনি দরজা খোলা দেখিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং ভ্যানেডিয়াম আবিষ্কার করিলেন। তোমার খনিজ নমুনাটীতে ভ্যানেডিয়াম পেণ্টক্সাইড (Vanadium pentoxide) ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃত্রিম পদ্ধতিতে জান্তব শরীর প্রস্তুত করিয়াছে তাহার পক্ষে একটি ধাতু আবিষ্কারের গৌরব ত্যাগ করা কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে এক ব্যক্তি ১০টি ধাতু আবিষ্কার করিয়া যে কৃতিত্ব পাইবার যোগ্য হইবে তাহার চেয়ে তোমার ও লিবিগের আবিষ্কার বহুগুণে কৃতিত্বপূর্ণ।"

১৮৩১ সনে উলারকে বার্লিন হইতে ক্যাসেল শহরে আহ্বান করা হয়। এখানে আসিয়া কিছু দিন তিনি নিজ গবেষণাগারে প্রস্তুতিতেই

নিবিষ্ট থাকেন। সেখানে বসিয়া উলার তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর সহায়তায় আর একটি বিশেষ গবেষণালব্ধ ফল সুধীসমাজে পরিবেশন করেন। ইহাকে বলা হয় 'বিটার এল্‌মণ্ড' (Bitter almond) সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর গবেষণা। সেই সময় উঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারেন নাই যে এই আবিষ্কার হইতে জৈব রসায়নের একটি প্রধান স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য। দুই বন্ধু গবেষণা-সাগরে নিমগ্ন, হঠাৎ উলারের উপর বজ্রাঘাত হইল! তাঁহার সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ ঐ সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। উলারের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল. তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—সাধের গবেষণা গারটি একটি মরুভূমিতে পরিণত হইল। তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। এদিকে লিবিগ্ বন্ধুর বিপদটিকে নিজ বিপদরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করার সর্ব্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি সমাদরে উলারকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং দিবারাত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ ভাবে মনোরঞ্জনের আয়োজন দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করেন। কিছু দিন বন্ধুর সঙ্গে গবেষণা করিয়া উলার আবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসেন। ১৮৩২ সনের ৩০শে আগষ্ট তিনি লিবিগ্‌কে লিখিয়াছিলেন, "আমি আবার আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি যে কি ভাষায় তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তোমার সঙ্গ ও আন্তরিক যত্ন আমাকে কি আনন্দ দিয়াছে তাহা বলা যায় না। দুই জনে এক স্থানে এক যোগে কাজ করিয়াছি, ইহাতে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। এই সঙ্গে আমি বিটার এল্‌মণ্ড্ (Bitter almond) সম্বন্ধে প্রবন্ধটি পাঠাইতেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি সব টুকু ভাল করিয়া পড়িয়া যেখানে ইচ্ছা পরিবর্ত্তন কর। আমার মনে হইতেছে কোথাও যেন একটু গলদ্ আছে।"

উলার ও লিবিগের বেঞ্জয়িক এসিডে (Benzoic acid) র‍্যাডিকাল (Radical) আবিষ্কার রসায়নবিদ্যায় নূতন আলোকপাত করিয়াছে। ইহার মধ্যে চিন্তা ও গবেষণার প্রচুর খাদ্য ছিল। কাজেই কেনিজারো (Cannizzaro), ফেলিং (Fehling) প্রভৃতি পরবর্ত্তী গবেষকগণ উক্ত পথে কাজ করিয়া শাস্ত্রটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উলার ও লিবিগ্ প্রকৃতপক্ষে র‍্যাডিকাল মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। উঁহাদের লিখিত স্মারকলিপি পাঠ করিয়া পণ্ডিতবর বার্জিলিয়াস অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার মতামত লিখিয়া পাঠান—"তোমাদের প্রবর্ত্তিত র‍্যাডিকাল মতবাদটী অতি চমৎকার ও কার্য্যকর হইয়াছে। ইহাকে জৈব রসায়নের নবরাগ বলা যায়।"

উলার কেসেল শহরে পাঁচ বৎসর ছিলেন। ১৮৩৫ সনে তিনি গটিনজেন্ (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং তাঁহার কেসেলের পদটী বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুনসেন (Bunsen) গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে উলার আবার কর্ম্মব্যস্ত হইয়া লিবিগ্‌কে চিঠি লিখেন—"আমি একটি মুরগীর মত। মুরগীটী একটি ডিম প্রসব করিয়াছে। ডিমটাকে এখনই তা দেওয়া দরকার। এই ভোরে আমি এমিগ্‌ডেলিন হইতে বিটার এল্‌মণ্ড তৈল ও প্রুসিক এসিড উদ্ধার করিয়াছি। আমার মনে হয় এই গবেষণায় আমাদের যুক্তশক্তি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ বেঞ্জয়েল র‍্যাডিকালের (Benzoyl Radical) সঙ্গে গবেষণাটির যোগাযোগ থাকায় ইহাকে একান্ত ভাবে নিজের নামে চালাইলে আমার

পক্ষে তোমার প্রতি অবিচার করা হইবে।” ইহার পরে উলার এমিগ্‌ডেলিন গবেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া লিবিগ্‌কে পাঠাইয়া দেন। দুই বন্ধুর ঐকান্তিক চেষ্টার পরে প্রমাণিত হয় যে ইমালসিন্ (Emulsin) নামক একটি এন্‌জাইমের মধ্যস্থতায় এমিগ্‌ডেলিন বিভক্ত হইয়া বেঞ্জল্‌ডিহাইড, (Benzoldehyde) প্রুসিক্ এসিড ও গ্লুকোজ দান করিয়া থাকে। ঐ ‘ইমালসিন্’ নামটী বন্ধুদ্বয়ের সৃষ্টি। উঁহাদের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা আরও সাব্যস্ত হয় যে গ্লুকোজ আরও বহুবিধ পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া গাছপালায় অবস্থান করে এবং তাহাদিগকে গ্লুকোসাইড্ (Glucoside) বলে।

উলারের প্ররোচনায় বন্ধুদ্বয় আবার ইউরিক এসিড সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত হন। এবারও তাঁহাদের দান পৃথিবীতে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে। শরীরবিদ্‌গণ ইহা দ্বারা বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ হন। মহাত্মা সিলে এই ইউরিক্ এসিড্ আবিষ্কার করেন এবং পণ্ডিতবর প্রাউষ্ট্ ইহাকে সরীসৃপের মলে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিন্তু ইহার আণবিক গঠন সম্বন্ধে কেহই কিছু অবগত ছিলেন না। উলার ও লিবিগ্ সর্ব্বপ্রথম ইহার গঠনসমস্যা সমাধান করেন এবং ইহা হইতে ১৫টি নূতন পদার্থ সৃষ্টি করেন। বন্ধুদ্বয় এই গবেষণায় যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্লেষণ ও সংযোজন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। দুই বন্ধু যেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ছিলেন। জৈব-রসায়নের কোন্ সূত্র ধরিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা যেন উঁহাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বলরূপে দেখা দিত। পণ্ডিতদ্বয় নিজেরাই বলিয়া গিয়াছেন, “আমাদের এই গবেষণা হইতে রসায়ন-দর্শন এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিবে যে গবেষণাগারে সম্পূর্ণ জৈব শরীর গঠিত না হইলেও আংশিক ভাবে যে অন্যান্য জান্তব দেহ গঠিত হইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিনি, মরফিন (Morphine) প্রভৃতি পদার্থ অচিরে কৃত্রিম উপায়ে গঠিত হইবে। যদিও কি ভাবে তৈরী হইবে এখনও বলিতে পারি না। কারণ উহাদের গঠনভঙ্গির উপাদান আজও আমরা পাই নাই।”

ইহার পরে দুই বন্ধু এক যোগে আর কোন কাজ করেন নাই। লিবিগের কর্ম্মশক্তি অন্য পথে পরিচালিত হওয়ায় উলার অজৈব রসায়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি দানাদার বোরন (Boron) ও ঐ জাতীয় কিছু কিছু পদার্থ প্রস্তুত করেন। অপর এক জন বন্ধুর সঙ্গে তিনি সিলিকন্‌হাইড্রাইড্ (Silicon-Hydride) তৈরী করেন। এইটীও পরবর্ত্তী রসায়নীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। উলার ক্রোমিয়াম, টাইটেনাম প্রভৃতি অনেকগুলি ধাতব পদার্থ নিয়াও কাজ করিয়াছেন।

উলারের কর্ম্মসমষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় তাঁহার মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান্ রসায়নী পৃথিবীতে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কোন শাখা নাই যেখানে তাঁহার কিছু দান নাই। উল্কা ও খনিজাদি বিশ্লেষণ করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ একটা পদার্থ উপহার দিতেন, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মসাধনা বন্ধুদের নিকট অতীব বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। একবার লিবিগ্ তাঁহাকে লেখেন, “তুমি কাজ করিয়া কি আনন্দই পাও! ভারতবর্ষের একটি গল্পে পাওয়া যায় সেখানে এক প্রকার মানুষ ছিল যাহাদের হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে গোলাপ ফুল ঝরিত। তুমিও যেন ঠিক সেইরূপ।”

লিবিগ্ ও উলার একবৃন্তের দুইটী ফুল। একেকে বাদ দিয়া অপরকে ভাবা যায় না। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হফ্‌ম্যান উঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "লিবিগ্ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী, ও বেগবান। ইনি একটি নূতন চিন্তা অতি উৎসাহে গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইতেন। ইনি ছিলেন নিজের বিশ্বাসে অটুট, কিন্তু ভ্রান্ত ধারণাকে ত্যাগ করিতেও কাতর নন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ। এদিকে উলার ছিলেন অতিশয় শান্ত ও চিন্তাশীল। নূতন ভাব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি সবিশেষ বিবেচনা করিতেন, হঠাৎ কোন নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন না এবং অতীব কঠিন পরীক্ষার পর কোন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন। আবার লিবিগ্ ছিলেন একটু খিট্‌খিটে, ভাবপ্রবণ ও ক্রোধপ্রবণ, উলার ছিলেন সহনশীল, অক্রোধী ও শত্রুঞ্জয়ী। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবধারার সমাবেশ দৃষ্ট হইলেও কখনও নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের হানি হয় নাই। বিশেষতঃ উলারের মত সহনশীল, প্রেমিক বন্ধু যখন একদিক আগ্‌লাইয়া ছিলেন তখন অপর দিকের অত্যধিক ভাবপ্রবণতা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। উলারের কতটা বন্ধুপ্রীতি ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার একটি চিঠি হইতে। তিনি গটিন্‌জেন্ হইতে বন্ধুকে লিখিতেছেন,—"মারচাঁদ বা অপর কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কি? ইহাতে কোন শান্তি নাই, ইহাদ্বারা বিজ্ঞানেরও কোন উন্নতি হইবে না।.........মনে মনে ভাবিয়া দেখ তুমি ও আমি উভয়েই ১৯০০ সনে কার্ব্বলিক এসিড, এমোনিয়া ও জলে পরিণত হইয়া গিয়াছি এবং আমাদের ভস্ম হয়ত কোনও কুকুরের হাড়ের অংশরূপে বিরাজ করিতেছে, তখন আমরা শান্তিতে বাস করিয়াছি কি ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়াছি একথা কে চিন্তা করিবে? তখন কে তোমার বাগ্‌বিতণ্ডার বা বিজ্ঞানের জন্য স্বাস্থ্যহানি ও মানসিক অশান্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিবে? কেহই তাহা করিবে না। কিন্তু তোমার উচ্চ পরিকল্পনা বা ভাবরাশি এবং তোমার আবিষ্কৃত নূতন তত্ত্বগুলি চিরকাল মনুষ্য-সমাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রহণ করিবে। বড়ই আশ্চর্য্য, আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী তোমার মত সিংহকে শর্করাগ্রহণে প্রণোদিত করিতেছে।"

মহাত্মা উলারের কর্ম্মপ্রীতি, সংসারপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি ও সঙ্গে সঙ্গে অনাবিল দার্শনিক ভাবালুতা ৮২ বৎসর মানবজাতিকে পরিচর্য্যা করিয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় গটিন্‌জেন্ বিশ্ববিদ্যালয় আজ পৃথিবীর মধ্যে রসায়ন-শাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। তিনি একুশ বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়া ৮০০০ ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে তাঁহার রাসায়নিক প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয় নাই। ১৮৮২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দেহরক্ষা করেন।

বৈদিক ভারতের বিচার-কার্য ও আইন

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্, সাহিত্যরত্ন

বৈদিক ভারতে স্বয়ং রাজা মন্ত্রণাদাতাদের সহায়তায় বিচার-কার্য নির্বাহ করিতেন। দেওয়ানী অপেক্ষা ফৌজদারী মোকদ্দমাতেই তিনি অধিকতর অংশ নিতেন। দূরবর্তী বিচারালয়ে রাজপ্রতিনিধিই বিচার করিতেন। বিবাদিগণ কর্তৃক স্বীকৃত দেনাগুলির শতকরা পাঁচ ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। আর যে সকল দেনা অস্বীকৃত কিন্তু প্রমাণীকৃত হইত উহাদের শতকরা দশ ভাগ রাজা পাইতেন। এই দক্ষিণা সম্ভবতঃ বিচারকগণকে দেওয়া হইত। বাদী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের আচরণ, অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত-ইসারা, কথা বলিবার কায়দা, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বিশেষ বিধিনিষেধ, স্থানীয় রীতি-নীতি, পারিবারিক নিয়মকানুন, পণ্যজীবীদের প্রথা এবং পূর্ববর্তী বিচারকগণের নজিরসমূহের প্রতি রাজা সবিশেষ ও সতর্ক লক্ষ্য রাখিতেন।

রাজা অথবা তাঁহার কর্মচারিগণ মামলা-মোকদ্দমায় কখনও উৎসাহ দিতেন না বটে, কিন্তু কোন মোকদ্দমা যথাবিধি রুজু করা হইলে উহার ন্যায়-বিচার-কার্যে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন না। প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত বলিয়া রাজা কর্তৃক তাহারা প্রতিপালিত হইত। আইনজ্ঞদের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজা মোকদ্দমার বিচারে নিযুক্ত হইতেন না। আইনানুসারে কোন বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা হইয়া গেলে রাজা উহাতে কোন হস্তক্ষেপ করিতেন না। বিচারকার্যে রাজা প্রচলিত প্রথা ও আইন মানিয়া চলিতেন।

এই যুগের ফৌজদারী আইনগুলি কতকটা কঠোর ছিল বলিয়া মনে হয়। অপরাধী অথবা সাক্ষীদের উপর কখনও কোন উৎপীড়ন ও নির্যাতন করা হইত না। অতি প্রাচীন কালের অনগ্রসর সামাজিক পরিস্থিতিই সম্ভবতঃ এই সকল কঠোর আইন-কানুনের একমাত্র মূলীভূত কারণ। শাস্তি তত কঠোর না হইলেও অপরাধের অনুপাতে কতকটা বেশী ছিল। ব্যভিচার যে কেবল গুরুতর পাপ ও অপরাধ বলিয়াই বিবেচিত হইত এমন নহে, পরন্তু অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষ বলিয়াও পরিগণিত হইত। এইজন্য ইহা সমাজে সম্পূর্ণরূপে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যা-অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সামান্য চুরির অপরাধে অর্থদণ্ড হইত; বহুমূল্য দ্রব্যাদি চুরি করিলে অপরাধীর হাত কাটিয়া দিত। চোরাই মাল সহ ধৃত হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। যাহারা চোরাই মাল গ্রহণ এবং অপরাধীদিগকে আশ্রয়দান করিত তাহদের জন্য গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

ডাকাতি-অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গচ্ছেদন; ভীষণ ও লোমহর্ষণ ডাকাতির জন্য প্রাণদণ্ড হইত। সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্যই এই সকল গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। কঠোর শাস্তির ভয়েই লোকসকল অপরাধ হইতে নিরস্ত থাকিত। রাজকীয় মুদ্রা, অনুশাসন-

লিপি প্রভৃতি জাল করিবার অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান ছিল। মিথ্যা সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুতর পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত; এমন কি পরবর্তী কালে এই অপরাধের জন্য জাতিচ্যুতিও ঘটিত। সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জনীয় ছিল। অন্য কোন জাতির সাহিত্যে সত্যকথনের এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। মানহানি, গালিগালাজ ও সাধারণ আঘাতের জন্য অর্থদণ্ড হইত। আঘাতের ফলে হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই অপরাধের জন্য নির্বাসনের ব্যবস্থা ছিল। অগ্নিসংযোগকারী, বিষদাতা, হত্যাকারী, ডাকাত, বলপূর্বক ভূমিদখলকার ও স্ত্রী অপহারকের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার (right of self-defence) দেওয়া হইত। অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যানবাহনাদি পরিচালনের এবং রাজপথ অপবিত্র করার অপরাধে উপযুক্ত অর্থদণ্ডের বিধান ছিল। মন্ত্রিগণ ও বিচারকগণ ঘুষ গ্রহণ করিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখাইতে না পারিলে রাজা তাহাদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। দেববিগ্রহ-ভঞ্জন ও জিনিষপত্র-প্রতারণার অপরাধেও অর্থদণ্ড হইত। স্বর্ণকার প্রতারণা করিলে ধাতব পদার্থটিকে খণ্ড খণ্ড করা হইত। পুলিশের আইন-কানুন অত্যন্ত কঠোর ও স্বৈরাচারমূলক ছিল। জুয়াখেলোয়ার, প্রকাশ্যে নৃত্যকারী ও গায়ক, ধর্ম-পুস্তকনিন্দক, ধর্মবিদ্বেষ-প্রচারক, নির্দিষ্ট কর্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তি ও মন্তবিক্রেতাদিগের নগর হইতে তৎক্ষণাৎ নির্বাসন হইত। বৈদিক ভারতে কৃষি ও বাণিজ্যই প্রধান উপজীবিকা ছিল; তৎসংক্রান্ত কোনও অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। আত্মহত্যা সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল; আইনানুসারে আত্মহত্যাকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হইত না। কোনও অপরাধীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার সবিশেষ অধিকার (prerogative) একমাত্র রাজার উপরই ন্যস্ত থাকিত।

এই সকল অপরাধ-ঘটিত আইনের কঠোরতা সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, বিধানগুলি কঠোর হইলেও প্রয়োগকালে ঐগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা হইত। জ্ঞানবৃদ্ধ, বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ, সদ্বংশজাত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও কর্তব্যপরায়ণ আর্যবিচারকগণ অতিশয় সতর্কতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত আইনগুলি প্রয়োগ করিতেন। উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত ও সমাজের অনিষ্টকারী অপরাধীদিগের বিরুদ্ধেই কেবল আইনগুলি কঠোরতার সহিত প্রযুক্ত হইত। ইংরেজজাতির আইনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গ্রেট ব্রিটেনেও ১৮০৮ খৃঃ পর্যন্ত ৫ শিলিং চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই চুরির অপরাধে হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এই আইন উঠাইয়া দেওয়ার জন্য কমন্স সভায় একটি বিল উপস্থাপিত হইলে লর্ড সভা উহা প্রত্যাহার করেন। অনেক চেষ্টার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে চুরির এই কঠোরতম আইনটি রহিত হইয়া যায়। যে ভারতীয় আর্যগণের সামরিক আইনগুলি অত্যন্ত উদার ও মহত্ত্বব্যঞ্জক ছিল, তাঁহাদের ফৌজদারী আইনগুলি কোনও মহৎ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণ-বশতঃ কখনও এরূপ কঠোর হইতে পারিত না। সমাজের মঙ্গল-বিধানই সেই মহৎ উদ্দেশ্য। জমি ও বাগান হইতে আগাছা তুলিয়া না ফেলিলে শস্যবৃদ্ধির আশা ব্যাহত হয়। সমাজের অনিষ্টকারীর শাস্তি না হইলে শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে না। এরূপ আপাত-প্রতীয়মান কঠোর আইন-কানুনের পশ্চাতে একটা শুভেচ্ছাপ্রণোদিত মহৎ নৈতিক বল

ছিল বলিয়াই প্রাচীন হিন্দুজাতি উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুগণের দেওয়ানী আইনসমূহ উন্নত, সুবিবেচনাপ্রসূত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইত। বিচারকের নিকট যাহাতে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয় এইজন্য সাক্ষী ও উভয়পক্ষকে শপথ করান হইত। সাক্ষ্যসম্বন্ধীয় আইন ইংলণ্ডের আইনের অনুরূপ ছিল। সত্য-পরীক্ষার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইত। আঠার প্রকার মালিশের (disputes) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আইনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি দেখিলেই মনে হয় সেই সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। টাকা ধার দেওয়ার প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। সুদ শতকরা ২ হইতে ৫ মুদ্রা প্রদত্ত হইত। বন্ধক থাকিলে সুদ অর্দ্ধেক হইত এবং বন্ধক দ্বারা উত্তমর্ণের কোনও উপকার হইলে সুদ লওয়ার বিধি ছিল না। সমুদ্র-যাত্রার জাহাজ ও জমির চুক্তিতেও টাকা ধার দেওয়া হইত এবং এইজন্য সুদের পৃথক আইন নির্দিষ্ট ছিল। ঋষিগণ সময় সময় ঋণের দায়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন—এরূপ উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল, ২৪।৯)।

গ্রামের সীমানা বৃক্ষ প্রভৃতি স্বাভাবিক বস্তু-দ্বারা চিহ্নিত হইত। আজকালকার মত সে সময়েও জমি-বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান ছিল। প্রজাগণ নির্বিঘ্নে কৃষিকার্য পরিচালন করিতে পারিত। পথঘাটের উপর অধিকার সম্বন্ধীয় আইন (right of way) অতি উত্তম ছিল। স্থাবর সম্পত্তির বিবাদে দলিলপত্র, দখল ও সাক্ষ্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইত। নাবালকের ও বিধবার সম্পত্তি রাজা যত দিন প্রয়োজন তত দিন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন পঞ্চতীর্থ, এম্‌-এ

পণ্ডিতগণ বলেন—ধর্ম্ম ভিন্ন কোনও জাতির প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে না, ধর্ম্ম ভিন্ন কোনও জাতির অভ্যুদয় অসম্ভব। রাজার রাজত্ব, ধনীর ঐশ্বর্য্য, বিজেতার বিজয়, পণ্ডিতের সম্মান—সকলই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মাভাবে ঐ সমস্তের মূল্য এক কপর্দ্দকও নয়।

ধর্ম্মের দ্বারাই মানব ব্যষ্টিগত ভাবে বেঁচে থাকে, ধর্ম্মের প্রভাবেই মানব সমষ্টিগত ভাবে সমাজরূপে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ মানবের দেহ-রক্ষার্থ যেমন ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, গোষ্ঠী-রক্ষার্থও তেমন ধর্ম্মকেই আশ্রয় করতে হয়।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে নানা দেশের শাস্ত্র নানা রকমের সূত্র রচনা করেছেন। কোনও শাস্ত্র বলছে—যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

মানবজাতির উন্নতি এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। কণাদ বলেছেন—'যতো বা সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।'

কেউ কেউ বলেছেন—বেদ-বিহিত আচার-পালন এবং বেদবিরুদ্ধ আচার হতে নিবৃত্তিই ধর্ম্ম।

মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে দেখা যায়—যা' এই জগৎকে ধারণ করে তা'-ই ধর্ম্ম। যে হেতু ধর্ম্ম নিখিল স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থকে ধরে আছে, সেইহেতু এর নাম ধর্ম্ম। ধৃ-ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়। ধৃ-ধাতু অর্থ ধারণ করা।

দার্শনিক হব্‌স্ বলেন—পৃথিবীর আদিতে সকল মানুষের সমান অধিকার ও সমান ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কতগুলি নিয়মের অধীন না হ'লে চলে না, তাই তাদের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন। সেই ব্যক্তির গঠিত আইনই ধর্ম্ম। এই আইন সমাজের স্থিতিমূলক এবং দেশের ইষ্টসাধক।

কেউ কেউ বলেছেন—'চির সুখভোগের জন্য ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যদি পরের উপকার করা যায় তবেই তা' ধর্ম্ম হলো।' এই সংজ্ঞাতে তিনটি প্রস্তাব দেখা যায়—পরের উপকার সাধন, ঈশ্বরের নিয়ম পালন, চির সুখ ভোগ। ভারতীয় আর্য্যজাতির সংহিতাশাস্ত্রে আছে ধর্ম্মের লক্ষণ চার প্রকার—শ্রুতি বা বেদমার্গ, স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন, সদাচার প্রতিপালন এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে দুটি পথ খোলা থাকলে নিজের হিতজনক পথ অবলম্বন।

উইলিয়ম পেলী কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মের চারটি অংশ নির্দ্ধারিত—Prudence, বা পরিণামদর্শন। Fortitude বা সহিষ্ণুতা, Temperance বা মিতাচার, Justice বা সুবিচার।

আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে এই শ্রেণীর নানা শ্লোক, নানা মন্ত্র ও নানা সূত্র বিদ্যমান। সৎপাত্রে দান, ভগবানে মতি, গুরুজনের সম্মান, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা, আত্মরক্ষা ও গোরক্ষা এই ছয়টি ধর্ম্মলক্ষণ।

মহাভারতে আছে—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥'

সকল বর্ণ ও সকল শ্রেণীর পক্ষে দশটি হ'লো ধর্ম্মলক্ষণ—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা, বিদ্যার্জন, সত্য ও অক্রোধ।

ধৃতি শব্দের স্থূল অর্থ ধৈর্য্য। সূক্ষ্ম অর্থ শোকদুঃখে জর্জ্জরিত চিত্তের স্থিরীকরণ। এটা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। ক্ষমা—শক্তি থাকা সত্ত্বেও অপর শক্তিমান্‌কে সহ্য করা। দম—বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। অস্তেয়—পরের দ্রব্য অপহরণ হতে নিবৃত্তি। শৌচ—দেহের অভ্যন্তর ভাগ ও বহির্ভাগ উভয়কে পবিত্র রাখা। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বশীভূত রাখা। চক্ষু শুধু বহির্জগতের রূপই দেখ্‌বে অন্তর্জগতের রূপ দেখ্‌বে না—তা নয়। অন্তর্য্যামী ভগবান্ যে অন্তরে বিরাজ করছেন তার দিব্য জ্যোতির্দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মুখ্য কর্ত্তব্য। ধী—বুদ্ধি-বৃত্তির প্রসারণ। বিদ্যা—জ্ঞানার্জ্জন। আত্মা কি বা আমি কে এই ভাবনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান। সত্য—সত্যবাক্য ভাষণ, সত্যপথে গমন, মিথ্যাবর্জ্জন, অপ্রিয় পরিহার। অক্রোধ—কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টি রিপুর অন্যতম রিপু ক্রোধকে দমন করা। অহিংসার পথেই ক্রোধজয় সম্ভব।

ধর্ম্মসম্বন্ধে বল্‌তে গেলে অনন্ত শাস্ত্রের অনন্ত লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। আমাদের ন্যায় সান্ত, অশান্ত, স্বল্পজ্ঞের পক্ষে উহা অসম্ভব। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এমন কিছু

বর্ণিত আছে যা উল্লিখিত দশ লক্ষণকে অতিক্রম করে, পরন্তু অনেকগুলি তুল্য-মূল্যবিশিষ্ট সাধারণ ধর্ম্মলক্ষণ উল্লেখ করছি—

অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে অবস্থান, দান, দম, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, খলতাবর্জ্জন, জীবে দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লোকলজ্জা, চাঞ্চল্য-শূন্যতা, তেজঃপ্রদর্শন, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, দম্ভাভাব। এই গুলো হচ্ছে উন্নতি-কামী ব্যক্তিদের ধর্ম্ম-লক্ষণ। দম্ভ, দর্প, অভিমান, অহঙ্কার, ক্রোধ, কর্কশ ভাষণ ও অবিবেকের বশীভূত থাকা এইগুলো হচ্ছে অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ধর্ম্ম।

মথুরাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত কংস ঐরূপ অসুরভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরাজয় হ'ল সুরধর্ম্মাবলম্বী সত্যাশ্রয়ী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে। সত্যই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই সত্য, সেই সত্যই ভগবান্। ভগবান্ একমাত্র সত্য। ধর্ম্মকে মেনে চল্‌লে ধার্ম্মিকের রক্ষা হয়, সত্যকে মেনে চললে ভগবান্ প্রসন্ন হন, ভগবানকে মেনে চল্‌লে ধর্ম্ম ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হয়। নাম ভিন্ন বটে, কিন্তু বস্তু এক। লঙ্কাধিপতি রাবণ অতিশয় দর্পবশতঃ অধর্ম্ম-আচরণে পাতকগ্রস্ত হয়ে নিপাতিত হন শ্রীরামচন্দ্রের নিকট। মহামানী দুর্যোধন শত ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, নানারূপ অধর্ম্ম-লক্ষণে আক্রান্ত। তিনি নিহত হলেন শতভ্রাতা সহ মধ্যম পাণ্ডবের কঠোর হস্তে। দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণ ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজেতা হ'লেও চিরকালের নিমিত্ত পরাজিত হ'ল দেবতাদের নিকট। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও উপনিষদ সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বলোককে শিক্ষা দিচ্ছে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়।

ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে—যেখানে ধর্ম্ম সেখানে কৃষ্ণ, যেখানে কৃষ্ণ সেখানে জয়। গীতার শেষ শ্লোকটিতেও এই কথারই প্রতিধ্বনি—

যেই পক্ষে বিরাজেন কৃষ্ণ যোগেশ্বর,
বিরাজিত সেই পক্ষে পার্থ ধনুর্ধর।
সেই পক্ষে শ্রী বিজয় উন্নতি ও নীতি,
ইহাই নিশ্চয় মোর মত হে নৃপতি।

যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের পূর্ব্বে পুত্র দুর্য্যোধন জননী গান্ধারীকে প্রণাম করে শুনেছিলেন 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়।' মাতা পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে এমন কথা বল্‌লেন না 'বৎস! জয়লাভ কর।' পিতা ছিলেন জন্মান্ধ এবং পুত্রস্নেহে অন্ধ, কিন্তু মাতা ছিলেন তার বিপরীত। স্বামীর অন্ধত্ব দুঃখের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হবেন বলে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের চক্ষু আবৃত করে রাখ্‌তেন।

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন যখন স্বীয় মাতা কুন্তী ও মাদ্রীকে প্রণাম করে গান্ধারীকে প্রণাম কর্‌লেন, তখনও তখনও গান্ধারী আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

সতীধর্ম্মপালন-তৎপরা ভারতরমণী সতীধর্ম্মের মর্য্যাদানাশক স্বকীয় পুত্রকেও ক্ষমার চক্ষুতে দর্শন করেন নি। সতী সাধ্বী গান্ধারী, দ্রৌপদীর মর্য্যাদানাশকারী পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন না যে তোমার জয় হোক। যার যা ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মকে ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি দীপের ধর্ম্ম দীপ্তিদান, শিশুর ধর্ম্ম চাপল্য, মানবের ধর্ম্ম মানবত্ব। যে মুহূর্ত্তে জলের শৈত্য থাকবে না, সেই মুহূর্ত্তে বুঝা যাবে জল নেই,—জলের মৃত্যু হ'য়েছে। যে আগুনের দাহিকা শক্তি নেই সে আগুন আগুন নয়, সে আগুন ভস্ম বা পোড়া কাঠ। ধর্ম্মের লোপে ধর্ম্মীর লোপ। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ধর্ম্ম যে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত সেই মুহূর্ত্তে তার মৃত্যু। এই

কারণেই সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল মানবকে উপদেশ দেন—ধর্ম্মত্যাগী হয়ো না, ধর্ম্মকে অবহেলা করো না, তাতে তোমার মৃত্যু, সমাজের মৃত্যু।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—পরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা নিজের ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করে ভগবান বাসুদেব সমগ্র জগৎকে কিরূপ সাবধান বাণী শুনালেন—পরধর্ম্ম ভয়াবহ! এই বাণীর তিনি অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরুক্তি করছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ

১৮।৪৭

স্থূল দৃষ্টিতে নিজের ধর্ম্মকে যদি অঙ্গহীনও মনে হয়, তবু সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করতে নেই। নিজ ধর্ম্মে অবস্থান করে যে ব্যক্তি মারা যায়, তার জীবাত্মা স্বর্গসুখ লাভ করে, পক্ষান্তরে পরধর্ম্ম গ্রহণ অতীব নিন্দনীয়, অতীব পাপজনক।

ভারতীয় শাস্ত্রে মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে সুখী শান্ত ও অচঞ্চল রাখার জন্যে পরমায়ুকে ভাগ করেছেন—দশভাগে। একে বলা হয় দশ দশা। যথা—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, গৃহস্থ, প্রৌঢ়, বানপ্রস্থ, বার্দ্ধক্য, অতি-বার্দ্ধক্য বা ভিক্ষু। পাশ্চাত্য কবি সেক্স-পিয়ার তাঁহার 'As you like it' নামক নাটকে মানবের সপ্ত দশা বর্ণনা করেছেন—Infant, schoolboy, lover, soldier, justice, slipperied pantaloon, second childish-ness, অর্থাৎ শিশু, বিদ্যার্থী ছাত্র, প্রেমিক, সৈন্য, বিচারক, করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ড, দ্বিতীয় শৈশব।

মানবজীবনকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করার অর্থই হ'লো যথাসময় যথাযথ ধর্ম্মপালনের ব্যবস্থা। এতে প্রত্যেকের জীবনকে মহিমমণ্ডিত করে তোলা যায়। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র এই পরমায়ুকে ১০৮ বৎসর ধরে নিয়ে নয় ভাগে বিভক্ত করেছেন—৯ × ১২ = ১০৮। প্রত্যেক ১২ বৎসরে এক এক ধর্ম্ম পালন। এই শাস্ত্রের মতে অষ্টোত্তরী শত মানবের আয়ুর্গণনা। অপর এক গ্রন্থের মতে বিংশোত্তরী শত, অর্থাৎ ১২০ বৎসর পরমায়ু। একে ভাগ করা হয় দশ ভাগে ১০ × ১২ = ১২০। প্রথম ১২ বৎসর মাতাপিতার অধীন, দ্বিতীয় ১২ বৎসর গুরুগৃহে বিদ্যাধ্যয়নরত, তৃতীয় ও চতুর্থ ১২ বৎসর (অর্থাৎ ২৪ হইতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত) গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। ৪৮ + ১২ = ৬০ প্রব্রজ্যাগ্রহণের কাল, পঞ্চাশদূর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। ৬০ + ১২ = ৭২ বাহুত্তুরে বৃদ্ধ। ৭২ হইতে দুই বারো ২৪ = ৯৫ বছর পর্য্যন্ত ভিক্ষু, ৯৬ + ১২ = ১০৮ অথবা আরও ১২ = ১২০ পর্য্যন্ত অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণনায় দীর্ঘায়ু।

মানবের এই জীবনগত ধর্ম্মকে মেনে চলা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন না প্রাক্তন, অদৃষ্ট বা সংস্কার রূপ ধর্ম্ম তার ইহজন্মের কর্ম্মকে পরিচালিত করছে।

এইতো গেল ব্যক্তিগত ধর্ম্মের সীমারেখা নির্দ্ধারণ। তারপর মানবের সমষ্টিগত সামাজিক জীবনকে শৃঙ্খলিত করবার জন্য অপর এক মহান্ প্রয়াস আর্য্যশাস্ত্রে দেদীপ্যমান। সুবিশাল মানবসমাজের মধ্যে মস্তিষ্কশক্তি যাদের প্রবল তারা থাক্‌বেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্যে,—শিক্ষাবিভাগে, দেশরক্ষার কাজে উপযুক্ত যারা, দৈহিক শক্তিমান্, তারা হবে সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনানায়ক। হেঁটে খেটে, দেশদেশা-ন্তরে গিয়ে যারা করতে পারবে ধন-উৎপাদন ও ধনবর্দ্ধন, কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণ, তারা হবে বণিক্ ও কৃষক। এই তিনটি প্রধান গুণ যাদের মধ্যে নেই তারা হবে জনসেবক, পরোপকারক।

মহামতি প্লেটো বলেছেন—যাতে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থাবস্থায় থাকে তাই ধর্ম্ম। গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটল্ এই মতেরই পোষক। একটু প্রভেদ এই, প্লেটো বলেন সুখই ধর্ম্মের কারণ, ইনি বলেন ধর্ম্মই সুখের কারণ।

ভারতীয় শাস্ত্রে নারীধর্ম্মও উপেক্ষিত হয় নি। বিবাহের পূর্ব্ব পর্যন্ত সে কুমারী, কন্যা, বিবাহের পর সে শ্বশুর-কুলের সম্রাজ্ঞী, সতী সাধ্বী পতিব্রতা।

ভারতবর্ষের স্মৃতিশাস্ত্রের নাম ধর্ম্মসংহিতা, তন্মধ্যে মনুসংহিতা অন্যতম। কেউ কেউ মনে করেন এ সমস্ত গ্রন্থে জীবিকার ব্যবস্থা নেই, উদরপোষণের ব্যবস্থা নেই, শুধু আছে সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতা, অতএব মনুসংহিতাকে ভারত সাগরের জলে বিসর্জ্জন দাও! মনুর শাস্ত্রে জীবিকার কথাও রয়েছে—বিদ্যা শিল্প ভৃতি সেবা গোরক্ষা বাণিজ্য কৃষি ভৃতি ভৈক্ষ ও কুসীদ—এই দশটি জীবিকা।

ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বাস্থ্যতত্ত্ব অপূর্ব্ব। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হয়েছে—ধর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন, অধর্ম্মে অধঃপতন—ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ। একমাত্র নিরাকার জ্যোতিকে যে ব্যক্তি ধ্যানধারণায় আনতে পারবে না, তার পক্ষে সাকারোপাসনা ধর্ম্ম। সকলের শক্তি সমান নয়। অধিকারিভেদে উপাসনাভেদ। তাই কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বৈষ্ণব, কেউ গাণপত্য, কেউ বা সৌর। গম্যস্থান সকলের এক, গমনের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

কোনও দেশের বা জাতির যদি ধনক্ষয় হয়, জনসংখ্যা হ্রাস পায়, এমন কি যদি স্বাধীনতাও লুপ্ত হয়, তবু সেই জাতির মনে একটা তীব্র আশা জেগে থাকে—কবে আবার ধন হবে, জন-সংখ্যা বাড়বে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আশা প্রবল থাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার মধ্যে থাকে ধর্ম্মভাব এবং স্বকীয় ভাষার প্রসার। জাতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা কল্পে ধর্ম্ম ও ভাষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় আর্য্যদের সংস্কৃত ভাষার উপর ভারতীয় সংস্কৃতি অনেক নির্ভর করে।

একটি মহনীয় উক্তি আমাদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যের মতো চলে' আসছে—'ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।' ধর্ম্মকে রক্ষা করে চললে সেই ধর্ম্মই আমাদিগকে রক্ষা করবে। "ধর্ম্ম কি?" এই প্রশ্নের অপর এক সরল উত্তর—'আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতাই আমাদের ধর্ম্ম।'

তুলসীদাস বলেছেন—

চল্‌তি চাক্কি সব কোই দেখা,
কীল ন-দেখা কোই।
কীল পাকড়কে যো রহে গা,
সাবুদ রহে হ্যায় ওই।

যাঁতার মধ্যে কলাইএর ডাল ঘুরপাক্ খাচ্ছে, গোটা ডাল চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু যে ডাল যাঁতার কীল বা খুঁটিকে ধরে আছে, সেই ডালের ধ্বংস নেই, সেই ডা'লটি ভাঙছে না, আস্ত রয়েগেছে। তেমনি সংসারের ঘূর্ণীপাকে যে মানব ধর্ম্মরূপ খুঁটিকে আকড়ে থাকে তার কখনো ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই, সে অজর অমর, অক্ষয়, সে জগতের আদর্শ, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিলেও সেই মহাপ্রাণ—মৃত্যুহীন।

বকরূপী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গুহ্য, মহাজনগণ যে-পথে গমন করেছেন সেই পথই পথ। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, হজরৎ মোহম্মদ, প্রভৃতির জীবন বর্ত্তমান ধর্ম্ম-জগতে আদর্শ হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতে প্রতিগৃহে ছিল ধর্ম্মের আসন। সেই আসনের অধিকারী ছিলেন আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ। আমরা কি আজ সেই আসন হ'তে বিচ্যুত হব—স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হব?

বিজয়া

শ্রী—

মহানবমীর ইমন্‌কল্যাণ নীরব হ'য়ে যাবার পর উৎসব-শেষের যে বিষাদ অন্তর আপ্লুত ক'রেছিল, তারই বেহাগ আজ বায়ুমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে। এ ধ্বনি উৎসবের দিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ সুর বিদায়ের সুর—বিসর্জনের বেদনায় আর্দ্র। আজকের আচরিত অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো মত্ততা নেই, আগ্রহ নেই। আছে প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের স্নিগ্ধতা, আছে আশীর্বাদের স্নেহ। যে শক্তি অরি-বিনাশে ছিল দুর্দম্য, অসুরের কাছে অপরাজেয়—তা' বিদায়-গ্রহণের বেলা বিগলিত। শত্রুবিজয়িনী জননী বিজয়ার বেলা কল্যাণী। মায়ের এই কল্যাণী-রূপই বিজয়ার বুকের বাণী। বিজয়া তাই গম্ভীর, ভয়াল—আবার করুণ, কমনীয়।

শ্রীরামচন্দ্রের আকুল আহ্বানে শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রহরণধারিণী অসুরনাশিনী দুর্গামূর্তিতে জেগে-ছিলেন। বিজয়া এসেছিল, রাবণ নিহত হ'য়েছিল, সীতার উদ্ধার হ'য়েছিল, শ্রীরামচন্দ্র ক'রেছিলেন বিজয়লাভ। ঋষিকণ্ঠে বিজয়ার গীতি ঝংকৃত হ'য়েছিল। সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তর-আহ্বান সে বিজয়ার স্মৃতিকে প্রতিবৎসর বহন ক'রে চ'লেছে।

শ্রীরামচন্দ্র যে বিজয়াকে বহন ক'রে এনে-ছিলেন, সে বিজয়াকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি, আমরা বিজয়ের আশা ছেড়েছি, প্রাণাকাংক্ষাকে পরিহার ক'রেছি, পরাজয়কে বরণ ক'রে নিয়েছি। পরাজয়ের ওপর পরাজয়। জীবন্ত মহাজাতির অন্তরের অনলে উদ্দীপ্ত যে আবেগ মহাভারতের আকাশে বাতাসে একদা আলোড়ন তুল্‌তো, বহুকাল তা' সুপ্ত হ'য়েছে—নিভে গেছে তা'র বহ্নি-বিকিরণ।

দুর্ধর্ষ রাবণাসুর বিজিত হ'য়েছিল কৃতিত্বের বলে নয়, দৈবেরও বলে নয়, প্রেমের বলে—সুদৃঢ় মমত্ববোধের প্রখর সংহতি-শক্তির প্রভাবে। শ্রীরামচন্দ্রের জয়—মৈত্রীর জয়, প্রেমের জয়। পঞ্চবটীতলে যে প্রেমের হোমানলে তেজোময়ী পুণ্য-প্রতিমা মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে ওঠে, তা'র জ্যোতিতে, তা'র শ্রীতে সুগ্রীবের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য প্রত্যক্ষীভূত হ'য়েছিল। সাক্ষাৎ নারায়ণ রাজ্য-তাড়িত কপিরাজকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে মিত্র সম্বোধন ক'রেছিলেন, আলিংগনে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। প্রেমের বিচিত্র বিকাশ তাই বালিবধে। বালিবধ—প্রেমের গূঢ়তা যে বোঝে না, যে জানে না প্রেমের ধর্ম, সে বল্‌বে কলংকের কাহিনী। কিন্তু সে তো কলংক নয়, প্রগাঢ় প্রেমের সে হ'লো দীপ্তোজ্জ্বল রক্তললাটিকা। যে প্রেম অনন্যলক্ষ্য অধ্যবসায়ে বিজয়াকে প্রতিষ্ঠিত করে, অজ্ঞাতদোষক্লিষ্ট বিচার-বিশ্লেষণে তা' চলে না। দুর্বোধ্য পথে দুর্বার গতিতেই তা' প্রধাবিত হয়। লৌকিক নীতিবাদের সূক্ষ্ম বিচারণার বিতংস-জালকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সে প্রেম উগ্রতায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। এমন প্রেমের প্রগাঢ়তা যেখানে নেই, সেখানে বিজয়া নেই—মমত্ববুদ্ধির উদার অনুভাবনা যেখানে নেই, সেখানে বিজয়া নেই।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেবী দুর্গাকে শুধু

শক্তির অধিষ্ঠাত্রী-রূপে কল্পনা ক'রেন নি, মাধুর্য ও মংগলের, সত্য ও শ্রী-র মূর্ত প্রতীকরূপে মর্মের মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। তাঁ'দের ভাব-গম্ভীর মনের রঙে রাঙিয়ে তাঁ'রা উমাকে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়-গামিনী কন্যার বেদনায় চিত্রিত ক'রে গেছেন। যে বিদায়ে বুকের বেলায় আঘাত না জেগে পারে না, যে বিসর্জনে আঁখির কোলে অশ্রু না-ফুটে পারে না—প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষেরা সেই বিজয়াকে বেদনা-বিধুর কল্যাণমূর্তির মধ্যেই জাগ্রতা ক'রে গেছেন। বিজয়ার অনুষ্ঠান—যে উদার অনুভূতির ভিতর দিয়ে পর আপনার হয়, শত্রু মিত্র হয়, দ্বন্দ্ব-দ্বেষের সকল জ্বালা দূর হ'য়ে যায়, সেই অনুভূতি যেখানে, যে সমাজে, যে জাতিতে বাস্তব হ'য়ে ওঠে, বিজয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তথায়, সর্বতো সফল হয় সেখানেই। মহিমময় পূর্বপুরুষেরা মায়ের আশীর্বাদে সত্যকে উপলব্ধি ক'রে পেয়ে গেছেন বিজয়ার আনন্দ এবং সার্থক ক'রে গেছেন সেই বিজয়াকে।

আমরাও যুগে-যুগে সেই বিজয়াকে প্রতিষ্ঠা ক'র্তে চেয়েছি। কিন্তু বিজয়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বপ্রকার ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও নগ্নতার ওপর মায়ের বিজয়—সর্বত্র কুশ্রীতার বিলীয়মান অপচ্ছায়ায় শান্ত-সুন্দর বৃত্তি-নিচয়ের উদার বোধন—যে বিজয়ার বুকের বাণী, তুংগ অসংগতির মধ্যে তবুও চিরপ্রতীক্ষিত বেদনা-মধুর সে দিনটির পুনরাবির্ভাব হ'য়েছে। ফেলে আসা বিগতের এই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বাংগীণ অবস্থার হ'য়েছে অনেক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। তখন যে কলংকের কালো অন্ধকারে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ কোলাহল ছিল, পরিবর্তনের তারতম্যে তা'র তীব্রতা হ্রাস পেলেও প্রাচুর্যের পরিতৃপ্ততা, আনন্দের উদ্বেলতা, জীবনের উজ্জ্বলতা আজো ফিরে আসেনি। সূর্যের সোনালী রশ্মি শরতের ব্যোম-বায়ে উচ্চকিত হ'তে চাইলেও মুখে মুখে বুকের হাসি উচ্ছল হ'য়ে ওঠেনি। সমস্ত উদ্দীপনার আত্মা যেন স্তিমিত। ব্রহ্মবাদিনী কল্যাণী সাবিত্রী আমাদের তামসী প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মদান্ধতায় অবরুদ্ধা। অন্তরের সত্যসাধনা আমাদের অন্তর্হিত।

তবুও তা'র মধ্যে বিজয়ার যে অমোঘ প্রেরণা-শক্তি, পঞ্চপল্লবাপ্লুত বারিধারায় অমংগল-বিনাশী যে মাংগলিক মন্ত্র-সিদ্ধি জীবনের সকল আড়ষ্টতার ফাঁকে উৎসারিত হ'চ্ছে, তা' অনুভব না ক'রে পারি না। সংগতিহারা জীবনের পুরোভাগে তাই পাই বিজয়ার মৌন বরাশিস্—"অগ্রসর হও পশ্চাতের মৃত্যুর পটভূমি থেকে সম্মুখ-জীবনের অমৃত-আস্বাদনের পথে।—শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।"

চিরন্তন শ্রেয়াশীর্বাদে নিতান্ত নিষ্ফল আজ আচ্ছন্ন বুদ্ধির দন্তাস্ফালন! আজ কেবল গভীর প্রাণের প্রার্থনা—"হে মাতৃকা, প্রেমের দ্বারা জয় করতে, দুঃখের দ্বারা লাভ ক'র্তে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ ক'র্তে উপযুক্ত করো। সর্ববিধ অনৈক্যের, সর্ববিধ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে মহামৈত্রীর মিলনাংগনে যেন সৌহার্দ্যের শুভসূত্রে, ভ্রাতৃত্বের রাখী-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারি।—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'।"—

শত্রু ও মিত্র, বন্ধু ও বিদ্রোহী, উচ্চ ও নীচ, দূর ও নিকটকে এক ক'রে দেখ্‌বার এমন সুযোগ, এমন অবকাশ আর নেই। বছরের আর আর দিনে প্রসাদ বিতরিত হ'য়েছে, আর আজ হ'বে আশীর্বাদ। আজকের এই কুশ্রীতার মধ্যে এই আশীর্বাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। প্রয়োজন এই

জন্য যে, বিজয়ার শান্তি ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে জাতির জীবন নবজন্ম পরিগ্রহ ক'রবে। আপনাকে ও অপরকে আমরা নূতন ক'রে ফিরিয়ে পাবো। বিজয়ার মধ্য দিয়ে নূতন জীবনের প্রারম্ভ এবং নূতন জীবনের প্রকাশ। বিজয়া নবজীবনের জয়যাত্রা।

জগদ্ধাত্রী মায়ের আশীর্বাদে আমাদের সমাজ-দেহে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের এ বিজয়া সত্য হো'ক্, প্রসন্ন হো'ক্। সংক্রামিত মোহের দুর্বলতা কেটে গিয়ে জাতি আবার ধন্য হো'ক্, পুণ্য হো'ক্। আশা ও আনন্দ, প্রীতি ও প্রাচুর্য, কুশল ও কল্যাণ জাতির জীবনকে সত্য-শ্রী-মণ্ডিত ক'রে তুলুক্। প্রত্যেকের ওপর নির্বিচার মমত্ববোধ প্রগাঢ় হ'য়ে উঠুক্। মহাজাতির সত্যিকার সুপ্রভাত সমাসন্ন হো'ক্।

বিজয়ার পবিত্র পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভাবনায় আমি কবি জানাই অধীরে—সারা জীবন যার সংগে সংগ্রাম ক'রেছি, এই বিজয়ায় তা'র সম্পর্কে কোনো অনুযোগ নেই। যে ভালোবেসেছে, কিংবা যে বাসেনি, বিজয়ার পরমক্ষণে তা'রা সবাই ভালোবাসার পাত্র। প্রাণের প্রীতি, সপ্রেম আলিংগন, সশ্রদ্ধ অভিবাদন সবাই গ্রহণ করুন। নমস্কার আজ সকলকে। যাঁরা শুভৈষী, কিংবা যাঁ'রা শুভার্থী নন, তাঁ'দেরকে নমস্কার। যাঁ'রা একমত নন, কিংবা যাঁ'রা প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদেরকে নমস্কার। যাঁ'রা মরমী-মিতা যাঁ'রা বন্ধু যাঁরা বৈরী—তাঁদেরকে নমস্কার। আপন পর, পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড়, বর্ণধর্ম-শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিচারে সবাইকে নমস্কার। নমস্কার আমার জন্মভূমির প্রত্যেককে,—জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, কুসুম, বিটপী, বল্লরী, প্রতি বালুকণাকে নমস্কার। নমস্কার আমার অখণ্ড বাংলার, নমস্কার আমার অবিভক্ত মহাভারতের গিরি-নদী, সাগর-প্রান্তর, আকাশ-বাতাস—সকলকে, সব কিছুকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজীর দেহত্যাগ— গত ২রা ভাদ্র শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪-২০ মিনিটের সময় স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৬৯ বৎসর বয়সে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কিছু দিন যাবৎ হৃদ্‌রোগ ও হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া মণিকর্ণিকাঘাটে সমাহিত করা হইয়াছে।

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী কপিল মহারাজ নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সনে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। কপিল মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৩১৮ সনের মাঘ হইতে ১৩২৭ সনের পৌষ পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সহিত 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের ম্যানেজারের কার্য-পরিচালনা করেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী বহুদিন পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে অবস্থান

করিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি কাশীধামে থাকিয়া সাধন-ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার তপস্যাপরায়ণতা ও অমায়িকতা প্রশংসনীয়। কপিল মহারাজের পরলোকগত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি—এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দজী এবং তাঁহার সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দজী গত জুলাই মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন: (১) ধ্যানযোগের কৌশল, (২) মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি? (৩) স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম, (৪) জাগতিক ব্যাপার-সমূহের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, (৫) সত্যের আচরণ, (৬) মনকে অবধারণ করিবার যথার্থ প্রয়াস, (৭) মরণে জীবন ও জীবনে মরণ, (৮) 'অহং'-নাশের উপায়, (৯) দীক্ষা ও শিষ্যত্ব। এতদ্ব্যতীত প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সোসাইটির বক্তৃতা-ভবনে স্বামী অশোকানন্দজী সদস্য ও শিক্ষার্থিগণকে ধ্যানাদি শিক্ষা দেন এবং 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্' ব্যাখ্যা করেন।

কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান—এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩১শে শ্রাবণ জন্মাষ্টমী দিবসে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যাবির্ভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্দির ও নাটমন্দির বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। উপনিষৎপাঠ, ভজন, কীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড় মঠ ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সাধু উৎসবে যোগ-দান করিয়াছিলেন। প্রায় পনর হাজার ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। অপরাহ্ণে স্বামী মৈথিল্যা-নন্দজী ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী অতি মনোজ্ঞ ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত জীবনী ও বাণী আলো-চনা করিয়াছিলেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর বক্তৃতা—বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত আসামের অন্তর্গত শিলং নওগাঁ শীলঘাট তেজপুর হোজাই লামডিং করিমগঞ্জ হাফলং হরঙ্গাজাঁউ মাহুর মাইবাং লাংটিং গৌহাটি পাণ্ডু কামাখ্যামন্দির আমিন গাঁও এবং কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে মোট ৭০টি বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে ২০টি বক্তৃতা আলোকচিত্র সহযোগে প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা', 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'জনজাগরণ ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'শক্তি-সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় শিক্ষার ধারা', 'ছাত্রজীবনের কর্তব্য', 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মশিক্ষা', 'ছাত্রদের প্রতি যুগাচার্য বিবেকানন্দের নির্দেশ', 'ভক্ত ও ভগবান', 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও আদর্শ', 'সেবাধর্ম' প্রভৃতি।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা আচার্য বিবেকানন্দ সোসাই-টির উদ্যোগে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা—ভারতের শাশ্বত আত্মার মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের ৮৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৭ই ভাদ্র শনিবার সায়াহ্নে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতের গৌরবময় দিনে হিন্দুধর্ম কখনও বাস্তবতাবিমুখ ছিল না। নব-জাগ্রত জাতির জীবনে তিনি ভাবের গঙ্গা বহাইয়া দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি জনহিতকর কাজে আজ যে শত সহস্র কর্মী কর্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে তাহার প্রেরণা যোগাইয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

সভায় এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে তিলধারণের স্থান ছিল না। বক্তাগণ যখন স্বামীজীর কর্মশক্তি ও ধর্মপ্রেরণা সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন সভায় এইরূপ গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল যে, সূচীপতনের শব্দও শুনা যাইত। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা বাংলার নরনারীর হৃদয়কে কি গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়।

বিচারপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেলুড়মঠের স্বামী চণ্ডিকানন্দজী কর্তৃক স্বরচিত একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে সোসা-ইটির সেক্রেটারী জানান যে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানে তাঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির-নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তদুদ্দেশ্যে এ যাবৎ মাত্র ৫৯ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বাকী অর্থের জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন করেন।

পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ধ্যাননিমীলিত-নেত্র স্বামী বিবেকানন্দের একখানি তৈলচিত্র মাল্যসজ্জিত হইয়া মঞ্চোপরি শোভা পাইতেছিল।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন—কর্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ এ যুগে কদাচিৎ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে আজ নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার চরম সমাধানের একমাত্র পথ—সাংসারিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ-স্থাপন। দুইটি যদি তফাৎ থাকে তাহা হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, কোন রাষ্ট্রনেতাই তাহা দূর করিতে পারেন না। তাহার একমাত্র সমাধান—অধ্যাত্মলোকে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার সমাধান যদি ঊর্ধ্বলোক হইতে করিতে পারা না যায় তবে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

স্বামী পবিত্রানন্দজী বলেন—স্বামী বিবেকা-নন্দ ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও দেশপ্রেমিক। তিনি ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করিতেন, কিন্তু পৃথিবীর উপর হইতে তাঁহার দৃষ্টি কখনও অপসারিত হয় নাই। ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্য তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিত। সেই ব্যথা বুকে লইয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ডের ন্যায়

ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন—জগৎকে নূতন ধর্মের বাণী শুনাইবার ভার ভারতের উপর বর্তিয়াছে। সেইজন্য স্বাধীনতা-লাভের পর হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু কৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—যেদিন স্বামীজী আমেরিকায় জলদগম্ভীরস্বরে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সেদিন ছিল হিন্দুধর্মের গৌরবোজ্জ্বল দিন; ধর্মকে গ্লানি ও জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া আদিম ও অকৃত্রিম রূপে তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণত্ব প্রমাণিত হয়, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—'তোমার মুখের কথায় আমি ভুলিব না, যদি না তুমি আমাকে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দেখাইতে পার'। ধ্যানের শান্তি ও কর্মনিষ্ঠার প্রবল প্রেরণা তাঁহার মধ্যে যুক্ত হইয়াছিল। আজ হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব লুপ্তপ্রায়, জাতীয় জীবনকে সামনের দিকে আগাইয়া নেওয়ার গুরু দায়িত্ব আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে। আমাদের অস্থিমজ্জায় যে আধ্যাত্মিক প্রভাব যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সঞ্চিত আছে, স্বামীজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তাহাকে যদি আমরা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, তবেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

অধ্যক্ষ রেভাঃ জন কেলাস বলেন—ভারতের শাশ্বত আত্মাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে বিবেকানন্দ চেষ্টা করিয়াছেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ, প্রাচীন ও নূতন—এই দুই-এর মধ্যে তিনি সমন্বয়সাধন করিয়াছিলেন। হৃদয়ের ও আত্মিক বলে তিনি বলীয়ান ছিলেন। দেশের বর্তমান সংকটময় দিনে এই বলের প্রয়োজন আজ সর্বাপেক্ষা বেশী।

স্বামী সুন্দরানন্দজী বলেন—জাতির জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যেদিন আমেরিকায় গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন করেন, সেদিন হইতে জাতি আত্ম-সংবিৎ ফিরিয়া পায়; আমরা বুঝিতে পারি—জগতের ভাণ্ডারে দান করিবার মত সামগ্রী আমাদেরও আছে। তাঁহার প্রেরণায় নবজাগ্রত জাতির জীবনে ভাবের গঙ্গা বহিতে আরম্ভ করে। আজ দেশ যে সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহার সমাধান করিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ধর্ম, সত্য ন্যায়নীতি সংযম প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে এবং ঐ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পাশ্চাত্যের সর্ববিধ বাহ্যোন্নতি অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতে আমাদের জাতীয় কল্যাণসাধনের উপায়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায় বলেন—অসত্যের সঙ্গে আপস না করিতে স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিতেন। তাঁহার সে উপদেশ যদি আমরা পালন করিতাম তাহা হইলে আজ দেশ দ্বিখণ্ডিত হইত না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন—বাংলাদেশ আজ সমস্যা-সমাকুল প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন—এ প্রদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বক্তা মনে করেন—যে প্রদেশে স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন সে প্রদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইতে পারে না এবং তাহার আধ্যাত্মিকতার উৎসও শুকাইয়া যাইতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে নব-জাগরণের যে স্পন্দন দেখা দিয়াছিল, তাহা

স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রেরণার সাক্ষাৎ পরিণতি—এই প্রেরণা অতীতে বাংলাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে।

কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—কিছু দিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের কতিপয় বিশিষ্ট সন্ন্যাসী কুমিল্লায় শুভাগমন করিয়া অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও উৎসবের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, স্বামী চণ্ডিকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী প্রভৃতির পবিত্র সঙ্গলাভে এবং তাঁহাদের শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাশ্রবণে কুমিল্লার নর-নারীর প্রাণে নবীন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজা হোম ভজন কীর্তন এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। ডাঃ হাসান সকল ধর্মের মূলসূত্র যে এক সেই সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ বরিয়াছিলেন জেলা জজ মহোদয়।

লণ্ডনে যক্ষ্মা সম্মেলন—লণ্ডনে যক্ষ্মাসম্মেলনে ৫৩টি দেশের বিশেষজ্ঞগণ যোগ দিতেছেন। এই ভয়াবহ ব্যাধি সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই রোগে বৎসরে ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ অর্থাৎ দৈনিক ১০।১৫ হাজার লোক প্রাণ হারায়। ভারত ও পাকিস্তানের বিশেষজ্ঞদ্বয় এ বিষয়ে একমত যে, এশিয়ার দেশগুলিতে যক্ষ্মা নিবারণের একমাত্র উপায় হইতেছে, নবজাত শিশুদের বি-সি-জি (ব্যাসিলাস ক্যামেট গুয়েরিণ) টীকা দেওয়া। ৪০ বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের দুইজন ডাক্তার এই প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করেন এবং তাঁহাদের নামানুসারেই এই টীকার নামকরণ হইয়াছে। যক্ষ্মার প্রকোপ এশিয়ায় সর্বাধিক।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির ডাঃ আর সি অধিকারী প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মত এলাকায় রোগীদের পৃথক করিয়া রাখা যখন সম্ভব নয়, তখন শিশুদের বি-সি-জি টীকা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং তাঁহারা এই টীকা দিতে আরম্ভ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীই কোন-না-কোন প্রকার যক্ষ্মার কবলে পড়িয়াছে এবং এই রোগ ক্রমবর্দ্ধমান। ভারতে ম্যালেরিয়ায় সবচেয়ে বেশী লোক মরে, কিন্তু তাহাতে লোক কেবল পঙ্গু হয়, অপর দিকে যক্ষ্মা রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

লাহোরের কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজের ডাঃ আর শা মনে করে যে, যক্ষ্মারোগ নিবারণ করিতে হইলে একেবারে শিশু হইতে আরম্ভ করাই বাঞ্ছনীয়।

তিনি বলেন যে, পাকিস্তানে যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসার জন্য মাত্র ৪০০ বেড আছে। তিনি বলেন যে, বাস্তব লাভের আশায় তিনি এখানে (সম্মেলনে) আসিয়াছেন। রাষ্ট্রসংসদ বি-সি-জি টীকা দান সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি দল প্রেরণ করিতেছেন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান একজন ডাক্তার পাঠাইতেছেন। শিক্ষা দান করিতে বহু বৎসর লাগিবে। ডাঃ শা বলেন যে, গরম এবং ডাক্তারী বিদ্যায় পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে বি-সি-জি টীকা অত্যন্ত উপযোগী। ইহা সস্তাও বটে।

সিংহলের যক্ষ্মাচিকিৎসা বিভাগের কর্মকর্তা ডাঃ জি-ই রনওয়াকে বলেন, শিশুদের

টীকা দান করিয়া যক্ষ্মা নিবারণী অভিযান করা যাইতে পারে, তবে ধীরে ধীরে অভিযানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের প্রয়োজন। তবে তিনি প্রাকৃতিক প্রতিরোধের পক্ষপাতী। যক্ষ্মাপ্রতিরোধক ক্ষমতা লইয়া কোন শিশু জন্মায় না, এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে ভাল করে। ধীরে ধীরে সংগৃহীত ক্ষমতা স্থায়ী হয়, কিন্তু বি সি-জির প্রতিরোধক ক্ষমতার মেয়াদ নির্দিষ্ট। তিনি বলেন যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে শহরে আসিয়া ভীড় জমায় এবং পার্থিব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দূষিত স্থানের সৃষ্টি করে। ফলে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

উত্তর রোডেসিয়ার মেডিকেল অফিসার ডাঃ ব্রিগ্‌স বলেন যে, আফ্রিকায় তাঁহাদের এলাকায় কত যক্ষ্মা রোগী আছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা যে ক্রমবর্ধমান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

ভ্রম সংশোধন

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় ৪৫৬ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে, একাদশ লাইনে 'শ্রেণীর' স্থলে 'প্রাণীর' হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সাহায্যের জন্য আবেদন

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মস্থান। দেশ-বিদেশের বহু নরনারীর নিকট উক্ত গ্রাম মহাতীর্থ। এই গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা অবশ্য-কর্ত্তব্য বিবেচনায় যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় ছোট একটি মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। পল্লীগ্রামের পরিবেশ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পৈত্রিক বাসগৃহের কুটীরগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মন্দিরের পরিকল্পনা করিয়াছেন। মন্দিরের কার্য্য অর্দ্ধেক সমাপ্ত হওয়ার পর বর্ষার দরুণ সম্প্রতি বন্ধ রহিয়াছে ; বর্ষার পর পুনরায় উহা আরম্ভ করা হইবে। এ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কার্য্যে কিঞ্চিদধিক চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। মন্দিরটী সমাপ্ত করিতে আরও চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি বিদ্যালয় এবং একটি অতিথি-ভবনও তথায় শীঘ্রই নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্যে আনুমানিক ব্যয় হইবে ত্রিশ হাজার টাকা।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর হাজার টাকা আবশ্যক।

জনসাধারণ, বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগোষ্ঠীর নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা যেন উক্ত সদনুষ্ঠানের জন্য অবিলম্বে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করেন। সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :—

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
পোঃ—বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া।

পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের বর্তমান অবস্থা

সম্পাদক

কিছু দিন হইল পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—তথাকার ধনবান এবং জমিহীন চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ নিরাপত্তার জন্য প্রথমোক্ত শ্রেণী এবং অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা-সমাধানের জন্য দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণী স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রাম-সমূহের এতদুভয় শ্রেণীর অধিকাংশের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য বাড়ীতে অতি অল্পসংখ্যক লোক আছেন। প্রধান প্রধান শহরে—বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এই উভয় শ্রেণীর বহু ব্যক্তির বাড়ী স্থানীয় গভর্নমেণ্ট 'রিকুইজিসন্' করায় তাঁহারা সপরিবারে বাস্তত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই গুণ্ডাদের দ্বারা কম বেশী আতংকিত বা উপদ্রুত হইয়া অথবা মানসম্ভ্রমের ভয়ে একেবারে বাস্তত্যাগ করিয়াছেন। উকিল-মোক্তার শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত এবং নানাবিধ সামান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পি-শ্রেণীর ভূমিহীন দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে অনেকে পাকিস্তানে জীবিকার্জন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার তালুকদার জোতদার এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদের পরিবারবর্গের মধ্যে দুই চারিজন নিজ নিজ বাটীতে আছেন এবং বেশি সংখ্যকই স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। অনেক জমিদার-বাড়ীতে কেবল তাঁহাদের কর্মচারিগণ থাকিয়া কাজ চালাইতেছেন; মালিকগণ মাঝে মাঝে বাড়ী আসিয়া কাজকর্ম পরিচালন করেন। বহু পল্লীর নিঃস্ব জমিদারদের বিরাট অট্টালিকা এবং সুদৃশ্য বাগানবাড়ী তালাবদ্ধ। পল্লীগ্রামের দরিদ্র ভদ্র-শ্রেণীর হিন্দুদের অনেকে পরিজনবর্গের অন্নবস্ত্র-সংস্থানের জন্য বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ভাবে কত হিন্দু যে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ।

পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা কম। কোন কোন গ্রাম হইতে এই উভয় শ্রেণীর হিন্দুগণ নানা কারণে চলিয়া গেলেও প্রধানতঃ ইহারা স্থান ত্যাগ করে নাই। পল্লী-গ্রামসমূহের হিন্দুদের মধ্যে যাহাদের পরিবারবর্গ-পোষণের

উপযোগী জমি-জমা আছে তাহারাও অন্যত্র চলিয়া যায় নাই। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বর্গাদার ও শ্রমিকদের সাহায্যে জমি চাষ করাইয়া থাকে। বর্তমানে অনেক স্থানে ইহারা বর্গাদারদের নিকট হইতে ন্যায্য ফসল পাইতেছে না। এ জন্য এই শ্রেণীর হিন্দুদের সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। তন্তুবায় ও জেলে শ্রেণী সূতার অভাবে কাপড় ও জাল তৈয়ার করিতে না পারিয়া দৈন্য-দুঃখের শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু মহাজন এবং বড় বড় আড়ৎদার ও দোকানদারদের অনেকেই মাল-পত্র আমদানী-রপ্তানী ও বিক্রয় করিবার পারমিট ও লাইসেন্সের অভাবে কাজ-কর্ম বহুলাংশে গুটাইতে বাধ্য হইয়াছেন। মাঝারি ও ছোট ছোট দোকানদারগণ অতিকষ্টে টিকিয়া আছেন। গুরু পুরোহিত গণৎকার মালাকার তেলি মালি প্রমুখ শ্রেণীর বৃত্তিজীবীদের বৃত্তিগুলি লোপ পাইয়াছে। এ জন্য এই সকল শ্রেণীর পক্ষে জীবিকার্জন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রায় সর্বত্র এখনও চাল তেল কাপড় প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দুর্মূল্য। এ জন্য তথাকার নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর দরিদ্রগণ দূরের কথা, ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষক, জমিদার ও মহাজনদের কর্মচারী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের পক্ষেও তাঁহাদের স্ব স্ব উপার্জিত অর্থ-দ্বারা পরিজনবর্গ পোষণ করা একটি কঠিন সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। তথায় এখন অতি মুষ্টিমেয় ধনবান জমিদার তালুকদার জোতদার এবং সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক ও ছুতার মিস্ত্রী কুম্ভকার প্রমুখ কয়েকটি শিল্পিশ্রেণী ভিন্ন অবশিষ্ট সকল শ্রেণীর হিন্দুদের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। অধিকাংশ পরিবারই অতিকষ্টে জীবনযাপন করিতেছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে অধিকাংশ মুসলমানই কৃষক এবং তাহাদের জমি আছে; যাহাদের পর্যাপ্ত জমি নাই তাহারা অপরের জমি বর্গা চাষ করে। তথাকার শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মুসলমানগণ অতি সহজেই সরকারী কাজ পাইয়া থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় মহাজন ও দোকানদারগণকে পারমিট লাইসেন্স সেলট্যাক্স ও ইনকাম ট্যাক্স প্রভৃতির উপদ্রব ভোগ করিতে হইলেও গভর্নমেণ্টের সমর্থনে তাঁহাদের সংখ্যা ও প্রসার প্রতিপত্তি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহারা হিন্দু মহাজন ও দোকানদারদের স্থান অধিকার করিতেছেন। এই সকল শ্রেণী এবং মুসলমান শিল্পিশ্রেণী-সমূহের অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা হিন্দুদের তুলনায় তেমন প্রবল নহে। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যেও পর্য্যাপ্ত জমিহীন নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক এবং জমিজমাহীন বেকার শ্রমিকগণ এখন অন্নবস্ত্র-সমস্যায় ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যাও সামান্য নহে। তথায় শ্রমিকদের মজুরি খুব বেশী হইলেও স্থানে স্থানে তাহাদিগকে নিয়মিত কাজ দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এজন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা হইতে সম্প্রতি তাহারা দলে দলে জীবিকা-সন্ধানে আসামে যাইতেছে। কিছু দিন হইল ঢাকা জেলা মুসলিম লিগ ইহার প্রতিকার করিতে পূর্বপাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়া মন্তব্য পাশ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে এই শ্রেণীর বহু মুসলমান পশ্চিম-বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানে কেবল হিন্দুগণ নয় পরন্তু দরিদ্র মুসলমানগণও

জীবিকার্জন-সমস্যায় বিশেষ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অত্যল্প কালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল শ্রেণীর জমিজমাহীন হিন্দু এবং এক শ্রেণীর মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল যাবৎ খাদ্য ও বস্ত্রাদির অগ্নিমূল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ-কর্মের অভাব এবং ব্যয়ের অনুপাতে আয় না হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। দরিদ্র হিন্দু জনসাধারণ দূরের কথা, জমিজমাহীন মধ্যবিত্ত হিন্দুগণও অতি তীব্র অভাব-অনটনের অংকুশ-তাড়নায় তাঁহাদের সোনা-রূপা পিতল কাঁসা ও তৈজসপত্রাদি বিক্রয় শেষ করিয়া এখন ঘর বিক্রয় করিতেছেন। হিন্দুপল্লী-সমূহে বহু ঘর ইতোমধ্যেই বিক্রীত হইয়াছে। ইহাদের ক্রেতা অধিকাংশই মুসলমান। অনেক হিন্দু তাহাদের সামান্য জমিও বিক্রয় করিয়া সাময়িক ভাবে উদরান্ন-সংস্থানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কয়েক মাস হইল স্থানীয় মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুদের ঘর বাড়ী ও জমি ক্রয় করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে বাস্তুত্যাগ কতকটা প্রশমিত হইলেও এক শ্রেণীর হিন্দুদের দুর্দশা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অনশনে মৃত্যু অথবা গ্রাম ত্যাগ করা ভিন্ন এই শ্রেণীর পক্ষে আর অন্য কোনও উপায় দেখা যাইতেছে না। অধিকাংশ জমিজমাহীন হিন্দুই তাহাদের ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের কোনও উপায় না দেখিয়া অত্যন্ত আতংকিত হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে এবং কোথায় গেলে তাহারা মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পাইবে এই দুশ্চিন্তায় সকলেই অত্যন্ত বিষাদ-গ্রস্ত। তাহাদের অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, পাকিস্তানে শীঘ্র খাদ্য ও বস্ত্রাদির অগ্নিমূল্য হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। সেখানে থাকিয়া তাহাদের পক্ষে মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা এবং আসামেও তাহাদের স্থান নাই। যে অল্পসংখ্যক পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু নানা কারণে ঐ সকল প্রদেশে গিয়াছে তাহাদেরও দুঃখদুর্দশার সীমা নাই। এ অবস্থায় তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৃত্যু-বরণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায় দেখিতেছে না। ওদিকে ভারতীয় ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরকারী বেসরকারী সকল নেতাই সমস্বরে তাহাদিগকে বাস্তুত্যাগ না করিয়া পাকিস্তানে থাকিতেই বিশেষ জোরের সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—বর্তমান অবস্থাধীনে তথাকার দুর্গত হিন্দুদের পক্ষে কি উপায় অবলম্বনে দুবেলা দুমুঠো খাইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব সে উপায় কেহ এপর্যন্ত দেখাইতে পারিতেছেন না। বাঁচিবার উপায় না দেখাইয়া কেবল বাস্তুত্যাগ না করিবার উপদেশ দান একেবারে নিরর্থক। ইহা অবিসং-বাদিত সত্য যে, যদি আরও কিছু কালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্যের অগ্নিমূল্য হ্রাস না হয় এবং তথাকার জমিজমাহীন হিন্দুগণ মোটা ভাতের সংস্থান করিবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের অধি-কাংশই ভীষণ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার আনুষঙ্গিক মহামারীর প্রকোপে একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইবে, অথবা উদরান্নের একান্ত অভাবে বাস্তু-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, কিংবা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আত্ম-রক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায় সপরিবারে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে প্রলোভিত হইবে! ইহার কোনটি কল্পনায় স্থান দেওয়াও অত্যন্ত আতঙ্কজনক।

পূর্ব-পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর হিন্দুদের অর্থনৈতিক চরম দুর্গতির অবশ্যম্ভাবী কুফল-স্বরূপে ইতোমধ্যেই তাহাদের ধর্ম সংস্কৃতি শিক্ষা সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। সেখানে অভাবের তাড়নায় পূজাপার্বণাদি অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ী হইতে বহুলাংশে বিলুপ্ত হইয়াছে। বার মাসে তের পার্বণ এখন আর দেখা যায় না। অতি অল্পসংখ্যক ধনবান এখন কোন রকমে দোল-দুর্গোৎসবাদি নির্বাহ করেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে পূর্বে নহবৎ, নানা প্রকার বাদ্য এবং বিশেষ জাঁকজমক-সহকারে যাত্রা কবি নাটক প্রভৃতি হইত। ইহা ছাড়া ধর্মসভা হরিসভা কীর্তন ভাগবত-পাঠ মহোৎসব বারোয়ারি প্রভৃতিতে গ্রামগুলি মুখরিত থাকিত। হিন্দুদের আর্থিক দুরবস্থার ফলে এইগুলি ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। শহর ও গ্রামসমূহে মন্দির মঠ আখড়া আশ্রম টোল সাহিত্য-সভা প্রভৃতি কতকগুলির দরজা বন্ধ হইয়াছে এবং অবশিষ্টের অস্তিত্ব অতিকষ্টে কোন রকমে রক্ষিত হইতেছে। পাকিস্থানের এই সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাশক্তি সাহায্য করা হিন্দু-মাত্রেরই কর্তব্য। কারণ, এইগুলি হিন্দুগণকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ রাখিবার উপায়। এই সকল নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে হিন্দুধর্মও নির্জীব হইতেছে।

পাকিস্তানের শিক্ষানীতিকে নানা কারণে হিন্দুগণ তাহাদের অনুকূল বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। এই নীতির অনুসরণে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে অত্যন্ত মুসলমান-প্রভাবিত করা হইতেছে। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং এই ভাষাশিক্ষা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাংলা অক্ষর একেবারে বর্জন করিয়া আরবী অক্ষরে বাংলা শিক্ষাদানের পরিকল্পনা চলিতেছে। এই ব্যবস্থা কেবল হিন্দুদের পক্ষে নয় অধিকন্তু বাঙালী মুসলমানদেরও ভাষাগত জাতীয়তারক্ষার একেবারেই অনুকূল নহে। পক্ষান্তরে এইরূপ শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও 'ইসলাম রাষ্ট্র' (Islamic State) বলিয়া ঘোষিত পাকিস্তানের সকল বিভাগে হিন্দুযুবকগণ সংখ্যানুপাতে সম্মানিত পদ পাইবেন কি না, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত হিন্দুগণ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ। এই সকল কারণে এবং সর্বোপরি আর্থিক দুর্গতির জন্য ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের পাঠশালা এবং স্কুল-কলেজ-সমূহে হিন্দু ছাত্র অত্যন্ত কমিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে অনুপাতে হিন্দু ছাত্র কমিয়াছে সে অনুপাতে হিন্দুরা স্থান ত্যাগ করে নাই। ইহা তাহাদের চরম আর্থিক দুরবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অপর দিকে পাকিস্তানের পাঠশালা ও স্কুল-কলেজসমূহে মুসলমান ছাত্র পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা মুসলমানদের আর্থিক উন্নতি এবং জাতীয় অভ্যুদয়ের পরিচায়ক।

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ হিন্দু এখন অন্ন-বস্ত্র-সমস্যায় এরূপ ভাবে বিব্রত যে, ইহা তাহাদের সমগ্র চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে। শিক্ষানীতি বা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এখন তাহারা প্রায় উদাসীন। পাকিস্তানের সকল বিভাগের প্রায় সকল সরকারী কর্মচারীই মুসলমান হইলেও তাঁহাদের বা মুসলমান জনগণের হিন্দুদের উপর সংঘবদ্ধ কোন অত্যাচারের কাহিনী এখন শুনা যায় না। স্থানে স্থানে হিন্দুগণ ব্যক্তিগত ভাবে উপদ্রুত, অপমানিত ও অসম্মানিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাকে সকলেই গুণ্ডাশ্রেণীর উপদ্রব বলিয়া মনে করে। অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকিলে ব্যক্তিগত সামান্য অপমান-অসম্মানের জন্য কেহ কখনও বাস্তুত্যাগ করে না এবং হিন্দুরাও অবশ্য করিবে না। কিন্তু দীর্ঘকাল অনশন ও অর্ধাশনে থাকিয়া কাহারও পক্ষে ভিটাবাড়ী আঁকড়াইয়া

পড়িয়া থাকা সম্ভব নয় এবং হিন্দুদের পক্ষেও ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাইতেছে যে, অনশনক্লিষ্ট মুসলমানদের পক্ষেও ইহা সম্ভব হইতেছে না। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কিছুকাল যাবৎ পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি জেলায় চালের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৩ সনের ন্যায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অনেক ধনবান এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করায় পল্লীগ্রাম-সমূহে ভিক্ষা না পাইয়া দলে দলে বুভুক্ষু হিন্দু-মুসলমান নর-নারী শহর-বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। দু'মুঠো উদরান্নের জন্য তাহাদের মর্মন্তুদ আর্তনাদে রাজপথ মুখরিত হইতেছে। রেশনের ব্যবস্থা থাকায় ইচ্ছাসত্ত্বেও হৃদয়বান ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই দুর্গত নরনারীগণকে খাদ্যভিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এই সকল কারণে আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কগণকে অনশনপীড়িত হিন্দু ও মুসলমানদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিবার জন্য অতি শীঘ্র উভয় শ্রেণীর মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা, অন্ততঃ যে সকল অঞ্চলে চাল অগ্নিমূল্য সেই সকল অঞ্চলে উহাদের মূল্য হ্রাস এবং রিলিফের ব্যবস্থা করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। দরিদ্রদের বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষা করাও অপরিহার্য। এই ভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান না করিয়া অশন-বসনহীন ব্যক্তিগণকে কেবল বাস্তুত্যাগ না করিবার উপদেশ দান করিলে কোন ফল হইবে না।

উপসংহারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার হিন্দুগণ বারংবার প্রলয়ংকর অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের মধ্যেও অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া আজও বাঁচিয়া আছে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুগণকেও বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান পূর্বক মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই জন্য অবস্থাধীনে তাহাদের পক্ষে পাকিস্তান স্বীকার করিয়া আপনাদের সর্ববিধ ন্যায্য অধিকারসমূহ আইনসঙ্গত উপায়ে সর্বপ্রযত্নে সংরক্ষণের চেষ্টা করা ভিন্ন আপাততঃ অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। এরূপাবস্থায় পাকিস্তানের হিন্দুগণের পক্ষে কোন বিষয়ে ভারতের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে এবং ইহাতে কোন ফলও হইবে না। এজন্য আমরা তাহাদিগকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্না হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার সকল রাষ্ট্রনায়কই সমস্বরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি বিশেষ জোরের সহিতই দিয়াছেন এবং অনেকে এখনও দিতেছেন। এই প্রতিশ্রুতি যাহাতে কার্যতঃ রক্ষিত হয় তজ্জন্য হিন্দুগণকে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেই হইবে। এখন এক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের অন্ন-বস্ত্রের অভাবই সেখানকার গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল হিন্দুকে অস্পৃশ্যতা, অনাচরণীয়তা, সর্ববিধ সামাজিক অধিকারবৈষম্য, ও বর্ণভেদ প্রমুখ মহা অনর্থসমূহ একেবারে ত্যাগ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রসার গীতা ও উপনিষৎ-প্রচারিত গুণ-কর্ম এবং জীবব্রহ্ম ও নরনারায়ণবাদ আশ্রয়ে চূড়ান্ত সাম্য-মৈত্রী-ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পাকিস্তানের হিন্দুগণ কল্পনাতীত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যদি স্বগৃহের বিরোধ-বিদ্বেষ-অনৈক্য দূর করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে

না পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অধিকার রক্ষা করা দূরের কথা আত্মরক্ষা করাও একেবারেই সম্ভব হইবে না। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুগণ শিক্ষা এবং আর্থিক অবস্থায় তথাকার মুসলমানগণ অপেক্ষা উন্নততর এবং তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে। তাহারা যদি স্বগৃহে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আপনাদের ন্যায্য অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য আবশ্যকতানুসারে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তাহারা দেশ-বিদেশের মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেরই সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবে এবং তাহাদের সর্ববিধ ন্যায্য অধিকার নিশ্চয় রক্ষিত হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের বর্তমান দুরবস্থা-প্রতিকারের ইহাই একমাত্র উপায়।

প্রকৃতির রাজ্যে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

হেথায় তোমারে নাই ভোলার উপায়,
হেথায় প্রকৃতি নিত্য তোমায় স্মরায়।
হেথায় তোমার সৃষ্টি
করে যে অমৃত বৃষ্টি।
সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে নাহি অন্তরায়,
আমার আঁখির দৃষ্টি অবাধ হেথায়।

নগরে আমার দৃষ্টি নয়কো অবাধ,
সবই সেথা মানুষেরই কহিছে সংবাদ।
মানুষের সৃষ্টিচয়
তব সৃষ্টি ঢেকে রয়।
যায় না মানুষ ছেড়ে চিত্ত এক পাদ,
মানুষে বিধাতা বলি ঘটে যে প্রমাদ!

হেথায় তোমার সৃষ্টি নগর ভুলায়,
চিত্ত চায় হেথা তাই বাঁধিতে কুলায়।
হেথায় তোমার সৃষ্টি
ফিরায় আমার দৃষ্টি
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে, খুঁজিতে তোমায়।
এখানে ঢাকেনি কেহ তব মহিমায়।

উপনিষদে সাধন-সঙ্কেত

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

বেদ হিন্দুধর্ম্মের আদি ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক শাস্ত্র। ইহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশই বিভিন্ন উপনিষদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মজ্ঞান-লাভই পুরাকালে মনুষ্যমাত্রের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় ছিল এবং এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রিয়াযোগের অভ্যাস ও জ্ঞানযোগানুরূপ বিচার উভয়ই প্রয়োজন। যোগশিখা উপনিষৎ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

'যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীহ ভোঃ।
যোগোঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি।
তস্মাজ্ জ্ঞানং চ যোগং চ মুমুক্ষুর্দৃঢ়মভ্যসেৎ॥'

১।১৩।১৪

তাই মহর্ষি অগস্ত্যও শিষ্য সুতীক্ষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, যেমন পক্ষী উভয় পক্ষের সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যোগাভ্যাস ও জ্ঞানযোগের বিচার উভয়ই প্রয়োজন—

'উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥'

যোগবাশিষ্ঠ, ১।১।৭

উপনিষদের সর্ব্বপ্রকার উপদেশ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তাই আমরা কেবলমাত্র ক্রিয়াযোগের অভ্যাস সম্বন্ধে উপনিষদে যে সকল সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তাহার একটিমাত্র এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

২। উপনিষদে দেখিতে পাই মনের সাধনই একমাত্র সাধন এবং সেই মনকে সুসংযত ও স্থির করিবার জন্য যে অভ্যাস তাহাকেই প্রকৃত অভ্যাস বলা হইয়াছে; কারণ মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিতে পারিলেই উহা ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয় ও তখন জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন লাভ ঘটে—

'তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদি গতং ক্ষয়ম্।
এতদ্ জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ'॥

অমৃতবিন্দু উপঃ, ৫

হৃদয়ে মনোলয় করারই নাম ধ্যান ও জ্ঞান, অন্যান্য উপদেশ বাগাড়ম্বর ও গ্রন্থবিস্তার মাত্র। সর্ব্বোপনিষদের সারমর্ম্ম এই একটিমাত্র শ্লোকে অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মনের লয় হইলে সাধক যে অবস্থা অনুভব করেন তাহার নাম "উন্মনী"। ইহা সমাধির ঠিক পূর্ব্বাবস্থা। উপনিষৎ এই উন্মনী অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥'

অমৃতবিন্দু উপঃ, ৪

শঙ্করাচার্য্যও এই উন্মনী অবস্থার বর্ণনা বিশেষ-ভাবে করিয়াছেন—

'নেত্রে যয়োন্মেষনিমেষশূন্যে
বায়ুর্যয়া বর্জ্জিতরেচপূরঃ।
মনশ্চ সংকল্পবিকল্পশূন্যং
মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্॥'

যোগতারাবলী, ১১

অমৃতবিন্দু উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটির অর্থ অতি সহজ; কিন্তু মুমুক্ষু সাধক কেবলমাত্র বাক্যার্থ, ভাষ্য ও টীকা পড়িয়াই সন্তুষ্ট হন না; তিনি অনুসন্ধান করেন, শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম কি ও কি কার্য্য করিতে হইবে। তাই বিচারশীল সাধকের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে, "হৃদয়" কি ও কোথায় এবং মনকে কি উপায়ে সেই হৃদয়ে নিরোধ করা যায়।

৩। আমরা প্রথমে "হৃদয়" শব্দটী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দেখিতে পাই সমস্ত যোগ-শাস্ত্রে ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাদিতে, বিশেষতঃ উপনিষদে, "হৃদয়" শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে—

(ক) 'বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্য মধ্যে বিশ্বং দেবং
জাতরূপং বরেণ্যম্।
তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তির্ভবতি নেতরেষাম্॥'
অথর্ব্বশির উপঃ, ৫

(খ) 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং
হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'
কঠ উপঃ, ৩।১৭

(গ) 'হৃদি হ্যেষ আত্মা।' প্রশ্ন উপঃ, ৩।৬

(ঘ) 'হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি।' ব্রহ্ম উপঃ, ২১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, তিনি সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন—

(ক) 'সর্ব্বস্য চাহম্ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' ১৫।১৫

(খ) 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥'
১৮।৬১

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, ধ্রুব যোগস্থ হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে হৃদয়েই অনুভব করিয়াছিলেন—

'হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্॥' ৪।৯।২

মহাভারতে দেখি, সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মহাত্মা, ন দৃশ্যতেঽসৌ হৃদি
সন্নিবিষ্টঃ।' উদ্যোগ, ৪৬।২৭

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতেও "হৃদয়" শব্দের প্রয়োগ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই "হৃদয়" শরীরের কোন্ অংশে অবস্থিত।

৪। আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য বিদ্যায় সমুন্নত কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত "হৃদয়"কে "Heart" শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্তিজনক ও হাস্যজনক ভাষান্তর আর হইতেই পারে না। "Heart" শব্দের অর্থ হৃৎপিণ্ড। শাস্ত্রে দেখি—

'হৃদয়ং মনসঃ স্থানম্।' শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৬।১১

'যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ।' ঐতরেয় উপঃ, ৩।১।২

অতএব মনের উৎপত্তি ও লয়ের স্থানই হৃদয়। মনকে এই হৃদয়ে নিরোধ করিতে পারিলে উহা স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। "Heart" অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদা স্পন্দনশীল; তাহার আশ্রয়ে মন কি কখনও নিস্পন্দ হইতে পারে? যোগবাশিষ্ঠ স্পষ্টই বলিয়াছেন, বক্ষস্থলের বামদিকে যে মাংসপিণ্ড (হৃৎপিণ্ড) উহা হেয়; উহাকে প্রকৃত হৃদয় বলা যায় না—

'ইয়ত্তয়া পরিচ্ছিন্নে দেহে যদ্ বক্ষসোঽন্তরম্।
হেয়ম্ তদ্ধৃদয়ং বিদ্ধি তদেবৈকতটে স্থিতম্'॥
৫।৭৮।৩৪

'কপিলগীতাতে' দেখি গ্রন্থকার দুই চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী অংশে হৃদয়ের স্থান নির্দ্দেশ করার পর বলিতেছেন, যিনি অন্যত্র হৃদয়ের স্থান নির্দ্দেশ করেন, তিনি স্থূলবুদ্ধি—

'তদেব হৃদয়ং নাম চক্ষুরগ্রে সুশোভিতম্।
অন্যথা হৃদি কিঞ্চাস্তি প্রোক্তং যৎ স্থূলবুদ্ধিভিঃ॥'

উপরে যে কয়টী মাত্র উক্তির উল্লেখ করিলাম ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, "হৃদয়" শব্দের প্রকৃত অর্থ হৃৎপিণ্ড নহে।

৫। এক্ষণে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে "হৃদয়" কোথায়? একটু সূক্ষ্ম-ভাবে উপনিষদাদি আলোচনা করিলে হৃদয়-স্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রহ্ম উপনিষৎ স্পষ্টই বলেন, হৃদয় পদ্মকোষের ন্যায়, সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট ও নিম্নমুখী; ইহারই অপর নাম "বিশ্বাস্যায়তনং মহৎ"—

'পদ্মকোষপ্রতীকাশং শুষিরং চাপ্যধোমুখম্।
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥'

ব্রহ্ম উপঃ, ৪০

আবার নাদবিন্দু উপনিষৎ এই "বিশ্বস্যায়তনং মহৎ" এর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ললাটপ্রদেশে, দুই ভ্রূ ও নাসিকার অন্তর্বর্তী স্থানই "বিশ্বস্যায়তনং মহৎ" এবং উহারই অপর নাম "অমৃত-স্থান"—

'ভ্রুবোর্মধ্যে ললাটস্তু নাসিকায়াং তু মূলতঃ।
অমৃতস্থানং বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥'

ধ্যানবিন্দু উপঃ, ২।২১

উপরের উক্তি দুইটি বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভ্রূ-যুগলের মধ্যগত ললাটদেশই "হৃদয়" এবং উহাই "অমৃতস্থান," উহাই "বিশ্বস্যায়তনং মহৎ"। এই হৃদয়ের অপর অনেক-গুলি নাম আছে—দ্বিদল, আজ্ঞাচক্র, বারাণসী, কাশী, অবিমুক্ত, গহ্বর, ত্রিবেণী, গুহা, পুষ্কর, সত্যলোক, গুরুস্থান, শিবস্থান, আকাশ, নাসাগ্র, নাসামূল, বৃন্দাবন প্রভৃতি। এই নামগুলি সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপনিষদ্-বিষয়ক বলিয়া উপনিষদেরই কয়েকটি মাত্র শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) 'আজ্ঞা নাম ভ্রুবোর্ম্মধ্যে দ্বিদলম্
চক্রমুত্তমম্।'

যোগশিখা উপঃ, ১।১৭৫

(খ) 'বারাণসী মহাপ্রাজ্ঞঃ ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য মধ্যমে॥

জাবালদর্শন উপঃ, ৪।৪৮

(গ) 'ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য সা সন্ধিঃ স এষ…
সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ।'

জাবাল উপঃ, ২।২
রামোত্তরতাপনীয় উপঃ, ২১

(ঘ) 'সন্ত্যজ্য হৃদ্‌গুহেশানং দেবমন্যং
প্রযান্তি যে।
তে রত্নমভিবাঞ্ছন্তি ত্যক্তহস্তস্থ-
কৌস্তুভাঃ॥'

মহা উপঃ, ৬।২০

৬। এক্ষণে শেষ প্রশ্ন—কি উপায়ে মনকে হৃদয়ে স্থির করা যায়। যে ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা মনকে সমাহিত করা যায়; তাহা লয়-যোগেরই অন্তর্গত। ইহার একটি নাম "হংস-যোগ"। হংসমন্ত্র অবলম্বনে এই যোগ অভ্যাস করিতে হয় বলিয়া, ইহার নাম হংসযোগ। আকর্ষণাত্মক হং ও বিক্ষেপণাত্মক সঃ শব্দ-যোগে অভ্যাস করিতে হয় বলিয়াই এই মন্ত্রের নাম "হংস"। এই হংস-মন্ত্রের অপর কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ নামও আছে।—"অজপামন্ত্র", "অজপা-গায়ত্রী", "মূলমন্ত্র", "ব্রহ্মমন্ত্র", "আত্মমন্ত্র", "প্রাণমন্ত্র", "শিবশক্তিমন্ত্র", "অনাহতমন্ত্র" প্রভৃতি। এই মন্ত্র জপ করিতে হয় না বলিয়া ইহার নাম "অজপা"—

'ভাবনস্যস্য মন্ত্রস্য জপমাত্রং ন বিদ্যতে।
অজপা তেন বিখ্যাতা শিবশক্তিসমন্বিতা॥'

ভূতশুদ্ধি-তন্ত্র।

ইহা সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের মূলস্বরূপ ও মূলাধার হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "মূলমন্ত্র"—

'মূলত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রাণাং মূলাধারসমুদ্ভবাৎ।
মূলস্বরূপলিঙ্গত্বান্মূলমন্ত্র ইতি স্মৃতঃ॥'

যোগশিখা উপঃ, ২।৯

এই মন্ত্রের সাধন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও ইহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর বলিয়া ইহার নাম আত্মমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র। ঊর্দ্ধগ শ্বাস ও নিম্নগ প্রশ্বাসযোগে এই মন্ত্র সাধন করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাণমন্ত্র—

'উচ্ছ্বাসে চৈব নিঃশ্বাসে হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
তস্মাৎ প্রাণস্থ হংসাত্মা আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ ॥'

প্রাণতোষিণী তন্ত্র।

উপনিষৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এই হংসযোগ বা হংসবিদ্যা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতর যোগ পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হইবে না—

'অনয়া সদৃশী বিদ্যা অনয়া সদৃশো জপঃ।
অনয়া সদৃশং জ্ঞানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥'

যোগচূড়ামণি উপনিষৎ, ৩৫

সূতসংহিতায় দেখি, এই হংস-বিদ্যা না জানিয়া যিনি অন্য উপায় অবলম্বনে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হয়—

'হংসবিদ্যামবিজ্ঞায় মুক্তৌ যত্নং করোতি যঃ।
স নভোভক্ষণেনৈব ক্ষুন্নিবৃত্তিং করিষ্যতি ॥'

৭।৭।২৭

৭। হংসযোগ ও প্রণবসাধন একই কথা। কারণ হংসমন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে যখন "হ" ও "স" উভয় ব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দই আর ধ্বনিত হয় না, তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম প্রণব বা ওঁ-কার। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে দেখিতে পাই—

'স-কারঞ্চ হ-কারঞ্চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।
সন্ধিং বৈ পূর্ব্বরূপাখ্যং ততোঽসৌ প্রণবো ভবেৎ ॥' ৪।২৭

এই জন্যই উপনিষৎ হংস ও প্রণবকে অভিন্ন বলিয়াছেন—

(ক) 'হংস-প্রণবয়োরভেদঃ।' পাশুপৎব্রহ্ম উপনিষৎ।

(খ) 'হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ এক হংসঃ।' বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। ৪।৩।১১

(গ) 'হংসো নাদে লীনো ভবতি।' হংস উপঃ, ৮

৮। ঋষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান-যুগ পর্য্যন্ত এই হংস-যোগ ধারাবাহিক ভাবে শিষ্যানুশিষ্যক্রমে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে ভারতে এই সাধনার বিশেষ বিস্তৃতি ও প্রচার ছিল এবং অনেক মহাপুরুষ এই সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নানক, দাদু, কবীর, য়ারীসাহেব, বুল্লাসাহেব, দরিয়াসাহেব (বিহারী ও মাড়োয়ারী) প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান বহু সাধক এই যোগে সিদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অমর বাণীই এখনও তাঁহাদিগের সাধনধারার সাক্ষ্য দিতেছে। হংস-যোগ সাধনের গুহ্য সঙ্কেতও উপনিষদে আছে, কিন্তু তাহা গুরুগম্য ও তাহার ফল দীর্ঘ ও দৃঢ় সাধনসাপেক্ষ। এই বিষয়ক কয়েকটিমাত্র শ্লোক ও বাণী নিম্নে দিলাম—

(১) 'স-কারেণ বহির্যাতি হ-কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥'

যোগশিখা উপনিষৎ। ২।২১
যোগচূড়ামণি উপনিষৎ, ৩২

(২) 'এবমেনং সমারূঢ়ো হংস-যোগবিচক্ষণঃ।
ন বধ্যতে কর্ম্মচারী পাপকোটিশতৈরপি ॥'

নাদবিন্দু উপঃ, ৫

(৩) 'হংস-হংসেতি সদাঽয়ং সর্ব্বেষু দেহেষু ব্যাপ্তো বর্ত্ততে।'

হংস উপঃ, ৪

(৪) 'প্রণবো হংসঃ।' পরব্রহ্ম উপঃ, ১

(৫) 'ব্রহ্মস্বরূপো হংসঃ।' পশুপত ব্রহ্ম উপঃ, ১

(৬) 'হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসব্যপদেশেনানুসন্ধানং করোতি।'

নারদপরিব্রাজক উপঃ, ৬।৪

(৭) 'অজপ জপত রহু নিশ দিন।' জগজীবন সাহেব।

(৮) 'কবীর অজপা সুমিরণ হোৎ হ্যায় শূন্য-মণ্ডল অবস্থান'। কবীর।

(৯) (ক) 'দাদূ হংস রহৈ সুখ সাগর'। দাদূ।

(খ) 'সহজ সরোবর আত্মা, হংস করে কল্লোল'। দাদূ

(গ) 'অজপা জপ'। দাদূ।

(ঘ) 'পর আতম, সোঁ আত্মা জ্যুঁ হংস সরোবর মাহিঁ'। দাদূ।

(১০) 'শ্বাস শ্বাস প্রভ তুমহি ধিয়াবউ'। নানক।

(১১) 'চল মন আগম কে দেস,
কাল দেখত ডরে।
রহ ভরা প্রেমকা হৌজ
হংস কেলি করে॥'
মীরাবাঈ।

(১২) 'অজপা জাপ কে মন সমুঝায়।'
দরিয়া সাহেব (বিহারী)

(১৩) 'মানস সরোবর বিমল নীর
জহঁ হংস সমাগম তীর তীর॥'
দরিয়া সাহেব (মাড়োয়ারী)

(১৪) 'অজপা জাপহিঁ জাপ সোঽহং ডরি লগাঈ'। বুল্লাসাহেব।

(১৫) 'মূলমন্ত্র নহিঁ জানহী দুখিয়া ভৈ রোঈ॥'
গুলালসাহেব।

(১৬) 'জপত হৈ অজপা মালা'। পল্টুসাহেব।

পরবর্ত্তী কালের শক্তিসাধক রামপ্রসাদও যে এই সাধন-প্রভাবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতেই পাওয়া যায়—

(ক) 'হং বর্ণপূরকে হয় সঃ বর্ণ রেচকে বয়
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে।'

(খ) 'কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে
করে রমণ।'

বর্ত্তমান যুগেও দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু তোতাপুরী প্রদত্ত হংস-যোগ সাধন করিয়াই পরমহংসত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাসের পদেও এই সাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

(ক) 'মূলচক্র হয় হংস-যোগের আশ্রয়।'

(খ) 'অজপা নামেতে তারা কুম্ভকরেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥'

৯। হংস-যোগ সহজ-সাধন নামেও উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে। সহজ (সহ—জন+ড) শব্দের অর্থ, যাহা দেহের সঙ্গেই জন্মিয়াছে। হংসমন্ত্রকে অজপা, আত্মমন্ত্র ও প্রাণ-মন্ত্র নামে আখ্যায়িত করার ইহাই বিশেষত্ব এবং সদ্গুরুপ্রদত্ত এই মন্ত্রসাহায্যেই সহজ অবস্থা লাভ হইতে পারে বলিয়া উপনিষৎ ঘোষণা করিয়াছেন—

'দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা॥'
বরাহ উপঃ ২।৭৬
মহা উপঃ, ৪।৭৭

এই হংসযোগই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহজ সাধন—

'সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥'
চণ্ডীদাস

উপরের উক্তিগুলিই লক্ষ্য করিলে পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সাধন কোন কালেই জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না, কারণ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত ইহাই মনুষ্যমাত্রেরই সহজ বা স্বাভাবিক সাধন।

১০। এই হংস-যোগ অভ্যাসকালে সাধক দশবিধ অনাহত নাদ শ্রবণ করেন—

"হংসবশান্নাদো দশবিধো জায়তে—চিনীতি

প্রথমঃ, চিঞ্চিনীতি দ্বিতীয়ঃ, ঘণ্টানাদস্তৃতীয়ঃ, শঙ্খনাদশ্চতুর্থঃ, পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ, ষষ্ঠস্তালনাদঃ, সপ্তমো বেণুনাদঃ, অষ্টমো মৃদঙ্গনাদঃ, নবমো ভেরীনাদঃ, দশমো মেঘনাদঃ।”

হংস উপনিষৎ, ৯

অভ্যাসকালে অপর কতকগুলি রূপের অভিব্যক্তিও অনুভূত হয়—

(ক) ‘আত্মমন্ত্রসদাভ্যাসাৎ পরতত্ত্বং প্রকাশতে
তদভিব্যক্তি-চিহ্নানি সিদ্ধিদ্বারাণি মে শৃণু ॥
দীপজ্বালেন্দুখদ্যোতবিদ্যুন্নক্ষত্রভাস্বরাঃ।
দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেণ সদাযুক্তস্য যোগিনঃ ॥’

যোগশিখা উপঃ, ২।১৮।১৯

(খ) ‘নীহারধূমার্কানলানিলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎ-
স্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তি-
করাণি যোগে ॥’

শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ২।১১
যোগশিখা উপঃ, ২।৮
যোগচূড়ামণি উপঃ, ৩২

১১। হংসযোগ সাধন করিতে করিতে এই প্রকারের নানাবিধ রূপ ও নাদের অভিব্যক্তি হইলেও সাধকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল অভিব্যক্তি অগ্রগতির চিহ্নমাত্র, সাধনের চরম ফল নহে; অর্থাৎ এইরূপ নানাবিধ অভিব্যক্তি হইলেও বুঝিতে হইবে সাধক ঠিক পথে অগ্রসর হইতেছেন মাত্র। রূপ ও শব্দের মধ্যে শব্দই সূক্ষ্মতর, তাই সাধকের তখন রূপকে উপেক্ষা করিয়া শব্দে অর্থাৎ প্রণবে তন্ময় হইবার চেষ্টা করা উচিত। সমগ্র প্রণবও (অ+উ+ম্) সূক্ষ্মতম অবস্থা নয়; প্রণবধ্বনি ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে যখন প্রায় নিঃশব্দ অবস্থায় পরিণত হয় তখনই দেহস্থ আত্মা বা চৈতন্যের অনুভূতি জন্মে। এইজন্য উপনিষৎ প্রণবের অগ্রভাগ অর্থাৎ শেষ-রেশটুকুকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন তাহা বাক্যজ শব্দ নহে, অর্থাৎ উহা “অক্রতনাদ”, অন্তস্থ “ভ্রামরীনাদ”—

(ক) ‘তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ
অবাগ্‌জং প্রণবস্যাগ্রং যস্তং
বেদ স বেদবিৎ ॥’

ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ, ২।১৬

(খ) ‘তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।
প্রণবস্য ধ্বনিস্তদ্বৎ তদগ্রং ব্রহ্ম উচ্যতে ॥’

যোগচূড়ামণি উপঃ, ৮০

প্রণবের এই লীয়মান শব্দটুকু নিঃশব্দ হইলেই ব্রহ্মানুভূতি জন্মে—

(ক) ‘সুশব্দং চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং
পরমং পদম্ ॥’

ধ্যানবিন্দু উপঃ, ২

(খ) ‘যস্মিন্ সংলীয়তে শব্দস্তৎ
পরং ব্রহ্ম গীয়তে ॥’

ব্রহ্মবিদ্যা উপঃ, ১২।১৩

এই অবস্থাকেই “ব্যোমাতীত”, “শব্দাতীত” প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিশেষণীভূত করা হইয়াছে। হংস-যোগের অথবা সর্ব্বপ্রকার সাধনার ইহাই সাধ্য ও চরম লক্ষ্য। এই অবস্থা সম্বন্ধে তন্ত্রেও ঠিক এই ভাবের উক্তি দেখিতে পাই। —

‘নিঃশব্দং ব্রহ্মশব্দিতম্—’ প্রাণতোষিণী তন্ত্র।

দেবদেব মহাদেবও বলিয়াছেন—

“নিঃশব্দস্তং বিজানীয়াৎ স ভাবো ব্রহ্ম পার্ব্বতি।”

পর্য্যায়ক্রমে সাধনার এই ধারা অনুসরণ করিতে করিতে সাধক আপন সত্তাকে কেবলমাত্র শব্দস্বরূপ বোধ করেন। এই চরম অবস্থায় উন্নীত হইয়াই, পরমজ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষ পরমাত্মার অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া, উপনিষদের ঋষি গাহিয়াছিলেন—

‘বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতেঽয়নায় ॥'
শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৩।৮

১২। বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইলেই আচার্য্যের প্রয়োজন। তাই এই হংস-যোগ অভ্যাস করিতে হইলেও আত্মজ্ঞানী কৌশলজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উপনিষৎ তাই তারস্বরে জ্ঞানী গুরুর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করিয়াছেন—

(ক) 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥'
মুণ্ডক উপঃ, ১।২।১২

(খ) 'তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥'
মুণ্ডক উপঃ, ৩।১।১০

(গ) 'তদা সদ্গুরুমাশ্রিত্য ......।'
পৈঙ্গল উপঃ, ২

কিন্তু যদি গুরু স্বয়ংই অজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা শিষ্যের কোনও উপকার হওয়া সম্ভব নহে, পরন্তু অপকারই সম্ভব। তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, এবম্বিধ গুরুর সাহায্যে অন্ধকর্তৃক পরিচালিত অন্ধের দশাই পাইতে হয়—

'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।'
কঠ উপঃ, ১।২।৫
মুণ্ডক উপঃ, ১।২।৮

পরমজ্ঞানী মহাপুরুষ কবীরও বলিয়াছেন—

(ক) 'অন্ধেকে অন্ধ মিলা, পথ-বতারে কোন্?'

(খ) 'কবীর জাকো গুরু হৈ অঁধেরা, চলা
খড়া নিবন্ধ।
অন্ধে অন্ধে ঠেলিয়া দুনো কুঁয়া পড়ন্ত ॥'

মহাভারতেও দেখি—

'মাবুধাস্তারয়ন্ত্যন্যানাত্মানং বা কথঞ্চন।'
শান্তিপর্ব্ব, ২৩৫।২

এইজন্য মুমুক্ষু সাধকমাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে আত্মজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—

'শ্রদ্ধালুর্মুক্তিমার্গেষু বেদান্তজ্ঞানলিপ্সয়া।
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রহ্মবিদং ব্রজেৎ ॥'
নারদপরিব্রাজক উপঃ, ৬।১৭

আত্মজ্ঞানী গুরুর সাহায্যেই দেহস্থ আত্মার সাক্ষাৎকার সম্ভব। উপনিষৎ স্বয়ংই প্রশ্ন করিয়াছেন, "কঃ উপাস্যঃ?"—কে উপাস্য? ও উত্তরে বলিয়াছেন, একমাত্র গুরুই উপাস্য—

'সর্ব্বশরীরস্থচৈতন্যব্রহ্মপ্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ ॥'
নিরালম্ব উপঃ, ২১

স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন এবং তাঁহার 'মণিরত্নমালা'য় বলিয়াছেন—

"কে কে হ্যুপাস্যাঃ?
গুরুদেববৃদ্ধাঃ।" ২৩

সর্ব্ব উপনিষদের সার গীতাও আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা সম্বন্ধে নীরব নহেন—

(ক) 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-
দর্শিনঃ ॥' ৪।৩৪

(খ) আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম-
বিনিগ্রহঃ।' ১৩৮

একমাত্র সদ্গুরুই যোগশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা শিষ্যকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম। তাই দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন—

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥'

সাবানের অনুকল্প

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর, বি-এস্‌সি

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে সাবান এক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু দেখা যায়, সাবান সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না—বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং বিজ্ঞানী, বিশেষ রসায়নজ্ঞ, চেষ্টা করিতে লাগিলেন এমন কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কারের—যেগুলির পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা সাবানের মত অথবা স্থলবিশেষে তদধিক; অথচ সাবান যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না, সেই সকল স্থলে এইগুলি নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যের সাধারণ নাম "সাবানের অনুকল্প"। ইংরেজীতে ইহাদের বলা হয় Soapless Soap, Synthetic Detergent অথবা Soap Substitutes.

সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাবানের অনুকল্প-সমূহের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাবানের অভাব পূরণের জন্যই এই গৌণদ্রব্যসমূহের অবতারণা করা হয়। মুখ্যতঃ ইহাদের প্রবর্ত্তন করা হয় সাবান ব্যবহারের অসুবিধা নিবারণকল্পে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্তরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি গড়িয়া উঠিতে থাকে। অনেকটা সংস্কৃত প্রবাদ 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' (অর্থাৎ মধু অভাবে গুড় দিবে) এই সার্থকতা লইয়া তখন অনুকল্পসমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে। কৃত্রিম রবার ব্যতীত বোধ হয় আর কোন রাসায়নিক দ্রব্য এত শীঘ্র ইহাদের ন্যায় বাজারে প্রচলিত হইতে ও প্রসারলাভ করিতে দেখা যায় না। আর সম্ভবতঃ ইহাদের ন্যায় অপর কোন রাসায়নিক দ্রব্যই জীবনযাত্রার উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় নাই।

প্রথম প্রথম এই অনুকল্পগুলি রঞ্জনশিল্পে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সূতা বা কাপড় রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়—যেন জিনিষটী সম্পূর্ণরূপে ধূলাবালি, কালিঝুলি-মুক্ত হয়। সাবান ব্যবহার করিয়া যখন জিনিষটী কূপ, ইঁদারা, নদী অথবা পুষ্করিণীর স্বভাবজাত জলে ধৌত করা হয় তখন সাবান হইতে ফেনা বাহির হওয়া দূরে থাকুক—অযথা সাবান ক্ষয় হইয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া ধৌত করিবার আধারের তলদেশে জমিতে থাকে। এই গুঁড়াগুলি কাপড় বা সূতার উপর জমিয়া জল-দুর্ভেদ্য প্রলেপ বা আস্তরণের সৃষ্টি করে। প্রকৃতিদত্ত অধিকাংশ জলই খর—ইহাতে চূণ-জাতীয় উপাদান দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তাহা হইতেই সাবানের গুঁড়াগুলির উদ্ভব। সূতা বা কাপড় এই ভাবে ধৌত হইবার পর দ্রবীভূত রঞ্জক পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে দেখা যায় সূতা বা কাপড়ের সকল অংশ সমান-ভাবে রঞ্জিত হয় নাই—কোথাও রং বেশী ধরিয়াছে আবার বিপরীতক্রমে কোন কোন অংশের রং ধরে নাই বলিলেই চলে। এইরূপ

সামঞ্জস্যহীন-ভাবে রঞ্জিত কাপড় কাহারও অভিপ্রেত নহে। প্রয়োজন বোধ করা গেল এমন একটি দ্রব্যের যাহা সাবানের ন্যায় পরিষ্কারক শক্তিযুক্ত হইবে, কিন্তু সূতা বা কাপড়ের উপর কোন আস্তরণের সৃষ্টি করিবে না। কারণ এই আস্তরণই রঞ্জনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা হইতে বাধা দেয়।

অনুকল্পসমূহ সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় না—তাহারা জলদুর্ভেদ্য আস্তরণের সৃষ্টি করে না, ফলে রঞ্জনকার্য্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

ক্রমে ইহাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইয়াছে এবং হইতেছে। আধুনিক যুগে প্রত্যেকটি বড় শিল্পে ইহাদের ব্যবহার অপরিহার্য্য।

শোধন ও পরিষ্কার করিবার শক্তি ইহাদের অদ্ভুত। আরও অত্যদ্ভুত ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মসমূহ। কোনটি রোগজীবাণুধ্বংসী কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নির্ভয়ে খাদ্যদ্রব্যাদি শোধনের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন কোনটি এত বেশী কার্য্যকরী যে সামান্য মাত্রায় সুপ্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ পরিষ্কার করিতে পারে, অথচ তাহাদের প্রভাব এত মৃদু যে শিশুদের স্নানের জলে নিশ্চিন্ত-চিত্তে মিশ্রিত হইতে পারে। আবার কোনটি উত্তম পরিষ্কারক অথচ কোন ফেনার সৃষ্টি হয় না।

তিনটি প্রধান ভূমিকায় এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়—রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে ও শিল্পে, গৃহস্থজীবনে ও কৃষিকর্ম্মে। রাসায়নিক পরিবর্ত্তন অধিকাংশ স্থলেই সংঘটিত হয় কঠিন পদার্থের সহিত তরল বা দ্রবীভূত পদার্থের সংযোগে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দ্রুততর, প্রকৃষ্ট ও কার্য্যকর করিতে হইলে পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ তুলাজাত বা পশমী সূতা রং করার প্রক্রিয়াটী লওয়া যাইতে পারে। দ্রবীভূত রং যখন সূতাগুচ্ছকে উত্তমরূপে ভিজাইতে সমর্থ হয় তখনই রাঙ্গান ভাল হয়—নচেৎ রঞ্জিত জিনিষের ভিতর অনেক দোষ রহিয়া যায়। দ্রবীভূত রং এর মধ্যে সাবানের অনুকল্প-সমূহ ব্যবহৃত হইলে সূতাগুচ্ছ দ্রুত উত্তমরূপে রঞ্জিত হয়—কারণ দ্রবীভূত রংটি সূতাগুচ্ছের চতুর্দ্দিক সমানভাবে ভিজাইয়া ফেলে, রঞ্জনকার্য্যে যথেষ্ট সহায়ক হয় এবং পরিশেষে যদি কোন ধূলাবালি সূতাগুচ্ছের উপর আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে সেগুলিকে দ্রবীভূত করিতে সাহায্য করে।

পরীক্ষাগারে এবং বিবিধ শ্রেণীর শিল্পে রাসায়নিক যন্ত্রপাতিসমূহ পরিষ্কারের জন্য এই রাসায়নিকগুলি অতি প্রয়োজনীয়। 'আমেরিকার রসায়ন সমিতির' সম্প্রতি এক বিবরণে এক অভিনব শ্রেণীর সাবানের অনুকল্পের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি জীবাণুনাশক হইলেও ধূলাবালি ময়লা প্রভৃতি পরিষ্কার করে। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি ও গৃহস্থের ঘটিবাটী উভয় শ্রেণীর জিনিষপত্রাদি শোধন ও পরিষ্কারের জন্য ইহারা সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাদের রসায়নগত নাম মর্‌ফোলিয়ম্ এল্‌কিল্ সাল্‌ফেটস্। এই প্রসঙ্গে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

সাবানের অনুকল্পসমূহ অধিকাংশই তরল বা গুঁড়া হিসাবে বিক্রীত হয়। সম্প্রতি এক ইংরেজ প্রস্তুতিকারক প্রতিষ্ঠান থান ইষ্টকাকারের এক অনুকল্প বাহির করিয়াছে। মামুলী সাবানের ইষ্টকের ন্যায় আকার হওয়ায় ইহা সহজেই ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ইহা ছাড়া এই ধরনের জিনিষের আরও কয়েকটি সুবিধা আছে—প্রথমতঃ আজকালকার দিনে কোন আধারে (যেমন বোতল বা কাগজের মোড়ক প্রভৃতি) প্রয়োজন না হওয়ায় অনেকটা বাড়তি খরচের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারের সময় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে নষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ জলীয় বা গুঁড়ার আকারের জিনিষ অপেক্ষা এই শ্রেণীর কঠিন দ্রব্য স্বল্পায়াসে সংরক্ষণ করিয়া রাখা যায় এবং যানবাহনাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সরবরাহ করা সহজসাধ্য হয়।

বিজ্ঞানক্ষেত্রে উন্নতদেশগুলিতে সাবানের অনুকল্পসমূহ আধুনিক সভ্যতার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। কয়েকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাধারণের ভোজনাগারে, জলযোগের স্থানে, অন্নসত্রে, কাচের থালা, গেলাস, কাপ, অন্যান্য পানপাত্র ও তৈজসাদি অধিকাংশ স্থলেই সাবান দিয়া ধুইবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ সাবানের সহিত যত অল্পমাত্রায় জল ব্যবহার করা যায় তত বেশী সংখ্যক বাসনাদি পরিষ্কার করা সম্ভব হইবে। সাবানের অনুকল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মের পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুকল্পের সহিত যত অধিক পরিমাণে জল ব্যবহৃত হয় তত বেশী সংখ্যক তৈজসাদি পরিষ্কার করা যাইবে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, অনেকখানি সাবান সামান্য জলের সহিত যে পরিষ্কার কার্য্য সাধন করিবে, সামান্য পরিমাণ সাবানের অনুকল্প অনেকটা জলের সহিত সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করিবে সুষ্ঠু ভাবে।

কানাডা প্রভৃতি দেশে সাবানের অনুকল্প রাজপথ পরিষ্কারের জন্য লাভজনকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটী কেরোসিন হইতে প্রস্তুত। নাম Nacconal NR. রাসায়নিক দ্রব্যটী জলে দ্রব হয়। ৩০০০ হাজার ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগ পরিমাণ এই রাসায়নিক দ্রব্য সুপ্রশস্ত এক মাইল পথ পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। পিচকারির সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে এই দ্রবীভূত পদার্থ রাস্তার উপর বিক্ষিপ্ত করা হয়। এই পিচকারির মুখের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০-৬০ পাউণ্ড। সাবান বা সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে পরিষ্কারে যে ফল পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম ফললাভ করা যায় এই অনুকল্প-ব্যবহারে। পথিপার্শ্বে জল নিকাশের খানাগুলিতে অনুকল্পমিশ্রিত জল প্রচুর ফেনা ও বুদ্বুদ সহকারে জমা হয়। আর এই ফেনার সঙ্গে রাস্তার যাবতীয় ধূলাবালি ময়লা প্রভৃতি চলিয়া আসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই ফেনার চতুর্দ্দিক খেলা করিতে ভালবাসে। লক্ষণীয় বিষয় এই এত শক্তিশালী এই রাসায়নিকটি যে সামান্য মাত্রায় প্রয়োগে বহুদূরব্যাপী পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়, তথাপি ইহা এত মৃদু যে কোমল ত্বকের উপরও কোন তীক্ষ্ণ প্রভাব বিস্তার করে না। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সাবান ব্যবহারে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম খরচায় এই রাসায়নিক সাহায্যে রাস্তা পরিষ্কার করা যায়। রাস্তা ধুইবার পর ভিজা ও ফেনাময় থাকিলেও যানবাহনাদির চাকা পিছলাইয়া যায় না, উপরন্তু রাস্তার সহিত দৃঢ় ভাবে আটকাইয়া থাকিবে।

কিছুকাল পূর্ব্বেও রন্ধনশালা পরিষ্কার করা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার ছিল। সেইজন্য রান্নাঘরের দেওয়াল, ষ্টোভ্, শৈত্য

প্রয়োগ দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণের আধারাদি ঘোর কাল রংএর করা হইত—যাহাতে ধূলাবালি, ঝুলকালি দেখা না যায়। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই—এখন রন্ধনশালা ইচ্ছামতরূপে পরিষ্কার করা যায়—তাহাও স্বল্পায়াসে। সাবানের অনুকল্পের জন্য পরিষ্কারকার্য্য এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

স্নানেও ইহারা ব্যবহৃত হইতেছে। স্নানের সময় চৌবাচ্চার মধ্যে প্রায় এক চামচ পরিমিত এই রাসায়নিক দ্রব্য দেওয়া হইলে চৌবাচ্চার জলে প্রচুর ফেনা হয়। স্নানের শেষে দেখা যায় চৌবাচ্চার তলদেশে অনেক ময়লা জমিয়াছে। চৌবাচ্চা থেকে এগুলিকে বাহির করাও সহজ। কোন রগড়ান বা ঘসামাজার প্রয়োজন হয় না। চৌবাচ্চা খালি করার নল খুলিয়া দিলে জলের সঙ্গে সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া যায়। সবচেয়ে মজার জিনিষ এই যে, যে সব নর্দ্দমা বা নালীর মধ্য দিয়া এই সকল রাসায়নিক যায় তাহাদের ভিতর কোন দিন পাঁক বা আবর্জ্জনা জমিয়া বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

পশমী জামাকাপড়, কম্বল, শাল আলোয়ান ধৌত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হইয়াছে সাবানের অনুকল্প আবিষ্কারের ফলে। সাবান দিয়া পরিষ্কার করিলে এই সকল জিনিষ কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক চাকচিক্য অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকন্তু, সাবান জলের ভিতর অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিবার পর ধৌত করিলে তবে কিছু মাত্রায় পশমী জিনিষপত্রাদি পরিষ্কৃত হয়। অল্প সময়ের ভিতর সাবানের অনুকল্প তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ময়লা দূর করে এবং পশমজাত জিনিষের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখে। জিনিষটী পরিষ্কৃত হইয়া গেলে পর সামান্য মাত্রায় যে অনুকল্প উদ্বৃত্ত থাকে তাহা জল দিয়া ধুইবার প্রয়োজন হয় না। এই সামান্য মাত্রায় অবশিষ্ট অংশ পশমী জিনিষকে উই, রূপালি পোকা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। ধৌতকালে ও পরিষ্কার করিবার সময় কোন রোগজীবাণু থাকিলে সেগুলিও এই রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের সংস্পর্শে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

সাবানের অনুকল্পসমূহের আর একটি ধর্ম্ম এই যে তাহাদের ভিতর অধিকাংশই দুর্গন্ধ-নাশক। পিঁয়াজ কাটিবার পর অত্যল্প মাত্রায় এই জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যসাহায্যে হাত ধুইয়া ফেলিলে আর কোনরূপ গন্ধ থাকে না। অনুরূপ ব্যবহারের আরও যথেষ্ট উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

বাজারের তরিতরকারী, ফলমূল এমন কি শাকসব্জি আহারের বা রন্ধনের পূর্ব্বে ভালরূপে ধুইয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এ গুলির সহিত জড়িত ধুলা, বালি, মাটি ইত্যাদি শীঘ্র নির্ম্মূল করিতে এই রাসায়নিকগুলি অত্যন্ত কার্য্যকর। আর যে সমস্ত আহার্য্য ইহাদের দ্বারা পরিস্কৃত হইয়াছে তাহাদের স্বাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকাশ। পরিশেষে এই ধুলাবালি জলনালী দ্বারা সহজে চলিয়া যাইবে। কোন দিনের জন্য জমিয়া থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আহার্য্য সাবান দ্বারা পরিষ্কার করা যায় কি না। সাবান সাহায্যে সকল আহার্য্য ধৌত করা যায় না—সাবানের প্রতিক্রিয়ার ফলে ফলমূল ইত্যাদির ধর্ম্ম ও গুণাগুণ নষ্ট হয়।

প্রায় সকল অনুকল্পই ক্ষার বা অম্লাত্মক ধর্ম্ম বর্জ্জিত। সেই কারণে ছবি আঁকা, কারুকার্য্য শোভিত মীনা করা দেওয়াল ও তৈজসাদি আজ নির্ভয়ে পরিষ্কৃত হইতেছে ইহাদের সাহায্যে।

অনুকল্পগুলি গরম জলে ও ঠাণ্ডা জলে, এমন কি কতকগুলি বরফ জলেও, সমান কার্য্যকর। কৃষিকর্ম্মে ও গবাদি পশু পালন ক্ষেত্রে সাবানের অনুকল্পসমূহের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

কয়েকটি বিশিষ্ট সাবানের অনুকল্প—

নিম্নে কয়েক শ্রেণীর সাবানের অনুকল্পের এক তালিকা প্রদত্ত হইল। শ্রেণীগত ভাবে অনুকল্পগুলিকে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত অনুকল্পসমূহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর কতকগুলি অনুকল্পের নামও লিপিবদ্ধ করা হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই নামগুলি ব্যবসায়গত, রাসায়নিক নাম নহে।

প্রথমত: Nacconol NR, Santomerse 1, Crontite, Swerl. কাঁচামাল প্রধানত: কেরোসিন ও ক্লোরিন্ গ্যাস।

এই যৌগিক পদার্থসকল উত্তম পরিষ্কারক এবং খরজলে উপযোগী। ইহারা প্রচুর ফেনার সৃষ্টি করে। পশমজাত দ্রব্য ধৌতকার্য্যে ইহারা বিশেষ সহায়ক।

দ্বিতীয়ত: Duponol WA, Gardinol WA, Arctic Syntex M, Igepon AP, Dreft, Vel, Shampoo Derene.

নারিকেল তৈল হইতে সাধারণত: এইগুলি প্রস্তুত হয়। সাবান অপেক্ষা এগুলি বেশী মূল্যবান। প্রথমোক্ত শ্রেণীর রাসায়নিকগুলি অপেক্ষা এইগুলি খরজলে আরও অধিকতররূপে কার্য্যকর ও অধিকমাত্রায় দ্রবণীয়। গরমজল অথবা ঘন অম্লঘটিত মাধ্যমে এই রাসায়নিকগুলি বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ MP 189. এই অনুকল্পগুলি পেট্রোলিয়ম, সাল্ফার্ ডাই-অক্সাইড্ এবং ক্লোরিন্ হইতে প্রস্তুত।

পরিষ্কারক হিসাবে ইহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর রাসায়নিকগুলি অপেক্ষা কম কার্য্যকর। কিন্তু গুণাগুণ প্রায় উহাদের সহিত তুলনীয়। তীক্ষ্ণক্ষার বা অম্লের সংস্পর্শে ইহারা বিনষ্ট হয় না। এইগুলি হইতে মাঝামাঝি রকমের ফেনা হয়। খরজলে অল্পমূল্যের পরিষ্কারক হিসাবে ইহাদের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপর্য্যুক্ত তিন শ্রেণীর অনুকল্পেই সোডিয়ম্ সাল্ফেট্ মিশ্রিত করা হয় উৎপাদনমূল্য হ্রাস করিবার জন্য।

চতুর্থ শ্রেণীর অনুকল্পসমূহের উদাহরণ—Aerosol OT, Nacconol LAL. কাঁচামাল ফিউমারিক্ অথবা ম্যালেইক্ অম্ল। ইহারা মূল্যবান্। রঞ্জনশিল্পে ইহাদের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

পঞ্চম শ্রেণীর উদাহারণ Igepon T. মৃদু ক্ষার বা অম্লে ইহারা বিনষ্ট হয় না। ইহারা বয়নশিল্পে প্রধানত: ব্যবহৃত হয় এবং মাঝামাঝি রকমের পরিষ্কারক।

ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে বহু রাসায়নিক অনুকল্প। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী যথা—Ceepryn, Roccal, Zephiran ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে কয়েকটী উচ্চাঙ্গের শোধক। প্রচুর ফেনা উৎপাদক ও বিক্ষেপক। রোগজীবাণুনাশক শক্তি ইহাদের অমোঘ। তথাপি বিশেষত্ব এই যে, ত্বকের উপর ইহারা অপপ্রভাবহীন, রোগপ্রতিষেধক, কিন্তু বিষক্রিয়া করে না।

আল্কাতরাজাত রোগজীবাণুনাশক ঔষধাদি (যথা ফিনাইল্) অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং মূল্যও ইহাদের তদপেক্ষা বেশী।

সপ্তম পর্য্যায়ভুক্ত কয়েকটি—Santomerse DT, Triton NE, Spans, Tweens,

Pergal O. সচরাচর এইগুলি তরল আকারে পাওয়া যায়। Santomerse DT পরিষ্কারক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট কিন্তু কোন ফেনার সৃষ্টি করে না। ইহারা সাবান বা অন্যান্য কয়েক শ্রেণীর অনুকল্পের সহিত যুক্ত হইতে পারে কিন্তু লবণ-সমূহের সহিত মিশ্রিত করা যায় না।

সাবানের অনুকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ—

বিজ্ঞানক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহে সাবানের অনুকল্পসমূহ সাবানের প্রতিযোগী শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উত্তরোত্তর ইহাদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বা তদূর্দ্ধ সাবানের পরিবর্ত্তে ইহারা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই সকল রাসায়নিক রসায়নজগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এইগুলি আরও প্রসারলাভ করিবে—বিশেষজ্ঞগণ এই-রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিরাট শিল্পের কোনরূপ আভাস এদেশে পাওয়া যায় না—শিল্প হিসাবে ইহারা গড়িয়া উঠে নাই এবং ইহাদের প্রয়োগও করা হয় অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে। সুতরাং যাহাতে এই অতি প্রয়োজনীয় শিল্পটী আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। শোধন, ধৌতকরণ ও পরিষ্করণ বিষয়ক যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিতে ইহারা অদ্বিতীয়।

গ্রেট্‌জ (প্যারিস) শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার, এম্‌-এস্‌সি

শনিবারের সন্ধ্যা। টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ায় বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল না মোটেই। বুকের নীচে বালিশ এবং পায়ের উপর কম্বল টানিয়া "সঞ্চয়িতার" সঞ্চিত রস আস্বাদন করিতেছিলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত এবং অনুমতির সাথে সাথেই আমার পাশের ঘরের শ্বেত রাশিয়ান বিংশতিবর্ষীয়া মহিলা। হাতে কী একটা চাইনিজ খেলার সেট্। প্রায় সারাদিনই এর হাল্‌কা সুরের গানের রেশ ভাসিয়া বেড়ায়। বেশ্‌ চটপটে, আড়ষ্টতা নাই মোটেই, ঢুকিয়াই বলিল—'সঙ্গীহীনা আজি এ বাদলে—তুমি হবে মোর সাথী।' দুইজনে খেলিতে বসিলাম, সাথে চলিল আলোচনা—ভারতীয় সামাজিক ও নৈতিক বিশ্লেষণ। আমার ভাঙ্গা ফরাসী ও এর ভাঙ্গা ইংরেজীর জোরে বিশ্লেষণ শেষে বিতর্কে পৌঁছিল। এরা কল্পনাও করিতে পারে না—আমরা পূর্ব্বে এমন কি দেখাশুনা পর্য্যন্ত না করিয়া কি ভাবে একটি মেয়েকে অবলীলা ক্রমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে এবং সারা জীবন তার সাথে কাটাইতে পারি। বলিলাম—আজকাল মাঝে মাঝে যদিও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় তবু আমাদের মাতাপিতা আমাদের

হাতে স্ত্রীরূপী যে মেয়েকে সঁপিয়া দেন আমরা নির্ব্বিচারে তাহাকে গ্রহণ করি। আমি আলোচনার মোড় ঘুরাইবার জন্য ভারতীয় সনাতন ধর্ম, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু মেয়েটির তর্কের নিকট আমাকে অনেকটা নতি স্বীকার করিতে হইল। সে বলিয়াই চলিল—পরকালের সুখের আশায় যে হতভাগ্য এ কালের সুখে জলাঞ্জলি দেয়—তার সাথে আমার আপস নাই। এই বাদল ঝর ঝর সন্ধ্যায় এই প্যারিস্ নগরীর বুকে তুমি আজ ঘরের কোণে। হাঁ, তুমি খাঁটি ভারতীয় বটে! সুষুপ্তি এবং পরকালের সুস্বপ্ন জানাইয়া মেয়েটি যখন প্রস্থান করিল—রাত তখন বারোটা। পরকালের সুস্বপ্ন কথাটি আমার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না। ভারতীয় ধর্মের শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষাদি ষট্ সম্পদের কি কোন মূল্য নাই?

হঠাৎ আসিল পূজনীয় স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর সাদর নিমন্ত্রণ—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবে যোগ দিতে। প্যারিসের পূর্ব ষ্টেশন (Gare de l'est) হইতে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ট্রেনের কামরায় লোকজন বেশী ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী। মদরংগা চামড়ার গদি আরামের দিক হইতে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণী হইতেও ভাল। দুইটি ফরাসী যুবক পানীয়ের বোতল খুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। আমি সহাস্যে কর্ক-স্ক্রু সহ আমার চাবির গোছাটা আগাইয়া দিলাম। এরা "merci beaucoup" অর্থাৎ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্ক্রুটি কর্কের ভিতরে সন্তর্পণে প্রবেশ করাইয়া টান দিল। ফুলেল তেল ও লিভার মিক্শ্চার খুলিতে অভ্যস্ত আমার স্ক্রুটি ঐ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরার্থে আত্মদান করিল। ওরা মহা অপ্রস্তুত! বেচারীরা সারা রাস্তায় তৃষ্ণার্ত্তই রহিয়া গেল।

খানিক পরেই গাড়ী শহরতলীতে আসিয়া পড়িল। ছোট ছোট চার পাঁচতলা বাগান-ঘেরা বাড়ী; জানালায় অতি কারুকার্য্যময় সাদা পরদা, মাঝে মাঝে আপেলের বাগান, কোথাও বা ফুলের বাগান—এর মধ্য দিয়া ট্রেন চলিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। এদেশে এবার শীত বেশী পড়ে নাই। গত ২।১ দিন যাবৎ প্যারিসে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অতি হাল্কা এবং শুক্না বরফ তুলার মত আকাশ হইতে ভাসিয়া নামিতে থাকে। তখন আকাশের কেমন একটা মরা রং হয়।

কালবৈশাখীর আকাশ অথবা বর্ষণরত শ্রাবণসন্ধ্যার আকাশে এর তুলনা মিলে না। কিন্তু আকাশের ঐ মরা রং মনের মাঝে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার করে। রেল লাইনের দুই ধারে বরফের রেণু পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। গাছপালা বাড়ীর ছাদ আগাগোড়া বরফে ঢাকা। চির-সবুজ সরল পাইন গাছের চিকন পাতায় বরফের সরু আস্তরণ। যে দিকে দৃষ্টি চলে শুধু শাদা আর শাদা—মাঝে মাঝে সবুজের বুটি। মনে হইতেছিল যেন কোন স্বপ্নপুরীর মাঝ দিয়া চলিতেছি। ট্রেনের কামরায় শিশুসহ এক তরুণ দম্পতী ছিল। এরা সারা রাস্তা অতি মিষ্টি এবং হাল্কা সুরে বাচ্চাটিকে ঘিরিয়া গান করিয়া চলিল। এদের ভাষা না বুঝিলেও গানের সুরে বুঝিলাম—কল্পনায় এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য একটি মায়ালোক সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আধ ঘণ্টা পর ট্রেন এক বনানীর ভিতর প্রবেশ করিল। এ দেশী বন ও বাংলার বনে বেশ পার্থক্য আছে। এ দেশে কোনও জংগল নাই।

বনতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—শিকার জোটে একমাত্র খরগোস্। দুই ধারে দুই একটি বন্দুকধারী প্রহরী দেখিতে পাইলাম, বনস্থলী পাহারা দিতেছে।

আশ্রমে পৌঁছিতে আমার বেশ একটু দেরী হইয়া গেল। আশ্রমবাসিনী কুমারী প্রেম (mlle cholette) আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া একটু মিষ্টি ভর্ৎসনায় আমার বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিশাল আশ্রম-বাটিকা নিস্তব্ধ-নিঝুম। উৎসবের কোন লক্ষণই দেখিতেছি না। এর আগে আমি কখনও এরূপ অবস্থায় দেখি নাই। একটু অপ্রস্তুত ভাবে তেতলায় ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই সে পাশের ঘর হইতে তাড়াতাড়ি একটি গদি আনিয়া আমাকে নীচ তলার হল ঘরের দরজার সম্মুখে লইয়া গেল এবং অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া গদিটির উপর উপবেশন করিতে আদেশ করিল ও তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া সেখানে প্রহরীর কার্য্য করিতে লাগিল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া আমি তো বিস্ময়ে হতবাক্! খানিক আগে পূজা আরম্ভ হইয়াছে। সুসজ্জিত বেদীর উপর উপবিষ্ট স্বামীজী উদাত্ত স্বরে পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু আমার সম্মুখে এ কী দৃশ্য! প্রায় পঞ্চাশ জন তরুণ-তরুণী প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নির্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় সজল নয়নে উপবিষ্ট। মন্ত্রের একটি শব্দও আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছিল না—আমি মুগ্ধ নেত্রে অবাক বিস্ময়ে এদের ধ্যাননিমগ্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অপূর্ব্ব-রূপলাবণ্যময়ী তরুণীর দল স্থাণুর ন্যায় উপবিষ্ট! কোথায় যেন শুনিয়াছিলাম সুন্দরীর অশ্রু তার হাসির চেয়ে মনোহর। আহা! ভগবৎপ্রেমাশ্রুতে সজল নয়নের কী অপূর্ব্ব মাধুরী! ঘন তমসাবৃত গভীর রজনীতে ইটালীর পাশ দিয়া জাহাজে আসিবার সময় কালো সাগরের বুকে কালো আকাশের পট-ভূমিতে একটা জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরির অগ্নি-বর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পর্ব্বতের শিখর হইতে ভীষণ অগ্নিরাশি মুহুর্মুহু আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। একপার্শ্বে সুদীর্ঘ নদীর ন্যায় বিলম্বিত রক্তবর্ণ গলিত লাভাস্রোত দুর্মদ গতিতে মহাসাগরের বুকে পতিত হইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতেছিল। এখানে দেখিতেছি রূপ-মদ-গর্ব্বিতা অগ্নিগর্ভা প্যারিস নগরীর কত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বঙ্গহৃদয়-গোমুখীনিঃসৃত করুণা-গঙ্গায় হৃদয়সন্তাপ দূর করিতেছে! অদ্ভুত দৃশ্য নয় কী? আমি দুই চোখ ভরিয়া সেই দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলাম।

আমার বিস্ময় কাটিল আরাত্রিকের গানে। কতক্ষণ মোহগ্রস্ত ছিলাম জানি না। পূজার শেষে স্বামীজীর আহ্বানে চলিলাম খাবার ঘরে। কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি সারি সারি স্তূপীকৃত রহিয়াছে—আর রহিয়াছে গামলা ভর্ত্তি পায়েস। মহানন্দে এবং মহা কলরবে যার যা' খুসী খাইতে লাগিল। আমার মনটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। এদের সাথে খুব মিশিতে পারিতেছিলাম না—মনে কেমন একটা ভাব জাগিতেছিল—ভাবিতেছিলাম এরা কত ভদ্র! আমাকে ভারতীয় জানিয়া এরা আমার সাথে আলাপ করিতে খুবই ব্যগ্র। মেড্গা দিয়া যাইবার সময় মহাপ্রভুর ভাব হইয়াছিল—এই ভাবিয়া যে ঐ স্থানের মাটিতে খোল তৈরী হয় এবং ঐ খোল সংকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হয়! এদেরও আমাকে দেখিয়া অনেকটা সেই অবস্থা হইল।

রাত্রি ১১টার গাড়ী ধরিয়া প্যারিসে ফিরিতে হইবে। স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইলাম।

স্বপনী

শ্রীরবি গুপ্ত

গোপন তব চরণ ফেলে এলে ধরায় স্বপনী,
সেই চরণের পরশ পরে জাগাও সে কোন সরণী!
ভ্রান্ত-পথে দিশার আলো
তোমার মানস-চন্দ্রে জ্বালো,
তিমির ঘন পারাবারে বেয়ে তপন-তরণী,
এলে তোমার বিকাশ-বিভার ইন্দ্রজালে, স্বপনী।

প্রাণের প্রদীপ জীবন-জ্যোতি বিলায় তোমার
বাণী যে,
তরঙ্গে মোর মুক্ত-লহর আনন্দে তাই আনি যে।
ঊর্মি মালায় জাগর-ধ্বনি
অচিন-পায়ের নূপুর-মণি,
রুদ্ধ-নীরব জীবন-স্রোতে অতল-পরশ জানি যে,
প্রাণের প্রদীপ জীবন-জ্যোতি বিলায় তোমার
বাণী যে।

ধরার ভালের নীহারিকা সৃজন-করে সাজালে,
অযুত রবি-গ্রহ-তারায় দীপন নব জাগালে।
অতল তিমির তন্দ্রাতলে
চরণ দু'টি তোমার চলে,
সেই চলাতে সকল জয়ী বিজয়-তূর্য বাজালে,
ধরার ভালের নীহারিকা সৃজন করে সাজালে।

কত কালের অভীপ্সা আজ পূর্ণ তোমার স্বপনে,
তারি অমল দীপ্তি জাগে স্নিগ্ধ তোমার নয়নে।
সেই স্বপনের পরশ লাগে—
সে কোন স্বর্ণ-কমল জাগে,
অচিন গোলাপ মুঞ্জরিত পরশ-বিভব চয়নে,
কত কালের অভীপ্সা আজ পূর্ণ তোমার স্বপনে।

প্রাণে আমার সেই পরশের দীপন-দোলা জাগল,
আঁধার-বুকে প্রভাত যে তার আশীষ চির রাখল।
নিখিল-ভুবন-জীবন-ধারা
হিন্দোলে তার আপন-হারা,
বিশ্ববীণায় বীণাপাণির পরশখানি লাগল,
প্রভাত পরশ-দীপন-দোলা প্রাণে আমার জাগল।

নিবিড় তব স্বপ্ন-নেশায় জাগে আমার রজনী,
চির চরণ-শরণ নিয়ে সাজে ধূলার সরণী।
উদয়-পথে অবাধ ঢালো
অসীম, তোমার মর্ম-আলো,
তিমির ঘন পারাবারে বেয়ে তপন-তরণী,
খুলে ঊষার সুর-কোষাগার এলে ধরায় স্বপনী।

স্বামী আত্মানন্দ

(২)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ঢাকা মঠে স্বামী আত্মানন্দ শুধু যে অধ্যক্ষ ছিলেন তাহা নহে, তিনি স্থানীয় সাধু-ভক্তদের এক জন অভিভাবকও ছিলেন। তাঁহাদের কর্তব্যে শিথিলতা ও অনবধানতা দেখিলে মৃদু ভৎর্সনা দ্বারা তিনি ঐ সকল দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন। সাধুভক্তগণ আড্ডা দিলে তিনি খুব বিরক্ত হইতেন। ঢাকা মঠের সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন, "আড্ডা জীবনের পরম শত্রু। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন, আড্ডা মানুষকে ruin (ধ্বংস) করে দেয়। সুতরাং ঐ থেকে সাবধান থাকবে। কিছু কাজ না থাকে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু আড্ডায় যাবে না। যদি কেউ তোমার কাছে আড্ডা দিতে আসে, একখানা বই নিয়ে পড়তে থাকবে। দেখবে, সে ধীরে ধীরে সরে পড়বে; তারপরে আর আসবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই, রামায়ণ, মহাভারত—ঐসব অল্প অল্প করে রোজ পড়বে। কিছু দিন পরে দেখবে, অনেক পড়া হয়ে যাবে। এখন অন্য বই পড়বে না। এমন কি, একটা ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থও পড়বে না।" সাধনজীবনে সন্ন্যাসিব্রহ্মচারীদের সংবাদপত্র পড়াও তিনি খুব অপছন্দ করিতেন। কেহ সংবাদপত্র মঠের গ্রন্থাগার থেকে নিজের ঘরে আনিলে বিরক্ত হইতেন। সন্ন্যাসিব্রহ্মচারীদের রাজনীতি আলোচনাও তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। উহা সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিষয়াভিমুখী করে। সেইজন্য উহা হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "যে সংস্কারগুলি মাথার মধ্যে ঢুকে আছে, সেগুলিই তাড়ান যাচ্ছে না। আবার নূতন সংস্কার ঢোকান কেন? সাধুজীবনে এটা জানবো, ওটা দেখবো, ইত্যাদি ভাব ভাল নয়।"

এক দিন স-মহারাজকে বলিলেন, "অধ্যক্ষের নির্দেশ না পেলে ঠাকুর-পূজার কাজটি ছেড়ো না।" তিনি প্রশ্ন করিলেন, "পূজা কিরূপে করতে হয়, জানি না। বলে দিন।" শুকুল মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "পূজা মানে সেবা। তিনি সাক্ষাৎ রয়েছেন, এইটি মনে করে তাঁকে নাওয়ান, খাওয়ান, ইত্যাদি।" পূজা এবং পূজার কাজ করিতে করিতে কেহ গল্প করিলে বিরক্ত হইতেন। তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া সকল কাজ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এক দিন স-মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বন্যা, কোথায় দুর্ভিক্ষ, এসব খবর সংবাদপত্র না পড়লে কি করে জানব?" তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুমি ত' আর অধ্যক্ষ নও। অধ্যক্ষ ঐসব দেখে যেমন বলবেন তেমন করবে। ভগবান লাভ জীবনের উদ্দেশ্য, ঐ নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত গ্রহণ। এই কঠোর সাধনার যা' পরিপন্থী, যা' চিত্তবিক্ষেপকারক, তা' নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে।" স্বামী আত্মানন্দ কঠোর নিয়মনিষ্ঠ হইলেও অবস্থাবিশেষে নরম ব্যবস্থাও

দিতেন। এক দিন জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী আহারের পর দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করতে বলেছেন। এখানে বিশ্রাম অর্থে কি নিদ্রা বুঝায় ?" উত্তরে তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমাদের মত রোগাপট্‌কার জন্য ত' স্বামীজী নিয়ম করেন নি। কি আর করবে ? না পারলে একটু ঘুমিয়ে নেবে।" শুকুল মহারাজ চট্‌পটে চন্‌মনে ভাব ভালবাসিতেন, ম্যাদাটে, মেয়েলি ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাহচর্য তাঁহার চরিত্রে উক্ত বীর-ভাব দৃঢ় করিয়াছিল।

অমূল্য জীবনের এক মুহূর্তও যাহাতে বৃথা নষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি routine life (নিয়মিত জীবন) পালন করিতে উৎসাহ দিতেন। জনৈক সাধুকে অনেক বার বলিয়াছিলেন, "একটা routine (দৈনিক কার্যসূচী) করে চলবে।" অবশ্য তাতে আহারের পর একটু গল্প করবার এবং বৈকালে একটু বেড়াবার সময়ও থাকবে।" শরীর ও মনের জড়তা দূর করবার জন্য এক জন সাধুকে এক দিন বলিলেন, "সকাল-বিকাল মঠের এই lawn (প্রাঙ্গণ) এর চারদিকে দৌড়াবে।" আর একজন সাধু তাঁহার এই উপদেশটি কিছু দিন পালন করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বিষয়ে অনবধান থাকিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় তৈলমাখা, স্নানের ঘাটে বসিয়া গল্প করা ইত্যাদি সাধুজীবনের শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া এক দিন তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "এই ভাবে সময় নষ্ট করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সময়টা সচ্চিন্তা বা সৎকার্যে কাটাতে হবে। অল্প হলেও নিয়মিত ভাবে রোজ জপ-ধ্যান করে যাবে। ভগবানকে ত' আর দেখ নি। শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী—এঁরাই ভগবান, এঁদের কাছে প্রার্থনা করবে।"

এক দিন শুকুল মহারাজ বলিয়াছিলেন, "বুড়ো হলে যখন কাজ-কর্ম করবার সামর্থ্য থাকবে না, তখন কি নিয়ে থাকবে ? তাই এই বয়সে কতকগুলি সদভ্যাস স্বভাবগত করে নিতে হয়—যেমন, জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ ও সদালোচনা। এখন আড্ডা দিয়ে কাটালে তখনও তাই করতে হবে।" যে মন ভগবানের পাদপদ্মে রাখিতে হইবে, সেই মন পাছে জামা-কাপড়ে আসবাব-পত্রে পড়িয়া যায়, সেইজন্য তিনি নিজে খুব সাবধান থাকিতেন। তাঁহার ঘরের আসবাব-পত্র এমন পরিপাটী ভাবে সাজান থাকিত যে, ঝাড়ুটি দেখিলেও মনে হইত, ইহা সযত্নে রক্ষিত। নিজের ঘরটি নিজেই ঝাঁট দিতেন। কুয়া হইতে জল তুলিবার জন্য একটি ঘটি ও দড়ি নিজের কাছে রাখিতেন। পাছে অপরকে কষ্ট দিতে বা কাহারো সেবা লইতে হয়, সেজন্য নিজের সকল কাজ নিজেই করিতেন। জামা-কাপড় ও ঘরের জিনিষ-পত্র সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা সম্বন্ধে এক দিন বলিয়াছিলেন, "উহা মনঃসংযমের পরিচায়ক। যারা বাইরে এলোমেলো, তারা ভিতরেও তদ্রূপ। যে ভাল শিল্পী সে ভাল সাধু হতে পারে। শিল্পী হতে গেলে মনঃসংযোগ দরকার, আর মনঃসংযোগ না হলে সাধনা অসম্ভব।"

স্বামী আত্মানন্দ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া খুব অল্প সময়ে সমাপন-পূর্বক নিজ বিছানায় চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। বলিতেন, "স্নান-শৌচাদিতে বেশী সময় দিতে নেই। কারণ ঐ সময়টায় বড় একটা ঈশ্বর-চিন্তা হয় না। প্রাতে তিনি নিয়মিত ভাবে ঠাকুরমন্দিরে যাইয়া প্রণামান্তে কিছু ক্ষণ মঠপ্রাঙ্গণে দ্রুত পাদচারণ করিতেন। শীতকালে কখনও বা রৌদ্রে কিছু সময় একলা বসিয়া কাটাইতেন। জলখাবারের জন্য মুড়ি খাইতে ভালবাসিতেন। স্নানান্তে নিজ ঘরে ধুনা জ্বালিয়া

সামনে একটি ছোট আসনে ঠাকুর ও মার ছবি বসাইয়া কিছু ক্ষণ জপের পর শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তব কয়েকটি পাঠ করিতেন। বেশী সময় নিজের খাটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল এত উজ্জ্বল ও প্রশান্ত দেখাইত যে, কাছে যাইতে কেহ সাহস করিত না। বৈকালে মঠের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া পাঁচ ছয় জন ব্রহ্মচারী ও বাহিরের যুবকদের লইয়া স্বামীজীর বই পড়াইতেন। তাহাতে এক জন পাঠ করিতেন, আর যেখানে প্রয়োজন হইত, দুই একটি কথায় তিনি বুঝাইয়া দিতেন। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

বেদান্তদর্শনের একটি সূত্র আলোচনাকালে নিজের মাথায় অঙ্গুলি ঠেকাইয়া বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর কৃপায় এর মধ্যে কিছু আছে।" ঈশ্বরের বাণী মনে করিয়া ঠাকুর-স্বামীজীর গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত তিনি পাঠ করিতেন। সন্ধ্যাসমাগমে নিজের ঘরে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। গিরিশ ঘোষের নাটকাবলী সম্বন্ধে এক দিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ভাবরাশি যত প্রচারিত হবে, লোকে ততই গিরিশ বাবুর বই বুঝতে পারবে ও আদর করবে। এখনও সে সব লোক জন্মায় নি।" সংঘগুরু এবং স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহাকে না দেখিলে ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। জনৈক যুবক এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী বলেছিলেন, মেয়েদের পৃথক্ মঠ হবে। তা হলো কৈ?" শুকুল মহারাজ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "শিববাক্য একটীও মিথ্যা হবার নয়। যা যা বলে গেছেন সব কালে সত্যি হবে। স্বামীজী বৃথা বাক্য ব্যবহার করেন নি। তাঁর কথা হতে একটী কমা (,) ও বাদ দেবার নয়।" স্বামীজী মঠের নিয়মাবলীতে লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষের আদেশপালনে প্রাণপণে তৎপর হইবে। শুকুল মহারাজ এই 'প্রাণপণ' কথাটীর উপর জোর দিয়া বলিতেন, "এই কথাটীও স্বামীজী বৃথা ব্যবহার করেন নি। এরও তাৎপর্য আছে।" এক দিন স-মহারাজকে বলেছিলেন, "মঠের নিয়মাবলী মুখস্থ করে ফেলবে, এবং যেখানে থাকবে আশ্রমের সকলকে নিয়ে মাঝে মাঝে পড়বে।"

শুকুল মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং তাঁহাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখিতেন। এক দিন বলিয়াছিলেন, "খুব সাধন-ভজন না থাকলে মহারাজের সঙ্গ করে তাঁকে বোঝা যায় না। অর্থাৎ সাধনরাজ্যের এত উচ্চ স্তরে মহারাজ অবস্থান করেন যে, সাধারণ মন তাঁকে ধরতে পারে না।" মহারাজের দেওয়া একখানি চাদর অতি যত্নে তিনি নিজের বাক্সে রাখিতেন, কখনো ব্যবহার করেন নাই। ঠাকুরের শিষ্যদের সম্বন্ধে কেহ কোন রূপ অশ্রদ্ধাসূচক বাক্য ব্যবহার করিলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে, নিজেকে কিছু ক্ষণ সামলাইতে পারিতেন না। যে দিন শ্রীশ্রীমায়ের পূতাস্থি ঢাকা মঠে আনীত হইল, সেদিন শুকুল মহারাজের এক অপূর্ব ভাব! বালকের মত মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বেলা দুইটা আড়াইটা পর্যন্ত উপবাসী রহিলেন, মায়ের পূজাভোগ হইলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তিনি মঠের মন্দিরে ঠাকুরের অস্তিত্ব সর্বদা অনুভব করিতেন। রাত্রে ঠাকুরের শয়ন হইলে মন্দিরের কাছে কেহ কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন।

ঠাকুরের পূজাসেবার ন্যায় সংঘের কাজকর্মকে তিনি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

এক দিন ঢাকা মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। কিন্তু তখনো মঠস্থ হাসপাতালের রোগীদের পথ্য দেওয়া হয় নাই। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি বিশেষ বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। মিশন স্কুলের ছাত্রপড়ান কাজটিও সন্ন্যাসিব্রহ্মচারিগণ যাহাতে নিয়মিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি কার্যক্ষেত্রে সামরিক নিয়মানুবর্তিতা খুব পছন্দ করিতেন। বলিতেন ঠাকুরের কাজে ব্যক্তিগত রুচিবৈচিত্র্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দিয়া আনন্দের সহিত কর্মাধ্যক্ষের আদেশপালনে প্রস্তুত থাকা উত্তমাধিকারীর লক্ষণ। তাঁহার মতে যে অধ্যক্ষের আদেশের সহিত নিজের সুখসুবিধা দেখে সে মধ্যম, এবং যে নিজের সুবিধা আগে দেখে সে অধম অধিকারী। এক দিন স-মহারাজকে বলিলেন, "এমন ভাবে নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখবে যে, অধ্যক্ষ অন্যত্র যেতে বললে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে পার।" আবার বলিতেন, "যে (কর্মাধ্যক্ষ) কাজ করবে তাকে স্বাধীনতা দিতে হয়। নইলে সকলে মিলে তার পেছনে লাগলে কি কাজ চলে?" 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।' তাঁহার প্রত্যেকটী উপদেশ তিনি নিজে সর্বাগ্রে পালন করিতেন। তিনি ছিলেন আচার্যশ্রেণীর সন্ন্যাসী।

শুকুল মহারাজ খুব অল্পভাষী ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, কখনো বা আপন মনে পায়চারী করিতেন। সর্বদা একটানা তন্ময় ভাব তাঁহাতে লক্ষিত হইত। কখনো বৃথা উল্লাস-আমোদে মত্ত হইতেন না, অথচ রসিকতার অভাব ছিল না। তাঁহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী অপর চারিটী অঙ্গুলির উপর দিয়া সর্বদা চালিত হইতেছে দেখা যাইত। অজ্ঞতাবশতঃ কোন কোন সাধুর ধারণা ছিল, উহা তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ। পরে তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বদাই জপ চলিতেছে। দীর্ঘসময় বসিয়া জপ-ধ্যান না করিলেও সর্বদাই তিনি যে ধ্যানভাব রাখিতেন এবং স্মরণ-মনন করিতেন, তাহা বেশ বুঝা যাইত। এক দিন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "আপনার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে কি?" উত্তরে বলিলেন, "যদি একটা ভূতও দেখতাম, তবুও বুঝতাম একটা কিছু দেখেছি।" তারপর একটু গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "তবে মনে কোন বাসনা নেই।" ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন সম্বন্ধে এক দিন বলিলেন, "রূপদর্শনাদি সাধনরাজ্যের খুব উচ্চস্তরের কথা নয়। উপলব্ধির জগৎ দর্শনাদির উর্দ্ধেই বেশী। সকল সাধকের প্রকৃতিতে রূপদর্শনাদি হয় না।" তাঁহার সৌম্য উজ্জ্বল মুখ এবং সদানন্দ মূর্তি দেখিলে মনে হইত অমৃতের সন্ধান কিছু না পাইলে এমন মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের সমাবেশ হইতে পারে না। বালকের মত সরল মধুর হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত এবং তাঁহার ব্যবহারও ভদ্র ও মিষ্ট ছিল।

শুকুল মহারাজের কাছে টাকা পয়সা থাকিত না। তাঁহার সেবার জন্য কেহ কিছু দিলে হিসাব-রক্ষকের নিকট দিয়া দিতেন এবং কিছু জমা হইলে সন্ন্যাসিব্রহ্মচারীদের জামা কাপড় প্রভৃতির অভাব পূরণ করিতেন। বিছানাপত্রাদি সম্বন্ধে বলিতেন, "আমাদের সময় personal (ব্যক্তিগত) বলে কিছু ছিল না। সবই মঠের বলে ধরা হত। মঠ হতে অন্যত্র যাবার সময় কেউ ঐসব নিয়ে যেত না।" এক দিন এক জন মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কি ব্রাহ্মণ?" তিনি উত্তরে

বলিলেন, "আমি সন্ন্যাসী।" দুই তিন বার জিজ্ঞাসার পর একই উত্তর পাইয়া মহিলাটি নিরস্ত হইলেন। স্ত্রীভক্তেরা আসিলে তিনি তাঁহাদের যথাযথ আদরযত্ন করিতেন। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় তাঁহাদের কাছে থাকিতেন না, কৌশলে বিদায় দিতেন। এক দিন বলিয়াছিলেন, "এমন একটি আশ্রম থাকবে যেখানে নারী মেথর পর্যন্ত ঢুক্‌তে পারবে না।" তিনি কঠোর সন্ন্যাসী হইলেও হাস্যরসিকতা ছাড়িতেন না। এক দিন রৌদ্রে বসিয়া চোখের চশমাটি মেঝের কাছে ধরিলেন। চশমার ভিতর দিয়া ঘনীভূত সূর্যালোক দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, নিরাকার ব্রহ্ম কিরূপে সাকার হন।"

অতিরিক্ত ও বৃথা বাক্যালাপীদের লক্ষ্য করিয়া এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যায়াম কয় প্রকার বলত।" স-মহারাজ বলিলেন, "শারীরিক ও মানসিক এই দুই প্রকার।" তিনি বলিলেন, "না, আর এক প্রকার আছে, vocal exercise (বাক্য-ব্যায়াম)! অর্থাৎ অযথা বাক্যব্যয় এক প্রকার ব্যায়াম মাত্র।" নিজে তেমন গাহিতে না পারিলেও তিনি সঙ্গীত খুব ভালবাসিতেন। এই গান দুইটি প্রায়ই আপন মনে গাহিতেন—

(১)　কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন
　　　কায়া ত রবে না।

দিন যাবে দিন রবে নাত,
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে?
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কারু নয়, দ্যাখ্ না চেয়ে
কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি।

(২)　অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি, চরণে প্রণমি তব
　　　প্রেম ভক্তিভরে শরণ লাগি।
দুর্মতি দূর করি　　শুভ মতি দাও হে
　　　এই বরদান ভগবান্ মাগি॥
ঘোর নিঠুর রিপু　　অন্তরে বাহিরে
　　　ভীত অতি আমি এই অন্ধকারে।
দীন বৎসল তুমি　　তার নিজ সেবকে
　　　তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে॥
বিষয়-মোহার্ণবে　　মগন হয়ে ডাকি হে
　　　দীনহীনে প্রভু রাখ রাখ।
তব কৃপা যে লভে　　কি ভয় ভবসঙ্কটে
　　　কাটি যাবে বিপদ লাখ॥

প্রথমটী গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে আছে, দ্বিতীয় গানটী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত।

গানের আসরে আনন্দে যোগদান করিতেন। ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুর বাবু তাঁহার বাড়ীতে যাত্রা-গানের সময় শুকুল মহারাজকে গাড়ি করিয়া লইয়া যাইতেন। এক দোলপূর্ণিমার দিনে তিনি সব সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের কাপড় চাদর বাসন্তী রঙে ছোপাইয়া বৈকালে মঠপ্রাঙ্গণে বসিয়া গান ও আনন্দ করিয়াছিলেন। শুকুল মহারাজকে কখনও বিষাদগ্রস্ত দেখা যাইত না। বেলুড় মঠের আদি গৃহদ্বয় যখন প্রথম নির্মিত হইল তখন নূতন বাড়ীর দেওয়ালে কেহ পেরেক মারিলে শুকুল মহারাজ স্বামীজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) বলিতে শুনিয়াছিলেন, "পেরেকটা যেন আমার গায়ে মারছে। এই বাড়ীর প্রত্যেক ইঁটটির জন্য আমার গায়ের এক এক আউন্স রক্ত দিতে হয়েছে।"

স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "স্বামীজীর শিবাংশে, মহারাজের কৃষ্ণাংশে এবং নিরঞ্জন স্বামীর রামাংশে জন্ম। নিরঞ্জন স্বামীর পূর্ব-

স্মৃতি ছিল, তিনি শৈশবে তীরধনু লইয়া খেলা করিতেন। ঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অসুস্থ তখন নিরঞ্জনানন্দজী গুরুর সেবা করিতেন এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য চিন্তিত হইতেন। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সেরে গেলে তুই কি করবি, নিরঞ্জন?" শিষ্য আনন্দোন্মত্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "বাগানে এই যে খেজুরগাছটা আছে সেটা উপ্‌ড়ে ফেলবো।" ঠাকুর বলিলেন, "তা তুই পারবি।" স্বামী আত্মানন্দ বলিতেন, "যাদের ভক্তিভাব বেশী উপনিষদাদি বেদান্ত-গ্রন্থ পড়লে তাদের অনিষ্ট হয়, তাদের ভক্তি-ভাব কমে যায়।" ঢাকা শহরের যে অংশে রামকৃষ্ণ মঠ অবস্থিত উহা শিক্ষিত ভদ্রপল্লী। সন্ধ্যাকালে বহু শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা মঠে বেড়াইতে আসিতেন। স্বামী আত্মানন্দ মহিলাদের সহিত আদৌ কথা বলিতেন না। মঠের জনৈক সাধু তাঁহাকে এই প্রার্থনা জানাইলেন, "যে সব মহিলারা আসেন তাঁদের অনেকেই মঠে অর্থ সাহায্য করেন। আপনি তাঁদের সঙ্গে অন্ততঃ দুই একটা কথা বলবেন। নচেৎ তাঁরা দুঃখিত হবেন।" তখন গুরুল মহারাজ কর্তব্যানুরোধে তাঁহাদের সহিত দুই একটী কথা বলিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসিত হইলে। কঠোর যতি-বিধি তিনি জীবনে কখনো ভঙ্গ করেন নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী আত্মানন্দ ঢাকা মঠের অধ্যক্ষতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বেলুড় মঠে আসেন। তখন বেলুড় মঠে তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বেলুড় মঠ হইতে তিনি ভুবনেশ্বর মঠে যাইয়া প্রায় এক বৎসর থাকেন। ঢাকা মঠে রক্তামাশয়ে ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। শেষ জীবন মোক্ষতীর্থ কাশীধামে অতিবাহিত করিবার জন্য তিনি ভুবনেশ্বর হইতে তত্রস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গমন করেন। শ্রাবণ মাসে স্বামী করুণানন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন, "খেলাধূলা ঢের হলো, চল আবার একান্ত স্থানে গঙ্গাতীরে বসে যাই। গোলমাল, লোকালয় ভাল লাগে না।" সেই সময় তিনি স্বামীজীর 'দেববাণী' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ আশ্রমের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের পড়াইতেন। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম-প্রসঙ্গপ্রমত্ত থাকিতেন। ১৩৩০ সালে ভাদ্রের শেষে স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীধামে যান। তখন স্বামী আত্মানন্দ বেশ সুস্থ ছিলেন। উভয় গুরুভ্রাতা এক দিন পদব্রজে স্বামী অখণ্ডানন্দকে শহরের অপরাংশে দেখিয়া আসেন। স্বামী আত্মানন্দকে তখন অত্যন্ত নির্লিপ্ত অন্তর্মুখী ও নির্জনতাপ্রিয় দেখা যাইত। তিনি ইহধাম হইতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট প্রায়ই বলিতেন, "মিশনের কর্মকেন্দ্রে থাকতে আমার আর ইচ্ছা হয় না। এখানে মন চঞ্চল হয়, কেবল সংঘাধ্যক্ষ মহাপুরুষজীর আদেশে আছি। যদি তিনি অনুমতি করেন তবে হরিদ্বার বা ঐরূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়া গঙ্গাতীরে পড়ে থাকি। তবে এখন একলা থাকবার ক্ষমতা নেই। কেহ সঙ্গে থাকলে সুবিধা হয়। কারণ, জল-তোলা প্রভৃতি কাজ এখন আমার অসাধ্য হয়ে পড়েছে। বসে বসে রান্নাবান্না ঐরূপ করে নিতে পারি।"

স্বামী শুদ্ধানন্দ কাশীতে যাইবার পরই স্বামী আত্মানন্দ স্বীয় পুরাতন ট্রাঙ্কটী চাবিসহ গুরু-ভ্রাতাকে দিয়া বলিলেন, 'এর ভিতর দু'খানি গরম চাদর আছে। আমি এটা আর রাখবার বন্দোবস্ত করতে পারব না। তুমি এটা নিয়ে মঠাধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দাও। তিনি এগুলি যাকে ইচ্ছা হয় দেবেন। আমি একটা সস্তা

বালাপোষ যোগাড় করে আগামী শীতে ব্যবহার করব। স্বামীজী কি মঠের এই নিয়ম করে যান নি যে, সংঘের প্রত্যেক সাধু অধ্যক্ষকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে যাবেন?" ট্রাঙ্কটী খুলিয়া দেখা গেল, উহার মধ্যে দুটী গরম কাপড় এবং একটী ফ্লানেলের জামা। গরম কাপড় দুটী শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি এই অতিরিক্ত কাপড় দু'খানি সযত্নে রাখিয়াছিলেন, কখনো ব্যবহার করেন নাই। প্রথমে স্বামী আত্মানন্দের জ্বর হয় কাশীতে এবং জ্বর কয়েক দিন চলিতে থাকে। তখন তাঁহাকে ডাঃ ভবানী বাবুর চিকিৎসায় রাখা হয়। ক্রমে ১৫।২০ বার করিয়া দাস্ত আরম্ভ হইল। জ্বরের বিরাম একদম না হওয়ায় এবং জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রসিদ্ধ ডাঃ অমর বাবুকে দেখান হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া রেমিটেন্ট (পালা) জ্বর বলেন এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা হইতে থাকে। রবিবার হইতে একটু নিউমোনিয়ার ভাব দেখা দেয়। অমর বাবুকে ডাকা হইল। ইন্‌জেক্‌সন দিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া বলেন, "এ সামান্য ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ঔষধেই সারবে।" ব্যস্ততা সত্ত্বেও ডাক্তার বাবু নিয়মিত ভাবে আসিয়া সযত্নে চিকিৎসা করেন। ক্রমে স্বামী আত্মানন্দ কাণে কম শুনিতে থাকেন, খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহাকে ঔষধপথ্যাদি খাওয়ান হইত। স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ সর্বদা কাছে থাকিয়া রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে রোগীর সেবা করিলেন। শেষে দাস্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদানার রস, হর্লিক্‌স্ প্রভৃতি পথ্য চলে। বৃহস্পতি-বার হইতে অতিরিক্ত prostration (দুর্বলতা) হয়। শুক্রবার প্রাতে অমর বাবু দেখিয়া বলেন, "অন্য সব লক্ষণ ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত prostration (দৌর্বল্য)।" তিনি stimulant mixture (উত্তেজক মিশ্রিত ঔষধ) এর ব্যবস্থা দেন। উহা ২।৩ দাগ খাওয়ান হইয়াছিল। বেলা দুইটা আড়াইটা হইতে আত্মানন্দজীর বাক্য বন্ধ হয়। আন্দাজ চারিটা হইতে ঘাম হইতে থাকে। ডাঃ ভবানী বাবু ও ডাঃ চৌধুরী আসিয়া শেষাবস্থা বলিয়া গেলেন। অমর বাবু যখন আসিলেন তখন সকলে স্বামী অখণ্ডানন্দের আদেশে মুমূর্ষু সন্ন্যাসীকে উচ্চৈঃস্বরে রামকৃষ্ণ নাম শুনাইতেছেন। ১৩৩০ সালের ২৫শে আশ্বিন শুক্রবার (১৯২৩ সন, ১২ই অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিয়া স্বামী আত্মানন্দ প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ পূর্বক সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। শনিবার প্রাতে তাঁহার দেহ পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া মণি-কর্ণিকা ঘাটে গঙ্গায় জলসমাধি দেওয়া হয়। পরবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে ভাণ্ডারা হয়।*

স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন কঠোর সন্ন্যাসী, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতেগড়া সাধু। তাই তাঁহার জীবনে ত্যাগতপস্যার হোমানল সদা প্রদীপ্ত ছিল। শশী মহারাজের সঙ্গে সর্বদা কত সতর্ক থাকিতে হইত সেই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 'তোমরা যেরূপ কাপড় পর আল্‌গা করে সেরূপ আমরা পরতুম না। সকাল থেকে বারটা পর্যন্ত মালকোঁচা মেরে থাকতে হতো। তাঁর কখন কি আদেশ আসে? যখন যেটা বলতেন সেটা অবিলম্বে করতে হতো। একটু দেরী বা এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা ছিল না!' সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নিষিদ্ধ।

* 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

শেষ অসুখের সময় দেখা গেল, স্বামী আত্মানন্দের কাছে একটীও পয়সা নাই। একখানা অতিরিক্ত কাপড়ও তিনি রাখিতেন না। কিন্তু তিনি কঠোর হইলেও নীরস ছিলেন না। নির্দোষ রসিকতা তিনি ভালবাসিতেন। একবার তিনি বাংলা পদ্যে একটী লম্বা ছড়া রচনা করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। শেষ জীবনে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস অতিশয় বাড়িয়াছিল। পূর্বোক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত হইতে উহা বোঝা যায়। তিনি ভাল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন এবং ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বাজাইতেন। তিনি ধর্মসঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। শেষ অসুখের সময় তিনি সংঘের একজন সন্ন্যাসীর গান মাঝে মাঝে শুনিতেন। তখন সুগায়ক স্বামী অম্বিকানন্দের আগমনের সম্ভাবনা শুনিয়া তিনি উল্লসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অম্বিকানন্দজীর গান শুনিবার ইচ্ছা তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। তিনি সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম নির্মম ভাবে পালন করিতেন। একবার কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী প্রশান্তানন্দ ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন সাধুগণ এবং স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসিগণ পুরুষ ভক্তগণ সহ ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত। একটী বড় ফরাসের উপর সকলে উপবিষ্ট। এমন সময় হরিমতি নামক পরিচিতা এক জন স্ত্রীভক্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণার্থ আসিয়া ফরাসের এক কোণে পশ্চাতে বসিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী আত্মানন্দ পাঠশ্রবণ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "নারীর সহিত একাসনে সন্ন্যাসীর উপবেশন নিষিদ্ধ।"

স্বামী আত্মানন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা মিশিতেন তাঁহারাই তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতার নীরব প্রভাব অনুভব করিতেন। গুরুস্থানীয় সন্ন্যাসিগণ এবং গুরুভ্রাতাগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যোগীর ধ্যানপ্রিয়তা ও সাধুর কঠোরতায় তাঁহার জীবন অলঙ্কৃত ছিল। তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম কর্মী। প্রত্যেক কাজটী পূজার মত তিনি নিখুঁতভাবে করিতেন সমগ্র মন দিয়া। স্বামী আত্মানন্দ ছিলেন স্বামীজীর সুযোগ্য শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সংঘের উজ্জ্বল রত্ন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের সমবায়ে গঠিত চরিত্রই স্বামীজীর অভিপ্রেত ছিল। তৎশিষ্য স্বামী আত্মানন্দের জীবনে উক্ত যুগাদর্শ মূর্ত হইয়াছিল।

"রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে; তুমি এক ডুবে পেলে না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে করো না। সেইরূপ একটু সাধন করে ঈশ্বরদর্শন হল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে সাধন করতে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার ওপর হবে……যেমন সাঁতার দিতে হলে আগে অনেক দিন ধরে জলে হাত পা ছুড়তে হয়, একবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে সাঁতার দিতে গেলে অনেকবার উঠতে পড়তে হয়, একবারে হয় না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

পশ্য জাতোঽহম্

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী

আসিয়াছে সেই দিন,
সারাটি পৃথিবী সভয়ে যে দিন প্রাণস্পন্দহীন।
কংসের করাল মূর্তি অবাধ স্বৈরাচার
গ্রাসিতে উদ্যত যবে পৃথিবীর সমাজ-সংসার;
উষার উদয়-লক্ষ্মী ধ্বংসতলে যায় ডুবে যায়,
কাঁপে শুধু ক্ষিতিতল শাসিতের শোণিত-ধারায়;
অবিচার, অত্যাচার অধঃ-উর্দ্ধে পিছনে-সম্মুখে
ন্যায় ধর্ম লুপ্ত করি গৃধ্র তার বীভৎস কৌতুকে
অবিশ্রান্ত করিছে ভ্রূকুটি;
দিকে দিকে আর্তরব—শান্তি গেছে পৃথ্বী হ'তে টুটি';
হিংস্র দানব-গর্জন-ভীত, জর্জর নখাঘাতে
অসহায় ক্ষীণ সহায় মাগিল দুরন্ত দুখের রাতে—
"কোথা' ভগবান্, রক্ষ মাম্"—অশ্রু-করুণ সুর
পৃথিবীর প্রতি প্রান্ত, ব্যোম-বায়ু করিল বিধুর।

ব্যাকুল বিলাপে পাষাণ টলিল, টলিল জগন্নাথ,
ধেয়ানমগ্ন আঁখিপুট খুলি' করিল দৃষ্টিপাত।
দেখিল স্তম্ভিত আঁখে নির্বিশেষে নির্যাতন স'য়ে
প্রপীড়িতা পৃথ্বী কাঁদে শতাব্দীর বিভীষিকা ল'য়ে।
অন্তরের অনুযোগ, বক্ষঃশ্বাস, অশ্রু অনর্গল
সত্য-শিব-সুন্দরে বুঝি ক'রে দেয় বিকৃত বিকল।
চঞ্চল নারায়ণ,
মুমূর্ষু মর্ত্যেরে দিতে জীবনের নূতন স্পন্দন,
(অধর্মের ধূম্রজাল সমূলে সুচির খণ্ডনে)
নব জাতকের রূপে নামি' এল কারার বন্ধনে।
আপন অভয় হাস্যে বিঘোষিল অভয় প্রথম—
"ভয় নাই, ভয় নাই আর—পশ্য জাতোঽহম্"।
পৃথিবীর প্রতি রন্ধ্র, জগতের আছে যত কাণ
শুনিল অভয় বাণী,
হেরিল—জাগ্রত ভগবান্।
প্রাণশক্তি প্রস্ফুরিল মুহ্যমান মূর্চ্ছিত জীবনে,
লভিল চৈতন্যসত্তা উদ্ভাসিত যুগসন্ধিক্ষণে।

আসিয়াছে সেই দিন—

দুর্দিনের দুঃসহ প্রহর,

দারুণ দুর্যোগময়ী ঘোরা নিশা অতি ভয়ংকর!

কোথা' তুমি বাসুদেব! হা কংসারি! সর্বদুঃখহারী!

এক বার এস তুমি—এ দুর্গতি সহিতে না পারি।

চূর্ণ করো বন্ধন শত বাধার বিন্ধ্যাচল,

পূর্ণ করো মুক্তির আলো সৃষ্টির সপ্ততল।

তোমার আশায় উন্মুখ আজি অতন্দ্র অনিমিখ,

মহাভারতের করিবে সূচনা ভরিয়া দিগ্বিদিক।

মহামানবতা ভিত্তিতে রাখি পৃথ্বীর বক্ষোপরে

বিঘ্ন-দানবে তীব্র আহবে বধিবে আপন করে।

আজি সেই দিন—

কালিন্দীর বীচি-বিক্ষোভে বাজিছে অস্ফুট সেই বীণ্।

বাজিছে আজিও মেঘের মন্দ্রে, বিদ্রোহী বাজের মুখে,

ক্রুদ্ধ বায়ুর কর-বিদলিত বনানীর বুকে বুকে।

জাগরে দেবতা! তড়িৎ-কান্তি করুক সমুজ্জ্বল

পুঞ্জিত ঘোর অন্ধ-তিমির-লেপিত পৃথ্বীতল।

ভোরের প্রভাতী মিছে হ'য়ে যায় শরতের শ্যামলিমা,

নীল-সবুজের প্রাণের দোলায় মুক্তির মধুরিমা।

মুছে যায় বুঝি ধরণীর হাসি মনের আনন্দ সব,

বুকভরা প্রীতি মধুময়ী গীতি বাধাহীন কলরব।

এস সখা! আজি সেই দুরদিন দুরন্ত বিষম,

অভয় ভৈরব রবে ঘোষ আর বার—

'পশ্য জাতোঽহম্'।

সব শঙ্কা হো'ক্ দূর

দুখ-নিশা হোক্ অবসান;

সর্বহারা প্রাণ ভ'রে

গা'ক্ তব আরতির গান।

শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীগোপালদেব বঙ্গদেশকে 'মাৎস্য ন্যায়ের' হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ইতিহাসে পাল-সাম্রাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালাদেশে সবিশেষ বিস্তার লাভ করে। উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলার সংঘারাম পালগণের বৌদ্ধধর্মানুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্তমান বিহারই উদ্দণ্ডপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পালগণের সময়ে বৌদ্ধধর্ম সুদূর তিব্বতে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। আচার্য ধর্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধ প্রচারক ভগবান তথাগতের বাণী প্রচার করিতে তথায় গমন করেন। তিব্বতীয় ধর্ম ও শিল্পের উপর বাঙ্গালীর প্রভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুমাত্রা দ্বীপে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত হন। ইঁহার পূর্ব নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে ইনি বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ওদন্তপুরীর মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীলরক্ষিত কর্তৃক ইনি দীক্ষিত হন। শীলরক্ষিত তাঁহাকে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন এবং বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত বহু পুস্তকের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাই এই বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদ্দেশে কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন—

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

বাঙ্গালীর ভাস্কর্য ও শিল্পকলার প্রভাব তিব্বতীয় বৌদ্ধ শিল্পের উপর বিস্তৃত হয়। যবদ্বীপের বোরোবুদুর ও কাম্বোজদেশের অঙ্কোর-ভাট মন্দির বাঙ্গালী স্থপতির অক্ষয় কীর্তি। পালযুগের বিখ্যাত বাঙ্গালী ধীমান্ ও বিট্‌পাল ছিলেন এই ভাস্কর্য-শিল্পের জনক। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে ধীমান্ আবির্ভূত হন। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—'এ দেশের ধীমান্ ও বীতপাল অর্ধ এশিয়ার চিত্রগুরু হইয়া শিল্পজগতে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন।' বোরোবুদুর সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

……কত যাত্রী কত কাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন,
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিত পুঞ্জ পাষাণের সঙ্গীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম—
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি—"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

*　　*　　*

…………পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে　　এ তীর্থ-দ্বারে
শুনিবারে

পাষাণের মৌন-কণ্ঠে যে বাণী রয়েছে চির স্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—"বুদ্ধের শরণ লইলাম"॥

অতঃপর সেনবংশের অভ্যুত্থানে এই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অবসান ঘটে। সেনবংশীয় রাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর অত্যাচার ও অবিচারের অভিযান সুরু হয়। এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময় 'পূর্ব-মীমাংসার' টীকাকার ভট্টপাদ কুমারিল এবং পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র বিরাজ করেন। তাঁহারা বজ্রনির্ঘোষে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকেন। অবশেষে বেদান্তকেশরী আচার্য শংকরের অদ্বৈত বেদান্তের প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের উপর যবনিকাপাত ঘটে। উপায়ান্তর না দেখিয়া বৌদ্ধগণ আর্যেতর ধর্মের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্বে আর্যগণের হস্তে পরাভূত অনার্যগণ নিজেদের সমাজ সংগঠন করিয়া আর্যসমাজের বহির্ভাগে বসবাস করিতে থাকে। বৈদিক সমাজের বহির্ভূত অনার্য-ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম সংমিশ্রিত হইলেও বৌদ্ধভিক্ষুগণ স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। বৌদ্ধ ও আর্যেতর ধর্ম সংমিশ্রিত হইয়া এক নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন—"বঙ্গদেশের বহুসংখ্যক ডোম, কাপালী ও হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যে 'ধর্ম্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি এবং এক প্রকার রূপান্তর। এই ধর্মের পুরোহিতগণও নিম্নশ্রেণীর।' এই ধর্মপূজার বিধান-সম্বলিত একখানা পুস্তক সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা 'শূন্য-পুরাণ' নামে অভিহিত। ইহার রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্বকালে বিরাজ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ধর্মপূজার পৌরোহিত্য করায় ইনি সমাজ-চ্যুত হন। ধর্মপূজার বিধানের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান 'তথাগতের' মহাপরিনির্বাণ লাভ হয়। ধর্মঠাকুরের গাজন সাধারণতঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্মঠাকুর বুদ্ধদেবের কল্পিত মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। হিন্দুধর্মে বৌদ্ধ বলিতে নাস্তিকতাকেই বুঝাইত। বোধ হয় সেই কারণে বৌদ্ধ-সম্প্রদায় স্বীয় সম্প্রদায়কে 'সদ্ধর্মী' বলিয়া পরিচয় দিত। শূন্যপুরাণে 'শ্রীনিরঞ্জন রুস্মা' শীর্ষক অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

বলিষ্ঠ হইয়া বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ বেয়াত্ম অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সবাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ॥

ধর্মঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদিত মন্ত্রের একটি চরণে দেখা যায়—ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিং। এই শূন্যমূর্তি বৌদ্ধধর্মের মহাযানপন্থার 'শূন্যবাদ'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নাগার্জুন 'শূন্যবাদ' প্রবর্তন করিয়া বৌদ্ধ জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' উক্ত পূজাপদ্ধতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। 'ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে'—বুদ্ধদেবকে ধর্মরাজ কল্পনা করিয়া বিলীয়মান বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার ইহা ক্ষীণ প্রচেষ্টা মাত্র। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য বিদ্যমান—ইহা সাধারণ্যে প্রচারকল্পে বলা হইয়াছে—'শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।' ধর্মপূজায় যে চূণ প্রদত্ত

হইয়া থাকে তাহা বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত। এ সম্বন্ধে রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলেন—"বৌদ্ধযুগের অবসানে গ্রাম্য দেবতারা আসর জম্‌কাইয়া বসিলেন। বৌদ্ধ জনসাধারণ নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত নামের দেবতা পূজা করিতেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি বহু কাব্যে এই সকল দেবতার উল্লেখ আছে, বুড়ি, বুড় মা, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি দেবতা এই শ্রেণীর। ইহাদের পূজা জনসাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে আর্যদেবতার এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান দিলেন এবং ইহাদের পূজার ভার নিজেরা গ্রহণ করিলেন। ডোম, কাপালিক, হাড়ি প্রভৃতি জাতীয় পুরোহিতের হাত হইতে পূজার মন্দিরের ভার ব্রাহ্মণেরা কাড়িয়া লইলেন, এখনও শীতলা পূজার পুরোহিত ডোম পণ্ডিতেরা। ....এই অদ্ভুতনামা দেবগণকে হিন্দু দেব-সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় করিবার জন্য তাহাদের নাম সংস্কৃতভাবাপন্ন করা হইল এবং তাহাদের সঙ্গে হিন্দু দেব-দেবতার নানারূপ সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইল। এই দেবতাদের পূজার মণ্ডপে যে সকল আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হইত, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাহাদের মধ্যে 'মঙ্গল গান' লোক-মনোরঞ্জনের জন্য বঙ্গভাষায় বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল।" ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধরাজা ও সিদ্ধাচার্যগণের মহিমা প্রচারকল্পে লিখিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবসানে এই সকল কাব্যে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন রচয়িতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে, ময়ূরভট্ট প্রভৃতির কথা পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—'ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্য-কবি।'

কবি ঘনরাম বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী। পিতার নাম গৌরীকান্ত ও মাতার নাম সীতাদেবী। 'শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে' কবি স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

'ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তাঁর সংসারে প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদাক্রান্ত॥'

মাতুলবংশের পরিচয়ও তিনি কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন—

'কৌকুসারী অবতংসে. কুশধ্বজ রাজবংশে,
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান্।
তাহার দুহিতা সীতা, সত্যবতী পতিব্রতা,
তাঁর সুত ঘনরাম গান॥ (২২শ সর্গ)

শৈশবে ঘনরাম অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। রামপুরের টোলের অধ্যাপক তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার উন্মেষণী প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন—'নিজগুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা-আধান।' বর্ধমানাধিপ মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আদেশে তিনি 'শ্রীধর্ম-মঙ্গল কাব্য' রচনা করেন—'অখিল বিখ্যাত কীর্তি, মহারাজ চক্রবর্তী, কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজ ঘনরাম রসগান।' স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মতে—'তিনি কবিকঙ্কণের পরবর্তী, এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্তী কবি।' কবিকঙ্কণ অনুমান খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরামের অনন্যসাধারণ সারস্বত প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বসু বলিয়াছেন—'মহাভারত,

রামায়ণ, অনুবাদমাত্র, —কিন্তু শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষাভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে, —বাস্তব-ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। এ কাব্য ঐতিহাসিক, তবে কবি-কল্পনায় ইতিহাস কাব্য-রসে পরিণত হইয়াছে। ....বঙ্গের অপর কোন কাব্যে যে দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে। অশ্বে আরোহণ করিয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীররমণীর ধনুর্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন—কোন্ কাব্যে এ নয়নমনোহর দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে পরপুরুষের মন ভুলায়, সাধু পুরুষ কিরূপে কুলটার মায়াফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিত নবযুবতী মনে মনে আজন্ম-পূজিত মনোমত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে না, অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পরপুরুষের পানে মন টলে না, এ সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে। ....যেমন গ্রীক ভাষায় হোমর, লাটিন ভাষায় বার্জ্জিল, —সেইরূপ বঙ্গভাষায় ঘনরাম।'

কবি ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল চব্বিশ সর্গে সমাপ্ত। প্রথম সর্গ—স্থাপনপালা; দ্বিতীয় সর্গ—ঢেকুর পালা; তৃতীয় সর্গ—রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা; চতুর্থ সর্গ—হরিশ্চন্দ্র পালা; পঞ্চম সর্গ—শালেভর পালা; ষষ্ঠ সর্গ—লাউ-সেনের জন্মপালা; সপ্তম সর্গ—আখড়া পালা; অষ্টম সর্গ—ফলা নির্মাণ পালা; নবম সর্গ—গৌড় যাত্রা পালা; দশম সর্গ—কামদল বধ পালা; একাদশ সর্গ—জামতি পালা; দ্বাদশ সর্গ—গোলাহাট পালা; ত্রয়োদশ সর্গ—হস্তিবধ পালা; চতুর্দশ সর্গ—কাঙুর যাত্রা পালা; পঞ্চদশ সর্গ—কাম্বরূপ যুদ্ধ; ষোড়শ সর্গ—কানড়ার স্বয়ম্বর; সপ্তদশ সর্গ—কানড়ার বিবাহ; অষ্টাদশ সর্গ—মায়ামুণ্ড পালা; ঊনবিংশ সর্গ—ইছাই বধ পালা; বিংশতি সর্গ—বাদল পালা; একবিংশ সর্গ—পশ্চিম উদয় আরম্ভ; দ্বাবিংশ সর্গ—জাগরণ পালা; ত্রয়োবিংশতি সর্গ—পশ্চিম-উদয় পালা; চতুর্বিংশ সর্গ—স্বর্গারোহণ পালা।

ধর্ম্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু এইরূপ—মহারাজ ধর্ম্মপালের বীর্যবান পুত্র রাজা গৌড়েশ্বর। প্রধান মন্ত্রী মহামদ। কলির অংশে মহামদের জন্ম। মহামদের ভগ্নীর নাম রঞ্জাবতী। পূর্বজন্মে রঞ্জাবতী ইন্দ্রের অপ্সরা ছিলেন,—তখন তাঁহার নাম ছিল অম্বুবতী। কলিযুগে মর্তে ধর্ম্মপূজার মহিমা প্রচারকল্পে ভগবতী অম্বুবতীকে অভিশাপ প্রদান করেন—

জন্ম নিতে যাও গৌড় রমতি নগর।
ধাম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর॥
জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।
সে হবে তোমার ভাই, কর্ণসেন পতি॥
বেণুরায় পিতা তোর জননী মন্থরা।
শুনিতে শুনিতে তনু ত্যজিল অপ্সরা॥—(১ম সর্গ)

একদা গৌড়েশ্বর হস্তিপৃষ্ঠে শীকারে বহির্গত হন। পথে বিশ্বস্ত প্রজা সোমঘোষকে কারারুদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, রাজকর না দেওয়ার দরুন তিনি মন্ত্রী মহামদ কর্তৃক বন্দিজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কর্ণসেন রায় তখন ত্রিষষ্ঠির গড়ের সামন্তরাজ। সোমঘোষকে তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কর্ণসেনের উপর আধিপত্য প্রদান করিলেন। শিশুপুত্র ইছাই ঘোষকে সাথে লইয়া ত্রিষষ্ঠির গড়ে উপনীত হইলে রাজনির্দেশনামা দৃষ্টে কর্ণসেন সোমঘোষকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। এদিকে 'কোপে তাপে মহাপাত্র মুচড়ায় দাড়ি।'

ত্রিষষ্ঠির গড়ে ইছাই ঘোষ ক্রমশঃ প্রবল

হইয়া উঠিলেন। তিনি বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ইছাই ঘোষ মা ভবানীর একজন পরম ভক্ত ছিলেন। ভবানীর বরে তিনি অজেয় হইলেন। তিনি কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং ত্রিষষ্ঠির গড়ের মালিক হইলেন। গড়ের নতুন নামকরণ হইল—অজয় ঢেকুর। সেখানে মহামায়ার কনকপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবী স্বয়ং গড়ের রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন বলিয়া ইছাইকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। দেবীর বরে অজয় ঢেকুর অভেদ্য দুর্গে পরিণত হইল। ইছাই জাতিধর্মনির্বি-শেষে সকলের বসবাসের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভবানী মায়ের মূর্ত্তি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত নিত্য পূজিত হইতে লাগিল।

এদিকে বিতাড়িত কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের নিকট ইছাই ঘোষের কাহিনী সবিস্তারে নিবেদন করিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য ভট্ট গঙ্গাধর রায় ঢেকুর প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি ভীষণ ভাবে লাঞ্ছিত ও অপ-মানিত হইয়া ভগ্নমনোরথে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহাতে অপমানে ক্ষিপ্ত গৌড়েশ্বর অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ইছাইকে দমন করিতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু দৈববল এবং লোহাটা কোটালের বাহুবিক্রমে গৌড়েশ্বর ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন। কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইল, পুত্রবধূরা অনুমৃতা হইল এবং শোকে মুহ্যমান রাণী বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। শোকে দুঃখে কর্ণসেন পাগলের ন্যায় হইলেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যে বীতরাগ কর্ণসেনকে পুনরায় সংসার-ধর্ম পালনের জন্য গৌড়েশ্বর উপদেশ দিলেন। তিনি স্বীয় শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। মন্ত্রী মহামদ বৃদ্ধ কর্ণ-সেনের সহিত রঞ্জার বিবাহ দিতে অসম্মত হইতে পারেন বিবেচনা করিয়া গৌড়েশ্বর এবং মহারাণী ভানুমতী গোপনে যুক্তি করিয়া কাঙুর ভূপালকে দমনের জন্য তাঁহাকে কামরূপ প্রেরণ করিলেন। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে মহাসমারোহে বৈদিক মতে রঞ্জাবতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল—

বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে॥—(৩য় সর্গ)

পরিণাম চিন্তা করিয়া গৌড়েশ্বর সস্ত্রীক কর্ণ-সেনকে ময়নানগরে প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে উক্ত জনপদের সামন্তরাজ নিযুক্ত করিলেন। মহামদ সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা বেণু-রায়কে সম্বোধন করিয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥
—(৩য় সর্গ)

অনেক দিন পর রঞ্জাবতী মাতাপিতা ও ভ্রাতার সংবাদ জানিবার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করিয়া স্বামীকে গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজসভায় মহামদ কর্ণসেনকে চরম অপমান করিলেন—

যার মুখ হেরিলে অশেষ পুণ্য হরে।
তারে তুমি সম্মুখে বসাও সমাদরে॥
বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আঁটকুড়া।
এজনে আদর এত নৃপতির চূড়া॥—(৩য় সর্গ)।

ভ্রাতার আচরণে ক্ষুব্ধা রঞ্জাবতী পুত্রার্থে বহু ব্রত উপবাস করিলেন, কিন্তু অভীষ্টলাভে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে রামাই পণ্ডিতের উপদেশক্রমে তিনি ধর্মঠাকুরের কৃপাকণা লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামীর অনুমতিক্রমে রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ধর্মঠাকুর রঞ্জার অপার্থিব আরাধনায় সবিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার প্রাণ

দান করিলেন। অধিকন্তু মহাদেবীর অভিলষিত বর প্রদান করিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন।—

নারিকেল গর্ভধান, লাউসেন অভিধান,
থোবে পুত্র হইলে ভূমিষ্ঠ।
রাণী কন কৃতাঞ্জলি, সরম খাইয়ে বলি,
বৃদ্ধপতি আমার অদৃষ্ট॥
ঠাকুর কহেন তবে, বাসরে বসিবে যবে,
তুমি মোরে করিবে স্মরণ।
মদনে পাঠাব কয়ে, রাজার শরীরে যেয়ে,
সাধিবে তোমার প্রয়োজন॥

—(৫ম সর্গ)।

যথাসময়ে কর্ণসেনের ঔরসে রঞ্জার গর্ভে সর্বসুলক্ষণ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ধর্মঠাকুরের নির্দেশক্রমে পুত্রের নাম লাউসেন রাখা হইল। এ সংবাদে গৌড়েশ্বর ও তত্রত্য জনপদবাসী আনন্দে আত্মহারা হইল। কিন্তু কংস-মাতুল মহামদ অত্যন্ত অস্থির হইলেন এবং লাউসেনকে হরণ করিয়া আনিতে ইন্দ্রজাল নামক এক ব্যক্তিকে ময়নানগরে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রজাল কালিন্দীর তটে বালুকা দ্বারা কালিকামূর্তি নির্মাণ করিয়া আগমপুরাণ মতে দেবীর আরাধনা করিল। স্তবে তুষ্ট দেবী ইন্দ্রজালকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন। বরপ্রভাবে ইন্দ্রজাল সূতিকাগার হইতে লাউসেনকে অপহরণ করিল। ধর্মঠাকুরের আদেশে বীর পবননন্দন হনুমান ইন্দ্রজালের কবল হইতে লাউসেনকে উদ্ধার করিলেন। রাণী রঞ্জাবতী 'সবে ধন নীলমণি' পুত্রকে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। দৈবজ্ঞবেশী হনুমান প্রথমতঃ ধর্মঠাকুরের মানস-পুত্র কর্পূরসেনকে রঞ্জার কোলে অর্পণ করিলেন। পরে রাণীর ব্যাকুলতা দেখিয়া লাউসেনকেও প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় দুই ভাই রঞ্জার স্নেহে দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

লাউসেন ও কর্পূরসেন যথাকালে নানা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিলেন। ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান উভয় ভ্রাতাকে মল্লবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী করিয়া তুলিলেন। এক দিন মহামায়া বারবনিতার বেশে লাউসেনের চিত্তবিকার ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইলেন। জিতেন্দ্রিয় আদর্শ-ভক্ত লাউসেন মহামায়ার মোহজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলে দেবী পরম প্রীত হইয়া তাঁহার প্রার্থনামতে 'অরিজয়ী অক্ষয় হাতের' খড়্গ প্রদান করিলেন।

গৌড়েশ্বরকে স্বীয় অস্ত্রপরীক্ষায় তুষ্ট করিতে লাউসেন গৌড় যাত্রার আয়োজন করিলেন। রঞ্জাবতী কিছুতেই পুত্রকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে ভ্রাতার শরণাপন্ন হইলেন। শয়তান মহামদ যমদূত-সদৃশ শারঙ্গধর প্রভৃতি পাঁচ জন মল্লকে লাউসেনের হত্যাকার্যে নিয়োগ করিলেন। হনুমানের প্রসাদে লাউসেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিপন্মুক্ত হইলেন। অবশেষে ময়নানগর অন্ধকার করিয়া মাতা-পিতার সম্মতি নিয়া দুই ভাই গৌড়যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জলন্দার গড়ের 'ভূপতি-শার্দূল কামদল' লাউসেন হস্তে নিহত হইল। পূর্বে সুরলোকে নট শ্রীধর তাণ্ডবনৃত্যের তাল ভঙ্গ করায় ভগবতীর অভিশাপে ব্যাঘ্র-রূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করে। 'তারাদীঘী-তীরে' জল অন্বেষণে গিয়া ভীষণাকার কুম্ভীর বধ করিয়া তাঁহারা জামতি নগরে উপনীত হইলেন। এখানে শিবদত্ত বারুইয়ের স্ত্রী নয়ানী লাসবেশে লাউসেনের প্রণয়ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থ হইল। হতাশ প্রেমিকা নয়ানী লাউসেনের সর্বনাশকল্পে আপন পুত্রকে কূপজলে নিক্ষেপ করিয়া রাজ-

দ্বারে তাঁহার বিরুদ্ধে শিশু-হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিল। ধর্মঠাকুরের মহিমায় নয়ানীর মৃতপুত্রের মুখ দিয়া সত্য ঘটনা প্রকাশ করাইয়া লাউসেন সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন।

গোলাহাট নারীরাজ্যের অধীশ্বরী নর্তকী-কুলেশ্বরী সুরিক্ষা লাসবেশে বিলোল কটাক্ষ হানিয়া লাউসেনের চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। লাউসেন তাহার সকল হেঁয়ালীর উত্তর প্রদান করিলে রূপজীবিনী তাঁহাকে রতিশাস্ত্র-সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন করিল—'কোনখানে বৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গে।' লাউসেন উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইলে—'ছকুড়ি নাগরে নটী কহে আঁখি ঠারে। পঘুতা করিয়া বেন্ধে রাখ কারাগারে।' অবশেষে হনুমানের সাহায্যে লাউসেন এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিলেন—'ধাতুর নিবাস নিত্য নারীর নয়ান।' পণে বদ্ধা সুরিক্ষার নাসিকা ও নয়নদ্বয় কর্তন করিয়া বিজয়গর্বে লাউসেন গোলাহাট পরিত্যাগ করিলেন।

অবশেষে লাউসেন গৌড়ে উপনীত হইলেন। মহামদের চক্রান্তে রাজার পাট-হস্তী অপহরণের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ধর্ম-ঠাকুরের অনুগ্রহে লাউসেন দ্বৈরথ সমরে মদমত্ত মাতঙ্গ বধ করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্মের মহিমা প্রচারমানসে রাজাদেশে মৃত হস্তীর প্রাণদান করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। লাউসেনের পরিচয় এবং তাঁহার অপূর্ব্ব বীরগাথা শুনিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে অশেষ পুরস্কার দিলেন এবং দক্ষিণ ময়নানগরের আধিপত্য প্রদান করিলেন। অধিকন্তু গৌড়েশ্বর অশ্বশালা হইতে মনোমত বাজী গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। হনুমানের উপদেশে তিনি সূর্যদেবের 'রণ্ডীর-পাথর' নামক পক্ষীরাজ ঘোড়া গ্রহণ করিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে কালু ডোম, তাহার স্ত্রী লখ্যা এবং তাহাদের স্বজাতিবর্গকে তিনি সাথে লইলেন। লাউসেনের প্রত্যাবর্তনে ময়নানগরে আবার আনন্দের হাট বসিল। কর্ণসেন লাউসেনের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলে তিনি কর্পূরসেনকে প্রধান মন্ত্রী এবং কালুকে শহর-কোটাল নিযুক্ত করিলেন।

আমি

শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষ, এম-এ

বাহির পানেতে নয়ন-ফিরায়ে
দেখি আমি বারে বারে,
সরস বরষা ঝরে ঝরে পড়ে
ঝুম্ ঝুম্ ঝঙ্কারে।
তারি সুর লাগে গোপন মনের—
মাধুরী-মিশান তারে;
তারি মাঝে আমি ফিরে পাই যেন
আনন্দে আপনারে।
মোর বাণীরূপ আনন্দরূপে
সুরের মাঝারে জাগে;
তারি মাঝে হেরি নিজের স্বরূপ
প্রকৃতির নব রাগে।

অগ্নিকাণ্ড-নিবারণের উপায়

ডাঃ ট্রেভর আই উইলিয়াম্‌স্‌

অনিয়ন্ত্রিত অগ্নি মানুষের অন্যতম প্রধান শত্রু। অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতিবৎসর বিপুল ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় এবং বহু লোকের জীবন-হানি ঘটে। এ ছাড়া, অগ্নিকাণ্ডের পরোক্ষ ফল হিসাবে গুরুতর ব্যবসায়ের ক্ষতি, বহুলোকের কর্মচ্যুতি ইত্যাদিও ঘটে থাকে।

সুতরাং অগ্নি নিবারণ ও নির্বাপন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হওয়া উচিত সে কথা বলাই বাহুল্য। বৃটেনে সে চেষ্টার ত্রুটি নেই এবং চেষ্টার ফলে যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করা গিয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের পিছনে যে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত পরিশ্রম বর্তমান সে সম্বন্ধে জনসাধারণ বিশেষ সংবাদ রাখে না। অগ্নি নিবারণ ও নির্বাপন কার্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য।

অগ্নি গবেষণা বোর্ডের প্রথম বৎসরের কার্যাবলীর বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বৃটেনে অগ্নিকাণ্ড নিবারণ ব্যবস্থাগুলি সম্প্রতি কিরূপ উন্নতিলাভ করেছে আলোচ্য বিবরণীতে তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গত মহাযুদ্ধকালে অগ্নিবোমা-আক্রমণ-জনিত ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড নিবারণকল্পে যে গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল শান্তিকালেও তা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণাগারের বিশেষজ্ঞগণের সহ-যোগিতায় যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

নূতন শিরস্ত্রাণ

যুদ্ধপূর্ব কয়েক বৎসরের মধ্যে ফায়ারম্যানদের শিরস্ত্রাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি; হয়ত এরূপ ভাবা হয়েছিল যে উৎকৃষ্টতর শিরস্ত্রাণ নির্মাণ সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রয়ো-জনের তাগিদে কাচতন্তুর সাহায্যে একপ্রকার বিশেষ উন্নত ধরনের শিরস্ত্রাণ নির্মাণ করা হয়। এই শিরস্ত্রাণের ওজন মাত্র দু'পাউণ্ড হলেও ১২ ফুট ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত ১৪ পাউণ্ড ওজনের প্রস্তরখণ্ডের আঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি এর আছে।

সিকি ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের পাতের ধার দিয়ে সজোরে আঘাত করলেও এই শিরস্ত্রাণের ওপর কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় না। এই নূতন শিরস্ত্রাণ তড়িৎ আঘাত প্রতিরোধক। সিক্ত অবস্থাতেও ১০,০০০ ভোল্ট শক্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এর আছে।

ধূম্র অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর পরম শত্রু। ধূম্রজালে তাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ এবং অনেক সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র ব্যবহারে শ্বাসরোধের আশংকা দূর করা যায় বটে, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ধূম্রজাল পরিষ্কারের কোন কার্যকর উপায় জানা ছিল না। গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা সামান্য পরিমাণ মাত্র জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে স্প্রে করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধূম্র পরিষ্কৃত হয়।

অগ্নিনির্বাপণ-কার্যে অবলোহিত রশ্মির (infra-red rays) ব্যবহার করা যায় কি না সে

সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে। সাধারণ আলোক-রশ্মি অপেক্ষা এই রশ্মির ধূম্রজাল ভেদ করার শক্তি অনেক অধিক।

তৈলাধারে অগ্নিকাণ্ড

তৈলাধারগুলিতে প্রায়ই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেই অগ্নিনির্বাপনের বর্তমান ব্যবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নয়। জ্বলন্ত তৈল বা পেট্রোলের আধারে ঠিক কি ধরনের পরিবর্তন হয় তা জানবার জন্য অগ্নি গবেষণা বোর্ডের বৈজ্ঞানিকগণ বিশদ গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে পরিশুদ্ধ তৈলের আধারে উপরিভাগে অগ্নির তাণ্ডব চললেও ভিতরের সমস্ত তৈল শীতল থাকে।

অবিশুদ্ধ তৈল, অপরিশুদ্ধ পেট্রোল ইত্যাদির মধ্যে একটি উত্তপ্ত 'এলাকার' সৃষ্টি হয়। অগ্নি জ্বলতে থাকলে এই 'এলাকা' নিম্নদিকে, তৈলাধারের গভীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এই বিপজ্জনক 'এলাকাটি' ক্রমশঃ আধারের তলদেশস্থ জলের সংস্পর্শে আসে, সেই জলকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত করে এবং ফলে সমস্ত তৈল ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকে।

এই কারণেই তৈলাধারের অগ্নি নির্বাপন করতে জল ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে প্রজ্বলিত তৈলাধারের তৈল আলোড়িত করে দিলে অগ্নি অনেকটা আয়ত্তে আসে। আলোড়নের ফলে উত্তপ্ত এলাকাটি নিম্নস্থ শীতল তৈলের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে পড়ে এবং এই উপায়ে অগ্নি সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত করাও সম্ভব হতে পারে।

গবেষণাগারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মেথিল ব্রোমাইড, কার্বন টেট্রো ক্লোরাইড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বাষ্পের কার্যকারিতা সম্পর্কেও নানারূপ পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে যে এই বাষ্পগুলি অগ্নি থেকে অক্সিজেন বাষ্পকে দূরে রেখেই যে অগ্নিনির্বাপনে সাহায্য করে তা নয়; যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে অগ্নির সৃষ্টি হয়, তার ওপরও প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

স্বয়ংসম্ভূত অগ্নিকাণ্ড

স্বয়ংসম্ভূত অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধেও বিশেষভাবে গবেষণা করা হচ্ছে। কোন কোন অজ্ঞাত কারণে কয়লা, তৈলবীজ, খড়, তুলা প্রভৃতির স্তূপের মধ্যে অনেক সময় আপনা আপনিই অগ্নির সৃষ্টি হয়। একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এই যে জীবাণুদের আক্রমণে এগুলির মধ্যে এক প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং ফলে তাপবৃদ্ধি ঘটে, বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এই তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। স্বয়ংসম্ভূত অগ্নিকাণ্ডের কোন নিশ্চিত কারণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বটে কিন্তু গবেষণার ফলে উপরোক্ত বস্তুগুলি গুদামজাত করার উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে যার ফলে অগ্নিকাণ্ড-ভীতি বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

গবেষণার ফলে এক প্রকার নূতন ধরনের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। যন্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়। কোন গৃহের তাপ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই এই যন্ত্রের কাজ সুরু হয়ে যায়। অগ্নিনিরোধক ইস্পাতের কাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে অগ্নিবিস্তারের হার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও নানা প্রকার পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য অগ্নি গবেষণা বোর্ডের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ স্থাপিত হয়েছে। বৃটেনে অগ্নিকাণ্ডের সাধারণ তিনটি কারণ হল— অপরিষ্কৃত চিমনী, শিশুদের দেশলাই নিয়ে খেলা এবং ধূমপায়ীদের অসতর্কতা। অগ্নিনির্বাপনব্যবস্থার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের কারণগুলি দূর করার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা ও প্রচারকার্য করা হচ্ছে।

* নিউ দিল্লী ব্রিটীশ ইনফরমেশন্ সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত। —উঃ সঃ

ডলারসমস্যা ও মুদ্রামূল্য-হ্রাস

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম্-এ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ডলারের দুর্ভিক্ষ সারা জগতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই তা অবগত আছেন। কোন দেশ থেকে জিনিষ আমদানি করলে সেই দেশের মুদ্রায় পাওনা মেটাতে হয়, সুতরাং পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জনের চেষ্টা এইজন্য করতে হবে।

গত মহাযুদ্ধে এক দিকে আমেরিকার উৎপাদন-শক্তির অভাবনীয় উন্নতি তেমনি অন্য সমস্ত দেশের গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় হওয়ায় মার্কিন পণ্যদ্রব্যের চাহিদা যুদ্ধোত্তর কালে অসম্ভব বৃদ্ধিলাভ করেছে, অথচ অন্য দেশের আমেরিকাতে রপ্তানির শক্তি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে আমদানি, রপ্তানির চেয়ে বেশী হওয়ার দরুনই ডলারের ঘাটতির উদ্ভব হয়েছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও অবশ্য বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানির উদ্বৃত্ত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন দেশের হাতে তখন যথেষ্ট সোনা মজুদ থাকায় সেই ঘাটতি মেটাতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি এবং ডলার-সমস্যাও নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পায় নি। তাদের সোনার পুঁজি অবশ্য এই ভাবে ক্রমে নিঃশেষিত হচ্ছিল, যে টুকু বাকী ছিল তার অধিকাংশই যুদ্ধে আমেরিকা থেকে মাল ক্রয়ের জন্য খরচ করতে হয়েছে। তাই যুদ্ধের পরে যখন ঘাটতির পরিমাণ বহু গুণ বেড়ে গেল অথচ সোনার ভাণ্ডার প্রায় খালি তখন সমস্যা ঢাকবার আর কোন উপায়ই থাকল না। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে অন্য সব দেশের মোট ঘাটতির পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ৭১৩ মিলিয়াম ডলার থেকে ১৯৪৭এ ১১২৭৬ মিলিয়ানে [১] দাঁড়ায়, অথচ এই বৎসরে জগতের সোনার পুঁজির ২/৩ অংশই যুক্তরাষ্ট্রে সঞ্চিত হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের দরুনই বিভিন্ন দেশের আমদানি ও রপ্তানির এই বিরাট অসাম্য দেখা দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই অসাম্য দুরীভূত হবে, এই বিশ্বাসে আমেরিকা এই সব দেশকে ঋণ এবং সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে। ১৯৪৬ সালে অত্যন্ত সুবিধাজনক সর্ত্তে ব্রিটেনকে তিন 'বিলিয়ানের' [২] ওপর ডলার ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। পরের বছর মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য অকৃপণ ভাবে বাৎসরিক ডলার-সাহায্য করার ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়। অবস্থার উন্নতির কিন্তু কোন লক্ষণই নেই বরং দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে দেখে আমেরিকার টনক নড়ল, কারণ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, তাও ক্রমবর্দ্ধমান হারে, সাহায্য করার মহান্ ব্রত গ্রহণ করার ইচ্ছা আমেরিকার বিশেষ নেই।

১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত, সাড়ে তিন বৎসরে ষ্টার্লিং অঞ্চলের (Sterling Area) অন্তর্গত দেশগুলির ডলার ঘাটতির পরিমাণ হয়েছিল উনিশ শ' বার মিলিয়াম পাউণ্ড। তার মধ্যে ১৫২৭ মিলিয়ান আমেরিকা ও কানাডা প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে, ৮০ মিলিয়ান সাউথ

১ আমেরিকায় মিলিয়ান = দশলক্ষ; ২ বিলিয়ান = এক হাজার মিলিয়ান।

আফ্রিকার দত্ত ঋণের দ্বারা এবং ১০০ মিলিয়ান আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ভাণ্ডার থেকে গৃহীত ঋণের দ্বারা মেটান হয়। বাকীটা মেটাতে গিয়ে লণ্ডনে মজুদ অকিঞ্চিৎকর সোনার পুঁজি থেকে ২০৫ মিলিয়ান খোয়াতে হয়েছে। এভাবে আর কতদিন চলে? শীঘ্রই সকলে বুঝতে পারলেন যে অন্য দেশের, বিশেষ করে ব্রিটেনের যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি ক্রমে বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাবার একটা প্রধান কারণ দামের তারতম্য। আমেরিকার তুলনায় ব্রিটেনে জিনিষের দাম বেশী হওয়ায় স্বভাবতই আমেরিকানরা বিলাতী পণ্য কিনতে নারাজ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ জিনিষপত্রের দাম পড়ে যাওয়ায়—(এটা মন্দার পূর্ব্বাভাস কিনা সে নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে)—এই দামের তারতম্য বেড়ে গিয়েছে এবং বাইরের জিনিষের চাহিদা আরও কমে গিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাড়াতে হলে দাম কমাতে হবে এই উপদেশ চার দিক থেকেই আসতে লাগল। কিন্তু উৎপাদনখরচ না কমিয়ে তো আর দাম কমান যায় না এবং উৎপাদনখরচ কমাতে হলে শ্রমিকের মজুরি এবং করের হার হ্রাস করতে হয়, অথচ এর কোনটাই সহজ-সাধ্য নয়, বিশেষ করে জনকল্যাণব্রতধারী মজদুররাজের পক্ষে। দেশে জিনিষের দাম না কমিয়েও বিদেশের বাজারে রপ্তানি মাল সস্তা দরে বিক্রয় করার উপায় হল অন্য মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়ের হার (rate of exchange) হ্রাস করা এবং ব্রিটেনকে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। এক পাউণ্ডের ডলারে মূল্য ৪ ডলার ৩ সেণ্ট থেকে কমিয়ে ২ ডলার ৮০ সেণ্ট করা হয়েছে। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Colin Clark কিছুদিন পূর্ব্বে সমস্ত কিছু বিবেচনা করে ২ ডলার ৫০ সেণ্ট পাউণ্ডের মূল্য হওয়ার যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সুতরাং বিনিময়-হার বড় বেশী কমান হয়েছে একথা ঠিক নয়)। বিলেতে জিনিষের দাম অপরিবর্ত্তিত থাকলেও বিনিময়-হারের এই পরিবর্ত্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বিলিতী পণ্য সস্তা হয়ে যাবে। আগে ৪ ডলার দিয়ে এক পাউণ্ডের জিনিষ কিনতে হোত, এখন দু'ডলার আশি সেণ্ট দিলেই হবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।

কিন্তু তেমনি আবার ডলারের দাম বাড়ার ফলে আমেরিকার জিনিষের দাম ইংলণ্ডে বেড়ে যাবে। বর্ত্তমানে ব্রিটেনকে খাদ্যদ্রব্য থেকে আরম্ভ করে উৎপাদনের কাঁচা মাল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ ডলার-অঞ্চল, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে আমদানি করতে হয় এবং এ সমস্ত জিনিষের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়-বৃদ্ধিহেতু অন্য সব জিনিষেরও দাম বাড়া স্বাভাবিক। পৌনে দু'পাউণ্ড রুটীর দাম ৪½ পেঃ থেকে বাড়িয়ে ৫½ পেঃ করার কথা অবশ্য ক্রীপস্ সাহেব (Sir Stafford Cripps) পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের ঘোষণার সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন এবং এর দরুন শ্রমিকদের তরফ থেকে বেতন-বৃদ্ধির দাবী যাতে উত্থাপিত না হয় তার আবেদনও করেছেন। কিন্তু রুটী ছাড়া অন্য কোন জিনিষের দাম বাড়ার কোন কারণ নেই বলে যে আশ্বাস তিনি দিয়েছেন সেটা স্তোকবাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতোমধ্যেই তামা প্রতি টন ১০৭½ পাউণ্ড থেকে ১৪০ পাউণ্ড হয়েছে, সীসা ৮৭¼ পাঃ থেকে ১২২ পাঃ, দস্তা ৬৩½ পাঃ থেকে ৮৭½ পাউণ্ড। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দাম তো বিশেষ রকম বেড়েইছে। তুলার দামও পাউণ্ডে (lb) ৪½ পেঃ বেড়েছে। এই রূপে বিলেতে সাধারণ ভাবে সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধি হলে পাউণ্ডের (£) বৈদেশিক মূল্য

হ্রাসের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর পাউণ্ডের মূল্য-হ্রাস সত্ত্বেও ব্রিটেনে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ বাড়েনি এই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যাঁরা মূল্য-বৃদ্ধির আশঙ্কা অমূলক মনে করেন তাঁরা ভুলে যান যে সেটা ছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় (Great Depression)। তখন বিদেশে জিনিষের দাম নেবে যাচ্ছিল বলে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও বিদেশী জিনিষের দাম বিলেতের বাজারে বেশী বাড়ে নি এবং সাধারণ কোন মূল্যবৃদ্ধি হয় নি। বলা বাহুল্য এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রপ্তানির ওপর মুদ্রামূল্যহ্রাসের আশানুরূপ ফল হ'তে হ'লে আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ অত্যাবশ্যক এবং এর জন্য দরকার রাষ্ট্রের ব্যয়সঙ্কোচ, শ্রমিকদের মজুরি এবং শিল্পপতিদের লাভনিয়ন্ত্রণ। ইতোমধ্যেই লাভ-করের হার ২৫% থেকে ৩০% করা হয়েছে যাতে শ্রমিকদের মজুরিনিয়ন্ত্রণের সময় পক্ষপাতিত্বের কথা না ওঠে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনীয়তাই সব চেয়ে বেশী এবং সব চেয়ে কঠিনও। সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারার বাহক হয়ে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সঙ্কোচ করা শ্রমিক সরকারের পক্ষে আদৌ প্রীতিকর নয়। এই ব্যয়সঙ্কোচ করতে গেলে তাঁদের জনহিতকর অনেক কাজই ছাঁটাই করতে হবে, এবং এটা এড়ানোর জন্যই জিনিষপত্রের দাম না কমিয়ে বিনিময়-হার কমিয়ে রপ্তানি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। রপ্তানির প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ষ্টার্লিং অঞ্চলের প্রায় সব দেশের মুদ্রার মূল্যই পাউণ্ডের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবে হ্রাস করায় আমেরিকার বাজারে রপ্তানিই এখন ব্রিটেনের বেশী লাভজনক হবে। ফলে বিলিতি মালের রপ্তানি ষ্টার্লিং-অঞ্চলে কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ানোর সম্ভাবনা দেখা দেবে। বিলেতের ব্যবসায়ি-মহলে এ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে, কারণ ষ্টার্লিং-অঞ্চলই তাদের পণ্যের প্রধান খরিদ্দার, সেই বাজার নষ্ট হয়ে গেলে ভবিষ্যতের দিক থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অবশ্য যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহলে এ সমস্যা থাকবে না কারণ ডলারমূল্য বৃদ্ধির দরুন মার্কিন পণ্যের দাম বেড়েছে, সুতরাং ষ্টার্লিং-অঞ্চলে মার্কিন জিনিষের তুলনায় বিলিতি জিনিষের চাহিদা অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধিই তো শক্ত সমস্যা! দেখা যাচ্ছে ব্যয়সঙ্কোচ, উৎপাদনবৃদ্ধি প্রভৃতি যে সমস্ত কঠিন সমস্যা পরিহার করার জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাউণ্ডের বিনিময়-হারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তার একটিও বিদায় নেয়নি। সদর দরজা দিয়ে না ঢুকতে পেরে পেছন দরজা দিয়ে অন্দর-মহলে হাজির হয়েছে মাত্র।

ভারতের ডলারসমস্যা অতি অল্পদিনের এবং উপেক্ষণীয় না হলেও ইয়োরোপ, বিশেষতঃ ব্রিটেনের মত গুরুতর অবশ্যই নয়। ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্য্যন্ততো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদেরই উদ্বৃত্ত থাকত। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রথম আমাদের ১৫ কোটী টাকার ঘাটতি দেখা দেয়। পরবর্ত্তী বৎসর-গুলিতে অবশ্য এই ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে এই ঘাটতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে আমাদের দেশের বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতির, কারণ প্রভূত খাদ্যশস্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করার প্রয়োজন হওয়ায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। খাদ্যশস্যের আমদানি

বাদ দিলে ১৯৪৮ সালেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যে আমাদের ৩৩·৮ মিলিয়ান ডলার উদ্বৃত্ত ছিল।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে টাকার মূল্য হ্রাস করার কি প্রয়োজন ছিল? ভারত সরকারের ঘোষণায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়েছে ষ্টার্লিং-অঞ্চলের বাজারে আমাদের রপ্তানি বজায় রাখবার জন্য, আমেরিকায় রপ্তানি-বৃদ্ধির জন্য তত নয়। আমেরিকাতে আমরা যে সব জিনিষ রপ্তানি করি তাদের উৎপাদন প্রসারণশীল নয় বলে টাকার মূল্যহ্রাসের দরুন তাদের চাহিদা বাড়লেও রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব নয় এবং রপ্তানির পরিমাণ যদি না বাড়ে তাহলে বিনিময়-হার কমিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব, কারণ সেই রপ্তানি থেকে আগের চেয়ে আমরা কম ডলার পাব। এই জন্যই সম্প্রতি পাটের তৈরী জিনিষের ওপর রপ্তানি কর টন প্রতি ৮০৲ থেকে ৩৫০৲ করা হয়েছে, যাতে দাম বেশী হওয়ায় টাকার মূল্যহ্রাসের দরুন লোকসান নিবারিত হয়। অবশ্য করবৃদ্ধি সত্ত্বেও পাটের জিনিষের দর আমেরিকার বাজারে আগের চেয়ে কম হবে, কারণ টাকার মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে চটের দাম ততটা বাড়বে না। প্রথমটা এটা হেঁয়ালীর মত মনে হবে, কারণ টাকার মূল্য কমেছে মাত্র ৩০% আর কর বাড়ছে ৩৫০%। কিন্তু এক টন চটের দামের এত নগণ্য অংশ করের পরিমাণ যে তার হার তিন চার গুণ বাড়লেও মোট দাম সামান্যই বাড়বে। টাকার মূল্য আমরা হ্রাস করেছি যাতে ষ্টার্লিং অঞ্চলের অন্য দেশ মুদ্রামূল্যহ্রাসের দরুন এই অঞ্চলে রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের তুলনায় অন্যায় সুবিধালাভ না করতে পারে। আমরা যদি পাকিস্তানের মত একটা "নিজস্ব" কিছু করার উৎসাহে অন্য দেশের সঙ্গে তাল রেখে বিনিময়-হার হ্রাস না করতাম, তাহলে সেই-সব দেশের জিনিষ আমাদের তুলনায় সস্তা হয়ে বিদেশের বাজার থেকে প্রতিযোগিতায় আমাদের হটিয়ে দিত, তাই টাকার মূল্য হ্রাস করে আমাদের বিশেষ লাভ না হলেও, হ্রাস না করলে ক্ষতি হোত। সরকারী ঘোষণার ভাষায় এটা প্রকৃতপক্ষে একটা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থামাত্র। কিন্তু টাকার মূল্যহ্রাস হওয়ার দরুন যদি জিনিষপত্রের দাম বাড়ে তা'হলে তো দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না এবং বহির্বাণিজ্যের সুবিধা অবশ্যই বিশেস সান্ত্বনার বিষয় হবে না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ব্রিটেনের মত নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য আমাদের আমেরিকার ওপর নির্ভর করতে হয় না এবং সেইজন্যই বিনিময়-হার কমায় মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাও আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত কম। যদি ভারত সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে ডলার-অঞ্চল থেকে আমাদের খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করে ষ্টার্লিং-অঞ্চল থেকে আমদানির ব্যবস্থা সত্যই করা যায় তাহলে সাধারণভাবে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা অনেকাংশে দূরীভূত হবে, অন্য যে সব জিনিষ আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করি তাদের অধিকাংশই বিলাস-সামগ্রী এবং এই সব জিনিষের দাম বাড়লেও সংক্রামক ভাবে সমস্ত জিনিষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে না, কারণ জীবন-ধারণের খরচ (এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রমিকের মজুরি) প্রভাবান্বিত হবে না। ষ্টার্লিং-অঞ্চল থেকে আমাদের চাহিদা মেটানো সম্ভব কি না এবং বিনিময়-হার কমার ফলে এই অঞ্চলে জিনিষপত্রের দাম কি রকম বাড়ে তার ওপর নির্ভর করবে টাকার মূল্যহ্রাসের আভ্যন্তরীণ ফল কি হবে।

ষ্টার্লিং-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশ হয়েও ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাসের সঙ্গে নিজেদের টাকার মূল্যহ্রাস না করে পাকিস্তান "বৈশিষ্ট্য" দেখিয়েছে বটে, কিন্তু কত দিন এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হবে সেই নিয়েই প্রশ্ন। পাকিস্তানী টাকার মূল্য অপরিবর্তিত রাখায় ষ্টার্লিং-অঞ্চলে পাকিস্তানী জিনিষের দাম যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। পাকিস্তান আশা করেছিল দাম বাড়া সত্ত্বেও তাদের রপ্তানির চাহিদা বিশেষ কমবে না, কারণ পাট, তুলা এই সব জিনিষ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ আশা সফল হয়নি। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশ এত বেশী দামে পাকিস্তানের পণ্য কিনতে নারাজ হওয়ায় পাকিস্তানের রপ্তানি রীতিমত ব্যাহত হয়েছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের (State Bank of Pakistan) প্রথম সাধারণ বাৎসরিক সভায় ব্যাঙ্কের কর্ণধার জাহিদ হোসেন সাহেব স্পষ্টই বলেছেন যে, মুদ্রামূল্য অপরিবর্তিত রাখায় পাকিস্তানকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হ'বে। এর পরে বাইরের লোক যদি মনে করে যে, পাকিস্তানকে অদূর ভবিষ্যতে তার জিদ ছাড়তে হবে, তাহলে তাদের দোষ কি? অথচ পাকিস্তানী টাকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই রকম সন্দেহ উঠলেই পাকিস্তান থেকে লোকে অন্য মুদ্রায় টাকা রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করবে যা'তে পরে দাম কমলে পাকিস্তানী টাকা কিনে তারা লাভবান হতে পারে। পাকিস্তান থেকে এই ভাবে টাকা বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য অবশ্য মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণের (Exchange Control) ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে আবার ব্যবসাবাণিজ্য একেবারে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান তাকে করতেই হবে। ২৮শে সেপ্টেম্বর গিলঘিটে (Gilghit) এক বক্তৃতায় লিয়াকৎ আলী সাহেব অবশ্য বেশ আবেগভরেই বলেছেন, "It (devaluation) shall not be. It can not be—(মুদ্রামূল্যহ্রাস হবে না, হতেই পারে না)।" কিন্তু অর্থনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ আবেগ, উচ্ছ্বাস, চোখের জল কিছুরই যে অপেক্ষা রাখে না!

৩-১০-৪৯

তোমার বাঁশী আমায় ডাকে

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর দত্ত

তোমার বাঁশী আমায় ডাকে
শুনেও নাহি বুঝি,
দেখেও আমি দেখতে না পাই
আকুল হয়ে খুঁজি।

সুরের রেশের দোলায় দুলে
হৃদয়-তন্ত্রী বাজে—
(শুধু) জানি তুমি আসবে প্রিয়
আমার জীবন মাঝে

সমালোচনা

দীক্ষিতের নিত্যকৃত্য ও পূজাপদ্ধতি (১ম ও দ্বিতীয় ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ—স্বামী কৈবল্যানন্দ-প্রণীত; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, লাক্‌সা, কাশী এবং উদ্বোধন কার্যালয়, ১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩; পৃষ্ঠা—প্রথম ভাগে ৫৬ এবং দ্বিতীয় ভাগে ১১৪; মূল্য প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের যথাক্রমে ৸৹ এবং ১।৹; উভয়ভাগের একত্র মূল্য ১৸৹ আনা।

বিশাল আর্য-সংস্কৃতির ধারক ত্যাগতিতিক্ষৈক-সম্বল ঋষিমুনিগণ ছিলেন নিত্যস্বাধ্যায়বান্ এবং কর্মানুষ্ঠাতা। রাগানুগা ভক্তির সহিত বৈধী ভক্তি তাঁহাদের জীবনে অতি সুন্দর রূপে সমন্বিত। আধুনিক ভোগবাদ উভয়েরই মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত। এই 'মহতী বিনষ্টি' হইতে উদ্ধারের উপায় কি? আমরা বিশ্বাস করি সর্বপ্রকার আন্তরিকাতা-বিমিশ্র সদনুষ্ঠান দ্বারা মানব কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের পুস্তক দুইখানা পড়িয়া এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। তিনি নিত্যানুষ্ঠায়ী; দীর্ঘকাল বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত বলিয়া তাঁহার রচিত পুস্তকে 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' ভাবটি পরিস্ফুট। প্রথম খণ্ডে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীসারদা-দেবী, বিশ্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অন্যান্য লোকপাবন সন্ন্যাসী সন্তানগণের পূজাবিধি প্রপঞ্চিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রেম ও পবিত্রতার ঘনীভূত মূর্তি। পূজাব্যপদেশে এই মহামানবগণের নিত্যানুধ্যান অনুষ্ঠাতার মহোপকার সাধন করিবে। দ্বিতীয় খণ্ডে গুরু গণেশ শ্রীদুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী সরস্বতী শিব প্রভৃতি দেবদেবী এবং শ্রীরাম-চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের পূজা প্রত্যেক ভক্ত নরনারীর নিকট সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানপ্রেমী অনেকের ইচ্ছা উপযুক্ত গ্রন্থাভাবে পূর্ণ হয় না। আলোচ্যমান পুস্তকদ্বয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংস্করণে বর্তমান প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন বহু বিষয় সংযোজিত হওয়ায় মূল পুস্তক-খানি দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত মুদ্রা ও ষট্‌চক্রবিষয়ক আলোচনা সাধনানুরাগীর বিশেষ সহায়ক হইবে মনে করি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ববিবেচনায় পুস্তকের মূল্যও খুব কমই বলিতে হইবে। ষট্‌চক্রের চিত্রখানিও পুস্তকের বৈশিষ্ট্য। আমরা পুস্তকদ্বয়ের বহুল প্রচার কামনা করি। কাগজ, মুদ্রণ প্রভৃতিও সযত্ন প্রকাশনের পরিচয় দেয়।

সচিত্র ষট্‌চক্র—স্বামী কৈবল্যানন্দ প্রণীত; শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম, লাক্‌সা, কাশী ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩, পৃষ্ঠা—৩, মূল্য ।৹ আনা।

পুস্তিকাখানি পূর্বালোচিত দীক্ষিতের নিত্য-কৃত্য ও পূজাপদ্ধতি' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত। সাধনেচ্ছু পাঠকের সুবিধার জন্য ইহা পৃথক্ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পুস্তকের মত ইহাতেও ষট্‌চক্রের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতাপরিচয়—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্-এ, বি-টি, বি-এল্ প্রণীত; বি-৭।১৯১, হাজারিবাগ,

কেদার ঘাট—৺কাশীধাম হইতে শ্রীস্বদেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত; পৃষ্ঠা—১২৮; মূল্য ১া০ মাত্র।

বহু গ্রন্থে ও নিবন্ধে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া ইহার মূল্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। আলোচ্যমান গ্রন্থের প্রাঞ্জল আলোচনা আমাদের ভালই লাগিয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের আলোচনান্তে অধ্যায়ের প্রসিদ্ধ শ্লোক-গুলি দেওয়া হইয়াছে। অশেষ সমস্যা-সঙ্কুল জীবনে শ্রীভগবানের কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তির উপর দৃষ্টি নিয়ত নিবদ্ধ রাখিলে নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারেও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি অধ্যায়ের উপদেশনিষ্কর্ষও অতি সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধি না থাকিলে পুস্তক-খানির মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইত। যাহাই হউক, এই প্রকার সদ্‌ভাবভূয়িষ্ঠ সাহিত্যের প্রচার যতই বাড়িবে ততই মঙ্গল। লেখকের সাধু প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

ধারা—বিজয় গোপাল প্রণীত; গ্রন্থকার কর্তৃক বিনোদপুর (যশোহর) হইতে প্রকাশিত; পৃষ্ঠা—৪৩; মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি লেখকের কয়েকটি গদ্য-কবিতার সমষ্টি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে গদ্য-কবিতার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে আপাততঃ ছন্দের বন্ধন ধরা পড়ে না, মনে হয় ইহার গতি অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কবিপ্রতিভা এই প্রকার কবিতাকেও একটি আন্তর ছন্দো-বন্ধন দিয়াছে। লেখকের কবিতাগুলিতে তাহার পরিচয় পাইলাম।

'ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথা দূরে যায়!
কতো খেলা, কতো লীলা
চলে অবিরাম!
অসীমের মহাযাত্রী
এই সেই চির শান্তিধাম!
মরি মরি কী মাধুরী!
অসীমেতে সসীম-মিলন!
মহাযাত্রীর যাত্রা সমাপন!'

উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে কবির প্রাণের আকূতি সুস্পষ্ট।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম্-এ

সাধিকামালা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ—১৯৪৯; পৃষ্ঠা—১৯৬; মূল্য—দুই টাকা।

এই পুস্তকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন যুগের ষোল জন সাধিকার তপস্যাপূত জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ষোলটি 'মণি' বা অধ্যায়ে রামায়ণ-যুগের শবরী, বৌদ্ধ যুগের সংঘমিত্রা, মধ্যযুগের মীরাবাই ও অণ্ডাল, অষ্টম শতাব্দীর মুসলিম তাপসী রাবেয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের লীলাসঙ্গিনী পুণ্যশ্লোকা সারদামণি এবং শিষ্যাচতুষ্টয় অঘোরমণি, গোলাপসুন্দরী, যোগেন্দ্রমোহিনী ও গৌরীপুরী, স্বামী বিবেকা-নন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা ও এমা কাল্‌ভে, খৃষ্টান তপস্বিনী সান্তা ক্লারা, থেরেসা নিউমান, সেণ্ট টেরেসা ও সেণ্ট ক্যাথারাইন—এই ষোল জন সাধিকার অনুপম কাহিনী সরল, সুন্দর, স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল মহীয়সী নারীর জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভক্তি বিশ্বাস প্রেম পবিত্রতা ত্যাগ তপস্যা সংযম প্রভৃতি দৈবী সম্পদ্‌রাজি কোন বিশেষ দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না—উহারা সকল দেশের, সকল জাতির ও সকল ধর্মের নারীরই চিরন্তন আদর্শ; এগুলি নারীচরিত্রের

অপরিহার্য অলঙ্কার ও গুণ। এই সকল গুণ যে সমাজের নারীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে অর্জিত হইয়াছে, সে সমাজ তত উন্নত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উভয়ত্র আধুনিক নারী ত্যাগ তপস্যা সংযম ও পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হইয়া বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে। ইহা দ্বারা সমাজের ভাবী অনর্থ ও অকল্যাণই সূচিত হইতেছে। এই অনর্থকে প্রতিরোধ করিতে হইলে গ্রন্থোক্ত সাধিকাগণের জীবনে যে আধ্যাত্মিকতা বিকশিত হইয়াছে তৎপ্রতি নারীজাতির অবহিত হইতে হইবে। আশা করি, দেশের বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণের দৃষ্টি সাধিকাগণের অনুরূপ অধ্যাত্মজীবন-গঠনে নিবদ্ধ হইবে। স্কুল-কলেজে এরূপ পুস্তক পাঠ্য হইলে ছাত্রীসমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয়। পুস্তকখানির মুদ্রণ, কাগজ ও প্রচ্ছদপট সুন্দর হইয়াছে। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

স্নেহধারা—শ্রীসুরমা বসু কর্তক সঙ্কলিত। প্রকাশক—এস্ কে পালিত এণ্ড কোং; ৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—২২২; মূল্য আড়াই টাকা।

পুস্তকখানিতে কাঁকুড়গাছি, শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিমল মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার শিষ্যা ভক্তিমতী শ্রীসুরমা বসুর নিকট বিভিন্ন সময়ে লিখিত ধর্মোপদেশপূর্ণ এক শত উনচল্লিশখানা পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পত্রগুলি পাঠ করিলে সাধন-ভজনোপযোগী বহু অমূল্য তথ্য ও উপদেশ পাওয়া যায়। শিষ্যের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য গুরুর ঐকান্তিক আগ্রহ, স্নেহ ও দায়িত্ববোধ এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেম পত্রগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরু-শিষ্যের এই অচ্ছেদ্য স্নেহ-সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই প্রকাশক পুস্তকখানির 'স্নেহধারা' এই উপযোগী নামটি রাখিয়াছেন। পুস্তকপাঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক অমৃতময় উপদেশ এবং মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত-প্রতিষ্ঠিত কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের ইতিবৃত্ত জানিবারও সুবিধা হইবে। ধর্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। পুস্তকের ভাষা, প্রকাশভঙ্গী ও মুদ্রণ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—এই বৎসর বেলুড় মঠে শারদীয়া দুর্গাপূজা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তিন দিনই বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আসানসোল, কাঁথি, জয়রামবাটী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বালিয়াটি, বরিশাল, মালদহ, শিলং ও শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বামী দেবাত্মানন্দজী—পোর্টল্যাণ্ড (আমেরিকা) বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী

দেবাত্মানন্দজী সুদীর্ঘ কাল তথায় কৃতিত্বের সহিত বেদান্তপ্রচার-কার্য পরিচালন করিয়া গত ২১ শে সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে পৌছিয়াছেন। তিনি কয়েক মাস ভারতবর্ষে অবস্থান করিবেন।

বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশন—আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। এই মহানগরীতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকবৃন্দ গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ যে সকল জনহিতকর কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন তাহার ফলে প্রদেশের সর্বশ্রেণীর লোক বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। সার্বভৌম বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা এক দিকে জনগণের রক্ষণশীলতা, অপর দিকে পাশ্চাত্ত্যের অন্ধানুকরণ-প্রবৃত্তি প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে।

আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে মিশনের কর্মপ্রচেষ্টা তিনভাগে পরিচালিত হইয়াছে—(১) ধর্মপ্রচার, (২) শিক্ষাবিস্তার, (৩) দাতব্য চিকিৎসা।

মিশনের সন্ন্যাসিগণ বোম্বাই নগরী ও উহার উপকণ্ঠে, প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ও বহির্ভাগে বেদান্তের সার্বভৌম তত্ত্ব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে কার্যকর ভাবে প্রতিফলিত ধর্মসমূহের ঐক্য প্রচার করিয়াছেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী ও তাঁহার সহকারী স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী সাপ্তাহিক ধর্মালোচনাসভায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ্‌, বেদান্তদর্শন, পঞ্চদশী, বাক্যবৃত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী সম্বন্ধে যথাক্রমে ৩৬৪ এবং ১৫৫টি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বোম্বে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে, কুরুক্ষেত্র কনখল গয়া আসানসোল কলিকাতা ঢাকা কুমিল্লা বরিশাল আসাম প্রভৃতি স্থানে মোট ১১৭টি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ধর্ম-জিজ্ঞাসুমাত্রই জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে আশ্রমে সন্ন্যাসিগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তদীয় শিষ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বোম্বে নগরীতে ও আশ্রমে বিপুল সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে বোম্বে প্রদেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই লোকোত্তর মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীসারদাদেবী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ যীশুখৃষ্ট শঙ্করাচার্য এবং চৈতন্যদেবের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মিশনের গ্রন্থাগারে ধর্ম দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে ১৯৪৭ সনে ৩৯০২ এবং ১৯৪৮ সনে ৩৯৬৮ খানা পুস্তক ছিল। ১৯৪৭ সনে ১৫৬৪ এবং ১৯৪৮ সনে ১৭৭৭ খানা পুস্তক পাঠক-পাঠিকাদিগকে গৃহে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে ইংরেজী সংস্কৃত হিন্দী মারাঠী গুজরাটি তামিল মালয়ালম্‌ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২৯।

মিশনের বিদ্যার্থি-ভবনে ১৯৪৭ সনে ১৯ এবং ১৯৪৮ সনে ২১ জন ছাত্র ছিল। পূর্ব বর্ষে একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, এক জন সাধারণ বি-এস্‌সি, এবং এক জন বি-কম্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পর বৎসর এক জন ছাত্র এম-এ, এক জন বি-এস্‌সি এবং এক জন বি-এস্‌সি (টেকনিক্যাল) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সনে মিশনে বিদ্যার্থি-ভবন স্থাপিত হয়।

মিশনের দাতব্য চিকিৎসালয় দ্বারা সর্বশ্রেণীর নর-নারী উপকৃত হয়। ইহাতে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক দুই প্রকার চিকিৎসাই পরিচালিত হইয়াছে। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সনে যথাক্রমে ১,০৩,০৯২ এবং ১,২৩,৮০৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে 'এস্ এস্ রামদাস' নামক একটী জাহাজ ঝঞ্জা-তাড়িত হইয়া জলমগ্ন হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে ৫০০ জন যাত্রী মারা যায় এবং ২০০ জন যাত্রীকে সমুদ্রতীরের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর্তযাত্রীদের সাহায্যের জন্য বোম্বের শেরিফ অর্থসংগ্রহ-কার্যে ব্রতী হন। স্থানীয় মিশন কংগ্রেস ও সরকারের সহযোগিতায় রত্নগিরি জেলার বিভিন্ন তালুকে ঐ সকল আর্ত-যাত্রীদের মধ্যে সেবাকার্য পরিচালনা করেন। ইহাতে মোট ৫৯২০৲ টাকা ব্যয়িত এবং ৭০ খানা বস্ত্র ও সাড়ি বিতরিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৯৪৭ সনে মিশন পাঞ্জাব শরণার্থীদের সেবা-কার্য পরিচালন করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

১৯৪৭ সনে পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্তসহ মিশনের মোট আয় ছিল ৯৭,২১৬৷৹ এবং ব্যয় ৫১,৬৭৬৷৷৶৯ পাই এবং ১৯৪৮ সনের মোট আয় ১২৫,৬৩১৴৯ পাই ও মোট ব্যয় ৭৫,০৫১৷৷৶৹।

মিশন-কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ভারতের জনগণের সেবার সৌকর্যার্থ দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যার্থি-ভবন, গ্রন্থাগার ও পাঠভবনের সম্প্রসারণের জন্য সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইতেছেন।

কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী— ১৯০১ সালে কনখলে ক্ষুদ্র একটি কুটিরে এই সেবাশ্রমটির প্রথম পত্তন হয়। এই স্থানটি হরিদ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত। হরিদ্বার ভারতের একটি পবিত্র ও মহান্ তীর্থস্থান। সুদূর হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বিরাজিত শ্রীকেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ দর্শন এবং পূজা করিতে যাইবার উদ্দেশ্যে অগণিত যাত্রী এইখান হইতেই তাঁহাদের যাত্রা শুরু করেন। প্রতি ১২ বৎসর অন্তর 'পূর্ণকুম্ভ' মেলাও এইখানেই হয়। এতদুপলক্ষে আগত লক্ষ লক্ষ নরনারী রোগে ও নানাভাবে যে দুঃখ-কষ্ট পাইয়া থাকেন তাহারই যথাসাধ্য নিরসনকল্পে রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাশ্রমের সূত্রপাত করেন। সেই অতীতে প্রথমে যাহা একটি সামান্য কুটিরে জন্মলাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সকলের সাহায্যে এবং মিশনের সেবাব্রতী সাধুগণের উদ্যমে একটি পূর্ণাবয়ব হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে,—একটি অন্তর্বিভাগ (Indoor) অপরটি বহির্বিভাগ—(Outdoor)। বর্তমানে অন্তর্বিভাগে ৫০টি বেড্ (bed) রহিয়াছে। উভয় বিভাগেই ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত তীর্থযাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসিগণের চিকিৎসা অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক করানো এবং ঔষধপথ্যাদি সমস্তই বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

আলোচ্যমান বর্ষে হাসপাতালের উভয় বিভাগে মোট ৮৮,৮৫৭ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। প্রতিদিন গড়ে ২৪০ জন রোগী চিকিৎসার্থ আসিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১৯৪৭ সনের মে মাসে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ বাস্তত্যাগী-দিগের জন্য যে 'মেডিক্যাল রিলিফ' আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ১৯৪৮ সনে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই চলিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে ১৩৮ জন কঠিন রোগাক্রান্তকে অন্তর্বিভাগে রাখিয়া চিকিৎসা ও সেবা করা

হয় এবং আরোও অনেককে বালি, গরম কম্বল, ঔষধ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সরকারের বাস্তুত্যাগী সাহায্য বিভাগ (Refugee Relief Department) হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়ায় সেবাশ্রমের পক্ষে এতটা 'রিলিফ্' দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। হরিদ্বার এবং তাহার আশে পাশে এখনও প্রায় ত্রিশ হাজার বাস্তুত্যাগী আছেন এবং সেবাশ্রম তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

এই প্রতিষ্ঠান বহুকাল যাবৎ স্থানীয় হরিজন বালকদিগের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় এবং মিউনিসিপাল বোর্ড পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করিবার ভার লওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে, সেইজন্য সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সনের ১লা এপ্রিল হইতে বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

সেবাশ্রমে সাধারণের জন্য একটি এবং রোগীদের জন্যও একটি গ্রন্থাগার আছে। আলোচ্যমান বর্ষে উহাতে দেড়শত বাঁধানো পত্রিকা-সহ মোট ৩৭৭১ খানি বই ছিল। পাঠকগণ ৩২৩৮ খানি বই পড়িতে লইয়াছেন, সাধারণের নিকট হইতে ৭৭ খানি পুস্তক, ১৮টি মাসিক ও ৩টি সংবাদপত্র লাইব্রেরীর জন্য উপহার পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ ১০৮৶৬ পাই মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। কোটা শহরের শ্রীরাজকিশোর গুপ্ত মহাশয় আড়াই শত টাকা মূল্যের হিন্দি পুস্তক এবং একটি আলমারীর জন্য ৪০০৲ দান করিয়াছেন।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রায় ১৬০০ লোককে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হয়। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হরিজন।

আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের সাধারণ ফণ্ডে আয় হয় ৫০,৭৫৩।৩ পাই এবং ব্যয় হয় ৫২,২৮৫৸৵১০ পাই। গৃহ-নির্মাণ ফণ্ডে (বিল্ডিং ফণ্ডে) এবং বিশেষ ফণ্ডে আয় যথাক্রমে ২০০৫৲ ও ১৯,২৫৩৸৵ এবং ব্যয় যথাক্রমে ২৬৭০৸৶১১ পাই ও ৪,৯৬১৴৩ পাই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নানাবিধ অভাব অসুবিধার জন্য আশ্রমটির কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। ইহার সমস্ত বিভাগের দৈনন্দিন কাজ সুচারু রূপে পরিচালনা করিতে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি ফণ্ডের একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত—(১) উন্নত ধরনের স্যানিটারী ব্যবস্থাপূর্ণ একটি Under-ground Drainage, (২) একটি গোশালা, (৩) রান্নাঘর, ভাড়ার ঘর, খাবার ঘর, (৪) ডাক্তারদের জন্য 'কোয়ার্টার', (৫) জল সরবরাহের জন্য উচ্চস্থাপিত ট্যাঙ্ক এবং ইলেক্ট্রিক মোটর পাম্প্, (৬) আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম-সহ ২০টি অতিরিক্ত 'বেড্', (৭) রোগীদের জন্য একটি প্যান্ট্রি, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড়, চাদর, কম্বল, তোয়ালে ইত্যাদি রাখিবার ঘর—ইত্যাদিরও বিশেষ প্রয়োজন। এ সবের জন্যও আনুমানিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দরকার। আমরা আশা করি সহানুভূতি-সম্পন্ন সহৃদয় নরনারী মুক্তহস্তে এই সেবাশ্রমটিকে সাহায্য করিবেন।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন—১৯৪৭-১৯৪৮ সনের বার্ষিক কার্য-বিবরণী—রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখা-কেন্দ্রটি ১৮৯৯ সনে স্থাপিত এবং ১৯১৬ সনে বেলুড় মূলকেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া অদ্যাবধি আচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত ত্যাগ ও সেবার মহান্ আদর্শে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে নর-নারায়ণের সেবা করিয়া আসিতেছে। ইহার কর্মপ্রচেষ্টা প্রধানতঃ তিনটি ধারায় পরিচালিত হইতেছে—(১) সেবা, (২) শিক্ষা, (৩) ধর্মপ্রচার।

সেবাবিভাগ—মিশন-প্রাঙ্গণে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে একটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপর্যয় সত্ত্বেও শহর ও গ্রামবাসী ৭০১৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯১০ এবং পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৫১০৮। মোট ১০৪৯ জন দুঃস্থকে মাসিক ও সাময়িক সাহায্যরূপে অর্থ, অন্ন ও বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে ৩০৭ জন ১০৩।৶৩ পাই, ৩০২ জন ৩০২ খানা বস্ত্র, এবং ৪৪৩ জন ১৮৮২ সের চাউল ও আটা পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৪৮ সনে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মধ্যে খাদ্যবিতরণের জন্য সোনারগাঁ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের হাতে ৫০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৬ সনে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিলে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন ঐ সকল স্থানের দুঃস্থদের যথোপযোগী সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি সেবাকেন্দ্র খুলিয়াছেন। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে প্রেরণ করিয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সনে মোট ১,৩০৫।/০ আনা সংগৃহীত হইয়াছিল।

শিক্ষাবিভাগ—স্থানীয় বালকবালিকা-গণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান বহু বৎসর যাবৎ কয়েকটি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সনে শহর ও শহরতলীতে এরূপ মোট ৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয় হেতু ১৯৪৮ সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া গিয়া দুইটিতে পরিণত হয়। মিশন-প্রাঙ্গণস্থ মধ্য ইংরেজী বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২২৫; ফরিদাবাদ শ্রীসারদেশ্বরী নিম্নপ্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ১৬; ব্রাহ্মণকিত্তা শ্রীসারদেশ্বরী উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা ৩৪; এবং নবাবগঞ্জ বিবেকানন্দ নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১। ১৯৪৮ সনে ব্রাহ্মণকিত্তা বালিকা বিদ্যালয় এবং নবাবগঞ্জ বালক বিদ্যালয় উঠিয়া যায়।

এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে দুইটি সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে—একটি মিশন-বাটীতে, অপরটি শহরের ফরাশগঞ্জ অঞ্চলে। মিশনবাটীর গ্রন্থাগারের সহিত একটি পাঠাগারও সংশ্লিষ্ট আছে। গ্রন্থাগার দুইটিতে ধর্ম দর্শন সাহিত্য এবং অন্যান্য সুরুচিপূর্ণ বহু মূল্যবান পুস্তক রাখা হইয়াছে। ১৯৪৮ সনের শেষে গ্রন্থাগারদ্বয়ে পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩০০০; পড়িবার জন্য পাঠকগণকে দেওয়া হয় ১৩৯৩ খানা পুস্তক। পাঠাগারে ১১ খান ম্যাগাজিন ও ১ খানা দৈনিক সংবাদ-পত্র ছিল এবং দৈনিক গড়ে ১২ জন পাঠক সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন।

প্রচার-বিভাগ—ধর্মসমন্বয়ের সার্বভৌম বাণীপ্রচারের জন্য মিশন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সাপ্তাহিক ধর্মসভার অধিবেশন, ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করেন। এই শাখাকেন্দ্রের মঠ-বিভাগের সহযোগিতায় প্রতিবৎসর শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, যীশু, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি লোকোত্তর মহাপুরুষ

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও লীলাসহচরগণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত এবং তদুপলক্ষে তাঁহাদের জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। আলোচ্যমান বর্ষদ্বয়ে দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও মিশনবাটী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে ২১৭, ২৩ ও ৯২টি ধর্মালোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বক্তৃতার সংখ্যা ছিল ৪০ এবং গড়ে ২৯০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৭ ও ১৯৪৮ বর্ষদ্বয়ে মিশনের মোট আয় ছিল যথাক্রমে ২১,৬২৫৶৮ পাই ও ৩৯,২৪৬৷৵১১ পাই এবং মোট ব্যয় যথাক্রমে ১৬,৬৩৪৸৵০ আনা ও ৩৩,০২৫৸৶৯ পাই।

পূর্বপাকিস্তানের এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হেতু ঘোরতর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি এযাবৎ আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় ইহা নিদারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মিশনের হিতাকাঙ্ক্ষী পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাজ্যের সহৃদয় নরনারীগণের নিকট এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সর্ববিধ সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানাইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি— এই প্রতিষ্ঠানে গত ভাদ্র ও আশ্বিন দুই মাসে বেলুড় মঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী "শ্রীশ্রী-চণ্ডীতত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি এবং স্বামী সুন্দরানন্দজী "বর্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ", "সমন্বয় ও গণতন্ত্র", "ভারতের বাহ্য ও আভ্যন্তর উন্নতি" সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। মহালয়া দিবসে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী "শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পূত জীবনী" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। তৎপর রামরসায়ন সংকীর্তন সম্প্রদায় শ্রীশ্রী-রামচন্দ্রের অকালবোধন পালা কীর্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত রমণীকুমার দত্তগুপ্ত সাপ্তাহিক ধর্মসভায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" ও "শিবানন্দ-বাণী" (২য় ভাগ) ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন।

স্বয়ংক্রিয় রোপণযন্ত্র— কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ং-ক্রিয় রোপণযন্ত্রের আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটেন হইতে এই যন্ত্র বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি হইতেছে। যন্ত্রটি ঘণ্টায় ১২,০০০ পর্যন্ত চারা গাছ রোপণ করিতে পারে এবং এই কাজে সাহায্যের জন্য অনভিজ্ঞ সাধারণ শ্রমিকই যথেষ্ট। তাহাতে প্রতি হাজারে খরচ পড়ে গড়ে প্রায়

ছ'আনা মাত্র। চারাগাছ ধরিবার জায়গায় রবার বসাইয়া যন্ত্রটিকে এমন ভাবে তৈরী করা হইয়াছে যে তাহাতে চারাগাছের উপর কোন রকম আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই। এই যন্ত্র দ্বারা সব রকম গাছই রোপণ করা সম্ভব। বেলজিয়াম, নিউজিল্যাণ্ড এবং রোডেসিয়ায় তাহা দ্বারা দৈনিক ৫০,০০০ হইতে ৭০,০০০ তামাক গাছ রোপণ করা হইতেছে। আলুর বীজ বপনের কাজেও একই ভাবে যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রেও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন নাই। যন্ত্রটি প্রতি ঘণ্টায় কম পক্ষেও প্রায় অর্ধ একর পরিমাণ জমিতে আলুর বীজ বপন করিতে পারে।

ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন—স্নাতক-নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে কোনও ভারতীয় ভাষাকেই ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া সম্প্রতি "ভারতীয় বিজ্ঞানের জাতীয় পরিষদ" মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানশিক্ষা-দানের মাধ্যম রূপে কোন্ ভাষা ব্যবহার করা উচিত এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বিচার করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে সম্প্রতি ঐ কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার পর পরিষদ কর্তৃক উপরোক্ত মন্তব্য করা হইয়াছে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা সম্বন্ধে পরিষদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুবিধানুযায়ীই নির্ণীত হইতে পারিবে। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার পরিবর্তন না করাই বাঞ্ছনীয় এবং এই ক্ষেত্রে নূতন ভারতীয় প্রতিশব্দ সৃজনের চেষ্টা না করাই কর্তব্য বলিয়া পরিষদ মত প্রকাশ করেন।

গীতা কি সপ্তসতী?—দীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত বিশ্বাস যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাত শত শ্লোকে রচিত। সাধারণ প্রচলিত সংস্করণে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার এই মান সঠিক কি না অথবা মূলে শ্লোকসংখ্যা আরও বেশী ছিল, সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এক বক্তৃতায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে গীতার মান সম্বন্ধীয় যে নির্দেশ আছে তাহার উল্লেখ করেন। এই নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের উক্ত শ্লোক ৬২০, অর্জুনের উক্ত ৫৭, সঞ্জয়ের উক্ত ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত ১—মোট ৭৪৫ শ্লোক হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, সপ্তশতী বলিয়া গীতার যে প্রসিদ্ধি তাহার সমর্থনে মহাভারতে কোন প্রমাণ নাই। অথচ উল্লিখিত সুস্পষ্ট নির্দেশে বলা হইতেছে যে, গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে মহাভারতের উল্লিখিত শ্লোকটির প্রামাণিকতা কতখানি তাহার বিচার করিতে হয়। এই বিচারপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নীলকণ্ঠ প্রভৃতি মহাভারতের টীকাকার, ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত ভীষ্ম পর্বের ভূমিকা ও সমালোচনা, গীতার কাশ্মীরী পাঠ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে প্রচলিত মহাভারতের পাঠের উল্লেখ করেন। ইহাতে দেখা যায় মহাভারতের উল্লিখিত শ্লোকটি কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পরন্তু উহার সহিত গীতার শ্লোকসংখ্যার কি করিয়া সামঞ্জস্য সাধন করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য কাথিয়াওয়াড় গোণ্ডল হইতে প্রকাশিত গীতার একখানি বিশেষ সংস্করণের উল্লেখ করেন। ইহার পাঠ কাশী হইতে প্রাপ্ত ভোজপত্রে লিখিত মূল পুঁথি হইতে সংগৃহীত। ইহাতে ৭৪৫ শ্লোক ধার্য করা হইয়াছে। এই সংস্করণে যে সকল পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গীতা অনুসারে অর্জুন যেখানে বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় "চতুর্ভুজ" হইতে বলিতেছেন, এই গীতায় সেখানে "চতুর্ভুজেন" পাঠ নাই, "ভুজদ্বয়েন" পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। এই সংস্করণ ছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য প্রাচীন পারসী ও আরবী ভাষায় গীতার অনুবাদের কথা উল্লেখ করেন। তাহাতেও দেখা যায় সাত শতের অতিরিক্ত শ্লোক এবং কোথাও কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে ৭৪৫ শ্লোকই স্বীকৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বক্তা গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকার শঙ্করাচার্য ও শ্রীধরের উক্তি উল্লেখ করেন। উভয়েই গীতার মান ৭০০ বলিয়া ধার্য করিয়াছেন। মহাভারতীয় মান গ্রহণের পক্ষে ইহা এক প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার উপর আলোকসম্পাতের জন্য বক্তা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে গীতার অবলুপ্তি বিষয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের আলাপের কথা উল্লেখ করেন। গীতার অবলুপ্তি ও পুনরুদ্ধার ইহার মধ্যে শ্লোক-সংখ্যার ইতরবিশেষ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। তাহা ছাড়া মহাভারতীয় মানের সমর্থনে আরও একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীল গদাধরের লিখিত গীতায় মহাপ্রভু নিজহস্তে শ্লোকসংখ্যার মান লিখিবার সময়ে মহাভারতের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিপিসহ এই পুঁথি এখনও ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) শ্রীগদাধরের শ্রীপাটে রক্ষিত আছে এবং ইহা লইয়া আলোচনাও হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ লক্ষ্য করিয়া গীতার মান সম্বন্ধে সন্ধান ও গবেষণা করিতে বক্তা সুধীবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, গীতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। বিশ্বরূপদর্শনের অন্তে অর্জুনের মুখে "চতুর্ভুজেন" স্থলে যে "ভুজদ্বয়েন" পাঠ পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

বাহ্য ও আভ্যন্তর উন্নতি

সম্পাদক

প্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতিলাভের বাহ্য ও আভ্যন্তর দুইটি দিক আছে। সর্ববিধ কার্যকরী শিক্ষা এবং ভোগসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি-বিষয়ক উন্নতিই মানুষের বাহ্য উন্নতি এবং ধর্ম সত্য নীতি ত্যাগ সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতি বিষয়ক উন্নতিই আভ্যন্তর উন্নতি। মুষ্টিমেয় নিবৃত্তিপন্থী অসাধারণ ব্যক্তি বাহ্য উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া আভ্যন্তর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইলেও কোন দেশেরই সাধারণ নরনারী এবং তাহাদের সমষ্টিস্বরূপ জাতির পক্ষে উহা একেবারেই সম্ভব নহে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য বিষয়সমূহে উন্নত জাতি-সমূহের তুলনায় বাহ্যবিষয়সমূহে অনুন্নত জাতিসমূহ কমবেশি অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমগ্ন। এজন্য তাহারা আভ্যন্তর উন্নতি-সাধনে অসমর্থ হইয়া অভাব-অনটনের প্রেরণায় এবং আত্মরক্ষার তাড়নায় অধর্ম অসত্য ও দুর্নীতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ উভয় দিক দিয়া অনুন্নত ও দুর্বল জাতিসমূহের পক্ষে বাহ্যবিষয়সমূহে উন্নত সুসভ্য ও শক্তিমান জাতিগুলির সঙ্গে সকল বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সসম্মানে বাঁচিয়া থাকাও বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, যে সকল জাতি আভ্যন্তর উন্নতি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল বাহ্য বিষয়-সমূহে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদেরও জাতীয় জীবন ক্রমেই অধিকতর সমস্যা-সংকুল হইয়া পড়িতেছে—তাহাদেরও ঘরে বাহিরে সুখ-শান্তি নাই, অধিকন্তু তাহাদের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বিশ্ব-মানবের শান্তি-পথের প্রবল বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কারণে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জাতিমাত্রেরই সকল সমস্যার সমাধান এবং বিশ্ব-শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক।

বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বাহ্য উন্নতি-ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগের কল্পনাতীত উৎকর্ষ-সাধন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও কলকারখানাদি পরিচালন, জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাতায়াতে অচিন্তনীয় সুবিধা-বিধান, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সুশৃঙ্খলভাবে রাষ্ট্র-

নিয়ন্ত্রণ, ভোগ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শত শত উপকরণ সরবরাহ, যুদ্ধবিগ্রহের অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম আবিষ্কার, জনসাধারণের মধ্যে বিবিধ শিক্ষাবিস্তার এবং তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য ও রোগে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠ দান। সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি এবং উন্নতিকামী জাতিমাত্রই এই দানগুলি সাদরে বরণ করিয়া লইতেছেন। স্বাধীন ভারতও পাশ্চাত্যের সর্ববিধ বাহ্য উন্নতি গ্রহণের দিকে ক্রমেই বেশি মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ইহা তাহার জাতীয় অভ্যুদয়ের পরিচায়ক। ভারতের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে পাশ্চাত্যের সর্ব-বিধ বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আভ্যন্তর উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করায় তাহাদের জাতীয় জীবনে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ঐগুলি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ভারতবাসীর পক্ষে আভ্যন্তর উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সর্ববিধ বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করা আবশ্যক। গভীর পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীন ভারতকে ঐহিক রাষ্ট্র (Secular State) বলিয়া ঘোষণা করায় ভারতের আভ্যন্তর উন্নতি অর্থাৎ ধর্ম সত্য নীতি সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছে। এজন্য তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের বাহ্য উন্নতি প্রবর্তনের যতই চেষ্টা করা হইতেছে, ততই অধর্ম অসত্য দুর্নীতি অসংযম প্রভুত্ব স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের জাতীয় জীবনকে ক্রমেই অধিকতর সমস্যাপূর্ণ করিতেছে। কোন ব্যক্তি ও জাতি ভোগকে সংযমের পুণ্যস্পর্শে মহত্ত্বমণ্ডিত করিয়া গ্রহণ না করিলে তাহার পরিণতি এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াই থাকে। স্পষ্ট দেখা যায়—সাধারণ নরনারী দূরের কথা, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং নানাবিষয়ে অসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও জীবন আভ্যন্তর উন্নতি-বিবর্জিত হইয়া বাহ্য উন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হইলেও গুণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পরিণামে তাঁহাদের পরিবার সমাজ দেশ—এমন কি বিশ্বের মহা অকল্যাণের কারণ হয়। বর্তমানে এই শ্রেণীর রাজনীতিক ধুরন্ধরগণের প্রাধান্যবৃদ্ধির ফলে বাহ্যবিষয়সমূহে উন্নত দেশগুলিতে এবং ইঁহাদের সংঘবদ্ধ চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সদ্যমুক্ত স্বাধীন ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে এই সাংঘাতিক সমস্যা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইলে তাহাদের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধর্ম সত্য নীতি সংযম পরার্থপরতা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পাশ্চাত্যের সর্ববিধ বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য।

এক শ্রেণীর পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধারণা যে, হিন্দুধর্ম জাগতিক বিষয়-বিরাগ-মূলক ; ইহা বাহ্য উন্নতিকে অবহেলা করিয়া কেবল আভ্যন্তর উন্নতিসাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ইহা সর্বাংশে সত্য না হইলেও একে-বারে মিথ্যা নয়। কেন না, হিন্দুশাস্ত্রে অধিকারি-ভেদে নিবৃত্তিমূলক মোক্ষ এবং প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম উভয়েরই স্থান আছে। মোক্ষপন্থিগণের মতে ইহ ও পর উভয় লোকের ভোগসুখই ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব-মাত্র এবং উভয়ই অস্থায়ী। এইজন্য ইঁহারা সকল প্রকার ঐহিক অভ্যুদয়-স্পৃহা একেবারে বর্জন এবং বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া সুখ-দুঃখের বাহিরে যাইয়া আত্মার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপে স্থিত হওয়াই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এই নরদেবগণ ধর্ম সত্য নীতি সংযম প্রভৃতি

বিষয়ক মানুষের আভ্যন্তর উন্নতির জীবন্ত প্রতীক। সকল দেশে ও সকল কালে এই শ্রেণীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হইলেও সকল নরনারীকে আভ্যন্তর উন্নতির পথ প্রদর্শন এবং তাহাদের সম্মুখে মহান আদর্শ ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য ইঁহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারীই প্রবৃত্তিমূলক ধর্মকামী। ইহজীবন ও পরজীবনে সর্বাবস্থায় আপনাদের এবং আত্মীয়-স্বজনবর্গের ভোগ-সুখ অর্থাৎ বাহ্য উন্নতিই তাহাদের একমাত্র কাম্য। ইহাদের ধর্ম-সাধনও এই একই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত। হিন্দু-শাস্ত্রসমূহ সমস্বরে বলেন যে, ধর্ম অপেক্ষা মোক্ষ—প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি-ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির পথ অতিক্রম না করিয়া নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না,—সাধারণ তমোগুণী মানুষ রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সত্ত্বগুণে উপনীত হইতে অসমর্থ। প্রকৃতপক্ষেও বলপূর্বক ধর্মকামীকে মোক্ষকামীতে পরিণত করা অসম্ভব। হিন্দুধর্মসার রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে মোক্ষ ও ধর্ম উভয় পথের মাহাত্ম্য কীর্তিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্মশাস্ত্রেই মোক্ষ ও ধর্মের উপযোগিতা স্বীকৃত। হিন্দুধর্মের শাখাস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম কেবল মোক্ষমার্গ ভিন্ন অন্য পথের উপযোগিতা স্বীকার করে না। খৃষ্টধর্মও বিষয়-বিরাগ এবং নিবৃত্তিমূলক। এক গালে চড় মারিলে অপর গাল পাতিয়া দিতে সকল নর-নারীকে যিশুখৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষকামিগণকে সর্বভূতের প্রতি বৈরিতা ত্যাগ করিয়া সমদর্শী হইতে এবং ধর্মকামিগণকে শত্রু জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে বলিয়াছেন। হিন্দুর সকল শাস্ত্রে ধর্মকামিগণের পক্ষে ন্যায্য হিংসারও স্পষ্ট সমর্থন আছে। এই সকল প্রমাণমূলে হিন্দু-ধর্মকে মানুষের বাহ্যোন্নতি-বিরোধী বলা যায় না। তথাপি ইহাও সত্য যে, ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভারতের অধিকাংশ নরনারীর কাম্য হইলেও তাহারা উন্নত পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের তুলনায় বাহ্য বিষয়সমূহে এ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ কালের পরাধীনতার পেষণ, প্রতিকূল রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, জনসাধা-রণের নিদারুণ অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য, শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের প্রতিকূলাচরণ, স্বগৃহে সাম্প্রদায়িকতা অনৈক্য ও বিরোধ প্রভৃতি ইহার কারণ। বাহ্য উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে রজোগুণের উদ্বোধন আবশ্যক, তাহাও এতদিন ভারতের জনগণের ছিল না, তাহারা মহাতমে আকণ্ঠ মজ্জমান ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দীর্ঘকাল যাবৎ প্রলয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লব বহির্বিপ্লব এবং কল্পনাতীত দৈন্য-দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও তাহাদের জাতীয় জীবনের চিরন্তন গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য—ধর্ম সত্য নীতি সংযম প্রভৃতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়াই আজও তাহারা জাতি হিসাবে কেবল বাঁচিয়াই নাই, পরন্তু তাহাদের সর্বাঙ্গে নব জাগরণের মুঞ্জরণ পরিস্ফুট। বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করার ফলে তাহাদের সর্ববিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর উন্নতি লাভের রুদ্ধ দ্বারগুলি উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সময়ে যদি তাহারা রজোগুণে উদ্বুদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিসমূহের সর্ববিধ বাহ্য উন্নতিকে তাহাদের পূর্বোক্ত জাতীয় বিশেষত্বের পুণ্য স্পর্শে মহত্ত্বমণ্ডিত করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাদের জাতীয় জীবন যে পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শস্থানীয় হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলিয়া গর্বের সহিত পরিচয় দিলেও তাহারা খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্ম সত্য নীতি ত্যাগ ও সংযম প্রভৃতির পূত স্পর্শে মহিমান্বিত করিয়া তাহাদের বাহ্য উন্নতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার কারণ প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাহার ঐ বিশ্বপাবন ভাবগুলি লইয়া উপস্থিত হয় নাই। খৃষ্টের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ ভারতের আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ মাত্রায় প্রকট। এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভারত হইতে সমানীত আধ্যাত্মিক ভাবাবলীর সাহায্যে বর্তমানে পাশ্চাত্যে প্রচলিত খৃষ্টধর্মকে যথার্থ খৃষ্টধর্মে পরিণত করিয়া ইহার মহিমময় আদর্শে তাহাদের সর্ববিধ বাহ্য ও আভ্যন্তর উন্নতি নিয়ন্ত্রিত করাই তাহাদের জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় এবং ইহাই বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত শান্তি-প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

পূজারী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পূজারী তোমার পূজা-আয়োজন শীঘ্র লহ গো সারি
পূজার সময় যায় বহে যায় এস এস ত্বরা করি।
উষাকাল হ'তে কুড়াতেছ ফুল এখনো ভরে নি সাজি?
কোথা কোশাকুশি কোথা চন্দন কোথায় অর্ঘ্যরাজি?
এখনো কেন রে মন্দির পরে দীপ নাহি হ'ল জ্বালা
ধূপের গন্ধ নাহি আমোদিল কখন গাঁথিবি মালা?
দিক দিক হ'তে আসে নরনারী পূজা দেখিবার আশে
সাজানো হ'ল না তোর উপচার অলস রহিলি বসে।
মন্দিরে দেখ ব্যাকুল পিয়াসী দেবতা তোমার লাগি
ওরে নির্দয় উঠিল না হায় পরাণ এখনো জাগি?
থাক্ পড়ে কাজ যতরে অকাজ যত টান যত মোহ
জীবনের নাথ মাগিছে জীবন পূজা তাঁর সমাপহ।

চর্য্যাপদের কৌলিক ব্যাখ্যা

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

কুক্কুরীপাদের দোঁহা

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥ ১

(পাঠান্তর—খাই)

টীকাকার—দুলি=দ্বয়াকারং যস্মিন্ লীনং গতং মহাসুখকমলং। দুহি=দোহনং—কূর্ম্মমুদ্রা-প্রসঙ্গাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।

বসু—উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; অধিকন্তু সংস্কৃত দুলি, ডুলি শব্দের অর্থ স্ত্রীকচ্ছপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ডুলীক্ষীর=কচ্ছপের দুধ, আকাশ-কুসুমবৎ অলীক করিয়াছেন। ভাবানুবাদে লিখিয়াছেন—

"দুলিকে দুহিয়া পীঠে ধরণ না যায়"। টীকাতে "কূর্ম্মমুদ্রা"—দেখিয়া বোধ হয় ডুলি কচ্ছপের কথা মনে উদিত হইয়াছে। কচ্ছপ ছয় প্রকার আছে, তন্মধ্যে এক প্রকারকে সাধারণ কথায় দুরা বা ডুরা বলে,—সংস্কৃতে দুলী, দুলি, ডুলি, দুড়ি। কিন্তু কূর্ম্মমুদ্রা-রূপ যোগের অঙ্গ দুলি দোহন করার সঙ্গে কি অর্থে তুলিত হইল বুঝা গেল না।

পিটা=বজ্রমণি পীঠ; শূন্যতা-রূপ বজ্রের অধিষ্ঠান-স্থান (বসু)।

ধরণ ন জাই=অনভিজ্ঞেরা সেখানে পৌছিতে পারে না। রুখ=কায়াবৃক্ষ। তেন্তলি=চিঞ্চাফল, তেঁতুল; দেহবৃক্ষের ফল বোধিচিত্ত। কুম্ভীর=কুম্ভক সমাধি; খাই=খায়, নিঃস্বভাব করে।

টীকাকার ও বসুর অর্থ—অনভিজ্ঞ সাধকেরা দ্বৈতভাব যাহাতে লীন হইয়াছে, সেই মহাসুখ-কমল দোহন করিয়া অর্থাৎ চিত্তকে নির্ব্বাণমার্গে চালিত করিয়া মহাসুখ-রূপ পৈঠায় ধারণ করিতে পারেন না, কিন্তু গুরুর উপদেশে দেহতরুর ফলস্বরূপ চিত্তকে নিঃস্বভাব করা যাইতে পারে।

কৌলিক অর্থ:—দুলি=দুহেলি, দুল্লহ, দুর্লভ্য, কঠিন, শক্ত—

"কহনি সুহেলি, রহনি দুহেলি"—বলা সহজ, সেই ভাবে থাকা কঠিন।

(গোরখ-বাণী, ৪২ পৃঃ)

দুহি=দুই-হিঁ=দুইএর মধ্যস্থ। লুইপাদের প্রথম দোঁহায় বলা হইয়াছে ধমণ চমণ বা ইড়া-পিঙ্গলা নামক দুই বেণীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত পিণ্ডি বা পিঁড়ি করিয়া চঞ্চল চিত্ত বসিয়া থাকে। যোগশাস্ত্রমতে উক্ত পিঁড়ি আজ্ঞাচক্র এবং ইহার দুইটি দল। ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—"এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে ভেদ নাই"; অন্যান্য চক্রভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে মনকে উঠান বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার; সহজে ঐ পীঠস্থানে পৌছা যায় না।

রুখ=বৃক্ষ;—"বনি বনি চন্দন রুখ ন কোই"—প্রত্যেক বনেই চন্দনগাছ জন্মে না। প্রথম দোঁহায় নরদেহকে তরু বা বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

তেন্তলি=তেঁতেলী (অসমীয়া); তেঁতুল ফল। নরদেহের তেঁতুল কি? তেঁতুলের বীজগুলি পৃথক্ পৃথক্ এক একটি কোটরে

গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় থাকে। এক একটি তেঁতুল ফলে এইরূপ পাঁচ ছয়টি গাঁট থাকে। মানবদেহের মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদ্বারের উপরস্থ মূলাধার চক্র হইতে উর্দ্ধদিকে সহস্রার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা নামক ছয়টি চক্র আছে।

সুষুম্নার বামপার্শ্ব দিয়া ইড়া ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পিঙ্গলা নাড়ী মূলাধার চক্র হইতে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়াছে। স্বাধিষ্ঠান-চক্রে গিয়া এই নাড়ীদ্বয় আবার দিক পরিবর্ত্তন করিয়াছে; ইড়া সুষুম্নার দক্ষিণ পার্শ্বে ও পিঙ্গলা বাম পার্শ্বে চলিয়া গিয়া আবার পূর্ব্ববৎ উর্দ্ধমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই ভাবে গিয়া মণিপুর চক্রে আবার দিক্-পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এইরূপে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত আজ্ঞাচক্রে আসিয়া আবার পরস্পরকে ভেদ করিয়াছে। সুতরাং এই নাড়ীদ্বয়ের চক্রে চক্রে বিপরীত গতির চিত্র আঁকিলে ঠিক একটি তেঁতুল ফলের মতই দেখা যায়। ইহা যেন মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের পীঠস্থানে উঠিবার একটি সিঁড়ি। পার্ব্বত্য লোকেরা মঞ্চে উঠিবার জন্য একটি বৃক্ষখণ্ডে তেঁতুলের গাঁটের মত ধাপ কাটিয়া ইহাকে সি ড়িরূপে ব্যবহার করে; ইহা কোন কোন অঞ্চলে রুখের তেন্তলি বলিয়া পরিচিত।

কুম্ভীর—সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রা নামক একটি সূক্ষ্ম নাড়ী আছে এবং তাহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম চিত্রা বা চিত্রাণী নাড়ী আছে। ইহাতেই ষট্‌চক্ররূপ সাধনপদ্মগুলি গ্রথিত আছে। এই চিত্রিণী বা চিত্রাণী নাড়ীর অন্তরমধ্যেই 'ব্রহ্মনাড়ী' নামক আর একটি নাড়ী মূলাধারের অন্তিম কোণ হইতে উত্থিত হইয়া সহস্রারের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অন্যান্য নাড়ীগুলি আজ্ঞাচক্রেই সীমাবদ্ধ, আর উর্দ্ধে তাহাদের গতি নাই, কিন্তু ব্রহ্মনাড়ী মূলাধার হইতে সহস্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মূলাধারের সর্ব্বনিম্ন স্থানস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর মুখকে ব্রহ্মদ্বার বলা হয়। সহস্রার হইতে অনুলোম গতিতে এক অলৌকিক জ্ঞানধারা নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে, এবং মূলাধারে আসিয়াই লৌকিক জ্ঞানে পরিণত হয়। এই মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিরাজিত; ইহা বাস্তবিক মেরুদণ্ডের যে সর্ব্বনিম্ন অংশ সামান্য বক্র হইয়া গুহ্যদ্বারের দিকে গিয়াছে, সেখানে একটি ক্ষুদ্র পানিফলের মত বস্তু। সহস্রারস্থিত অমৃতধারা গলিত হইয়া আসিয়া ব্রহ্মদ্বার-পথে এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে আপ্লুত করিলেই জীবের জ্ঞানোন্মেষ হয়। কিন্তু লতাতন্তু-সদৃশ অতি সূক্ষ্ম সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে সাড়ে তিন পাকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্রহ্মনাড়ীর মুখে নিজের মুখ দিয়া উহার পথ বন্ধ করিয়া নিদ্রিতা হইয়া আছে। সহস্রার হইতে বিগলিত অমৃতধারা এই সর্পিণীই খাইয়া ফেলাতে জীবের জ্ঞানোন্মেষ হয় না। সুতরাং সাধক সাধনার দ্বারা এই নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া সুষুম্না-পথে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রে উত্থিত করেন; এবং সেখান হইতে ব্রহ্মনাড়ী-পথে আরও উর্দ্ধে সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত মিলিত করান। ইহাকে বলা হয় শক্তিস্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত রতিরসে মত্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কয়েকটি দোঁহাতে এই তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা যথাসময়ে ব্যাখ্যা করা হইবে। কুণ্ডলিনী এই অবস্থায় উপনীত হইলে সাধকের দিব্যজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়।

কুণ্ডলিনী সর্পাকৃতি, সর্পিণী, কুম্ভীর, গ্রাহ—ইনি আজ্ঞাচক্রে উঠিবার তেঁতুলের পথ গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকেন। এই অবস্থাকেই

"রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ" অর্থাৎ খাইয়াছে, গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে বলা হইয়াছে।

আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো ! বিয়াতী।
কানেট চোরে নিল অধরাতী॥ ২

টীকাকার—আঙ্গণ ঘরপণ=শরীর রূপ গৃহের মধ্যস্থিত-উষ্ণীষ কমল—মহাসুখের নিবাস এবং সর্ব্বশূন্যালয়।

সুন ভো বিয়াতী=হে পরিশুদ্ধাবধূতি সাধিকা, শ্রবণ কর।

কানেট চোর—প্রবেশাদিবাতদোষবিভবম্ সহজানন্দেন চোরেণ হৃতম্। সমাধিস্থ অবস্থায় সহজানন্দ চোর নিশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রবাহ-জনিত দোষ অর্দ্ধরাত্রে হরণ করে।

বসু—দেহরূপ গৃহের নিকটেই অর্থাৎ উষ্ণীষ কমলে মহাসুখের আঙ্গিনা রহিয়াছে। ওগো দুঃখনাশকারিণী অবধূতী, আমাকে তথায় লইয়া চল। সেখানে অর্দ্ধেক রাত্রে (টীকায় আছে চতুর্থসন্ধ্যায়াম্) অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক দান সময়ে পূরকরেচকাদি-বর্জ্জিত কুম্ভক দ্বারা আমি স্থির ভাবে বায়ু ধারণ করিয়া সহজানন্দ উপভোগ করিতে পারিব।

এই ব্যাখ্যায় প্রশ্ন থাকিয়া যায়—উষ্ণীষ-কমল দেহের অভ্যন্তরে না হইয়া নিকটে কি করিয়া হইল? অবধূতী অর্থাৎ যাহার সাহায্যে সর্ব্বক্লেশহর নির্ব্বাণ লাভ করা যায়—ইনি স্ত্রীলিঙ্গ কেন? অবধূত হইলে কি হইত না? "আমাকে তথায় লইয়া চল" অর্থবোধক কিছুই পদে নাই। প্রজ্ঞাজ্ঞানাভিষেক শুধু রাত্রে হইবার কোনও বিধান নাই, শেষ রাত্রে বা মধ্যরাত্রেত নহেই। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ—"প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ। নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্॥"

কৌলিক অর্থ :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দ্বিদলীয় আজ্ঞাচক্রস্থ পীঠস্থানে পৌঁছা সহজ নয়, আর সেখানে উঠিবার পথ কুম্ভীর পথ রোধ করিয়া বসিয়া আছে। যদি বা কেহ কষ্ট করিয়াও সেইস্থানে পৌঁছে, তথাপি সেখানে খুব ভাল জিনিষ দেখে না। সেখানে ঘরের আঙ্গিনার দিকে কৃষ্ণ-চোর অর্দ্ধরাত্রে নববিবাহিতা বধূকে চুরি করিয়া নিয়া যায়। সত্য—সে বড়ই বিষম ঠাঁই, সতীর সতীত্বও বজায় থাকে না। আঙ্গন=অঙ্গন, উঠান।' ঘর=ঘরের। পণ= পোণে=দিশে! সুন ভো=ওহে সাধক বা শিষ্য, শ্রবণ কর।

বিয়াতী=বিবাহিতা; বিবাহ=বিয়া; বিবাহিতা=বিয়াতী।

কুম্ভক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জালন্ধর মুদ্রা করিলে প্রাণবায়ু উত্তপ্ত হইয়া নাভিকমলে পৌঁছে, এবং পরে আরও যৌগিক ক্রিয়ার পর ঐ বায়ু মূলাধারে পৌঁছিলেই উত্তপ্ত বায়ুর সংস্পর্শে সর্পাকারা কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন এবং স্বয়ম্ভূলিঙ্গও ব্রহ্মবিবরমুখ ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ষট্‌চক্রের এক একটি কেন্দ্র ভেদ করিয়া সুষুম্না-পথে উর্দ্ধদিকে উত্থিতা হন এবং অতঃপর সহস্রারস্থ পরমশিবের সহিত রতিরসে মত্ত হন। জাগরিতা কুণ্ডলিনী বধূ; শ্বাস-প্রশ্বাস তাহাকে ঠেলিয়া নিয়া প্রেমিক শিবগৃহে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে।

কানেট চোর=কানু চোর, কৃষ্ণ চোর। শ্রীকৃষ্ণ আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী রাধাকে শাশুড়ী ননদের অজ্ঞাতে গৃহ হইতে বাহির করিয়া নিয়া লীলারসে মত্ত হইতেন। হাল কবির গাথাসপ্তশতীতে উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকেই পণ্ডিতেরা এই সম্পর্কীয় প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করেন। প্রাচীন আলবার বৈষ্ণবদের গাথায় ও (অণ্ডালের তিরুপ্পাবাই পদে)

"নাগ্নিরাই"· এবং "কান্নেনের" প্রেমাভিনয়-কাহিনীর বর্ণনা আছে। সুতরাং চর্য্যাপদের রচয়িতার মনেও সেই কাহিনী জাগরূক ছিল।

সাধারণতঃ ষট্চক্রের কথা বলা হয়। কিন্তু মূলাধারাদি প্রধান ছয়টি চক্রের বাহিরেও নরদেহে ললনা, মন ও সোম নামক আরও তিনটি গুপ্তচক্র আছে। সুতরাং এই নবচক্র সহস্রার সহ দশটি হওয়াতে নরদেহকে দশমীও বলা হয়।

আজ্ঞাচক্রের দুইটি দলের পিছনের মিলনাংশের ঠিক উপরেই ষট্দল-বিশিষ্ট গুপ্ত মনশ্চক্র আছে। জীবের বিষয়াসক্ত মন আজ্ঞাচক্রে একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, আজ্ঞা-কেন্দ্রকে ভেদ করিয়া উক্ত দল দুইটির সম্মুখস্থিত মিলনস্থলে প্রদীপশিখার ন্যায় জ্যোতিঃ দর্শন করে। সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে অতি স্বচ্ছ কৃষ্ণমণির ন্যায় একটি বিন্দু আছে; ইহা অতি গভীর কূপের তলসম স্বচ্ছ কৃষ্ণাবয়ব। এই কৃষ্ণ কূপই মস্তিষ্কের মূল বা মনের স্থান। জীব যাহা কিছু চিন্তা বা ভাবনা করে, সে সমস্তই এই স্থানে গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়, এবং সময় সময় তাহা স্পন্দিত হইয়া পূর্ব্বচিন্তা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেইজন্য সাধনার সময় কুণ্ডলিনী ঐ কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করিলেই প্রথমতঃ সাধকের পূর্ব্বচিন্তিত সাংসারিক ভাবসকল উঁকি মারিয়া উঠে, এবং সাংসারিক সর্ব্বক্ষণের অনুষ্ঠান-পুষ্ট চিন্তার মধ্য হইতে নানা কথা মনে পড়িয়া মনকে সাধনপথ হইতে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে।

এই কৃষ্ণকূপ আবার জ্ঞানকূপও বটে, এখানে যোগজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। সাধনার ফলে মনকে আবার বশে আনিতে পারিলে সাধকের তৃতীয় নয়ন প্রকটিত হয়, এবং কুণ্ডলিনী অতঃপর সোমচক্রে প্রবেশ করেন। আঙ্গন ঘরপণ—আজ্ঞাচক্র একটি ত্রিকোণ পীঠস্থান, ইহাকে অকথাদি বা হলক্ষ ক্ষেত্রও বলা বলা হয়। এই চক্রের ত্রিসীমার বাহিরে প্রায় পরস্পর সংলগ্নভাবে মনশ্চক্র ও সোমচক্র বিরাজিত। তাহারা সত্যই ঘরের আঙ্গিনায় নয়, আঙ্গিনার দিকে অবস্থিত।

অসমীয়া ভাষায় বলা হয় ঘরের পোনে, অর্থাৎ ঘরের দিকে, পাশে।

আজ্ঞাচক্রের শীর্ষবিন্দুতে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী পরস্পরকে ভেদ করিয়াছে। এই দুই নাড়ীতে প্রবাহিত শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুর গতির সীমা এই শীর্ষবিন্দু পর্য্যন্ত; ইহার বাহিরে রেচক-পূরকাদির ক্রিয়া চলে না। সুতরাং কুণ্ডলিনী যখন এই বিন্দু অতিক্রম করিয়া ইড়া-পিঙ্গলার তথা রেচকপূরকের আয়ত্তের বাহিরে মনশ্চক্রে উঠিয়া যান, তখন তিনি এতকাল যাহাদের শাসনাধীন ছিলেন,—তাহা-দিগের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন; কৃষ্ণ-চোর বধূকে শাশুড়ীর ঘর হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

অধরাতী—অর্দ্ধরাত্রি,—ঠিক মধ্যরাত্রের পর, রাত্রির চতুর্থ প্রহরে।

"অর্দ্ধরাত্র্যতীতে কালে প্রাণিনাং ধ্বনিবর্জ্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্য্যাৎ পূরককুম্ভকম্॥"
(গোরক্ষসংহিতা, ১।২১৯)

শাস্ত্রমতে মধ্যরাত্রির পরে চতুর্থ প্রহরই যোগসাধনার প্রশস্ত সময়, এই সময় কুম্ভক করিলে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়। যোগীদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

"পয়লা প্রহর সবকোই জাগে, দুছরা প্রহর ভোগী।
তিছরা প্রহর চোর চোট্টা, চৌঠা প্রহর যোগী॥"

সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥ ৩

টীকাকার—সসুরা=শ্বরিতাদি শ্বাস। নিদ=চতুর্থানন্দ যোগনিদ্রাভিভূত। বহুড়ী=বধূ, নৈরাত্ম্য অবধূতী। যোগীন্দ্র যখন পূর্ণ কুম্ভকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন, তখন তাঁহার প্রকৃতিরূপিণী অবধূতী ভববিকল্প পরিহার করিয়া জাগ্রত থাকেন।

কৌলিক অর্থ :—

সসুরা নিদ গেল—শ্বাস ও উৎশ্বাস=সাস-উসাস=সাসু। সসুরা=শ্বাশুড়ীরা। অন্য অর্থে শ্বাশুড়ী-ননদীরা।—"নাভ অস্থানংক মোরা—সাসুনৈং সসুরা"—(গোরখবাণী)

গোরখনাথ বলেন—

"চন্দসূর দোউ গগমে বিলুধা, ভইলা ঘোর অন্ধারং।
পঞ্চ বাইক জব ন্যংদ্রা পৌঢ্যা, প্রগট্যা ফৌলি পগারং॥
(গোরখবাণী, ৯৬পৃঃ, ৪ পদ)

অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলা যখন গগনে বিলুপ্ত হইল, তখন ঘোর অন্ধকার জানিয়া পঞ্চবায়ু (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) নিদ্রায় পতিত হইলে চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া যায়।

আবার—"নগরকোটিকী বহুবিধি গলী, সুন্দরী এক রাজন্দরি খড়ি।
পঞ্চ মহাঋষি তঁহা কুটবাল, তিনকী ক্রিয়া মহা ঝুঝারি॥
ইনহি মারি যে লাগৈ পন্থা, সুন্দরী জিতৈ লোক সৌকন্থা॥
(গোরখবাণী, ১৬৭পৃঃ, ২৪-২৫ পদ)

অর্থাৎ দেহনগর চারিদিকে প্রাকারবেষ্টিত, ইহাতে অসংখ্য গলি (নাড়ী) আছে। রাজদ্বারে এক সুন্দরী নারী (কুণ্ডলিনী) পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাঁচ জন মহা-ঋষি কতোয়াল স্বরূপে দণ্ডায়মান (চেতনি পহরৈ—কোটবাল বুলিয়ে—গোরখবাণী, ১২০পৃঃ, ২পদ) আছে। ঐ নারী মহাবলবতী ও যুদ্ধকুশলা। প্রহরীদিগকে মারিয়া যে পথ উন্মুক্ত করিতে পারে, সেই সুন্দরীকে লাভ করে এবং সমগ্র জগৎসহ দেহ-নগরকে জয় করে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—শ্বাস-প্রশ্বাস আদি বায়ুই শ্বাশুড়ীননদী, এবং কুলকুণ্ডলিনী বিয়াতী বহুড়ী বা বধূ।

নিদ গেল—নিদ্রা গেলেন, নিদ্রিত হইলেন।

"গোরখ পুছৈ বাবা মচ্ছিন্দ্র যা ন্যংদ্রা কহাঁথৈ আয়ৈ।"

অর্থাৎ গোরখনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা মৎস্যেন্দ্র, নিদ্রা কোথা হইতে আসে।"

মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিলেন—

"গগনমণ্ডল মেঁ সুন্যি দ্বার। বিজলী চমকৈ ঘোর অন্ধার।
তা মহি ন্যংদ্রা আয়ৈ জায়ৈ। পঞ্চতত্ত্বমেঁ রহৈ সমাই॥"
(গোরখবাণী, ৬০পৃঃ, ১৭৬ পদ)

অর্থাৎ গগনমণ্ডল সহস্রারে একটি শূন্যদ্বার আছে, সেখানে ঘোর অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকায়; সেখান হইতে নিদ্রা আসা যাওয়া করে এবং শরীরের পঞ্চতত্ত্বে প্রবেশ করে।

আগে মনশ্চক্রের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথের বাণীর অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। কুম্ভকযোগে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ হইল, কুণ্ডলিনী মনের সহিত তাহাদের আওতা ছাড়িয়া মনশ্চক্রের কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস এখন নিদ্রিত কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগ্রতা, তিনি সেখান হইতে সোমচক্রে যান, তারপর আরও উর্দ্ধে যাইবার সময় শঙ্খিনী নাড়ীর ক্রিয়ার সীমাও পর্য্যবসিত হইল। শঙ্খিনী নাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্না হইতে বিচ্ছিন্না

হইয়া গেল ; তারপর কতক অংশ শূন্য—ইহাকে নিরালম্ব পুরী বলে ; তারপর সহস্রার। কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাকে আর কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ?

দিবসই বহুড়ী কাড়ৈ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥৪

টীকাকার—মূদ্বাস্থাদি ভেদে সেই অবধূতী নিজে শুক্ররূপে ত্রৈলোক্য নির্ম্মাণ করিয়া দিব্যাদি জ্ঞান সঞ্চার করে এবং কাড়ই বা কায়কালপুরুষ হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রজ্ঞাদ্বারা প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া কামরূপে অর্থৎ মহাসুখ চক্র স্বস্থানে নির্ব্বিকল্প প্রাপ্ত হয়।

বসু—চিত্তের সজাগ অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়াদি সজাগ থাকে, তখনই দিবস। চিত্তই দৃশ্যদর্শনের হেতু, অতএব নিজ সংবৃত্তি দ্বারা ইহা জগৎসৃষ্টি করিয়া জগতের ভীষণ পরিণতি দেখিয়া নিজেই ভীত হয়। কিন্তু প্রজ্ঞার উদয় হইলে ইন্দ্রিয়াদির সুষুপ্তি হেতু চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া নির্ব্বিকল্পাকারে মহাসুখ-সঙ্গমে গমন করে।

কৌলিক ব্যাখ্যা :—"শিষ্যগুরুসংবাদ" নামক একখানি নাথগ্রন্থে (ছাপা হয় নাই) দিবস ও রাত্রি সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—

শ্রীগোরক্ষ উবাচ—
"ও স্বামি ! দিন ন হোতা ত রাত্রি কাহাঁছে আয়ে।
আদি প্রভু জ্যোতি কাহাঁ সামাইয়ে ॥
পিণ্ড নোহে ত প্রাণকা নিবাস কোন্ ঘরে।
দিন হোতা ত রাত্রি কাহাঁ সামাইয়ে ॥"

শ্রীমৎস্যেন্দ্র উবাচ—
"অবধূত ! দিন ন হোতা ত রাত্রি সহজছে আয়ে।
আদি প্রভু জ্যোতি প্রাণ সামাইয়ে ॥
পিণ্ড নোহে প্রাণ শূন্য বিশ্বঘরে।
দিন হোতা ত রাত্রি সহজে সামাইয়ে ॥"

অর্থাৎ সহজ অবস্থা প্রাপ্তির নাম রাত্রি ; তখন আদিজ্যোতি প্রাণে প্রবেশ করে, এবং প্রাণ শূন্য ঘরে বিরাজ করে। ইহার বিপরীত অবস্থাই দিবস। কুণ্ডলিনী যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের আওতায় ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার পক্ষে দিবস ছিল।

কুম্ভক-ক্রিয়ার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের তপ্ত বায়ু যোগে যখন কুণ্ডলিনী উর্দ্ধগতি লাভ করেন, তখন প্রতিচক্রে আসিয়া তাহাকে বাধাপ্রাপ্ত হইতে হয়, এবং প্রতিচক্রে বাণবিদ্ধবৎ এক একটি আঘাত পাইয়া যেন উর্দ্ধে উঠেন। এই সময় সাধকের শরীরেও বেপথু উপস্থিত হয়। যাঁহারা সামান্যভাবেও প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতে পারেন।

কাড়ই = কাড়ৈ = কাঁড়, তীর, বাণ। ভাঅ = ভাব দেখান।

পূর্ব্বোক্ত নিরালম্বপুরী বা শূন্যস্থানের পরেই সহস্রারের নিম্নভাগ। সেই নিম্নদেশে পশ্চিমাভিমুখে একটি যোনিস্থান আছে, এখানেও ত্রিকোণ রেখারূপে কামকলা বা শক্তিপীঠ বা ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। ইহাকে কামপুর বলা হয় ; চর্য্যাপদে কামরূপ বলা হইয়াছে। কুণ্ডলিনী শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ শ্বাশুড়ী-ননদীর শাসনবিমুক্ত হইয়া তাহাদের নিদ্রিতাবস্থায় সহস্রারের যোনিময় কামরূপ নগরে প্রবেশ করিয়া পরমশিবের সহিত মিলিত হন। তখন শিবশক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে একাকার।

অইছেন চর্য্যা কুক্কুরীপাত্র গাইড়।
কোটি মাজে একু হিঅহি সমাহড় ॥ ৫

(পাঠান্তর কোড়ি)

কুক্কুরীপাদ সিদ্ধা এই চর্য্যাপদ গাহিয়াছেন; ইহার তত্ত্ব কোটিজনের মধ্যে এক জনের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে।

চর্য্যার ভাবানুবাদ—

দ্বিদলীয় পীঠস্থান সহজপ্রাপ্য নয়।
উঠিবার বৃক্ষের সিঁড়ি কুম্ভীরে গ্রাসয়॥
আরো শুন! পীঠগৃহের অঙ্গনের ধারে।
অর্দ্ধরাত্রে নববধূ হরে কৃষ্ণ চোরে॥
শ্বাশুড়ীরা নিদ্রা গেলে বধূ রয় জাগি।
তারে নিলে কানুচোরে কোথা গিয়া মাগি॥
দিবসে বধূয়া যেন ভীত বাণ ডরে।
রাত্তি হইলে চলে যায় কামরূপ নগরে॥
আচার্য্য কুক্কুরীপাদে এই চর্য্যা গায়।
কোটি মাঝে গুটি যদি বুঝিবারে পায়॥

পৌরুষ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

"সমরথ মারি হিজড়া বনে
　　দোষসাধন মেঁ জান"—রজ্জব।
বিফল সাধন পৌরুষে মারি
　　বানায় যাহাতে ক্লীব।
জীবনধর্ম্ম গেলে হয় জড়
　　নর থাকে নাক জীব।
দয়ার ধর্ম্ম সাধন করিতে
　　পৌরুষে যেবা মারে।
ঘাতক-বৃত্তি পালে সেই জন
　　দয়াল বলি না তারে।
একটি শাবকে মারিয়া ফেলিয়া
　　তাহার অংশ দিয়া
বাঘ-বিড়ালেরা অন্য শাবকে
　　রাখে বটে জিয়াইয়া।
পশুর এ রীতি, সাধকের রীতি
　　চির অহিংসাময়।
এক 'ভাবে' মারি অন্য 'ভাবের'
　　পোষণ সাধনা নয়

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অস্ফুট স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

সে আজ অনেক দিনের কথা, ১৯১৮ কি ১৯১৯ খ্রীঃ হইবে। জীবনের এক অধ্যায় প্রায় শেষ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছি। শরীরটি বিকল, উহা সারাইতে হইবে। গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ পূর্ব-পরিচিত দুইটী বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের সহিত কিছুকাল পূর্বে কয়েক বার বেলুড় মঠে যাতায়াত করিয়াছিলাম। দেখা হইতেই বন্ধুগণ আমার ভবিষ্যৎ জীবনধারা কোন দিকে প্রবাহিত হইবে জিজ্ঞাসা করেন। এ বিষয়ে তখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই বলায় এক জন বলিলেন, "এখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে। আমরা সেখানে যাতায়াত করি। তুমিও ভাই, সেখানে যাইও।" শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া উহা আমার পক্ষে বর্তমানে সম্ভব নহে বলিলাম। তদুত্তরে তখনই অন্য বন্ধুটী বলিলেন, "ওহে সেখানে যাইও, সেখানে একজন আমেরিকা-ফেরত সাধু আছেন দেখিবে। তিনি স্বামিজীর সমসাময়িক।"

নানা বিষয়ে আলোচনার পর মিশনে মাঝে মাঝে যাইতে স্বীকৃত হইলাম, এবং প্রথম বন্ধুটীর সহিত বোধ হয় পর দিনই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মিশনে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন ও নবীন কয়েক জন সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের পর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সান্নিধ্যে বন্ধুবর আমাকে লইয়া গেলেন। তিনি তখন অম্বিকা-কুটীরের বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। দেখিলাম তিনি অতি সৌম্য-মূর্তি, সর্বাঙ্গ হইতে যেন অপূর্ব-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক আমরা আসন গ্রহণ করিলাম। তিনিও আমাদের কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কাশীতে কেন আসিয়াছি, কত দিন থাকিব এবং কোথায় উঠিয়াছি প্রশ্ন করিলেন। সকল বিষয়ে যথাযথ উত্তর দিবার পর, তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার নিকট সুবিধামত আসিতে বলিলেন।

মিশনের প্রতি আকর্ষণ ইতঃপূর্বে আমার বিশেষ কিছু ছিল না। দুই একবার বেলুড় মঠে যাতায়াত করিলেও জীবনধারা অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছিল। তাই এবারও অনুরূপই হইবে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অদ্ভুত পুরুষের আকর্ষণ তখন হইতেই কেম যেন একটু একটু অনুভব করিতে লাগিলাম। বন্ধুবরও নাছোড়বান্দা। সুতরাং তাঁহার সহিত পরে প্রায় প্রতিদিনই সেবাশ্রমে আসিতে হইল ও শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর পুণ্য সঙ্গ, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিলাম। স্বামিজী তখন খুবই অসুস্থ। কিন্তু রোজই দেখিতাম তিনি ধীরস্থির ভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট অতি সুন্দর সুমিষ্ট ভাষায় নানা শাস্ত্র হইতে নানারূপ শ্লোক উদ্ধার-পূর্বক প্রত্যেকের জীবন-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। তখন আমরা ঘোর সংশয়বাদী, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান অতি অল্পই ছিল। তাই অনেক সময়েই স্বামিজীর অপূর্ব উপদেশের কিছুই বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার বলিবার অলৌকিক ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

স্বামী তুরীয়ানন্দজী হঠাৎ একদিন গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

এই শ্লোকটী অতি গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আত্মাকে আত্মাদ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে, তিনিই তোমার বন্ধু। তাঁহাকে না জানিতে পারিলেই তিনি তোমার রিপু হইয়া পড়েন। তিনি ব্যতীত তোমাকে উদ্ধার করিতে জগতে আর কেহ নাই। আমাদের সকলের তাঁহারই শরণ লইতে হইবে।" পূর্বে কিছু দিন হইতে তাঁহার মুখে নানাপ্রকার শ্লোকাবৃত্তি শুনিলেও, তাঁহার ঐদিনের উক্ত শ্লোকটির অপূর্ব আবৃত্তি যথার্থই আমাদের প্রাণে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ভাবিলাম, সত্যই কি আমাদের ভিতর এইরূপ এক আত্মা রহিয়াছেন যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ও সর্বাশ্রয়। তাঁহার ধ্যানচিন্তায় কি আমাদের সর্বপ্রকার দৌর্বল্য বিদূরিত হইয়া যায়?

সেদিনের সেই শ্লোকের ঝঙ্কার আজও কানে বাজিতেছে। তাঁহার ঐদিনের উদাত্তকণ্ঠের আবৃত্তি শুনিয়া সত্যই মনে হইয়াছিল, আমাদের সেই মহান আত্মা রহিয়াছেন। তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে জীবনে সবই বৃথা হইয়া যাইবে। তার পর বহুদিনই শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর নিকট গিয়াছি। একথা সেকথা বলিয়া, কি আশ্চর্য্য!—মাঝে মাঝে ঐ অপূর্ব শ্লোকটি সেই স্বর্গীয় তেজঃসম্পন্ন ঋষি আমাদের নিকট আবৃত্তি করিতেন। আমাদের তৎক্ষণাৎ মনে হইত, বেদান্তের সাক্ষাৎ মূর্ত ঋষি যেন আমাদের ভিতরে সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিতে অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু তখন সংশয়াকুল যুবক আমরা। তাঁহার এই গম্ভীর প্রত্যক্ষোপলব্ধির বাণী শুনিয়াও মাঝে মাঝে ঘোর সংশয়ে পড়িতাম। চপলমতি বালকের বুদ্ধি লইয়া কত দিনই না তাঁহার সহিত কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি। তিনি কখনও কখনও হাসিয়া হাসিয়া, কখন বা তীব্র ভৎর্সনা করিয়া আমাদের ঐ অলীক সংশয় দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন।

মনে পড়ে, এক দিন বৈকালে তাঁহার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে সেবাশ্রমের নিকটেই দেখিলাম বহু যাত্রী দেশবিদেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। সেদিন পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ ছিল। শ্রদ্ধেয় স্বামিজী উহা দেখিয়া আমাদিগকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ দেখ, কি ভক্তি লইয়া কত দূর দেশ হইতে এই সকল যাত্রী আসিয়া একত্রিত হইয়াছে আজ গ্রহণ, তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া ধন্য হইবে। ইংরেজী কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম,—গ্রহণ বিষয়ে বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র যাহা বলে, তাহা কিছু কিছু জানিতাম। বিদ্যাভিমানীর মত বলিয়া উঠিলাম, "মহারাজ, এতো ঘোর কুসংস্কার! রাহু তো কখনই চন্দ্রকে গ্রাস করিবে না। পৃথিবীর ছায়ামাত্র পড়ে বলিয়াই তো চন্দ্রকে ঐরূপ রাহুগ্রস্ত দেখায়। এতগুলি লোক কেন সেই ভ্রান্ত ধারণায় পড়িয়া চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত ভাবিবে ও গঙ্গাস্নানে আপনাদিগকে পাপমুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে?" স্বামিজী আমার কথা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তুমি কি এই বিষয়ে সবই জানিয়া ফেলিয়াছ? কোন্ অনাদি কাল হইতে এইরূপ কত ভক্ত আসিয়া এই ভাবে তাহাদের মনের ময়লা কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার কি কোন ফলই নাই?" কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক আমরা তাঁহার এই কথা নির্বিচারে মানিয়া লই নাই। এই বিষয়ে আমরা যাহা যাহা পড়িয়াছি, সবই নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে বলিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি সেই দিন আর

কোন কথা না বলিয়া সেবাশ্রমে ফিরিয়া উপস্থিত সাধুদের বলিলেন, "শোন, এই ছেলেটা গ্রহণ সম্বন্ধে কি বলিতেছে!" তাঁহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিলেন মাত্র। পর দিন আশ্রমে গেলে শ্রদ্ধেয় স্বামিজী সস্নেহে আমাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "গ্রহণ-স্নানের কথা কাল যাহা বলিতেছিলে, উহার অনেক অর্থ আছে। আমাদের ঋষিগণ কোন জিনিষই বৃথা আমাদের শাস্ত্রে লিখিয়া যান নাই। ছোট বালক দেখিয়াছ তো?—তাহারা সাধারণত তিন শ্রেণীর থাকে। একদল সুবোধ। তাহাদিগকে অভি-ভাবকগণ বলিলেই পড়িতে বসিয়া যায়। দ্বিতীয় দলকে পড়াশুনা করাইবার জন্য অভি-ভাবকগণের মিঠাইমণ্ডা প্রভৃতি উপহার দিতে হয়। ঐ শ্রেণীর বালকগণ সেইজন্যই পড়ায় মনঃসংযোগ করে। কিন্তু আর একদল বালক আছে যাহারা উহাতেও ভুলে না। তাহাদের জন্য সেই কারণেই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উহা না হইলে, তাহারা পড়িতে বসিবে না। আমাদের শাস্ত্রকার ও ঋষিগণও দেখিয়াছেন আমাদের ভিতরেও ঐরূপ তিন শ্রেণীর লোক আছে। যাহারা বিশেষ ভাগ্যবান, তাহারা শাস্ত্রকথা শুনিয়াই সংসার অনিত্য জ্ঞান করিয়া নিত্যবস্তু লাভের জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু এই ভাগ্যবানের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তাই শাস্ত্রকারগণ অপরদিগের জন্য ঐরূপ মোদক বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রকৃতির এই সকল পরিবর্তনের সময় এইরূপ এইরূপ ভজন-পূজন ও অনুষ্ঠানাদি করিলে উহাতে বিশেষ ফল অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গাদি পাইবে। একদল লোক ঐ লোভেই ঐ সকল অনুষ্ঠানাদি পালন করে ও অন্ততঃ সেই সময়টুকু সমগ্র মনপ্রাণ শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা উহাতেও অনিত্য সুখের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। শাস্ত্র তাহাদের জন্যই বেত্রাঘাত বা নরকাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য ইহাই, যে কোন প্রকারেই হউক উহারা শ্রীভগবানের দিকে মন সমর্পণ করিবার চেষ্টা করুক। তাহা হইলে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। শুধু মিষ্ট কথায় উহাদিগকে বুঝাইলে তো হইবে না। তাই এই সকল পুরস্কার ও শাস্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা। যাঁহারা প্রতিক্ষণ তাঁহার নাম করিতে পারেন, অবশ্য তাহাদের এই সকলের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর লোক ক'জন আছে বল?"

আর একদিনের কথা। বালকসুলভ চাপল্য-হেতু পুনরায় একদিন পূজনীয় হরি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, "মহারাজ, গঙ্গাস্নান করিয়া কি লাভ হয়?" তিনি বলিলেন, "তুমি কি গঙ্গাকে সামান্য নদীমাত্র মনে কর?" পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রগল্‌ভতার বশে বলিলাম, "না মহারাজ, ৺কাশীতে গঙ্গার যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে নদীও বলা যাইতে পারে না।" মহারাজজী হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণই গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাদের লেখা পুস্তকের দুইচার পাতা পড়িয়া তোমরা আজ তোমাদের দেশের দেবদেবীগণকে এইরূপ অশ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছ, জান কি পূজ্যপাদ স্বামিজী (বিবেকা-নন্দ) তোমাদেরই শাস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগের (বিদেশীদের) জয় করিয়া আসিয়াছেন? এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে তিনি কিরূপ ভাবগদ্‌গদ হইয়া পড়িতেন! শুধু তিনি কেন, অনাদি কাল হইতে কত মুনিঋষি এই গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করও ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তোমরা

দুই-একখানি পাশ্চাত্য পুস্তক পড়িয়াই আজ গঙ্গাকে অনাদর করিতে শিখিয়াছ !"

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় তুরীয়ানন্দ স্বামিজীর গঙ্গার প্রতি অবিচলিত ভক্তির দুই একটি কথা উল্লেখ না করিলে আমার বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বহুদিন দেখিয়াছি, অতি অসুস্থ শরীর লইয়াও তিনি পদব্রজে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-দর্শনে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে দশাশ্বমেধ-ঘাটে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গাদর্শন করিতেন। সেখানে আমাদের সহিত দেখা হইলে অনেক সিঁড়ির নীচ হইতে গঙ্গাজল হাতে করিয়া আনিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিতে বলিতেন। তখন কিছু না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি, সেই বহুঋষি-পূজিতা গঙ্গাদেবীকে তিনি সত্য-সত্যই দেবী বলিয়া মনে করিতেন। সেই হেতু তাঁহাকে নিত্য দর্শন-স্পর্শন করিয়া যাহাতে আমাদিগের মত অবিশ্বাসী যুবকের মনেও ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য তিনি এইরূপে অশেষ চেষ্টা করিতেন।

পরমজ্ঞানী হইলেও তাঁহাকে এই সময়ে অসুস্থ শরীর লইয়া অতি কষ্টে কয়েকবার বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইতে দেখিয়াছি। কাশীধামের মাহাত্ম্যও তাঁহার মুখে এই সময়ে বহুবার শুনিয়া ধন্য হইয়াছি। "কাশীকা সমান নাই পুরী" গানের এই পদটী গাইতে গাইতে ভাবগদগদ-চিত্ত হইয়া বলিতেন, "কাশীর মত স্থান কি আর ভূ-ভারতে আছে ? সম্পূর্ণ শরীর-বোধ-রহিত ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত কত মহাপুরুষই এ-স্থানে বাস করিয়া এ স্থানটিকে পরম তীর্থ করিয়া গিয়াছেন !"

শিবরাত্রির দিনে উপবাস করিয়া আমাদের আশ্রমের সাধুদের বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতে দেখিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, "যাও, তোমরা ব্রতী। তোমরা অদ্যকার দিনে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া ধন্য হও। আমার শরীরে আর সামর্থ্য নাই, তাই আমার পক্ষে উহা সম্ভব নহে।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতেই সেই পরমজ্ঞানী তাঁহার হৃদয়ের অলৌকিক জ্ঞানের কথা আমাদের নিকটে এইভাবে প্রকাশ করিয়া বসিতেন, "তোমরা তাঁহাকে সেখানে যাইয়া দর্শন কর। আমি কিন্তু তাঁহাকে এইখানে (নিজ শরীর দেখাইয়া) দর্শন করিতেছি।"

তাঁহার এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির কথা প্রায় একই সময়ে শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া যাইতাম। আমরা বুঝিতাম না কোনটির সাধনা করিয়া তিনি এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে যাহাতে সেই পরমসত্য উদ্ভাসিত হয়, যাহাতে প্রবল পুরুষকার-সহায়ে আমরা যথার্থ জ্ঞানলাভে ধন্য হইতে পারি তজ্জন্য তাঁহার কত চেষ্টাই না প্রতিক্ষণ অনুভব করিতাম ! আমাদিগের অভিমানে আঘাত করিয়া বলিতেন, "তোমরা কি ছেলে ?—তোমরা 'পিলে' মাত্র।" উপহাসচ্ছলে এই কথাটি উল্লেখ করিয়া আরও বলিতেন, "ছেলে ছিলেন স্বামিজী, যাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন 'পুরুষ-পায়রা,' ঠোঁট ধরিলেই ঠোঁট ছিনাইয়া লইয়া যায় ; তেজস্বী বলদ, যাহার ল্যাজে হাত দিলেই তিড়িং বিড়িং করিয়া উঠে। তোমরা কি এইরূপ হইতে পার ?"

একদিন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, কিছু উপদেশ দিন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ওহে চোখে চশমা পরিলে কি হইবে ? আগে চোখটি খোল, নতুবা চশমায় কোন কাজই হইবে না।" আবার সেই 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া

বলিলেন, "আত্মাকে নিজের পুরুষকার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে। নতুবা কে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে বল ?"

একটী ছেলে কয়েক বৎসর রাজনৈতিক কারণে সরকারের নির্যাতন ভোগ করিয়া জেল হইতে মুক্ত হইয়া হরি মহারাজজীর নিকট আসিলে, তিনি দুই একটী কথা বলিয়াই তাহার ভিতরের তেজস্বিতার পরিচয় পাইলেন। ইহাতে পরম প্রীত হইয়া পরে আমাকে বলিলেন, "ছেলে হইলে এইরূপ ছেলেই চাই। দেখনা আমাদের মুখের সামনেই বলিয়া গেল, 'যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের আমি বলিব coward (ভীরু), সংসারের দুঃখকষ্টের সহিত তাঁহারা দুঃখ করিলেন না কেন ?' ছেলেটী স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়িয়াছিল ও তাঁহার বিশেষ ভক্ত ছিল। তাই তাহার ঐ কথার উত্তরে আমি বলিলাম,—তোমার স্বামিজী, তিনিও তো তাহা হইলে এইরূপ coward ? ছেলেটি তখন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু উহার সাহসিকতা দেখ, এইরূপ সাহসী ছেলেরই আমাদের প্রয়োজন।"

যখন কোন কাজকর্ম লইয়া স্থানীয় কর্মীদের মধ্যে সামান্য সামান্য মনোমালিন্য হইত, তখন দেখিয়াছি হরি মহারাজ তাঁহাদিগকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, "তোরা কিসের ধ্যানভজন করিস্ ? তোরা কি ঠাকুরঘরে যাইয়া মালাজপ করিয়া আসিলি না কলা চটকাইলি ? ওরে, সন্তুষ্ট যদি কাহাকেও করিতে হয় তো তোর ভিতরে যে অন্তরাত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকেই সন্তুষ্ট কর। তখন দেখিবি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে। নতুবা, এই সকল কাজ করিয়া তোরা কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে যাইতেছিস বল্ ?"

আমার শরীর বহুদিন হইতে খারাপ ছিল। তাঁহার নিকট গেলে তিনি উহার খবর নিত্যই লইতেন। কিন্তু এই শরীরবুদ্ধি যে আমার ধর্মজীবন-লাভের প্রধান অন্তরায় তাহা তখন বুঝিতাম না। তাই সেই পরম-কারুণিক একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, উহার (অপরের) সংসার-আসক্তির কথা বলিতেছ। কিন্তু এই শরীরটিওতো সংসার! কি বল ?" তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, হঠাৎ তিনি আজ একি অদ্ভুত কথা বলিতেছেন। এই শরীরটির তো তিনি নিত্য কতভাবে খোঁজ লইতেছিলেন। কিন্তু আজ আবার একি কথা বলিলেন!—চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু জলদগম্ভীরস্বরে পুনরায় তিনি ঐ প্রশ্নের আবৃত্তি করিলেন। আমার স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কে যেন আমার মস্তকে দারুণ আঘাত করিয়া আমার চিরন্তন দেহবুদ্ধির দুর্গ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলাম। পরে চাহিয়া দেখি আচার্যবর সোৎসুক নয়নে আমার নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছেন। হাত জোড় করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "হ্যাঁ, মহারাজ, এই শরীরটি সত্যই সংসার। আশীর্বাদ করুন যেন আত্মবুদ্ধি আমার দৃঢ় হইতে পারে।"

তারপর কতদিনই না তিনি আমাদিগের ভিতরে সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতদিন বলিয়াছেন, "দেখ, হরিণের নাভিতে কস্তুরী আছে, কিন্তু হরিণ উহার সন্ধান জানে না। তাই বৃথা পাগল হইয়া সে উহার সন্ধানে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া মরে। তোমরাও যখন অন্তরাত্মার সন্ধান পাইবে, তখন আর এইরূপে ঘুরিয়া মরিবে না।" আবার কখনও কখনও তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া বলিতেন, "দেখ, শ্রীশ্রীঠাকুরও এইরূপে

নিজের মাথাটিকে সামান্য একখানি গামছায় ঢাকিয়া আমাদিগকে বলিতেন, 'তোমরা কি আমাকে এখন দেখিতে পাইতেছ? অথচ সামান্য একটি গামছায় আমার মুখখানি তো আড়াল করিয়া রাখিয়াছি। এইরূপেই মহামায়া তাঁহার সামান্য অবগুণ্ঠন দ্বারা হৃদয়স্থিত সেই পরব্রহ্মকে আমাদের নিকট অজ্ঞাত রাখিয়াছেন। ঐ অবগুণ্ঠনটি সরাইয়া ফেল, চিরদিনই তিনি তোমার অন্তরে বিরাজমান'।"

এইপ্রসঙ্গে হরি মহারাজ বলিতেন, "শ্রদ্ধেয় স্বামিজী (বিবেকানন্দ) নানাতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক পরিত্যক্ত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহার গাত্রে কবে কোন্ সাধক এই সুন্দর দোঁহাটি লিখিয়া গিয়াছেন—

চাহি চামারী চুহী তু সব নীচ উন্ কো নীচ।
ইয়ে তো পূরণ ব্রহ্ম থা যব তু নহী হোতী বীচ॥

ইহার অর্থ এই : "হে চামারী, হে মেথরাণী বাসনা, তুই নীচ হইতেও নীচ। আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি তো পূর্ণব্রহ্মই। কিন্তু তুইই তো মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইহাকে এইরূপ ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছিস!" দোঁহাটী আবৃত্তি করিয়া হরি মহারাজ বলিতেন, "দেখ, এই সামান্য দোঁহাটিতে বেদান্তের কি অপূর্ব ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে! মহামায়া এইরূপেই আমাদের নিকট হইতে আমাদিগের স্বরূপজ্ঞান লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

আর একদিনের কথা। হরি মহারাজের আদেশ লইয়া আমি দেশে আসিয়াছি, পড়াশুনা শেষ করিতে হইবে। কিন্তু ভিতরে তিনি যে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন তাহাতে উহা সম্ভব হইতেছিল না। তাঁহাকে একপত্রে লিখিলাম, "মহারাজ, আশীর্বাদ করিবেন যেন বন্ধনমুক্ত হইতে পারি।" পরম দয়ালু জ্ঞানিবর অমনিই নিজহস্তে উহার উত্তর দিলেন। নানা কথার পর লিখিলেন, "বন্ধন মনে করিলেই তো বন্ধন, নতুবা কে তোমায় বাঁধে? তুমি তো সদাই মুক্ত।"

সাধু শান্তিনাথ মহারাজজীর নিকট এই সময়ে প্রায়ই যাইতেন। শান্তিনাথজী তখন মৌনী, কঠোর সাধন-ভজন করিবার ফলে তখন তাঁহার কিছু কিছু মস্তিষ্কপীড়াও দেখা দিয়াছিল। রোজই মহারাজজী তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন তাঁহার কঠোর সাধন-ভজনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে সস্নেহে বলিলেন, "দেখ শান্তিনাথ, সবই তো করিলে। কিন্তু জানিও, মহামায়ার কৃপা ছাড়া কিছু হইবার নহে। তাঁহার শরণাগত হও।" জ্ঞানিবরের মুখে সেদিন আমরা এইরূপ শরণাগতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

এইরূপ কত জ্ঞান ও ভক্তির কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়া আমরা ধন্য হইয়া গিয়াছি। এখন আমার মনে হয়, সেই পরশমণির পরশ না পাইলে জীবন বৃথা হইয়া যাইত।

"একটু সাধন করে ঈশ্বরদর্শন হ'ল না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য ধরে সাধন করতে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার ওপর হবে।" —শ্রীরামকৃষ্ণ

চিতি-শক্তি

শ্রীদীননাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ

চিতি শব্দের অর্থ চেতনা বা চৈতন্য। সংজ্ঞানার্থক চিৎ (চিতী সংজ্ঞানে) ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয় করিয়া চিতি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শক্তি শব্দের বহু অর্থ, ইহা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত। সামর্থ্য, বল প্রভৃতি অর্থ প্রকৃতি-প্রত্যয় হইতে লব্ধ বলিয়া এইগুলি শক্তি শব্দের যৌগিকার্থ। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিকে সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী, চৈতন্যময়ী, সর্ব্বজীবৈকগম্যা, সৃষ্টি-স্থিতিলয়বিধাত্রী, জীবের ভবভয়হর্ত্রী, পরা প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে পদ-পদার্থের সম্বন্ধকে 'শক্তি' নাম দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে শক্তি শব্দ যোগ্যতা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত। বেদান্তে মায়াকে শক্তি বলা হয়। কোথাও ইহা স্বরূপ বা স্বভাব অর্থে গৃহীত হইয়াছে। "শক্তি-র্দ্রব্যাদিকস্বরূপমেব" (সপ্তপদার্থী-সংহিতা)। 'যোগবাশিষ্ঠে' পরিচ্ছিন্ন বা অপরিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্রকেই শক্তি বলা হইয়াছে। দ্রব্যগুণাদি পদার্থমাত্রের স্বরূপই শক্তি। ইহা হইতে 'শক্তি' শব্দের একটী অর্থ স্বরূপ বা স্বভাব জ্ঞাত হয়। এই স্বরূপ বা স্বভাব অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রকৃত বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

সমস্ত চিতি-শক্তির অর্থ চৈতন্যস্বরূপ। যে বস্তুর যাহা স্বভাব, সেই বস্তুর ধ্বংস ব্যতীত তাহার সেই স্বভাবের নাশ হয় না। সাংখ্য-শাস্ত্র পুরুষকে 'চিতি শক্তি' অর্থাৎ চৈতন্য-স্বভাব এবং বেদান্ত ইহাকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন। এখন এই চিতি-শক্তির লক্ষণ, স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। যাহা দ্বারা লক্ষ্য বস্তুকে জানা যায় তাহাকে সাধারণতঃ লক্ষণ বলে। ইহার স্বরূপলক্ষণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। বেদান্তমতে চিতি-শক্তিতে কোন বিশেষণ বা ধর্ম্ম নাই, সেই জন্য ইহার স্বরূপই লক্ষণ। ইহার স্বরূপ ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর বলিয়া স্বরূপলক্ষণের সম্যক জ্ঞান হয় না, সেইজন্য "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) ইহার তটস্থ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। নদীতটে অবস্থিত বৃক্ষবিশেষাদি নদীর বিশেষণ বা ধর্ম্ম না হইয়াও যেমন তাহার লক্ষণ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ কর্ত্তৃত্ব রূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মে না থাকিলেও তাঁহার লক্ষণ হইতে পারে। সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মের উপলক্ষণ। চিতিতে সৃষ্ট্যাদি বাস্তবিক নাই, যদি থাকে তাহা হইলে "অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চো-পশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও "ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ" ইত্যাদি স্মৃতির বিরোধ দেখা দেয়। আরও বলা যাইতে পারে যে বাস্তব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈতপ্রসঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া ও তাহার কর্ত্তা স্বীকার করা ব্যতীত উপায় থাকে না। এইজন্য অবিদ্যারূপ উপাধিজন্য কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম চিতিতে আরোপিত ইহা স্বীকার করিতে হয়।

এখন ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। শ্রুতি ইহাকে অভোক্তা অশ্রোতা অমন্তা অকর্ত্তা ইত্যাদি নিষেধমুখে বিবৃত করিয়া সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন; সৎ-চিৎ প্রভৃতি ইহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু স্বরূপ। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সহজ ভাবে বেদান্তের সার বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।' সাংখ্যকারদের মতে এই চিতি কর্ত্তা না হইলেও ভোক্তা। কারণ তাঁহারা বলেন যেমন অচেতন অন্নাদির ভোক্তা চেতন অবশ্য বর্ত্তমান, সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়বিষয় প্রভৃতির চেতন ভোক্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অচেতন বলিয়া তাহাদের ভোক্তৃত্ব সম্ভব নয়, অতএব চিতি বা পুরুষই একমাত্র ভোক্তা।

এখন এই চিতির প্রয়োজন অন্বেষণ করা যাইতেছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায় কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। একটী অঙ্কুর উৎপন্ন হইল, তাহার পূর্ব্বে বীজ জল মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান আছে। রূপের জ্ঞান হইল, তাহারও পূর্ব্বে চক্ষু, রূপবান দ্রব্য, আলোক-সংযোগ প্রভৃতি কারণ রহিয়াছে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-দেব-মনুষ্য-পশু-উদ্ভিদাদিযুক্ত গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতু, উত্তরাদি অয়নদ্বয়, সম্বৎসর-যুগ-কল্পাদিসমন্বিত এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডও প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং ইহারও অবশ্যই কারণ আছে। অন্যান্য কার্য্যের যেরূপ এক বা একাধিক কারণ বিদ্যমান, সেইরূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চেরও কারণ বিদ্যমান। জগতের কারণ চেতন অথবা অচেতন। কারণ এক বা বহু এই বিষয়ে বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা গেলেও কারণের অস্তিত্বে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বেদান্তমতে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ-প্রধানাত্মক মায়োপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ (কর্ত্তা) ও উপাদান কারণ—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ। এতন্মতে চিতি-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে জগতের অন্ধত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়—'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।' যুক্তি-প্রধান সাংখ্যশাস্ত্র বলেন প্রকৃতি এই জগৎ-প্রপঞ্চের মূল কারণ। যদিও সত্ত্বরজস্তমো-গুণাত্মিকা অচেতনা প্রকৃতিই জগতের কারণ তথাপি চিতিশক্তি স্বীকারের আবশ্যকতা আছে; যেহেতু জড়ের কর্তৃত্ব সম্ভব নয়, কার্য্যের উপাদান-বিষয়ে যাহার জ্ঞান, কৃতি বা চিকীর্ষা আছে তাহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। সেইজন্য সাংখ্যাচার্য্য কপিলাদি মহর্ষি বলেন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সাক্ষী অথচ ভোক্তৃরূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যেমন জবাপুষ্পের সন্নিধানে স্ফটিক-মণিতে লৌহিত্য আরোপিত, সেইরূপ সান্নিধ্য-বশতঃ প্রকৃতিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অচেতন প্রকৃতি চেতনবৎ এবং অকর্ত্তা পুরুষও প্রকৃতির সন্নিধানে কর্ত্তৃবৎ প্রতীত হয়। এইরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পঙ্গু ও অন্ধ মিলিত হইয়া যেরূপ স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্ত্যাদি সংঘটিত হইতেছে। অতএব দেখা যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত জ্ঞানস্বভাব পুরুষের অর্থাৎ আমাদের প্রবন্ধের বিষয় চিতিশক্তির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। চিতিশক্তির অস্তিত্বের প্রতি অন্যান্য হেতুও 'সাংখ্য-কারিকায়' উক্ত হইয়াছে। যথা :—

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥

(১) যেমন অচেতন বস্ত্রাদি স্বীয় স্বভাবের বিপরীত স্বভাবযুক্ত অপর চেতন পুরুষের নিমিত্ত

প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ অচেতন বুদ্ধি প্রভৃতির সমষ্টিও অপর কোন স্ব-স্বভাব-বিপরীত-স্বভাব-যুক্ত চেতনের উপযোগী হইবে। (২) পুরুষই সেইরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতির ত্রিগুণাত্মকত্ব স্বভাবের বিপরীত স্বভাবযুক্ত চেতন পদার্থ। (৩) যেমন অচেতন রথ চেতন সারথি কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া গমনাগমন করে, সেইরূপ অচেতন শরীর প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) রূপে চেতন পুরুষের অনুমান হয়। (৪) জড় প্রকৃতি প্রভৃতির ভোক্তৃত্ব সম্ভব নয় বলিয়া ভোগ্য শরীরাদির ভোক্তৃরূপে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য। (৫) নিজ নিজ কৈবল্যের নিমিত্ত সকল পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া পুরুষের সত্তা অনুমিত হয়। নিত্য-শুদ্ধ-চিৎ-মুক্তস্বভাব পুরুষরূপ পদার্থ স্বীকার না করিলে মুক্তির নিমিত্ত লোকের প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইবে। লোকে যেমন বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই আনন্দলাভের জন্য অধিক আগ্রহ বোধ করে, সেইরূপ জীবও আপনার কৈবল্য-স্বভাব বিস্মৃত হইয়া তদবস্থালাভার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এই ভাবে চিতিশক্তি-রূপ পুরুষের অস্তিত্ব সাংখ্যাচার্য্যেরা স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত পুরুষ দ্রষ্টা সাক্ষী মধ্যস্থ নিত্যমুক্ত-স্বভাব অপরিণামী শুদ্ধ এবং চৈতন্য-স্বরূপ। সাংখ্যমতে এই চিতি ভোক্তা এবং অনেক স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যদি চিতি এক হয় তাহা হইলে একটি লোকের জন্ম, মরণ বা মুক্তি হইলে যুগপৎ সকল জীবের জন্ম, মরণ কিংবা মুক্তির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, সেই জন্য প্রতি শরীরভেদে পুরুষের ভেদ আবশ্যক। বেদান্ত এই পুরুষকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আত্মা এক, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব; ইঁহাতে কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি কিছুই নাই। পুরুষ বা আত্মার একত্ববিষয়ে সাংখ্যেরা যে দোষের আপত্তি দেন, বেদান্তীরা নিম্নোক্ত প্রকারে তাহা পরিহার করেন। যেমন একটি সূর্য্য বিভিন্ন শরাবাদি আধারস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক সূর্য্যরূপে প্রতীয়মান হয়, একটি শরাব ভগ্ন হইলেও অন্যান্য প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের অস্তিত্ব লোপ পায় না, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধির বৈচিত্র্যবশতঃ যেন বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। ভিন্ন ভিন্ন অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত আত্মাকে জীব-সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। একটি জীবের জন্ম, মরণ বা মুক্তি হইলেও অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদবশতঃ অন্যান্য জীবের জন্ম, মরণ বা মুক্তি যুগপৎ হয় না। পরমার্থতঃ এই জন্ম, মরণ প্রভৃতি আত্মাতে কিছুই নাই, এই সমস্ত ব্যবহার আরোপজন্য। বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ মুখে বলা যায় না বলিয়া বেদান্তশাস্ত্রে ইঁহাকে অনির্ব্বাচ্য বলা হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এই আত্মা বা চিতিশক্তিই একমাত্র সত্য বস্তু, এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন সত্য বস্তু নাই। রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ সর্প-মাল্যাদির প্রতীতি হয়, সেইরূপ চিচ্ছক্তিকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতপ্রতীতি হইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে চিচ্ছক্তি বা ব্রহ্মই যদি একমাত্র বস্তু, তাহা হইলে অপরাপর জ্ঞান হয় কিরূপে? অসৎ পদার্থের ত জ্ঞান হয় না। শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম, আকাশ-পুষ্প প্রভৃতির জ্ঞান কখনও কাহারও দেখা গিয়াছে কি? ইহার উত্তরে বৈদান্তিক বলেন, ব্রহ্মাতিরিক্ত জগদাদির অসত্যতা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় ঐকান্তিক নহে। কিন্তু ব্রহ্মের যেরূপ পারমার্থিক সত্তা আছে, জগদাদির সেইরূপ পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরমার্থ-

সত্য বস্তু এক। চিতিতে অবিদ্যার অধ্যারোপ-বশতঃ নানাপ্রকার বৈচিত্র্যের প্রতীতি হয়। শুক্তির যাথার্থ্য-জ্ঞান হইলে যেরূপ শুক্তিতে রজতের ভ্রম চলিয়া যায়, যাথার্থ্যজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রজতের প্রতীতি হয় বলিয়া রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ দোষাদিজন্য-ভ্রমজ্ঞান-কালীন সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ রজত নাই, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের বা স্বকীয় চিতিশক্তির পরিচয় হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগতের প্রতীতি হেতু আত্মসত্তা ভিন্ন জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়; বস্তুতঃ এই চিতি ভিন্ন জগদাদির সত্তা নাই। অদ্বৈতজ্ঞান হইলে অর্থাৎ চিতি-শক্তির সন্ধান পাইলে জ্ঞানীর নিকট আর এই সমুদয় জগৎ পূর্ব্ববৎ প্রতীত হয় না। তিনি তখন সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ভেদ দূরীভূত হওয়ায় মোহ অপগত হয়, তিনি পরমানন্দ চৈতন্যরূপ চিতি-শক্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হন। গন্ধমৃগ যেরূপ স্বনাভি-প্রসূত গন্ধের সন্ধান না পাইয়া তদ্গন্ধপ্রলুব্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, তদ্রূপ জীবও স্বকীয় চিতির স্বরূপ-ভ্রান্ত হইয়া তল্লাভের আশায় বিষয়মত্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যুরূপ এই সংসারপ্রবাহে আবর্ত্তিত হইতেছে। কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরম-কৃপালু কোন বিজ্ঞানবান্ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্ব-চিতিশক্তির অনুসন্ধান-লাভে সমর্থ হন। ইঁহাকে (চিতিকে) জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না, ইঁহাকে শুনিলে আর কিছু শুনিবার থাকে না, ইঁহাকে পাইলে আর কিছু পাইবার থাকে না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। নদ নদী উপনদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলরাশির গতি যেমন সমুদ্র, সেইরূপ স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর আশ্রয় এই একমাত্র বস্তু। সমস্ত শব্দ, সমস্ত বাক্য, সকল শাস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার মতবাদ, সকল ধর্ম্ম ইহা হইতে উদ্ভূত, ইহাতেই স্থিত, এবং ইহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় যেন ইঁহারই মাহাত্ম্যবর্ণনার চেষ্টা হইতেছে।

অচিন-প্রিয়

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্রী

নিবিড় মেঘে, হৃদয় আকাশ
যেদিন দেবে ঘিরে,
শ্রাবণ-ধারা, অঝোরে মোর
ঝরবে নয়ন-নীরে;

চপল হাসি হেসে সেদিন
অচিন আমার প্রিয়!
মায়া-মোহের তিমির ঘন
কাটিয়ে প্রভু দিও।

ব্রহ্মসূত্রস্থ বেদাচার্য্যগণ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১। **আশ্মরথ্য**—ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের "বাক্যান্বয়াধিকরণে"র (১।৪।১৯-২২) বাচস্পতিকৃত ভামতী টীকা পাঠে এঁকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী (নিম্বার্ক মত) বলে বোধ হয়। ইনি একজন বেদান্তাচার্য্য, কারণ জৈমিনি তাঁর পূর্বমীমাংসা-সূত্রে (৬।৫।১৬-১৭) এঁর মত খণ্ডন করেছেন। একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-সিদ্ধির পূর্বপক্ষ-পূর্বপক্ষরূপে ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে এঁর মত উপস্থাপিত করেছেন (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২০)। শ্রীশংকর ঐ সূত্রের ভাষ্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতররূপে তাঁর মত সম্বন্ধে বলছেন, "যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ, ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং যৎ প্রতিজ্ঞাতং তদ্ধীয়তে। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে।" ভামতীকার ভাষ্যের টীকা স্পষ্টতঃ দ্বৈতাদ্বৈতপক্ষেই করেছেন বলে বোধ হয়—"যথা হি বহ্নেবিকারা ব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে, তদ্রূপানিরূপণত্বাৎ। নাপি ততোঽত্যন্তমভিন্না বহ্নেরিব পরস্পর-ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে, চিদ্‌রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ—তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ।" জীব ব্রহ্মবিকার হেতু ব্রহ্মাংশ, অথচ তাতে ব্রহ্মের সহিত সনাতন ভেদ বর্তমান—এটা নিম্বার্কমততুল্য। কিন্তু আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় "বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণম্"—বাক্যের দ্বারা আশ্মরথ্যের মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলেন। আশ্মরথ্যের মতে পরমেশ্বর মহান্ হলেও উপাসকের হৃদয়-প্রদেশে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তি ঘটে (ব্রঃ সূঃ ১।২।২৯)।

২। **ঔড়ুলোমি**—ব্রহ্মসূত্রকার ১।৪।২১ সূত্রে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রসঙ্গেই আর একটী পূর্বপক্ষ-পূর্বপক্ষরূপে উক্ত আচার্য্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি যে বেদান্তী ছিলেন, তার প্রমাণ বাদরায়ণ ব্যাস, 'যজ্ঞকর্ম যজমানের স্বয়ং কর্তব্য না পুরোহিতের কর্তব্য'—প্রসঙ্গে পূর্বমীমাংসক আত্রেয়ের 'যজমানের কর্তব্য'—মতটী উল্লেখ করে ঔড়ুলোমির 'পুরোহিতের কর্তব্য'—মতটি স্থাপিত করেছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৪৪-৪৬)। পুনরায় মুক্তাত্মা সম্বন্ধে পূর্ব-মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনির মত উল্লেখ করে ঔড়ুলোমির মতের দ্বারা আপত্তি তুলেছেন এবং স্বীয় মতের দ্বারা উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করেছেন (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৫-৭)। জৈমিনির মতে আত্মা নিষ্পাপ এবং অনন্ত জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তির আশ্রয়। ঔড়ুলোমির মতে মুক্তাত্মা নির্গুণ, নির্ধর্মক, চৈতন্যস্বরূপ মাত্র। বাদরায়ণ-মতে ঔড়ুলোমির মত পারমার্থিক সত্য, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জৈমিনিমতও শ্রুতি স্বীকার করেছেন। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২১ সূত্রের শাংকর ভাষ্য পাঠে তাঁকে ভেদাভেদবাদী বলেই নির্ণয় হয়। "বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি-সংঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদি-

সাধনানুষ্ঠানাৎ সংসম্পন্নস্য দেহাদিসংঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে।" দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিকে এখানে উপাধি বলে আচার্য্য কীর্ত্তন করেছেন, যার জন্য আত্মা কলুষীভূত হয়েছেন। জ্ঞানধ্যানাদির দ্বারা এই সংসম্পন্ন দেহাদি-সংঘাত হতে উৎক্রমণকারী আত্মার পরমাত্মার সহিত ঐক্য উপপত্তি হেতু এটি ভাস্কর-সদৃশ ভেদাভেদবাদ রূপেই অনুমিত হয়। বাচস্পতি এটীকে পাঞ্চরাত্রিক মত বলে কীর্ত্তন করেছেন —"জীবো হি পরমাত্মনোঽত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধ্যানসম্পর্কাৎ সর্বদা কলুষঃ। তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্পন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতাৎ উৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—'আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥"—(ব্রঃ সূঃ ১।৪।২১ ভাষ্যে ভামতী)।

৩। **কাশকৃৎস্ন**—স্বীয় মত স্থাপনের জন্য সূত্রকার ব্যাস "বাক্যান্বয়াধিকরণে" এঁর মত সূত্রিত করেছেন—"অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" —(ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২)। অর্থাৎ কাশকৃৎস্ন বলেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে যে পরমাত্মাই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নামরূপ প্রকট করেছেন, সেইজন্য একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং জীবাত্মার প্রিয়ত্বও সিদ্ধ হয়। দ্বৈতপক্ষেই বৃহদারণ্যকস্থ মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ বাক্যে 'পরমাত্মার না জীবাত্মার প্রিয়ত্ব'—এইরূপ সংশয় উঠে। শ্রীশংকর উক্ত সূত্রের ভাষ্য করেছেন— "অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে।" এর দ্বারা তিনি যে অদ্বৈতবাদী ছিলেন তা স্পষ্ট। তবে পরমাত্মার এই জীবরূপে অনুপ্রবেশটী অনির্বচনীয়া খ্যাতির দ্বারা ব্যাখ্যাত কিনা তা সঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইনিই পূর্ব-মীমাংসার সংকর্ষণ-কাণ্ডের এবং মতান্তরে দেবতা-কাণ্ডের রচয়িতা।

৪। **কার্ষ্ণাজিনি**—ভগবান ব্যাস ছান্দোগ্য শ্রুতির (৫।১০।৭) জন্মান্তরের হেতু "রমণীয় চরণ" এবং "কপূয় চরণ" বাক্যের "চরণ" পদের অর্থনির্ণয়ে স্বীয় মতপোষণের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ৪।১।৯-১০ সূত্রে কার্ষ্ণাজিনির মত উপস্থাপিত করেছেন। "চরণ" পদের বাচ্যার্থ শীল বা চরিত্র। অর্থাৎ সাধু বা অসাধু আচারই বিভিন্ন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জন্মান্তরের হেতু।

কিন্তু কার্ষ্ণাজিনির মতে "চরণ" পদের অজহল্লাক্ষণিক অর্থ 'অনুশয়' অর্থাৎ শুভাশুভ কর্মজন্য পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্ট (সংস্কার) স্বীকার করা উচিত। কারণ শাস্ত্রে শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠানের ফলে যে পুণ্যাপাপরূপ অদৃষ্ট (সংস্কার) অর্জ্জিত হয়, তা ই জন্মান্তরের হেতু বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রুতির বাচ্যার্থত্যাগে ত অনর্থক্য-দোষ হয়? তাতে তিনি বলেন, বাচ্যার্থ একেবারে নিষ্ফল নয়। আচার বা চরিত্র সকল কর্মকেই অপেক্ষা করে। যাগযজ্ঞাদি শুভকর্মও সদাচার-সাপেক্ষ। সদাচারহীন শুভকর্মের দ্বারাও পুণ্য-সংস্কাররূপ অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় না, যার জন্য শুভাদৃষ্টের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। কাজে কাজেই সদসদ্ আচার-সাপেক্ষ 'কর্ম' ও 'বিকর্ম'ই শুভাশুভ স্বর্গনরকাদি-ফলোৎপাদক। এতদর্থ-জ্ঞাপনে শ্রীশংকর কার্ষ্ণাজিনির মত ভাষ্যাকারিত করেছেন—"কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায় লাক্ষণিকোঽনুশয়ঃ প্রত্যাযাতে? অবশ্যং শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্ অন্যথা আনর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ? নৈষ দোষঃ। কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ, ইষ্টাদিকর্মজাতং হি চরণাপেক্ষম্।

ইষ্টাদৌ হি কর্মজাতে ফলমারভমাণে তদপেক্ষ এবাচারে তত্রৈব কিঞ্চিদতিশয়মারপ্স্যতে। তস্মাৎ কর্মৈব শীলোপলক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণমিতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্।"—(ব্রঃ সূঃ ৩।১।১০)।

ইনি যে পূর্বমীমাংসাচার্য্য নন তার কারণ জৈমিনি তাঁর মীমাংসায় কার্ষ্ণাজিনির মত পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করে খণ্ডন করেছেন (পূঃ মীঃ সূঃ ৪।৩।১৭,৪।৩।১৮,৬।৭।৩৫)।

৫। **বাদরি**—পূর্বোক্ত "চরণ" পদের 'অনুশয়' অর্থাৎ শুভাশুভাদৃষ্ট লক্ষ্যার্থে স্থাপনের জন্য ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে বাদরির উল্লেখ করেছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।১।১১)। তাঁর মতে "চরণ" শব্দের অর্থ অনুষ্ঠান বা সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম। আচার্য্যপাদ শংকর এর ভাষ্য করছেন,—"বাদরিস্ত্বাচার্য্যঃ সুকৃত-দুষ্কৃত এব চরণশব্দেন প্রত্যাখ্যাতে ইতি মন্যতে। চরণমনুষ্ঠানং, কর্মেত্যর্থান্তরম্। তস্মাৎ রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্মাণঃ কপূয়চরণা নিন্দিতকর্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ।"

স্বীয় মত দৃঢ়করণেচ্ছায় ভগবান ব্যাস আর এক জায়গায় বাদরির উল্লেখ করেছেন। ছান্দোগ্যের "চরণ"-শ্রুতির পূর্বে আছে (ছাঃ উঃ ৫।১০।২)—"আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি।"—এখন এখানে বিশয় (সংশয়) হচ্ছে—যাঁরা দেবযান-মার্গে গমন করেন তাঁরা সগুণ, না নিগুর্ণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন? এখানে জৈমিনিমত পূর্বপক্ষরূপে সূত্রিত হয়েছে (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।২২)। জৈমিনিমতে, তাঁরা নিগুর্ণ পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। কারণ শ্রুতি ও স্মৃতির বহু স্থলে 'তাঁরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন' বলে উল্লেখ আছে (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১১)। অমৃতত্ব পরব্রহ্ম ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মপদের মুখ্যার্থ পর ব্রহ্ম এবং গৌণার্থ অপর ব্রহ্ম। মুখ্যার্থের দ্বারাই অমৃতত্বের সম্যক্ প্রত্যয় হয়। অর্থাৎ উপাসনারূপ কর্মের দ্বারাই মোক্ষ সিদ্ধ হলে আর বেদের কর্মাঙ্গের আনর্থক্য প্রসঙ্গই ওঠে না। শাংকরভাষ্যে জৈমিনিমতটী স্পষ্টীকৃত হয়েছে—"জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যঃ 'স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রাপয়তি ইতি মন্যতে। কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ। পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমবলম্বনং গৌণমপরম্। মুখ্য-গৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি।" (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।২২)।

কিন্তু জৈমিনির এইরূপ আপত্তির পূর্বেই ভগবান ব্যাস স্বীয় মত সমর্থনের জন্য বাদরির মত সূত্রিত করেছেন—"কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ"—(ব্রঃ সূঃ ৪।৩।৭)। অর্থাৎ বাদরিমতে দেবযানমার্গীরা কার্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তা হলেই তাঁদের সম্বন্ধে শ্রুতিতে যে 'উর্দ্ধ-'গতি'র উল্লেখ আছে, তার উপপত্তি হয়। মায়িক জগতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে। সংসারাবদ্ধ জীবের নিকট সেই সগুণ কার্যব্রহ্ম অপ্রাপ্ত। উপাসনাদি শুভ কর্মের দ্বারা নির্ধূতপাপ জীবের ব্রহ্মলোকে গতি সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যা অপ্রাপ্ত ছিল তার প্রাপ্তি হলো। কিন্তু, নির্বিকল্প নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে জীব ও ঈশ্বরোপাধিদ্বয় বাধিত হওয়ায় 'সর্বং ব্রহ্মময়ম্'—এইরূপ অপরোক্ষানুভূতি জন্য প্রতিভাসরূপ সলোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাধিত হয়; সেইজন্য শ্রুতি জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্যবিচারাদিতে নিগুর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীর গতি স্পষ্টতঃ নিষেধ করেছেন—(বৃঃ উঃ ৩।১।১১, ৪।৪।৬)। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাষ্যকার বলছেন—"তত্র কার্য্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্ম নয়ত্যেনামমানবঃ পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্য্যব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে—প্রদেশবত্ত্বাৎ। ন তু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্বা অবকল্পতে—

সর্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৃণাম্"— (ব্রঃ সূঃ ৪।৩।৪)। এটী বাচস্পতি আরও পরিস্ফুট করছেন, "তত্ত্বমসিবাক্যার্থসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ কিল জীবাত্মা অবিদ্যাকর্মবাসনাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদাৎ বস্তুতোঽনবচ্ছিন্নোঽবচ্ছিন্নমিব অভিন্নোঽপি লোকেভ্যো ভিন্নমিব আত্মানমভিমন্যমানঃ স্বরূপাদন্যান্ অপ্রাপ্তান্ অর্চিরাদীন্ লোকান্ গত্বা আপ্নোতীতি যুজ্যতে। অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবতস্তু বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চাবভাস-বিভ্রমস্য ন গন্তব্যং ন গতির্ন গময়িতার ইতি কিং কেন সঙ্গতম্?"—(ভামতী, ব্রঃ সূঃ ৪।৩।৭)।

আর এক স্থলে বাদরির মত ব্রহ্মসূত্রে পাওয়া যায়—'সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের মন', শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে কিনা?' এই সংশয়স্থলে ব্যাসদেব বাদরির মত উল্লেখ করেছেন (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১০)। বাদরির মতে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞের দেহেন্দ্রিয় থাকে না, কেবল মন থাকে। "মনসা এতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বোঝা যায় যে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞদের সিদ্ধসংকল্পত্ব-হেতু মন থাকে, কিন্তু শ্রুতিতে তাঁদের দেহেন্দ্রিয়াদির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এতে জৈমিনির আপত্তি (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১১), শ্রুতিতে সগুণ ব্রহ্মবিদ্‌দের বহু শরীরের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—"তিনি এক হলেন, তিন হলেন, বহু হলেন"; কাজে কাজেই তাঁদের মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয় সম্ভব। তাতে ব্যাসদেব একটী সূত্রে উভয় মতের সমন্বয় করেছেন (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১২)—ঐরূপ মুক্ত পুরুষের অপ্রতিহত ইচ্ছা হেতু উভয়ই সম্ভব।

ব্যাসদেব আত্মার বিভুপরিমাণ-নির্ণয়েও বাদরির সাহায্য গ্রহণ করায় এবং জৈমিনি তাঁর সূত্রদর্শনে (১।১।৫, ৫।২।১৯, ৬।১।৮, ১০।৮।৪৪, ১১।১।৬৪) বাদরিকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করায়, তিনি নিশ্চয়ই অদ্বৈতবেদান্তী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। আচার্যপাদ বাদরির মতে বৈদিক কার্যে সকলেরই অধিকার আছে। জৈমিনি ও ব্যাস উভয়েই এই মতের বিরোধী। ব্যাস শূদ্রের বেদাধিকার স্বীকার করেন নি (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৩৪-৩৮)।

৬। **আত্রেয় ও জৈমিনি**—আশ্মরথ্যাদির মতালোচনার দ্বারা ব্রহ্মসূত্রস্থ জৈমিনি ও আত্রেয়, কর্মমীমাংসকাচার্যদ্বয়ের মতেরও কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। অবশ্য জৈমিনিকে ব্যাস আরও বহুবার বহুবিধ বিষয়ের পূর্বপক্ষরূপে উল্লেখ করেছেন, এখানে তার বিশেষ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ এই মীমাংসকদ্বয় উভয়ের সূত্র-দর্শনে উভয়কে সমালোচনা করেছেন। ব্যাস গুরু, জৈমিনি শিষ্য। সেইজন্য জৈমিনি ব্যাসকে সশ্রদ্ধ পূর্বপক্ষরূপেই উল্লেখ করেছেন। এইজন্য পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যকার শ্রীশবর স্বামী বলছেন, "বাদরায়ণগ্রহণং বাদরায়ণস্যেদং মতং কীর্ত্যতে বাদরায়ণং পূজয়িতুম্।" (পূঃ মীঃ সূঃ ৬।১।৫), "বাদরায়ণগ্রহণং কীর্ত্ত্যর্থং নৈকমত্যর্থম্। (পূঃ মীঃ সূঃ ১১।১।৬৪)।

[এই সকল বেদাচার্যগণ সম্বন্ধে লেখক উদ্বোধন ২৪ বর্ষ ১২শ. সংখ্যার "কথাপ্রসঙ্গে" বিবৃত করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী উহারই পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনের দ্বারা সংস্কৃতাকারে পুনরুপস্থাপিত হইল।]

"………এই শ্রৌত সার্ব্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব্ব তত্ত্বরাশি—মহিমার অচল অজেয় ও অবিনাশী ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি-এ

(২)

লাউসেনের প্রতি গৌড়েশ্বরের মহানুভবতা পরশ্রীকাতর মহামদকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। গৌড়েশ্বরকে 'সমুচিত শিক্ষা দিতে তিনি প্রজা-পুঞ্জের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। প্রজাগণ প্রাণভয়ে রাজ্যত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে আরম্ভ করিল। গৌড়েশ্বর সমস্ত অবগত হইয়া মহামদকে কারারুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রজাল কোটালকে প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত করিলেন। কিন্তু কৌশলে মহামদ রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় গৌড়েশ্বর কামরূপের রাজা কর্পূরধলকে পরাজিত করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য লাউসেনকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধর্ম-ঠাকুরের আদেশে পবননন্দন হনুমান লাউসেনকে কিরূপে কামরূপ জয় করিতে হইবে তাহার উপায় বলিয়া দিলেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের মাতা ধর্মশীলা বল্লভাদেবীর নিকট হইতে দেবদত্ত ব্রহ্ম-করজাপ্যমালা ও সমুদ্র-কাটারী আনয়ন করেন। সসৈন্যে লাউসেন ব্রহ্মপুত্র পার হইলেন। ব্রহ্মকরজাপ্যমালা সাহায্যে কামরূপের রক্ষয়িত্রী দেবী কামাখ্যাকে মন্দির হইতে দূরীভূত করিয়া একক কালুডোম কর্পূরধলকে বন্দিরূপে রাজপদে উপঢৌকন প্রদান করিল। লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ রাজা কর্পূরধল জয়পত্র লিখিয়া দিলেন এবং রমণী-মুকুটমণি একমাত্র দুহিতা কলিঙ্গাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন যুদ্ধে হত সৈন্যবাহিনীর প্রাণদান করিলেন—

আজ্ঞা পেয়ে সুরপতি সাজিয়া সত্বরে।
করিল অমৃত বৃষ্টি অবনী কাঙুরে ॥
মার্ মার্ ক'রে উঠে যত রাজসৈন্য।
সবে বলে সাধু সাধু সেন ধন্য ধন্য ॥ (১৫শ সর্গ)

রণজয়ী লাউসেন সগৌরবে গৌড়ে উপনীত হইয়া গৌড়েশ্বরকে 'রাজভেট দিল আর কাঙুরের কর'। গৃহে প্রত্যাবর্তন-কালে লাউসেন মঙ্গল-কোটের রাজা গজপতির কন্যা অমলা এবং বর্ধ-মানাধিপ কালিদাসের দুহিতা বিমলার পাণিগ্রহণ করিলেন। সর্বগুণালংকৃতা বধূগণকে লাভ করিয়া 'আনন্দসাগরে ভাসে রঞ্জাবতী রাণী'। সমস্ত নগর উৎসবানন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর লাউসেন পার্থিব ভোগৈশ্বর্যে মত্ত হইয়া স্বীয় জীবনের ব্রত ধর্মঠাকুরের মহিমাপ্রচার বিস্মৃত হইলেন। তখন সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় মহিমা প্রচারকল্পে ধর্মঠাকুর এক জন মদনমনোরমা স্বর্গবিদ্যাধরীকে মর্তে প্রেরণ করিলেন। মদালসা অপ্সরা তাণ্ডবনৃত্যে এবং আপনার প্রভাবে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে তমোগুণে আচ্ছন্ন করিল। দুষ্টবুদ্ধি মহামদের পরামর্শে তিনি কানড়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হরিপাল-সকাশে ভাট প্রেরণ করিলেন। রাজকন্যা কানড়া শৈশবকাল হইতে লাউসেনকে পতিরূপে লাভ করিতে ভবানীর আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি দেবীর একান্ত অনুগৃহীতা ভক্ত। পিতার অগোচরে তিনি ভাটকে অশেষ

লাঞ্ছিত করিয়া বিদায় করিলেন। ফলে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল। হরিপাল প্রাণভয়ে কানড়াকে একাকী ফেলিয়া বাসডিঙ্গা গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কানড়ার ব্যাকুল আহ্বানে মহিষমর্দিনী ভবানী এক লৌহনির্মিত গণ্ডার কানড়াকে দিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি এই গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সেই ভাগ্যবান পুরুষ কানড়াকে লাভ করিবে। গৌড়েশ্বর এবং মদগর্বে স্ফীত মহামদ অকৃতকার্য হইলেন। পরে গৌড়েশ্বরের আদেশে রাজা লাউসেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ধুমসী দাসী কানড়ার বরমাল্য সর্বসমক্ষে লাউসেনের গলদেশে অর্পণ করিল। মহামদের চক্রান্তে লাউসেন সসৈন্যে বাসডিঙ্গা গড়ে হরিপালের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধুমসীকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবী ভবানী গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া সতী-সাধ্বী কানড়ার মর্যাদা রক্ষা করিলেন। দেবর্ষি নারদের পৌরোহিত্যে দেবীর সমক্ষে তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। অতঃপর লাউসেন ধর্ম-ঠাকুরের কৃপায় গৌড়েশ্বরের মৃত সৈন্যদের প্রাণ-দান করিয়া সস্ত্রীক ময়নানগর গমন করিলেন।

এদিকে পদে পদে অপমানিত মন্ত্রী মহামদ গৌড়েশ্বরকে প্ররোচিত করিয়া লাউসেনকে অজয় ঢেকুর জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। লাউসেন অজয়ের তীরে শিবির স্থাপন করিয়া ভাটার অপেক্ষায় রহিলেন। ইতোমধ্যে কালুডোম লোহাটা সর্দারকে বধ করিয়া তাহার মুণ্ড গৌড়ে পাঠাইয়া দিল। মহামদ লোহাটার মাথাটি লাউসেনের মুখের প্রতিকৃতি করিয়া ময়নানগরে প্রেরণ করিলেন। রাজ্যে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল; কলিঙ্গা প্রভৃতি চারি রাণী কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হইয়া কলিঙ্গার নিকট মহামদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিলেন।

লাউসেন অজয় নদী পার হইতে গিয়া পাতালে বাসুকিনাগের গৃহে বন্দী হইলেন। অবশেষে হনুমানের কৃপায় মুক্তিলাভ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইছাই ভবানীর আশ্রিত ভক্ত। তাঁহার পূজায় তুষ্ট হইয়া শিবানী ইছাই তিনটি বাণ দিয়া বলিলেন—'এই বাণে বীর কালু, এই বাণে হয়। এই বাণ মেলে মরে রঞ্জার তনয়।' পবননন্দন-সহ ধর্মঠাকুর রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধে নিহত কালুর প্রাণদান করিলেন। দেবীদত্ত বাণ ধর্ম-ঠাকুর মায়ায় অপহরণ করিলে লাউসেন ইছাইর মস্তক ছিন্ন করিলেন। ভবানী ইছাইর প্রাণদান করিলেন এবং তাঁহাকে বর দিলেন, যতবার তাঁহার মাথা কাটা যাইবে ততবারই মুণ্ড গজাইয়া উঠিবে। ফলে ইছাই দ্বিতীয় লঙ্কেশ্বর হইলেন। দেবী লাউসেনকে বধ করিয়া বক্ষ-রক্ত পান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে দেবতামণ্ডলী ষড়যন্ত্র করিয়া মায়া লাউসেন নির্মাণ করিয়া দেবী-যুদ্ধে পাঠাইলেন। মায়া লাউসেনের বক্ষ-রক্ত পান করিয়া দেবী রণনৃত্যে মাতিয়া উঠিলেন। দেবর্ষি নারদ কৌশলে দেবীকে কৈলাসে লইয়া গেলেন; ফলে ইছাই যুদ্ধে সহজেই নিহত হইলেন। অন্তরীক্ষে হনুমান ইছাইর কাটামুণ্ড বিষ্ণুপদতলে রক্ষা করিলে ইছাই নির্বাণ লাভ করিলেন। সুতরাং শ্যামরূপা শর্বাণী ইছাইকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না। পদ্মার একান্ত অনুরোধে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেবী যুদ্ধে বিরত হইলেন। গৌড়েশ্বরের বিজয়-কেতন অজয় ঢেকুরের প্রাসাদে উড্ডীন হইল। সোমঘোষ গৌড়েশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল; বিজয়গর্বে লাউসেন সসৈন্যে ময়নানগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শুভক্ষণে কলিঙ্গার গর্ভে লাউসেনের এক পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নামকরণ

হইল চিত্রসেন। পরম সুখে লাউসেনের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এদিকে ধর্মপূজার অজুহাতে মন্ত্রী মহামদ লাউসেনের অনিষ্ট-কামনায় প্রজা-উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তামসিক মহামদের প্রতি বীতরাগ ধর্মঠাকুর গৌড়ে বর্ষা এবং প্লাবন আনিলেন। কুচক্রী মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় করাইতে আদেশ দিলেন। পশ্চিম-উদয়ে সমস্ত বিঘ্ন অপসারিত হইবে বলিয়া মহামদ প্রকাশ করিলেন। লাউসেন অকৃতকার্য হইলে তাঁহার মাতাপিতাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তদনুসারে বসুদেব-দেবকীর ন্যায় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী গৌড়ের কারাগৃহে আবদ্ধ হইলেন। রঞ্জাবতীর নির্দেশে লাউসেন রামাই পণ্ডিত, সামুলা ও হরিহর বাইতিকে সাথে লইয়া হাকন্দে গিয়া ধর্মঠাকুরের মহাপূজা আরম্ভ করিলেন।

ইতোমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে ময়নানগর অধিকার ও লুণ্ঠন করিবার জন্য কীচক-শ্যালক মহামদ রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। গণ্ডারের অত্যাচারে দক্ষিণ-ময়না ছারখারে যাইতেছে বলিয়া তিনি গৌড়েশ্বরকে বুঝাইলেন। মহারাজাধিরাজ তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া সরল প্রাণে তাঁহাকে সসৈন্যে ময়নানগরে যাইতে অনুমতি দিলেন। ইন্দ্রজালের মন্ত্রশক্তি-বলে সমস্ত পুরী নিদ্রিত হইলে মহামদ নৈশ আক্রমণ করিলেন। ধর্ম-ঠাকুরের নির্দেশে হনুমান স্বপ্নচ্ছলে নিদ্রিত কালু ডোমকে ভদ্রকালীর উপাসনা করিয়া পুরীরক্ষার আয়োজন করিতে উপদেশ দিলেন। কালু ডোম দেবীর আরাধনা-কালে অনুৎ-সর্গীকৃত মদ্যপান করায় দেবী ভদ্রকালী ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করিলেন, যুদ্ধে কালু সবংশে নিহত হইবে। মদ্যপানে কালু হতচেতন হইলে, অনন্যোপায় লখ্যা একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লখ্যা আপন পুত্র শাকাশুকাকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। যুদ্ধে দুই ভাই নিহত হইলে পুত্রশোকে উন্মত্ত কালু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কৌশলে সহোদর ভাই কাম্বা কালুকে বধ করিল। মহারাণী কলিঙ্গাদেবী যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। অবশেষে কানড়া এবং ধুমসী ভবানীর কৃপায় মহামদকে পরাজিত করিয়া ময়নার গৌরব রক্ষা করিলেন।

এদিকে লাউসেন সামুলার পরামর্শে স্বীয় দেহের মাংস কাটিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ধর্মঠাকুরের কৃপা হইল না দেখিয়া লাউসেন স্বীয় মস্তক ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিলেন। সামুলা, 'রামাই পণ্ডিত ও উপস্থিত সকলে প্রাণবিসর্জন দিলেন। তখন ধর্মঠাকুর যজ্ঞস্থলে দর্শন দিয়া সকলের জীবন দান করিয়া পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাইলেন। কিন্তু দুষ্টমতি মহামদ গৌড়েশ্বরকে বুঝাইলেন—'পশ্চিম-উদয় মিছে, পর্বতের আলা। রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা॥' মহামদ হরিহর বাইতিকে প্রচুর অর্থদানে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেও ধর্মের ভয়ে রাজসভায় সত্য সাক্ষ্য দিল। ফলে চৌর্যাপরাধে মহামদ হরিহর বাইতিকে শূলদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু ধর্ম-ঠাকুরের মহিমায় বাইতি সশরীরে স্বর্গে গেল। পুনরায় মহামদ গৌড়েশ্বরকে কুপরামর্শ দিতে উদ্যত হইলে লাউসেন তাঁহাকে 'গলিত কুষ্ঠক হও' বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। অবশেষে গৌড়েশ্বরের অনুরোধে লাউসেন মন্ত্রীকে নীরোগ করিলেন। কিন্তু 'ধর্মনিন্দা কারণ ধবল রহে মুখে।' রাজসকাশে বিদায় লইয়া লাউসেন মাতাপিতা ও অন্যান্য সঙ্গী সহ ময়না গেলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রাণী কলিঙ্গা, কালু প্রভৃতি প্রাণ পাইলেন। এইরূপে মর্তে ধর্ম-ঠাকুরের মহিমা প্রচার করিয়া সপরিবারে

লাউসেন সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। চিত্রসেন রায় ময়নানগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাব্যের পরিসমাপ্তি হইল।

লাউসেনকে কেন্দ্র করিয়া এই বিরাট কাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে। লাউসেন একজন পরম ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ; ধর্মঠাকুরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। অমিতবিক্রম ও সর্বগুণের অধিকারী হইয়াও তিনি আদর্শ নায়করূপে প্রতিভাত হইতে পারেন নাই। অতিরিক্ত দেবানুগ্রহ থাকায় তাঁহার বিপদে অশিব-আশংকায় আমাদের হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে না; তাঁহার বিজয়লাভে আমাদের যেন সাধুবাদ উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয় না। লাউসেনের চরিত্রে অতিপ্রাকৃত ঘটনার আলোক-সম্পাত করিয়াও কবি তাঁহাকে আমাদের অনুভূতি ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দিতে সক্ষম হন নাই। কর্পূরসেনের বাণীচিত্র আমাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছে। এই চরিত্রাংকনে কবির রচনাশৈলী প্রাণবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। কর্পূর অগ্রজকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন সত্য, কিন্তু 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এই নীতিতে তিনি পরিচালিত। কামদল বাঘ শিকারের পূর্বে তাঁহাকে বলিতে শুনি—

আমার সহিত তুমি সত্য কর আগে।
মোরে থুয়ে লুকায়ে বাঁধিতে যেও বাঘে ॥

(৯ম সর্গ)

কর্পূরের অপূর্ব বীরত্ব আমাদের হাস্যোদ্রেক করে—

নাসিকা বয়ান বাটে না বহে অনিল।
তবু ভূমে হাঁটু পেড়ে উভ হানে কিল ॥
কিলিয়া বধিনু বাঘে দেখসিয়া ভাই।
সেন বলে ভাই তোর বলিহারি যাই ॥

(১০ম সর্গ)

জামতি নগরে কুলটা রমণীর ষড়যন্ত্রে লাউসেন বন্দী হইলে কর্পূর বনের মধ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন; পরে বিপদের মেঘ কাটিয়া গেলে কর্পূর নির্লজ্জের মত দাদার নিকট মিথ্যা কথা বলিলেন—

কান্দিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।
কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা ॥
কর্পূর বলেন যবে বন্দি হ'ল ভাই।
রাতারাতি গৌড় গিয়াছিনু ধাওয়া-ধাই ॥
রাজারে আদ্দাশ করি জামতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে ॥
পথে শুনি বিজয়, বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥

(১১শ সর্গ)

পাছে সুরিক্ষার হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হয় এই ভয়ে কর্পূর নর্তকীর অভিলাষ পূরণ করিতে লাউসেনকে উপদেশ দিতেছেন—

বুঝিতে সেনের মতি কহেন কর্পূর।
সঙ্কট দেখিলে দোষ না লবে ঠাকুর ॥
যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগে ছাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা ॥

(১২শ সর্গ)

যেন তেন প্রকারেণ প্রাণ রক্ষা করাই তাঁহার জীবনের মূলনীতি। তথাপি কর্পূরসেনের নৈতিক চরিত্র ম্লান বলিয়া আমাদের মনে হয় না; ইহার মূলে তাঁহার সরলতাপূর্ণ ভীরু স্বভাব।

অন্যান্য চরিত্রাংকনে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কালু ডোম যেমন বীর তেমনই প্রভুভক্ত; তাহার চরিত্র একমাত্র পরম রাম-ভক্ত মহাবীরের সহিত তুলিত হইতে পারে। মহামদের বাণীচিত্র কবির অমর তুলিকাস্পর্শে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলির অংশে যে দুষ্টমতি মন্ত্রীর জন্ম তাহা তাঁহার বাক্যে এবং

কার্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দুনিয়ায় এমন কোন কার্য নাই যাহা করিতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত! সমরক্ষেত্রে মহারাণী কলিঙ্গাদেবীর সতীত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া মহামদ যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা পশুত্বেরই পরিচায়ক। লখ্যার ন্যায় বীরাংগনা বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কাম্য। বাঙ্গালী রমণী সতীত্বের জন্য অবহেলায় স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহারাণী কলিঙ্গা-দেবী। অজয় ঢেকুর যাত্রার প্রাক্‌কালে লাউ-সেনকে যুদ্ধজয়ের উন্মাদনা ভুলাইয়া সাংসারিক মায়ায় আবদ্ধ করিবার জন্য কলিঙ্গাদেবীর কৌশল-জাল বিস্তার মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকালীন জরাভীতি ও সুন্দরী রমণীগণের প্রলোভনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রঞ্জাবতী বধুগণকে পুত্রের চিত্তজয় করিতে যে ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; তবে তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়াই এই আতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক নারীসুলভ ব্যাকুলতা।

ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচার-কল্পে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু-দেবদেবীর উপাখ্যানের অতিরিক্ত সমাবেশে মূল বৌদ্ধ ভাবধারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। প্রতি ঘটনায় শাস্ত্রের দোহাই এবং অবতারণা করায় কবি আমাদের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে অতিরিক্ত সজাগ থাকায় কবি স্বীয় প্রতিভা ও মৌলিকত্ব বিকাশের অবকাশ পান নাই। তবে কাব্যের গতি শেষ পর্যন্ত অব্যাহতই রহিয়াছে।

কবি ঘনরাম রস-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। যথাক্রমে বীর রস, বীভৎস রস ও করুণ রসের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নিম্নে বীররসের নমুনা দেওয়া গেল—

মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ, সমরে নিদারুণ,
দুদলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিণী রণজই, দুন্দুভি বাজই,
ঘনঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজবুত, যৈছন যমদূত,
সমযুথ যুঝে খানসামা॥
দাদালিয়া দলবল, মহী মাঝে মাতল,
মানব মহিষে দানা দম্ভে।
ধর ধর বলি ঘন, ধাইল দানাগণ,
ধমকে ধরাধর কম্পে॥
* *
ঝকড়া ঝাকে ঝাকে, ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে,
লাখে লাখে বরিষে তীর।
সামালিয়া হানিতে, গজবাজী সহিতে
সমরে শিফাইয়ের শির॥
করয়ে তর্জ্জন, ঘোরতর গর্জ্জন,
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সমরে সেনাগণ, সংহারে যৈছন,
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে॥

(১৭শ সর্গ)

বীভৎস রস কবির অমর তুলিকাস্পর্শে অনবদ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী।
নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥
ফড়া ফড়া মড়া করে ডাকিনী যোগিনী।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি॥
* * * *
রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা।
বয়ে লয়ে কেহ কারে যে গাইছে ডালা॥
মনোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি।
যাচিয়া যোগায় কত যোগিনীর ঝি॥
খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিতে ক্ষুধা।
চুমুকে রুধির পীয়ে সম তার সুধা॥

কাঁচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে ॥
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়।
মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড় ॥
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে।
লাফ দিয়া লুফে কেহ অমনি গরাসে ॥
পরিয়া নাড়ীর মালা কেহ করে নাট।
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট ॥
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ডদানা।
হাটে করে কেবল মাংসের বেচাকেনা ॥

(১৭শ সর্গ)

কবি করুণরস-পরিবেশে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। একমাত্র শাকার বিলাপে আমাদের হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে—

নিশায় নিধন রণে, পিতামাতা বন্ধুগণে
দেখিতে না পেনু শেষকালে ॥
গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর,
দিহ মোর যেখানে জননী।
নিশান অঙ্গুরী লয়ে, ময়ূরার হাতে দিয়ে,
কয়ো তুমি হলে অনাথিনী ॥
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে,
সঁপে সমাচার বলো, অকালে অভাগা মলো,
অভাগিনী রাখে সাথে সাথে ॥
শুকায় সুবর্ণ ছড়া, বাপেরেও ঢাল খাঁড়া
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।

* * *

কাণের কুণ্ডল ধর, শিঙ্গাদার তুমি পর,
ছুরী তীরে তুষ বীরগণে।
শুনি শোকে শিঙ্গাদার, চক্ষে বহে জলধার,
বহে লোহ শাকার নয়নে ॥

(২২শ সর্গ)

ধর্মঠাকুরের মহিমাকীর্তন-উপলক্ষে কবি হিন্দুদেবদেবীগণের বিবিধ কীতিকলাপ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তৎকালে রমণীগণের লাসবেশ পরিধান করিয়া পুরুষের হৃদয় জয় করার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। বশীকরণ-বিদ্যায় যে স্ত্রীলোকেরা সবিশেষ পারদর্শিনী ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

তৎকালীন যে সামাজিক চিত্র কাব্যে অংকিত হইয়াছে তাহা একমাত্র পাকা হাতেই সম্ভব। এ হিসাবে কবি ঘনরাম আমাদের নমস্য। তখন যে ইন্দ্রজালবিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ছিল তাহার নমুনা দেখিতে পাই—

জাগ্ জাগ্ জাগ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর ॥
আগম ডাকিনী-তন্ত্রে মন্ত্রে প'ড়ে মাটী।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিচুটী ॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥
খাটে বাটে ভূমে প'ড়ে যেজন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥

(৬ষ্ঠ সর্গ)

কবি রমণীগণের যে-চিত্র অংকিত করিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত শাস্ত্রীয় উপমা দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

কবি ঘনরাম হাস্য-রসের পরিবেশ করিতে সিদ্ধহস্ত—

সর্ব্বকাল কামনা প্রমাণ ঐ পা।
তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা ॥
বাসুলি বলেন বাছা শুন প্রাণ জুড়া।
কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া ॥

(১৬শ সর্গ)

কবিবরের যে তুলিকায় নয়ানী, সুরিক্ষা প্রভৃতি ভ্রষ্টা-নারীচিত্র অংকিত হইয়াছে—সেই তুলিকার যাদুদণ্ড স্পর্শে কলিঙ্গা, অমলা, কানড়া প্রভৃতির সতীত্বমহিমা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সতী-সাধ্বীর চরিত্র

আমাদিগকে পৌরাণিক সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পৌরাণিক দেবীগণের সমগোত্রা মনে করিয়া ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক নত হয়। ইঁহাদের স্পর্শে যেন পাষাণ হয় 'অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী'।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বিয়োগান্ত কাব্য নহে। কবি কল্পনার স্বর্গরাজ্য সৃজন করিয়া সপরিবারে লাউসেনকে সশরীরে তথায় পাঠাইয়া দিয়া কাব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। পার্থিব ভোগৈশ্বর্যের প্রতি লাউসেনের আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইয়া কবি হনুমানের মুখ দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কামের প্রার্থনা দুঃখময়; বিশেষতঃ কলিকালে ধর্ম-কর্ম ব্রহ্মচিন্তা বলিয়া কিছুই থাকিবে না। ইহা বৌদ্ধধর্মের 'দুঃখবাদ' ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুকর্মের অবসানে মানব পুনরায় দুঃখময় সংসারে জন্ম-পরিগ্রহ করে। কলিকালে একান্তমনে ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হইলে মানব এই কর্মবন্ধন ছিন্ন করিতে এবং পরিণামে নির্বাণলাভে সমর্থ হইবে। বৌদ্ধধর্মের এই মর্মবাণীর ভিতর দিয়া কবি কাব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

নবীন-স্বপ্ন

শ্রীসংযুক্তা কর, বি-এ

থাক্ থাক্ পড়ে মিছে ক্ষয় ক্ষতি ভাবনা—
মরুমায়া ফাঁদে কাঁদুনি গেয়ে কি হবে?
ভাঙো শৃঙ্খল! পিছনেতে ফেরা কেন?
নব ভাস্কর উদয়-অচলে জাগে।

যাত্রা যে শুরু—বন্দরে কাল শেষ,
চির-দুর্জ্জয় হাসিছে নবীন বেশে।
সর্পিল পথ এখনো অনেক বাকী—
অজাগর ঘুম পথের প্রান্তে ভাঙো।

হিমঝরা রাতে তারার ইশারা ধরি',
অনেক কেতকীমত্ত শাঙন রাতি,
পার হয়ে শেষে মধু ফাল্গুন দিন,
চৈতী হাওয়ায় এসেছি পথের বাঁকে।

সূর্য্য-সারথি দেখাও দেখাও পথ!
নয়া বন্দর কত দূর—দূর কত?
যৌবন-গানে সাধিয়ে নিয়েছি বীণা,
নবীন স্বপ্ন জাগে নব অনুরাগে।

বৃথা আশ্বাসে ভরিনি চিত্ত মোর—
জানি নির্দ্দয় কালপুরুষের ভাষা।
হিরণ্ময়ের শুভ ইঙ্গিতে শুধু,
জ্বলুক দীপ্ত জীবন-যজ্ঞ মম।

ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-তর্পণে *

শ্রীবীণাপাণি বসু, এম্‌-এ, বি-টি

নিবেদিতা বিদ্যামন্দিরে আজ আমরা ভগিনী নিবেদিতার পুণ্যস্মৃতি-তর্পণ করতে সমবেত হয়েছি। আমাদের আয়োজন সামান্য—শুধু আন্তরিকতা দিয়ে অর্ঘ্য রচনা করে তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করতে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। তিনি মহীয়সী—তাঁর প্রসন্ন চোখের দৃষ্টি আমরা যেন অন্তরে অনুভব করতে পারি।

পার্থিব দৃষ্টিতে এখন আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, কিন্তু এক দিন তিনি এখানে আপন মহিমায় বিরাজিতা ছিলেন। এই ধরিত্রীর ধূলিতে তাঁর পদস্পর্শ পড়েছে—এখানকার বাতাসে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের কল্যাণ-চিন্তায় শ্রান্তি ছিল না তাঁর—আপনাকে তিনি নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আদর্শ ত্যাগের মহিমায় তিনি সমুজ্জ্বল। ভগিনী নিবেদিতাকে লাভ করবার সৌভাগ্য এক দিন আমাদের হয়েছিল—আমরা বাংলা দেশের মেয়েরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি। তিনি হাতে ধরে আমাদের লিখতে পড়তে আঁকতে শিখিয়েছেন। ইংরেজ মেয়ে তিনি—মিস্ মার্গারেট ই নোব্‌ল তাঁর নাম—সে নামের বদলে স্বামীজীর দেওয়া ভগিনী নিবেদিতা নাম নিলেন তিনি। স্বামীজীর স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে এলেন তিনি আমাদের মাঝে। আমাদের দেশকে আপন করে নিতে চাইলেন অন্তর থেকে। ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জানতে তাঁর কত আগ্রহ! 'Line'-এর বাংলা 'রেখা' শুনে ছেলেমানুষের মত তাঁর কত আনন্দ! এসব আমাদের শোনা কথা।

ভগিনী নিবেদিতাকে চোখে দেখিনি আমরা অনেকেই, তাঁর সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাপূর্ণ কোন বই আজও লেখা হয় নি; শুধু সরলা বালা দেবীর 'ভগিনী নিবেদিতা', আর এখানে ওখানে ছড়ানো প্রবন্ধ পড়ে অন্তরে পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তবু তা' থেকেই আমরা তাঁর অন্তরের রূপটী কিছু যেন দেখতে পাই। তাঁকে দেখি নি, তিনি নেই এ আমরা ভাবতে পারি না—চাইও না। তিনি এখানে আপন মহিমায় বিরাজমানা। এখানকার প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার পথে আছে তাঁর আশীর্ব্বাদ। তাঁরই আশীষ ছড়িয়ে আছে আনন্দ-উৎসবে, দুঃখ-বিচ্ছেদের মাঝে, আছে এখানে ছাত্রীদের আসন্ন পরীক্ষার উদ্বেগে—আছে পরীক্ষা-শেষে সাফল্যের আনন্দ-কোলাহলে!

বর্ত্তমান বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠা অনেক পরে হয়েছে। প্রথমে বিদ্যালয়ের আরম্ভ বাগবাজারের বসুপাড়া লেনের এক ভাড়াটে বাড়ীতে। ভগিনীর জীবনকালে এই বিদ্যাভবনের কিছুই প্রায় গড়ে ওঠেনি, তবু এই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে আমাদের তাঁর উপস্থিতি কল্পনা করে নিতে বাধে না; তাঁর নামের মধ্যে তিনি বিরাজ করছেন। তাঁর সম্বন্ধে শোনা পুণ্যকথা এখানকার পরিবেশের মধ্যেই আমরা ভেবে নিতে পারি—তিনি পড়াচ্ছেন আমাদের

* গত ২১শে সেপ্টেম্বর বাগবাজার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে 'নিবেদিতা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পঠিত।

দেশের ইতিহাস, আমাদের অতীতের বীর্য্যের কাহিনী, ত্যাগের কাহিনী, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা! উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ, উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে! হাতে ধরে তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষাদান-প্রণালী—কেমন করে শিক্ষা হয়ে ওঠে সার্থক। আনন্দের শিক্ষাও শিখিয়ে গেছেন তিনি। নিবেদিতা বিদ্যামন্দিরের বাণীর আরাধনার প্রথম সূত্রপাত তিনিই করে গেছেন। চাঁদা তুলে ৫৲ টাকার মধ্যে প্রতিমা-পূজা! আজও মনে হয় শ্রীপঞ্চমীর দিনে আমাদের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে তাঁকে যেন আমরা আমাদের মধ্যে পাই।

আমাদের শিক্ষায়তনের সঙ্গে প্রাণের যোগ ছিল তাঁর; কিন্তু আমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণের চিন্তা সর্ব্বদাই জাগরূক হয়ে থাকত তাঁর প্রাণে; স্বাধীনতা-প্রয়াসীদের সকল চেষ্টাতেই ছিল তাঁর প্রাণের সমবেদনা; অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন তিনি পরাধীনের মর্ম্মব্যথা! আমাদের দেশের মহান্ যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ছিল তাঁর যোগসূত্র। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। আরও অনেককে তিনি জান্তেন, চিনতেন—সহায়তা করেছেন তাঁদের কাজে। ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর শিল্পী মন আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পরিচয় পাই শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপে, আর শিল্পী নন্দলাল বসু প্রভৃতিকে অজন্তায় পাঠাবার সহায়তার মধ্যে।

তাঁর অসীম ভক্তি ও প্রেম মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর ব্যবহারে। বিদ্যালয়ের পূর্ণতার জন্য মাকে এখানে আনতে হবে; তাঁর পায়ের স্পর্শে হবে এস্থান ধন্য! তাই হোল—মায়ের সামনে লুটিয়ে প্রণাম করলেন তিনি! কি ব্যাকুল আগ্রহে অন্তরের ভক্তির উৎস-ধারায় মাকে অভিষিক্ত করলেন এখানে! মায়ের আশীর্ব্বাদ রইল তাঁর প্রতিষ্ঠানের মাঝে।

তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী গুরুর যোগ্যা শিষ্যা তিনি! তেজোময়ী, বীর্য্যবতী, দৃপ্তা, অথচ ভক্তি-শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। তাঁরই লেখা 'My Master as I saw Him' বইয়ের ভাষার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের পরিচয় আভাসে ফুটে উঠেছে।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়— "ভারত-বর্ষকে যাঁরা সত্যি ভালবেসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড় * * * কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা—ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্ত্তি একটা"—আর এক জায়গায় অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "নিবেদিতা এলেন—সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন—সে কি বলব! যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল * * * সুন্দরী সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়েছে। 'কাদম্বরী'র মহা-শ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্ত্তি যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠল।"

ভগিনীর সম্বন্ধে সকল কথা আজও জানা যায় নি। টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে আমরা তাঁকে পূর্ণরূপে দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। মনের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে তাঁকে দেখিনি, সে সৌভাগ্য হয়নি বলে। এই না দেখার বেদনার লাঘব করবার জন্য তাঁকে উপলক্ষ্য করে তাঁর স্মৃতিপূজার দীনতম আয়োজন আমাদের, আর অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করছি আমরা—আত্মনিবেদনের জাগ্রত প্রতীক ভগিনী

নিবেদিতার উদ্দেশে। তিনি আমাদের অন্তরের পূজা গ্রহণ করুন—সৈষা প্রসন্না বরদা ভবতু। তাঁর প্রসন্ন অন্তরের আভাস আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হোক, চারিদিকে প্রসন্ন আলোকে উদ্ভাসিত হোক্, তাতে আমাদের মলিনতা দীনতা হীনতা দূরে যাক! মধুময় হোক্ পৃথিবী আকাশ-বাতাস অন্তরীক্ষ ভূলোক দ্যুলোক—সব হোক্ মধুময়!

প্রাপ্তি

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

ধরা তুমি দিয়েছো আমায়
ওগো প্রিয়,
বারে বারে।
নহে শুধু চুপিসারে।

আমার জীবন-পথে,
কতবার কত ভাবে,
আপনাকে করেছো প্রকাশ।
কোন অবকাশ
রাখোনি কখনো
চিনেছি কি চিনি নাই
সে কথা জানিতে।

আপনাকে ধরা দিতে
কোন বাধা মানোনি কখনো—
ছোট শিশুসম।

যখনি ভেবেছো তুমি
ধরা দিবে মোরে—
তখনি দিয়েছো ধরা
কোন রূপ ধরে।

একটু হেঁয়ালি তাতে
ছিল গো মেশানো।
কখনো
আমাকে তাহা
পারনি লুকোতে।

প্রিয়জন হ'য়ে তুমি
এসেছিলে কাছে।
আশে পাশে
স্নেহের বাঁধন যত
করিয়া সৃজন।
দয়া মায়া প্রেম-ভালবাসা—
অকাতরে দিয়েছো ঢালিয়া।
তবু প্রিয়,
রেখেছো ঢাকিয়া—
তোমার স্বরূপ—
রূপের আড়ালে।

* * *

আগুনের যে শকতি
পুড়ে ফেলে সব—
আগুনের সাথে তাহা
রেখেছো মিশায়ে।
সেই তো স্বরূপ তব—
সে রূপ হেরিতে
মোর শকতি কোথায়?
তবু জানি ধরা তুমি
দিয়েছো আমায়।

ভারতে ইংরেজী ভাষার ভবিষ্যৎ

ভারতীয় গণপরিষদে আগামী পনর বৎসরের জন্য ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে রাখিবার এবং তৎপরে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া সম্প্রতি 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উগ্র স্বাজাত্যবোধের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া যে বাস্তব বুদ্ধি ও আপসের মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা-নির্বাচনের ব্যাপারে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে পণ্ডিত নেহেরু তৎসম্পর্কে একটি প্রাঞ্জল বিবৃতি প্রদান করেন। ইংরেজী ভাষা বর্তমান বিশ্বে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে যে ভারতীয় বিদ্যালয়-সমূহে তাহাকে সম্ভবতঃ একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসাবে রাখা হইবে। কিন্তু তথাপি ইহা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না এই কারণে যে, ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে এমন এক অবাঞ্ছিত বিভেদের সৃষ্টি হয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাহার প্রতিক্রিয়া সামান্য নহে।

এখনও পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা ভারতের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কেরাণীরা এই ভাষায় চিঠিপত্র লিখিয়া থাকেন, ছাত্রেরা এই ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে এবং সাংবাদিকগণ এই ভাষারই মাধ্যমে জনমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। ভারতে প্রচলিত ইংরেজী ভাষার মান অত্যন্ত উচ্চ; যাঁহারা পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতা শুনিয়াছেন বা 'হিন্দু' পত্রিকা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিবেন।

ইংরেজী ভাষাকে ভারত হইতে অতি দ্রুত নির্বাসন দেওয়া চলিতে পারে না। কালই যদি ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দী ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে ছুটি দিতে হইবে; বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীকে নূতন ভাষা শিক্ষা না করা পর্যন্ত তাঁহাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিতে হইবে; অধিকাংশ অফিস ও আদালতের কাজকর্ম অচল হইয়া যাইবে এবং ফলে কিছুকালের জন্য সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও ভারতে ইংরেজী ভাষার চর্চা লোপ পাইবে না। বহির্জগতের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য প্রত্যেক দেশেরই একটি প্রথম শ্রেণীর বিদেশী ভাষার সহিত পরিচয় রাখা আবশ্যক। ইংলণ্ডে ফরাসী ভাষার যেরূপ স্থান ইংরেজী ভাষা ভারতে সম্ভবতঃ সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার যত গুণই থাকুক না কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা তাহার নাই। সেই যোগ্যতা আছে কেবলমাত্র হিন্দী ভাষার।

বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক হিন্দী ও তাহার উপভাষাগুলিতে কথাবার্তা বলিয়া থাকে। অপর কোন প্রাদেশিক ভাষা হিন্দী অপেক্ষা উন্নততর হইলেও ইহার অর্ধেক সংখ্যক লোকেরও মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। দেবনাগরী বর্ণমালার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি করিয়া হরফ থাকার দরুন ইহার বানানপদ্ধতি অতি সরল। রোমান বর্ণমালায় যথেষ্টসংখ্যক হরফের অভাব আছে এবং উর্দু বর্ণমালার অত্যধিক সংক্ষিপ্ততা নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে ভারতীয় গণপরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সুবিবেচনা-প্রসূত। ইংরেজী ভাষাকে কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়া ভারত সমগ্র বিশ্বে এক বৃহৎ উদারনৈতিক রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারত একজাতি-গঠনের পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।*

* নিউ দিল্লী ব্রিটিশ ইন্‌ফরমেশন সারভিসেস্‌-এর সৌজন্যে প্রকাশিত—উঃ সঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত

পঙ্কিল বায়ুতে যবে পরিপূর্ণা হয় বসুন্ধরা,
ক্লীবতা হীনতা যবে মানবেরে করে আত্মহারা,
অশিবের মায়াজাল শিবের ঘটায় ব্যবধান—
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে যুগে যুগে আস ভগবান
দানব দলিয়া নিত্য মানবের ঘুচাও সঙ্কট,
বহুরূপে অবতীর্ণ বহুরূপে আঁকা তব পট।
রামকৃষ্ণরূপে এবে আবির্ভূত হইলে ধরায়
মিলিত হইল সর্ব্বরূপ এক হ'ল তব সাধনায়
মহামিলনের দ্রষ্টা—হে মহান করি নমস্কার
অবতার মাঝে তুমি রামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ অবতার।

শ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

জনৈক ভক্ত মিরাট থেকে লাটু মহারাজের কাছে এসে বললেন, 'কেদারবাবা পাঠিয়েছেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।' মহারাজ ভক্তটির খবর-টবর নিলেন। ভক্তটি বিবাহ করেনি জেনে খুব খুসী হলেন। মহারাজ তখন প্রসাদ পাচ্ছিলেন। ভক্তটিকে ডেকে তাঁর পাত্র থেকে প্রসাদ খেতে দিলেন। এটি তাঁর ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখলুম। এর আগে এরূপ করতে তাঁকে কখনও দেখি নি। ভক্তটির খুব ভক্তি বিশ্বাস। মহারাজ বল্লেন, 'আপনি আমার কাছে থাকুন।' উনি লাটু মহারাজের খুব পরিচর্য্যা করেছিলেন। ভক্তটি চাকরী করতেন; কিন্তু খুব প্রাণ দিয়ে মহারাজের সেবাযত্ন করেছিলেন। ভৎ'সনা, বকুনী খেয়েও তাঁর নিষ্ঠা, ভক্তি অটল ছিল। মাঝে একবার চাকরীর জন্য মহারাজের কাছ থেকে যেতে হয়েছিল। মহারাজ বারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যেতে হ'ল। মহারাজ তখন বলেছিলেন, 'যাবে কোথায়? ওকে আবার আসতে হবে।' মহারাজকে সেই ভক্তটি প্রত্যহ খিচুড়ী রান্না করে খাওয়াত। আমি ভক্তটিকে বল্লাম, 'আপনি কেন যাচ্ছেন? মহারাজ রোজ আপনার হাতে খাচ্ছেন, আপনার কত সৌভাগ্য, আপনি যাবেন না।' পরে তিনি আবার ফিরে এসে মহারাজের অনেক সেবা করেছিলেন।

* * *

ভাই ভূপতি কিছু দিন মহারাজের কাছে ছিলেন। তিনি বিনা অনুমতিতে মহারাজের কাছ-ছাড়া হতেন না। বৃহস্পতিবার বারবেলায় গেলে মহারাজ বলতেন, 'ভূপতি, আজ বৃহস্পতি-বার!' ভাই ভূপতি লাটু মহারাজের নিকট খুব বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি নিয়ে তবে রওনা হতেন। তিনি মহারাজের প্রতি অগাধ ভালবাসাও শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলেন। মহারাজ বলতেন, 'কাশীতে ভূপতি যোগানন্দের সঙ্গে কতো কঠোর করেছে।' ভূপতি একবার কাশীর বেগুন সস্তা দেখে খাওয়ার ইচ্ছা করায় যোগানন্দ বললেন 'এ ই সাধু হবে।' ভূপতি কাশীতে কপর্দ্দকশূন্য ছিলেন। শ্রীশ্রীলাটু মহারাজ সেবাশ্রমের দ্রব্য সাধারণতঃ গ্রহণে নারাজ ছিলেন। বলতেন, 'রোগীদের জন্য দেয় জিনিষ সাধু কেন গ্রহণ করবে?' সেবাশ্রমের চারুবাবুর (শুভানন্দ) নিকট টব নিয়েছিলেন। চারুবাবু দাম নিতে না চাইলেও জোর করে ওর ।০ আনা দাম দিয়েছিলেন। কেদারবাবা মহারাজের জন্য কিছু নেবুর আচার নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করেন নি। কেদারবাবা বললেন, 'শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি গ্রহণ করেছেন।' উত্তরে মহারাজ বললেন, 'তাঁরা খেয়েছেন তাতে কি হয়েছে? আমারিও খেতে হবে?' কিন্তু অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ নিতে কখনও আপত্তি করেন নি। বলতেন, 'ওখানে ঠাকুর-সেবা হয় কি না!'

* * *

রোগি-সেবা করে এসে কোন সাধু মহারাজের পা ছুঁলে তিনি বলেছিলেন, 'রোগীর মায়া আমার ঘাড়ে ফেলো না।'

লাটু মহারাজ বলতেন 'চন্দ্র (স্বামী নির্ভরা-

নন্দ) যে সাধুকে অন্ততঃ তিন দিন স্থান দেয় এটা ভালো। তারপর সাধু আস্তানা খুঁজে নেবে, সাধু ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে ও মাধুকরী করবে—কারুর দিক্ (বিরক্তি) করবে না।'

*　　*　　*

মহারাজ জনৈক সাধুকে কথাচ্ছলে বলেছিলেন, 'সেবাশ্রমে ওখানকার কিছু না কিছু কাজ করতে হবে। তা না হলে সেবাশ্রম চলে না। তোমার এতে অসুবিধা হলে চলবে না। তুমি উত্তরাখণ্ডে গিয়ে সাধন ভজন করো। তোমার উপর যাঁরা আছেন তাঁরা ভাববেন। শ্রীশ্রীমহারাজ, শরৎ মহারাজ এঁদের দায়িত্ব কতো! তুমি অমুকের ভাই বলে তোমাকে খোসামোদ করতে পারবো না।' সে বিরক্ত হয়ে চলে গেল। লাটু মহারাজ চিন্তায় ও কথায় সমভাবে স্বাধীন ছিলেন।

*　　*　　*

লাটু মহারাজকে জনৈক সাধু শ্রীচরণে জড়িয়ে বলেছিলেন 'আমাকে কেউ সমাদর করে না।' লাটু মহারাজের আশ্বাস-বাক্য শুনে তাঁর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসেছিল, আমি মহারাজকে বললুম, "একটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরে আপনার দর্শনের জন্য বসে আছে।" মহারাজ বললেন, "গেলেই হত।" পরে তাকে ডেকে দিতে বললেন। সাধুটি শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা নিয়ে গয়াধামে বাপমায়ের কাজ করে এসেছে। ইহা শুনে মহারাজ খুব খুশী হলেন ও বললেন, 'খুব ভাগ্যবান্, তা না হলে মার কৃপা পায়?' সাধুটি এক বৃদ্ধের সঙ্গে এসেছেন, তাঁকে সেবা করতে বল্লেন। পরে সাধুটি মহারাজের কাছে আশ্রয় পেলেন। লাটু মহারাজ যার প্রতি কৃপা করতেন তার প্রতি অহেতুক সদয় হতেন।

*　　*　　*

কাশীতে লাটু মহারাজ প্রথম প্রথম কোন স্ত্রীলোককে পা স্পর্শ করতে দিতেন না। মেয়েরাও তাঁর কড়া স্বভাব দেখে পায়ের নিকট যেতে সাহস করতেন না। কেবল খুব ভাল আধার দেখলে কখনও কখনও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন। এ বিষয়ে শেষের দিকে অনেকটা উদার হয়েছিলেন।

*　　*　　*

তিনি গৃহস্থকে বিষয়-আশয় রক্ষা করতে উপদেশ দিতেন। বিষয় বিক্রয় করে যারা লক্ষ্মীছাড়া হাবাতের মত দিনযাপন করত তিনি তাদের বিশেষ পছন্দ করতেন না।

*　　*　　*

সাধুদের মাধুকরী ভিক্ষায় মহারাজের খুব প্রীতি ছিল। বলতেন, 'গৃহস্থ একখানা রুটী ও একটু অন্ন দিবে—এতে আর কি কামনা করবে? বেশী দান করলে ছেলে হোক অর্থ হোক এসব কামনা গৃহস্থরা করে। তজ্জন্য সে অন্ন শুদ্ধ নয়, মাধুকরীর অন্ন শুদ্ধ। মাধুকরী ভিক্ষা খুব ভাল, এতে শীঘ্র চৈতন্য হয়।'

ভারত-জার্মাণ সাংস্কৃতিক সংযোগ *

হেলমুথ্ ফন্ গ্লাসেনাপ্
অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকগণ-লিখিত মহাবীর আলেকজান্দারের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির বিবরণ এবং খৃষ্টীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত বুদ্ধের জীবনী 'বারলাম্ ও জোসাফট্' প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি হইতে জার্মেণি মধ্যযুগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মাণ ভাষায় অনূদিত প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র' নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। ওয়ারটেম্বার্গের কাউণ্ট এবারহার্ডের প্রোৎসাহে য়্যাণ্টন ফন্ পফর্ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে 'পঞ্চতন্ত্রের' ল্যাটিন সংস্করণ জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেন। পঞ্চতন্ত্রের এই ল্যাটিন সংস্করণখানি আবার নির্ভর করিয়াছিল কতকগুলি হিব্রু, আরবী ও পহ্লবী অনুবাদের উপর। প্রাচীন ঋষিগণের হিতোপদেশ-সম্বলিত এই পুস্তকখানি অত্যাশ্চর্যরূপে ও প্রভূত পরিমাণে জার্মাণ উপন্যাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, কারণ অনেক জার্মাণ কাহিনী এই পুস্তক হইতে উদ্ভূত। অবশ্য সেই সুদূর প্রাচীনকালে ভারত সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধের সময় অদ্ভুত গজ, একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট কল্পিত জন্তুবিশেষ (unicorn), পুরোহিত-রাজা জনের উপকথা ব্যতীত অন্য কোনও কাহিনী ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে পৌঁছে নাই। ইটালীদেশীয় মার্কো পোলো প্রমুখ কেবল কয়েক জন পাশ্চাত্যবাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কৃত হইবার পর ভারত-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ ভাষায় অনূদিত এব্রাহাম্ রোজারের 'ওপেন্ ডোর টু হিড্ন্ হিদেনডম্' নামক পুস্তক হইতে ক্যাথলিক মিশনারীর দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের বিবরণ সর্বপ্রথম জানা যায়। ফাদার হেনরি রথ্ ও হ্যানক্স্লেডেন প্রমুখ কয়েকজন খৃষ্টধর্ম-প্রচারক সংস্কৃতভাষা-অনুসন্ধানের কার্যে অগ্রগামী হন। প্রোটেষ্টাণ্ট্ মিশনারী বারথলোমিউস্ জিগেনবাল্গ্ তামিল ব্যাকরণ ও মালাবারের ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়াছেন।

এ পর্যন্ত যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা জীবিত ছিলেন সার চার্লস উইল্কিন্সের 'ভগবদ্গীতা'র অনুবাদ (১৭৮৫), সার উইলিয়ম জোন্সের মহাকবি কালিদাস-কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক ও 'মনুসংহিতা'র ইংরেজী অনুবাদ (১৭৮৯) এবং সার কোল্ব্রুকের বিখ্যাত 'নিবন্ধাবলী' প্রকাশের দ্বারা ভারতীয় বিদ্যার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন আরম্ভ হইবার পূর্বে।

সংস্কৃতজ্ঞ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা প্রথম জার্মাণ পণ্ডিত ছিলেন

* 'প্রবুদ্ধভারত' মাসিক পত্রিকায় (অক্টোবর, ১৯৪৯) প্রকাশিত 'জার্মেণি ও ভারত' শীর্ষক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

ফ্রিড্‌রিক্‌ স্লিগেল। ১৮০২ খৃঃ অধ্যয়নের নিমিত্ত প্যারীতে অবস্থানকালে তিনি আলেকজান্দার হ্যামিল্টন নামে জনৈক ইংরেজের সহিত পরিচিত হন। হ্যামিল্টন ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াছিলেন। ভারত হইতে ফিরিয়া হ্যামিল্টন ফ্রান্সে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু তখন নেপোলিয়ন রাজনৈতিক কারণবশতঃ ইংলণ্ডকে ইউরোপের অন্যান্য দেশসমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। হ্যামিল্টনের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও জার্মাণ পণ্ডিত স্লিগেলের নিকট ইহা প্রকৃতই আশীর্বাদ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, কারণ সেই সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকলাভ অথবা ব্যাকরণ-সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হওয়ায় প্রতিভাশালী তরুণ জার্মাণ কবি ইংরেজ হ্যামিল্টনের নিকট হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিবার অপূর্ব সুযোগ পাইলেন। জার্মেণীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্লিগেল ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণ ভাষায় 'ভারতীয়দের ভাষা ও জ্ঞানভাণ্ডার' সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক-প্রকাশনের দ্বারা এযাবৎ প্রায় অজ্ঞাত ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি জার্মাণ মনীষীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পরবর্তী কালে স্লিগেল সংস্কৃত-অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা শেক্ষপিয়রের নাটকাবলীর প্রসিদ্ধ অনুবাদক অগাষ্ট উইল্‌হেল্‌ম্‌ স্লিগেল সংস্কৃত-অধ্যয়নকে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি 'ভগবদ্‌গীতা' এবং 'রামায়ণে'র এক সংস্করণ বাহির করেন এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত বন্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জার্মেণীতে প্রথম ভারতীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

স্লিগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সমসাময়িক ছিলেন তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বের সুবিখ্যাত গবেষক ফ্রান্‌জ্‌ বপ্‌। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'সংস্কৃত ভাষায় ধাতুরূপ-রীতি' সম্বন্ধে একখানা পুস্তক এবং 'নলদময়ন্তীর উপাখ্যান' ও মহাভারতের অন্যান্য অংশগুলির সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

উনবিংশ শতকের প্রথমপাদে জার্মাণ কবি ও দার্শনিকগণ ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি ক্রমবর্ধমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ জার্মাণ কবি গেটে 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত' ও 'গীতগোবিন্দের' ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অভিনয়ের প্রারম্ভে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে সূত্রধারের মুখে প্রস্তাবনার রীতি কবি গেটেকে তাঁহার 'ফাউষ্ট' নামক বিখ্যাত নাটকে উহা অনুকরণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। *

কবি ফ্রিড্‌রিক্‌ রুকর্ট বহু প্রাচ্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি ভারবির 'কিরাতা-র্জুনীয়ম্‌' প্রমুখ সংস্কৃত কাব্যসমূহের অতি দুরূহ শ্লোকগুলিরও জার্মাণ ছন্দে অনুবাদ করিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। উইলহেল্‌ম্‌ ফন্‌ হাম্‌বল্ড বহু বৎসর বার্লিনে শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি সংস্কৃত জানিতেন এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় বিজ্ঞান পরিষদে 'ভগবদ্‌গীতা' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা অনুধাবনযোগ্য যে, তৎকালীন জার্মাণ দার্শনিকগণ ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। ইতঃপূর্বে

* জার্মান কবি গেটে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌'-এর অসাধারণ সুখ্যাতি করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তুমি যদি স্বর্গ ও মর্ত্যের একত্র সম্মিলন দেখিতে চাও তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।" 'মেঘদূতে'র প্রশংসায়ও পঞ্চমুখ হইয়া গেটে বলিয়াছেন, "ভারতের ভৌগোলিক চিত্রের বর্ণনায় এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতীত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।" —অনুবাদক

ইমান্সুয়েল কাণ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনায় মনোবিবেশ করেন। মূল সংস্কৃতের সুন্দর অনুবাদ সহজলভ্য হওয়ায় শেলিং, হেগেল ও শোপেনহাওয়ার ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিশদরূপে আলোচনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহা সুবিদিত যে, শোপেনহাওয়ার উপনিষৎসমূহকে 'তাঁহার জীবন ও মৃত্যুর সান্ত্বনাস্বরূপ' মনে করিতেন এবং বুদ্ধকে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইতেন।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন ভারতের যে জ্ঞান-ভাণ্ডার জার্মাণ মনীষিগণ অধিগত করিয়াছিলেন উহা খুব নৈপুণ্যের সহিত খৃষ্টান পণ্ডিত লাসেন্ তাঁহার চারি খণ্ডে বিভক্ত 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব' (১৮৪৩-১৮৬২) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ সংকলন করিয়াছেন। নরওয়েদেশীয় লাসেন জার্মাণ শ্লিগেলের ছাত্র ছিলেন এবং পরে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে বন্ সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় উহাকে রাইন নদীর তীরস্থ বারাণসী বলা হইত।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হওয়া অবধি তদানীন্তন জার্মেণির সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠনপাঠন হইতে থাকে। এত অধিকসংখ্যক পণ্ডিত সংস্কৃত-অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কয়েকজন বিদেশে অধ্যাপনা-কার্যের জন্য আহূত হইলেন। তন্মধ্যে মোক্ষমূলারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ডেসৌতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতার নাম ছিল কবি উইলহেল্‌ম্ মূলার। মোক্ষমূলার বিখ্যাত ফরাসী মনীষী বারনোফের ছাত্র ছিলেন। যৌবনকালেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে 'ঋগ্বেদসংহিতা'র একটি সংস্করণ বাহির করেন (১৮৪৯-১৮৭৫)। ("অধ্যাপক মোক্ষমূলার পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতজ্ঞদিগের অধিনায়ক, পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী। মোক্ষমূলার অপেক্ষা ভারতহিতৈষী ইউরোপ-খণ্ডে আছেন কিনা সন্দেহ। তিনি যে শুধু ভারতহিতৈষী তাহা নহেন, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে, ভারতের ধর্মে তাঁহার আস্থা ছিল; অদ্বৈতবাদ যে ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া তাহা অধ্যাপক সর্বসমক্ষে বারংবার স্বীকার করিয়াছেন। চল্লিশবৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অবিরাম অধ্যবসায় ও গভীর সংস্কৃত-নিষ্ঠার অত্যাশ্চর্য ফলস্বরূপ সটীক ঋগ্বেদ-সংহিতার একটি সুন্দর সংস্করণ মুদ্রণ মোক্ষমূলারের জীবনের অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। তিনি আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ডুবিয়া ছিলেন। অধ্যাপকের অন্যতম কীর্তি ইউরোপীয় মনীষিগণের অবগতির জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট সংখ্যা 'নাইনটিন্থ্ ছেঞ্চুরি' নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় 'প্রকৃত মহাত্মা' শীর্ষক প্রবন্ধ-প্রকাশ। 'ব্রহ্মবাদিন্' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ও উপদেশ,' ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত,' ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারিক টনি সাহেবের লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত', এবং মাদ্রাজ ও কলিকাতা হইতে সংগৃহীত বিবরণাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মোক্ষমূলার 'রামকৃষ্ণের জীবন ও উক্তি' সম্বন্ধে 'নাইনটিন্থ্ ছেঞ্চুরী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন।"—স্বামী বিবেকানন্দের 'ভাববার কথা') তিনি 'ভারতীয় ষড়্‌দর্শন' এবং পনর খণ্ডে 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থরাজি' নামক পুস্তক রচনা করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মূলার অক্‌স্‌ফোর্ডে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত তৎপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জার্মেন পণ্ডিত থিওডোর গোল্ডষ্টুকার, থিওডোর ওফ্রেক্ট ও এগেলিন ইংলণ্ডে এবং

কিল্‌হর্ণ, বুলার, হোয়ারন্‌লি ও থিব ভারতবর্ষে পর পর সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোক্ষমূলারের সময় হইতে বেদাধ্যয়ন বরাবরই ভারতীয়বিদ্যানুরাগী জার্মান পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই যে, জার্মাণ পণ্ডিতগণ সর্বপ্রথম চতুর্বেদসংহিতার সমালোচনামূলক সংস্করণ বাহির করেন। মোক্ষমূলার ও থিওডোর ওফ্রেক্ট ঋগ্বেদের, থিওডোর বেন্‌ফে সামবেদের (১৮৪৮), এলব্রেষ্ট ওয়েবার (১৮৫২-১৮৭১) ও লিওপল্ড ফন্ শ্রোয়েডার্ (১৮৮১-১৯০০) যজুর্বেদের, এবং রুডল্‌ফ্ রথ্ অথর্ববেদের (১৮৫৬) সংস্করণ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে যে সকল জার্মাণ পণ্ডিত বৈদিক সূক্তের অনুবাদ এবং প্রাচীন বৈদিক কাহিনীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গ্রাস্‌ম্যান, লুডউইগ, গেল্ডনার, ওল্ডেনবার্গ, হিলেনব্রাণ্ড এবং লুডার্স এর নাম উল্লেখযোগ্য।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'কে তুমি ?'

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ

আলোকেতে জ্যোতিঃ তুমি
　　ফুলেতে সুবাস,
সঙ্গীতের তান তুমি,
　　মলয়ে পরশ।

বরষার ধারা তুমি
　　শরতে শেফালী,
আকাশের নীল তুমি,
　　সন্ধ্যার চামেলী।

হিয়ার স্পন্দন তুমি
　　মাতার পীযূষ,
প্রিয়ের পীরিতি তুমি
　　কভু না কলুষ।

রাজহস্তে দণ্ড তুমি
　　সাধু-হৃদে ক্ষমা,
কে তুমি, কে তুমি ওগো,
　　আমি তো জানি না !

মহাজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার

একদিন গৌরীর বাসনা হইল শিবমুখে মহাজ্ঞান শুনিবেন। প্রথমে শিব মহাজ্ঞান বলিতে সম্মত হন নাই। পরে ভার্যার নির্বন্ধে তাঁহাকে মহাজ্ঞান শুনাইতে হইয়াছিল। ক্ষীরোদ সাগরের টঙ্গীতে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থান অসম্ভব। তাই সেখানে যাওয়াই স্থির হইল। কারণ মহাজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া পড়িলে লোক অজর অমর হইয়া সৃষ্টি ব্যর্থ করিয়া দিবে। বিশেষতঃ গৌরী স্ত্রীলোক, কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারেন। সেজন্য ক্ষীরোদ সাগরের টঙ্গী মহাজ্ঞান উপদেশের পক্ষে প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'গোরক্ষবিজয়ে' আছে—

'তুমি কেনেতর গোসাঞি আজি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥
দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
সত্বরে চলহে গৌরী ক্ষীরোদ সাগর॥
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গী মনোহর।
এ বলিয়া দুইজনে চলিলা সত্বর॥
মৎস রূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টঙ্গীর লামাতে রহে বোগালি সুন্দর॥'

মহাদেব গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশ দিবেন জানিতে পারিয়া মীননাথ মাছের রূপ ধরিয়া (অন্য মতে মাছের মধ্যে ঢুকিয়া) টঙ্গীর নীচে জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। দেবীকে মহাদেব মহাজ্ঞান শুনাইবেন জানিয়া আদিদেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মন্ত্রীর মন্ত্রণায় গৌরীর উপর নিদ্রার আবেশ দিলেন। ফলে দেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। মহাদেব মহাজ্ঞান বলিতে লাগিলেন—

'উড়্যা যায় পরমহংস নাহি যায় দুর।
উড়িয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুর॥
এড়িলে সে রহে গৌরী উজানে সে বহে।
মন পবন তারা পরিচয় নহে॥'

(নাথপন্থের দিশা—ডাঃ সুকুমার সেন সংগৃহীত, কল্যাণশ্রী, শারদীয়া সংখ্যা—১৩৫৫)

শিব মহাজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিলে দেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। দেবী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন বুঝিতে পারিলে মহাদেব মহাজ্ঞান-কথা তখনি বন্ধ করিয়া দিবেন। সেজন্য মীননাথ গৌরীর পক্ষে 'হুঁ' 'হুঁ' বলিয়া সায় দিতেছিলেন। মহাজ্ঞান বলা শেষ হইতেই দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন 'কই মহাজ্ঞাম বলিলেন না তো?'

'চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিলা বচন।
কিছু না শুনিমু আমি নিদ্রার কারণ॥'

(গোরক্ষবিজয়)

মহাদেব—

'দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে।
কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোণে॥
বিমর্ষিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান।
টঙ্গীর লামাতে দেখে মীন পরিমাণ॥
চিন্তিয়া জানিল এই শুনিল বচন।
শাপ দিলা এক কালে হোক বিস্মরণ॥'

(গোরক্ষবিজয়)

দিন আসিল। মীননাথ মহাজ্ঞান হারাইয়া নারীরাজ্যের রাজা হইলেন। জপতপ দূরে গেল, মীননাথ ভোগসুখে মাতিয়া উঠিলেন—

'ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপ কদলীতে জাএ।
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ॥
সোলস কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারিপাশে মীনে করি মাঝ॥'

(গোরক্ষবিজয়)

'মীননাথ রাজ-সিংহাসনেতে বসিল।'

(ভক্তমাল)

সিদ্ধি হারাইয়া মীননাথ রাজসিংহাসনে বসিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু যোগিবেশে সেখানে যাওয়া যায় না। কারণ কদলী রাজ্যের লোকেরা যোগী দেখিলেই মারিয়া ফেলে। তাহাদের বিশ্বাস যোগীরা মীননাথকে ভুলাইয়া নারী মায়াজাল-মুক্ত করার চেষ্টা করিতেছিল। মীননাথের রাজ-সভায় নটীদের অবাধ অধিকার। তাই নর্তকী সাজিয়া গোরক্ষনাথ মীননাথের রাজসভায় হাজির হইলেন এবং দেখিলেন গুরুর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মহাজ্ঞান হারাইয়া তিনি যমপথযাত্রী। মুখে কিছু বলার উপায় ছিল না। তাই গোরক্ষনাথ মাদলের সাথে, মন্দিরার ঝঙ্কারে ও নূপুরের তালে প্রহেলিকার সঙ্কেতে গুরুকে তত্ত্বকথা শোনাইতে লাগিলেন—

'পুখরিতে পানি নাই পাড় কেন বুড়ে।
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল॥
জাগো যোগী কনক-রা বলিয়া গুরুদেব
মেহলৌ বুঠৌ।
খোজতাঁ খোজতাঁ সতগুরু পায়া সহজে
ভাবৈ নৈটুটৌ॥'

(নাথপন্থের দিশা)

এই ভাবে নর্তকীর বেশে নাচিয়া নাচিয়া গোরক্ষনাথ তত্ত্বকথা শুনাইতেছিলেন—

'নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটীতে না লাগে পদ আলগ উপর॥
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাগরীর রোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলী হেন বোলে॥
হাতের ধমাক নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগন মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চারে॥'

(গোরক্ষবিজয়)

মীননাথ নাচগানে একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। কিন্তু—

'মাদলের তাল শুনে ভোলে মীন রায়ে।
মাদলের রায়ে কেনে গুরু মোরে কহে॥
নাট করে নাটুয়া তাল বহে ছলে।
তোহ্মার মদিলে কোন গুরু গুরু বোলে॥
এক শিষ্য আছে মোর যতি গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই॥
দুই শিষ্য আছে মোর আমি জানি ভাল।
তুহ্মি কেনে গুরু হেন মোরে বল ছলে॥"

(গোরক্ষবিজয়)

গুরু মীননাথের সুমতি জন্মিল এবং তাঁহার চিত্ত নির্মল হইল—

'আরে গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুখেতে অনল জ্বালি দিনু॥
ধিক ধিক মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ॥'

(ভক্তমাল)

এ ভাবে মীননাথ নিজের শোচনীয় অধঃপতনের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

'আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবৎ কার্য যে কৈলি॥'

(ভক্তমাল)

গুরু মীননাথকে কদলীমায়ামুক্ত করিয়া

কদলী-রাজ্য ত্যাগকালে গোরক্ষনাথ শাপ দিলেন—

'মুখে খাও মুখে বর্হ্ মুখে জাও সঙ্গ।
গোর্খের শাপেতে উঠ হইয়া পতঙ্গ॥
বিক্ষে'র ফলমূল বসি কর পান।
এহি শাপ দিলো তোরে করি সমাধান॥
এ বলিয়া জতিনাথ হাতে দিল তুড়ি।
বাদুড় হইয়া সব কদলী গেল উড়ি॥'

(গোরক্ষবিজয়)

একদিন শিব গোরক্ষনাথকে বর দিয়াছিলেন—'তুমি তপস্বিনী পত্নী লাভ কর।' শিবের বাণী ব্যর্থ হইবার নয়। ফলে এক তপস্বিনী রাজকন্যা গোরক্ষনাথকে পতিত্বে বরণ করিলেন। রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া রাজকন্যা দেখিলেন তাঁহার স্বামী ছয় মাসের শিশুরূপে স্তন্যপান করিবার জন্য কাঁদিতেছেন—

'স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যায় বলে আচাভুয়া॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়।
শুনি কি বলিব মোর বাপে আর মায়॥'

(মীনচেতন)

লজ্জায় দুঃখে রাজকন্যা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ বলিলেন—আমার দোষ নাই। শিবঠাকুর তোমাকে ঠকাইয়াছেন। আমি তো পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি—

'স্ত্রী-পুরুষ নহি আম্মি নাহি বীর্যবল।
শুখুনা যে কাঠ মোর শরীর সকল॥
গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল।
শরীরেও রস নাহি কাঠ সমতুল॥'

(নাথপন্থের দিশা)

শেষে গুরু গোরক্ষনাথ রাজকন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন তুমি পুত্রসন্তান লাভ করিবে। রাজকন্যা পুত্র লাভ করিলে তাঁহার নাম কর্পটীনাথ রাখিয়া ও তাহার কানে মন্ত্র দিয়া গোরক্ষনাথ বিদায় হইলেন। গুরু গোরক্ষনাথের গৃহবাসের এইখানেই পর্যবসান।

তোমার বাঁশী আমায় ডাকে

শ্রী—

তোমার বাঁশী আমায় ডাকে
শুনেও নাহি বুঝি—
দেখেও আমি দেখতে না পাই
আকুল হয়ে খুঁজি।

সুরের রেশের দোলায় দুলে
হৃদয়-তন্ত্রী বাজে,
জানি তুমি আসবে প্রিয়
আমার জীবন মাঝে।

আর্য্য ও অনার্য্য

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য

'ঋ' ধাতুর সহিত 'ণ্যৎ' প্রত্যয় যুক্ত হইলে আর্য্যশব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতি। গত্যর্থক সকল ধাতুই জ্ঞানার্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দের মুখ্য বা অভিধালভ্য অর্থ হইতে জানা যাইতেছে, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারাই আর্য্য, আর আর্য্যেতর ব্যক্তিগণই অনার্য্য। ইহাই হইতেছে আর্য্য ও অনার্য্য শব্দের প্রাথমিক অর্থ।

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত 'অর্' ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বলিতে চান। তাঁহাদের মতে অর্ ধাতুর অর্থ কর্ষণ। কর্ষণ বা চাষবাসই যাঁহাদের জীবিকা তাঁহারা আর্য্য। এই মতে আর্য্যগণ কৃষক-সম্প্রদায়-ভুক্ত। সংস্কৃত ভাষায় অর্ ধাতুর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই হেতু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অনুকূলে সঙ্গত কোন কারণ নাই।

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। তাহাতেও আর্য্যশব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। (১৷৫১৷৮, ১৷১৩০৷৩, ১৷১৩০৷৮, ৮৷৫১৷৯ ইত্যাদি) আচার্য্য সায়ণ ঋগ্‌ভাষ্যে আর্য্যশব্দের অর্থ করিয়াছেন—যজ্ঞানুষ্ঠাতা এবং বিজ্ঞ।

বেদের পরেই সংস্কৃত সাহিত্যে মনুসংহিতার প্রামাণ্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। মনুতে অনেকবার আর্য্যশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ মনু আর্য্যবর্ত্তের সংজ্ঞা স্থির করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী যে ভূভাগ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারই নাম আর্য্যাবর্ত্ত। টীকাকার কুল্লূক ভট্ট বলেন, এই ভূখণ্ডে আর্য্যগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। টীকাকার নারায়ণ বলিয়াছেন, এই ভূদেশে আর্য্যগণ ভ্রমণ করেন, কিন্তু স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন না। মেধাতিথি বলেন, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও ম্লেচ্ছগণ এখানে তিষ্ঠিতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্তের কথা বলিতে গিয়া কোন টীকাকারই আর্য্য-শব্দের অর্থ প্রকাশ করেন নাই। টীকাকার পণ্ডিতগণের মৌনভাব হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, আর্য্য শব্দটি তখনই যজ্ঞানুষ্ঠাতা, জ্ঞানী প্রভৃতি অর্থে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তখন কাহারও কোন সন্দেহই নাই।

আচারনিষ্ঠ অর্থে আর্য্য শব্দ এবং অসদাচার অর্থে অনার্য্য শব্দের প্রয়োগও মনুসংহিতাতেই একাধিকবার করা হইয়াছে (মনু ১০৷৫৭-৫৮)।

সাধু, মান্য, পূজ্য প্রভৃতি অর্থে আর্য্যশব্দের প্রয়োগও মনুতেই পাওয়া যায় (২৷২০১, ৭৷২১১)। 'ব্রাহ্মণ'-অর্থে আর্য্যশব্দ এবং শূদ্র-অর্থে অনার্য্যশব্দের প্রয়োগও দেখিতে পাই। (মনু ১০৷৬৬, ৬৭, ৭৩)। মনু ব্যতীত অন্য কোথাও এই অর্থে প্রয়োগ আছে কিনা বলিতে পারি না। সভ্য, পণ্ডিত, মান্য, পূজ্য প্রভৃতি অর্থে রামায়ণেও আর্য্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (রামায়ণ ৩৷১৮৷৯-১০)

মহাভারতে আর্য্যশব্দের প্রয়োগ অসংখ্য।

যাঁহারা বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত সাধু আচারের অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে—আর্য্য, আর যাঁহারা তাহা করেন নাই বা বিপরীত আচরণ করিয়াছেন তাঁহারাই অনার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। (সভা ৬৭।৩৭, ৫০; ঐ ৫৪।৬; বন ২৬০।১; শান্তি ৯৪।১০; ঐ ৯৩।১৬)

পরবর্ত্তী সাহিত্যে মান্য, পূজ্য প্রভৃতি অর্থেই আর্য্যশব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 'আর্য্যা অরুন্ধতী', 'আর্য্য হনুমান্', 'আর্য্যপুত্র' প্রভৃতি প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষার কাব্য-নাটকাদিতে প্রচুর ভাবেই রহিয়াছে।

সাবর্ণ মনুর দশ জন পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'আর্য্য'। হরিবংশে এই কথা উল্লিখিত আছে।

প্রাচীন-কালের বঙ্গসাহিত্যেও মান্য, সাধু ও শ্রেষ্ঠ অর্থেই আর্য্যশব্দটিকে প্রয়োগ করা হইত। 'তেঁহো জগতের আর্য্য', 'আর্য্য সরল তুমি' এই প্রয়োগগুলি চৈতন্যচরিতামৃতের। কবিরাজ গোস্বামী মান্য বা শ্রেষ্ঠ অর্থেই এই প্রয়োগ করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যে আর্য্যশব্দের প্রাচীন অর্থটি অক্ষুণ্ণ রহে নাই। ইংরেজী 'এরিয়ান্' ও 'নন্-এরিয়ান্' শব্দের অনুবাদরূপে 'আজকাল আর্য্য ও অনার্য্য শব্দের প্রয়োগ করা হইতেছে। সুপ্রাচীন কালে আর্য্যদের বাসভূমি কোথায় ছিল, কোথা হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন, অনার্য্যদের সহিত আর্য্যেরা কিরূপ ব্যবহার করিতেন—এই সকল ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রাগুক্ত ইংরেজী শব্দদ্বয়ের তর্জ্জমারূপেই আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ প্রয়োগ করা হইতেছে। কিন্তু আর্য্য শব্দের পুরান অর্থগুলিই যেন ম্লান বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—মানবের চরিত্রের সহিত আর্য্যশব্দের বিশেষ যোগ আছে। এই সহজ সুন্দর উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। তেজস্বিনী কুন্তী দেবীর মুখ হইতে মহামতি বিদুরের প্রশস্তিরূপে এই বাণীটি প্রকাশিত হইয়াছে—ধন বা বিদ্যার দ্বারা মানুষ আর্য্য হইতে পারে না। সাধু চরিত্রের বলেই আর্য্যতা লাভ করা যায়—

"বৃত্তেন হি ভবত্যার্য্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া।"

(উদ্যোগ ৯০।৫৩)

সমালোচনা

ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধিঃ, শ্রাদ্ধপ্রদীপ (১ম খণ্ড), প্রশস্তিবন্দনম্—শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি বেদাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত; পোঃ রাজনগর, গ্রাম ডলা, জেলা শ্রীহট্ট বেদবিদ্যালয় হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য যথাক্রমে ৸০, ॥০ এবং ১৲; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৩৬, ৭১, ৫৪।

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তি আমাদের জাতীয় জীবনকে সর্বক্ষেত্রে নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুক ইহাই প্রত্যেক স্বদেশপ্রাণ ভারতবাসীর প্রাণের আকুতি। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবময় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জাতিগঠনে বিশেষ কার্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। সদাচারভূয়িষ্ঠ ভারতীয় জীবনাদর্শ মানবজীবনকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের অধিকারী করিয়া মহিমান্বিত

করিবে। আলোচ্যমান পুস্তকত্রয় এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। সম্পাদক-মহাশয় স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বাধ্যায়বান্, বেদবিদ্যানিষ্ণাত। প্রথম পুস্তকে ত্রিবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের সটীক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যাতে মন্ত্রের গূঢ়ার্থ সুব্যক্ত। সম্পাদক বহু শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থের সম্যগালোচনাক্রমে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পুস্তকে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তৃতীয় পুস্তকে বেদের প্রশস্তিবন্দন মন্ত্র সটীক ও সানুবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। পুস্তক তিনখানি আচারবান্ জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রের নিকট সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাদের বহুল প্রচারে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে মনে করি।

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্-এ

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং বাংলা বাজার, ঢাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৮, মূল্য ৪৷৷৹ টাকা।

এই গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চারিটী রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—(১) ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ, (২) গীতার শ্রীকৃষ্ণ, (৩) পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ, (৪) বৈষ্ণব শাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণ। গ্রন্থকার নিজ প্রতিপাদ্য বিষয় নানা শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করিয়া এবং কথোপকথনচ্ছলে যথাসম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি চিন্তাশীল ব্যক্তি ও ভক্তগণের নিকট আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। ইহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উত্তম, কিন্তু পুস্তকে অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ বি-এ সম্পাদিত; ৫ম সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও বাংলা বাজার, ঢাকা। পৃষ্ঠা—৬৭২; মূল্য ৪।৹ টাকা।

বঙ্গাক্ষরে মূল বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দ্বারা ভাষা-মুখে অন্বয়, অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দগুলির ব্যাখ্যা এবং মতভেদস্থলে যথাসম্ভব উহাদের উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সুগম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে আপাতবিরুদ্ধ ভাবগুলির সামঞ্জস্যের চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। গ্রন্থকার নানা স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভিন্ন ভিন্ন আচার্যগণের উক্তি উল্লেখ করিয়া সংশয়-নিরসনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ের শেষে উহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভূমিকায় প্রদত্ত সুচিন্তিত আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা বুদ্ধিজীবিগণের বিচারসৌকর্য সাধন করিবে।

মোটের উপর, এই গ্রন্থখানি অল্পসংস্কৃতজ্ঞ অথচ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের পক্ষে যে বেশ উপাদেয় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানির মুদ্রণে যথোপযুক্ত যত্নের পরিচয় পাইলাম না। ইহাতে বহু মুদ্রাকর-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

Towards Self-Realisation—By Som Nath Trikha. Published by the author, Principal, Vocational Training Centre, Arab-ki-Sari, Nizam-ud-Din, New Delhi.

অধ্যাত্ম-বিদ্যার দার্শনিক আলোচনা প্রাচ্য-দেশে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া তৎসমুদয়ের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্যমান গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রধানতঃ সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনেরই আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোনও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বা সিদ্ধান্তের আভাস

পাওয়া গেল না। পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্থানে স্থানে অধুনাতন প্রচলিত ব্যবহারিক উদাহরণ দ্বারা কোন কোন দার্শনিক সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। মোটের উপর এই গ্রন্থে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে নূতন ধরনে চিন্তা করিবার কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যাইবে।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

বাংলা বর্ষলিপি (১৩৫৬)—সম্পাদক শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী, বি-এ, সংস্কৃতি-বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস্, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। ৪১২ পৃষ্ঠা; মূল্য দুই টাকা।

এই বর্ষলিপিতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলার আদমসুমারী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, খেলাধূলা, জনস্বাস্থ্য, আবহাওয়া, ছায়াচিত্র, দেশশাসন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অতিশয় যত্ন, অনুসন্ধিৎসা ও যাথার্থ্যের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, ব্যবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ—সকলের হাতের কাছেই এইরূপ একখানি তথ্যপূর্ণ নির্ভরযোগ্য পুস্তক থাকা উচিত। আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ-জ্ঞানার্থী সর্বশ্রেণীর লোকের নিকটই এই বর্ষলিপিখানি 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'র কাজ করিবে এবং জ্ঞানের পরিসরবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। পুস্তকখানির সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রচ্ছদপট, বিষয়-বস্তুগুলির বিন্যাস প্রভৃতি সুরুচি ও প্রযত্নের পরিচয় দিতেছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ৩০নং কানাই ধর লেন (নিত্যানন্দ-ভবন), কলিকাতা হইতে শ্রীজীবনরঞ্জন রায় চৌধুরী ও শ্রীদিবাকর রায় কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৫ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তিকায় গ্রন্থকার যুগপ্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানবজীবনের ধারা, ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাব, নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানে গমন, সেবাব্রত ও সন্ন্যাসগ্রহণ, প্রব্রজ্যা, আমেরিকায় হিন্দুধর্ম-প্রচার, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি মর্মস্পর্শী বাণী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই লোকোত্তর মহাপুরুষের জীবনবেদ-আলোচনায় গ্রন্থকার যথেষ্ট ভাবগ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত হইতে উদ্ভূত দেশের বর্তমান সংকটে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী জীবনপথে সকলকে সুস্পষ্ট ও অব্যর্থ সন্ধান দিবে।

মুদ্রণকার্যে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলি সংশোধিত হইবে। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ উপদেশামৃত—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ ও সিদ্ধানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—দক্ষিণ বাংলা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর, ২৪ পরগণা। ২০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৲ টাকা।

সারস্বত-মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ইহা বিংশতিতম গ্রন্থ। স্বামী নিগমানন্দজী সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভক্তবৃন্দকে যেসব উপদেশ দিয়াছেন ঐগুলিরই কতক এই পুস্তকাকারে সংকলিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐকারণেই স্থানে স্থানে বৈসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। স্বামী নিগমানন্দজী বাংলা দেশে পরিচিত; তাঁহার উপদেশে অভিনবত্ব ও সাবলীল ভাব বিদ্যমান। পুস্তকখানি সাধকগণের অধ্যাত্মপথের সহায়ক হইবে। "শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ" কথাটী বেশ নূতন ও প্রীতিপ্রদ। পুস্তকখানি সাধারণ্যে আদর পাইবার যোগ্য।

স্বামী যুক্তাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী বিবিদিষানন্দজী ও স্বামী প্রভবানন্দজী—আমেরিকার সিয়াটল (ওয়াশিংটন) বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দজী এবং আমেরিকার হলিউড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী সুদীর্ঘকাল কৃতিত্ব-সহকারে বেদান্ত প্রচার করিয়া যথাক্রমে গত ১৯শে ও ২২শে অক্টোবর ভারতে আগমন করিয়াছেন। উভয়েই কয়েক মাস ভারতে অবস্থান করিয়া আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা—গত ২১শে সেপ্টেম্বর এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ভগিনী নিবেদিতার স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করে। পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পূত আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বৎসর বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে ৮০০ শত ছাত্রী ইহাতে শিক্ষালাভ করে। ১৯৪৯ সনের জানুয়ারী মাস হইতে বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

'নিবেদিতা দিবস' উপলক্ষে ছাত্রীবৃন্দ ভগিনীর সুবৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যভূষিত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে স্বরচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধাদি পাঠ করে। শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বসু, এম-এ, বি-টি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছাত্রীদিগকে উৎসাহ দেন।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব্ সার্ভিস্—(১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী)—এই জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির বহুধাবিস্তৃত সেবাকার্য অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে পরিচালিত হইতেছে। অন্তর্বিভাগে একটি হাসপাতাল আছে। আলোচ্যমান বর্ষে ইহাতে ২২৬৯ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়। দৈনিক গড়ে ৮৪·৬ জন রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসিত হন। ইহাতে এই বৎসর ২১৯ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। শারীরিক সামর্থ্যহীন নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের জন্য সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে একটি আশ্রয়াবাস পরিচালিত হইতেছে। যদিও এই আবাসে ২৫ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া সম্ভবপর, তথাপি অর্থাভাববশতঃ আলোচ্যমান বর্ষে মাত্র তিনজনকে স্থায়িভাবে এখানে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। দুঃস্থা নারীদের জন্যও একটি আশ্রয়াবাস আছে। এই বৎসর ইহাতে ১৩ জন দুঃস্থা নারীকে স্থান দেওয়া হয়। অর্থাভাববশতঃ অনেক প্রার্থিনীকে আশ্রয়দান সম্ভব হয় নাই। এতদ্‌ভিন্ন সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগের চন্দ্রী বিবি ধর্মশালা তহবিলের অর্থে এই বৎসর ৪৬৭ জন নরনারীকে খাদ্য ও অন্যান্য সাহায্য দান করা হইয়াছে।

সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে দুইটি ঔষধালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্যমান বর্ষে এই ঔষধালয়দ্বয়ে ১,০৪,৩৩২ জন নূতন রোগী ও ২,৩৫,৮২৯ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শিবালয় ঔষধালয়ে চিকিৎসিত নূতন রোগীর সংখ্যা ৪৩,৭৮৭ এবং পুরাতন রোগীর সংখ্যা ৬৪,৪৩৫। এই বৎসর

উভয় ঔষধালয়ে আগত রোগীর সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৯৩৪·৫ জন। এই বৎসর এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে ১৮৪৪ জন রোগীকে অস্ত্রোপচার করা হয়। দরিদ্র পুরুষ ও অসহায় নারীদিগকে আর্থিক সাহায্য দান বহির্বিভাগের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্যমান বর্ষে ৮৯ জন দুঃস্থ নরনারীর সাহায্যকল্পে ১৫৫৩৸৶০ ব্যয়িত হয়। তাঁহাদের মধ্যে কম্বল, বস্ত্র এবং ২॥৭ মণ পরিমিত চাল, ডাল এবং আটা বিতরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্রদিগকে পুস্তকদান, বিপন্ন যাত্রিগণকে খাদ্যদান প্রভৃতি সাময়িক সেবাকার্যও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকার ১২৮ জনকে ৩৯৩৶০ আনা সাহায্য করা হইয়াছে।

সেবাশ্রমের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। সেবাশ্রম হাসপাতালে অধিকাংশ বেডের জন্যই স্থায়ী ফণ্ডের ব্যবস্থা নাই। প্রতি বেডের জন্য অস্ত্রোপচার বিভাগে ৬০০০৲ টাকা, সাধারণ বিভাগে ৫০০০৲ এবং দুঃস্থাবাসে (Invalid Home) ৪৫০০৲ টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় ব্যক্তিগণ আপনাদের স্বর্গত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতিকল্পে উক্ত বিভিন্ন বিভাগে বেডের ব্যবস্থা করিতে পারেন। শয্যাদ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনও নিত্যই অনুভূত হইতেছে। বহির্বিভাগের ঔষধালয়ের একটি পৃথক্ ব্লক নির্মাণে ৬০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। স্ত্রী ও পুরুষ রোগীদের পৃথক্‌ভাবে অস্ত্রোপচারের জন্য একটি Septic Surgical Ward নির্মাণের জন্য ৯৫,০০০৲ টাকার দরকার। রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রের (X-Ray Plant) প্রয়োজন বহুকাল হইতে অনুভূত হইতেছে। ইহার জন্য ৪০,০০০৲ টাকার আবশ্যক। সেবাশ্রমের সাধারণ তহবিলেও যথেষ্ট অর্থের দরকার। আলোচ্যমান বর্ষে সেবাশ্রমের মোট আয় ১,০১,৮৫৭॥৶২ এবং মোট ব্যয় ১,১৯,৫১৭৸৶৯।

শিলচর (কাছাড়) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—১৯৪৪-৪৭ সনের কার্যবিবরণী —আলোচ্যমান বর্ষগুলিতে ধর্ম, শিক্ষা ও সেবা বিভাগত্রয়ে সেবাশ্রমের কার্যাবলী পরিচালিত হইয়াছে। উপনিষৎ, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা ধর্মপ্রচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভা আহূত হয়। তাহাতে বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শের আলোচনা করেন। ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী ও নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত। আলোচ্যমান বর্ষচতুষ্টয়ে সেবাশ্রমের ছাত্রাবাসে প্রতি বৎসর গড়ে ১২ জন ছাত্রকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণের বয়ন শিক্ষার্থ তিনটি তাঁত চলিতেছে। বাগানের কাজ এবং কৃষিকার্যেও ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়। সেবাশ্রমের লাইব্রেরীতে ১০৪৫ খানা পুস্তক আছে। আলোচ্যমান বর্ষচতুষ্টয়ে লাইব্রেরী-সংলগ্ন পাঠাগারে ৫টি সাময়িক পত্র এবং ৪টি সংবাদপত্র ছিল। এই চার বৎসরে লাইব্রেরীতে ৭৪৭ খানা পুস্তক পঠিত হইয়াছে। সেবাশ্রম কর্তৃক তিনটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছিল। উহাদের মধ্যে একটি অর্থাভাব বশতঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয় সেবাশ্রমপ্রাঙ্গণে অবস্থিত। ইহাতে বালক ও বালিকাদের পৃথক্ বিভাগ আছে। এই বিদ্যালয়ে এই কয় বৎসর গড়ে ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। কৃষ্ণপুর নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার গড় ছিল ২৩·৫। সেবাশ্রম ১৯৪৩ সনে দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারায়ণের সেবায় সবিশেষ আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই সেবাকার্যে ৭১৫১।০ টাকা ব্যয়িত হয়। আশ্রম-

পরিচালিত ১৯৪৬ সনের বন্যা-সেবাকার্যও উল্লেখযোগ্য। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ঔষধবিতরণ, পুষ্করিণী-সংস্কার প্রভৃতি কার্যও সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে।

ঘনঘন বন্যার প্রাদুর্ভাবহেতু সেবাশ্রমকে বন্যান্তর (flood level) হইতে উন্নীত করা প্রয়োজন। তজ্জন্য সেবাশ্রম একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা কার্যে পরিণত করিতে ৩০০০০৲ টাকার প্রয়োজন। সেবাশ্রম লাই-ব্রেরীরও উন্নতিবিধান বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। আমরা সহৃদয় দেশবাসিগণকে এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাকার্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। ১৯৪৪, ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সনে সেবাশ্রমের মোট আয় যথাক্রমে ৮৪৭৯॥/৯, ৬৪৪৬॥/৯ এবং ১৭৭২৩।৬ এবং ব্যয় যথাক্রমে ৮২৭৬।০, ৬৪২২৸৩ এবং ১৭৬১৬৵৯। ১৯৪৭ সনের মোট আয় ৭০৭০৸৶৬ এবং ব্যয় ৭২০৫।৯।

পরলোকে মিস্ জোসেফিন্ ম্যাক্‌লাউড্

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান পাশ্চাত্য শিষ্যা মিস্ জোসেফিন্ ম্যাক্‌লাউড্ গত ১৪ই অক্টোবর আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেস শহরে পরলোক গমন করিয়াছেন। অনেকের নিকট তিনি 'টান্টিন' বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজে ১৮৯৫ সনে স্বামিজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সময় হইতে নিজের বয়স গণনা করিতেন। তিনি নিউ ইয়র্কের এক বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত ছিলেন। স্বামিজীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তিনি তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পরম ভক্ত হইয়া পড়েন। স্বামিজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অবর্ণনীয় ছিল। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত আবেগ-ভরে স্বামিজীর কথা আলোচনা করিতেন। তাঁহার সমগ্র সত্তা স্বামিজীময় ছিল! তাঁহার কথায় কি অভাবনীয় ওজস্বিতা প্রকাশ পাইত! স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যন্তরে কিরূপ অসামান্য তেজস্বিতা ছিল, তাহা এই মহীয়সী নারীর সঙ্গে সাধারণ ভাবে আলাপ করিলেও কতকটা বুঝা যাইত।

স্বামিজীও তাঁহার এই শিষ্যা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। স্বামিজী মিস্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে 'জো' নামে সম্বোধন করিতেন। একবার তিনি এই মহাপ্রাণা মহিলা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি রত্নস্বরূপা, ইঁহার অন্তর সদাই দয়ায় বিগলিত।" অন্য এক প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী লিখিয়াছিলেন—"ইনি রাষ্ট্রনায়ক-তুল্য—ইনি রাজ্যশাসন করিতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ় অথচ সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখিয়াছি।"

সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশে প্রচারকার্য পরি-চালনে তিনি স্বামিজীর প্রধান সহায় ছিলেন। ভারতবর্ষেও স্বামিজীর কার্যে তিনি কম সাহায্য করেন নাই। তিনি যখন স্বামী বিবেকানন্দের

ভাবে প্রভাবান্বিত হন, তখন স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামিজী, এখন আমি কি করব?" ভারতগতপ্রাণ স্বদেশ-প্রেমিক স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ভারতবর্ষকে ভালবাসা।" সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবন ভারতবর্ষের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইল। মিস্ ম্যাক্‌লাউড্ যখন সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন স্বামিজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "যদি ভারতবর্ষের প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে তবেই এসো, নচেৎ নয়। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনা আর সহ্য করিতে পারি না।" মিস্ ম্যাক্‌লাউড্ ভারতবর্ষে আসিলেন।

তিনি কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যেই সাহায্য করেন নাই, ভারতের হিতার্থে যে কেহ তাঁহার সাহায্য চাহিয়াছেন তাঁহাকে তিনি সব সময়েই আনন্দে অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন। কখন কখন তিনি ভারতবর্ষের সেবার জন্য স্বীয় সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

মিস্ ম্যাক্‌লাউড্ পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার আমেরিকা, ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার মহান্ গুরুর আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক স্বদেশ ছিল ভারতবর্ষ। তিনি বহুবার ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার প্রিয় বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই বিদুষী মহিলা নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সব সময়ই ভারতে আসিবার জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা ছিল। হায়! নিয়তির বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত হইল!

যে কেহ 'টান্টিন'-এর সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের কথা ভুলিতে পারিবেন না। নিস্তেজ, ভগ্নোৎসাহ প্রাণেও তিনি বল ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন ভারতগতপ্রাণা, সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের অত্যুৎসাহী ঐকান্তিকনিষ্ঠাসম্পন্না বন্ধু ও শিষ্যা।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

বিবিধ সংবাদ

নোবেল শান্তি পুরস্কার—রাষ্ট্র-সঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল লর্ড বয়েড ওরকে এ বৎসরের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। লর্ড বয়েড ওরের বয়স বর্তমানে ৬৯ বৎসর। এ বৎসর এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১০ হাজার পাউণ্ড।

লর্ড বয়েড ওর স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার গৃহে বলেন, "আমার ধারণা, সমস্ত গভর্নমেণ্টের নিকট বিশ্ব-খাদ্য-পরিকল্পনার যে প্রস্তাব আমি করি, সেই সম্পর্কেই আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কার্য চালাইলে গভর্নমেণ্টসমূহ খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করিবার বাস্তব একটি পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিবার সুযোগ পাইবেন। আর

উহা অনশন ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনসাধারণের অসন্তোষও দূর করিয়া তাহাদের মনে সান্ত্বনা দিবে। পরিকল্পনাটির পরীক্ষা একরূপ হইয়াছেই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহা সমর্থন করে। ফ্রান্সও উহার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছে। ভারতও উহা কার্যে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই উহা চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবেই। উহা বিশ্বকে প্রাচুর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলার কার্যে বিশ্ববাসীর সহযোগিতার প্রথম ধাপ। বিশ্বে প্রাচুর্য আনয়ন ও বিশ্বকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলাই বিশ্বশান্তির একমাত্র ভিত্তি।"

প্রাচীন ভারতে মুদ্রাপ্রস্তুতির ছাঁচ আবিষ্কার—বিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ পরলোকগত ডাঃ বীরবল সাহানী ১৯৩৬ সনে রোটকের নিকট অবস্থিত খোক্‌রাকোট নামক স্থানে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার যে সকল ছাঁচ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলি এখন নয়াদিল্লীস্থ জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হইবে। ঐ ছাঁচ বর্তমানে ডাঃ সাহানীর পত্নীর নিকটে আছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীমতী সাহানী ঐগুলি তাঁহাকে উপহার দিবেন।

এই সকল ছাঁচের উপর ভিত্তি করিয়া ডাঃ সাহানী প্রাচীন ভারতের মুদ্রাপ্রস্তুতি-কৌশল সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। যে স্থানে ঐগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানটি ছিল পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্গত বহুধান্যকের যৌদ্ধেয়দিগের মুদ্রা-প্রস্তুতি কেন্দ্র। ডাঃ সাহানী প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের ফসিলের সন্ধানে বাহির হইয়া ঐগুলি আবিষ্কার করেন। কতকগুলি ছাঁচে এখনও মুদ্রা আটকাইয়া আছে। ঐগুলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় হইতে প্রথম শতকের। ইহাতে প্রাচীন ভারতে মুদ্রা-প্রস্তুতির উন্নত কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় যুগের গোড়ার দিকে রোমকগণ এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়।

সংস্কৃত ভারতের গৌরব—কলিকাতা গবর্নমেণ্ট হাউসে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের উদ্যোগে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও সংস্কৃতানুরাগিবৃন্দের এক মহতী সভা হইয়াছে। এই সভায় বঙ্গদেশের প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ কাটজু মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীর খ্যাতনাম্নী সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্তা ক্ষমা রাও মহাশয়া প্রধানাতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীকান্ত তর্কবেদতীর্থ ও পণ্ডিত শ্রীসূর্যকান্ত ঝা সামবেদ গান করেন। উদ্বোধনবক্তৃতা প্রদান করেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রধানাতিথির পরিচয়-প্রদানকালে ডক্টর চৌধুরী বলেন, ভারতের নারীগণ যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী এবং উচ্চদরের কবি হইতে পারেন, আমাদের অতীত ইতিহাসে ইহার বহু জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। শ্রীমতী ক্ষমা রাওয়ের লেখনী হইতে ভারতীয় নারীর এই অপূর্ব প্রতিভা-বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। সংস্কৃতই ভারতীয় সভ্যতার দর্পণ-স্বরূপ। এই দর্পণের সাহায্যে আমরা আমাদের নিজস্ব-স্বরূপ দেখিতে পাই। বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতের জন্যই ভারতের সম্মান। বাঙ্গালীরা চিরকাল সংস্কৃতশিক্ষায় অগ্রণী এবং এই যুগে বাঙ্গালীদেরই এই বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। নিখিল ভারতীয় সংস্কৃত-শিক্ষা আন্দোলন অপেক্ষা করিতে পারে না; বঙ্গদেশীয় ছয়শতাধিক পণ্ডিতের উক্ত সভায় উপস্থিতিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে আর একদিনের জন্যও অপেক্ষা করিতে পারে না। সর্ব-ভারতের সঙ্গে এই

বিষয়ে সংযোগরক্ষার দিক হইতে সভাপতি ও প্রধানাতিথির সান্নিধ্য আনন্দের কারণ, সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের প্রদেশপাল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, সংস্কৃতই ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু। সংস্কৃত ভারতীয় সর্ব-ভাষার জননী বা পিতামহী। ভারতের বাহিরে সকলেই সংস্কৃতের সম্মান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয়গণ সংস্কৃতের প্রতি তাদৃশ মর্যাদা প্রদর্শন করেন না। তিনি আরও বলেন যে, যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকিত, তিনি সমগ্র ভারতের সমস্ত স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া দিতেন। সংস্কৃত ব্যতীত নিখিল ভারতীয় সংযোগ সংরক্ষণের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

প্রধানাতিথি শ্রীমতী ক্ষমা রাও বলেন যে, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত ভাষা একমাত্র সংস্কৃত, আর দ্বিতীয় কোনও ভাষা নাই। নিদ্রিত ভারত সংস্কৃতের মূল্য বুঝে নাই; স্বাধীন ভারতে এ বিষয়ে জনসাধারণ অচেতন থাকিলে চলিবে না। সমগ্র ভারতে সংস্কৃতের শিক্ষা-দীক্ষা-বৃদ্ধির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অচিরেই করিতে হইবে।

এই সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ও বক্তৃতা করেন। ইহাতে পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

পরলোকে শ্রীযুক্ত জে সি দাশ—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত জে সি দাশ (শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাশ) গত ১১ই অক্টোবর ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক বিশিষ্ট পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। স্বীয় প্রতিভা বলে জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিওরেন্স ও হিসাবপরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীযুক্ত দাশ স্বদেশে শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনে অগ্রণী হন। ব্যাঙ্কিং ও ব্যবসায়-জগতে তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি ক্রীড়ামোদী, ভক্ত ও দাতা ছিলেন। গত ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদিগের সেবার জন্য তিনি অনেকগুলি 'ক্যান্টিন' পরিচালনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন, বিবেকানন্দ সোসাইটি, শিশুমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান, ইণ্ডো-আমেরিকান এসোসিয়েশন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটি ও রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষরূপে তিনি অনেক কাজ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দাশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক।

শুদ্ধিপত্র—গত কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "সাবানের অনুকল্প" প্রবন্ধের লেখকের উপাধি "বি-এস্‌সি" স্থলে "বি-এস্‌সি, ডিপ্‌-সোপ-টেক্ (কলিঃ)" হইবে।

নাইট্‌ সম্প্রদায়

সম্পাদক

মধ্যযুগের প্রারম্ভে ইউরোপের খৃষ্টপন্থী পেশাদারী যোদ্ধগণ ধর্মভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া নাইট্‌ সম্প্রদায় গঠন করেন। নাইটগণের জীবনযাত্রা-পরিচালনের জন্য অনেক রীতি-নীতি প্রবর্তিত হয়। প্রতীচ্যের সেই অন্ধকারময় যুগে নাইট সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী উন্নত ধরনের ছিল। নাইট-মাত্রকেই এইগুলি যথাযথ ভাবে পালন করিতে হইত। কোন নাইট কোন নিয়মের অন্যথা করিলে সম্প্রদায়ের পরিচালকগণ তাঁহাকে দণ্ড প্রদান করিতেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এই রীতি-নীতিগুলি বিভিন্ন প্রকার ছিল। তবে সকল নাইটকেই যোদ্ধার কর্তব্যপালন এবং নানাভাবে জন-সাধারণের সেবা করিতে হইত। নাইটগণ খৃষ্টধর্মে অত্যন্ত অনুরাগী, সাহসী, সত্যনিষ্ঠ এবং পরার্থপর ছিলেন। আর্ত নরনারীর সেবার জন্য আবশ্যক হইলে তাঁহারা আপনাদের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজনির্দেশে যুদ্ধে যোগদান, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণ এবং দুঃস্থ নরনারীর সেবা তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। তৎকালীন প্রথানুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে অপ্রিয় কার্য করিলেও ত্যাগ স্বীকার করিয়া সকলের সেবা করিতেন। রাজার আদেশে আবশ্যক হইলেই তাঁহারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন—এই সর্তে রাজ-সরকার হইতে ভরণপোষণের জন্য তাঁহাদিগকে নিষ্কর জায়গীর দেওয়া হইত। ইহাই 'সৈন্যগণকে জায়গীর দান প্রণালী' (Feudal System) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নাইটগণ জায়গীরের উপস্বত্ব হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ জনসেবায় ব্যয় করিতেন। তাঁহাদের পরার্থপর কার্যাবলীর ফলেই মধ্যযুগে জনসেবা লোক-সমাজে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হয়। সেবার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের জন্য এই সময়ে ইউরোপে বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্যরূপে কার্য করা সম্মানজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

এই সম্প্রদায়ের নিয়মানুসারে প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, তিনি যিশুখৃষ্ট ও রাজার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন, আপন সুখ-সুবিধা তুচ্ছ করিয়া অপরের সুখ-সুবিধা বিধান করিবেন, কাহারও সহিত দুর্বিনীত ব্যবহার করিবেন না, দীন-দুঃখী ও নির্যাতিত জনগণকে সর্বপ্রযত্নে সেবা করিবেন। নাইটগণ এই সকল মহান্‌ আদর্শে যথার্থই অনুপ্রাণিত

ছিলেন। এইজন্য দেশের জনসাধারণ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিত। মুসলমানগণ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান তীর্থ জেরুজালেম ও বেথ্লেহেম প্রভৃতি দখল করিয়া তাহাদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে খৃষ্টানগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (Crusade) ঘোষণা করিয়া ঐ তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিতে চেষ্টা করে। এই ধর্মযুদ্ধে নাইটগণ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। কোন নাইট কোন মুসলমানকে দেখিলেই হত্যা করিতে চেষ্টা করিতেন। মুসলমানদের প্রতি নাইটদের মনোভাব অত্যন্ত গর্হিত হইলেও তাঁহাদের পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা কয়টি খৃষ্ট-প্রচারিত ধর্ম ও নীতিসম্মত ছিল। এই প্রতিজ্ঞাগুলিকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেক নিয়মানুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন বীরগণের বীরত্ব ও শৌর্যবীর্য অর্জন তাঁহাদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাঁহারা আহার-বিহারে সংযত ছিলেন। তাঁহাদের বীরত্ব, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা আদর্শস্থানীয় ছিল।

এই সকল কারণে নাইট্গণ মধ্যযুগে ইউরোপে সভ্যতার অগ্রদূত ছিলেন। 'নাইট' বলিতে তখন শিষ্টাচারী বা ভদ্র বুঝাইত। সমাজ-গঠন হইতে আরম্ভ করিয়া দৈনন্দিন ব্যাপারে জনসাধারণ তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিত। কি ভাবে কাপড় পরিতে হইবে, কি প্রকারে খাইতে হইবে, কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কেমন করিয়া নৃত্য ও সংগীত করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে এই যুগে নাইটগণই সকলের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

নাইটগণের প্রবর্তিত আচার-নিয়ম জনসমাজে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলেই ইউরোপের অধিবাসিগণ অন্ধকারময় যুগ অতিক্রম করিয়া মধ্যযুগে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিল। অন্ধকারময় যুগে প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ প্রায় আদিম অসভ্য মানবের স্তরে ছিল। ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা সূর্যোদয়-কালে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনের যে প্রতিজ্ঞা করিত, সূর্যাস্ত সময়ে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধের বন্দিগণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিত। এই সকল কারণে অন্ধকারময় যুগের বর্বর নরনারীগণকে মধ্যযুগে উন্নীত করিতে নাইট-গণকে বহু বৎসর যাবৎ অক্লান্ত ভাবে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘকালের অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটাইয়া প্রতীচ্যকে মধ্যযুগে আনয়ন করিতে নাইট সম্প্রদায়ের অবদান ছিল অপরিসীম।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এইরূপ মহৎ কার্য সাধন করা সত্ত্বেও কালচক্রের আবর্তে নাইট্ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। দেখা যায়, কোন যুগে কোন সংঘ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেও পরবর্তী কালে সেই সংঘ যদি দেশের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহার আর উপযোগিতা থাকে না এবং উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নাইট্ সম্প্রদায়ও এই কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের খৃষ্টপন্থী অধি-বাসিগণ প্রাচ্য দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ধর্মযুদ্ধ' করিতে যাইয়া অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাসমূহ কার্যে পরিণত করিবার ফলে প্রতীচ্যের সভ্যতা নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-প্রণালী নূতন আকার ধারণ করে। ইউরোপের বহু পল্লী শহরে পরিণত হয়। শহরের কল্যাণে দেশের বহু লোক ধনবান ও নানা বিষয়ে শিক্ষিত হন। ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যপদেশে

বিদেশে গমন করায় তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়। দেশের বহু পরার্থপর ধর্মপ্রাণ নরনারী ক্রমেই নাইট্‌দের কর্মক্ষেত্র অধিকার করেন। নাইট্‌গণ যোদ্ধারূপে ষ্টেট হইতে যে নিষ্কর জায়গীর উপভোগ করিতেন, দেশের রাজনীতি অর্থনীতি ও সমরনীতির পরিবর্তনের ফলে তাঁহারা উহা হইতে বঞ্চিত হন। বারুদ আবিষ্কৃত হওয়ায় যুদ্ধের পদ্ধতিও সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। সমরনীতি পরিবর্তিত হওয়ায় যোদ্ধা-রূপে নাইট্‌দের আর কোন উপযোগিতা থাকে না। দেশময় নূতন ভাবের মধ্যেও সকল বিষয়ে প্রাচীন ভাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকায় তাঁহারা প্রগতিশীল নরনারীর বিদ্রূপের পাত্র হইয়া দাঁড়ান।

কথিত আছে যে, ডন কুইক্‌জোট নামক জনৈক ব্যক্তি শেষ খ্যাতনামা নাইট্‌ ছিলেন। তিনি এরূপ পরার্থপর ছিলেন যে, বহু টাকা ধার করিয়া জনসেবায় ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার তরবারি ও বর্ম নীলামে বিক্রয় করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নাইট্‌ সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার অক্ষমতার জন্যই বিলুপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় বর্তমানেও দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বহু শ্রেণী ও সম্প্রদায় দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারিয়াই বিলীন হইয়া গিয়াছে। যুগোপযোগী ভাবসমূহের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলাই ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায়, সমাজ ও জাতির আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্বল্পতা

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

স্বল্পতার মাঝে
নানা কাজে
দিয়েছিলে ধরা
তবু ছিল তাতে বৈশিষ্ট্য প্রচুর,
কৃপণের দৃষ্টি নিয়ে
দেখি নাই চোখ চেয়ে
পূর্ণতার রূপ নিয়ে আছো ভরপুর।

সবটুকু দেখি না
ছোট দেখি তাই,
এ সহজ সত্য
সদা ভুলে যাই।
মেঘের আড়াল থেকে
রবির কিরণ আসে বেঁকে
কোথা হ'তে কেবা জানে
সে যে বহুদূর,
পূর্ণতার রূপ নিয়ে আছো ভরপুর

গীতার আদর্শ*

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস্, দর্শনসাগর

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্বসাহিত্যে এক অতুলনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। যেমন অর্থশাস্ত্র মন্থন করিয়া পঞ্চতন্ত্র রচিত হইয়াছে তেমনই উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে পার্থকে গীতার উপদেশ দ্বারা কর্ত্তব্য, আত্মজ্ঞান ও ভগবৎসেবা-বিষয়ে প্রতিবুদ্ধ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ বলিতে আমরা সাধারণতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই বুঝিয়া থাকি—অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে চৈতন্য-স্বরূপ নিত্যবস্তু বর্ত্তমান, যাহাতে বিশ্ব উৎপন্ন, স্থিত ও লীন হয়—সেই অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সন্ধান ও সাধন জীবনের একমাত্র আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য এই বাণীই উপনিষদ্ বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু উপনিষদের মুখ্য শিক্ষা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক শিক্ষা ক্রিয়া কর্ম্ম ও ভক্তিভাবের পরিপোষক এবং যোগাভ্যাসের অনুকূল। এই বৃহৎ শ্রুতি-সাহিত্য মন্থন করিয়া গীতা আধ্যাত্মিকতার মহৎ ভোজ্য পরিবেশন করিয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃ নানা রসের আস্বাদ আছে ও ইচ্ছা এবং রুচি হিসাবে তাহার অংশ গৃহীত হয়। যুগে যুগে যে শাস্ত্রের উপর টীকা লেখা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার গভীর তত্ত্ব যে ধর্ম্মপিপাসুদিগকে চিরকাল আকৃষ্ট করিবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। চিন্তার একটি বলিষ্ঠ বহুলতা বিদ্যমান থাকায় কর্ম্মী, ভাবুক ও ভক্ত সকলেই ইহা হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

গীতা সমন্বয়গ্রন্থ। ইহাতে আছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক কর্ত্তব্যের সমন্বয়, দৈহিক পরিস্ফুটি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সমন্বয়, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের সমন্বয়, কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের সমন্বয়, জীবের সহিত ভগবানের বিভিন্ন সম্বন্ধের সমন্বয়, ক্ষণিকের সহিত চিরন্তনের সমন্বয়, বৈচিত্র্যের সহিত সাম্যের সমন্বয়। মানবচিত্তের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা সংশয়—জ্ঞানের অভাবই সেই দুর্ব্বলতার কারণ এবং অক্রিয়াশীলতাই তাহার ফল। অর্জ্জুনের রণক্ষেত্রের অবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সহচর। প্রতিপদে আমরা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ—আমাদের না আছে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে মতির স্থিরতা। বয়স, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি যখন পূর্ব্বাচরিত পথ ও পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানকে পশ্চাতে রাখিয়া যায় তখন আমরা পথহারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যাই এবং জীবনের আদর্শ আমরা স্থির করিতে পারি না। সেই সময়ে জীবনের গতি ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের মূল ধর্ম্মসূত্রগুলির পরিচয় সন্দিগ্ধ মনকে চালিত ও বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করিবার একমাত্র সহায়।

জীবনের ছন্দঃ ও তাল অটুট রাখিতে গেলে চাই জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান। গতিশীল জগৎপ্রপঞ্চে কেহই নিশ্চল থাকিতে পারে না। কাজেই সকলকেই কাজ করিতে হয়। কেন না

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে প্রকাশিত।

কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত অসম্ভব। স্থষ্টিকর্ত্তা হিসাবে ভগবান পর্য্যন্ত কাজ করেন যদিও তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে অবহিত না হন তাহা হইলে সাধারণ লোক আরও জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। সুতরাং কাজ যখন করিতেই হইবে তখন নিজ নিজ প্রকৃতি, শিক্ষা ও সামাজিক মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য করিতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রস্বভাব ব্যক্তিরা নিজ নিজ ক্ষমতা-অনুযায়ী কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবেন—ক্রিয়ালোপ বা বৃত্তিসঙ্কর ঘটিলে সামাজিক জীবন অচল হইয়া পড়িবে। এই জন্য হিংসারও বৈধতা আছে—দুষ্টের শাসন, দুর্ব্বৃত্তের দমন, অসতের উচ্ছেদ কর্ত্তব্য হিসাবে করার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে হইবে—এখানে আত্মীয়তার প্রশ্ন উঠে না, বর্ষীয়ানের প্রতি সম্ভ্রম ও ক্ষমার কথাও উঠে না। আত্মীয়তা তো দৈহিক সম্বন্ধ মাত্র, সুতরাং ব্যক্তিনিরপেক্ষ হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয় কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অন্যায় অবিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া। জীবনসংগ্রামে ক্লীবতার স্থান নাই এবং জ্ঞাতি কুল ইত্যাদি স্মরণ করিয়া আত্মীয়ের পাপপ্রবণতাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। আত্মার অবনতি রোধ করিতে যদি দেহকে পাতিত করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য। আত্মা যখন অমর, তখন দেহের বধ তাহার বিনাশসাধন করিতে পারে না। দেহ ও আত্মা যে এক বস্তু নয় এবং আত্মার কল্যাণে দেহকে নিপীড়িত করা যে পাপজনক নয়—এই আদর্শ সব সময়ে সম্মুখে রাখা উচিত।

জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইলে আত্মাভিমান আসিয়া পড়ে—আমিই কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের আমিই অধিকারী এই বুদ্ধি জন্মাইলে সমাজে সংঘর্ষ তো অনিবার্য্যই; পরন্তু মৃত্যুর পর যাহাতে আমরা স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারি তাহার চেষ্টায় যজ্ঞপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস করিয়া থাকি। ভুলিয়া যাই স্বর্গসুখ নশ্বর এবং তাহা আত্মার নয়। দুঃখের চরম নিবৃত্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সংসাধিত হয় না। যেখানে স্পৃহা সেখানে অশান্তি—স্বর্গলোভ অন্যলোভের ন্যায় মোহের কারণ। সুতরাং লোভত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আপনাকে ভগবদিচ্ছার যন্ত্র ভাবিয়া তাঁহারই ইচ্ছা আমাদের ভিতর দিয়া পূর্ণ হইতেছে ভাবিলে সকল কর্ম্ম সমাধান করিবার অভিপ্রায় ও শক্তি আসিলে কর্ম্ম আর অভিমান জন্মাইবে না। সকল কর্ম্মফল ভগবানকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—মনকে সেই অবস্থায় আনিতে পারিলে জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, মান-অপমানকে সমানভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি আসিবে। কর্ম্মত্যাগে কাহারও অধিকার নাই কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগ করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে পুনর্জন্ম ও সংসারে গতায়াত অনিবার্য্য। যোগীরা যেমন উদাসীন ভাবে জাগতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং পরিবেষ্টনীর আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য গ্রাহ্যই করেন না, সেইরূপ সকলকেই সুখের প্রতি লালসা ও দুঃখের প্রতি বিতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া অচঞ্চল চিত্তে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। প্রবৃত্তির তাড়নায় বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িলে আমরা মোহান্ধ হইয়া যাই এবং সকল কর্ম্ম হইতে একান্ত নিবৃত্ত হইলে লোকযাত্রা বন্ধ হইয়া যায়—সুতরাং অনাসক্তরূপে ঈশ্বরাভিপ্রেত বা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই জীবনের আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কর্ম্মই জীবনের শেষ কথা নয়। বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত কাজ করা জড়ের স্বভাব, জীবের নয়। পৃথিবীর নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে

পারিলে আমাদের কর্তব্যের রূপ বদলাইয়া যাইবে। সকল বিষয়ে নিজের বুদ্ধি অভ্রান্ত এ বিশ্বাস দূর করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মনীষীদিগের আবিষ্কৃত সত্যে শ্রদ্ধাবান হওয়াই জ্ঞানের প্রথম সোপান। সকল বিচারের মূলে থাকা চাই সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মবেত্তার প্রতি শ্রদ্ধা। পরস্পরের অজ্ঞতা দূর করিতে হইলে সাধুসঙ্গম ও শাস্ত্রালোচন নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দেখি যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের উন্নততর ধারণা জন্মে। যিনি বৃহত্তর সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার আর নিম্নস্তরে থাকার প্রয়োজন নাই।

উপনিষদের ব্রহ্ম গীতার অক্ষরতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানগম্য রূপ। যজ্ঞ দান তপস্যা শ্রদ্ধা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ হইতে পারে কিন্তু এসকল কাম্য-কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় না। তবে ইহারা নিরর্থক নয়, কেন না ইহারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করে এবং উহাদের ফলত্যাগ করিবার সাহস, সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি জন্মাইলে উহারা মোক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সাহায্য করে। অনাসক্ত হইয়া আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ের প্রতি নির্ব্বিকার থাকিয়া যে সাত্ত্বিক কর্তা স্বধর্ম্মানুসারে কাজ করিয়া যান তাঁহার ও ব্রহ্মবাদীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই—উভয়েরই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উভয়েই শাশ্বত পদের অধিকারী হন। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে কর্ম্মীর সাধনা জ্ঞানীর সাধনা অপেক্ষা কঠোর, কেননা জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া ধীশক্তিকে অচঞ্চল রাখা এবং লব্ধ ফল ভগবানকে সমর্পণ করা অতীব দুরূহ সাধনা। নিজেকে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দেওয়া অপেক্ষা সমস্ত কামনাকে আত্মাতে লীন করিয়া দেওয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাঁহার সকল প্রচেষ্টা কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত তাঁহার কর্ম্মবীজ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেননা, তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভগবানই বিশ্বের একমাত্র কর্তা ও ধাতা। তিনি তখন আর দ্রব্যযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে ভিন্ন দেখেন না। অনুষ্ঠানবহুল জীবন প্রারম্ভিক সাধনা মাত্র—আত্মজ্ঞান লাভ করিতে গেলেই দেখা যায় যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অক্ষর পুরুষ সকলের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহার দর্শন মিলে যখন মন সাম্যে স্থিত হইয়া সমস্ত জীবনের জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া সকলকে সম ভাবে দেখে। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় যেমন তাঁহার কাছে সমান, তেমনই বিশ্বের সমস্ত প্রাণীই তাঁহার কাছে অভিন্ন। তিনি তখন আত্মার মধ্যেই সুখ, আরাম ও জ্ঞানের দীপ্তির সন্ধান পান এবং এই সমত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। তাঁহার তখন শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, আপন-পর ভেদ ঘুচিয়া যায় এবং বিশ্ব ও ভগবানের দ্বৈততার বুদ্ধি কাটিয়া যায়। তিনি তখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেন। সমুদ্রে যেমন নদীসকল আপন আপন সত্তা হারাইয়া ফেলে, তখন সকল বস্তুই ব্রহ্মে আপনার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। ইহার জন্য যোগ অভ্যাস আবশ্যক এবং শরীরের আহার নিদ্রা সম্বন্ধে যেটুকু যত্ন নেওয়া অপরিহার্য্য তাহা করা দরকার—অনর্থক দেহকে পীড়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেননা যোগ চিত্তকে সংযত করার নামান্তর, কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিশব্দ নয়। কিন্তু দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ও সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রভাব বলিয়া সাত্ত্বিক আহার আত্মার উন্নতির সহায়ক।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী ব্যতীত অন্য এক জাতীয়

জীবও মোক্ষের সন্ধানী ও অধিকারী। তিনি ভগবানকে ক্ষর বা অক্ষররূপে না দেখিয়া পুরুষোত্তম বা পরমাত্মারূপে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেবায় আত্ম-প্রাণ-মন উৎসৃষ্ট করেন। তাঁহার কাছে ভগবান অতি প্রিয়বস্তু, কেননা তাঁহারই নির্দ্দেশে তিনি জীবনকে চালিত করেন এবং তাঁহারই উপর সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হন। ভক্তের ভগবান নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন—তিনি জীবের—

'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥'

তিনিই যুগে যুগে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্টদিগের শাসনের জন্য ধরায় অবতীর্ণ হন এবং নষ্টধর্ম্মের মূল সূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রাণীদিগকে ধর্ম্মপথে চালিত করেন। তিনিইতো শ্রীকৃষ্ণরূপে বিষণ্ণ অর্জ্জুনের মনে অমৃতবর্ষিণী অষ্টাদশাধ্যায়িনী গীতার শিক্ষা দান করিতেছেন। কষ্টসাধ্য জ্ঞানমুক্তি সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু পরম কারুণিক শ্রীভগবান অল্পেই তুষ্ট—পত্রপুষ্পফলজল ভক্তিভাবে অর্পণ করিলে তিনি আমাদের সকলের ভার—যোগক্ষেম—বহন করেন। যে ভক্ত অনুক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করে ও তাঁহার নামকীর্ত্তন করে এবং আপনাকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার চরণে নিবেদন করে সে ভক্ত অপেক্ষা ভগবানের প্রিয়তর আর কেহ নাই। ঈশ্বরের কাজ করায় যাহার আগ্রহ ও প্রীতি, যিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে দেখেন বলিয়া তাহাদের সেবায় আত্মাকে নিয়োজিত করেন এবং সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহারই একান্ত শরণাপন্ন হন, সেই ভক্তের মুক্তির ভার ভগবানই গ্রহণ করেন ও তিনিই তখন হৃদিস্থিত হৃষীকেশ-রূপে জীবনকে সৎপথে চালিত করেন।

গীতা উপনিষৎশাস্ত্রের ব্রহ্মবিদ্যার সারার্থ বহন করিয়া আনিলেও তাহার আদর্শ পুরুষ সংযতচিত্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, সমবুদ্ধি, নির্লিপ্ত, অচঞ্চল, শ্রদ্ধাশীল যোগী। জ্ঞানীই হউন, কর্ম্মীই হউন, আর ভক্তই হউন, যিনি ঐ সকল গুণের অধিকারী নহেন তাঁহার জীবন অসম্পূর্ণ। সুতরাং শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥'

"যে কোন কার্য্য তোমার ভিতরে শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য; আর যাহা তোমার শরীর-মনকে দুর্ব্বল করে, তাহাই পাপ; এই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' তুমি বীর, তোমার এ সাজে না। তোমরা যদি জগৎকে এ কথা শুনাইতে পার—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে,' তাহা হইলে তিন দিনের ভিতর এ সকল রোগ, শোক, পাপ, তাপ কোথায় চলিয়া যাইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীউমারাণী দেবী

কে গো তুমি অপরূপা, ধরি বিদেশিনী-তনু
ভারত-দুয়ারে,
এসেছিলে প্রেমময়ী, প্রদীপ্তা, পরমা !
তব বিদেশিনী-তনু, নহে কি গো শিক্ষা দিতে,
শুধু শিক্ষা দিতে, ত্যাগের মহিমা ?
ত্যজি জাতি-কুল-মান, সর্ব্বস্ব আপন,
কেমনে হইতে হয় গুরুপদে আত্মলীনা
চির-নিবেদিতা ?

মরি মরি কি কহিব তব কথা
ওগো মহা তপস্বিনী, ভারত-সর্ব্বস্ব-প্রাণা !
বন্ধুরূপে, মাতারূপে, ভগ্নীরূপে ভারতের
ঘুমন্ত ললনা পাশে দাঁড়াইলে ধীরে।
হানি' স্নিগ্ধ করাঘাত, কহিলে ডাকিয়া—
"আজো ঘুম ? জাগো জাগো ভারতের নারী !
ভুলেছো যে ঘুমঘোরে আপন গৌরব ;
কেবা তুমি, কার বালা, লভিয়াছ কোন তীর্থে
পরম জনম।

মেল আঁখি, হের নিজ অন্তরের তলে ;
সেথা কি জাগিয়া নাই সীতা ও সাবিত্রী,
মীরা, গান্ধারী, দ্রৌপদী ?
সেথা কি জাগিয়া নাই অরুন্ধতী, মহাশ্বেতা,
খনা, লীলাবতী ?
কত কত মহীয়সী, মহাশক্তিরূপা !
জনমি তাঁদের ঘরে নিদ্রা যাবে লজ্জাকর
তম-নিদ্রামাঝে ?

রাজপুত ললনার বীরত্বের গাথা
তোমার দুয়ারে বাজে গভীর নিনাদে।
যে দেশের বক্ষ হতে মহা আত্মজ্ঞান,
মহাবেদ-ধ্বনি উঠে ছায় দিক অবনীমণ্ডল ;
সে দেশের নারী হয়ে ভুলে যাবে আপন স্বরূপ ?
এযে বড় লজ্জা মরি, দুঃখ বড় হায় !
মোর প্রভু, বিশ্বগুরু বিবেক আনন্দ
বরষিয়া দিব্যাশীষ, দিব্য দৃষ্টি দানে
দেখালেন ভারতের মহত্ব পরম।
তাই আজি হেথাকার প্রতি ধূলি-কণা
কি পবিত্র মোর কাছে, কিবা কব তার ?"

রুদ্ধ কণ্ঠ ভাবাবেগে, প্রেম-বিগলিত প্রাণে
কহিলে ডাকিয়া—
"আজি কিবা শুভক্ষণ, কি মহালগন !
রামকৃষ্ণ-মহাজ্যোতি প্রকাশি' জগতে
জাগাইছে বিশ্ব-প্রাণ মন।
মহাদোল, মহাগান, মহাপ্রাণ উঠিছে জাগিয়া।
পাশে তাঁর শক্তিরূপা মহামায়া জননী সারদা
দাঁড়ায়ে করুণাময়ী ব্যাকুলা বিহ্বলা।
ওঠো ওঠো ওঠো জাগো, প্রদীপ্তা সিংহীর মত
আপন স্বরূপে !
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম শক্তি বিকাশিয়া সহস্র প্রভায়
রামকৃষ্ণ-শক্তি-পূজা করো উদ্‌যাপন।"

নহে শুধু শিক্ষাদান।
সেবা-প্রেম-ভালবাসা ঢালিয়া দরদ,
করিলে প্রাণের পূজা নিঃশব্দ করমে,
গুরুগত মহা-প্রাণা, ভগ্নী নিবেদিতা !
কি দিয়াছি তব পদে ? হায় মোরা করিয়াছি
কতটুকু পূজা ?
তুমি শুধু দিয়ে গেছ, চাহ নাই কভু।
কত ব্যথা অবহেলা সহিয়াছ সবাকার তরে।
ক্ষমারূপা, ধৈর্য্যরূপা, হে পবিত্রা বিবেক-তনয়া !
অতি আপনার হয়েছিলে যবে দাঁড়াইয়ে পাশে,
কতটুকু চিনেছিনু প্রেমময়ী তোমারে তখন ?
আজ তারি প্রায়শ্চিত্ত অশ্রু-নীরে ভাসিতেছে বুক
তোমার বিরহে দেবী !

রুদ্ধ হৃদয়ের মাঝে গভীর বেদনা সাথে
জাগিছে যে প্রণতি নিবিড়
মেলি সেই স্নিগ্ধ আঁখি, লবে কি তুলিয়া তায়
ওগো দেবী, তুমি নিবেদিতা ?

মহাপুরুষ শ্রীশঙ্করদেব

শ্রীতরুণকুমার নাথ

১৩২৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোঘলকের নির্য্যাতনে ও নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া উত্তর ও মধ্যভারতের অনেক অধিবাসী প্রাণ ও মান রক্ষার জন্য বিদেশে পলায়ন করে। সেই সময়ে যুক্তপ্রদেশের কনৌজ নামক স্থান হইতে চণ্ডাবর কায়স্থ নামক একজন দলপতি আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে লইয়া পূর্ব্বদিকে আসিয়া কমতাপুর নামক হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান রংপুর জেলার ধারলা নদীর তীরে বাস করেন। পূর্ব্বস্থানের নামানুসারে তাহাদের বর্ত্তমান বাসস্থানের নাম কনৌজপুর রাখা হয়।

চণ্ডাবর দেবীভক্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল চণ্ডীবর বা দেবীদাস। দেবীদাস পরম পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও সাহসী যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হন। সেই সময়ে কমতাপুর রাজ্যের পশ্চিমে বঙ্গদেশে মুসলমান বাদশাহ রাজত্ব করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎকর্ত্তৃক কমতারাজ্য আক্রান্ত হইত। দেবীদাস কমতারাজের অধীনে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যশ অর্জ্জন করেন।

সেই সময় বর্ত্তমান কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও দরঙ্গ জেলার কিছু অংশ লইয়া কামরূপ রাজ্য ছিল। রাজা দুর্ল্লভনারায়ণ বা ধর্ম্মপাল কামেশ্বর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর এই দেশের হিন্দু রাজাদের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর সমস্ত লোকেরা পলায়ন করিয়া পশ্চিম দিকে ময়মনসিংহ, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রাজসাহী অঞ্চলে বাস করিতে থাকে। ঐ অঞ্চল তখন কমতাপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামেশ্বর ধর্ম্মপাল তাঁহার রাজ্যে বাস করাইবার জন্য কমতেশ্বরের নিকট কয়েক ঘর শিক্ষিত উচ্চ-শ্রেণীর লোক চাহিলেন। তদনুসারে কমতেশ্বর কনৌজাগত দেবীদাস সহ সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাতঘর কায়স্থ কামরূপে পাঠাইয়া দেন। কামেশ্বর ধর্ম্মপাল এই চৌদ্দ ঘর লোককে নিজ-রাজ্যের স্থানে স্থানে বাস করান, এবং প্রতি পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তাহাকে 'ভূঞা' উপাধি প্রদান করেন।

চণ্ডীবর ভূঞা প্রথমে গৌহাটির পূর্ব্বদিকে লেঙ্গামাগুরি স্থানে বাস করেন, কিন্তু সেখানে ভোটদের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার হেতু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে বর্ত্তমান নওগাঁ জেলার পশ্চিম অঞ্চলে আলিপুখুরী গ্রামে বাস করেন।

কয়েক বৎসর পরে কামেশ্বর ধর্ম্মপাল অপুত্রক অবস্থায় সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া যান এবং রাজ্য এক প্রকার অরাজক হওয়ায় ভূঞারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন নরপতি হইয়া উঠেন।

এই সময়ে গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম অঞ্চলে বিশ্বসিংহ কোচ প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি কোচরাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক ভূঞাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য করায়ত্ত করেন। ইহার

পর বঙ্গদেশাধিপতি হুসেন শাহ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়া গৌহাটির উত্তরে হাজোতে নিজপুত্র দানিয়ালকে শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আসামের পূর্ব্বদিকে আহোম জাতি প্রবল হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং কাছারীজাতি ক্রমশঃ পরাজিত হইয়া পশ্চিম দিকে অপসরণ করে।

দেশের এই অশান্তির সময় নওগাঁ জেলার আলীপুখুরী গ্রামে চণ্ডীবর ভুঞার বংশে কুসুম্বর ভুঞার পুত্ররূপে আনুমানিক ১৩৭১ শকাব্দ বা ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম ছিল সত্যসন্ধা। অন্যমতে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

বাল্যকালেই শঙ্করদেবের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হয়। স্বীয় পিতামহ ও পিতামহী দ্বারা তিনি পালিত হন। বার বৎসর বয়সে শঙ্করদেব গ্রাম্য পাঠশালায় মহেন্দ্রকন্দলী পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চতুষ্পাঠীর পাঠ শেষ করেন। বর্ণমালা শিক্ষা করিবার সময়ই তিনি স্বভাববশতঃ কবিতায় দেবতার স্তুতি রচনা করিয়া শিক্ষক ও সহপাঠিগণকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেন।

শঙ্করদেব বাল্যকালে বড়ই বলিষ্ঠ ও চঞ্চল-স্বভাব ছিলেন। বনে বনে ঘুরিয়া পাখী ধরা, সাঁতার দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইতে চেষ্টা করা, জলে ডুব দিয়া শুশুক ধরিতে যাওয়া—তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। অন্যদিকে তিনি সুগায়ক, সুবাদক ও সুচিত্রকর ছিলেন। যোগ-অভ্যাসেও তাঁহার নিপুণতা ছিল।

উনিশ বৎসর বয়সে শঙ্করদেব আলিপুখুরী ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বর্ত্তমান নওগাঁ শহরের নয় মাইল উত্তরে বরদোয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং পঁচিশ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি কন্যা জন্মে। জন্মের পরই শিশুটি মাতৃহারা হয়। শঙ্করদেব পত্নী-বিয়োগে ব্যথিত হন; তিনি পুনঃ বিবাহ না করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং সযত্নে শিশুটিকে প্রতিপালন করেন।

আট বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে শঙ্করদেব কন্যা হরিপ্রিয়াকে হরিভূঞা নামক একটি যুবকের সহিত বিবাহ দিয়া মৃতা পত্নী ও আপন পিতা-মাতার গয়াশ্রাদ্ধ করিবার জন্য বার জন সঙ্গী সহ তীর্থভ্রমণে বাহির হন।

শঙ্করদেব বার বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করেন। সেই সময় তিনি গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, উপবদরিকাশ্রম ও বরাহ-ক্ষেত্রাদি তীর্থ-পরিভ্রমণ করিয়া অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন।

এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এক আন্দোলন চলিতেছিল। দেশে মুসলমান-সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় দেশের জাতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উপর এক নূতন চাপ পড়িয়াছিল। এই নূতন আবহাওয়ায় দেশের সনাতন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তখন ভারতবর্ষে প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এক নূতন বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধর্ম্মের মধুর কীর্ত্তন গাহিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই একই বেদীর সম্মুখে সমবেত হইতে লাগিল। সমগ্র মধ্য ও উত্তর-ভারত বিদ্যাপতি ও জয়দেবের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমগীতিকায়, দক্ষিণ-ভারত রামানন্দ রায়ের ভক্তি-গাথায় এবং বঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিন্ধ্যাচল চৈতন্যদেবের ভাব-মুলক নৃত্যগীতে মুখরিত হয়। উত্তর-ভারত রামায়তী সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবদের প্রভাবে প্রাণবন্ত ছিল। শঙ্করদেব দেশের এই নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইলেন।

বার বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া শঙ্করদেব একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমূলক ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশবাসীকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এক বেদীমূলে সমবেত করিয়া দেশের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে হইল এবং এইজন্য তিনি কিছুটা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে পড়িলেন।

এই সময়ে ত্রিহুতের জগদীশ মিশ্র নামক একজন ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত 'ভাগবত'-পাঠ করিবার জন্য বরদোয়া গ্রামে আগমন করেন এবং শঙ্করদেবের অতিথি হন। এই দৈব প্রেরিত সুযোগে শঙ্করদেব ভাগবতের দশমস্কন্ধস্থিত শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া সুমধুর গীতিচ্ছন্দে স্থানীয় কামরূপীয় ভাষায় 'কীর্ত্তন' রচনা করিলেন। কীর্ত্তনের প্রেমমূলক কাহিনী, সুললিত সুর ও সুমধুর ছন্দে দেশবাসী সহজেই আকৃষ্ট হইল।

সেই সময় দেশে কাছারীদের অত্যাচারের প্রাবল্যে ধনপ্রাণ বিপদাপন্ন হইল। একদিন কয়েক জন কাছারী সৈন্য শঙ্করদেবকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি 'কীর্ত্তন' পুঁথিখানা বুকে বাঁধিয়া ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাহার পর শঙ্করদেব পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সহ বরদোয়া ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে আহোমরাজ্যে বর্ত্তমান মাজুলি অঞ্চলে ধুয়াহোর বা ধুয়াস্তি নদীর তীরে বেলগুরি গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই অঞ্চলে তখন অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বাস করিতেন। শঙ্করদেব তাঁহাদের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। নানারূপ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই অঞ্চলে রামদাস ভুঞা ও শতানন্দ কায়স্থ শঙ্করদেবের প্রথম শিষ্য হন। অতঃপর রামদাস ভুঞার শ্যালক মাধবদেব ভুঞা শঙ্করদেবের প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে তিনি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করিলেন, আসন্ন বিবাহের সকল আয়োজন বন্ধ করিলেন এবং বিধবা মাতার রক্ষণের ভার ভগিনীপতির উপর অর্পণ করিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে শঙ্করদেবের পাদমূলে উৎসর্গ করিলেন এবং গুরুদেবের প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হইলেন।

এখানেও শঙ্করদেবের জীবন নিরাপদ ছিল না। কয়েক বৎসর পরে আহোমরাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া শঙ্করদেব সদলবলে পশ্চিমে কোচরাজ্যের বরপেটায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বরপেটা স্থানটি শঙ্করদেব পছন্দ করিলেন। এই স্থানের অধিবাসীরা সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। কোচরাজা নরনারায়ণ শঙ্করদেবকে তাঁতিকুচি অঞ্চলের গোমস্তাপদ দিলেন, কিন্তু শঙ্করদেব তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসামবাসীদের হৃদয়রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

শঙ্করদেব স্থানীয় কামরূপী ভাষায় ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদি অনুবাদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন। তিনি সুললিত সুর ও রাগরাগিণী-পূর্ণ উচ্চ আধ্যাত্মিক গীত সরল ভাষায় রচনা করিয়া দেশবাসীর চিত্ত বিমোহিত করিলেন। তাঁহার প্রিয় ও প্রধান শিষ্য গুরুদেবের আদেশ অনুসারে তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অনুরূপ কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে সমগ্র দেশ শঙ্কর-মাধবের গীতনাট্যের ছন্দে ও সুরে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং দলে দলে লোক প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সমবেত হইতে লাগিল —'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নামে আকাশ-বাতাস ছাইয়া গেল।

ঈর্ষাপরবশ হইয়া একদল লোক কোচরাজা নরনারায়ণের নিকট শঙ্করদেবকে ধর্ম্মদ্রোহী

পাষণ্ড বলিয়া অভিযোগ করা সত্ত্বেও তিনি শঙ্করদেবের প্রতিই আকৃষ্ট হন এবং রাজসভায় তাঁহাকে সম্মানিত আসন দেন। শঙ্করদেব কোচবিহারেও ধর্ম্মপ্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।

বৃদ্ধ বয়সে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া কোচবিহার কেন্দ্রে ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অনুবাদ করিবার সময় তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটি বিস্ফোটক হয় এবং তাহাতে সমগ্র দেহের রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। ১৪৯০ শকের (১৫৬৮ খৃঃ অঃ) ৭ ভাদ্র, শুক্লা দ্বিতীয়া, বৃহস্পতিবার, বেলা এক প্রহরের সময় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। কোচবিহারের তোরষা নদীর তীরে তাঁহার নশ্বর দেহ রাজকীয় সম্মানে ভস্মীভূত করা হয়।

শঙ্করদেবের নশ্বর দেহ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারে ভস্মীভূত হইলেও তিনি আজ পর্য্যন্ত সমগ্র আসামবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে একাধিপতি-রূপে দিব্যশরীরে বিরাজ করিতেছেন।

ধার্ম্মিক ও বৈজ্ঞানিক

ডক্টর অভীশ্বর সেন, এম্-এস্‌সি, পিএইচ-ডি

আদিম জীবকোষ হইতে সকল জীবের সৃষ্টি কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা লইয়া আমরা যে কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান এখানেই ক্ষান্ত। দৃশ্য-জগতের বাহ্যিক সত্যসমূহ লইয়া যে সকল গবেষণাক্লান্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলিতে জীবনপাত করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত অনেকে একমত হইবেন, কিন্তু তাঁহারা যেখানে থামিয়া গিয়াছেন সেখানেও নিরস্ত না হইবার সাহস অনেক মানুষের আছে। বৈজ্ঞানিকের ইহা অবিশ্বাস কি অক্ষমতা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম কোণ হইতে এক অজ্ঞাত চেতনার, অনুভূতির, স্মৃতির এবং অচিন্তনীয় ধারণার আঘাত বৈজ্ঞানিকও পান। এই সংস্পর্শ, এই অদৃশ্য সংঘাত আত্মা হইতে আসে। বৈজ্ঞানিক জানেন এই অনুপ্রেরণা কোন পার্থিব জড়বস্তু হইতে আসে না।

অতীতকাল হইতেই মানুষ যে সকল সময় সকলক্ষেত্রে উন্নততর ও মহত্তর কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল তাহা প্রমাণ করে তাহার আন্তরিক ধর্ম্ম—বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করিবে। মানুষ মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া, পাথরের টুকরা সাজাইয়া তাহাকে ভালমন্দ করিবার শক্তি দিয়াছে—তাহা বড় কথা নয়। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে হাস্যকর এই অনুষ্ঠানের মূলে যাহা আছে তাহা কোন এক অজ্ঞাত শক্তিকে স্বীকার করা। যাঁহারা পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা যেন অতীতের অজ্ঞ মানুষের সহজ সরল বিশ্বাসকে ঘৃণা না করেন। বরং মানুষ ভয়ে, পুলকে ও শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হইয়া

থাকুক সকল জাতির, সকল মানুষের কোন এক পরম অজ্ঞাত শক্তির ব্যাকুল অনুসন্ধান-প্রচেষ্টাকে দেখিয়া। মানবাত্মা কি সেই বিরাট শক্তির সান্নিধ্য অনুভব করে না? বৈজ্ঞানিক কি বলিতে ভয় পাইবেন যে মানুষের মধ্যে সহজাত ধর্ম্মানুপ্রেরণা তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম? মৃত্যুসঙ্কুল প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব, তাহার অত্যদ্ভুত জড়-পদার্থ-নির্ম্মিত মস্তিষ্ক ও সূক্ষ্ম ভাববোধ কি প্রতিপদে তাহার বুদ্ধির ও জ্ঞানের অতীত বিরাট কোন কিছুর অস্তিত্বকে স্মরণ করাইয়া দেয় না?

অণু বা পরমাণুর চিন্তাধারা নাই, মৌলিক পদার্থের কোন মিলনপ্রণালী কোন ধারণার, কোম স্বাভাবিক বিধানের জন্ম দেয় নাই। কিন্তু জীবনের বহু উত্তেজনা বহু জীবন্ত শক্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার কাছে জড়-পদার্থ বাধ্য এবং তাহারই ফলে আমরা সভ্যতার বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। এই জীবন্ত শক্তি-গুলির গঠন কি শুধু অণু-পরমাণু লইয়াই, না তাহাদের উৎস স্পর্শাতীত কোন কিছু? যে পদার্থে পৃথিবীর গঠন হইয়াছে, তাহাদ্বারা ইহাদের তৈরী করা যায় না। তাহা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের ওজন করা যায় না, তাহাদের কোন প্রকারেই পরিমাপ করা যায় না। কোন স্বাভাবিক বিধানে তাহারা বাধ্য নয়। মানুষের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলির মধ্যে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের অস্তিত্ব আছে—নিজেদের ইহারা সকলের সম্মুখে উপস্থিত করে আপনাদের সুবিপুল কার্য্যশক্তি দ্বারা, জড়পদার্থের উপর শক্তি পরিচালনাদ্বারা—পার্থিব মানুষকে স্বাভাবিক মানবীয় দুর্ব্বলতা হইতে তুলিয়া কোন অজ্ঞাত মহান ইচ্ছার সহিত সুপরিচিত করার প্রচেষ্টাদ্বারা। মানুষের উন্নততর কাহারও সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছাই তাহার কারণ। ইহাই তাহার সহজাত ধর্ম্মানু-প্রেরণার রহস্য।

বিজ্ঞান উন্নততর কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণকে স্বীকার ও প্রশংসা করে। শতশত প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে সে নীরবে লক্ষ্য করিয়া যায়। মানুষের সহজাত ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈজ্ঞানিক জানেন এই সকল বহু বিভিন্ন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য একই। বিজ্ঞান যাহা দেখিয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই যাহা লক্ষ্য করিবেন, তাহা মানুষের মহৎ কাহারও উপর অখণ্ড বিশ্বাসের অবিশ্বাস্য মূল্য।

মানুষের নৈতিক উন্নতির দিকে অগ্রগতি ও বাধ্যতা—আত্মার অমরত্বের উপর তাহার বিশ্বাসের ফল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার সম্পদ মানুষের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করে। তাহাই তাহাকে করিয়া তোলে উন্নত, অজ্ঞাত বিরাট কোন শক্তির সান্নিধ্য অনুভব করিতে। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কোন্ মানুষ না বিপদের সম্মুখে অজ্ঞাতে বলিয়া ফেলে 'ভগবান আমাকে রক্ষা করুন'?

শ্রদ্ধা, দয়া, চরিত্রের মহত্ত্ব, সাধুতা, অনু-প্রেরণা—ইহাদের চরিত্রগত মহৎ গুণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে ইহারা আসে না। বিশ্বাসকে উপহাস করা যায় না, কারণ বিশ্বাস না থাকিলে সভ্যতা হইয়া যাইত নিঃস্ব—শৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা হইয়া দাঁড়াইত। নিয়ন্ত্রণ ও সংযম নিঃশেষে লোপ পাইয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

পৃথিবীতে মানুষের সময় অনন্ত কালের মধ্যে নিতান্ত অল্প। তাহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণতা রাসায়নিক গঠনপ্রণালী হইতে শেষ লক্ষ্য পূর্ণ আত্মার বিকাশের মধ্যে একটি ঘটনা মাত্র।

আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিলনক্ষেত্রে, পৃথিবীর বহু বৈজ্ঞানিকের আজীবন সাধনার ফলাফল দিয়া মানুষ সন্ধান পাইয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একত্বের—একই আদিম উপকরণ হইতে আসিয়াছে সকল পদার্থ, সকল শক্তি। সৃষ্টির অমর উপকরণ লইয়া অগ্রসর হইতে হইতে বৈজ্ঞানিক অমর স্রষ্টার সন্ধান কোন দিন পাইবে কি না জানি না, কিন্তু তাহার সকল সাধনার চরম লক্ষ্য ও অজ্ঞ ভক্ত মানুষ-মনের ব্যাকুল অভিব্যক্তি কি একই পথে মিলিত হইতেছে না?

পরিণতি

প্রস্ফুতি দেবী

যে নীরব রাগিণী ব্যথার বীণায় ফুটিয়া উঠিতে চায়,
সে কেমনে পশিবে তোমার শ্রবণে ভাবিয়া নাহি যে পায়;
তাল লয় সম ভুলিয়া সকলি
ছিন্ন করিয়া নিয়ম শিকলি,
সেই করুণ সুরের মৌন মিনতি কাঁপিছে মূর্চ্ছনায়,
শুধুই তোমারে শোনাবে বলিয়া এতই আবেগ তায়।

জানি নাথ তব অজানা কিছুই নাহিক বিশ্বময়
মরমের গীতি বুঝিবে না তুমি এ কথা সত্য নয়;
তবু মনে হয় কেন নাহি এসে
শুনিবে না গান বসে' মোর পাশে,
বুঝাবে সাধনা বিফল হয়নি তোমারে করেছে জয়,
দূর করি গ্লানি কেন বলিবে না মিথ্যা এ পরাজয়।

সন্ধ্যা তারার হাটের মাঝারে খুঁজে ফিরি মোর ধন,
মোর তরে কি গো একটি তারারও ঝরেনা দু' নয়ন?
দেখে না কি চেয়ে ধরণীর মুখে
আঁখির আলো হরে নিয়ে সুখে
তারা হয়ে আজ আকাশের বুকে ভাসিছে অনুক্ষণ,
সেই অন্ধ আঁখির ক্লিষ্ট চাহনি, নিষ্ফল আয়োজন।

বেদনার ভার উজাড় করিব তাইত তোমারে ডাকা
তোমার সভার একটি কোণেও থাকে যেন তারা রাখা;
চরম মূল্যে যে ফল পেয়েছি
বিফল নহে তা, আমি যে দেখেছি,
তাহার মাঝারে যে সতেজ বীজ আজিকে রহিল ঢাকা,
সম্ভাবনার নবীন মাটিতে সে বীজ মেলিবে শাখা।

ভারত-জার্মাণ সাংস্কৃতিক সংযোগ

হেলমুথ ফন্ গ্লাসেনাপ্

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

(২)

সংস্কৃত-চর্চার প্রথম শতকে জার্মাণ পণ্ডিতগণ ইংরেজী অভিধান ব্যবহার করেন। ইংরেজী অভিধান ব্যয়বহুল ও দুর্লভ হওয়ায় কবি রুকার্ট নিজের ব্যবহারের জন্য উইল্‌সনের সমগ্র অভিধানখানি নকল করিয়াছিলেন। বপ (১৮৫০) ও বেন্‌ফে (১৮৬৫) ছাত্রগণের ব্যবহারের জন্য জার্মাণ পরিভাষা এবং থিওডোর গোল্ড-ষ্টুকার (১৮৫৫) ইংরেজীতে একখানি অসম্পূর্ণ সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। সাত খণ্ডে সংস্কৃত ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জার্মাণ অভিধান অটো বোট্‌লিঙ্ক কর্তৃক সংকলিত এবং ১৮৫২-৭৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবার্গস্থিত ইম্পিরিয়েল একাডেমি অব সায়েন্সেস্ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলনের পর বোট্‌লিঙ্ক আর একখানা ক্ষুদ্র অথচ অধিকতর পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন করেন; ইহাও রুশদেশীয় একাডেমির প্রোৎসাহে মুদ্রিত হয় (১৮৭৯-৮৯)। এই দুই খানি অমূল্য গ্রন্থ হইতে জার্মাণগণ পরম্পরা-ক্রমে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন। ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ 'পিটার্সবার্গার ওরটারবাক্'-এর প্রণয়ন সম্পূর্ণ হইবার ষাট বৎসর পর, এমন অনেক শব্দ জানা গিয়াছিল যেগুলি এই দুইটি অভিধানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এই জন্য ১৯২৪-২৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড স্মিড্‌ট্ উহাদের অতিরিক্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই অতিরিক্ত সংস্করণগুলিও যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, সম্প্রতি পুনাতে যে নূতন পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান সংকলনের আয়োজন চলিতেছে উহা এই অভাব দূর করিবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ক্যাপেলার প্রথম শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য পিটার্সবার্গ অভিধানগুলির ভিত্তিতে ৫৫০ পৃষ্ঠাসম্বলিত একখানি অত্যন্ত উপযোগী ক্ষুদ্র সংস্কৃত-ওরটারবাকের সংস্করণ বাহির করেন। কয়েক বৎসর পর ইহার একখানা পরিবর্ধিত ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সার মনিয়ার উইলিয়ামস্-কৃত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশন ভারতীয়বিদ্যা-পারদর্শী জার্মাণ মনীষি-গণের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের উপর প্রভূতপরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল, কারণ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নূতন সংস্করণ লিউম্যান ও ক্যাপেলারের সহযোগিতায় লিখিত হইয়াছিল।

যে সকল জার্মাণ পণ্ডিত সংস্কৃত কাব্য ও নাটক সম্বন্ধে জার্মাণ ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্য ও নাটকসমূহের জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থ বহুবার অনূদিত হইয়াছে—'শকুন্তলা' দশাধিক বার, 'বিক্রমোর্বশীয়' পাঁচবার, 'মৃচ্ছকটিক' চারবার, 'দশকুমার-চরিত' তিনবার। অমরু এবং ভর্তৃহরির কবিতাগুলিরও অনেক জার্মাণ অনুবাদ আছে।

ভারতীয় গল্প এবং কাহিনীগুলিও জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অটো-বোট্‌লিঙ্ক পাণিনি ব্যাকরণের জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশ করেন (প্রথম সংস্করণ—১৮৩৯; দ্বিতীয় সংস্করণ—১৮৮৭)। পরলোকগত অধ্যাপক লিবিক্ প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা করেন। বুলার ও জলি কর্তৃক 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থমালা' পর্যায়ে কতকগুলি ভারতীয় আইন পুস্তক ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে; অন্যান্য কতকগুলিরও জার্মাণ অনুবাদ আছে। আমেরিকান-সুইস পণ্ডিত জোহান জ্যাকব মেয়ার-কৃত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রের' একখানা অত্যুৎকৃষ্ট জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাগুক্ত অধ্যাপক জলি একাধারে ভারতীয় আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই উভয় বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করায় জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ তাঁহাকে সম্মানজনক ডক্টর অব্ ল য্যাণ্ড্ মেডিসিন্ উপাধিতে ভূষিত করেন।

জার্মেণীতে সকল সময়েই দর্শন-চর্চায় সমধিক অনুরাগ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়; বহু পণ্ডিত এবিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। উপনিষৎসমূহ ও ভগবদ্গীতার বহু অনুবাদ হইয়াছে। রিচার্ড গার্বে সাংখ্যদর্শন এবং হাল্ট্‌জ্‌স্, মোক্ষমূলার, রোয়ার ও উইন্টার ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল দার্শনিক পল ডয়সনের। ডয়সন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাচার্যের পুত্র ডয়সন জীবনের প্রথমেই ধর্মতত্ত্ব চর্চা করিতে আরম্ভ করেন, শোপেনহাওয়ারের শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং শঙ্করের উৎসাহী অনুগামী হন। কোন রুশ-পরিবারে গৃহশিক্ষকের কার্য করিবার সময় তিনি অদ্বৈত-দর্শন অধ্যয়ন এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শাঙ্কর-বেদান্ত প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার 'শাঙ্করভাষ্য-সমেত 'বেদান্তসূত্রের' জার্মাণ অনুবাদের (১৮৮৭) সহিত 'ষাটখানা উপনিষদের' (১৮৯৭) এবং তাঁহার ছাত্র অটো ষ্ট্রৌজের সহযোগিতায় 'মহাভারতের' (১৯০৬) অনুবাদ সংযোজিত হইল। ছয় খণ্ড দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের মধ্যে প্রথম তিন খণ্ডে ভারতীয় দর্শন, অবশিষ্ট খণ্ডগুলিতে ডেকার্ট হইতে শোপেনহাওয়ার পর্যন্ত গ্রীস, মধ্যযুগ ও বর্তমান কালের দর্শন আলোচিত হইয়াছে। সমসাময়িক জার্মাণ দার্শনিকদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় আর কেহই পাশ্চাত্ত্যের জন্য বেদান্তের উপযোগিতা এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।* প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ্ রুডল্‌ফ্ অটোকে অনুরূপ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। সংস্কৃতে

* স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ-ভ্রমণকালে জার্মেণীর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক বিখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত পল ডয়সনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার এবং বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। অধ্যাপক ডয়সন একখানা বিশেষ অনুরোধ-লিপি দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দকে নিজ কিয়েল-স্থিত বাসভবনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডয়সন স্বামিজীর বক্তৃতাদি পাঠ এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একজন মৌলিক চিন্তাশীল ও প্রথম শ্রেণীর আধ্যাত্মিক-প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। ডয়সন নিজে বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বামিজীর ন্যায় একজন উপযুক্ত উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনাদি শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য বড়ই অভিলাষী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ও তাঁহার পত্নী মহাসমাদরে স্বামিজীকে তাঁহাদের বাস-ভবনে অভ্যর্থনা করিলেন। অধ্যাপক তাঁহার সুবৃহৎ পুস্তকাগারে অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে পুস্তকের কথা উঠিলে অমনি বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক ডয়সন উপনিষদ্ হইতে ২।৩টি

তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল এবং তিনি রামানুজের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ধর্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক ব্যতীত তিনি বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর অনেকগুলি অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তুলনামূলক ধর্মে হিন্দুধর্মের যথোপযুক্ত স্থাননির্দেশ করিতে প্রভূত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত ও হিন্দু সাহিত্যে সবিশেষ অনুরাগী এই সকল পণ্ডিত ব্যতীত আরও অনেকে আছেন যাঁহারা প্রাকৃত ও পালি এবং এই দুই ভাষায় লিখিত জৈন ও বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের জন্য সুবিদিত হইয়াছেন। হালের কবিতাবলীর প্রথম সম্পাদক এলব্রেক্ট্ ওয়েবার এবং পালি ব্যাকরণ-প্রণেতা রিচার্ড পিসেল ব্যতীত হারম্যান জেকবি ও আর্নষ্ট্-লোম্যানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইঁহারা জৈনদের ইতিহাস ও তাহাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলোকসম্পাত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল পালি গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে 'বিনয়' ধর্মগ্রন্থের বিখ্যাত সম্পাদক ও অনুবাদক এবং 'বুদ্ধের জীবনী' প্রণেতা হারম্যান ওল্ডেনবার্গের স্থান সর্বপ্রথম। বুদ্ধের জীবনীর বারটি জার্মাণ এবং তিনটি ফরাসী সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং ইহা বহুকাল যাবৎ গৌতমের জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। উইল্‌হেল্‌ম গিগার সিংহলী ঐতিহাসিক কাহিনী হইতে 'সমযুক্ত-নিকায়' গ্রন্থের একাংশ জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেন। নব সিংহলী অভিধানের গবেষণাকার্যের তত্ত্বাবধানও তিনি করিয়াছিলেন।

এলবার্ট গ্রুনওয়েডেল ও এলবার্ট ফন্ লেকথ্-এর নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব-তুর্কীস্থানে প্রুশিয়ান অভিযানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ও ইহার সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভিযাত্রী দুইজনই ভারতীয় কলা ও পাশ্চাত্যের সহিত ইহার সম্পর্ক সম্বন্ধে

শ্লোক সুমধুর স্বরে পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, "বেদচর্চা-জনিত আনন্দ একটি পরম লোভনীয় বস্তু এবং সেই উচ্চ আনন্দ-ভূমিতে আরোহণ করিলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অত্যাশ্চর্যরূপে প্রশস্ত হয় ও প্রাণে অপরিমেয় আনন্দরসের সঞ্চার হয়। উপনিষদ্ ও শঙ্করের ভাষ্যসমেত 'বেদান্তসূত্র' সত্যান্বেষী মানবপ্রতিভার বিরাট ও বহুমূল্যবান ফল। বর্তমানে জড়বাদের দিক হইতে আধ্যাত্মিকতার মূল প্রস্রবণের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ফলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই সমস্ত জগতের ধর্মগুরু হইয়া দাঁড়াইবে।" স্বামিজী অধ্যাপকের কতকগুলি অনুবাদও দেখিলেন। ডয়সন ও তাঁহার পত্নী ভারতবর্ষের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্বামিজীও তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নে বিশেষরূপে প্রীত হইয়াছিলেন। লণ্ডনেও পল ডয়সন দুই সপ্তাহ দিবারাত্র স্বামিজীর সন্নিধানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতাদি শুনিয়া বেদান্তের গূঢ়ার্থ আরও বিশদরূপে অবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। ডয়সনের কিয়েল-স্থিত বাস-ভবনে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্বে স্বামিজী চারিশত পৃষ্ঠার একখানি কবিতাপুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে উহা অর্ধঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বামিজী অধ্যাপকের সহিত কথোপকথনকালে উক্ত পুস্তক হইতে পঠিত কথাগুলি অনর্গল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। স্বামিজীর এই অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া অধ্যাপক বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "এ পুস্তকখানি নিশ্চয়ই আপনি ইতঃপূর্বে পাঠ করিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র চোখ বুলাইয়া চারিশত পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্ত করা কেবল দুঃসাধ্য নহে—অসাধ্য।" তদুত্তরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "সংযতমনা যোগীর পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। আজীবন অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফলস্বরূপ এই ক্ষমতা স্বতঃই আমাতে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতে ব্রহ্মচর্যবলে এইরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিরল হইলেও একেবারে অদৃশ্য হয় নাই। এই ক্ষমতা সকলেই লাভ করিতে পারে।" অধ্যাপক স্বামিজী-প্রদর্শিত যুক্তিশ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন। —অনুবাদক

পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল জার্মাণ পণ্ডিত টারফানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন,তন্মধ্যে হিন্‌রিক্ লুডার্স এবং তাঁহার পত্নীর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রনষ্ট বৌদ্ধ পুস্তকের পাণ্ডুলিপির অংশগুলি সম্পাদনা করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, অধ্যাপক ওয়ালেসার-এর ন্যায় অল্প কয়েকজন জার্মাণ পণ্ডিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রধানতঃ ফরাসী ও বেলজিয়ান পণ্ডিতগণই বরাবর মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন।

প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক মরিস উইণ্টারনিজ লিখিত তিনখানি পুস্তক ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে জার্মাণ ভাষায় প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রথম দুইখণ্ড ইংরেজীতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়কে জার্মেণীতে ভারতীয় বিদ্যার সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই প্রাগুক্ত পণ্ডিতবর্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রায় সকল জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের চর্চা হইত এবং তাহাতে ভারতীয় সাহিত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইল। বিগত দুইটি মহাসমরের বিপর্যয় এবং তজ্জনিত অশান্তি জার্মেণীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না; এইজন্যই পরিতাপের বিষয় যে, জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কতিপয় সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও সংস্কৃতের পঠন-পাঠন এখনও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে এবং পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি ও আমেরিকা অপেক্ষা জার্মেণীতে এখনও সংস্কৃতাধ্যাপকের সংখ্যা অনেক বেশী।* আরও উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপের অন্যান্য জাতি যেরূপ ভারতের কোন না কোন অংশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, জার্মেণী সেরূপ ভারতের কোনও অংশে কখনও রাজত্ব করে নাই বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। জার্মেণীর উদ্দেশ্য বরাবরই নিছক বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক; এই দেশ বিখ্যাত কবি হিন্‌রক্ হায়েন্-এর সুবিদিত উক্তির মর্ম অনুসরণ করিতেছে—'পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ জাতি বড় বড় জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারতের সম্পদ্‌রাজি নিজেদের দেশে আনয়ন করিয়াছে, আর আমরা জার্মাণরা এ বিষয়ে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ ব্যতীত আমাদের চলিবে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কারখানা হইবে।'

বহু-সংখ্যক জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থাকায় ভারতের গৌরবময় অতীত, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির

* জার্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে ভারতীয় বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে সকল পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেছেন তাঁহাদের নাম সহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল:— বন্—পুরাণ, জৈনধর্ম ও চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক কিরফেল্; পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর লস্; বেদান্তের অধ্যাপক ডক্টর হ্যাকার; ফ্রাঙ্কফর্ট—বেদের অধ্যাপক লোমেল; গটিন্‌জেন্—বৌদ্ধধর্ম ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ওয়াল্ডেস্মিড্, হিন্দীর অধ্যাপক ডক্টর স্টেচি; হ্যালে—বেদের অধ্যাপক থিম্; হামবুর্গ—জৈন ধর্মের অধ্যাপক সুব্রিং; জেনা—বেদ ও হিন্দীর অধ্যাপক ডক্টর হাউস্‌চাইল্ড; কিয়েল—হিন্দুধর্মের অধ্যাপক স্ক্রাডার; লিপ্‌জিগ্—ভারতীয়, চৈনিক ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফ্রিড্‌রিক্ ওয়েলার; মারবুর্গ—ভারতীয়, চৈনিক ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক নোবেল; ম্যুনিক—বেদের অধ্যাপক ওরটেল, ভারতীয় ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক হেলমুথ হফ্‌ম্যান; মান্‌স্টার—প্রাকৃত ও জৈনধর্মের অধ্যাপক য়্যালস্‌ডরফ্; টুবিঙ্গেন—হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অধ্যাপক ফন্ গ্লাসেনাপ এবং নাটকের অধ্যাপক হারম্যান ওয়েলার।

অধ্যয়নই বরাবর তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্যই তাঁহারা আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের যথোপযুক্ত আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই। মিশনারীগণ প্রাদেশিক ভাষাসমূহ হইতে কতিপয় গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে বাদ দিলে অতি সামান্য কয়েক ব্যক্তিই আধুনিক ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড়দের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গভীরভাবে চর্চা করিয়াছেন। পারস্যভাষায় বিশেষজ্ঞ ভূতপূর্ব বৈদেশিক মন্ত্রী ডক্টর রোসেন উর্দু সাহিত্যের বিবরণ এবং আমানতের 'ইন্দরসভা' অনুবাদ করিয়াছেন। অধ্যাপক স্কোমেরাস একখানা তামিল ব্যাকরণ এবং ডক্টর বেথান শৈব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডক্টর রেইনহার্ড ওয়াগ্নার একজন প্রতিভাশালী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আশা করা যায়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় জার্মেণীতে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহেরও বিশেষ চর্চা হইবে। জার্মাণ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও ছাত্র বিনিময়ের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সকল জার্মাণ ভারতীয় সাহিত্যে সাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা ভারতীয় ভাষা-সমূহ শিক্ষা করেন, অনুবাদের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেন, অথবা ভারতীয়বিদ্যাবিশারদগণের বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় লিখিত পুস্তকাবলী পাঠ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্যই সামান্য। ভারতীয় কবি ও গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকাবলী সর্বাধিক পঠিত হয়; কবিবরের জার্মেণীভ্রমণ এখনও সকলে স্মরণ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ জার্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। 'ডাকঘর' প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক জার্মেণীতে অভিনীত হইয়াছে। ধনগোপাল মুখার্জি এবং আরও অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থকারদের পুস্তকাবলীও খুব পঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু জার্মাণ জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। জার্মাণ পার্লামেণ্টে ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলিতে সহানুভূতিসূচক শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। পরলোকগত মহাত্মার স্মরণে টুবিঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভা আহূত হইয়াছিল; উহাতে প্রবন্ধকার গান্ধীজির জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

যদিও জার্মেণী বিশাল স্থল ও জলভাগদ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি গত শতাব্দীর প্রথম পাদে যে সহানুভূতির বন্ধনে উভয় দেশ সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহাই গুণগ্রাহিতা ও সখ্য-সূত্রে পরস্পরকে সম্মিলিত রাখিবে। আত্মার নিকট দূরত্ব কিছুই নয়। জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

'দূরস্থোঽপি ন দূরস্থঃ স্বজনানাং সুহৃজ্জনঃ।
চন্দ্রঃ কুমুদখণ্ডানাং দূরস্থোঽপি প্রবোধকঃ॥'

অর্থাৎ, দূরস্থ হইলেও বন্ধু বন্ধুর নিকট হইতে দূরবর্তী হয় না; চন্দ্র অতি দূরবর্তী থাকিলেও রাত্রির পদ্মকে বিকশিত করে।

জাগৃহি মাতঃ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

রিক্ত হ'য়ে এলে আজ, বেদনায় মলিন আনন,
মাতৃত্বের দীপ্তি নাই বুঝি তব ব্যথিত হৃদয়ে !
কোটি কোটি পুত্র তব আর্ত্তস্বরে করিছে ক্রন্দন,
সান্ত্বনার ভাষাহারা আজি তুমি জননি অভয়ে !

অজস্র সম্পদ তব, প্রাণভরা স্নেহরসধারা—
কোথা হ'ল অবলুপ্ত ! কোথা সেই করুণা অপার !
তোমার ভুবন যেন ধূধূ করে ঊষর সাহারা,
কোথাও যে আলো নাই, ঘিরে আছে কালো অন্ধকার !

দুর্গত বিপন্ন যত ভিড় ক'রে আছে চারিপাশে,
তোমার অভয়পদে জনে জনে আকুতি জানায়,
শুধু তব চক্ষু ভ'রি দর দর অশ্রু বেয়ে আসে,
আমাদেরি মত তুমি আজি হ'লে এত অসহায় !

দেবে না ক্ষুধার অন্ন দীনভাগ্য নিরন্নের মুখে ?
দেবে না আশ্রয় তব সর্বহারা নিরাশ্রয় জনে ?
ল'বে না আদর ক'রে অনাদৃত পুত্রদের বুকে ?
দেবে না চরণছায়া সুখশান্তি-বিহীন জীবনে ?

অসীম অনন্ত তুমি, বিশ্বাতীত স্বরূপ তোমার,
নির্বিকার, নিরালম্ব সত্তা মাত্র—কোথা সে ধারণা !
দুর্গমে পতিত পুত্র বোঝে না সে রূপ-নিরাকার,
তোমারে লভিতে মাগো, নাহি শক্তি, নাহি সে সাধনা !

বুকে বুকে এস তুমি রূপময়ী, হেমকিরীটিনী,
দাও স্নেহ বরাভয় দশভুজ ক'রি প্রসারণ,
দুর্গমে কর মা রক্ষা, জীবধাত্রি, জগৎরূপিণি,
কর প্রাণ-পরিব্যাপ্ত জীর্ণ রিক্ত জগৎ-জীবন।

মিথ্যায় এ অন্ধকারে আনো তব সত্যতম জ্যোতি,
মরুবক্ষে ঢেলে দাও তৃষাহারী শান্তিবারি সুধা !
কদর্য্যতা ঊর্দ্ধে আনো মহিমা ও সুষমা শাশ্বতী,
জাগৃহি জাগৃহি মাতঃ, দুঃখভারে কাঁদিছে বসুধা।

বিশাখা মৃগারমাতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

শ্রাবস্তিপুর নগরীতে পূর্ব্বারাম নামক এক অতি বিস্তৃত, বিচিত্র ও সুসজ্জিত উদ্যানবাটিকা ছিল। কিংবদন্তী আছে, এই নগরীর এক বিপুলবিত্তশালিনী, সাধ্বী, দানশীলা মহিলা, নাম বিশাখা মৃগারমাতা, প্রভূত অর্থব্যয়ে এই উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃ মাতৃদত্ত নাম ছিল বিশাখা, কিন্তু কোশলরাজ্যের প্রজাগণ, কি ধনী কি দীনদুঃখী—যাহাদের তিনি মাতৃস্বরূপা ছিলেন, তাঁহাকে বিশাখা মৃগারমাতা বলিয়া ডাকিত। কোশলরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মৃগধর তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। বংশমর্য্যাদায় এই কন্যা তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলেও, তাঁহার পরম শুভবুদ্ধি, অপূর্ব্ব কৌশল, সর্ব্বকার্য্যে নিপুণতা ও অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া সংসারাভিজ্ঞ মৃগধর তাঁহাকে পুত্রবধূ করিয়া গৃহে আনিলেন। তিনি অপরিসীম স্নেহে কন্যানির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিতেন ও 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। এইজন্য তাঁহার নাম মৃগারমাতা বা মৃগধর-মাতা হইয়াছিল। রাজকার্য্য-পরিচালনায় সদা ব্যস্ত, ক্লান্ত, চিন্তাকুল, চির-অন্যমনস্ক মৃগধরকে এই মাতৃস্নেহপ্রবণা বধূ পুত্রের মত যত্ন ও সেবা করিতেন এবং সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চাহিতে না চাহিতে হাতের নিকট যোগাইয়া দিতেন। সবার উপর, তিনি এই ভোলানাথ শ্বশুরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। এই বধূর শুভবুদ্ধির উপর মৃগধরের এত প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে কূট রাজনৈতিক বিষয়েও সময়ে সময়ে তিনি তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতেন এবং বধূর বুদ্ধিমত্তায় প্রীত হইতেন। ধার্ম্মিক-প্রবর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রবীণ বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পুত্রবধূর মধুর স্বভাব, সদ্‌বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন, আদর করিয়া তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিতেন এবং ভগিনীর মতই মর্য্যাদা দিতেন ও যত্ন করিতেন। একবার রাজা অসুস্থ হইলে তাঁহার সেবার জন্য নিপুণ শুশ্রূষাকারী পাওয়া না যাওয়ায় তিনি তাঁহার এই 'ভগিনী'কে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া এই বিশ্বস্ত কার্য্যের ভার দিলেন। বিশাখার অতুলনীয় যত্নে, সাবধানতায় ও নিপুণ হস্তের শুশ্রূষায় রাজার রোগযন্ত্রণার লাঘব হইত এবং তাঁহারই মুখে রাজা রাজ্যের যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ পাইতেন। রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি সে সকলের যথাযথ ব্যবস্থা করিতেন। পরে বিশাখার অক্লান্ত সেবায় তিনি সুস্থ হইলেন। তখনকার দিনে কোশলরাজ্যে বিশাখার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল; তিনি নির্লোভ, সুচরিতা ও নম্র ছিলেন বলিয়া কাহারও কখনও অনিষ্ট চিন্তা করিতেন না এবং এই প্রতিপত্তি স্বীয় স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করিতেন না। পুত্রবধূ শ্বশুরের মাতা বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিতা ছিলেন? ইহা অপেক্ষা বধূর ভক্তিশ্রদ্ধার ও শ্বশুরের অসীম স্নেহের আর বেশী কি পরিচয় হইতে পারে? রত্নপ্রসূ ভারতমাতার অশেষ গুণবতী এই অনুপমা মনস্বিনী কন্যার কথা অনেকেই জানেন না। ইংরেজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

'আঁধার অতল মহাসাগর-গহ্বরে কত রাজে পূত
স্নিগ্ধদ্যুতি মণি,
অলক্ষ্যে কুসুম কত ফুটি' করে অপচয় মরুবায়ে
সুরভির খনি।'*

বিশাখা শ্রীবুদ্ধের প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য অত অর্থব্যয় করিয়া মনোরম উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীবুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিপুরে আসিতেন তখন তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত জেতবন অনাথপিণ্ডদারামেই সাধারণতঃ থাকিতেন, লোকালয়ে বাস করিতেন না। কিন্তু পূতশীলা বিশাখার আমন্ত্রণে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ মাঝে মাঝে পূর্ব্বারামে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তখন যাহাতে কোলাহল না হয় সেইজন্য বিশাখা সেদিক পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানবাটিকার সুদূর এক কোণে পরিচারিকার মত অবস্থান করিয়া নিঃশব্দে প্রভুর সেবা করিতেন। বিশাখা বৌদ্ধধর্ম্মের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

একবার ভগবান বুদ্ধ পূর্ব্বারামে ভিক্ষুগণের সহিত বিহার করিতেছেন এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে বিশাখা আর্দ্রবস্ত্রে স্বীয় দেহ ও সিক্ত আলুলায়িত কুন্তল আবৃত করিয়া ম্লানমুখে শ্লথগতিতে আসিয়া বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামানন্তর একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ধ্যানস্তিমিতলোচন প্রভু একবার নিমেষের জন্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া সুদূর শূন্যের দিকে চাহিয়া স্নেহমধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিশাখা মৃগারমাতা, এই মধ্যাহ্ন সময়ে সিক্তবস্ত্রে ও সিক্তকেশে তোমার এখানে আসিবার কারণ কি?" বিশাখা উদ্গত রুদ্ধ বাষ্পের বেগ অতিকষ্টে সংযত করিয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন "ভন্তে, আজ আমার প্রিয়তম একমাত্র পৌত্র আমাদিগকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করিয়াছে, তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্নানান্তে আপনার দুঃখহরণ পাদমূলে শান্তিলাভের জন্য আসিলাম, অন্তঃপুরে যাইবার ইচ্ছা হইল না।" এইকথা শুনিয়া বুদ্ধদেব কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিশাখা মৃগারমাতা, তুমি কি তোমার পৌত্রকে খুব ভালবাসিতে?"

বিশাখা। ভন্তে, হাঁ, সে আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছিল।

শ্রীবুদ্ধ। বিশাখা মৃগারমাতা, এই শ্রাবস্তিপুরে যত অধিবাসী আছে তাহারা সকলে যদি তোমার পৌত্র-পৌত্রী হয়, তাহা হইলে কি তুমি তাহা চাও?

বিশাখা। ভন্তে, হাঁ, আমি তাহা চাই; তাহাদের স্নেহলাভে আমি কৃতার্থ হইব।

শ্রীবুদ্ধ। বিশাখা মৃগারমাতা, এই জনবহুল রাজধানীতে প্রত্যহ কতজন লোক প্রাণত্যাগ করে?

বিশাখা। ভন্তে, তা কোন দিন বার জন, কোন দিন দশ জন, কোন দিন আট জন, কোনও দিন বা একজন মারা যায়, আবার কোন দিন একজনও মরে না।

শ্রীবুদ্ধ। বেশ, বিশাখা মৃগারমাতা, এখন যদি শ্রাবস্তিপুরের সকল অধিবাসী তোমার পৌত্র-

* 'Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.'
—Gray's 'Elegy'

পৌত্রী হয়, তবে তুমি কখন সিক্ত বস্ত্র ও সিক্ত কেশ শুকাইবার সময় পাইবে ?

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী বিশাখা এই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চকিত ও মুহূর্ত্তের মধ্যে অবহিত হইলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া নতশিরে স্বপ্নোত্থিতের মত ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভন্তে, সত্যই সে অবস্থা বড় বিসদৃশ হইবে। অবশ্যম্ভাবী এই সম্ভাবনা জানিয়াও সত্যবিয়োগ-বিধুর আমার মাতৃহৃদয় স্নেহলাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিল।"

শান্ত করুণ দৃষ্টিতে বিশাখার তাপদগ্ধ খিন্ন হৃদয়কে শীতল শান্তিধারায় অভিষিঞ্চিত করিয়া ভগবান শ্রীবুদ্ধ বলিলেন "তবেই দেখ, বিশাখা মৃগারমাতা, যদি তোমার একশত প্রিয়জন থাকে তবে তোমার একশত দুঃখ, যদি তোমার নব্বইটী প্রিয়জন থাকে তবে নব্বইটী দুঃখ, যদি আশিটী প্রিয়জন থাকে তবে আশিটী দুঃখ, এইরূপে যদি একটী প্রিয়জন থাকে তবে একটী দুঃখ থাকিবে। আর যদি কোনও প্রিয়জন না থাকে তবে তোমার কোনও দুঃখই থাকিবে না। যাহার কিছুতেই আসক্তি নাই, তাহার কোনও শোক-দুঃখ নাই। মমত্বই যত দুঃখের মূল; শোক, অশ্রু, আঘাত, প্রতিঘাত, প্রভাব, পরাভব, প্রিয়তা এ সকলই দুঃখের আকর। দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অনাসক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা চেষ্টাসাপেক্ষ। এই বলিয়া ভগবান শ্রীবুদ্ধ নীরব হইলেন।

তখন বিশাখা ঋজু হইয়া বসিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন—"ভন্তে, ইহা অবধারিত সত্য।"

উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নীল আকাশের পানে তাকাইয়া যেন সুদূর মহাশূন্যের রহস্য গ্রহণ করিতে করিতে চিরপ্রসন্নমুখ ভগবান এই অমৃতময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন—

শোকের আগার এই সংসার সমুদ্রে, ক্ষোভে
　　প্রিয়জনে দিয়ে বিসর্জ্জন,
চারিদিক শূন্য হেরি প্রেমের নিগড়ে বদ্ধ
　　করে জীব কতই ক্রন্দন।
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্র প্রেম পরিহরি, আর কভু
　　না জড়ায়ে মোহের বন্ধনে,
অশেষ যতনে কর অনবদ্য শ্রেয়োলাভ,
　　বরি লহ নির্ব্বাণ-রতনে।'

পীযূষনিস্যন্দী এই বাক্যে বিচ্ছেদক্লিষ্ট মনকে অভিষিক্ত ও সঞ্জীবিত করিয়া সংযমশালিনী বিশাখা ধীরে ধীরে উঠিয়া সন্তর্পণে ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নিঃশব্দে দৃঢ়পদক্ষেপে রেখাহীন শান্তমুখে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

"অজ্ঞানই আত্মার বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি—জ্ঞানোদয়েই উহার নাশ হইবে, আমাদিগকে এই অন্ধতমের অপর পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞানলাভের উপায় কি ? ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা এবং সর্ব্বভূতকে ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্ব্বভূতে প্রেমদ্বারা সেই জ্ঞানলাভ হয়। ঈশ্বরে পরানুরক্তিবলে জ্ঞান উদয় হইবে—অজ্ঞান দূরীভূত হইবে—সকল বন্ধন খসিয়া যাইবে ও আত্মা মুক্তিলাভ করিবেন।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের কথা

স্বামী সিদ্ধানন্দ

লাটু মহারাজ নাম-মাহাত্ম্যের উপর বিশেষ জোর দিতেন। বল্‌তেন, 'কলিযুগে কেবল নামের দ্বারা শীঘ্র চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়, যার দ্বারা লোকে শ্রীভগবানকে বুঝতে পারে।' এযুগে নামই সব চেয়ে সহজ পন্থা বলে তিনি নির্দ্দেশ করতেন।

'কায়মনোবাক্যে কারুর অনিষ্ট না করলেও সত্যিকারের সৎকাজ করা হয় এবং তাতে ভগবান প্রসন্ন হন।'

'অন্নবস্ত্রের সংস্থানে অবহেলা করতে নেই। পেটে দুটি ভাত না পড়লে আবার ধর্ম্ম হবে কি করে? কুড়ের কি সহজে ধর্ম্ম হয় রে?'

ভক্তদের উপলক্ষ করে লাটু মহারাজ বলতেন, 'সাধনপথে যারা যাবে ঈশ্বর স্বয়ং তাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যে যে রকমটি এগুবে তার ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা। কৃপার হাওয়া তাদের জন্য সব সময় বইছে।'

'কাউকে প্রবঞ্চনা করতে নেই। নিজের উপর এসে পড়ে। শঠতার মত পাপী কি আর আছে? আগে থেকে সাবধান না হলে পরে ভুগতে হয়।'

সাধকদের লক্ষ্য করে লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "সংসারে কেউ কাউকে শান্তি দিতে পারে না; নিতান্ত আপন জনও না। তা' পারলে লোকে আর কোন দুঃখে সন্ন্যাস নিত? সাধুসন্ন্যাসীরা এটা বুঝতে পেরে নিজের শান্তি নিজেরাই খোঁজে। তাঁদের শান্তিলাভ না হলে আর দশজনের কল্যাণ হয়। স্বামীজি বলতেন, 'বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়'।"

লাটু মহারাজ গোপীদের প্রেমের কথা খুব জোর দিয়ে বল্‌তেন। এরূপ অবস্থা খুব কম সাধকের হয়। 'শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া গোপীরা সব কুল, মান কিছুই জানতেন না।' নিঃস্বার্থ প্রেমের কথা বললে মহারাজ রাগ করতেন, বলতেন, 'প্রেম কি সোজা কথা, চারটি খানি জিনিষ?' ঠিক ঠিক প্রেম মহাপ্রভুর হয়েছিল।'

'জীবে দয়াই হ'ল ধর্ম্ম। জীবের প্রাণে কখনও আঘাত দেওয়া অনুচিত। জীবকে ভালবাসতে বাসতেই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব আসে। তখন ধর্ম্ম কি জিনিষ বুঝা যায়।'

লাটু মহারাজ স্নেহ-প্রীতি সম্বন্ধে ভক্তদের উপদেশ দিতেন। বলতেন, বিষয়ীদের স্নেহ স্বার্থমেশান ও লোকদেখান। কোন আশা না রেখে যে স্নেহ করে তার উপর ভগবানের খুব দয়া বল্‌তে হবে। বিষয়ীদের স্বার্থ ছাড়া কোন কথা নেই।' এজন্য তিনি সাধুদের বিষয়ীদের সঙ্গে মিশতে বারণ করতেন।

লাটু মহারাজ গুরুভক্তির উপর খুব জোর দিতেন। 'গুরুই সব।'

'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না। যুবা বয়সে নিয়মমত ধ্যান-জপ অভ্যাস না করলে বুড়ো বয়সে সহজে কিছু হয় না। ত্রিশ বছরের পর থেকে সব তেজ কম্‌তে থাকে। যা হবার তা এর মধ্যে হয়।'

জনৈক ভক্ত লাটু মহারাজের কাছে আসা

যাওয়া করতেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন। সন্ধ্যার পর অথবা রাত্রিতে মহারাজের কাছে অমূল্য উপদেশ শুনে মুগ্ধ হতেন। এক এক দিন রাত্রি ১১টা হয়ে যেত। এত রাত্রিতে ভক্তটির বাসায় যাওয়া তাঁর স্ত্রী পছন্দ করতেন না। হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বাসা বদলাবার ব্যবস্থা করলেন। মহারাজ বাসা বদলানর কথা শুনে বললেন, 'ডাক্তারের স্ত্রীর মনে সন্দেহ হয়েছে তাঁর স্বামীকে পাছে সন্ন্যাসী করে ফেলি।'

বাসা বদল হওয়ায় অনেক দূর থেকে ভক্তটি নিয়মমত মহারাজের নিকট আসতে পারতেন না। তার কিছুদিন পরে হঠাৎ ভক্তটির স্ত্রী মারা যান। মহারাজ খুব দুঃখ করতে লাগলেন, 'এও ভগবানের এক খেলা।'

লাটু মহারাজ অন্য সম্প্রদায়ের সাধুদের খুব সম্মান দিতেন। কোন সাধু ভিক্ষার্থী হয়ে আসলে খুব যত্ন করে সেবা করতেন। অসময়ে আসলে সেবক হয়ত খুব বিরক্ত হ'ত। সেজন্য তিনি তাঁদের আগের থেকে একটু জানিয়ে দিতে বলতেন। তা হলে ব্যবস্থা করে রাখা হতো। লাটু মহারাজ বলতেন, 'আমি বৈদ্যনাথ থেকে চিড়ে আনিয়ে রেখে দিয়েছি। কেউ অসময়ে আসলে চিড়ে খেতে দি। এতে পেট ভরে, পেট ঠাণ্ডাও থাকে। সাধু-সেবা, ভক্তসেবা—বিশেষ করে এই কাশীধাম!' 'বিশেষ কাশীতে' এই কথা খুব বলতেন।

'শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে খুব অন্তর থেকে প্রার্থনা করতে হয়, অন্ততঃ ঘুম থেকে উঠবার সময় আর রাত্রে ঘুমতে যাবার সময়। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ঘুমুতে যাবার সময় খানিকটা স্মরণ-মনন বা নাম-জপ করে শোওয়া ভাল। তাতে সুনিদ্রা হয়, আর ঘুমের ভেতরও খানিকটা সাধন হয়ে যায়। ভোরবেলা উঠবার সময়ও মন খুব স্নিগ্ধ ও পবিত্র থাকে, সাধনভজনের অনুকূল হয়। একটু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সাধনভজন করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়, আর খুব কল্যাণ হয়। লোকে বলে সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করতে হয়।'

'বৈরাগ্য আসলে খুব শীঘ্র তাঁর দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। একমাত্র তিনি আছেন আর সব অসার, মিথ্যা—এই ভাব খুব দৃঢ়তার সঙ্গে অভ্যাস করতে করতে বৈরাগ্য এসে পড়ে, আর সংসারের ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি আসে। সব দু'দিনের এ জ্ঞান পাকা হ'লে জগৎটাকে দেখে ভয় হয়, আর ভগবানকে জানবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। ঠিক্ ঠিক্ বৈরাগ্য হয়েছিল বুদ্ধদেব, শঙ্কর, চৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের। এঁরাই সব আদর্শ।'

'যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলেছে। সব চিত্তকে শুদ্ধ করবার জন্য। শুদ্ধচিত্তে সত্য প্রতি-ফলিত হয়। এযুগে ব্রহ্মচর্য্য আর ধ্যান-জপের দ্বারা যোগের সব কাজ হয়। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারও গুরুদত্ত সাধনের দ্বারা নাশ হয়ে যায়। এযুগে সদ্গুরুর মহিমা খুব বেশী।'

"আন্তরিক যে ঈশ্বরকে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

অদ্বৈত বেদান্তের সারকথা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সর্ব্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা। অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে শঙ্করসম্প্রদায়-কর্তৃক অগণিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আচার্য্য শঙ্করের দুই প্রধান শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য ও সুরেশ্বরাচার্য্য হ'তে শাঙ্কর-বেদান্তের দু'টী ধারা নির্গত হ'য়েছে। শাঙ্কর-বেদান্তের পদ্মপাদ-ব্যাখ্যাত মতকে 'বিবরণ-প্রস্থান' বলে। বিবরণকার প্রকাশাত্ম-যতি পদ্মপাদ-বিরচিত 'পঞ্চপাদিকা'র অনুসরণ করেছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য 'বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় ভাষ্যবার্ত্তিক', 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি', 'ব্রহ্মসিদ্ধি', 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতকে 'বার্ত্তিক-প্রস্থান' বলা যায়। শারীরক-ভাষ্যের 'ভামতী'নামক টীকার রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র সুরেশ্বরাচার্য্যকে অনুসরণ করেছেন। কিছু মতভেদ দৃষ্ট হ'লেও উভয় আচার্য্যই মুখ্যতঃ অদ্বৈতবাদী। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হ'তে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে দুই শত আচার্য্যের আবির্ভাব হ'য়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন খ্যাতনামা অদ্বৈতবাদী আচার্য্যের নাম করা যাচ্ছে। এঁদের অতি সূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী দৃষ্টে বুঝা যায় এঁরা কিরূপ মহাজ্ঞানী ছিলেন। এ সকল আচার্য্য ভারতের অলঙ্কার-স্বরূপ এবং এঁদের গ্রন্থাবলী অমূল্য রত্ন। সর্ব্বজ্ঞাত্ম-মুনি, বোধঘনাচার্য্য, অবিমুক্তাত্ম ভগবান, বাচস্পতি মিশ্র, প্রকাশাত্মযতি, শ্রীহর্ষ, চিদ্বিলাস, আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর, জ্ঞানোত্তমাচার্য্য, চিৎসুখ, ভারতীতীর্থ, অমলানন্দ যতি, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর বা মাধবাচার্য্য, শঙ্করানন্দ, আনন্দ গিরি, নরেন্দ্র গিরি, প্রকাশানন্দ সরস্বতী, রঙ্গরাজ অধ্বরী, নৃসিংহ আশ্রম, অপ্পয় দীক্ষিত, সদানন্দ যোগীন্দ্র, রঙ্গোজী ভট্ট, সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র, মধুসূদন সরস্বতী, ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র প্রমুখ কতিপয় বিখ্যাত আচার্য্যের নাম পণ্ডিতসমাজে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে দ্বৈত ও ন্যায় মত খণ্ডনে শ্রীহর্ষরচিত 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্' নামক গ্রন্থকে প্রথম বলা যায়। ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ১৩শ শতাব্দীতে আবির্ভূত আচার্য্য চিৎসুখ-প্রণীত 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' একখানি প্রধান খণ্ডনগ্রন্থ। ১৬শ শতাব্দীর মধুসূদন সরস্বতী-কৃত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডন-গ্রন্থ। উক্ত আচার্য্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবরণপ্রস্থান অনুযায়ী এবং কেহ কেহ সুরেশ্বর-মতানুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর এরূপ অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন যে তাঁকে দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য বলা হয়। তাঁর রচিত 'পঞ্চদশী' অদ্বৈতবেদান্তের মুকুটমণি-স্বরূপ। মধুসূদন-কৃত 'গূঢ়ার্থদীপিকা' গীতার যাবতীয় টীকার শীর্ষস্থানীয়। এই টীকাতে একাধারে অদ্বৈতভাব ও ভক্তিবাদের সমন্বয়। এই হেতু শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান জ্ঞানঘনমূর্ত্তি স্বামী শিবানন্দজী তাঁর শিষ্যদের কাউকে কাউকে উক্ত 'গূঢ়ার্থদীপিকা' সহায়ে 'গীতা' পাঠ করতে উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর মতে অদ্বৈতবেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থ—(১) 'শারীরক-মীমাংসা' অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্ম-

সূত্র, (২) শঙ্কর-কৃত ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-ভাষ্য, (৩) বাচস্পতি মিশ্র-কৃত শঙ্করভাষ্যের 'ভামতী'-নাম্নী টীকা, (৪) অমলানন্দ যতি কৃত 'ভামতীর' টীকা 'কল্পতরু' এবং (৫) অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত 'কল্পতরু'র টীকা 'পরিমল'।

ইতিহাস-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে এখন আমরা অদ্বৈত-বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করব। যে সকল ব্যক্তির দেহ-বুদ্ধি প্রবল, তাঁরা অবশ্যই প্রাথমিক অধিকারী। তাঁরা দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন। যাঁরা দেহটাকে অতি অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন, দেহ কখনও আত্মা হ'তে পারে না বুঝতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন মধ্যম অধিকারী এবং যাঁরা 'সোঽহং' বাক্যের মর্ম্ম ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ তাঁরাই উত্তম অধিকারী। অদ্বৈতবেদান্ত তাঁদের পক্ষেই উপযোগী। এই অদ্বৈতবাদ যোগবাশিষ্ঠেও ব্যাখ্যাত হয়েছে, অতএব এই বাদ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ও ব্যাসসম্মত। আচার্য্য শঙ্কর এই সুপ্রাচীন অদ্বৈত-মতের একরূপ প্রথম ব্যাখ্যাতা ব'লে তাঁর মতই পরম প্রমাণ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ উপনিষদের সার,—সুতরাং অদ্বৈতবাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ হিসাবে বেদেও গৃহীত একথা বলা যায়। শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে সকল সগুণত্ব-বোধক বাক্য আছে, সেগুলি অবশ্যই মধ্যমাদি অধিকারীদের জন্য। এই দ্বৈতবোধক বাক্যগুলির সার্থকতা এই যে—দ্বৈত-জ্ঞান ব্যতীত'ত অদ্বৈতজ্ঞান সম্ভব হয় না; এই জন্য ঐগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বা অদ্বৈতবাদের বিরোধী বলা যায় না। অতএব দ্বৈত যেন অদ্বৈতসৌধে উঠবার প্রথম সোপান। এই হেতু পৃথক্ পৃথক্ বাদ নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। মানুষের যতক্ষণ দেহাত্মবোধ প্রবল, ততক্ষণ সে ত দ্বৈত-স্তরে থাকবেই এবং বেদান্তবিচার ও সাধনা দ্বারা তাকে ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতস্তরে উঠতে হবে। জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ—এ'ত পারমার্থিক নয়, এ ত ঔপাধিক। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ হ'য়েও উপাধিযোগে তিনি সগুণ ঈশ্বর ও সসীম জীব হয়েছেন। আমরা মন দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, কিন্তু মন যখন অ-মন হয়,—অবশ্য সমাধি-অবস্থায়—তখন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। এই অদ্বৈতই পারমার্থিক সত্য। পূর্ণসত্ত্বাপ্লুতবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "অদ্বৈতভাব শেষ কথা জান্‌বি, এ বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়। মনবুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্য্যন্ত বলা ও বুঝা যায়। তখন নিত্য লীলা দুইই সত্য। বিষয়বুদ্ধিপ্রবণ সাধারণ মানুষের পক্ষে দ্বৈতভাব।" জগৎ মনোময় ও মিথ্যা হ'লেও এর ব্যবহারিক সত্তা আছে, জগৎটি প্রবাহরূপে নিত্য। এই অধ্যাস বা একমাত্র ব্রহ্মে জীব ও জগতের আরোপ অনাদি ও অনন্ত। যে সাধকের নিকট এই অধ্যাস আর থাকে না, তিনি তখন ব্রহ্মস্বরূপ হন। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই জিজ্ঞাসার অধিকারী হ'তে হলে চাই চারটী সাধন-সম্পদ, যথা (১) কোন্‌টী নিত্য ও কোন্‌টী অনিত্য এর বিবেক, (২) ইহলোকের বা পরলোকের ভোগ্য-বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ ছয়টী গুণ এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হ'বার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত। আত্মা নিজ মায়ায় নিজেকে বদ্ধ ক'রে মনে করেন তিনি যেন কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী ইত্যাদি। এই ভ্রান্তিমোচনের নাম মোক্ষ। মানুষ যে 'আমি' 'আমি' করে, এই বোধটা মনের একটা বৃত্তিমাত্র। এ মুখ্য আত্মা নয়। মুখ্য আত্মা ঐ অহংবোধের দ্রষ্টা বা সাক্ষী। মানুষ মরলে স্থূল শরীরের উপর মমতা দূর হ'লেও হ'তে

পারে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের অভিমান ঠিকই থেকে যায়। উপাধিবিমুক্ত আত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ। একই আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি-বশতঃ ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি বলা হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা দেহাদি উপাধি হেতু জীবাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি অভিহিত হন। জীব যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে সতের অভ্যন্তরে লীন হয়, আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সুষুপ্তিতে জীবের অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি সূক্ষ্মভাবে থাকে ব'লে সেই অজ্ঞান-হেতু জীব পুনরায় ব্যবহারিক জগতে জাগ্রত থাকে। জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লীন হ'লেও অজ্ঞান-আবরণে আবৃত থাকায় নিজ স্বাতন্ত্র্য হারায় না। মুক্তির অবস্থায় জল-রাশিতে জলবিন্দুর ন্যায় জীব ও ব্রহ্ম এক হ'য়ে যান। নিদ্রায় ইন্দ্রিয়সকল যখন নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু মন কার্য্যকরী থাকে, তখন ঐ মনরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবের স্বপ্নাবস্থায় স্থিতি বলা হয়। জীব স্বভাবতঃই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাকে চেষ্টা ক'রে ব্রহ্ম হ'তে হয় না। উপাধি-গুলিই জীবত্ববোধের কারণ। যতদিন না মুক্তি হয় বা জীববুদ্ধি নষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ জন্ম এবং সংস্কার-রাশি নিয়ে দেহান্তরপ্রাপ্তি হ'তে থাকে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাবী জন্মের চিত্র তার মনে উদিত হয়। জীবাত্মা পরমার্থতঃ বিভুই বটে, তবে বুদ্ধির সাহচর্য্যে তাকে 'অণু'ও বলা চলে। যেমন একই সূর্য্য দর্পণে যত উজ্জ্বলভাবে প্রতি-বিম্বিত হয়, কাংস্যপাত্রে তত হয় না, সেইরূপ একই পরমাত্মা সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিবিম্বিত হ'লেও প্রতিবিম্বাধারে চিত্তের উৎকর্ষ, অপকর্ষ অনুসারে তাঁর প্রকাশের তারতম্য হয়। এইজন্য কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বদ্ধ, যে মুক্ত জলস্থ প্রতিবিম্বিত সূর্য্য জলকম্পনে কম্পান্বিত ব'লে মনে হ'লেও প্রকৃত সূর্য্য যেরূপ কম্পিত হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণ-রূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত জীবাত্মার দুঃখভোগ হ'লেও বিম্বস্থানীয় পরমাত্মার কোনই দুঃখ হয় না। যেমন এক জলপাত্রের সূর্য্য প্রতিবিম্বের কম্পনে অন্য পাত্রস্থ প্রতি-বিম্বিত সূর্য্যের কম্পন হয় না, সেইরূপ এক জীবের কর্ম্মফল অন্য জীব ভোগ করে না। মূলতঃ আত্মা এক হ'লেও অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি-ভেদে আত্মা বহু। সেইজন্য একের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সহিত অপরের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের কোন গোল বাধিবার উপায় নেই। যেমন সূর্য্য এক হ'লেও অগণিত জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু সূর্য্য ব'লে ভ্রম হয়, সেইরূপ আত্মা পরমার্থতঃ এক হ'লেও উপাধি-জন্য প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন ব'লে মনে হয়। ব্রহ্ম দেহাদি-উপাধিযোগে বহু এবং বিকৃত ব'লে মনে হ'লেও যে বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক, অবিকৃতই থাকেন—একথা বুঝাবার জন্যই বেদান্ত প্রতি-বিম্বের উদাহরণ দিয়েছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জীবের উপাধি লয় পায়।

জীবাত্মা সম্বন্ধে বেদান্তের উপদেশ সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল, এখন পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদান্ত কি বলেন দেখা যাক্। যাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, যাঁতে স্থিতি ও প্রলয় কালে যাঁর মধ্যে এই জগৎ বিলীন হয় সেই পরম কারণই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম বস্তু কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নি, অর্থাৎ কেউ ভাষা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হয় নি। শাস্ত্র ব্রহ্মসম্বন্ধে একটা আভাস দেন মাত্র। যা' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ যাঁর স্বরূপে এক ছাড়া দুই থাকে না, তাই ভূমা। এই ভূমা নিত্য ও অমৃত। যা' সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বত্র একই রূপে থাকে, তাকে সত্য পদার্থ বলে।

যা' কখন থাকে, কখন থাকে না, তাই মিথ্যা। এই হিসেবে অর্থাৎ চিরকাল অবিকৃতরূপে থাকে না ব'লে জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মবস্তুর কোন তুলনাও নেই। আমরা আকাশকেই খুব ব্যাপক ব'লে দেখি, তাই দুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ ধারণা করার জন্য সহজসাধ্য ঐ আকাশের সহিত ব্রহ্মের তুলনা দিয়ে থাকি। ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ব্রহ্ম অবশ্যই তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হন এবং তা'হলে ব্রহ্মের সর্ব্ব-ব্যাপিত্বের হানি হয়। যা দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাই অসৎ। যে বস্তু কখন থাকে, কখন থাকে না, তাকে কালপরিচ্ছিন্ন বলে। যা' সকল স্থানে বর্ত্তমান থাকতে পারে না, তাকে দেশপরিচ্ছিন্ন বলে এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদকে বস্তুপরিচ্ছেদ বলে। যার কোন প্রকার পরিচ্ছেদ নেই তা'ই পারমার্থিক সৎ—ব্রহ্ম। এই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের মায়ানাম্নী এক অনির্ব্বচনীয়া শক্তি আছে। এই শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতীয়মান হন। শক্তির নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্ম সৃষ্টি করতে সমর্থ হন না। এই শক্তিকে আশ্রয় ক'রেই ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। শক্তি হ'তে পৃথক্‌ভাবে ব্রহ্মকে দেখলে তিনি সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণবিহীন, তখন তিনি কেবল, অদ্বৈত ও নির্গুণ।

মায়াশক্তি-সহযোগে ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীয়মান হ'ন বলে, তিনি এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। তাঁর চেতন সত্তা নিমিত্ত কারণ ও মায়া উপাদান কারণ। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, এই অনাদি প্রবাহে পর পর যে সৃষ্টি হয়, তা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। প্রলয়ে কোন বস্তুর আত্যন্তিক লয় হয় না, সবই বীজ-রূপে মায়ায় লীন থাকে, আবার কল্পারম্ভে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। তবে এ সবই মায়িক, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি। মায়াশক্তি পরমাত্মার স্বভাব। এই স্বভাবের সহিত তিনি একীভূত। এই স্বভাবের বশে জগতের উৎপত্তি। যে বস্তুর যা স্বভাব, সেই স্বভাবের অভাবে সেই বস্তুর অস্তিত্বই অসিদ্ধ হয়। মায়াশক্তি-রূপ পরমেশ্বরের স্বভাবের অভাবে আমরা তাঁকে ধারণাই করতে পারি না। স্বভাবের বশে যে সৃষ্টি, তার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের প্রশ্ন হতেই পারে না। সৃষ্টি পরমাত্মার মিথ্যা পরিণাম অর্থাৎ বিবর্ত্ত; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি। জগৎ দেখ্‌ছি তাই আছে, কিন্তু আছে ব'লে দেখ্‌ছি না—অদ্বৈতবাদের এটাই সিদ্ধান্ত।

যিনি জ্ঞানলাভ করেন তিনি জীবন্মুক্তরূপে প্রারব্ধকর্ম্ম জন্য জীবিত থাকেন, তাঁর সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমুদয় নষ্ট হ'য়ে যায়, দেহান্তে বিদেহ মুক্তি লাভ করেন। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে অন্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন—ইহাই ক্রমমুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে দেহ হ'তে বহির্গত হওয়া বা কোথাও গমন করা উভয়ই নিষ্প্রয়োজন।

দুটী লোকের মনের অবস্থা, রুচি, সামর্থ্য ইত্যাদি যখন একরূপ নয়, তখন উভয়ের সাধনপ্রণালীতেও অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তবে অন্তিমে উভয়েই অদ্বৈত অবস্থা লাভ করবে সাধনেচ্ছুকে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হ'তে হয়। ব্রহ্মজ্ঞের পুনর্জন্ম নেই। তবে যে সমস্ত ঋষির পুনর্জন্মের কথা শুনা যায় তাঁরা এক একটা অধিকার বা উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ অধিকার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা জীবন্মুক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকেন। তাঁদের ঐ অধিকার প্রারব্ধ কর্ম্মের ন্যায়। এরূপ জন্মগ্রহণে তাঁদের কোন বন্ধন হ'তে পারে না। অধিকার শেষ হ'লে তাঁরা কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

যাঁরা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরতুল্য হন, তাঁরা জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাপার ছাড়া অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ কর্‌তে পারেন, পরে তাঁরাও মুক্তিলাভ করেন। যাঁরা অদ্বয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন, তাঁরা কেবল হন। উপাধির অপগমে যে আত্মা সে-ই পরমাত্মা। জলে জল মিশে যাওয়ার ন্যায় আত্মা ও শুদ্ধ ব্রহ্ম এক হ'য়ে যান। এইটি পরিপূর্ণতা লাভ। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞানই দুঃখের কারণ এবং পূর্ণ-স্বরূপের অনুভবই চরম সুখ।

অদ্বৈতবেদান্ত-মতে সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ এবং মায়াতীত। যখন তিনি মায়াশ্রিত হন, তখন তিনি সগুণ। মায়াবশতঃ তিনি পাশ-বদ্ধ হ'য়ে জীব হন। পাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে পুনরায় শিব হওয়াই বদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবরূপী শিবের জীবন্মুক্তি লাভ করাই তাঁর দেহধারণের উদ্দেশ্য। সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত ব্রহ্ম ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত জীব বা আত্মা একই। মায়ার শুদ্ধ সত্ত্ব গুণে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই মায়াধীশ ঈশ্বর—জগৎপতি, এবং মলিন সত্ত্বগুণে বা অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই মায়াধীন জীব। বেদান্তের উদ্দেশ্য জীবের স্বীয় আনন্দস্বরূপ লাভ। এ অবস্থা নির্ব্বিকল্প-সমাধিলভ্য, তখন ব্রহ্মানুভূতি হচ্ছে এরূপ জ্ঞান থাকে না, কারণ তখন অনুভবকর্ত্তা আর থাকে না। তবে সবিকল্প সমাধিকালে আনন্দের অনুভব হয়। শরীরধারী ব্যক্তির বন্ধভ্রমের অভাবই জীবন্মুক্তি। প্রারব্ধের ভেদবশতঃ জ্ঞানী জীবন্মুক্তগণের ব্যবহার নানাপ্রকার হয়। নিজ স্বরূপের অজ্ঞানকেই দুঃখের হেতু বলা হয়। সেই স্বরূপের অজ্ঞান স্বরূপের জ্ঞান ব্যতীত দূরীভূত হয় না। জীবন্মুক্তগণ এই স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করলেও ব্যবহারকালে কখন কখন আত্মবিস্মৃত হন, নচেৎ ভোজনাদি ব্যবহার তাঁদের সম্ভব হয় না। তবে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ঘট্‌লে যে আনন্দবোধ হয়, এটা যে তাঁর স্বরূপাতিরিক্ত কিছু নয় এই বোধ জীবন্মুক্তের থাকে। বিষয়ে আনন্দ নেই, আত্মার স্বরূপ আনন্দ, তাঁর দ্বারাই সকল বস্তু আনন্দযুক্ত অর্থাৎ প্রিয় হয়। প্রতিবিম্ব হিসাবে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ থাক্‌লেও চৈতন্যাংশে জীব ও ঈশ্বরে ভেদ নেই। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ধর্ম্ম ও জীবের অল্পজ্ঞত্ব ধর্ম্ম বাদ দিলে এক শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্ম জ্ঞানের অগোচর। তাঁকে জানার অর্থ ব্রহ্ম হওয়া। তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ; তিনি কখনও জ্ঞেয় হ'তে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ—তুমি যে ব্রহ্ম তাই হওয়া অর্থাৎ উপাধিমুক্ত হ'য়ে স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করা। বেদান্ত আলোচনার এইটিই উদ্দেশ্য এবং বেদান্তের সার কথা হচ্ছে—

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

ফুল

শ্রীমণিরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটে ফুল তাহে ভক্ত পূজে দেবতায়,
বিলাসী বিলাস তরে যতন দেখায়,
শুকনা পূজার ফুল মাথে স্থান পায়,
বিলাসীর বাসী ফুল পথেতে লুটায়।

বেদ ও উপনিষদের আদর্শ

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, সাহিত্যবিনোদ

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বেদ ও উপনিষদের যুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ যুগ বলা চলে। নানাক্ষেত্রে জীবনের এমন সম্যক্ বিকাশ আর অন্য কোন যুগে দেখা যায় না। তাই আজ পর্য্যন্তও আমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম্ম, রীতিনীতি ও অনুশাসনে কোথাও ত্রুটি দেখিলে আমরা বেদ ও উপনিষদের যুগের উল্লেখ করিয়া থাকি।

বেদশব্দ 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিদ্ ধাতুর অর্থ হইতেছে জানা। সুতরাং বেদ-অর্থে জ্ঞান বুঝায়। সেই লৌকিক ও পারমার্থিক সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার যাহা ভারতীয় ঋষির ধ্যানযোগে প্রকটিত হইয়াছে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, যাহা অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহের সহিত একত্র একভাবে স্থির হইয়া আছে, তাহাই বেদপদবাচ্য। এক কথায় বেদ ভারতীয় ঋষির উপলব্ধ সত্য। বেদব্যাস বেদসমূহকে বিভাগ করিয়া শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। বেদব্যাস বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে সমস্ত ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র-রূপ মন্ত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরসংযোগে আবৃত্তি করা হইত, তাহাদের নাম ঋক্। ঐ সমস্ত মন্ত্র নানাবিধ সুর-তান-লয় যোগে গীত ও যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের বলা হইত সাম। যজ্ঞের অনুষ্ঠানোপযোগী গদ্যমন্ত্রের নাম যজুঃ। যে সমস্ত মন্ত্র ইন্দ্রজাল, বশীকরণ, উচ্চাটন ও চিকিৎসা-বিষয়ে ব্যবহৃত হইত, সেইগুলি অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গ, বেদের কর্মকাণ্ড-সমূহের নাম অপরাবিদ্যা ও পরম পুরুষার্থস্বরূপ যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার হেতু উপনিষৎসমূহের নাম পরাবিদ্যা। ব্যাপকভাবে এই উপনিষৎসমূহের নামই পরাবিদ্যা। উপনিষদের উপরই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। যজুর্ব্বেদীয় 'শতপথব্রাহ্মণে' লিখিত আছে যে উপনিষৎ বেদের সার। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ হৃদয়ের ও বিশ্বাসের নিদর্শন। উপনিষৎ বিচারের ও জ্ঞানের নিদর্শন, এবং ইহা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। এইজন্যই দর্শন হইতে বেদের প্রামাণ্যবিষয়ক মতসমূহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বেদ নিত্যই হউক, আর অনিত্যই হউক, পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় হউক, ইহার প্রভাব যে আর্য্যসমাজের উপর অসাধারণ ছিল, আর ইহাই যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক মহত্তর উজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আজ কালক্রমে নষ্ট হইতে চলিয়াছে, গুণকর্ম্মানুসারে জাতিবর্ণ-বিভাগ আর দৃষ্ট হয় না। বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ভাগ সমাজের অভ্যন্তর হইতে আজ বহুলাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে, তবুও এক সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাদর্শের উল্লেখ করিতে হইলেই আমাদের বৈদিক যুগের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে হয়।

বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ বৈদিক যুগের কৃষি-প্রধান জীবনে যাহা একান্তভাবে প্রযোজ্য ছিল, আজ যন্ত্রযুগের সঙ্গে তাহার হয়তো সামঞ্জস্যবিধান হয় না,

কিন্তু জীবনের বাহ্যরূপের অন্তরালে সে সত্য সার্ব্বজনীনতায় আজও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া আছে, তাহা আমাদের জীবন-দর্শনকে আজও গভীরভাবে প্রভাবিত করিতেছে।

বৈদিক যুগের আচার্য্য অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে শিষ্যকে আদেশ করিতেছেন—কর্ম কুরু। মা দিবা স্বাপ্সীঃ'—দিবানিদ্রা জড়তা অলসতা পরিহার করিয়া কর্মী হও—বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে তোমাকে আদর্শ কর্মী হইতে হইবে। সুতরাং আলস্যের সময় নাই। দিবানিদ্রাদি অলস ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া সাধনায় তৎপর হও, তাহা হইলেই আয়ুঃ যশ বীর্য্যাদি, ধর্ম কাম মোক্ষ প্রভৃতি গুণসম্পদ তোমার করতলগত হইবে।

বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রম ধর্ম কী চমৎকার সামঞ্জস্যেই না পরিপূর্ণ ছিল! জীবনারম্ভের প্রথম অধ্যায়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মন ও শরীর গঠন, শরীর ও মন গঠিত হইলে বিবাহ ও গার্হস্থ্য-ধর্মপালন, গার্হস্থ্যধর্ম পালনের পর পঞ্চাশৎ বর্ষকালে বানপ্রস্থ-গ্রহণ, তারপর জীবনের চতুর্থ অধ্যায়ে সন্ন্যাস-অবলম্বন। সংযমসাধনা দ্বারা ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যে জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই বেদের শিক্ষা। প্রাচীন ভারতে ইহাই ছিল শিক্ষা ও সাধনার ধারা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার ছিল এই শিক্ষা ও সাধনায়।

একদিকে যেমন গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি অরুন্ধতী প্রভৃতি আদর্শ কুলবধূর সাক্ষাৎ মেলে প্রাচীন যুগে। একদিকে মৈত্রেয়ী যেমন বলিতেছেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্', তেমনি নবধূও প্রার্থনা করিতেছেন—

'ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে বরম্॥'

আকাশ নিষ্কম্প, পৃথিবী অচঞ্চলা, বিশ্বজগৎ প্রণালীবদ্ধ ও নিয়মিত, পর্বতসকল নিশ্চল, আর আমরাও পতিকুলে ধ্রুবা, অর্থাৎ যেন স্থিরা হইতে পারি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের একটি চমৎকার আদর্শ নিম্নলিখিত মন্ত্রটির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই। পতি স্ত্রীর নিকট কামনা করিতেছেন—

'সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ম্।
সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যং তে মাযোষ্ঠ্যাঃ॥'

একত্র সপ্তপদ অর্থাৎ ভূরাদি সপ্তলোক গমনে তুমি আমার সখী হও। আমিও তোমার সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। তোমার আমার সখ্যের ফলে উভয়ে একত্র ক্রমশঃ উন্নতিমার্গে আরোহণ করিয়া একত্র এই পৃথিবী হইতে সত্যলোকে উন্নীত হইব। তোমার আমার সখ্যবন্ধন যেন অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা নষ্ট না হয় এবং সুখকারী রমণীগণ তোমার আমার সখ্যবন্ধন সুদৃঢ় করুন।

বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমবন্ধনের যে আলেখ্য দেখিতে পাই, তাহা ভাবাদর্শের মহিমায় প্রোজ্জ্বল—

'যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥'

এত প্রাচীন-কালেও নরনারীর এইরূপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া ব্যক্তি ও সমাজ-জীবন সার্থকতায় মণ্ডিত করিয়াছিল। তাহা আজ কোথায়? ইহকালে পরকালে বিচ্ছেদ নাই ভাবিয়া স্বামী এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্ত্রীর সহিত সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। নর-নারীর মিলনের এই পবিত্র আদর্শ আজিও ভারতীয় সমাজ-জীবনকে বিধৃত করিয়া আছে।

বৈদিক অনুষ্ঠানগুলি এক উদার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহার মহৎ প্রভাব আজও বিদ্যমান। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের

মধ্যে আত্মসুখের উল্লেখ কোথাও নাই। যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা সকলই 'জনহিতায় প্রজাহিতায় চ'। ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের শেষে যে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহাতে নিহিত আছে বিশ্বের কল্যাণ—

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ
শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥

(যজুর্ব্বেদ)

শুধু পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নহে, বিশ্বকল্যাণ কামনা যে যুগের প্রার্থনায় বর্তমান, সে যুগ সভ্যতার কত উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বেদে যে দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ বর্ণিত আছে, তাহা নহে, জনক-জননীর প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার যে আলেখ্য অংকিত আছে, তাহাও পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য-জাতির ইতিহাসে দুর্লভ। জনক-জননী প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহ-জীবনে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা-তো অনুষ্ঠেয় নিত্য কর্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; পিতামাতার পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও পৃথিবীর অন্য কোথাও দুর্লভ। শ্রাদ্ধকর্মাদি দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়াছেন এই বিশ্বাস হইতেই শ্রাদ্ধকর্তার মনে সমস্ত বিশ্ব মধুময় প্রতীয়মান হইতেছে; তাহার মনে স্বতঃই এই প্রার্থনা জাগিতেছে—

'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥'

সমস্ত কিছু পার্থিব কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নিয়তই পার্থিবতাকে অতিক্রম করিয়া উদার বিশ্বলোকে প্রয়াণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সূত্র।

বেদে একদিকে যেমন ধর্মকার্য্য ও যজ্ঞাদির ব্যাপার রহিয়াছে, তেমনি লৌকিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের তথ্য বর্তমান। সামাজিক আচারের মধ্যে বিবাহ-প্রথা, স্বয়ংবর-প্রথা, দত্তকগ্রহণ, জাতিনির্ণয়, সমুদ্রযাত্রা, রাজ্যাভিষেক, দাসদাসী-ক্রয়, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি, জ্যোতিষ সম্বন্ধে সৌর ও চান্দ্রবৎসর, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন ঋতু বৎসর দিনগণনা, চন্দ্রলোকের উৎপত্তি, সূর্য্যের গতি, সূর্য্যগ্রহণ পৃথিবীর অক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কূপখনন, জলসেচন, গোচারণ, এবং পশু পালন, রোগচিকিৎসা, বস্ত্রবয়ন, লৌহময় অস্ত্রাদি প্রণয়ন, সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা দেখিলে প্রাচীন-কালের বৈদিক সভ্যতার ব্যাপকতা ও পরিধির এক আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে অপরা বিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে পরা বিদ্যাও চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান বিনষ্ট করে, ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়তা করে, তাহাই পরাবিদ্যা। উপনিষৎসমূহ সেই পরাবিদ্যার আকর। ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যে ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তেমন আর কোথাও হয় নাই। ঐক্যসাধনাই ভারতের চরম সাধনা। এই ঐক্য-সাধনার জন্যই ভারতবর্ষ জগৎসমাজে আজও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। ঐক্যবোধ যখন দুর্ব্বল হয়, প্রাণশক্তিও তখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উপনিষদের সাধনাই একদা ভারতের প্রাণধারাকে কল্যাণের শতধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতায়, বহু প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির

জয়োচ্চারণ করিয়াছেন। একদা তিনি বলিয়াছিলেন:—

'যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য প্রবাহিত মননধারা, যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ-বিভেদ তার ভেসে যায়, যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন যোগায় সকল দেশকে সকল কালকে।....একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান মননধারা। সে বল্‌তে পেরেছিল বেদাহম্—আমি জানি, এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। শৃণ্বন্তু বিশ্বে—শুনুক বিশ্বের লোক। আয়ান্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা—সকলে আসুক সকল দেশ থেকে।....প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে, বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।'

যে সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষ একদা জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা শুধু ভাব-বিলাসিতার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্মচর্য্য, মননশীলতা ও কঠোর আত্মত্যাগের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ঈশোপনিষদের তিনটি মাত্র শ্লোকে এই সাধনার ধারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে:

'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

যাহারা কেবল কর্মের অনুসরণ করে তাহারা অজ্ঞানরূপ গভীর তিমিরে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবল জ্ঞানের চর্চা করে তাহারা তদপেক্ষা গভীর তিমিরে প্রবেশ করে। তত্ত্ব-দর্শীরা জ্ঞান ও কর্মের পৃথক পৃথক ফল কহিয়াছেন। যাহারা আমাদের নিকট ইহা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই জ্ঞানীদের মুখ হইতে আমরা এইরূপ শুনিয়াছি: যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত মন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের একটি অন্তরতম সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদ বলিতেছেন—জীবনের যে চরম সার্থকতা চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করিয়া জানা—সকল কিছুই ব্রহ্মসত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত এইরূপ মনন, তাহা কেবলমাত্র কর্ম বা জ্ঞান কোনটির দ্বারা সম্ভব নয়। জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্যে সেই পরম কল্যাণলাভ হইবে।

উপনিষদের নানা আখ্যানের ভিতর দিয়া এই আদর্শকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উপনিষদের কাহিনীর মধ্যে আমরা কৈকেয় অশ্বপতি, প্রবাহণ এবং বৈদেহ জনক প্রভৃতি যে সমস্ত নৃপতির উল্লেখ পাই, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্। তাঁহারা একদিকে বিস্তৃত সাম্রাজ্য পরিচালনা করিয়াও মুহূর্তমাত্র আত্মবিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা কর্মকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহলোককে তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। এই বিপুল বিশ্বজীবন তখন তাঁহাদের নিকট শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহারা জানিতেন যে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি'।

উপনিষদের মহাসত্য ভারতবর্ষকে একদা মহান আদর্শে উন্নীত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে

বৌদ্ধধর্ম্মের দুঃখবাদ ভারতের এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। তারপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে হারাইয়াছে। বিদেশী শাসন অপনীত হইলেও ভারতবর্ষ আজ নানা দুর্ব্বলতায় অভিভূত। আমাদের স্বরাজের কর্ণধারগণ ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে রাষ্ট্র হইতে বহিস্কৃত করিয়াছেন। যে জাতীয়তার উপর ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ভারতের নিজস্ব জাতীয়তা নহে। এইরূপ জাতীয়তাবোধের সহিত ভারতীয় আত্মার কোন দিন যোগ ছিল না। বর্তমান কালেও একজন ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে ভারতের অকৃত্রিম জাতীয়তার বাণী ঘোষিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীও আশ্চর্য্য বিস্ময়ে সেই মহান অভ্যুদয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া তাকাইয়াছিল—সেই জাতীয়তার বাণী রাষ্ট্রসংগ্রামে আমাদের আদি প্রেরণা জোগাইয়াছিল—কিন্তু একথা আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। উপনিষদের বীর্য্যপ্রদ আদর্শের উপরই ছিল সেই জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। পাশ্চাত্য শাসনের অবসান ঘটাইয়া ভারত যদি সেই পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে, কিছুদিন পরে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে ফতুর হইয়া যাইবে। জগৎকে দান করিবার মত কিছুই আর তাহার থাকিবে না। স্বাধীন হইয়াছি বলিয়াই আমরা মহত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হই নাই। আমাদের মহত্ব স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ বিশ্ববাসীকে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ দানের যোগ্যতায় আমাদের মহত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আদর্শভ্রষ্ট কর্ম বা শুধুমাত্র জ্ঞানসাধনার দ্বারা তাহা হইবে না। পাশ্চাত্যের শিল্প বা বিজ্ঞানসাধনা আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনাকে সেই শিল্পসাধনার পদে বিকাইয়া দিয়া নয়। জাতির পক্ষে আজ সত্যই দুর্দিন। এই দুর্দিনকে অতিক্রম করিতে হইলে আমাদের সেই বলপ্রদ উপনিষদের বাণীকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

অপরূপ পাখী

মলিনা

মর্ত্য কামনা-বাসনায় ভরা
জীবনতরুর শাখে,
আজি অজানার সুদূর হইতে
কোন পাখী এসে ডাকে।

গানে গানে তার সুধা ঝরে পড়ে
আঁখির আলোকে নবারুণ গড়ে,
সারা বিশ্বের বেদনা আপন—
কণ্ঠে আবরি রাখে।

সেই সে পাখীর যুগল পাখায়
শত রবি শশী তারা ঝলকায়,
কনক জ্যোতির পুলক-বন্যা
ধরার তিমির ঢাকে।

মর্ত্য কামনা-বাসনায় ভরা
জীবনতরুর শাখে,
রূপান্তরের বারতা বহিয়া
অপরূপ পাখী ডাকে।

অজ্ঞাত-ভূভাগে আবিষ্কার-অভিযান

এস, গর্ডন কলার

পৃথিবীর অবশিষ্ট অজ্ঞাত স্থানগুলি আবিষ্কারের জন্য বর্তমানকালে যেরূপ ব্যাপক অভিযান সুরু হয়েছে এলিজাবেথীয় যুগের পর আর সেরূপ দেখা যায় নি। কুমেরু অঞ্চলে আসন্ন ইঙ্গ-সুইডিস-নরওয়েজিয়ান যুক্ত অভিযান সাম্প্রতিক আবিষ্কার-অভিযানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ মেরুর চতুষ্পার্শস্থ চিরতুষারাবৃত অঞ্চল বর্তমানে পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। ৩৭ বৎসর পূর্বে বৃটেনের দুঃসাহসী অভিযাত্রী স্কট এই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে স্কট তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "অভিযানের ফলাফলে আমি মোটেই দুঃখিত নই। এই অভিযানকালে আমি ইংরেজদের চরিত্রে চরম কষ্টসহিষ্ণুতা, বন্ধুবৎসলতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে প্রকাশ দেখেছি তাতে আমি বিশেষ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি।" দক্ষিণ মেরু অভিযান এখনও সমান বিপদসঙ্কুল, যদিও স্কটের পরবর্তী অভিযাত্রিগণ ঐ অঞ্চল-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান এবং রাডার, বিমান প্রভৃতির সাহায্য লাভ করেছেন।

কুমেরু অঞ্চল অভিমুখে যে ত্রিজাতীয় অভিযান সুরু হবে তাতে বৃটেন থেকে পাঁচজন বৈমানিক দুটি বিশেষ ধরনের বিমান নিয়ে যোগদান করবেন। এঁদের কাজ হবে 'কুইন মড ল্যাণ্ড' বেষ্টনকারী তুষার প্রাচীরের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশের পথ অনুসন্ধান করা। আজ পর্যন্ত কোন জাহাজ এই তুষার প্রাচীর ভেদ করে মেরু অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি এবং ১৯১৪ সনে স্যার আর্নেষ্ট স্যাক্‌লটনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অভিযাত্রিদলে চারজন তরুণ বৈজ্ঞানিক থাকবেন যাঁদের বয়স ২৬ বৎসরের অধিক নয়। এঁদের মধ্যে দুজন ইংরেজ, একজন কানাডিয়ান এবং এবং অষ্ট্রেলিয়ান। এঁরা মেরু-প্রদেশের আবহাওয়া, ভূতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণাদি করবেন।

অভিযাত্রিদলের লক্ষ্যস্থল হল দক্ষিণ মেরুর নরওয়েজিয়ান অঞ্চল। এই স্থানের পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ান অঞ্চল এবং পশ্চিমে বৃটিশ ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। গ্রাহামল্যাণ্ড, দক্ষিণ অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বৃটিশ অঞ্চলে অবস্থিত। যে সকল অসমসাহসিক বৃটিশ অভিযাত্রী চরম ক্লেশ বরণ করে এই সকল স্থানের মানচিত্র প্রস্তুত করেছেন, তাঁদের নাম অনুসারেই দ্বীপগুলির নামকরণ করা হয়েছে। গ্রাহামল্যাণ্ডের অদূরে তুষারাবৃত ষ্টোনিংটন দ্বীপে ১৯৪৭ সালের প্রথমভাগ থেকে এগার জন লোক বাস করছেন। বিমান ও জাহাজের সাহায্যে শীঘ্রই তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে।

উপরোক্ত এগার জন বৃটিশ আবহতত্ত্ববিদ্ পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা নির্জন জীবন যাপন করেছেন। এঁরা দক্ষিণ সাগরের উপকূলে তাঁবুতে বাস করেন এবং বেতারের সাহায্যে নিয়মিত ভাবে আবহাওয়ার সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁদের সংবাদের উপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক

তিমিশিকার অভিযানকারিগণ বিপদসঙ্কুল দক্ষিণ অতলান্তিক সাগরের মধ্যে নিরাপদে জাহাজ চালনা করেন।

পৃথিবীর অপর প্রান্তে উত্তর মেরুর চির-তুষারাবৃত অঞ্চল অবস্থিত। মানচিত্রে এই স্থান সংক্ষেপে 'অনাবিষ্কৃত ভূভাগ' বলে বর্ণিত হয়েছে। এই অঞ্চল আবিষ্কারের জন্যও একটির পর একটি অভিযান চালান হচ্ছে। বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন স্কটের পুত্র পিটার স্কট সম্প্রতি কানাডার মেরু অঞ্চলে পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে বৃটেনে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পিটার স্কট তুষার মরুর মধ্যস্থলে 'কুসুমাস্তীর্ণ পক্ষিকূজন-মুখরিত' একটি স্থান প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখানে এক নূতন ধরনের এস্কিমো জাতি বাস করে যাদের অস্তিত্বের সংবাদ এতকাল সকলেরই অজানা ছিল।

বৃটেনের স্কুলের ছাত্রদের একটি দল সম্প্রতি উত্তর নরওয়ের অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আবিষ্কার-অভিযান চালিয়েছিল। ছাত্ররা ছ'সপ্তাহ ধরে আশী বর্গ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করে এবং সেখানকার আবহাওয়া, ভূতত্ত্ব, হিমবাহ, পক্ষী ও গাছপালা সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করে। সম্প্রতি তারা বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের সংগ্রহ ও রিপোর্ট পেশ করেছে।

চারজন বৃটিশ অভিযানকারীর অপর একটি দল সম্প্রতি বৃটিশ কলম্বিয়া (কানাডা) অবস্থিত ক্যাসিয়ার ও স্কিকাইন পর্বতে অভিযান করে তথাকার মানচিত্র-প্রস্তুতি সমাপ্ত করেছেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ জন ছাত্র সম্প্রতি উত্তর মেরু প্রদেশের অন্তর্গত স্পিটস্বার্জেন অঞ্চলে ভূতত্ত্বসংক্রান্ত গবেষণা সমাপ্ত করে বৃটেনে প্রত্যাবর্তন করেছে। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আবিষ্কার-অভিযান ক্লাবের' পাঁচজন সভ্য কিছুকাল পূর্বে আইসল্যাণ্ডের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত নর্থ ইষ্ট ল্যাণ্ড-এ একটি নূতন হিমবাহ আবিষ্কার করেছে।

লিভিংষ্টোন ও ষ্টানলীর পদাংক অনুসরণ করে বৃটিশ অভিযানকারিগণের আফ্রিকার গভীর অভ্যন্তরে উষ্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ অনাবিষ্কৃত ভূভাগে আবিষ্কার-অভিযান চালিয়েছেন। একশ বৎসর পূর্বে এই ধারণা ছিল যে আফ্রিকার অনাবিষ্কৃত অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুভূমি, যেখানে বড় বড় নদী তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যই লিভিংষ্টোন অভিযান সুরু করেন। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ও তিন জন ছাত্র সম্প্রতি আফ্রিকার গভীর জঙ্গল ও জলাভূমিতে অদ্ভুত পদবিশিষ্ট এক জাতীয় মানুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন যারা তাদের পুরোহিতদের নির্দেশে বর্শার সাহায্যে মৎস্য শিকার করে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ফরাসী আফ্রিকার দুরধিগম্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বহুপ্রকার ভাষার রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন। দু'জন বৃটিশ ছাত্র সাহারা মরুভূমির মধ্যে, 'টুর্জেস্' নামে এক মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে এবং সেখান থেকে প্রস্তরযুগ সভ্যতার বহু নিদর্শন ও প্রস্তরলিপির কপি সংগ্রহ করে এনেছে, আজ পর্যন্ত কেউ যার পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়নি।

বৃটেনের যে সকল য়্যাডভেঞ্চার-পিপাসু ব্যক্তি পৃথিবীর দুর্গম অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে অভিযান করার সুযোগ সুবিধা পায়না তারা বৃটেনের মধ্যেই বহু অভিযান ক্লাব গড়ে তুলেছে। লণ্ডনে একটি ক্লাব আছে যার সভ্যদের কাজ হল লণ্ডন শহরের স্বল্পপরিচিত অংশগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। এলিজাবেথ, লিভিং-ষ্টোন ও ক্যাপ্টেন স্কটের যুগে বৃটেনবাসীদের মধ্যে যে আবিষ্কারস্পৃহা ও য়্যাডভেঞ্চার-তৃষ্ণা দেখা গিয়েছিল বর্তমান কালেও তা অব্যাহত আছে বলা যেতে পারে। *

---

* নিউ দিল্লী ব্রিটীশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস্-এর সৌজন্যে প্রকাশিত—উঃ সঃ।

সমালোচনা

(১) **গ্রহরত্ন বিজ্ঞান বা রত্ন-সমীক্ষা।** (২) **লঘু পারাশরী রহস্য**—উভয় পুস্তক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। প্রথম পুস্তক ১৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ভারত সাহিত্য ভবন, ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দ্বিতীয় পুস্তক ১৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রকাশক—সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১৯৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ আচার্যোপাধিক পণ্ডিত, নিখিল ভারত পারাশর জ্যোতিষ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও শ্রীবামানন্দ সরস্বতী নামে পরিচিত। যে যে গ্রহ অশুভ ফল প্রদান করেন, সেই গ্রহের শাস্ত্রনির্দিষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দান বা স্বয়ং ধারণ করিলে তৎ তৎ গ্রহ প্রসন্ন হন। প্রথম পুস্তকে নবগ্রহের এই রত্নবিজ্ঞান বিবৃত। ইহার মতে সূর্যের মাণিক্য, চন্দ্রের মুক্তা, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকত (পান্না), বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক, শনির নীলা, রাহুর গোমেদ এবং কেতুর বৈদূর্য রত্ন হইয়া থাকে। এই সকল রত্ন স্ফটিক-জাতীয় পদার্থ এবং বহু গুণ ও বর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের বিভিন্ন নাম, লক্ষণ ও ধারণবিধি বিস্তৃতভাবে লিখিত।

জ্যোতিষশাস্ত্র ষড়-বেদাঙ্গের অন্যতম। 'পারাশরী হোরা' উক্ত শাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ-অবলম্বনে বৃন্দাবনের পণ্ডিত ভৈরবদত্ত পাণ্ডে 'লঘু পারাশরী' বা 'উড়ুদায় প্রদীপ' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। আলোচ্যমান পুস্তকে ভৈরবদত্তের পুস্তিকা সমালোচিত এবং পরাশর-মতে জ্যোতিষশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত। গ্রন্থকার বেদাদি শাস্ত্রের বাক্যোদ্ধার-পূর্বক আয়ুর্বিচার এবং নাক্ষত্রিকী দশাফলাদি সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তক জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য উপক্রমণিকা-রূপে পঠিত হইতে পারে। পুস্তকদ্বয়ে প্রাঞ্জলতার অভাব এবং মূল্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহা সত্ত্বেও ইহাদের বহুল প্রচারে জ্যোতিষশাস্ত্র সর্বসাধারণের অধিগত হইবে।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

Narada—জাঁন হার্বার্ট কর্তৃক ফরাসী ভাষায় লিখিত এবং লাঁজেল রেমণ্ড কর্তৃক দের্যাঁ, লিঁয় (ফ্রান্স) হইতে প্রকাশিত। ৪২ পৃষ্ঠা।

বর্তমান পুস্তিকার ভূমিকায় গ্রন্থকার 'বিষ্ণুর অবতারগণ', ও পরিশিষ্টে 'কৃষ্ণকে সারথিপদে বরণ' বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণের প্রতি লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পুস্তিকায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, এই পুরাণ-সাহিত্যকে পুরাতত্ত্ববিদের কৌতূহলপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যদি আমরা না দেখি, তবেই উহা হইতে কর্ম ও ধর্মজীবনে প্রেরণা লাভ করিতে পারি। ভাগবত, মহাভারত ও উপনিষদাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ-সমূহে নারদের বহু উল্লেখ দেখা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান লেখক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় উক্ত সমালোচনাসমূহের উপর আলোক-সম্পাত করিয়াছেন।

ভাগবতে নারদকে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বলা হইয়াছে। লেখক নারদের এই অবতারত্ব লইয়াই মূল প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সৃষ্টির সৌকর্যার্থই নারদের আবির্ভাব এবং নারদ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে বার্তাবহ। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বধর্ম-পথে চলিয়াই পূর্ণতা লাভ করুক ইহাই নারদের বাণী।

পরিশিষ্টে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নারদের তুলনা করিয়া লেখক নারদের যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উপসংহারে দেখাইয়াছেন, ধর্মপিপাসুর কাছে নারদ-চরিত্রের এক বিশেষ সার্থকতা আছে। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ফরাসী ভাষাভিজ্ঞগণের নিকট সমাদৃত হইবে।

স্বামী সত্যকামানন্দ

The Sangita Malika of Mahammad Shah—Edited by Dr Jatindra Bimal Chaudhuri, Ph. D, F. R. S. A. Principal, Sanskrit College, Calcutta; Lecturer, Calcutta University, and Secretary, Bengal Sanskrit Association. Published by the author from "The Pracyavani", 3 Federation Street, Calcutta. Pages 42. Price Rs 3/-.

আলোচ্যমান গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা মহম্মদ শাহ্ নামক একজন মুসলমান কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত নৃত্যকলাবিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থ। যদিও 'সঙ্গীত' শব্দ দ্বারা নৃত্য গীত ও বাদ্য বুঝায় এবং এই গ্রন্থখানিতে সম্ভবতঃ নৃত্যাধ্যায়ের ন্যায় গীতাধ্যায় ও বাদ্যাধ্যায়ও সন্নিবেশিত ছিল, তথাপি ডক্টর চৌধুরী বিকানীর ষ্টেট্ লাইব্রেরী হইতে 'সঙ্গীত-মালিকা'র নৃত্যাধ্যায়-টুকুই পাইয়াছেন। ঐ স্থানে বা অন্য কোথাও এই পুস্তকের আর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, তিনি এই অমূল্য গ্রন্থখানির নৃত্যাধ্যায়াংশই অশেষ ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে মূল পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধার করিয়া দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন এবং ইংরেজী ভাষায় ইহার বিবরণী ও ইতিহাসাদিযুক্ত একটী ভূমিকাসহ প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানির মুখবন্ধে প্রকাশক মুসলমান বিদ্বন্মণ্ডলী-রচিত সংস্কৃত কবিতা ও ফলিত জ্যোতিষাদি প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা ঐ সকল রত্নের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় রহিলাম। প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি কলা-রসিকগণের নিকট আদৃত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

বেদান্ত ও সুফী দর্শন—লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডক্টর রমা চৌধুরী, এম্-এ, ডি-ফিল্ প্রণীত। প্রকাশক—ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, পিএইচ্-ডি, এফ আর-এস্-এ, যুগ্ম-সম্পাদক, প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৮; মূল্য দুই টাকা মাত্র।

এই অভিনব গ্রন্থখানি 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' হইতে সার্বজনীন গ্রন্থমালার চতুর্থ পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত। ইহাতে বৈদান্তিক ও সুফী সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া পরস্পরের সহিত তুলনার সুবিধা করা হইয়াছে। এই তুলনাকালে পাঠকগণের যাহাতে ভ্রমের সুযোগ না হয়, তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্রী বৈদান্তিক ও সুফী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাধকের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া তুলনার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কারণ, বৈদান্তিক বা সুফী মতবাদ বলিতে কোন একটী সাধক বা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদ বুঝায় না, অথচ বৈদান্তিকসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে যেমন

কতক অংশে সকলের মিল আছে সূফীসম্প্রদায়-সমূহের মধ্যেও তদ্রূপ; আবার বৈদান্তিক ও সূফী উভয়ের মধ্যেও কতক অংশে মিল আছে এবং মূলগত বহু প্রভেদও আছে। গ্রন্থকর্ত্রী এই সমস্ত বিষয় সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়া দশম পরিচ্ছেদে যে উপসংহার লিখিয়াছেন, তাহার দ্বারা এই গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোটের উপর ইহা একটী অভিনব গ্রন্থ। ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বেদান্তদর্শন ও সূফী-দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বুঝিবার বিশেষ সহায়তা হইবে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী প্রশান্তানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী—গত ৬ই নভেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের চত্বারিংশত্তম সাধারণ সভা বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে মিশনের ১৯৪৮ সনের বহুধাবিস্তৃত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্যমান বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ৬৬টি কেন্দ্রে এবং ১২টি উপকেন্দ্রে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে নরনারায়ণের সেবা এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্মপ্রচার-কার্য পরিচালন করিয়াছেন।

১৯৪৬ সনের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যে দাঙ্গা-সেবাকার্য আরব্ধ হইয়াছিল, ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে তাহা সমাপ্ত হয়। এই সেবাকার্যে ৫৬,৮৭৬৵৬ পাই ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৪৬ সন হইতে এই উদ্দেশ্যে সর্বসমেত ৩,৩২,১০৮৸৴১১ পাই পাওয়া গিয়াছে এবং মোট ২,৩৫,৪০২।৵৪ পাই খরচ হইয়াছে। যে ৯৬,৭০৬৷৷৴৭ পাই উদ্বৃত্ত আছে তাহার প্রায় অর্ধেক দাঙ্গাপীড়িত ৫২ জন ছাত্র ও ২৫ জন ছাত্রী এবং ১৮টি অসহায় পরিবারকে ১৯৪৯-৫০ সনে সাময়িকভাবে সাহায্য করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। ছাত্রদের অধিকাংশই অনাথ। অবশিষ্ট অর্থ ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার নিকট দাঙ্গাপীড়িত বাস্তু-ত্যাগীদের পুনর্বসতি-কার্যে ব্যয়িত হইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুরোধে মিশন বেলুড় ও রহড়া কেন্দ্র হইতে ১৯৪৯ সনের ১৬ই মার্চ পর্যন্ত সেবাকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্তদের সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১০,৩৮৬। ইঁহাদিগকে ৮,৫৯,২৮৫।৯ পাই সাহায্য করা হয়। এতদ্ভিন্ন ৩০,২১৯ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১২,৮৯৫ খানা শাড়ি ও ধুতি, ১২,৩২৮টি জামা ও ৬০৪৪ খানা কম্বল দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪২০০।৫ সের চাল ও আটা, ৯৭৯॥৩ সের ডাল, ২৬৫ পাউণ্ড দুধ এবং ২৫ পাউণ্ড বার্লি বিতরিত হইয়াছে। মালদহ, তমলুক, শিলং এবং সোনারগাঁ কেন্দ্র হইতেও সাধারণ ভাবে সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের ৫১৫টি বেড-

যুক্ত ৫টি সাধারণ হাসপাতালে ও একটি প্রসূতি-সদনে ১১,৩২১ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। মিশন-পরিচালিত ৪৯টি আউট ডোর চিকিৎসালয়ে সর্বসমেত ১৬,৪৬,৯৭৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। দিল্লী কেন্দ্র পরিচালিত যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্রে ১২,২০৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন।

আলোচ্যমান বর্ষে মিশন আর্ত নরনারীদের মধ্যে ২৫০ মণ খাদ্যদ্রব্য এবং ৭৫০ খানা কম্বল ও কাপড় বিতরণ করিয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত নিয়মিত ভাবে ও সাময়িক ভাবে ১,১২১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ২৯,৩৭৮।/৪ পাই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই সাহায্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শতাধিক ছাত্রও আছে।

মিশন-পরিচালিত ২টি কলেজ, ২টি আবাসিক বিদ্যালয়, ১৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৭টি অনাথাশ্রমে মোট ৪,৯৪৮ জন ছাত্র ও ১,৯৪১ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৪০০ জন বালক ও ৩৬৬৮ জন বালিকা, ১৩টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৫১৮ জন এবং দুইটি শিল্পবিদ্যালয়ে ১৮০ জন ছাত্র শিক্ষা পাইয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে মিশনের ৪৩টি ছাত্রাবাসে ২,৪১৪ জন ছাত্র ছিল।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালের মহিলাবিভাগ, ট্রেনিংবিভাগ-সমেত কলিকাতার প্রসূতিসদন, জলপাইগুড়ির প্রসূতিচিকিৎসা-কেন্দ্র, কাশীর দুঃস্থ মহিলাদের আশ্রয়াবাস, মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয় এবং কলিকাতার ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রমুখ প্রতিষ্ঠান হইতে নারীসেবাকার্য পরিচালিত হইয়াছে।

এই বৎসর মরিসাস্, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং সিংহল কেন্দ্রে মিশন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য পরিচালন করিয়াছেন।

মায়াবতী (আলমোড়া) দাতব্য হাসপাতাল, ১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী— সাধন-ভজন এবং তপস্যার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া হিমালয়ের অন্তর্দেশে, মায়াবতীতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 'অদ্বৈতাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু আশ্রমের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ জীবনে বেদান্তের চরম সত্য উপলব্ধি-কল্পে নিজদিগকে সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই, সমাজ-কল্যাণকার্যও তাঁহারা ঐ আশ্রম হইতে পরিচালনা করিতেছেন। আশ্রমের প্রকাশন-বিভাগ হইতে বহু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হইয়া সমগ্র ভারতে ও বিদেশে বেদান্তের বাণী পরিবেশন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত এই আশ্রম হইতে মাঝে মাঝে দেশে এবং বিদেশে প্রচারকও প্রেরিত হইয়া থাকেন। উপরোক্ত হাসপাতালটিও আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করিতেছেন।

স্থানীয় অধিবাসিগণের একান্ত প্রয়োজন-বোধেই মায়াবতী দাতব্য হাসপাতালের প্রথম সূত্রপাত হয়। পাহাড়ী গ্রামের দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকদিগের রোগে ও দুর্দশায় স্বতই সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। সেইজন্য ১৯০৩ সনে আশ্রমে একটি ডিস্পেন্সারী খোলা হয়। তদবধি ডিস্পেন্সারীটি ক্রমশঃই আকারে ও গুরুত্বে বাড়িয়াই চলিতেছে। এখন বহুসংখ্যক রোগী ৫০।৬০ মাইল দূর হইতে ৪।৫ দিনের পথ পায়ে হাঁটিয়া এখানে আসেন।

হাসপাতালটি আশ্রমের সংলগ্ন এবং ইহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য একজন সুযোগ্য এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিচারে রোগীদের সেবা পূজা-

স্থানেই করা হয়। হাসপাতাল-পরিচালনায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, শহরের নানা স্থবিধা হইতে বঞ্চিত স্থদূর হিমালয়ের নিভৃত এক কোণে অবস্থিত একটি হাসপাতালকে গড়িয়া তোলা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার। তথাপি কর্তৃপক্ষ ইহাকে একটি আদর্শ হাসপাতালে পরিণত করিতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিতেছেন না।

ইহাতে বর্তমানে ১৩টি বেড্ আছে কিন্তু সময় সময় অতিকষ্ট করিয়া বহুদূর হইতে এত বেশী রোগী আসিয়া পড়েন যে, কোনও রকমে তাঁহাদের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতেই হয়, ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। হাসপাতালের অস্ত্রোপচার-গৃহ (Operation Room) আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত থাকায় নানা প্রকারের অস্ত্রোপচার-কার্য সহজে সম্পন্ন হয়। ইহাদ্বারা স্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হইতেছে। এই অঞ্চলের পক্ষে একান্তই অভাবনীয় এবং বিরল এমন একটি রোগ-পরীক্ষাগারও (Clinical Laboratory) এখানে আছে। ইহাদ্বারা চিকিৎসা-বিষয়ে শহর-বাসীদের মত স্থবিধা এখানকার অধিবাসীরাও লাভ করিতেছেন। হাসপাতালে রোগীদের আনন্দ-বিধানের ব্যবস্থা এবং যাঁহারা পড়িতে পারেন তাহাদের জন্য ছোট-একটি গ্রন্থাগারও রহিয়াছে। আলোচ্যমান বর্ষে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে (Indoor Department) মোট ২৬২ জন রোগী ছিলেন, তন্মধ্যে ২০৪ জন আরোগ্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ২৬ জনের রোগ কমিয়া যায়, ২৬ জন হাসপাতাল পরিত্যাগ করেন এবং ৬ জনের মৃত্যু ঘটে। বহির্বিভাগে (Out door Department) মোট ৯,৫৪৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে ৭৯৭৭ জন ছিলেন নূতন এবং ১৫৬৯ জন পুরাতন রোগী। এই বৎসর হাসপাতালের আয় ছিল মোট ১৪,১০০৻১১ পাই এবং ব্যয় ৪৯৯৪৸৵৩ পাই। আমরা আশা করি, সহৃদয় দেশবাসী এই প্রতিষ্ঠানটিকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা ১৯৪৮ সনের কার্যবিবরণী—১৯২২ সনে এই জন-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ১৯৩০ সনে ১৪০০০৲ টাকা ব্যয়ে জমি ক্রীত হইলে আশ্রমটি লাঙ্গেরটুলি পল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেবা, শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার—এই তিন বিভাগে আশ্রমের কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। আশ্রম-পরিচালিত ভুবনেশ্বর দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করে। আলোচ্যমান বর্ষে ইহাতে ৩.৪৫৮ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা একটি অবৈতনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইহার অধিকাংশ ছাত্রই অনুন্নত ও হরিজন সম্প্রদায়ের দরিদ্র বালক। এই বৎসর ১২২ জন বালক বিদ্যালয়টিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। ইহার ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। স্থানাভাব-বশতঃ আশ্রম-কর্তৃপক্ষ বহু ছাত্রকে ভর্তি করিতে পারেন নাই। আশ্রম একটি নার্সারি বিদ্যালয়ও পরিচালন করিয়াছেন। আলোচ্যমান বর্ষে ইহাতে ১১টি শিশুকে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাভাব ও স্থানাভাব-বশতঃ বিদ্যালয়টি ১৯৪৯ সনের প্রথম হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যার্থিভবনে ১৪ জন ছাত্র স্থানীয় বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে। ছাত্রগণ পবিত্র পরিবেশে বাস করিয়া স্ব স্ব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানের সুযোগ পাইতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী ও পাঠাগার দ্বারা

স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৫২৫; পাঠাগারে ছয়খানা সাময়িক পত্র এবং একখানা দৈনিক সংবাদ-পত্র আছে। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ভাবে শাস্ত্রপাঠ এবং ধর্মালোচনা হয়। বিহারের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক নানা বিষয়ে বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আলোচ্যমান বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রায় সকল সন্ন্যাসী শিষ্য এবং যুগাবতার অন্যান্য মহাপুরুষগণেরও জন্মতিথি উপলক্ষে ধর্মালোচনা হইয়াছে। এই বৎসরের এপ্রিল মাসে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বিহারের প্রদেশপাল শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি য্যানে পৌরোহিত্য করেন।

আমরা এই জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি সহৃদয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—

বর্তমান হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ঔষধালয়ের সঙ্গে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা-যুক্ত এলোপ্যাথিক বিভাগ খোলা প্রয়োজন। ইহার বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ৬০০০৲ টাকা লাগিবে। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ক্রমেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার বিস্তৃতি ও উন্নতি-বিধানার্থ ৭২০০৲ টাকার দরকার। লাইব্রেরী ও পাঠাগার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। ইহাদের জন্য পৃথক্ গৃহ নির্মাণ ও পুস্তকসংখ্যা বাড়াইতে অন্ততঃ ৫০০০৲ টাকার প্রয়োজন। অন্ততঃ ২৫ জন ছাত্রের বাসোপযোগী বিদ্যার্থি-ভবনের আর একটি ব্লক্ নির্মাণ অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে ২০,০০০৲ টাকা লাগিবে। প্রাচীর ও পাকা রাস্তা নির্মাণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করা নিতান্ত দরকার। ত্যাগী কর্মিগণের বাসগৃহের সম্পূর্ণ মেরামত ও আবশ্যক পরিবর্তন-সাধনে ৪০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। আশ্রমের কোন স্থায়ী তহবিল নাই। ইহার বহুধাবিস্তৃত কার্যাবলী পরিচালনের জন্য ৬৩১৭৲ টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। এই ঋণশোধ ও স্থায়ী তহবিল গঠনে ও অর্থের দরকার। আলোচ্যমান বর্ষে আশ্রমের মোট আয় ১০০৪৪৮/০ এবং মোট ব্যয় ৯০৪৫৶৬।

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেবা ও প্রচারকার্য—গত ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর বেলুড় মঠের স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী পাটনা আশ্রম প্রাঙ্গণে সর্বজন-সমক্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও মাতৃজাতির আদর্শ সম্বন্ধে আলোক-চিত্রসহায়ে দুইটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে অক্টোবর পাটনা আশ্রমের উদ্যোগে গর্দানীবাগ অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও বাণী সম্বন্ধে তিনি আর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। গত ৬ই নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় দীন-দরিদ্রের সেবার জন্য পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid) এবং শল্যচিকিৎসা বিভাগ (Surgical Department) খোলা হইয়াছে বিহারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীজগলাল চৌধুরী প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমক্ষে ইহার উদ্বোধন-কার্য সম্পাদন করেন। তিনি তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে আশ্রমের সেবাকার্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া মুক্তহস্তে এই প্রতিষ্ঠানটীকে সাহায্য করিবার জন্য সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। আশ্রমসম্পাদক স্বামী তেজসানন্দজী আশ্রমের বিবিধ জনহিতকর কার্যের আলোচনার সঙ্গে এই চিকিৎসা বিভাগের প্রয়োজনীয়তাও সকলকে হিন্দি ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সর্বশেষে আশ্রম কমিটির সভাপতি পাটনা

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বরী প্রসাদ সিংহ আশ্রমের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইণ্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটীর বিহার-শাখা এই চিকিৎসাবিভাগের জন্য ৩৫৫০৲ টাকা এবং পাটনানিবাসী কর্ণেল শিশিরকুমার বসু ও তাঁহার সহোদরগণ ২০০০৲ টাকা প্রদান করিয়া আশ্রম-কর্তৃপক্ষের অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

আমেরিকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের শিয়াটল্ (Seattle) কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষা-নন্দজী ২০ বৎসর অক্লান্ত ভাবে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি ৺কাশীধাম হইতে বেলুড় মঠে যাইবার পথে পাটনা আশ্রমে তিন দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যায় অশ্রেম-বিদ্যালয়গৃহে তিনি অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য নরনারীর সমক্ষে আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার ও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সার্বজনীন আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর কাশী অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ওঁকারানন্দজী বাংলা ভাষায় 'প্রাচ্যও প্রতীচ্যের কৃষ্টিসম্পদ ও উহাদের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে তুলনামূলক এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করেন। ২৭শে নভেম্বর রবিবার রামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী এই আশ্রমে আগমন করেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ২৭শে নভেম্বর সোমবার তিনি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমা-নন্দজীর পুণ্যস্মৃতি কথা ভক্তগণ সমক্ষে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়া সকলকে আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রোৎসাহিত করেন। আশ্রমে তাঁহার অবস্থান-কালে বহু ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে প্রতিদিন সদুপদেশ লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিবার অপূর্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও শল্যচিকিৎসা বিভাগ, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয় ও ছাত্রগণের ড্রিল ও ব্যায়াম এবং আশ্রমের নানাপ্রকার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

স্বামী প্রণবাত্মানন্দজীর বক্তৃতা :— গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে স্বামী প্রণবাত্মা-নন্দজী কাশী, গয়া, পাটনা ও জামতাড়ায় মোট ১৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪টি আলোক-চিত্রসহযোগে প্রদত্ত হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'যুগধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান', 'শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভারতীয় নারী জাতীর আদর্শ', 'জনজাগরণ ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ,' 'শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষার্থীদের কর্তব্য'।

পরলোকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ্ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার গত ২৪শে নভেম্বর ৬৪ বৎসর বয়সে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিষদ ও ওয়াতুমুল

ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণক্রমে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্য তথায় গিয়াছিলেন। হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার পর নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তনের পথে সহসা তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।

অধ্যাপক সরকারের পিতৃ-পুরুষের বাসস্থান ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের সানিহাটি গ্রাম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতিশয় কৃতী ছাত্র এবং অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার স্বাদেশিকতা ছিল গভীর; বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। 'বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতৃরূপে তিনি বাঙ্গলা দেশে জাতীয় শিক্ষাপ্রসারে অগ্রণী ছিলেন। ১৯১৪ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্যন্ত দীর্ঘ বার বৎসর অধ্যাপক সরকার ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার শিক্ষা, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেন এবং পরবর্তী কালে উহা অধ্যাপনা, বক্তৃতা ও গ্রন্থরচনার মধ্য দিয়া দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করিয়াছেন।

অধ্যাপক সরকারের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ছিল সুগভীর ও বহুমুখী। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ব্যতীত তিনি ইতালীয়, জার্মাণ ও ফরাসী ভাষা ভালরূপে অধিগত করিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষাগুলিতে তিনি বক্তৃতা ও পুস্তক-রচনা করিতে পারিতেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার মোট ৫০ খানি পুস্তক ও ৫০০ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলা রচনায় তাঁহার কথ্য ভাষার সরস প্রয়োগ এক নূতন গদ্যরীতির সূচনা করিয়াছে। তদ্‌রচিত 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর', 'বর্তমান জগৎ', 'বাড়্‌তির পথে বাঙ্গালী', 'দুনিয়ার আবহাওয়া', 'চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ', 'নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন' প্রভৃতি পুস্তক অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাজনীতিতে তাঁহার অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক।

মহাশক্তিধর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় সাহসিকতা ও অপ্রমেয় স্বদেশপ্রেম দ্বারা ভারতে যে নবজাগরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ভারতেতর দেশগুলিতে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়া বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদাবৃদ্ধির সুমহৎ কার্য করিয়াছেন তৎপ্রতি অধ্যাপক সরকার অতিশয় আকৃষ্ট ছিলেন। গত শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আহূত বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত সরকার এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মনীষিবর্গের সহিত সংযোগস্থাপন এবং মহা-সম্মেলনের অধিবেশনের পরিচালনাকার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি শতবার্ষিকী উৎসবের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করিবার জন্য অনেকগুলি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ কালচারের সহিত তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল; তিনি উহার পরিচালক-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রচার-কার্য ও লোককল্যাণ-ব্রতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ এবং উহাকে তিনি 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের' ভাবধারা বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা ইডা সরকারের এক পত্রে জানিতে পারা যে, শ্রীযুক্ত সরকার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের' কথা বলিয়াছিলেন। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারতে' তাঁহার বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মনীষীর

অমায়িকতা, সারল্য, কর্মশক্তি, অভিমান-রাহিত্য ও মধুর স্বভাব সকলকেই মুগ্ধ করিত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনি অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার দেহাবসানে সবিশেষ ব্যথিত আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্তা স্ত্রী ও কন্যা এবং আত্মীয়স্বজনবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত অগ্রহায়ণ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারস্থিত বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পৌরোহিত্যে অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশ-গুপ্ত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ছাত্রসমাজ', সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ডক্টর দেবব্রত চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগ' এবং বেলুড় মঠের স্বামী জগদী-শ্বরানন্দজী 'স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জীবন ও শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত সাপ্তাহিক ধর্মসভায় শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'স্বামী বিবেকানন্দের 'চিকাগো বক্তৃতা'ও 'শিবানন্দ-বাণী' এবং পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা' সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন।

স্বাধীনতার দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুপযুক্ত—ভারতের শিল্প ও সরবরাহ-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে হইতেই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুপযুক্ত ছিল। স্বাধীনতার দিক দিয়া তাহা অধিকতর অনুপযুক্ত। আমরা বিরাট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব-সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখন অধিকতর ব্যাপক হইয়াছে। সমাজ-ব্যবস্থার নূতন আদর্শের সহিত শিক্ষাপদ্ধতিকে খাপ খাওয়াইতে হইবে। নূতন শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে যে আদর্শের কথা বলা হইয়াছে তদনুসারে সকল নাগরিক ন্যায়বিচার, সমমর্যাদা ও স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। শিক্ষাপদ্ধতিকে এই আদর্শ অনুসারে গঠন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি করিবার জন্য এবং একজাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপকতর করিতে হইবে। খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার জন্য এবং রোগ, অজ্ঞতা ও অভাব হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সাহায্য করিতে হইবে। সার্বজনীন ভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থার গুরুত্ব এখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা পাশা-

পাশি যাইবে। যেহেতু আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার লাভ করিতে যাইতেছি সেই হেতু আমাদিগকে শীঘ্রই প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। সংস্কৃতিই সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। এই ঐক্যই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান নিয়ামক। এই ঐক্যসৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

পরলোকে শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পূর্ণিয়া-স্থিত বাসভবনে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের বহু মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ এবং কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'চীন-প্রবাসীর পত্র', 'আমরা কি ও কে', 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই', 'পাওয়া', 'আই হ্যাজ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলার সাহিত্যিক-মহলে তিনি 'দাদা মশাই' নামে খ্যাত ছিলেন। ১৯৩৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেদারনাথকে 'জগত্তারিণী' পদক দানে সম্মানিত করেন।

বাল্যকালে কেদারনাথ তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের ভক্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তিনি কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

ভ্রম-সংশোধন—অনবধানতা-বশতঃ শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত লিখিত কবিতা "তোমার বাঁশী আমায় ডাকে" কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভ্রমের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত এবং পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সবিশেষ লজ্জিত।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

পত্রাবলী (দ্বিতীয় ভাগ—স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত পত্রসমূহের সঙ্কলন); স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; ৫১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য চার টাকা আট আনা।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত, স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; ৩৮২ পৃষ্ঠা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ উপলক্ষে সেবাকার্যে সাহায্যের জন্য আবেদন

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮ই মার্চ ও ১৩ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ পূর্ণকুম্ভ স্নান উপলক্ষে আনুমানিক ১০।১২ লক্ষ স্নানার্থী সাধু ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হইবে। ইঁহাদের সেবার জন্য কনখল (হরিদ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। সাহায্যকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—(১) সেবাশ্রমের ইন্‌ডোর হাসপাতালে অতিরিক্ত একশতটি বেড্; (২) হরিদ্বারের যে সকল অঞ্চলে অধিক-সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হয়, সেই সকল স্থানে তিনটি পৃথক্ সাময়িক ঔষধবিতরণ-কেন্দ্র; (৩) যে সকল রোগী সেবাশ্রমে বা অন্যান্য সাহায্য-কেন্দ্রে যাইতে অসমর্থ তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সেবাদল; (৪) প্রায় এক হাজার সাধু, ব্রহ্মচারী ও তীর্থযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্য সেবাশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি আশ্রয়-বিভাগ।

সেবাকার্য-পরিচালনার জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, পুরুষ শুশ্রূষাকারী, কম্পাউণ্ডার, স্বেচ্ছাসেবক এবং ঔষধপত্রাদি আবশ্যক। এই সকল কার্যের ব্যয়নির্বাহার্থ ২৫,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। মেলা উপলক্ষে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বয়স ও যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫০ এর পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

এই মহৎ কার্যের জন্য আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আর্থিক ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আবেদন করিতেছি। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার করা হইবে:—

১। **সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,**
পোঃ কনখল, জেলা সাহারাণপুর, (ইউ পি)

২। **প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন**
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

৩। **কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম,**
৪ ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা—১৩